প্রশ্নোত্তরে

সহজ

তাফ্‌সীরে বায়যাবী

(আরবী ইবারত, অনুবাদ ও প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা)

(প্রথম পারা)

মূল

কাযী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহ.)

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা জুনাইদ আহমদ (গোলাপগঞ্জী)

ফাযিল ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মুহাদ্দিস ঃ জামিয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর

বরুণা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রকাশক

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

প্রশ্নোত্তরে সহজ তাফসীরে বায়যাবী

মূল : কাযী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহ.)
অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : মাওলানা জুনাইদ আহমদ (গোলাপগঞ্জী)

প্রকাশক
মাওলানা আব্দুল আযীয
নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
মোবা: ০১৭১২-২৭৫২১৯

প্রকাশকাল
রজব ১৪৩১ হিজরী
জুলাই ২০১০ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ
মঞ্জুর আশরাফী
হেফাজতে ইসলাম কম্পিউটার বিভাগ

হাদিয়া : ৫৫০/- টাকা মাত্র।

জামেউল কামালাত, আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ রাহবর, ওলী ইবনে ওলী, আমীরে হেফাজতে ইসলাম, বরুণা মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও সফল প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লাম হযরত **মাওলানা শায়খ খলীলুর রহমান** বর্ণভী সাহেবের মূল্যবান

দোয়া ও বাণী

কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। আল্লাহ যেমন চিরন্তন তাঁর কালামও চিরন্তন। কুরআন সর্বযুগেই অপরিবর্তনশীল। এর কোন সূরা, আয়াত, রুকু, নুকতা, জের, জবর ও পেশেরও আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। এটা পবিত্র কুরআনের মুজেযা। মানব রচিত গ্রন্থে পরিবর্তন হয়, কিন্তু আল্লাহর কালামে পরিবর্তন নেই। এমন গ্রন্থ মানুষের পক্ষে রচনা করা অসম্ভব। দুনিয়ার সকল দার্শনিক জ্ঞানী, কবি সাহিত্যিক সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে কুরআন আল্লাহর কালাম। মানুষের রচনা করা অসম্ভব।

মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন। জার্মানীর ভূতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. আলফ্রেড ক্রোকার বলেছেন ১৪শ বছর পূর্বে এসব বিষয়ে মুহাম্মাদের (সা.) জানা অসম্ভব ছিলো। যদিও এসব বিষয়ে কুরআনে বর্ণনা আছে। অতএব বুঝতে হবে কুরআন মানুষের কালাম বা মানব রচিত নয়। কুরআন অবতীর্ণ সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের তাফসীরের কাজ অব্যাহত থাকবে। কিছু কিছু তাফসীর গ্রন্থ এমন আচে যা দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত। তাফসীরে বাইজাবী শরীফ এমনই একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা দুনিয়াবাসীর নিকট খুবই পরিচিত এবং বহুল পঠিত কিতাব।

দারুল উলূম দেওবন্দের ফারেগ ও ফাজেল জামেয়া লুৎফিয়া বরুনা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আমার স্নেহভাজন মাওলানা জুনাইদ আহমদ গোলাপগঞ্জী এই বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরে বাইজাবী শরীফের বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল। তাই বাইযাবী শরীফ সুকঠিন হলেও এই গ্রন্থপাঠে ছাত্র-শিক্ষকদের বুঝতে সহজ হবে। আমি মনে করি কুরআনের তাফসীর জানার জন্য এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের জন্য জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে মকবূলে আম্মাহ দান করুন। লেখকের শ্রম যেন আল্লাহ কবুল করেন এবং তাঁর দরজা বুলন্দ করেন। এই কিতাবকে আল্লাহ সকলের জন্য নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন- আমীন।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সমূহ

* ইবারতের সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করা হয়েছে।
* ইবারতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
* প্রশ্নোত্তর আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে।
* প্রত্যেক আয়াতের যাবতীয় আলোচনা 'প্রশ্নোত্তরের ঝিনুকে' প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।
* বেফাকের প্রায় ২০ (বিশ) বছরের সকল প্রশ্নের উত্তর দান করার চেষ্টা করা হয়েছে।
* মূল কিতাব হল করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
* উত্তর দানের ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে।
* বর্তমান যুগের ছাত্রদের মনমানসিকতার প্রতি সযত্নে খেয়াল রাখা হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। দুনিয়ার সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যার থেকে ইচ্ছা করিয়ে নেন। তিনি কিছু করতে চাইলে কেউ তা বাঁধা দিতে পারে না। তিনি চাইলে অযোগ্য বান্দা থেকেও যে খেদমত নিতে পারেন এর আরেকটি প্রকৃষ্ট নজির 'বাংলা শরাহ তাফসীরে বায়যাবী'। যারা আমাকে চেনেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, আমার মতো ইলমহীন ব্যক্তির শরাহ লেখা তো দূরের কথা তা পড়ারও যোগ্যতা নেই। এমন অযোগ্য ব্যক্তি থেকে ইলমে তাফসীরের মতো সূক্ষ্ম ও গভীর শাস্ত্রে কলম ধরাটা নিঃসন্দেহে যেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এই অধম থেকে এই মহান খেদমত নেওয়ায় তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-মরণ উৎসর্গ করছি। হে আল্লাহ! আমি পুনরায় স্বীকার করছি তুমি মহীয়ান-গরীয়ান, সকল শক্তির আধার! তুমি সর্বশক্তিমান।

কুরআন মজীদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাবী কালজয়ী মুফাসসির, যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন আল্লামা আব্দুল্লাহ কাযী বায়যাবী (রহ.)-এর ইখলাসপূর্ণ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। আল্লামা বায়যাবী (রহ.) এই প্রামাণ্য, তথ্যবহুল, অকাট্য ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য বিশুদ্ধরূপে পবিত্র কুরআনের অর্থগত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তাই এ কিতাবখানা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্তরের ক্লাসসমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় তাফসীরের কিতাবসমূহের মধ্যে তাফসীরে কাশশাফের পর তাফসীরে বায়যাবী-ই হলো এমন এক কিতাব যার ভাষাশৈলী অত্যন্ত দুরূহ,কঠিন ও দুর্বোধ্য। যার দুর্বোধ্যতার গন্ডি পেরিয়ে সঠিক মর্ম উদঘাটন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ করে কোমলমতি তালিবে ইলমদের জন্য রীতিমত একটি দুরূহ ব্যাপার।

এ বিচারে ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভান্ডারকে সম্যক উপলব্ধি করার জন্য এবং তাফসীরে বায়যাবীর এ দিকটি বিবেচনা করেই উর্দুভাষাভাষী ছাত্রদের জন্য বহু পূর্বেই উর্দূতে এর বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে তাদের জ্ঞানপিপাসার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও নিবারণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তেমনি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অপরিহার্য ছিল এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণার্থে আমি অধম পূর্ণ এক পারার বাংলা অনুবাদ কার্যে এগিয়ে এসেছি। এতে চেষ্টা করা হয়েছে বায়যাবী শরীফের দুর্বোধ্যতাকে অতি স্বচ্ছ ও সাবলীল করে উপস্থাপন করতে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাবলীলতার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত করণের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

লেখা শেষ না হতেই নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা কর্তৃপক্ষ কিতাবটি প্রকাশের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলে আল্লাহর নামে পান্ডুলিপি তাদের হাতে তুলে দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কিতাবটি ছেপে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য মূল কিতাব (আরবী) অধ্যয়ন করা চাই। যোগ্যতার জন্য এর বিকল্প নেই। মূল কিতাব থেকে পাঠ হাসিলের পরে বাংলা দেখা যেতে পারে। বাংলার উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। তবে যারা মূল কিতাব হতে পাঠ উদ্ধার করতে পারে না তাদের জন্য এ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নিশ্চয় ফায়দা দেবে। এ শ্রেণীর ছাত্রই বাংলার প্রথম পাঠক।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, তা হলো, কিতাবটি প্রণয়নে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। বারবার দোয়া করেছি, যেন সত্য-সঠিক কথাটি কলম থেকে বের হয়। ইচ্ছা করে ভুল রাখার প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ব্যস্ততাহেতু কোনো ভুল যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য আমিই দায়ী এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহপূর্বক ভুলগুলো আমাদের জানালে কৃতার্থ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের মতো কবুল করে নিন এবং একে আমার নাজাতের অসিলা করুন।

বিনীত

জুনাইদ আহমদ
ঘোষগাঁও, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

সূচিপত্র

- ২ ক

☆☆☆

তাফসীর সম্পর্কীয় জরুরী আলোচনা

السوال: عرف التفسير والتاويل لغة واصطلاحا مع الفرق بينهما ثم بين موضوعه وغرضه

উত্তর ঃ معنى التفسير لغة (তাফসীরের শাব্দিক অর্থ) ঃ

تفسير শব্দটি বাবে تفعيل -এর মাসদার। তার বহুবচন হলো تفاسير কারো কারো মতে, تفسير শব্দটি فسر মাদ্দাহ্ থেকে নির্গত। আবার কারো কারো মতে, تفسير শব্দটি تفسرة মাসদার থেকে নির্গত; تفسير শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে الاتقان গ্রন্থকার বলেন, مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ اَلْكَشْفُ وَالْبَيَانُ অর্থাৎ কোন কিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করা। المعجم الوسيط অভিধান প্রণেতা বলেন-- مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ اَلشَّرْحُ وَالْبَيَانُ (বয়ান করা ও ব্যাখ্যা করা)।

معنى التفسير اصطلاحا (তাফসীরের পারিভাষিক অর্থ) ঃ

শরীয়তের পরিভাষায় ইলমে তাফসীরের সংজ্ঞা দানে মুফাস্সিরীনে কেরামে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِه فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّه وَبَيَانِ مَعَانِيْه وَاِسْتِخْرَاجِ اَحْكَامِه وَحُكْمِه

অর্থাৎ তাফসীর হলো– এমন শাস্ত্র যা দ্বারা কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, তার আহকাম বা বিধি-বিধানগুলো আহরণ ও হিকমত তথা সূক্ষ্ম জ্ঞানসমূহ উদঘাটন করা যায়।

২. শায়খ আবু হাইয়ান (রহঃ) বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيْبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّتِيْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةَ التَّرْكِيْبِ وَتَتِمَّاتٍ لِذَالِكَ

অর্থাৎ ইলমে তাফসীর এমন একটি শাস্ত্র যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এর বিষয়বস্তু, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের রীতিনীতি ও সেসব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা এ শব্দাবীলর দ্বারা বাক্য বিন্যাসের অবস্থায় উদ্দেশ্য করা হয়। তদুপরি কুরআনী আয়াতের নাসেখ-মানসূখ, শানে নুযূল এবং অস্পষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সেসব অর্থ উপলব্ধি করার জন্য তাফসীর শাস্ত্র পরিশিষ্টের কাজ দেয়।

معنى التاويل لغة (তাবীলের শাব্দিক অর্থ) ঃ

تاويل শব্দটি اَوْلٌ মাদ্দাহ্ থেকে নির্গত। বাবে تفعيل -এর মাসদার। যার অর্থ– الرجوع (ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা) বা الارجاع (ফিরিয়ে আনা, প্রত্যাবর্তন করানো)।

معنى التاويل اصطلاحا (তাবীলের পারিভাষিক অর্থ) ঃ

اَلتَّاوِيْلُ هُوَ تَشْرِيْحُ الْقُرْاٰنِ بِاِعْتِبَارِ الدِّرَايَةِ

অর্থাৎ কুরআনে কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে تاويل বলে।

الفرق بين التفسير والتاويل (তাফসীর ও তাবীলের মধ্যকার পার্থক্য) ঃ

তাফসীর ও তাবীলের মাঝে পার্থক্য আছে কি না এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে

মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, উভয়টার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর কেউ বলেন, উভয়টার মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

১. আবূ উবায়দা (রঃ) বলেন, تفسير ও تاويل উভয়টা مرادف (সমার্থক) শব্দ। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতটি সঠিক হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এর স্বপক্ষে তাঁদের দলীল হলো, কুরআনের ইরশাদ – وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ এ আয়াতে تاويل শব্দ দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর জন্য দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ تَاوِيْلَ الْقُرْاٰنِ এখানেও تاويل শব্দটি تفسير -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কেউ বলেন, تفسير হলো প্রত্যেক শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করা, আর تاويل হলো পূর্ণ বাক্যের একসাথে ব্যাখ্যা করা। ইমাম রাগেব (রঃ) এ ধরনের উক্তি পেশ করেছেন। তিনি এভাবেও পার্থক্য করেছেন যে, تاويل শুধু আসমানী কিতাবের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, আর تفسير এরূপ নয়; বরং তা ব্যাপক।

৩. শব্দের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার নাম হলো তাফসীর, আর বিষয়বস্তু থেকে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফল বর্ণনাকে তাবীল বলে।

৪. কুরআনে কারীমের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ী তথা সালফে সালেহীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যা হলো তাফসীর। আর কুরআনের মনগড়া বিশ্লেষণ যা সালফে সালেহীনের ব্যাখ্যার পরিপন্থী তাকে তাবীল বলে।

موضوع علم التفسير (ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয়) ঃ

ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো القران الكريم অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াত। বিশেষ করে মুহকাম আয়াতগুলো।

غرض علم التفسير (ইলমে তাফসীরের উদ্দেশ্য) ঃ

ইলমে তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো– পবিত্র কুরআনের ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থগত পরিচয় লাভ করা।

السؤال: (الف) ما معنى التفسير بالرأى وما احكمه؟

(ب) ما ذا رأيكم فى من يجوز التفسير بالرأى ويدعى عدم ضرورة الأخذ من الأسلاف ويقول فيهم هم رجال ونحن رجال؟

উত্তর ঃ الف : معنى التفسير بالرأى (تفسير بالرأى -এর সংজ্ঞা) ঃ

কোন অযোগ্য মানুষ তাফসীরের শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে নিজের মন মতো তাফসীর করাকে تفسير بالرأى বা মনগড়া তাফসীর বলে।

حكم التفسير بالرأى (মনগড়া তাফসীরের বিধান) ঃ

تفسير بالرأى বা মনগড়া তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। কারণ, এভাবে মন মতো তাফসীর করে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। হিদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহির অতল গহবরে পতিত হয়েছে।

যারা تفسير بالرأى -কে জায়েয মনে করে তাদের বিধান ঃ

যদি কোন লোক একথার দাবী করে যে, তাফসীর বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সালফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দরকার নেই। কেননা, هم رجال و نحن رجال (বুদ্ধি ও মেধায় তারা মানুষ ছিলেন, আর আমরাও মানুষ)। তাদের যে নিয়ম-নীতি আবিস্কার করে গেছেন, সেগুলোর প্রয়োজন নেই।

এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের তথা জমহুরের অভিমত হলো এই যে– শরীয়তের নিয়মানুসারে তারা মুলহিদ ও যিন্দীক। কেননা, এটা কেমন করে সম্ভব যে, কুরআনে কারীমের অর্থ রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ যারা নিজের জীবনকে কুরআন-হাদীসের খেদমতে উৎসর্গ করে গেছেন– তাঁদের নিকট গোপন থাকবে। আর চৌদ্দ শত বছর পরে এসে তথাকথিত পন্ডিতদের (?) নিকট কুরআনের মর্ম পরিস্কার হয়ে গেছে।

السوال: كم شيئا يحتاج اليه المفسر وما هى؟ ومن يجوز له ان يفسر القران؟

উত্তর ঃ কুরআনের তাফসীর করতে হলে مفسر -এর মধ্যে কতিপয় শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন–

১. قَامُوْسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ (আরবী ভাষার অভিধান) -এর জ্ঞান থাকতে হবে।
২. عِلْمُ الصَّرْفِ (শব্দ রূপান্তর শাস্ত্র) সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
৩. عِلْمُ النَّحْوِ বা ব্যাকরণ শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে।
৪. عِلْمُ الْإِشْتِقَاقِ বা নিষ্পনন শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে।
৫. عِلْمُ الْمَعَانِىْ বা শব্দতত্ত্ব শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করতে হবে।
৬. عِلْمُ الْبَيَانِ বা বাক্য প্রয়োগ-জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে।
৭. عِلْمُ الْبَدِيْعِ বা অলংকার শাস্ত্রেরও জ্ঞান থাকতে হবে।
৮. عِلْمُ الْقِرَاءَةِ বা পাঠ পদ্ধতির জ্ঞানও থাকতে হবে।
৯. عِلْمُ اُصُوْلِ الدِّيْنِ বা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কেও জানা থাকতে হবে।
১০. عِلْمُ اُصُوْلِ الْفِقْهِ বা ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে।
১১. اَسْبَابُ النُّزُوْلِ বা কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১২. عِلْمُ الْقِصَصِ বা বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১৩. نَاسِخْ ও مَنْسُوْخْ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১৪. عِلْمُ الْفِقْهِ বা ইসলামী আইন মাত্র সম্পর্কে পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে।
১৫. مُجْمَلْ বা সংক্ষিপ্ত আয়াত সম্পর্কে হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত ব্যাখ্যা জানা থাকতে হবে।
১৬. عِلْمُ الْمَوْهِبَةِ বা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা -এর জ্ঞান থাকতে হবে।

যার এ সকল জ্ঞান অর্জিত হয়েছে বা যার মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তার জন্য কুরআনের তাফসীর করা জায়েয।

السوال:(الف) كم طبقة للمفسرين وما هى؟ والبيضاوى من أى طبقة؟
(ب) اذكر نبذا من حياة المؤلف ومزايا كتابه

উত্তর (الف) মুফাস্‌সিরগণের স্তর বিন্যাস ঃ

মুফাস্‌সিরগণের স্তরবিন্যাস দু'ভাবে করা যায়। ১. যুগ ও কালের দিক দিয়ে। ২. মুফাস্‌সিরগণের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিচারে।

যুগ ও কালের বিচারে মুফাস্‌সিরগণকে মোট ১১স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর: সাহাবা ও তাবেঈদের স্তর। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাফসীর শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আর তাবেঈদের মধ্যে হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) ও হযরত ইকরিমা (রঃ) বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর: হযরত দাউদ ইবনে কাওছার (রঃ), হযরত মুররাহ্ হামদানী (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) দ্বিতীয় স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাস্‌সির ছিলেন।

তৃতীয় স্তর: হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ), হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রঃ), শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের মুফাস্‌সির ছিলেন।

চতুর্থ স্তর: আবূ জা'ফর ইবনে জারীর তাবারী (রঃ), আবুল কাসিম ইবরাহীম নো'মানী (রঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম প্রমুখ ছিলেন এ স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাস্‌সির।

পঞ্চম স্তর: আবূ আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন সলমী, আবু ইসহাক আহমদ সান্নাবী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সির।

ষষ্ঠ স্তর: ইমাম রাগিব আস্পাহানী, ইমাম গাযালী, ইমাম মাহমূদ বাগাবী ও আল্লামা জারুল্লাহ্ যমখশরী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের পারদর্শী মুফাস্‌সির।

সপ্তম স্তর: ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, কাযী নাসির উদ্দীন বায়যাবী ও ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রঃ) প্রমখ এ স্তরের মুফাস্‌সির।

অষ্টম স্তর: ইমাম নসফী, আল্লামা ইবনে কাছীর, আল্লামা তাফতাযানী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের বিখ্যাত মুফাস্‌সির ছিলেন।

নবম স্তর: আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আবু তাহির ফিরোযাবাদী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীরকারক ছিলেন।

দশম স্তর: কাযী শাওকানী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) ও আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের মুফাস্‌সির ছিলেন।

একাদশ স্তর: শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মুফতী শফী' (রঃ) প্রমখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

প্রতিভা ও যোগ্যতার বিচারে মুফাস্‌সিরগণের স্তরবিন্যাস ঃ তাফসীরের মাধ্যমে যে সকল মহা মনীষীগণ আল-কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তাদের রচনার ধরন ও প্রতিভার আলোকে তাদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর: যারা সরাসরি কুরআনের ব্যাখ্যা করেন না আবার কোন মুজতাহিদ ইমামের প্রণীত উসূলে ইজতেহাদের অনুসরণ করেন না বরং আপন যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উক্তি ও অভিমত সংকলন করেন। আরবী ভাষায় সংকলিত সফওয়াতুল ইরফান, সফওয়াতুত তাফাসীর এবং উর্দূ ভাষায় আল্লামা শিব্বীর আহমদ উছমানী (রঃ) সংকলিত হাশিয়া এ স্তরের মধ্যে পরিগণিত।

দ্বিতীয় স্তর: যে সকল মুফাসসির কোন এক ইমামের প্রণীত নীতিমালার আলোকে কুরআনে কারীমের তাফসীর করেন। শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান এবং তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটন করেন। আরবী ভাষায় আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত রুহুল মা'নী এবং উর্দূ ভাষায় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) রচিত বয়ানুল কুরআন এ স্তরের তাফসীর গ্রন্থ।

তৃতীয় স্তর: যে সকল মুফাসসির যারা প্রথমে নিজেরা কতিপয় উসূল নির্ধারণ করেন অতঃপর এর অধীনে কুরআনের তাফসীর করেন। এ স্তরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন মুজতাহিদীন ফুকাহা ও অনুসৃত ইমাম চতুষ্টয়কে পরিগণিত করা হয়।

যুগ বা কালের দিক দিয়ে ইমাম বায়যাবী (রঃ) সপ্তম স্তরের মুফাসসির ছিলেন। আর প্রতিভার বিচারে তিনি তৃতীয় স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

(ب) গ্রন্থকার (রঃ) -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী

জন্ম ও বংশ ঃ

নাম আব্দুল্লাহ্। উপনাম আবুল খায়ের ও আবু সাঈদ। উপাধী নাসির উদ্দীন। পিতার নাম উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি পারস্যের বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের দিকে সম্পর্কিত করেই তাকে বায়যাবী বলা হয়। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা বায়যাবী (রঃ) -এর মর্যাদা ঃ

আল্লামা তাজ উদ্দীন তাঁর তাবাকাতে কুবরা নামক গ্রন্থে লিখেন– আল্লামা বায়যাবী (রঃ) ছিলেন আল্লাহ তা'লার আনুগত্যে অটল, অনড়, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, পরহেযগার, এক বিরল ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরুভাগে তিনি সিরাজনগরীর প্রধান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। পরে কোন কারণে এ পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি তিবরিয নামক শহরে গমন করে সেখানকার একটি ইলমী মজলিশে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি উক্ত মজলিশে সকলের পেছনে এভাবে চুপচাপ করে বসে পড়লেন যে, কেউ তার আগমন একটুও টের পায়নি। মজলিশ চলাকালে শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে তাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন এবং সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেন যে, যদি কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, তাহলে সে যেন জবাব দেয়। আর কেউ জবাব দিতে না পারলে কমপক্ষে এতটুকু কাজ যেন অবশ্যই করে যে, কৃত প্রশ্নটি পুনরুল্লেখ করে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কাযী সাহেব দাঁড়িয়ে জবাব দিতে আরম্ভ করে দিলেন। এতে শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা শোনব না যতক্ষণ প্রর্যন্ত তুমি আমার কৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে না। এ কথা শোনে কাযী সাহেব কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই প্রথমে শিক্ষকের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং পরে উহার সন্তোষজনকঃ জবাব দিলেন।

সাথে সাথে তিনি উক্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আরেকটি প্রশ্ন তৈরী করে শিক্ষক মহোদয়ের নিকট উহার জবাব জানতে চাইলেন। শিক্ষক মহোদয়ের তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে গেল। পাশে মন্ত্রী বসা ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে তাদের এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যখন মন্ত্রী সাহেব বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষক মহোদয় এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না, তখন তিনি স্বীয় আসন ছেড়ে দিয়ে কাযী সাহেবের হাত ধরে তাকে নিজের পাশে এনে বসালেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? কাযী সাহেব বললেন, আমি সিরাজনগরীর কাযী ছিলাম, আমাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী তাকে এ পদে পুনরায় বহাল করে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে বিদায় দিলেন।

রচনাবলী :

কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর অমর কীর্তি হচ্ছে তাফসীরে বায়যাবী। এ মহান মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে–

☆ শরহে মাসাবীহ,

☆মিনহাজ,

☆ শরহে মাত্বালে,

☆ লুবাবুল আলবাব ফী ইলমিল এ'রাব,

☆ নিজামুত্ তাওয়ারিখ,

☆ তাফসীরে বায়যাবী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইন্তেকাল :

কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর মৃত্যুসন সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি হচ্ছে– ৬৮২ হিঃ এবং অপরটি হচ্ছে– ৬৮৫ হিঃ। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। তাঁর জন্মসন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তাফসীরে বায়যাবীর বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লামা নাসির উদ্দীন বায়যাবী (রঃ) রচিত তাফসীরে বায়যাবী -এর বৈশিষ্ট্য অনেক তাফসীর গ্রন্থের ঊর্ধ্বে। মনীষীগণের মতে, তাফসীরে কাশ্শাফের পরে তাফসীরে বায়যাবী হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম তাফসীর গ্রন্থ। নিম্নে তাফসীরে বায়যাবী'র কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

১. তাফসীরে বায়যাবী সাহিত্যিকরসে দর্শন শাস্ত্রানুরূপে সুবিন্যস্ত।

২. তাফসীরে বায়যাবী উচ্চাঙ্গনের তুলনামূলক সর্বজন দুর্বোধ্য ও কঠিন প্রকৃতির, যা সাধারণ লোকদের জন্য সহজসাধ্য নয়।

৩. আল্লামা বায়যাবী (রঃ) তাঁর গ্রন্থে বিতর্কিত আলোচনার উত্তর এমনভাবে প্রদান করেছেন, যাতে কোন প্রকার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরও অবকাশ না থাকে।

৪. তাফসীরে বায়যাবীতে বিকৃত তথ্যের কোন সমাবেশ ঘটেনি।

৫. বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং দার্শনিক তত্ত্ব উদঘাটনে তাফসীরে বায়যাবী একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا فَتَحَدّٰى بِاَقْصَرِ سُوْرَةٍ مِّنْ سُوَرِهٖ مَصَاقِعَ الْخُطَبَاءِ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ فَلَمْ يَجِدْ بِهٖ قَدِيْرًا وَاَفْحَمَ مَنْ تَصَدّٰى لِمُعَارَضَتِهٖ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاءِ قَحْطَانَ حَتّٰى حَسِبُوْا اَنَّهُمْ سُحِّرُوْا تَسْحِيْرًا۔

অনুবাদ: ______

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য, যিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ সা.) -এর উপর ফুরকান তথা কুরআন নাযিল করেছেন, যেন সেই বান্দা বা কুরআন বিশ্ববাসীকে ভীতি প্রদর্শন করে। অতঃপর কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরার মোকাবেলায় (একটি সূরা বানানোর জন্য) খাঁটি আরবের বিশুদ্ধভাষী বক্তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু কাউকে তিনি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম পাননি। আদনান ও কাহতান গোত্রের যেসব সাহিত্যিকগণ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছিল তাদেরকে তিনি নিরুত্তর করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা ধারণা করে বসল যে, (কুরআনের আয়াত দ্বারা) তাদেরকে যাদু করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাদের এ ধারণা জন্মিল যে, তারা কঠিন যাদুর স্বীকার হওয়ার কারণে কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা : ______

السوال: لم بدأ المصنفؒ كتابه ببسملة وحمدلة؟ اكتب بالايجاز

উত্তর ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) তদীয় কিতাব আরম্ভ করেছেন بسم الله ও الحمد لله দ্বারা। এর কয়েকটি কারণ নিম্নে পেশ করা গেল।

১. পবিত্র কুরআনের অনুসরণার্থে। কেননা, আল কুরআনেও প্রথমে بسم الله তারপর الحمد لله এসেছে।

২. মানব জাতীর মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র হাদীসের অনুকরণার্থে। কেননা, পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে– كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَفِىْ رِوَايَةٍ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহ বা আল হামদু দ্বারা শুরু না হলে তা বরকতহীন হয়ে যায়।

৩. سلف صالحين -এর পদাঙ্ক অনুসরণার্থে তদীয় কিতাব আরম্ভ করেছেন বিসমিল্লাহ ও আল হামদু দ্বারা। কেননা, سلف صالحين -এর অভ্যাস ছিল, তাঁরা নিজ কিতাব আরম্ভ করতেন বিসমিল্লাহ ও আল হামদু দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ حل اللغات

০ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : সূরা ফাতেহার মধ্যে الحمد শব্দের বিশ্লেষণ করা হবে ইনশা আল্লাহ।

০ نَزَّلَ : باب تفعيل থেকে অর্থ– ধীরে ধীরে অবতরণ করা। যেহেতু কুরআন একসাথে অবতীর্ণ

হয়নি; বরং যেসময় যে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়েছে সে সময় সেটাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এভাবে গোটা তেইশ বছরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে; তাই মুসান্নিফ (র.) এখানে نـــــــزل শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ٱلْفُرْقَانُ ০ : পার্থক্য সৃষ্টিকারী। এখানে فرقان দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআনকে ফুরকান বলা হয় কারণ, কুরআন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

عَبْدٌ ০ : একবচন আর عبــــاد বহুবচন অর্থ বান্দা। এখানে বান্দা বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) উদ্দেশ্য। রাসূলের সমস্ত গুণাবলীর মধ্য থেকে صـفـت عبـوديـت বা দাসত্বের গুণটি সর্বোত্তম গুণ আর অবশিষ্ট গুণাবলী থেকে রিসালতের গুণটি সর্বোত্তম। তাই মুসান্নিফ (র.) علـى رسوله না বলে على عبده বলেছেন। তাছাড়া মহা গ্রন্থ আল- কুরআনে আল্লাহ তা'লা রাসূলের জন্য عبـــد শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন سبحان الذى اسرى بعبده ।

لِيَكُوْنَ ০ : এর লাম হল لام كى এবং يـكـون এর- ضـمـيـر টি فـرقـان অথবা عبد -এর দিকে ফিরেছে।

نَذِيْرًا ০ : অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী।

الاجـابة عـن سـوال একটি প্রশ্নোত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে রাসূল (সা.) -কে যেভাবে نـذيـر বা ভীতি প্রদর্শনকারী বলেছেন তদ্রূপ তাঁকে بشـيـر বা সুসংবাদ প্রদানকারীও বলেছেন। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) এখানে রাসূলের জন্য শুধু نــذِيــر শব্দ ব্যবহার করলেন তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব প্রদান করা যায়। যেমন– (১) নিয়ম আছে, تَـخْـصِيْـصُ الشَّيْئِ بِـالـذِّكْـرِ لَايُـنَـافِيْ عما عداه তথা কোন বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করাতে তার বিপরীতটির নফী বুঝায়না। সুতরাং এখানে نـذير উল্লেখ করাতে রাসূল بشـيـر নন তা বুঝায়না। (২) রাসূল প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে انذار তথা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা। সুতরাং রাসূল মানুষের আত্মিক ব্যধির চিকিৎসক। যেভাবে দেহের চিকিৎসক প্রথমত: রোগীর দেহ থেকে পুঁজ-বিষ্ঠা ইত্যাদি দূর করে তারপর শক্তিবর্ধক ঔষধ আহার করায়। তদ্রূপ আত্মার চিকিৎসককেও প্রথমত: ভ্রান্ত আকীদা, মন্দ চরিত্র ও কুকর্ম থেকে রোগীর অন্তরকে পরিস্কার করতে হবে। আর একাজটি সম্ভব হবে যখন রোগীকে মন্দ স্বভাব, ভ্রান্ত আকীদা এবং কুকর্মের পরিণতি থেকে ভীতি প্রদর্শন করবেন। অত:পর নেক কাজের ভাল প্রতিদান সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, تبشير বা সুসংবাদ প্রদান এটাও রাসূল প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এটা হল দ্বিতীয় স্তরে আর انذار ভীতি প্রদর্শন প্রথম স্তরে। মোটকথা, انـذار -এর মধ্যে আছে دفـع مـضـرت (ক্ষতিকারককে প্রতিহত করা) আর تبشير (সুসংবাদ প্রদানে) আছে جـلـب منفعت (ফায়দা হাসিল করা) আর جـلـب مـنـفـعـت -এর তুলনায় دفـع مـضـرت টি উত্তম। তাই মুসান্নিফ (র.) শুধু উত্তমটি উল্লেখ করেছেন।

تَحَدّٰى ০ : এটা نزل -এর উপর معطوف হয়েছে। তার هو ضمير টি আল্লাহ অথবা عبد বান্দার দিকে ফিরেছে। تحدى অর্থ চ্যালেঞ্জ করা।

بِـاَقْصَرِ سُوْرَةٍ مِّنْ سُوَرِهٖ ০ : অর্থ কুরআনের সর্বক্ষুদ্রতম সূরা। سورة শব্দটি একবচন আর سور (ج) । এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হল তিন আয়াত।

○ مِنْ سُوَرِهٖ : এর ضمير ফিরেছে فرقان-এর দিকে।

○ مَصَاقِعُ : (ج) مصقع (و) মীম বর্ণে কাছরা সহ। অর্থ, স্পষ্টভাষী, যার আওয়ায সুস্পষ্ট ও বুলন্দ।

○ اَلْخُطَبَاءُ : (ج) خطيب (و) খতীব, বক্তা। مصاقع الخطباء-এর মধ্যে اضافت الصفت الى الموصوف হয়েছে।

○ اَلْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ : খাটি আরব। ইবারতে দ্বিতীয়বার العرباء এনেছেন تاكيد সৃষ্টি করার জন্য, অর্থ– খাঁটি আরব বা শ্রেষ্ঠ আরব। مصاقع হল صفت আর الخطباء হল موصوف.

○ اَفْحَمَ: باب افعال থেকে, মাসদার افحام অর্থ– নিরুত্তর করা, চুপ বানিয়ে দেওয়া, অক্ষম বানিয়ে দেওয়া।

○ تَصَدّٰى: باب تفعل থেকে অর্থ– পদক্ষেপ নেওয়া, অগ্রসর হওয়া।

○ مُعَارَضَةٌ : (ب) مفاعلة অর্থ– মোকাবিলা করা, বিরোধিতা করা।

○ قَحْطَانُ وَ عَدْنَانُ : قحطان ও عدنان শব্দদ্বয় আরবের দু'টি প্রাচীন গোত্রের নাম। সকল আরববাসী তখন এ দু' গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। ফলে এ দু' গোত্রের নাম উল্লেখ করে সকল আরববাসীকে বুঝানো হয়েছে।

○ فُصَحَاءُ وَ بُلَغَاءُ : فصحاء (ج) فصيح (و) , بلغاء (ج) بليغ (و) উভয়টার অর্থ একই তথা সাহিত্যিক, ভাষালঙ্কারবিদ। উভয়টাকে একসাথে এনছেন تفنن তথা বাক্যের মধ্যে নিপুণতা সৃষ্টি করার জন্য।

○ سُحِّرُوْا : باب تفعيل থেকে অর্থ– যাদু করা।

☆☆☆

ثُمَّ بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ حَسْبَمَا عَنَّ لَهُمْ مِّنْ مَّصَالِحِهِمْ لِيَتَدَبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ تَذْكِيْرًا فَكَشَفَ قِنَاعَ الْاِنْغِلَاقِ عَنْ اٰيَاتٍ مُحْكَمَةٍ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ هُنَّ رُمُوْزُ الْخِطَابِ تَاوِيْلًا وَّتَفْسِيْرًا۔

অনুবাদ:

অতঃপর আল্লাহ তা'লা তাঁর নাযিল করা কুরআনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান ঐ পরিমাণই বর্ণনা করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ তাদের প্রয়োজন ছিল। যেন তারা কুরআনের আয়াতে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবানরা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং আয়াতে মুহকাম তথা দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহ থেকে দুর্বোধ্যতার পর্দাকে তাফসীর ও তাবীলের মাধ্যমে উন্মুচন করে দিয়েছেন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ, অপরগুলো হল আয়াতে মুতাশাবেহ তথা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ, এগুলো (আল্লাহর) সূক্ষ্ম ইশারা।

قوله ثم بين للناس...............تاويلا وتفسيرا

السوال: حقق الالفاظ فى العبارة المذكورة ثم بين الاستعارات المودعة فى قوله فكشف قناع الانغلاق الخ

উত্তর ঃ

শব্দ বিশ্লেষণ حل اللغات

০ بين : باب تفعيل থেকে অর্থ– বর্ণনা করা, প্রকাশ করা।

০ حسبما : اى قدرما অর্থ– যে পরিমাণ, প্রয়োজন মোতাবেক। শব্দটি منصوب على نزع الخافض অথবা منصوب على الظرفية হয়েছে। এখানে তার عامل হল بين অথবা نزل ।

০ عَنَّ : প্রকাশ পাওয়া।

০ من مصالحهم : এটা ما -এর بيان ।

০ ليتدبروا : এটা بين অথবা نزل -এর সাথে متعلق । التدبر পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।

০ فكشف : এখানে كشف -এর فاء হল فاء عاطفه تفصيليه এটা بين -এর উপর معطوف ।

০ كشف : باب ضرب থেকে– উন্মুচন করা, সরিয়ে দেওয়া, আবরণমুক্ত করা।

০ قناع : অর্থ– পর্দা।

০ الانغلاق : অর্থ– দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা।

০ ايات محكمات : কুরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। মুহকাম ও মুতাশাবিহ। মুহকাম বলা হয়, যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং জ্ঞানী বলতে সকলেই বুঝতে সক্ষম। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ বলা হয়, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয় অর্থাৎ সকলেই বুঝতে সক্ষম নয়।

একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নটি হলো– আয়াতে মুহকাম বলা হয় যার অর্থ সুস্পষ্ট, যার অর্থের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং মুসান্নিফ (র.) -এর এখানে كشف শব্দ ব্যবহার করা সঠিক হয়নি। কেননা, كشف বা উন্মোচিত করার জন্য পূর্ব থেকে বস্তুট লুকায়িত থাকা আবশ্যক। আর আয়াতে মুহকামের মধ্যে তো কোন অর্থ লুকায়িত ও অস্পষ্ট নয়। সুতরাং তার থেকে কি অস্পষ্টতা দূর করা হবে?

উত্তর: মুহকাম আয়াত থেকে দুর্বোধ্যতা উন্মোচন করার অর্থ হল শুরুতেই তাকে উন্মোচিত বা প্রকাশ্য অর্থের মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ অবতীর্ণের সময়ই তাতে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা।

০ رموز : (ج) رمز (و) অর্থ– ভেদ ও ইঙ্গিত।

০ خطاب : বলা হয় কালামকে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি উপস্থাপন করা।

০ تاويلا و تفسيرا : كشف -এর مفعول مطلق من غير لفظه হয়েছে। অথবা مؤولا و مفسرا -এর তাবীলে كشف -এর هو ضمير فاعل থেকে حال হয়েছে।

بيان الاستعارات والتشبيهات

قوله فكشف قناع الانغلاق عن ايات محكمات : এ ইবারতের মধ্যে قناع -এর ইযাফত الانغلاق -এর দিকে اضافت المشبه به الى المشبه হয়েছে। ইবারতটি এরকম ছিল– كشف الانغلاق

كـالـقـنـاع কুরআনের শব্দমালার দুর্বোধ্যতাকে পর্দার সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। পর্দা যেরকম মাথা দেখতে অন্তরায় হয় তদ্রূপ দুর্বোধ্যতাও কুরআনের শব্দমালা থেকে অর্থ উদঘাটন করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলেন, এখানে তিন ধরনের استعارہ পাওয়া গেছে। (১) استعاره بالكنايه (২) استعاره تخييليه (৩) استعاره ترشيحيه

উল্লেখ্য যে, مشبه به-কে হযফ করে مشبه উল্লেখ করাকে استعاره بالكناية বলে, আর مشبه به-এর مناسب-কে مشبه-এর জন্য ثابت করাকে استعاره تخييلية বলে। আর مشبه به-এর لازم-কে مشبه-এর জন্য ثابت করাকে استعاره ترشيحيه বলে।

উল্লেখিত ইবারতে কুরআনের আয়াতের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতাকে পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুর সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে। কিন্তু مشبه তথা ايات محكمات-কে উল্লেখ করে مشبه به তথা পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুকে উহ্য রাখা হয়েছে। কাজেই এখানে استعاره بالكنايه হয়েছে। অতঃপর مشبه به তথা পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুর لازم তথা قناع-কে مشبه-এর জন্য ثابت করা হয়েছে। কাজেই এখানে استعاره تخييليه পাওয়া গেছে। অতঃপর مشبه به-এর مناسب তথা كشف-কে مشبه-এর জন্য ثابت করা হয়েছে। কাজেই এখানে استعاره ترشيحيه পাওয়া গেছে।

☆☆☆

وَاَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ لِيَتَجَلّٰى لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوْتِ لِيَتَفَكَّرُوْا فِيْهَا تَفْكِيْرًا وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْاَحْكَامِ وَاَوْضَاعَهَا مِنْ نُّصُوْصِ الْاٰيَاتِ وَاَلْمَاعِهَا لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيْرًا ـ

অনুবাদ:

আর তিনি (আল্লাহ তা'লা) দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের গোপন বিষয়াবলীকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এ দু'জগতের গোপন কথাগুলো এবং (আল্লাহ তা'লার) পবিত্রতা ও ক্ষমতাধরতার গোপন রহস্যাবলী। যাতে তারা এসব বিষয়াবলীর উপর পরিপূর্ণ চিন্ত-ফিকির করতে পারে। সাথে সাথে তাদের জন্য আয়াতের ভাষ্য ও তার ইশারা থেকে উদঘাটিত আহকামের মূলনীতি ও তার علت বা কারণসমূহকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যাতে তাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূর করতঃ তাদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله: وابرز غوامض الحقائق..............سعيرا
السوال: حقق الالفاظ المذكورة فى هذه العبارة

উত্তর ঃ শব্দ বিশ্লেষণحل اللغات

○ و ابرز: -এর আতফ হয়েছে كشف-এর উপর। ابرز এটা باب افعال থেকে অর্থ– প্রকাশ করা,

উন্মুক্ত করা।

০ غوامض : (ج) غامض / غامضة (و)অর্থ– গোপনীয়। غمض الكلام অর্থ– কালামের মর্ম গুপ্ত থাকা।

০ حقائق : (ج) حقيقة (و) হাকীকত বলা হয় যা দ্বারা কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। حقائق দ্বারা দৃশ্য জগত উদ্দেশ্য।

০ لطائف : (ج) لطيفة (و) অর্থ– সূক্ষ্ম বিষয় যা গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

০ دقائق : (ج) دقيقة (و) অর্থ– সূক্ষ্ম বিষয়। এর দ্বারা অদৃশ্য জগত উদ্দেশ্য।

০ غوامض الحقائق -এর মধ্যে اضافت الصفت الى الموصوف এবং لطائف الدقائق -এর মধ্যে اضافت الموصوف الى الصفت হয়েছে।

০ خفايا : (ج) خفية (و) এবং خبايا : (ج) خبية (و) উভয়টির অর্থ– গোপনীয় বিষয়।

০ الملك والملكوت : অর্থ– রাজত্ব। ملك দ্বারা দৃশ্য জগত এবং ملكوت দ্বারা অদৃশ্য জগত উদ্দেশ্য।

০ القدس : অর্থ– পবিত্রতা। এখানে القدس দ্বারা আল্লাহ তা'লার صفت جمالى তথা সৌন্দর্যসূচক গুণাবলী উদ্দেশ্য।

০ الجبروت : অর্থ– ক্ষমতাধরতা, পরাক্রমতা। এখানে আল্লাহ তা'লার صفت جلالى তথা বড়ত্ব গুণাবলী উদ্দেশ্য।

০ اوضاع : (ج) وضع (و) । وضع বলা হয় সেই علت -কে, যা হুকুমের ফায়দা দিতে সহায়ক হয় অর্থাৎ সেই علت বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার দরুন হুকুমকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার কারণ বর্ণনায় রাসূল (সা.) -এর বাণী– انها من الطوافين عليكم او الطوافات (অর্থাৎ এগুলো তোমাদের ঘরে আসা-যাওয়া করেই থাকে)। এখানে طواف হল علت । এর কারণে নাপাক না হওয়ার হুকুম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

০ نصوص الايات : نصوص (ج) نص (و) । نص বলা হয় যা নিজের অর্থ প্রকাশে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ শব্দকে সেই সুস্পষ্ট অর্থ বুঝাতেই নেয়া হয়েছে। نصوص الايات দ্বারা عبارت النص উদ্দেশ্য।

০ الماع : (ج) لمع (و) অর্থ– ঔজ্জ্বল্য ও রশ্মি। এখানে اشارت النص , دلالت النص ও اقتضاء النص উদ্দেশ্য।

০ ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا : এটা احكام شرع বর্ণনা করার কারণ। এর কারণ বা হেকমত হল– মানুষ এগুলোকে পরিচয় করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। আহকামে শরা' পরিচয়ের মাধ্যমে মূর্খতার আঁধার থেকে মুক্তি পাবে এবং সেগুলোর উপর আমল করলে পাপাচারের অপবিত্রতা দূরীভূত হবে। ফলে তার পবিত্রতা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত হবে। এ জন্যই মুসান্নিফ (র.) ليذهب عنهم الرجس -এর পর ويطهرهم تطهيرا বলেছেন।

فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ فَهُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيْدٌ وَّ سَعِيْدٌ وَّمَنْ لَّمْ يَرْفَعْ اِلَيْهِ رَأْسَهُ وَاَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ يَعِشْ ذَمِيْمًا وَّسَيَصْلٰى سَعِيْرًا۔

অনুবাদ:

সুতরাং যার আলোকিত আত্মা রয়েছে এবং যে মনোযোগের সাথে কান পেতে শ্রবণ করেছে, সে দুনিয়ায় প্রশংসিত ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যে কুরআনের প্রতি স্বীয় মস্তক পর্যন্ত উত্তোলন করেনি (অর্থাৎ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছে) এবং জন্মগত জ্যোতিকে নিভিয়ে দিয়েছে, সে (দুনিয়াতে) লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করবে আর (পরকালে) সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله: فمن كان له قلب......الخ

السوال: شرح العبارة المذكورة

উত্তর ঃ মুসান্নিফ (র.) ইতিপূর্বে استحقاق حمد باری تعالی আল্লাহ তা'লার প্রশংসার যোগ্য হওয়ার আলোচনা করেছেন; তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা যেভাবে সত্ত্বাগতভাবে প্রশংসার যোগ্য সেভাবে গুণাবলীর দিক দিয়েও তিনি প্রশংসার যোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার যেসব গুণ রয়েছে; সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেও তিনি প্রশংসার যোগ্য হোন। আর তাঁর গুণসমূহের মধ্যে একটি গুণ হল تنزيل قرآن তথা কুরআন নাযিল করা।

এখন فمن كان له قلب الخ ইবারত দ্বারা منزل عليهم তথা যাদের প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে তাদের শ্রেণীভেদ বর্ণনা করছেন। সুতরাং منزل عليهم তিন দলে বিভক্ত।

১ম দল: من كان له قلب অর্থাৎ যারা জন্মগতভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান গ্রহণের জ্যোতিময় অন্তরের অধিকারী।

২য় দল: والقى السمع وهو شهيد অর্থাৎ যারা জন্মগ্রহণের পর প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার কাছে রাসূলের দা'ওয়াত, আল্লাহর বাণী ও আহকাম পৌঁছেছে এবং সে তার সেই জন্মগত জ্যোতীময় অন্তরকে কাজে লাগিয়ে করে সেই দা'ওয়াত ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং কুরআনের আহকামের পূর্ণ অনুকরণ করে স্বীয় অন্তরকে অপবিত্রতা এর কলংক থেকে পবিত্র করে নেয় যাতে কুরআন দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারে এবং কুরআনে কারীমের গভীর থেকে গভীর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করে।

৩য় দল: ومن لم يرفع اليه رأسه واطفأ نبراسه অর্থাৎ যারা রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করতে পারেনি। বরং মানবীয় অপবিত্রতা ও কলংকে নিজেকে লেপন করেছে। যদ্দরুন সে পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়েছে।

এরপর মুসান্নিফ (র.) উক্ত তিন দলের ইহকালীন ও পরকালীন বিধানও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং

প্রথম দুই দল সম্পর্কে বলেছেন فهو فى الدارين حميد و سعيد অর্থাৎ এ দু'দল দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসিত ও সৌভাগ্যবান হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

পক্ষান্তরে তৃতীয় দল সম্পর্কে তিনি বলেছেন يعش ذميما و سيصلى سعيرا অর্থাৎ এরা পৃথিবীতে লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করবে এবং আখেরাতে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে নিমজ্জিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এদের দলভুক্ত না করুন। অমীন!

☆☆☆

فَيَا وَاجِبَ الْوَجُوْدِ وَيَا فَائِضَ الْجُوْدِ وَيَا غَايَةَ كُلِّ مَقْصُوْدٍ صَلِّ عَلَيْهِ صَلٰوةً تُوَازِىْ غَنَائَهُ وَتُجَازِىْ عَنَائَهُ وَعَلٰى مَنْ اَعَانَهُ وَقَرَّرَ تِبْيَانَهُ تَقْرِيْرًا وَّاَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

অনুবাদ:

হে ঐ সত্ত্বা যার অস্তিত্ব অপরিহার্য! হে ঐ সত্ত্বা যার দান অসীম! হে সকল উদ্দেশ্যের শেষসীমা! আপনি তাঁর উপর (অর্থাৎ রাসূলের উপর) এমন রহমত বর্ষণ করুন যা তাঁর কল্যাণের বরাবর হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের সমপরিমাণ হয় এবং (রহমত বর্ষণ করুন) তাদের উপর যারা তাঁর সাহায্য করেছে এবং তাঁর বিধানাবলীকে সুদৃঢ় করেছে এবং আমাদের প্রতি তাদের বরকতের প্রবাহ দান করুন এবং তাদের মর্যাদা প্রাপ্তির পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন। তাদের প্রতি ও আমাদের প্রতি অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله: فيا واجب الوجود.................كثيرا

السوال: حقق الالفاظ المذكورة فى هذه العبارة

উত্তর ঃ শব্দ বিশ্লেষণ

০ واجب الوجود : সেই সত্তাকে বলে, যার অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং অনস্তিত্ব অসম্ভব।

০ فائض الجود : فائض –শব্দটি فيض থেক নির্গত অর্থ– প্রবহিত হওয়া, পানি উপত্যকা থেকে উবলিয়ে উঠা। الجود – অর্থ– দান। فائض الجود অর্থ– যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করে থাকেন, অসীম দানের মালিক।

০ توازى : باب مفاعله থেকে মাসদার موازاة অর্থ– বরারবর হওয়া, সমান হওয়া।

০ غناء : (بفتح الغين) অর্থ– কল্যাণ।

০ عناء : (بتح العين) অর্থ– কষ্ট-ক্লেশ।

০ قرر : باب تفعيل থেকে মাসদার تقريرا অর্থ– সুদৃঢ় করা, মজবুত করা।

০ تبيان : বর্ণনা, বয়ান। উদ্দেশ্য– রাসূলের বাণী ও তাঁর বিধানাবলী। على من اعانه দ্বারা সাহবায়ে কেরাম এবং قرر تبيانه দ্বারা তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন, মুজতাহিদীন মোটকথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত ওলামায়ে দ্বীন উদ্দেশ্য।

وَبَعْدُ: فَاِنَّ اَعْظَمَ الْعُلُوْمِ مِقْدَارًا وَّارْفَعَهَا شَرْفًا وَّمَنَارًا عِلْمُ التَّفْسِيْرِ الَّذِىْ هُوَ رَئِيْسُ الْعُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ وَرَأْسُهَا وَمَبْنٰى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَاَسَاسُهَا لَايَلِيْقُ لِتَعَاطِيْهِ وَالتَّصَدِّىْ لِلتَّكَلُّمِ فِيْهِ اِلَّا مَنْ بَرَعَ فِى الْعُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ كُلِّهَا اُصُوْلِهَا وَفُرُوْعِهَا وَفَاقَ فِى الصِّنَاعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفُنُوْنِ الْاَدَبِيَّةِ بِاَنْوَاعِهَا۔

অনুবাদ:

হামদ ও সালাতের পর, কথা হল– ইলমে তাফসীর সমস্ত ইলম অপেক্ষা মর্যাদাগত দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, আভিজাত্য ও উচ্চমানের দিক থেকে অতি শীর্ষে। এই ইলমে তাফসীর সকল ধর্মীয় ইলমের প্রধান ও মূল। আর শরীয়তের নিয়মনীতির ভিত্তি ও বুনিয়াদ। এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা, এ সংক্রান্ত বিষয়ে অলোচনা-সমালোচনা করার জন্য কেবল সেই যোগ্য যে মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে পাদর্শিতা অর্জন করেছে এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইলমের শীর্ষে পৌঁছেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السوال: (الف) الفاء فى قوله فان اعظم لاى معنى؟

(ب) اوضح قوله: فان اعظم العلوم مقدارا وارفعها شرفا

(ج) ما مراد قوله مبنى قواعد الشرع واساسها؟

(د) ولايليق لتعاطيه والتصدى للتكلم فيه الا من برع فى العلوم الدينية الخ بين غرض المصنف بهذه العبارة

উত্তর ঃ (الف) فان اعظم -এর فاء টি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হল– এখানে توهم اما -এর ভিত্তিতে فاء এসেছে অর্থাৎ بعد -এর শুরুতে সাধারণত: اما এসে থাকে, কিন্তু এখানে যেহেতু আসেনি তাই এখানে اما উহ্য আছে তা বুঝানোর জন্যই فاء এসেছে।

কেউ কেউ বলেন– بعد - ظرف -কে شرط -এর স্থলাভিষিক্ত করে তার জওয়াবে فاء আনা হয়েছে তাই فاء টি হবে فاء جزائيه ।

(ب) فان اعظم العلوم مقدارا وارفعها شرفا **ইবারতের ব্যাখ্যা ঃ** অর্থাৎ ইলমে তাফসীর সমস্ত ইলম অপেক্ষা মর্যাদাগত দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, উৎকর্ষতা ও উচ্চমানের দিক থেকে অতি শীর্ষে। কেননা, নিয়ম আছে যে, যে ইলমের আলোচ্য বিষয় যত মর্যাদাসম্পন্ন হয় সে ইলমও তত মর্যাদাশীল হয়ে থাকে। আর একথা পরিষ্কার যে, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হল কালামুল্লাহ, যার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই ইলমে তাফসীরও সকল ইলম অপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ও শীর্ষে।

(ج) مبنى قواعد الشرع واساسها **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** এর দ্বারা ইলমে তাফসীরের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইলমে তাফসীরই হল শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তি। কেননা, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হল পবিত্র কুরআন। আর পবিত্র কুরআন হল শরীয়তের মূলনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

(د) لايليق لتعاطيه والتصدى للتكلم فيه الا من برع فى العلوم الدينية الخ -এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) এই ইবারতের মাধ্যমে সেইসব ইলমের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে মুফাসিসর বা কুরআন ব্যাখ্যাকারের জন্য পারদর্শিতা অর্জন করা শর্ত। এগুলোর মধ্যে পারদর্শিতা অর্জন ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করা জঘন্যতম অপরাধ। সুতরাং তিনি اصولها দ্বারা ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে উসূলে ফেকাহ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর فروعها দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন ইলমে ফেকাহ এবং ইলমে আখলাকের প্রতি। আর অবশিষ্ট ইবারত দ্বারা অন্যান্য ইলমের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ادب -এর মধ্যে সর্বমোট ১২টি ইলম এসে গেল, যেগুলোর মধ্যে কিছু হল اصول আর বাকীগুলো فروع ।

☆☆☆

وَلَطَالَمَا اُحَدِّثُ نَفْسِيْ بِاَنْ اُصَنِّفَ فِيْ هٰذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَّحْتَوِيْ عَلٰى صَفْوَةِ مَا بَلَغَنِيْ مِنْ عُظَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ دُوْنَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ وَيَنْطَوِيْ عَلٰى نُكَتٍ بَارِعَةٍ وَّلَطَائِفَ رَائِقَةٍ اِسْتَنْبَطْتُّهَا اَنَا وَمَنْ قَبْلِيْ مِنْ اَفَاضِلِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَاَمَاثِلِ الْمُحَقِّقِيْنَ۔

অনুবাদ:

(লেখক বলেন) অনেক দিন থেকে আমার অন্তরে ভাবনার উদ্রেক হয় যে, এ বিষয়ের উপর আমি এমন গ্রন্থ রচনা করবো, যা শামিল করবে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-নির্যাসগুলোকে যা আমার নিকট বড় বড় সাহাবী, ওলামায়ে তাবেয়ীন এবং সালফে সালেহীনের সূত্রে পৌঁছেছে। আর কিতাবটি হবে এমন যা শামিল করবে গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় ও চিত্তাকর্ষক সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিষয়কে। যেগুলোকে চয়ন করেছি আমি ও আমার পূর্বসূরি মুতাআখিখরীন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহক্কিকগণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

حل اللغات শব্দ বিশ্লেষণ

০ لطالما : এখানে প্রথম لام হরফটি زائده (অতিরিক্ত) অথবা تاكيد -এর জন্য। فعل এটা – طال ماضى (م) طولا অর্থ– দীর্ঘ হওয়া। ما হল ما كافه আরবী ভাষায় طال - كثر - قل এই তিন ফে'লের শেষে ما كافه যুক্ত হয় আর তখন এগুলোর فاعل -এর প্রয়োজন হয়না। অথবা ما টি হল مصدريه ।

০ يحتوى : (ب) افتعال (م) احتواء অর্থ– শামিল করা, অন্তর্ভুক্ত করা, ধারন করা।

০ صفوة : অর্থ– সার-নির্যাস।

০ عظماء الصحابة : বড় বড় সাহাবীগণ। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ মুফাসিসরীন সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। যথা: চার খলীফা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উবই ইবনে কা'ব, যায়দ ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ।

০ علماء التابعين : তাবেয়ীন ওলামায়ে কেরাম। যেমন– হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, তাউস, আতা ইবনে আবি রাবাহ, আলকামা প্রমুখ।

০ ومن دونهم من السلف : তাবেয়ীনের পরবর্তী মুফাসিসরীনে কেরাম উদ্দেশ্য। যেমন– হযরত আব্দুর রাযযাক, আবু আলী ফারসী, আলী ইবনে আবি তালহা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ।

০ ينطوى : (ب) انفعال (م) انطواء অর্থ– শামিল করা।

০ نكت : (و) نُكْتَةٌ অর্থ– সূক্ষ্ম বিষয়।

০ رائقة : (م) روق অর্থ– চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর।

০ افاضل و اماثل : (و) افضل (و) امثل অর্থ– শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধাভাজন। এর দ্বারা কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা জারুল্লাহ যামখশরী, মুফরাদাত গ্রন্থকার আল্লামা রাগিব ইসফেহানী, তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) উদ্দেশ্য।

☆☆☆

وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوْهِ الْقِرَاٰتِ الْمَشْهُوْرَةِ الْمُعْزِيَةِ اِلَى الْاَئِمَّةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ وَالشَّوَاذَّةِ الْمَرْوِيَةِ عَنِ الْقُرَّاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ اِلَّا اَنَّ قُصُوْرَ بَضَاعَتِىْ يُثَبِّطُنِىْ عَنِ الْاِقْدَامِ وَ يَمْنَعُنِىْ عَنِ الْاِنْتِصَابِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ حَتّٰى سَنَحَ لِىْ بَعْدَ الْاِسْتِخَارَةِ مَا صَمَّمَ بِه عَزْمِىْ عَلَى الشُّرُوْعِ فِيْمَا اَرَدْتُّهُ وَالْاِتْيَانِ بِمَا قَصَدْتُّهُ نَاوِيًا اَنْ اُسَمِّيَهُ بَعْدَ اَنْ اُتَمِّمَهُ بِاَنْوَارِ التَّنْزِيْلِ وَ اَسْرَارِ التَّاوِيْلِ فَهَا اَنَا اَلْاٰنَ اَشْرَعُ وَبِحُسْنِ تَوْفِيْقِه اَقُوْلُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَالْمُعْطِىْ لِكُلِّ سُوْلٍ۔

অনুবাদ:

এবং এ গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আটজন কেরাতের ইমামদের সহিত সংযুক্ত প্রসিদ্ধ কেরাতের গঠন পদ্ধতিকে ও নির্ভরযোগ্য কারিদের হতে বর্ণিত বিরল গঠন পদ্ধতিকে প্রকাশ করবে। তবে আমার মূল ধনের (জ্ঞানের) দুর্বলতা আমাকে এ পথে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা প্রদান করে এবং এই স্থানে দাঁড়াতে আমাকে বারণ করতে থাকে। এমনকি ইস্তেখারার পর আমার সামনে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যদ্দরুন অভিপ্রায়ের সূচনা করতে এবং ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে আমার ইচ্ছা দৃঢ় হয় এই সংকল্প করে যে, এই গ্রন্থ সমাপ্ত করার পর 'আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল' করে তার নাম রাখব। তাই এখন আমি শুরু করছি এবং আল্লাহর উত্তম তাওফীকে বলছি। আর তিনিই প্রত্যেক উত্তম কাজের তাওফীক দাতা এবং সকল কামনা-বাসনা পূরণকারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

حل اللغات শব্দ বিশ্লেষণ

০ يعرب : (ب) افعال (مصـ) اعراب অর্থ– প্রকাশ করা।

০ المعزية : اسم مفعول (ب) ضرب يضرب (مصـ) عزوا অর্থ– সংযুক্ত করা, নিসবত করা। معزية সম্পর্কযুক্ত।

০ قصور بضاعتي : মূল ধনের ত্রুটি। উদ্দেশ্য– জ্ঞানের স্বল্পতা। এখানে ইলমকে ব্যবসার পুঁজির সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। অতএব এখানে استعارہ مصرحہ পাওয়া গেল।

০ يثبطني : باب تفعيل থেকে মাসদার تثبيط বাধা প্রদান করা।

০ ما صمم به عزمي : صمم এটা باب تفعيل থেকে অর্থ, দৃঢ় হওয়া, মজবুত হওয়া। ما صمم এটা سنح -এর فاعل । এবং عزمي টি صمم -এর فاعل । به -এর ضمير টি ما -এর দিকে ফিরেছে।

০ على الشروع : এটা عزمي -এর সাথে متعلق

০ و الاتيان به : معطوف হয়েছে الشروع -এর উপর।

০ ناويا : حال হয়েছে عزمي -এর ضمير متكلم থেকে।

০ انوار التنزيل واسرار التاويل : এটা বায়যাবী শরীফের পূর্ণ নাম।

السوال: اكتب اسماء الائمة الثمانية المشهورين فى القراءة

উত্তর ঃ اسماء الائمة الثمانية المشهورين فى القراءة : ইলমে কেরাতের প্রসিদ্ধ অষ্ট ইমামগণ। এরা হলেন–

১. নাফে' ইবনে আব্দুর রহমান (র.)।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে কাছীর (র.)।

৩. আবু আমর ইবনে আলী (র.)।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (র.)।

৫. আছিম ইবনে আবুন নাজুদ (র.)।

৬. হামযা ইবনে হাবীব যাইয়াত (র.)।

৭. আবুল হাসান কাসাঈ (র.)।

৮. আল্লামা ইয়াকুব হাযরামী (র.)।

سُوْرَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَتُسَمّٰى أُمُّ الْقُرْاٰنِ لِاَنَّهَا مَفْتَتَحُهٗ وَمَبْدَاُهٗ فَكَاَنَّهَا أَصْلُهٗ وَمَنْشَؤُهٗ وَلِذَالِكَ تُسَمّٰى أَسَاسًا أَوْ لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلٰى مَا فِيْهِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَالتَّعَبُّدِ بِأَمْرِهٖ وَنَهْيِهٖ وَبَيَانِ وَعْدِهٖ وَ وَعِيْدِهٖ أَوْ عَلٰى جُمْلَةِ مَعَانِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ النَّظْرِيَةِ وَالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِىْ هِىَ سُلُوْكُ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَالْاِطِّلَاعِ عَلٰى مَرَاتِبِ السُّعَدَاءِ وَمَنَازِلِ الْأَشْقِيَاءِ وَسُوْرَةُ الْكَنْزِ وَالْوَافِيَةُ وَالْكَافِيَةُ لِذَالِكَ وَسُوْرَةُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَتَعْلِيْمِ الْمَسْئَلَةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا وَالصَّلٰوةِ لِوُجُوْبِ قِرَاءَتِهَا أَوْ اِسْتِحْبَابِهَا فِيْهَا وَالشَّافِيَةُ وَالشِّفَاءُ لِقَوْلِهٖ ﷺ هِىَ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ لِأَنَّهَا سَبْعُ أٰيَاتٍ بِالْاِتِّفَاقِ اِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّ التَّسْمِيَةَ أٰيَةً دُوْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَكَسَ وَتُثَنّٰى فِى الصَّلٰوةِ أَوْ فِى الْاِنْزَالِ اِنْ صَحَّ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِمَكَّةَ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ وَبِالْمَدِيْنَةِ لَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَقَدْ أٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَهُوَ مَكِّيٌّ۔

অনুবাদ:

সূরা ফাতেহাতুল কিতাব, একে উম্মুল কুরআন নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। কেননা, এ সূরা কুরআনের প্রারম্ভিকা ও সূচনা। ফলে এটি যেন তার মূল ও উৎপত্তিস্থল। এ কারণেই এসূরাকে আছাছ বা বুনিয়াদ বলা হয়। অথবা সূরা ফাতেহাকে (উম্মুল কুরআন এ কারণে বলা হয় যে,) এটা কুরআনের মূল বিষয়বস্তুগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে শামিল করেছে। যেমন- আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অঙ্গীকার ও আযাবের ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত বর্ণনা। কিংবা এ সূরা কুরআনের সকল উদ্দেশ্য তথা আহকামে ই'তেকাদী ও আমলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর আহকামে আমলী ও ই'তেকাদী হল সরল পথে চলা। তদ্রূপ এসূরার মধ্যে সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও হতভাগাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে অবগত করার বর্ণনা রয়েছে। আর সূরা ফাতেহার নাম সূরাতুল কানয, সূরাতুল ওয়াফিয়া ও সূরাতুল কাফিয়া রাখা হয়েছে পূর্বোল্লেখিত কারণে। আবার এ সূরাকে সূরাতুল হামদ, সূরাতুশ শোকর, সূরাতুদ দুআ ও সূরাতু তা'লীমিল

মাসআলাও বলা হয়। কেননা, এসূরাটির মধ্যে এসকল বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এসূরাকে সূরাতুস সালাতও বলা হয়। কেননা, এ সূরা নামাযে পাঠ করা ওয়াজিব বা মোস্তাহাব। একে সূরাতুশ শাফিয়া ও শিফাও বলা হয়। কেননা, এসূরা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন- এটা সকল রোগের নিরাময়। একে আস সাবউলমাছানীও বলা হয়। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে এ সূরা সাত আয়াত বিশিষ্ট। তবে কেউ কেউ বিসমিল্লাহকে এক আয়াত গণনা করেছেন এবং انعمت عليهم -কে আয়াত গণনা করেননি। আর কেউ কেউ এর বিপরীত করেছেন। অথবা অবতরণে দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। যদি এটা সঠিক হয় যে, নামায ফরয হওয়াকালীন সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিবলা পরিবর্তনের সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক কথা হল- এ সূরা মক্কাবতীর্ণ। কেননা, আল্লাহ তা'লার বাণী- ولقد اتيناك سبعا من المثانى এটাও মক্কাবতীর্ণ আয়াত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السوال: اكتب اسماء سورة الفاتحة مع وجوه التسمية.
وفاق المدارس سنه ١٤٠٥، ١٤٠٨

উত্তর ঃ সূরা ফাতেহার নামসমূহ ঃ আল্লামা বায়যাবী (রঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা ফাতেহার মোট ১৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে শুধু নামগুলো উল্লেখ করা গেল।

(১) ফাতেহাতুল কিতাব (২) উম্মুল কুরআন (৩) আছাছুল কুরআন (৪) সূরাতুল কানয (৫) সূরাতুল ওয়াফিয়া (৬) সূরাতুল কাফিয়া (৭) সূরাতুল হামদ (৮) সূরাতশ শোকর (৯) সূরাতুদ দুআ (১০) সূরাতু তা'লীমিল মাসআলা (১১) সূরাতুস সালাত (১২) সূরাতুশ শাফিয়া (১৩) সূরাতুশ শিফা (১৪) সাবউল মাছানী।

এবার উক্ত নামগুলোর কারণ দেখুন !

১। ফাতেহাতুল কিতাব ঃ সূরা ফাতেহাকে ফাতেহাতুল কিতাব বলার কারণ হল- فاتحة অর্থ- আরম্ভকারী। যেহেতু এ সূরা দ্বারা কুরআন আরম্ভ করা হয় তাই একে ফাতেহাতুল কিতাব বলা হয়।

২। উম্মুল কুরআন ঃ এর নামকরণের কারণ তিনটি। যথা-

(ক) ام অর্থ- আসল বা মূল। যেহেতু এ সূরা কুরআনের প্রারম্ভিক ও সূচনাস্থল। ফলে তা কুরআনের আসল ও মূল হয়ে গেল। তাই তাকে উম্মুল কুরআন কলা হয়।

(খ) ام অর্থ- মা, জননী। যেহেতু সূরা ফাতেহা পবিত্র কুরআনের মৌলিক বিষয়াদিকে সংক্ষিপ্তাকারে শামিল রেখেছে। যেমন- আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের ওয়াদা ও আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন (এগুলো হল কুরআনের মৌলিক বিষয়।) ফলে এ সূরাটি গোটা কুরআনের জন্য মা সমতুল্য হয়ে গেল। সন্তান যেমনিভাবে মায়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকে তেমনিভাবে সূরা ফাতেহার ভিতরেও গোটা কুরআন লুকায়িত। তাই একে উম্মল কুরআন নাম রাখা হয়েছে।

(গ) মূলত কুরআন তিনটি বিষয়ের উপর সন্নিবেশিত। সেগুলো হল- (১) আহকামে ই'তেকাদী (২) আহকামে আমলী (৩) সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও দোর্ভাগাদের অশুভ পরিণতির বিবরণ। এ তিন বিষয়কে সূরা ফাতেহা সংক্ষিপ্তাকারে শামিল রেখেছে। ফলে এসূরা যেন সমস্ত কুরআনের মা স্বরূপ হয়ে গেল। তাই তার নাম রাখা হয়েছে উম্মুল কুরআন।

৩। আছাছুল কুরআন ঃ এর কারণ হল- আছাছ অর্থ বুনিয়াদ ও ভিত্তি। আর একথা পরিস্কার যে, সূরা

ফাতেহা কুরআনের বুনিয়াদ ও ভিত্তি। এ কারণে তাকে আছাছুল কুরআনও বলা হয়।

৪। সূরাতুল কানয ঃ এ নামকরণের কারণ হল- কানয অর্থ- খাযানা/ভাণ্ডার। যেহেতু কুরআনের মৌলিক বিষয়াদি সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে এ সূরাটি কুআনের জন্য খাযানা ও ভাণ্ডার সমতুল্য। এজন্য তাকে সূরাতুল কানয বলা হয়।

৫। সূরাতুল ওয়াফিয়া

৬। সূরাতুল কাফিয়া ঃ এ নাম দু'টোর কারণ হল- সূরা ফাতেহার মধ্যে কুরআনের সমস্ত বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান। কুরআনের বিষয়াদিকে বর্ণনা করতে এ সূরাটিই যথেষ্ট। আর ওয়াফিয়া ও কাফিয়া এর অর্থ- যথেষ্টকারী।

৭। সূরাতুল হামদ

৮। সূরাতুশ শোকর ঃ এ দুই নামের কারণ হল- হামদ ও শোকর উভয়টি এ সূরার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ সূরাকে হামদ ও শোকর বলা হয়।

৯। সূরাতুদ দুআ

১০। তা'লীমুল মাসআলা ঃ যেহেতু এ সূরার মধ্যে দুআ ও প্রার্থনা রয়েছে। তাই তাকে সূরাতুদ দুআ বলা হয়। আর যেহেতু এসূরার মধ্যে প্রার্থনা করার পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তাই এসূরাকে তা'লীমুল মাসআলাও বলা হয়।

১১। সূরাতুস সালাত ঃ এর কারণ হল- যেহেতু এসূরা নামাযে পাঠ করা শাফেয়ীগণের মতে ফরয, আর আহনাফের মতে, ওয়াজিব। মোটকথা আহনাফ ও শাফেয়ীদের মতে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যেন এ সূরা-ই নামায।

১২। শাফিয়া। ১৩। শিফা ঃ এ দুই নামের কারণ হল- সূরা ফাতেহা সকল রোগের নিরাময়। যেমন প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন- هى شفاء لكل داء "সূরা ফাতেহা সকল রোগের শিফা।" । তাই একে শাফিয়া ও শিফা বলা হয়।

১৪। সাবউল মাছানী ঃ এ নামের কারণ হল- سبع অর্থ সাত। যেহেতু সূরা ফাতেহা সাত আয়াত বিশিষ্ট তাই একে سبع বলা হয়। আর مثانى অর্থ বারবারকৃত বস্তু। যেহেত সূরা ফাতেহাকে নামাযে বারবার পাঠ করা হয় বা এ সূরাটি দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। একবার নামায ফরয হওয়ার সময়, আরেকবার কিবলা পরিবর্তনের সময়। এজন্য তাকে মাছানী বলা হয়।

বি: দ্র: সূরা ফাতেহার উপরোক্ত নামগুলো ব্যতীত আরো কিছু নাম রয়েছে। যথা-

(১) فاتحة القران
(২) ام الكتاب
(৩) سورة التفويض
(৪) سورة النور
(৫) سورة الرقية
(৬) سورة السوال
(৭) القران العظيم
(৮) سورة المناجات

ফায়দা ঃ

قوله لانها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله الخ ঃ এটা সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন নামে নামকরণের দ্বিতীয় কারণ।

কুরআনের মৌলিক বিষয় তিনটি

(১) মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা (২) তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা (৩) আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অঙ্গীকার ও আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন। এ তিনটি বিষয় সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। যেমন- الحمد لله থেকে مالك يوم الدين পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা, اياك نعبد -এর মধ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, انعمت عليهم -এর মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অঙ্গীকার এবং غير المغضوب عليهم -এর মধ্যে আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের বিবরণ রয়েছে।

قوله او على جملة معانيه من الحكم النظرية الخ ঃ এখান থেকে সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন নামে নামকরণের তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনের আরো তিনটি বিষয়

গোটা কুরআন তিনটি বিষয়ের উপর সন্নিবেশিত। (১) احكام اعتقادية বা মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী। যেমন- আল্লাহ তা'লাকে অদ্বিতীয়, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি মান্য করা। (২) احكام عملية বা বান্দার আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী। যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (৩) সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও দুর্ভাগাদের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত করা। এতিনটি বিষয় সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান। যেমন- الحمد لله থেকে مالك يوم الدين পর্যন্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ই'তেকাদী বিষয়সমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। اياك نعبد -এর মধ্যে আহকামে আমলী এর কথা রয়েছে। اهدنا الصراط المستقيم -এর মধ্যে সত্য পথের উপর পরিচালিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। صراط الذين انعمت عليهم -এর মধ্যে সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা এবং غير المغضوب عليهم -এর মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে দুর্ভাগাদের ঠিকানা।

السوال: كم أية فى سورة الفاتحة وما هى ؟ بين الاختلاف فى كيفية عددها۔

সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা কয়টি?

উত্তর ঃ এব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা ফাতেহার আয়াত ৭টি। তবে সাত আয়াত গণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যারা بسم الله -কে সূরা ফাতেহার অংশ মনে করেন তাদের মতে, সাত আয়াত হল এই-

(١) بسم الله الرحمن الرحيم (٢) الحمد لله رب العالمين (٣) الرحمن الرحيم (٤) مالك يوم الدين (٥) اياك نعبد واياك نستعين (٦) اهدنا الصراط المستقيم (٧) صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين

আর যারা বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতেহার অংশ মনে করেননা তাদের মতে সাত আয়াত হল এই-

(١) الحمد لله رب العالمين (٢) الرحمن الرحيم (٣) مالك يوم الدين (٤)اياك نعبد واياك نستعين (٥) اهدنا الصراط المستقيم (٦) صراط الذين انعمت عليهم (٧) غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوْفَةِ وَفُقَهَائُهُمَا وَاِبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِيْنَةِ وَالْبَصرة وَالشَّامِ وَفُقَهَائُهُمَا وَمَالِكٌ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يَنُصَّ اَبُوْحَنِيْفَةَ فِيْهِ بِشَيْءٍ فَظُنَّ اَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّوْرَةِ عِنْدَه وَسُئِلَ مُحَمَّدُبْنُ الْحَسَنِ عَنْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللّٰهِ لَنَا أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا مَا رَوٰى اَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ أيَاتٍ أُوْلٰهُنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفَاتِحَةَ وَعَدَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ايَةً وَمِنْ اَجْلِهِ اُخْتُلِفَ فِيْ اَنَّهَا ايَةٌ بِرَأْسِهَا اَمْ بِمَا بَعْدَهَا وَالْاِجْمَاعُ عَلٰى اَنَّ مَابَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللّٰهِ وَالْوِفَاقُ عَلٰى اِثْبَاتِهَا فِى الْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِيْ تَجْرِيْدِ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى لَمْ يُكْتَبْ أمِيْنْ

অনুবাদ:

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতেহার অংশ। এমত পোষণ করেছেন মক্কা ও কূফার ক্বারী ও ফক্বীহগণ, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী। পক্ষান্তরে মদীনা, বসরা ও শামের ক্বারী ও ফক্বীহগণ এবং ইমাম মালিক ও আওযায়ী (রঃ) তাঁদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন কিছু বলেননি। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রঃ) -কে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, কুরআনের দু'মলাটের মধ্যখানে যা আছে সবই আল্লাহর কালাম। আমাদের দলীল: এক. হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলে পাক (সঃ) বলেন- ফাতেহাতুল কিতাব সাত আয়াত বিশিষ্ট, এর প্রথম আয়াত হল- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। দুই. হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) -এর উক্তি- রাসূল (সঃ) ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও আল- হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনকে এক আয়াত গণনা করেছেন। বর্ণনাগত এই পার্থক্যের কারণে بسم الله কি একটি পৃথক আয়াত না তার পরবর্তী আয়াতের অংশ বিশেষ এনিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তিন. এব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআনের দু'মলাটের ভিতরে যা আছে সবই হল আল্লাহর কালাম। চার. কুরআনকে (গায়রে কুরআন হতে) মুক্ত রাখার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে امين শব্দটি লেখা হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال : التسمية جزء من الفاتحة ام لا؟ بين الاختلاف بالدلائل مع الرد عليهم

وفاق المدارس: ٥ ا. ٢١. ازاد دينى ١٣. ١٦. ا. ١٨. ٤. ٢. ٢٧ هجرى

উত্তর ঃ বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ কি না ?

আল্লামা তাফতাযানী (রঃ) বলেন, সূরা নামল -এর আয়াত انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم -এর মধ্যে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ উক্ত সূরার আয়াত এবং কুরআনের অংশ, এতে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হল. সূরা সমূহের শুরুর বিসমিল্লাহ নিয়ে, তা উক্ত সূরার কিংবা ফাতেহার অংশ কি না এনিয়ে। এবিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে।

☆ প্রথম অভিমত ঃ মদীনা, বসরা ও শামের ক্বারীগণ তদ্রূপ মদীনা ও শামের ফক্বীহগণের মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয় এমনকি কুরআন ও অন্যান্য সূরারও অংশ নয়।

☆ দ্বিতীয় অভিমত ঃ মক্কা ও কূফার ক্বারীগণ, তদস্থলের ফক্বীহগণ, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) -এর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহারও অংশ এবং অন্য সূরারও অংশ।

☆ তৃতীয় অভিমত ঃ আহনাফের গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ তবে সূরা ফাতেহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। বরং তা দুই সূরার মধ্যখানে প্রভেদকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পক্ষের দলীল ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রাঃ) -এর সেই হাদীস যেখানে তিনি আপন পুত্রকে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন- আমি রাসূল (সঃ), আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) -এর পিছনে নামায পড়েছি কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শোনিনি। সুতরাং তুমিও তা পড়বেনা। যখন নামায পড়বে তখন الحمد لله رب العالمين পড়বে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীল ঃ কাযী বায়যাবী (রঃ) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তাই স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন- فاتحة الكتاب سبع ايات اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم অর্থাৎ সূরা ফাতেহা সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা। এর প্রথম আয়াত হল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (২) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত -রাসূলে পাক (সাঃ) সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং بسم الله الرحمن الرحيم ও الحمد لله رب العالمين -কে এক আয়াত গণেছেন।

২য় দলীল ঃ এব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদী একমত যে, কুরআনের দু'মলাটের মধ্যখানে যা আছে সবই আল্লাহর কালাম। আর বিসমিল্লাহও দু'মলাটের মধ্যখানে। সুতরাং বিসমিল্লাহও আল্লাহর কালাম তথা কুরআনের অংশ হবে।

৩য় দলীল ঃ এব্যাপারে সবাই একমত যে, কুরআনের বহির্ভূত কোন জিনিস কুরআনে লিখা হবেনা। যেমন امين কুরআনের বহির্ভূত হওয়ার কারণে কুরআনে লিখা হয়নি। সুতরাং বিসমিল্লাহও যদি কুরআনের বহির্ভূত হত তাহলে তাকেও কুরআনে লিখা হতনা। অথচ বিসমিল্লাহকেও কুরআনে লিখা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, বিসমিল্লাহ কুরআন ও সূরাসমূহের অংশ।

আহনাফের দলীল ঃ ১ম দলীল : হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ), হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) -এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি।

২য় দলীল : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে মহান আল্লাহ পাক বলেন- قسمت الصلوة بيني وبين عبدى اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدى واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى على عبدى........ الخ বিসমিল্লাহ যদি সূরা ফতেহার অংশ হত তাহলে এ হাদীসে ফাতেহা শুরু হত বিসমিল্লাহ দ্বারা।

প্রথম পক্ষের দলীলের উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) -এর হাদীসে সাধারণ বিসমিল্লাহের নিষেধ করা হয়নি; বরং জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের উত্তর : তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল আমাদের বিপক্ষে নয়। কেননা, এর দ্বারা তো বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ প্রমাণিত হয়েছে। আর আমরাও তার প্রবক্তা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর হাদীসের জবাব হল- আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর বর্ণনার معارض বা পরস্পর বিরোধী দুই বর্ণনা রয়েছে। কেননা, পূর্বের বর্ণনা দ্বারা এক রকম বুঝে আসে আর পরের বর্ণনা দ্বারা আরেক রকম বুঝে আসে। কাজেই পরস্পর বিরোধী দটি বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবেনা।

উম্মে সালামা (রাঃ) -এর যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল- রাসূল (সাঃ) বিসমিল্লাহকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পড়েছিলেন, তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পাঠ করেননি।

চূড়ান্ত ফলাফল: আহনাফের পক্ষ থেকে শাফেয়ীগণের পেশকৃত হাদীসমূহের যে জবাব দেয়া হয়েছে তার দ্বারা এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়। তাছাড়া ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি উক্তিও আমাদের মাযহাবের সমর্থন করে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, كان رسول الله ﷺ لايعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم এই বর্ণনাটি একদিকে বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে আর অন্য দিকে কোন সূরার অংশ না হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

☆☆☆

وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوْفٍ تَقْدِيْرُهُ بِسْمِ اللّٰهِ أَقْرَءُ لِأَنَّ الَّذِىْ يَتْلُوْهُ مَقْرُوٌّ وَكَذَالِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ وَذَالِكَ أَوْلٰى مِنْ أَنْ يُضْمَرَ اَبْدَأُ لِعَدَمِ مَايُطَابِقُهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ اِبْتِدَائِىْ لِزِيَادَةِ اِضْمَارٍ فِيْهِ

অনুবাদ: ______________________

بسم الله -এর- باء (এর) হরফটি فعل محذوف -এর সাথে متعلق ; এর উহ্য ইবারত হবে (بسم الله اقرأ (আল্লাহর নামে পাঠ করছি) কেননা, এর পরে যা আসছে তা পাঠ করার যোগ্য বিষয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক تسميه পাঠকারী সে তার تسميه দ্বারা সূচনাকৃত কর্মের জন্য এমন শব্দকেই উহ্য মানবে যা তার কর্মের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর (এখানে اقرأ ফে'লকে উহ্য মানাই) ابدأ ফেলকে উহ্য মানার চেয়ে উত্তম। কেননা, ابدأ -এর সাথে পরবর্তী বিষয়ের কোন মিল নেই। অথবা (اقرأ -কে উহ্য মানা) ابتدائى -কে উহ্য মানার চেয়ে উত্তম। কারণ, ابتدائى -এর মধ্যে محذوف -এর সংখ্যা বেশী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال : اذكر الاقوال فى متعلق ب' مع ترجيح الراجح

উত্তর ঃ بسم الله **-এর মধ্যকার** باء **হরফে জারের** متلعق **কি?**

بسم الله -এর মধ্যে প্রথম হরফ হল باء আর এটা حرف جار । তাই باء -এর একটা متعلق -এর প্রয়োজন। অন্য দিকে ইবারতে এমন কোন শব্দ উল্লেখিত হয়নি যাকে باء -এর متعلق সাব্যস্ত করা যায় কাজেই তার متعلق -কে এখানে محذوف মানতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, متعلق টি فعل عام হবে না فعل خاص হবে? তাই তার জন্য একটি নীতিমাল প্রণয়ন করা হয়েছে যে, যদি افعال خاصه -এর মধ্য থেকে কোন একটিকে متعلق বানানো যায় তাহলে افعال عامه থেকে কোনটিকেই متعلق বানানোর প্রয়োজন নেই। অতএব وجود. كون. حصول. ثبوت এগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকেই متعلق হিসেবে محذوف মানার প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, তখন فعل خاص -কে জায়গা অনুপাতে متعلق মানা হবে। কিন্তু এখানে জায়গা অনুপাতে তার متعلق কোনটি হবে এব্যাপারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, جمله اسميه যেহেতু دوام و استمرار বুঝায় তাই কোন ইসমকে উহ্য মানা হবে।

কেউ কেউ বলেন, فعل -কে উহ্য মানা উত্তম কারণ হল, فعل উহ্য মানলে হযফের সংখ্যা কম হয়। অতঃপর এই দ্বিতীয় দলের পরস্পর মতভেদ দেখা দিয়েছে; এখানে فعل কোনটি মানা হবে? কেউ বলেন, أبدأ -কে উহ্য মানা হবে আর কেউ বলেন, أقرء -কে। এই متعلق টি বিসমিল্লাহর শেষে হবে না তার শুরুতে হবে? এবিষয়েও তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, শুরুতে আর কেউ বলেন, শেষে।

কাযী বায়যাবী (র.) -এর মতে, এই সকল সূরতের মধ্য থেকে فعل -কে উহ্য মানা আবার সেটা أقرء হওয়া উত্তম আর ঐ فعل টি হবে بسم الله -এর শেষে। সুতরাং ইবারতটি এভাবে হবে, بسم الله أقرء বায়যাবী (র.) এই মাযহাবকে গ্রহণ করে তার স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেন, (১) بسم الله -এর পরে যে বিষয় আসছে তা হল পাঠ করা ও তেলাওয়াতের বিষয়। কাজেই পরবর্তীর দিকে লক্ষ্য করে এখানে اقرأ ফে'লকে উহ্য মানতে হবে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত যে, সে যেই কাজকে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করবে সেই কাজের প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী একটি ফে'ল এনে বিসমিল্লাহকে তার সাথেই متعلق ধরবে। কাজেই এখানে যেহেতু কাজ হল পাঠ করা তাই اقرأ -কে উহ্য ধরতে হবে।

(৩) কুরআনের অন্যান্য আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, بسم الله -এর متعلق টি ابدأ পাওয়া যাওয়া না; বরং فعل خاص -ই পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– بسم الله مجريها তদ্রূপ হাদীসেও بسم الله -এর متعلق মানা হয়েছে فعل خاص -কে। যেমন এক হাদীসে এসেছে– بسم الله وضعت جنبى কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, متعلق টি فعل خاص হয়ে بسم الله -এর শেষে হবে।

☆☆☆

وَتَقْدِيْمُ الْمَعْمُوْلِ هٰهُنَا اَوْقَعُ كَمَا فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى: بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَقَوْلِه تَعَالٰى: اِيَّاكَ نَعْبُدُ " لِاَنَّهٗ اَهَمُّ وَاَدَلُّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ وَاَدْخَلُ فِى التَّعْظِيْمِ وَاَوْفَقُ لِلْوُجُوْدِ فَاِنَّ اِسْمَهٗ تَعَالٰى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرَاَةِ فَكَيْفَ لَا وَقَدْ جُعِلَ اٰلَةً لَهَا مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْفِعْلَ لَايَتِمُّ وَلَايُعْتَدُّ بِه شَرْعًا مَا لَمْ يَصْدُرْ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ "كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِاِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ"

অনুবাদ:

এখানে معمول (তথা بسم الله) -কে مقدم করা মহল ও স্থানের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যেমন আল্লাহর বাণী- بسم الله مجرها ও اياك نعبد -এর মধ্যে معمول -কে مقدم করা হয়েছে। কেননা, এ (مقدم করা) টা গুরুত্ব প্রকাশ করে, বেশী নির্দিষ্টতা বুঝায়, সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালনকারী এবং বাস্তবতারও অধিক কাছাকাছি। কেননা, আল্লাহ তা'লার নাম পাঠের ক্ষেত্রে অগ্রণী। আর অগ্রণী কেনই বা হবেনা? অথচ আল্লাহর নামকে (সকল কাজের জন্য) মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, কোন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে ততক্ষণপর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়না যতক্ষণপর্যন্ত আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা না হয়। রাসূল (সাঃ) -এর বাণী- যেসকল কাজ আল্লাহর নাম দ্বারা শুরা করা না হয় তা বরকতহীন হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله وتقديم المعمول ههنا اوقع.........الخ

السوال: اشرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর ঃ وتقديم المعمول ههنا اوقع.........الخ **ইবারতের বিশ্লেষণ:**

কাযী বায়যাবী (রঃ) ইতিপূর্বে باء -এর متعلق -কে উহ্য মেনে ইবারতের যে মূলরূপ উল্লেখ করেছেন সেখানে فعل -কে موخر মেনেছেন। যেমন: তিনি বলেন, بسم الله -এর মূল ইবারত ছিল, بسم الله اقرأ। এখন প্রশ্ন হল, عامل হয় পূর্বে আর معمول হয় তার শেষে; কিন্তু আপনি বিষয়টিকে উলট পালট করে দিলেন। অর্থাৎ معمول -কে আগে এনেছেন আর عامل -কে পরে নিয়েছেন। তার কারণ কি?

বায়যাবী (র.) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তার জবাব হল– এখানে معمول -কে আগে আনা স্থানের সাথে বেশী সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল। এর সমর্থনে তিনি দু'টি আয়াত পেশ করেছেন। প্রথম আয়াত হল– بسم الله مجريها এবং দ্বিতীয় আয়াত হল– اياك نعبد কাজেই এ দুই আয়াতে যেভাবে معمول -কে আগে আনা হয়েছে; সেভাবে بسم الله -এর মধ্যেও معمول -কে আগে আনা হয়েছে। সুতরাং এতে দূষের কি আছে?

এখন প্রশ্ন হল– এখানে معمول -কে আগে আনা স্থানের সাথে অধিক সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল হয় কিভাবে? এর উত্তরে বায়যাবী (র.) বলেন, চার কারণে এখানে معمول -কে আগে আনা স্থানের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। চারটি কারণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তা'লার নাম সম্মানী হওয়ার কারণে অধিক গুরুত্ব বহন করে। আর যে জিনিস বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় তাকে আগে আনতে হয় কাজেই এখানেও معمول তথা بسم الله -কে আগে আনতে হবে।

২. معمول -কে আগে আনা নির্দিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী। কারণ, নিয়ম হল- تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر অর্থাৎ যে জিনিসকে পরে আনতে হয় তাকে পূর্বে আনার দ্বারা সীমাবদ্ধতা ও تخصيص -এর ফায়দা দেয়। এজন্য এখানেও تخصيص -এর ফায়দা তথা খাছভাবে আল্লাহ তা'লার সত্তাকে বুঝানোর জন্যই معمول -কে مقدم করা হয়েছে।

৩. بسم الله -কে আগে আনলে আল্লাহর নামের মর্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালনকারী হয়।

৪. আল্লাহ তা'লার সত্তা সমস্ত مسميات তথা নামীয় বস্তুর সত্তা হতে অগ্রগণ্য। কাজেই আল্লাহ তা'লার নামও সমস্ত নামের উপর অগ্রগণ্য হবে। এমনকি তা قراءت -এর ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য হবে।

তাছাড়া কিছু হাদীসের ভাষ্য দ্বারাও একথা বুঝা যায় যে, কোন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সুসম্পন্ন ও গণ্য করা হয়না যতক্ষণপর্যন্ত আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু না করা হয়। সুতরাং এসকল কারণ দ্বারা معمول -কে مقدم করার বিষয়টি অধিক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হল। তাই معول -কে مقدم করা হয়েছে।

☆☆☆

وَقِيْلَ اَلْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمَعْنٰى مُتَبَرِّكًا بِاِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَقْرَءُ وَهٰذَا وَمَا بَعْدَهٗ مَقُوْلٌ عَلٰى اَلْسِنَةِ الْعِبَادِ لِيَعْلَمُوْا كَيْفَ يُتَبَرَّكُ بِاِسْمِهٖ وَيَحْمَدُ عَلٰى نِعَمِهٖ وَيَسْأَلُ مِنْ فَضْلِهٖ۔

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন, بسم الله -এর باء টি مصاحبة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল– বরকতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামের সাথে পাঠ করছি। বিসমিল্লাহ থেকে সূরা ফাতেহার শেষ পর্যন্ত বাক্যগুলো বান্দার বাচনভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। যেন বান্দা জানতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহর নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের উপর প্রশংসা করতে হয় এবং তাঁর (নিকট) অনুগ্রহ কামনা করতে হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السوال: الباء في بسم الله لاى معنى؟

উত্তর ঃ بسم الله-এর باء কোন অর্থে ব্যবহৃত?

باء মোট ১০ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে যে, بسم الله -এর মধ্যে باء হরফটি استعانت -এর জন্য ব্যবহৃত কাজেই পূর্বের আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল যে, فالباء للاستعانة আর এই উহ্য ইবারতের উপর عطف করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, وقيل الباء للمصاحبة অর্থাৎ কারো কারো মতে, بسم الله -এর

باء টি مصاحبت -এর অর্থে ব্যবহৃত। তখন ইবারতের মূলরূপ হবে– متلبسا بسم الله اقرء আল্লাহর নামের সাথে পাঠ করছি"।

তবে সম্মনিত গ্রন্থকার আল্লামা বায়যাবী (রঃ) -এর বর্ণনার ধরন থেকে বুঝে আসে যে, তাঁর নিকট باء টা استعانة -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অধিক যোগ্যতর। কেননা, তিনি باء -এর مصاحبة -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে قيل শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। আর তাঁর অভ্যাস হল, যে মতটা তাঁর মতে, দুর্বল সেটাকে তিনি قيل শব্দ যোগে উল্লেখ করেন। এত প্রতীয়মান হয় যে, باء তাঁর নিকট استعانة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

باء টি مصاحبت -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অভিমত দুর্বল কেন? এ ব্যাপারে পরিস্কার কথা হল যে, باء -কে مصاحبت -এর অর্থে প্রয়োগ করলে তাতে মু'তাযিলা মতবাদের গন্ধ পাওয়া যায়। মু'তাযিলার আকীদা হচ্ছে, বান্দার ঐচ্ছিক কর্মকান্ডের স্রষ্টা সে নিজেই; এতে আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপ নেই। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, বান্দার ঐচ্ছিক কর্মের স্রষ্টাও আল্লাহ্ তা'লা; বান্দা তার কর্মের সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নয়। এখন যদি باء -কে مصاحبت -এর অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে অর্থ হবে, আল্লাহর নামের বরকতের উদ্দেশ্যে পাঠ করছি অর্থাৎ বান্দা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ্র নামে শুরু করার অর্থ এ নয় যে, তাঁর নাম ছাড়া আমাদের কর্ম অস্তিত্বে আসতে পারবে না; বরং আমরা তাঁর নাম দ্বারা শুরু করেছি শুধু বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে باء -কে যদি استعانت -এর অর্থে ধরা হয় তাহলে بسم الله الرحمن الرحيم বলে বান্দা একথারই ঘোষণা করতে চাচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর নামের সাহায্যে পাঠ করছি। কারণ, আমাদের কোন কাজই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হতেই পারে না; বরং আমাদের সমস্ত কর্মের অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভরশীল।

قوله هذا وما بعده مقول على السنة العباد.........الخ

السوال: اوضح مراد المصنف بهذه العبارة

উত্তর ঃ উপরোক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (রঃ) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হল- বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে সূরা ফাতেহার শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহ্ তা'লার কালাম। এখন باء -কে استعانة -এর জন্য ধরা হোক অথবা مصاحبة -এর জন্য ধরা হোক, অর্থ দাঁড়ায়- আল্লাহ্ তা'লা নিজেই নিজের নাম দ্বারা সাহায্য কামনা করছেন, নিজেই নিজের নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে চাচ্ছেন, নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন, নিজেই নিজের উপাসনা করছেন, নিজেই নিজের কাছে সাহায্য কামনা করছেন। এরকম আচরণ আল্লাহর পক্ষে তো দূরের কথা স্বয়ং বান্দার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য বিষয়। বায়যাবী (র.) উল্লেখিত ইবারতে এ প্রশ্নের-ই জবাব তুলে ধরেছেন।

এর জবাব হল- একথাগুলো আল্লাহর তবে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বান্দার বাচনভঙ্গিতে তা ব্যক্ত করেছেন। তার দৃষ্টান্তটি যেমন এমন হয়ে গেল যে, ধরুন! কেউ আপনাকে তার পক্ষ থেকে একটি চিঠি লিখার নির্দেশ দিল। তো আপনি তার পক্ষ থেকে চিঠিটি এভাবে লিখলেন– "আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমার সালাম রইল, আশা করি আপনি ভাল আছেন, আমিও আপনার দোআয়া বেশ ভাল আছি। পর কথা হল"। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'লা এই সকল কথা বান্দার বাচন ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করেছেন আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বান্দাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া যে, বান্দা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহর কাছে বরকত চাইবে, কিভাবে তাঁর নিয়ামতরাজির উপর প্রশংসা করবে, কিভাবে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে। অতএব এসম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন থাকছে না।

وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوْفِ الْمُفْرَدَةِ أَنْ تُفْتَحَ لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُوْمِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ كَمَا كُسِرَتْ لَامُ الْأَمْرِ وَلَامُ الْإِضَافَةِ دَاخِلَةً عَلَى الْمُظْهَرِ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ

অনুবাদ:

(بسم الله-এর) باء -কে কাছরা দেয়া হয়েছে। অথচ নিয়ম হল حروف مفرده বা একক হরফগুলোকে ফাতহা দেয়া। তথাপিও কাছরা দেয়া হয়েছে حرفية ও جرية -এর সাথে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে খাছ হওয়ার কারণে। যেমনিভাবে لام الامر -কে এবং اسم ظاهر -এর উপর প্রবিষ্ট لام -কে কাছরা দেয়া হয় لام الابتداء এবং لام التاكيد -এর মধ্যে পার্থক্য করার লক্ষ্যে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السوال: وانما كسرت الباء..............الخ
اوضح العبارة بحيث يتضح مراد المفسر العلام
وفاق المدارس: ١٤١٧, ١٤١٩, ١٤٢٥- ازاد ديني: ١٤٠٨, ١٤١٧, ١٤٢٦

উত্তর ঃ ইবারতের ব্যাখ্যা: উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (রঃ) নাহু সংক্রান্ত একটি আলোচনা শুরু করেছেন; সাথে সাথে একটি প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন। তাই ইবারতটি বুঝার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক। এ বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করে নিলে মুসান্নিফের ইবারত সহজে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

☆ সমস্ত হরফ দুই প্রকার। (ক) حروف مبانى যা দ্বারা শব্দ গঠিত হয়। যেমন- ا- ب - ت - ث ইত্যাদি। (খ) حروف معانى যা কালিমা তিন প্রকারের এক প্রকার এবং ইসম ও ফে'লের বিপরীতে আসে।

☆ حروف معانى দুই প্রকার। (ক) حررف مفرده এক অক্ষর বিশিষ্ট হরফ সমূহ। যেমন: واو عاطفه فاء عاطفه باء ইত্যাদি। (খ) حروف مركبه যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট হরফ সমূহ। যেমন- الى - هل - على ইত্যাদি।

☆ حروف مبانى গুলো اعراب و بناء -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়না। অর্থাৎ এগুলো মু'রাব ও মাবনী হয়না। কেননা, اعراب وبناء হল কালেমার সিফাত, আর حروف مبانى তো কালিমাই নয়। পক্ষান্তরে حروف معانى হল মাবনী। কেননা, এগুলো হল مبنى اصل তিন প্রকারের এক প্রকার।

☆ حروف معانى যেহেতু মাবনী, আর মাবনী সর্বদা একই অবস্থায় থাকে। তাই মাবনী সহজতার চাহিদা রাখে। আর سكون যেহেতু حركت -এর তুলনায় সহজ তাই মাবনীর আসল হল সুকূন।

☆ سكون -এর উল্লেখিত কায়দাটি حروف معانى مركبه -এর মধ্যে প্রযোজ্য হয়, কিন্তু حروف معانى مفرده -এর মধ্যে সুকূনের কায়দা চলেনা। কেননা, حروف مفرده -এর মধ্যে ب -কে ধরা যেতে পারে। এই ب -এর মধ্যে যদি سكون দেয়া হয় শব্দের শুরু হরকতশূণ্য হওয়া লাযেম আসে, আর এটা কঠিন ব্যাপার। এজন্য ب -কে হরকত দিতে হবে। আবার এমন হরকত দিতে হবে যা سكون -এর কাছাকাছি। আর সুকূনের কাছাকাছি হরকত হল فتحه । কাজেই حروف مفرده -এর মধ্যে فتحه দেয়া

হল সমীচীন এবং তাকে ফাতহা দিতেই হবে।

এবার প্রশ্নটি লক্ষ্য করুন! উপরোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী حروف مفرده -কে ফাতহা দিতে হয়। অথচ بسم الله -এর মধ্যকার ب টি حروف مفرده -এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কাছরা দেয়া হয়েছে যা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। এমনটি করা হল কেন?

এর উত্তর হল- بسم الله -এর ب -তে কাছরা দেয়া হয়েছে দুই কারণে। (১) لزوم حرفية তথা ب অক্ষরটি সর্বদা হরফ হয়। অন্যান্য হরফ যেমন ك ইত্যাদির ন্যায় কখনো ইসম হয়না। (২) لزوم جرية তথা ب হরফটি তার পরবর্তী শব্দকে সর্বদা জর প্রদান করে।

মোট কথা এই দুই কারণে ب -কে কাছরা দেয়া হয়েছে। কেননা, جرية ও حرفية উভয়টি কাছরা চায়। এখন বুঝতে হবে এ দু'টি বিষয় কাছরা চায় কেন?

حرفيت **কাছরা চাওয়ার কারণ:** হরফ যেহেতু মাবনী। আর মাবনীর আসল হল سكون । অপর দিকে ب হল حرف مفرد বা এক অক্ষর বিশিষ্ট হরফ তাই তাতে سكون দেয়া যাবেনা। কাজেই ب -তে এমন হরকত দিতে হবে যা سكون -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর سكون -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হরকত হল কাছরা। কাজেই ب -তে কাছরা দেয়া হয়েছে। কেননা, سكون অর্থ হরকত না হওয়া, আর কাছরা যেহেতু যাম্মা ও ফাতহার তুলনায় কম ব্যবহার হয়। কারণ, কাছরাটি ফে'ল ও গায়রে মুনসারিফের মধ্যে আসেনা। তাই যেন কাছরাও না পাওয়ারই মত।

جريت **কাছরা চাওয়ার কারণ:** جر হল حرف جر -এর اثر বা প্রতিক্রিয়া, তাই ب -তে কাছরা দিলে তার হরকতটি নিজ اثر -এর মোয়াফিক হবে। বুঝা গেল, কোন হরফ তার পরবর্তী শব্দকে জর দিলে সে নিজে مكسور হওয়াকে চায়। তাহলে তার হরকতটি স্বীয় اثر -এর মোয়াফিক হবে। সারকথা- حرفية ও جرية টি কাছারার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এদু'টি বিষয় ب -এর জন্য নির্ধারিত, কখনো ب থেকে পৃথক হয়না। পক্ষান্তরে ب ব্যতীত অন্যান্য হরফের মধ্যে একসাথে এ দু'টি বিষয় পাওয়া যায়না। তাই ب -এর এই বিশষত্বের কারণে তাকে কাছরা দেয়া হয়েছে।

ফায়দা-(১):

قوله كما كسرت لام الامر ولام الاضافة الخ অর্থাৎ নিয়ম হল حروف مفرده -কে ফাতহা দেয়া কিন্তু ب -তে ফাতহা না দিয়ে কাছরা দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে لام الامر ও لام الاضافة -এর মধ্যে এ নিয়মের উল্টা কাছরা দেয়া হয়েছে। তবে যেকারণে ب -তে কাছরা দেয়া হয়েছে সে কারণে এ দু'টিকে কাছরা দেয়া হয়নি; বরং তাতে কাছরা দেয়া হয়েছে ভিন্ন কারণে।

উল্লেখ্য, لام الامر দ্বারা উদ্দেশ্য হল- যে لام টি امر غائب -এর শুরুতে প্রবেশ করে। যেমন ليفعل । আর لام الاضافة বলা হয় হরফে জারের লামকে। আর لام الابتداء হল যে লাম جملة اسمية -এর যে কোন অংশে প্রবেশ করে। যেমন لزيد قائم এখানে لزيد -এর লাম হল لام الابتداء

কাযী বায়যাবী (রঃ) বলেন, لام الاضافة যখন اسم ظاهر -এর উপর প্রবেশ করবে তখন তাকে কাছরা দেয়া হবে لام الابتداء থেকে পৃথক করার জন্য। যেমন لزيد قائم এবং قلت لزيد এখানে উভয় বাক্যে দু'টি লাম রয়েছে। প্রথম বাক্যের লাম হল لام الابتداء এবং দ্বিতীয় বাক্যের লাম হল لام الاضافة এখন যদি উভয় লামকে কাছরা দেয় হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাবেনা। তাই উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য لام الاضافة -কে কাছরা দেয়া হয়েছে যাতে لام الابتداء থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

আর لام الامر এবং لام الاضافة উভয়টির মধ্যে এক প্রকারের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রয়েছে। আর তা এভাবে যে, لام الامر -এর اثر বা আমল হল জযম দেয়া এবং لام الاضافة -এর আমল হল জর দেয়া। আবার উভয়টির আমল সব জায়গায় প্রকাশ পায় না। কেননা, لام الامر শুধু فعل مضارع এর শুরুতে আসে তদ্রূপ لام الاضافة টি শুধু ইসমের শুরুতে আসে। তাও আবার সকল ইসমের মধ্যে তার আমল প্রকাশ পায়না; বরং প্রকাশ পায় শুধু منصرف যাতীয় ইসমগুলোর মধ্যে। কাজেই প্রতীয়মান হল যে, لام الامر ও لام الاضافة -এর মধ্যে তদ্রূপ لام الامر -এর আমল জযম এবং لام الاضافة -এর আমল জর -এর মধ্যে এক প্রকারের সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। তাই لام الاضافة -এর সাথে মিল রাখার জন্য لام الامر -কেও কাছরা দেয়া হয়েছে।

ফায়দা- (২) ঃ

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব:

এখানে প্রশ্ন হল, যে দুই কারণে ب -তে কাছরা দেয়া হয়েছে। ঠিক এ দুই কারণ واو ও تاء قسمية -এর মধ্যে একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, باء -এর মত واو قسمية ও تاء قسمية উভয়টি حرفية ও قسمية -এর সাথে সম্পর্ক রাখে। তথাপি এ উভয়টিকে কাছরা না দিয়ে ফাতহা দেয়া হয়। তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- واو قسمية ও تاء قسمية -এর মধ্যে তো কাছরা হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু এ দু'টির মধ্যে ইসমের সাথে সাদৃস্যতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, واو قسمية ও تاء قسمية উভয়টি مضاف -এর স্থলাভিষিক্ত। যেমন- تالله এবং والله মূলে ছিল قسم الله (আল্লাহর শপথ)। قسم মুযাফকে হযফ করে তার স্থলে واو ও تاء -কে রাখা হয়েছে। কাজেই واو قسم ও تاء قسم উভয়টি ইসমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে কেমন যেন ইসম হয়ে গেল। সুতরাং যে দুই কারণে باء -এর মধ্যে কাছরা দেয়া হয়েছে সেই দুই কারণের এক কারণ তথা حرفية টি واو قسم ও تاء قسم -এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। তাই এ দু'টিকে কাছরা দেওয়া হয়নি।

☆☆☆

وَالْإِسْمُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّيْنَ مِنَ الْاَسْمَاءِ الَّتِيْ حُذِفَتْ اَعْجَازُهَا لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَالِهَا وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهَا عَلَى السُّكُوْنِ فَاُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً بِهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِأَنَّ مِنْ دَأْبِهِمْ أَنْ يَبْتَدِؤُا بِالْمُتَحَرِّكِ وَيَقِفُوْا عَلَى السَّاكِنِ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيْفُهُ عَلَى أَسْمَاءٍ وَسُمَى وَسَمَّيْتُ وَمَجِيْءُ سُمًى لُغَةٌ فِيْهِ قَالَ: وَاللّٰهُ اَسْمَاكَ سُمًى مُبَارَكًا ☆ وَاٰثَرَكَ اللّٰهُ بِهِ اِيْثَارَكَا. وَالْقَلْبُ بَعِيْدٌ غَيْرُ مُطَّرِدٍ وَاِشْتِقَاقُهُ مِنَ السُّمُوِّ لِأَنَّهُ رَفْعَةٌ لِلْمُسَمّٰى وَشِعَارٌ لَهُ وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوْفِيِّيْنَ وَأَصْلُهُ وِسْمٌ حُذِفَتِ الْوَاوُ وَعُوِّضَتْ عَنْهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ

لِيَقِلَّ إِعْلَالُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَمْ تُعْهَدْ دَاخِلَةً عَلٰى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِيْ كَلَامِهِمْ وَمِنْ لُغَاتِهٖ سِمٌ وَ سُمٌ قَالَ!ـ بِسْمِ الَّذِيْ فِيْ كُلِّ سُوْرَةٍ سِمُهٗـ

অনুবাদ:

اسـم শব্দটি বিসরিয়্যীনের মতে, ঐসমস্ত ইসমের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর শেষাক্ষরকে অধিক ব্যবহারের কারণে হযফ করা হয়েছে এবং শুরুর অক্ষরকে সাকিন রাখা হয়েছে। অত:পর শুরু করার সুবিধার্থে প্রথমে همـزه وصـل -কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা, আহলে অরবের অভ্যাস হল যে, তারা হরকত বিশিষ্ট হরফ দ্বারা শুরু করে এবং সাকিনরে উপর ওয়াকফ করে। বিসরিয়্যীনের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে اسم -এর রূপান্তরগুলো। যেমন- اسـماء - اسـامى - سـمى - سـميت এছাড়া اسـم -এর অন্য একটি لـغة (পঠন পদ্ধতি) سـمـى যা هـدى -এর ওযনে। যেমন কবি বলেছেন- والـلـه اسـمـاك سـمـى مباركا الخ (কবিতার অর্থ হল- আল্লাহ তোমার বরকতময় নাম রেখেছেন। এর দ্বারা তোমাকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনিভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন স্বয়ং তোমার সত্তাকে)। আর قـلـب মানা অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ। আর اسم টি مشتق হয়েছে سـمو থেকে। কেননা, ইসম তার مسمى -কে উচ্চে তুলে ধরে এবং তার জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।

আর কুফিয়্যীনদের মতে, اسم শব্দটি سمة থেকে নির্গত যার আসল হল, وسم শুরু থেকে واو ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে همـزه وصل যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এই বলে যে, আরবী ভবাষায় যে শব্দের শুরু থেকে হরফকে হযফ করা হয় সে শব্দের শুরুতে همزه وصل প্রবেশ করার কোন দৃষ্টান্ত খোঁজে পাওয়া যায়না। اسم -এর পঠনপদ্ধতির মধ্যে سم . سم ও রয়েছে। যেমন কবি বলেন, بسـم الـذى فـى كل سورة سمه (সেই সত্তার নামে শুরু করছি যাঁর নাম রয়েছে প্রতিটি সূরায়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هو اصل الاسم عند البصريين والكوفيين وما ذا معناه لغة ؟

وفاق المدارس: ١٩, ٢٥, ازاد دينى: ١٥

উত্তর ঃ اسـم শব্দের আসল রূপ কি ছিল এব্যাপারে বিসরিয়্যীন ও কূফিয়্যীনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

বিসরিয়্যীনের অভিমত: তাদের মতে, اسم শব্দটির আসল রূপ ছিল سـمو । অর্থ- উচ্চতা। শেষের واو -কে হযফ করে প্রথম অক্ষর তথা سيـن -কে سـكـو ن দেয়া হয়েছে। অতঃপর শুরুতে একটি همـزه وصل যুক্ত করা হয়েছে। ফলে اسم হয়ে গেল।

বিসরিয়্যীনের দলীল:

(১) اسم -এর جمع আসে اسماء । যদি اسم শব্দটি مثال হত তাহলে তার جمع হতো اوسام ।

(২) اسم -এর جمع الجمع হল اسامى । যদি مثال হত তাহলে جمع الجمع হতো اواسام

(৩) اسم -এর تصغير হয় سمى । যদি مثال থেকে হত তাহলে تصغير হত وسيم ।

(৪) فعل আসে سميت । যদি مثال হত তাহলে فعل হত وسمت ।

(৫) اسم -এর এক لغت আসে سمى যা هدى -এর ওযনে। এ সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত হল যে,

اسم মূলত سمو ছিল।

কূফিয়্যীনের অভিমত : তাদের মতে, اسم টি مشتق হয়েছে سمة থেকে। অর্থ- আলামত। আর سمة মূলে ছিল وسم শুরু থেকে واو -কে হযফ করে তার পরিবর্তে শুরুতেই একটি همزه وصل নেয়া হয়েছে। ফলে اسم হয়ে গেল।

কূফিয়্যীনের দলীল ঃ اسم -এর মূল রূপ وسم ধরা হলে তাতে تعليل কম হয়। আর سمو ধরা হলে তা'লীল বেশি হয়। আর তা'লীল বেশি হওয়ার চেয়ে কম হওয়াই ভাল। কাজেই اسم -এর মূল রূপ وسم হবে।

কূফিয়্যীনের দলীলের জবাব ঃ اسم -এর আসল وسم ধরা হলে যদিও تعليل কম হয়, কিন্তু এখানে تعليل এমনভাবে করা হয়েছে যার দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় পাওয়া যায়না। কেননা, আরবী ভাষায় শুরুতে হযফ করে শুরুতেই বৃদ্ধি করার কোন দৃষ্টান্ত নেই; বরং শুরুতে হযফ করে শেষে বৃদ্ধি করার অথবা শেষে হযফ করে শুরুতে হামযা যুক্ত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন- زنة و ابن । আর দৃষ্টান্তবিহীন তা'লীল করার চেয়ে তা'লীল বেশী করা ভাল।

والله اسماك سمى مباركا ☆ اثرك الله به ايثاركا

السوال : ترجم الشعر ثم بين علام استشهد المفسر العلام به

وفاق المدارس: ١٧, ٢٢, ٢٣ هج

উত্তর ঃ

والله اسماك سمى مباركا ☆ اثرك الله به ايثاركا

কবিতার অর্থ: অল্লাহ আপনার একটি বরকতময় নাম রেখেছেন। এ নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহ আপনাকে সবার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

محل استشهاد ঃ উক্ত কবিতা দ্বারা মুসান্নিফ (রঃ) বিসরিয়্যীনের মাযহাবের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। তাদের মতে, اسم মূলে ছিল سمو (ناقص)। এর প্রমাণ হল, اسم -এর এক لغت আসে سمى যা هدى -এর ওযনে। যদি اسم টি ناقص হত তাহলে سمى হতনা। আর اسم -এর এক لغيت - سمى হওয়া উপরোক্ত কবিতা দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

اسم-এর মোট ১৮টি لغات ঃ

قوله ومن لغاته سم وسم الخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (রঃ) اسم -এর لغات বা পঠন-পদ্ধতি বর্ণনা করছেন। এর মধ্যে ১৮টি লোগাত পাওয়া যায়। যেমন- اسم- سم- سمة- سمات- سمى- سماء এই ছয়টি শব্দের শুরুতে তিন হরকত যুক্ত করলে ১৮টি লোগাত বেরিয়ে আসবে। -(কুনুযে এ'যাযিয়া)

بسم الذى فى كل سورة سمه

السوال : اكتب الشعر كاملا ثم ترجمه ثم بين علا م استشهد المفسر العلام

উত্তর ঃ পূর্ণ কবিতাটি হল এরকম-

(١) أَرْسَلَ فِيْهَا بَازًا لَا يَقْرِمُهُ ☆ فَهُوَ بِهَا يَنْحُوْ طَرِيْقًا يَعْلَمُهُ
(٢) بِسْمِ الَّذِيْ فِيْ كُلِّ سُوْرَةٍ سِمُهُ ☆ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى طَرِيْقٍ تَعْلَمُهُ

অর্থ: (১) রাখাল লোকটি উটের দিকে শক্তিশালী একটি ষাঁড় ছেড়ে দিল, আর ঐ ষাঁড়টি উটের সাথে এমন কাজ করতে উদ্যত হল যা তার জানা ছিল।

(১) (রাখাল লোকটি ষাঁড় প্রেরণ করল) সেই সত্তার নামে যার নাম রয়েছে প্রতিটি সূরায়, যে সূরাটি এমন পদ্ধতিতে নাযিল করা হয়েছে যা তোমার জানা আছে।

محل استشهاد : এ কবিতার মধ্যে محل استشهاد হল سمة শব্দটি। মুসান্নিফ (র.) এ কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন اسم -এর যে একটি লোগাত سمة আসে তা প্রমাণ করার জন্য। এর দ্বারা বিসরিয়্যীনের মাযহাবের সমর্থনও হয়।

☆☆☆

فَالْإِسْمُ إِنْ أُرِيْدَ بِهِ اللَّفْظُ فَغَيْرُ الْمُسَمّٰى لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَصْوَاتٍ مُقَطَّعَةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرٰى وَالْمُسَمّٰى لَايَكُوْنُ كَذَالِكَ وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسَمّٰى لٰكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهٰذَا الْمَعْنٰى وَقَوْلُهُ: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ" وَ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ" وَالْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَنْزِيْهُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَنِ النَّقَائِصِ يَجِبُ تَنْزِيْهُ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوْعَةِ لَهَا عَنِ الرَّفَثِ وَسُوْءِ الْأَدَبِ وَالْإِسْمُ فِيْهِ مُقْحَمٌ كَمَا فِيْ قَوْلِ الشَّاعِرِ: إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ إِسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا. وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ الصِّفَةُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ إِنْقَسَمَ إِنْقِسَامَ الصِّفَةِ عِنْدَهُ إِلٰى مَا هُوَ نَفْسُ الْمُسَمّٰى وَإِلٰى مَا هُوَ غَيْرُهُ وَإِلٰى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ۔

অনুবাদ:

اسم দ্বারা যদি لفظ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা غير مسمى হবে। কেননা, اسم এমন বিচ্ছিন্ন আওয়ায দ্বারা গঠিত হয় যা স্থায়ী নয়, আবার কখনো (مسمى অভিন্ন হওয়া সত্ত্বে) اسم ভিন্ন হয় এবং (مسمى ভিন্ন হওয়া সত্ত্বে) اسم অভিন্ন হয়। কিন্তু مسمى এমনটি হয়না। আর যদি اسم দ্বারা ذات উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা عين مسمى হবে। তবে اسم এই অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'লার বাণী- تبارك اسم ربك - سبح باسم ربك এর মধ্যে اسم দ্বারা لفظ উদ্দেশ্য। কেননা, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'লার সত্তা ও গুণাবলী সমস্ত দুষ-ক্রুটি হতে পবিত্র তেমনিভাবে তাঁর জন্য গঠিত শব্দাবলীও অশ্লীলতা ও অশালীনতা হতে পবিত্র থাকা আবশ্যক। অথবা এখানে اسم শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন কবির কবিতায় অতিরিক্ত এসেছে- الى الحول ثم اسم السلام عليكما । আর যদি اسم দ্বারা صفة উদ্দেশ্য হয় যেমন নাকি শায়েখ আবুল হাসান আশআরী (রঃ) -এর অভিমত,

তাহলে তার মতানুযায়ী صفة -এর মত اسمও (তিন প্রকার) عين مسمى - غير مسمى ও لاعين ولا غير এ তিন প্রকারে বিভক্ত হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السوال: ما المراد بالاسم؟ بين كما بين المفسر العلام

উত্তর ঃ اسم দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

ইলমে কালামের একটি মাসআলা হল, اسم এবং مسمى উভয়টি এক না ভিন্ন এসম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, اسم বলা হয় সেই শব্দকে যা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বুঝায় আর ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে বলা হয় مسمى

কিছু জায়গা এমন রয়েছে যেখানে اسم টি عين مسمى (হুবহু সত্তা) হওয়া সুনিশ্চত। যেমন- قتلت زيدا (আমি যায়েদকে হত্যা করেছি) এখানে যায়েদ দ্বারা নিশ্চতভাবে যায়েদের সত্তা উদ্দেশ্য। অতএব এখানে اسم زيد হল عين مسمى (হুবহু যায়েদ)। কেননা, কোন ব্যক্তির নামকে হত্যা করা যায়না; বরং ব্যক্তিকেই হত্যা করা হয়।

আর কিছু এমন রয়েছে যেখানে اسم টি غير مسمى (সত্তা নয়; শব্দ) হওয়া সুনির্ধারিত। যেমন- كتبت زيدا (আমি যায়েদ শব্দ লিখেছি) এখানে زيد দ্বারা সুনিশ্চতভাবে لفظ زيد উদ্দেশ্য।

আর কিছু জায়গা এমন আছে যেখানে اسم টি عين مسمىও হতে পারে আবার غير مسمىও হতে পারে। এই সূরতে হল মতভেদ। যেমন- رأيت زيدا এখানে যায়েদ দ্বারা عين مسمى (সত্তা যায়েদ) উদ্দেশ্য নাকি غير مسمى বা لفظ زيد উদ্দেশ্য এব্যাপারে আশায়েরা এবং মু'তাযিলার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

মু'তাযিলা বলেন, এই তৃতীয় স্থানেও اسم টি غير مسمى (সত্তা নয়; শব্দ) উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে আশায়েরা বলেন, عين مسمى উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.) -এর অভিমত : বায়যাবী (র.) মীমাংসার সার্থে বলেন, اسم টি عين مسمى না غير مسمى তা নির্ভর করে নিয়তের উপর। যদি اسم দ্বারা শুধু শব্দ উদ্দেশ্য নেয়া হয়; যাত বা সত্তা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তো اسم টা غير مسمى হবে। কেননা, لفظ বা শব্দ বিচ্ছিন্ন কয়েকটি আওয়ায দ্বারা গঠিত; যা স্থায়ী থাকে না। যেমন زيد শব্দটির প্রথম زاء টি উচ্চারণ হবে তারপর ياء তারপর دال । তাছাড়া যুগ এবং জাতির ভিন্নতার কারণে اسم বা নামের মধ্যেও ভিন্নতা ঘটে। যেমন হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াছরাব অতঃপর তার নাম পড়ে মদীনা। এই পরিবর্তন ঘটেছে যুগের পরিবর্তনের কারণে। তদ্রূপ জাতি ও গোত্রের পরিবর্তনের কারণেও নামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন আরবী ভাষায় الله সুরিয়নী ভাষায় لاه এবং ফার্সী ভাষায় বলা হয় خدا । আবার কখনো اسم একটি হয় আর مسمى কয়েকটি হয়। যেমন عين একটা اسم তার مسمى হল চক্ষু, ঝর্ণা, স্বর্ণ। এখন যদি اسم টি হুবহু مسمى হয় তাহলে مسمى -এর ভিন্নতার কারণে اسم -এর মধ্যেও ভিন্নতা সৃষ্টি হবে; যা সমীচীন নয়। আবার কখনো একই مسمى -এর বিভিন্ন اسم বা নাম হয়ে থাকে। যেমন রূপা এক مسمى আর তার اسم হল فضة . ورق একাধিক। এখন যদি اسم টি হুবহু مسمى হয় তাহলে اسم -এর একাধিকতার কারণে مسمى ও একাধিক হয়ে পড়বে আর এটাও সমীচীন নয়। কাজেই এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যখন اسم দ্বারা لفظ বা শব্দ উদ্দেশ্য নিবে তখন اسم টি হবে غير مسمى আর হুবহু তার সত্তা উদ্দেশ্য নিলে اسم

টি হবে عين مسمى

সারকথা হল, اسم হুবহু সত্তা হবে না সত্তা ভিন্ন হবে বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। আশায়েরা তাদের মাযহাবের স্বপক্ষে নিম্নের দুই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যথা–

আল্লাহ তা'লার বাণী- ﴿سبح اسم ربك﴾ ﴿تبارك اسم ربك﴾ এ দুই আয়াতে বরকত ও পবিত্রতার নিসবত করা হয়েছে اسم -এর দিকে। অথচ বরকতময় ও সমস্ত দোষ-ক্রটি হতে পবিত্র হওয়া এটা আল্লাহ তা'লার সিফাত, الفاظ -এর নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহর সত্তা বরকতময় এবং আল্লাহর সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন। অতএব বুঝা গেল, اسم টি عين مسمى হয়।

বায়যাবী (র.) উক্ত দলীলের জবাবে বলেন, এ দুই আয়াতের মধ্যে اســـــم দ্বারা শব্দ উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ হল, তোমার প্রভুর নাম বরকতময়'' তুমি তোমার প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর''। কারণ, যেভাবে আল্লাহ তা'লার সত্তা বরকতময় ও সমস্ত দুষ-ক্রটির উর্ধে সেভাবে তাঁর সকল নামও বরকতময় এবং যাবতীয় দুষ-ক্রটির উর্ধে। কাজেই এই আয়াতদ্বয় দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। দ্বিতীয় জবাব হল, এখানে اسم শব্দটি زائده অতিরিক্ত।

আর যদি اسم দ্বারা صفة উদ্দেশ্য নেয়া হয় যেমন নাকি শায়খ আবুল হাসান আশআরী (রঃ) اسم দ্বারা صفة উদ্দেশ্য নেন, তাহলে তাঁর মতে, সিফাত যেরকম তিন প্রকার ইসমও তিন প্রকারে বিভক্ত হবে।

আবুল হাসান আশআরী (রঃ) -এর মতে সিফাত তিন প্রকার। যথা-

(১) এমন সিফাত যা عين موصوف হয়। যেমন-وجود

(২) এমন সিফাত যা غير موصوف হয়। যেমন- خلق - رزق

(৩) এমন সিফাত যা عين موصوفও নয় আবার غير موصوفও নয়। যেমন- قدرة

আবুল হাসান আশআরী (রঃ) -এর মতে, যেরকম সিফাত তিন প্রকার তেমনি ইসমও তিন প্রকার হবে। যথা-

(১) এমন ইসম যা عين مسمى হয়। যেমন- الله

(২) এমন ইসম যা غير مسمى হয়। যেমন- خالق - رازق

(৩) এমন ইসম যা عين مسمىও নয় আবার غير مسمىও নয়। যেমন- قدرت-علم

السوال: كما فى قول الشاعر: الى الحول ثم اسم السلام عليكما
اكتب الشعر كاملا ثم ترجمه ثم اوضح الاستشهاد به

উত্তর ঃ পূর্ণ কবিতা হল এই-

(١) تمنى ابنتاى ان يعيش ابوهما ☆ وهل انا الا من ربيعة او مضر

(٢) فقوما وقولا بالذى قد عرفتما ☆ ولا تخمشا وجها ولاتحلقا الشعر

(٣) الى الحول ثم اسم السلام عليكما☆ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

কবিতার অর্থ: (১) (কবি লবিদ তার মৃত্যুর সময় আপন কন্যাদ্বয়কে নসীহত করে বলছে) আমার কন্যা দু'টি এ আকাঙ্খা করে যে, তাদের বাবা দীর্ঘজীবি হোক। অথচ আমি রবিআা বা মুযার গোত্রের একজন, (তাদের মত আমাকেও মরতে হবে)।

(২) সুতরাং হে আমার কন্যাদ্বয়! আমার যেসব গুণ তোমাদের জানা আছে সেগুলোর আলোচনা

করবে এবং জাহেলী যুগের খারাপ প্রথানুযায়ী তোমাদের চেহারায় আঘাত করবেনা এবং মাথা মুণ্ডাবে না।

(৩) এক বছর পর্যন্ত আমার গুণাবলীর কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকবে। এরপর তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম (অর্থাৎ আর কাঁদতে হবেনা)। কারণ যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বছর কাঁদবে সে অপারগ বলে বিবেচিত হবে।

محل استشهاد ঃ কাযী বায়যাবী (রঃ) পূর্বে বলেছিলেন যে, আল্লাহর বাণী ﴿سبح اسم ربك﴾ ﴿تبارك اسم ربك﴾ এ দুই আয়াতের মধ্যে اسم শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে। এখন এর প্রমাণ হিসেবে উপরোক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন যে, এ কবিতার মধ্যেও اسم শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে।

☆☆☆

وَاِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللّٰهِ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْاِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اِسْمِهِ أَوْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْيَمِيْنِ وَالتَّيَمُّنِ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلٰى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عَوْضًا عَنْهَا۔

অনুবাদ :

(কুরআনে) بسم الله বলেছেন কিন্তু بالله বলেননি। কেননা, বরকত হাসিল করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা اسم শব্দকে বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই হতে পারে। অথবা (بسم الله বলা হয়েছে) باء قسميه এবং باء تيمنيه -এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। আরবী লিখন-পদ্ধতি অনুসারে باء -এর পর الف লেখা হয়নি; বরং উহ্য আলিফের পরিবর্তে باء -এর মাথাকে লম্বা করে টেনে দেয়া হয়েছে (যাতে হযফকৃত আলিফের প্রতি ইঙ্গিত করে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم قال بسم الله ولم يقل بالله؟
وفاق المدارس: ١١, ١٧, ٢٢ هج

উত্তর ঃ

قوله وانما قال بالله الخ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- بسم الله -এর باء -এর মধ্যে মুসান্নিফ (র.) দু'টি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। (ক) باء টি استعانت -এর অর্থে (খ) مصاحبت -এর অর্থে। استعانت হলে অর্থ হবে, আল্লাহর নামের সাহায্যে' আর مصاحبه -এর অর্থে হলে অর্থ হবে, আল্লাহর নামের বরকতে'। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঠক তার পাঠের শুরুতে আল্লাহর নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে হবে অথবা তাঁর নামের সাহায্য নিতে হবে। আর এ উদ্দেশ্য তো শুধু بالله বললেই হাসিল হয়ে যায়; কিন্তু দেখা যায় যে, باء এবং الله শব্দের মধ্যখানে একটি اسم শব্দকে যুগ করে بسم الله বলা হয়েছে; তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- بسم الله বলেছেন দুই কারণে। যথা-

(১) আল্লাহ তা'লার সত্তা অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। তাই কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর থেকে বরকত ও সাহায্য কামনা করা উত্তমের পরিপন্থী। এ কারণে মাধ্যম হিসেবে اسم শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২) যদি بسم الله না বলে بالله বলতেন তাহলে এ ধারণার সৃষ্টি হত যে, باء টি কসমের অর্থে এসেছে। অথচ باء টি এখানে কসমের অর্থে নয়; বরং تيمنيه বা বরকত হাসিল করার অর্থে। তাই بسم الله বলেছেন যাতে এখানে باء টি تيمنيه -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কেননা, باء قسميه আল্লাহ তা'লার কোন নাম বা সিফাতের পূর্বে আসে, اسم শব্দের শুরুতে আসে না।

السوال: لم لم يكتب الهمزة فى رسم الخط؟
وفاق: ۱۱, ۲۲, ۱۷ هج

উত্তর ঃ

قوله ولم يكتب الالف الخ: এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- بسم الله -এর اسم শব্দের মধ্যকার همزه হল همزه وصلى । আর همزه وصلى -এর ক্ষেত্রে লিখন-পদ্ধতির নিয়ম হল, যদি همزه وصلى বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে লেখা ও পড়া উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। আর বাক্যের মধ্যখানে আসলে লেখার মধ্যে বাকী থাকে কিন্তু উচ্চারণের সময় পড়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿اقرأ باسم ربك﴾ -এর মধ্যে باسم -এর همزه وصل লেখাতে এসেছে কিন্তু পড়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণ হয়নি। ঠিক এমনিভাবে بسم الله -এর মধ্যকার اسم শব্দের হামযা বাক্যের মধ্যখানে আসার কারণে হামযাটি উচ্চারণে যদিও না আসার কথা কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আসার কথা। কিন্তু আসেনি কেন?

এর উত্তর হল- بسم الله যেমনিভাবে পড়ার ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহার হয় তেমনিভাবে লেখার ক্ষেত্রেও বেশী ব্যবহার হয়। আর যে জিনিস অধিক ব্যবহার হয় সে জিনিস সহজতার কামনা করে। তাই সহজ করণার্থে اسم -এর হামযাকে হযফ করে দেয়া হয়েছে। আর ঐ হযফকৃত হামযার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য باء -এর মাথাকে লম্বা করে টেনে দেয়া হয়েছে।

☆☆☆

وَاللّٰهُ أَصْلُهُ اِلٰهٌ فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْاَلِفُ وَاللَّامُ وَلِذَالِكَ قِيْلَ يَا اَللّٰهُ بِالْقَطْعِ اِلَّا اَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَعْبُوْدِ بِالْحَقِّ وَالْاِلٰهُ فِيْ أَصْلِهِ لِكُلِّ مَعْبُوْدٍ ثُمَّ غُلِّبَ عَلَى الْمَعْبُوْدِ بِحَقٍّ ـ

অনুবাদ :

الله শব্দটি মূলত اله ছিল। (اله -এর) হামযাকে হযফ করে তার পরিবর্তে শুরুতে الف لام লাগানো হয়েছে। আর এ কারণেই همزه قطعى -এর সাথে يا الله বলা হয়। (اله যদিও الله শব্দের

মূল) কিন্তু لفظ الله সত্যিকার মা'বূদের জন্য নির্দ্ধারিত, আর اله শব্দ মূলত সকল প্রকার মা'বূদকে বুঝায়। পরবর্তীতে اله শব্দটি সত্যিকার মা'বূদ বুঝানোর উপরই প্রাধান্য লাভ করেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله والله اصله اله الخ : এখান থেকে الله শব্দের বিশ্লেষণ শুরু হচ্ছে। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুসান্নিফ (রঃ) চারটি আভিমত বর্ণনা করেছেন। অভিমতগুলো হলো– (১) الله শব্দ হল اسم مشتق (২) علم (৩) وصف مشتق (৪) সিরয়ানী শব্দ।

প্রথম অভিমত : لفظ الله মূলত اسم مشتق । এ শব্দটি শুধু সত্যিকার মা'বূদ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, বতিল মা'বূদের ক্ষেত্রে لفظ الله ব্যবহৃত হয়না। মুসান্নিফ (রঃ) তাঁর ভাষায় বলেন- والله اصله اله الخ অর্থাৎ لفظ الله মূলত اله ছিল। اله -এর হামযাকে ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে শুরুতে الف لام যুক্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু এখানে الف لام -কে একটি মূল অক্ষরের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে তাই الف لام টি মল অক্ষরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। এজন্য همزه قطعى সহকারে يا الله বলা হয়।

قوله الا انه يختص بالمعبود بالحق: এটা একটা সন্দেহের অবসান। সন্দেহ হল, মুসান্নিফ (রঃ) বলেছেন যে, لفظ الله মূলত اله ছিল। আর اله টি হল اسم جنس যা হক ও বাতিল সকল মা'বূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, لفظ اللهও اسم جنس যা হক ও বাতিল সকল প্রকার মা'বূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। এ সন্দেহকে দূর করে দিয়েছেন উপরোক্ত ইবারত দ্বারা। সন্দেহের নিরসন বুঝার আগে কয়েকটি কথা বুঝতে হবে।

(১) এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে তথা-إِلٰهٌ আলিফ লাম ব্যতিত, اَلْإِلٰهُ আলিফ লাম সহ, اَللّٰهُ । لفظ اله টি اسم جنس হওয়ার কারণে হক ও বাতিল সকল মা'বূদকে বুঝায়। তদ্রূপ الاله টিও মূল গঠন হিসেবে সকল প্রকার মা'বূদকে বুঝাত। কিন্তু আল্লাহর সত্তার উপর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাধান্য লাভ করার কারণে তাঁর সত্তার علم বা নামে পরিণত হয়ে গেছে এবং الاله বলতে শুধু আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়। অত:পর এই বিশেষত্বের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে الاله শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে তথা হামযাকে হযফ করে লামকে লামের মধ্যে ইদগাম করে দেয়া হয়েছে।

(২) علم بالغلبة -এর অর্থ: কখনো মূল গঠন হিসেবে শব্দের মধ্যে عموم ব্যাপক অর্থ হয়। কিন্তু ব্যবহারের মধ্যে ঐ শব্দটি কোন বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যদি এই নির্দিষ্টতা تشخص (স্বাতন্ত্র্যতা) বুঝায় তাহলে তার নাম হবে علم بالغلبة যেমন- النجم , আর যদি تشخص না বুঝায় তাহলে তার নাম হবে صفة غالبه যেমন- الرحمن ।

(৩) غلبة বা প্রাধান্যতা দুই প্রকার। تقديرى ও تحقيقى । কোন শব্দ যদি তার মূল গঠন হিসেবে প্রথম থেকেই ব্যাপক অর্থবোধক হয় অত:পর ঐ শব্দটি কোন বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার নাম হবে غلبه تحقيقى যেমন- النجم এটা প্রথমত যে কোন তারকা বুঝাত। পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট তারকার নাম হয়ে গেছে। الاله শব্দটি এরই অন্তর্ভুক্ত। আর প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট অর্থ বুঝালে তাকে বলা হবে غلبه تقديرى যেমন- لفظ الله ।

(৪) উপরের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল যে, الاله এবং الله শব্দদ্বয় আল্লাহর সত্তার علم بالغلبه । কিন্তু الاله শব্দের মধ্যে غلبه تحقيقى এবং لفظ الله -এর মধ্যে غلبه تقديرى পাওয়া যাচ্ছে। আবার

যেমনিভাবে الاله শব্দের হামযা হযফ করার পরে শব্দটি মহান সত্তার علم তেমনিভাবে হামযা হযফ করার পূর্বেও মহান সত্তার علم । কিন্তু لفظ الله টি কখনো গায়রুল্লাহের বেলায় ব্যবহৃত হয়নি।

এই কয়েকটি কথা স্মরণ রেখে সন্দেহ নিরসনটি বুঝুন! মুসান্নিফ (রঃ) বলেন, اله শব্দটি যদিও হক ও বাতিল সকল প্রকার মা'বূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর এ হিসেবে الاله শব্দও মূল অর্থ হিসেবে সকল প্রকার মা'বূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সত্যিকার মা'বূদ বুঝানোর উপর الاله শব্দটি প্রাধান্য লাভ করেছে। আর لفظ الله টি যেহেতু الاله থেকেই রূপান্তরিত হয়েছে তাই এ শব্দটিও সত্যিকার মা'বূদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

☆☆☆

وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ اَلِهَ اِلٰهَةً وَاُلُوْهَةً وَاُلُوْهِيَةً بِمَعْنٰى عَبَدَ وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ وَقِيْلَ مِنْ اَلِهَ اِذَا تَحَيَّرَ اِذِ الْعُقُوْلُ تَتَحَيَّرُ فِىْ مَعْرِفَتِهِ اَوْ مِنْ اَلِهْتُ اِلٰى فُلَانٍ اَىْ سَكَنْتُ اِلَيْهِ لِاَنَّ الْقُلُوْبَ تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ وَالْاَرْوَاحَ تَسْكُنُ اِلٰى مَعْرِفَتِهِ اَوْ مِنْ اَلِهَ اِذَا فَزِعَ مِنْ اَمْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ وَاَلِهَهُ غَيْرُهُ اَجَارَهُ اِذِ الْعَائِذُ يَفْزَعُ اِلَيْهِ وَهُوَ يُجِيْرُهُ حَقِيْقَةً اَوْ بِزَعْمِهِ اَوْ مِنْ اَلِهَ الْفَصِيْلُ اِذَا وَلِعَ بِاُمِّهِ اِذِ الْعِبَادُ مَوْلُوْعُوْنَ بِالتَّضَرُّعِ اِلَيْهِ فِى الشَّدَائِدِ اَوْ مِنْ وَلِهَ اِذَا تَحَيَّرَ وَتَخَبَّطَ عَقْلُهُ وَكَانَ اَصْلُهُ وِلَاهٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً لِاِسْتِقَالِ الْكَسْرَةِ عَلَيْهَا اِسْتِثْقَالَ الضَّمَّةِ فِىْ وُجُوْهٍ فَقِيْلَ اِلٰهٌ كَاِعَاءٍ وَاِشَاحٍ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلٰى اٰلِهَةٍ دُوْنَ اَوْلِهَةٍ وَقِيْلَ اَصْلُهُ لَاهٌ مَصْدَرُ لَاهَ يَلِيْهُ وَلَاهًا اِذَا اِحْتَجَبَ وَارْتَفَعَ لِاَنَّهُ تَعَالٰى مَحْجُوْبٌ عَنْ اِدْرَاكِ الْاَبْصَارِ وَمُرْتَفِعٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعَمَّا لَايَلِيْقُ بِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : كَحَلْفَةٍ مِنْ اَبِىْ رَبَاحٍ ☆ يَسْمَعُهَا لَاهُهُ الْكِبَارِ۔

অনুবাদ:

الله শব্দ مشتق হয়েছে اَلَهَ اِلٰهَةً و اُلُوْهَةً واُلُوْهِيَّةً থেকে। অর্থ ইবাদত করা। আর তার থেকেই تَاَلَّهَ و اِسْتَاْلَهَ এসেছে। কেউ কেউ বলেন, الله শব্দ নির্গত হয়েছে اَلِهَ থেকে, যার অর্থ অস্থির হওয়া। কেননা, সকল বিবেক আল্লাহর পরিচয় জানতে অস্থির হয়ে আছে। অথবা اَلِهْتُ اِلٰى فُلَان থেকে নির্গত। অর্থ- প্রশান্তি লাভ করা। কেননা, অন্তর সমূহ তাঁর যিকির করে প্রশান্তি লাভ করে এবং আত্মা সমূহ তাঁর পরিচয় পেয়ে স্থির হয়। অথবা সেই اَلِهَ থেকে নির্গত যার অর্থ- আপতিত বিপদে বিচলিত হওয়া এবং অন্যের তাকে আশ্রয় দেওয়া। কেননা, আশ্রয় প্রার্থনাকারী তাঁর কাছে বিচলিত হয়ে আসে আর তিনি তাকে বাস্তবিকভাবে আশ্রয় দেন অথবা তার ধারণানুযায়ী আশ্রয় প্রদান করেন। অথবা اَلِهَ الْفَصِيْلُ থেকে নির্গত। অর্থ- উষ্ট্রির বাচ্চা তার মায়ের কাছে আশ্রয় চাওয়া। কেননা, বান্দা

কঠিন বিপদে আকুতি-মিনতি করে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে। অথবা وَلِـهَ থেকে নির্গত। অর্থ- পেরেশান হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। আর তখন اِلَـهٌ -এর আসল হবে وِلَاهٌ । واو -এর নিচে কাছরা পড়া কঠিন হওয়ার واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন নাকি وُجُـوْهٌ -এর واو -এর মধ্যে পেশ পড়া কঠিন মনে করা হয়। সুতরাং اِلٰهٌ বলা হয় যেমন নাকি اِعَـاءٌ و اِشَاحٌ বলা হয়। তবে এ মতটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে যে, اِلَـهٌ -এর বহুবচন اَوْلِهَةٌ না হয়ে اٰلِهَةٌ হয়ে থাকে। আর কেউ কেউ বলেন, لـفـظ الله -এর আসল ছিল لَاهٌ যা لَاهَ يَلِيْـهُ لَيْهـاً و لَاهاً -এর মাসদার। অর্থ- গোপন থাকা এবং উঁচু হওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'লা দৃষ্টির দর্শন হতে গোপন এবং সকল জিনিস হতে উর্ধ্বে ও অসমীচীন বস্তু হতে উচ্চে। কবির কবিতা এ মতের সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন কবি বলেন- كحلفة الخ ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা ঃ মুসান্নিফ (রঃ) ইতিপূর্বে لـفـظ الـلـه -এর আসল বর্ণনা করে এসেছেন। আর এখান থেকে لفظ الله -এর مشتق منه সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন।

السوال: اذكر اشتقاق لفظ الله مع بيان المناسبة بين المشتق والمشتق منه

لفظ الله-এর مشتق منه কি?

উত্তর ঃ الله শব্দের مشتق منه সম্পর্কে সাতটি অভিমত রয়েছে। যথা-

১ম অভিমত: الله শব্দ مشتق হয়েছে اَلَهَ (باب فتح) থেকে। যার তিনটি মাসদার রয়েছে- (১) اِلَاهَةً (২) اُلُوهَةً (৩) اُلُوهِيَّةً অর্থ- ইবাদত করা। اِلَاهٌ এটা مَاْلُوْهٌ بمعنى معبود অর্থাৎ উপাস্য -এর অর্থ দিবে। যেহেতু আল্লাহ তা'লা গোটা বিশ্বের ও সৃষ্টিজীবের মা'বূদ এজন্য তাঁকে الله বলা হয়।

২য় অভিমত: الله শব্দের مشتق منه হল اَلِهَ (বাবে سمع) অর্থ- চিন্তিত হওয়া। الله শব্দের অর্থ হবে مـالـوه তথা যে সত্তার ব্যাপারে সকলেই চিন্তিত। যেহেতু আল্লাহ তা'লার সত্তাকে জানার জন্য সকলেই চিন্তিত এজন্য আল্লাহকে الله বলা হয়।

৩য় অভিমত: الـلـه শব্দের مشتـق منـه হল الهـت الى فلان অর্থ- আমি অমুকের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করেছি ও স্থির হয়েছি। যেহেতু অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'লার যিকির করে প্রশান্তি লাভ করে এবং তাঁর পরিচয় পেয়ে স্থির হয় এজন্য আল্লাহকে الله বলা হয়।

৪র্থ অভিমত: الـلـه শব্দটির مشتـق مـنـه হল সেই الـه যার অর্থ- আপতিত বিপদে বিচলিত হওয়া। আর বাবে افـعـال থেকে আসলে অর্থ হবে আশ্রয় দেয়া। যেহেতু মানুষ বিপদাপদে আল্লাহর আশ্রয় নেয় আর আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করেন এজন্য আল্লাহকে الله বলা হয়।

৫ম অভিমত: الله শব্দের مشتـق منه হল اله الفصيل । فصيل বলা হয় উটের বাচ্চাকে। এই বাক্য সেই সময় বলা হয় যখন উটের বাচ্চা নিজের মায়ের অধিক আকাঙ্ক্ষিত হয় এবং তার কাছে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়। এখন اِلَـهٌ -এর অর্থ হবে- যার কাছে গিয়ে বান্দা জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নেয়। যেহেতু বান্দা বিপদের সময় কান্নাকাটি করে আল্লাহর আশ্রয় খুঁজে এবং তাঁর যিকির করতে থাকে, কেমন যেন সে আল্লাহর কাছে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়।

৬ষ্ঠ অভিমত: الـلـه শব্দের مشتـق منـهটি হল ولـه । অর্থ- চিন্তিত হওয়া, জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'লাকে জানার ব্যাপারে মানুষ চিন্তিত ও তাদের জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় এজন্য তাঁকে الله বলা হয়।

৭ম অভিমত: الله শব্দ لاه يليه ليها ولاها হতে নির্গত। যার দু'টি অর্থ- (১) গোপন হওয়া (২) উঁচু হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'লা দৃষ্টির দর্শন হতে গোপন এবং সকল জিনিসের উর্ধে ও অসমীচীন বস্তু হতে উচ্চে এজন্য আল্লাহকে الله বলা হয়।

السوال: قول الشاعر : كحلفة من ابى رباح ☆ يسمعها لاهه الكبار
ترجم الشعر ثم اوضح الاستشهاد به

উত্তর ঃ كحلفة من ابى رباح ☆ يسمعها لاهه الكبار

কবিতার অর্থ: আবু রাবাহের একবারের শপথের মত যেই শপথ বাণী শুনছেন তার অনেক বড় প্রভূ।

ফায়দা ঃ আবু রাবাহা এটা حصن بن عمرو بن بدر -এর উপনাম। সে একবার বনু সা'দ ইবনে সা'লাবা গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। বনু সা'লবার লোকেরা তাকে বললো, তুমি হয়তো শপথ করে বলো যে, তুমি হত্যা করোনি, না হয় দিয়ত প্রদান করো। আবু রাবাহা শপথ করলো। কিন্তু তা সত্বে তাকে হত্যা করে দেয়া হলো। এ ঘটনা থেকেই كحلفة من ابى رباح একটি প্রবাদ বাক্যে রুপান্তরিত হয়। কারো শপথ কোন প্রকার উপকারে না আসলে তার জন্য এবাক্যটি ব্যবহার করা হয়।

محل استشهاد **:** মুসান্নিফ (রঃ) لفظ الله -এর مشتق منه বর্ণনা করতে গিয়ে সাতটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৭ম অভিমতটি ছিল, الله শব্দের مشتق منه হল لاه । এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন। এখানে لاه শব্দটি হল محل استشهاد যার অর্থ হল আল্লাহ। কাজেই বুঝা গেল যে, لفظ الله -এর مشتق منه হল لاه ।

☆☆☆

وَقِيْلَ عَلَمٌ لِذَاتِهِ الْمَخْصُوْصَةِ لِاَنَّهُ يُوْصَفُ وَلَايُوْصَفُ بِهِ وَلِاَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ اِسْمٍ تَجْرِيْ عَلَيْهِ صِفَاتُهُ وَلَايَصْلَحُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ وَلِاَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا مِثْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ فَاِنَّهُ لَايَمْنَعُ الشِّرْكَةَ

অনুবাদ :

আর কেউ কেউ বলেন, لفظ الله (مشتق নয়; বরং) আল্লাহ তা'লার নির্দিষ্ট সত্তার নাম। কেননা, لفظ الله টি موصوف হয় কিন্তু صفة হয়না। তাছাড়া আল্লাহর জন্য এমন একটি নামের প্রয়োজন যার উপর তাঁর সকল গুণ প্রয়োগ হয়, আর لفظ الله ব্যতীত অন্য কোন শব্দ এর যোগ্যতা রাখেনা। উপরন্তু لفظ الله যদি صفة হয় তাহলে لا اله الا الرحمن -এর মত لا اله الا الله বাক্যটি توحيد (একত্ববাদ) বুঝাবেনা। কেননা, وصف অংশিদারিত্বকে বাধা দেয়না।

قوله وقيل علم لذاته المخصوصة الخ
السوال: شرح العبارة حق التشريح

উত্তর ঃ

قـولـه وقيـل علم لذاته المخصوصة الخ : এটা لـفظ الله -এর তাহকীক সম্পর্কে দ্বিতীয় মতের বর্ণনা।

২য় অভিমত: لفظ الله হল علم

কেউ কেউ বলেন, لفظ الله হল আল্লাহ তা'লার নির্দিষ্ট সত্তার নাম। এটা প্রথম থেকেই আল্লাহর নাম হিসেবে গঠিত। যাজ্জাজ নাহবী, সিবাওয়ায়েহ নাহবী, জমহুর ফুকাহা ও ইমাম রাযি (রঃ) এমত পোষণ করেন। لفظ الله যে علم এব্যাপারে তারা তিনটি দলীল ও প্রমাণ পেশ করেছেন।

১। لـفـظ الله নিজে অনেক ক্ষেত্রে موصوف হয় আর অন্যান্য ইসম তার صفة হয়, কিন্তু الـله শব্দ কারো صفة হয়না। আর صفة না হওয়াটা عـلـم বা নামের আলামত। তাই لـفـظ الله টি আল্লাহর সত্তার علم হবে।

২। নিয়ম হল, প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা নাম থাকা চাই যার উপর বস্তুটির যাবতীয় গুণ প্রয়োগ হতে পারে। সুতরাং এ নিয়ম হিসেবে আল্লাহর জন্যও এমন নাম থাকার প্রয়োজন যার উপর তাঁর সকল গুণকে প্রয়োগ করা যায়। আর যখন আমরা আল্লাহর সেসব নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম যার প্রয়োগ আল্লাহ তা'লার উপর বৈধ ও সহীহ। সেগুলোর মধ্যে لـفـظ الله ব্যতীত কোন শব্দ এমন পাওয়া যায়নি যার উপর সমস্ত সিফাতের প্রয়োগ হতে পারে। কেননা, অন্যান্য নামের মধ্যে যেরকম গুণবাচক অর্থ পওয়া যায় সেরকম অর্থ لـفـظ الله -এর মধ্যে পাওয়া যায়না। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, لـفـظ الله সিফাত নয়। যখন সিফাত না হওয়া প্রমাণিত হল কাজেই তা علم হবে।

৩। لفظ الله -কে যদি সিফাত ধরা হয় তাহলে الرحمن শব্দটি সিফাত হওয়ার কারণে যেরকম لا اله الا الـرحـمـن তাওহীদের ফায়দা দেয়না সেরকম لا الـه الا الله বাক্যটিও তাওহীদের ফায়দা দিবেনা। আর যেহেতু لا الـه الا الـلـه বাক্যটি সর্বসম্মতিক্রমে তাওহীদের ফায়দা দেয়, তাই لا الـه الا الـلـه বাক্যটিকে তাওহীদের ফায়দা দেয়না মনে করা বাতিল। আর নিয়ম হল, যে বস্তু কোন বাতিল বিষয়কে অপরিহার্য করে সেও বাতিল। কাজেই لفظ الله -কে সিফাত বলা বাতিল।

لـفظ الله -কে সিফাত মানার সূরতে مفيد توحيد এজন্য থাকেনা যে, সিফাত বলা হয় যা গুণবাচক অর্থ সহ অনির্দিষ্ট কোন সত্তা বুঝায়। সুতরাং সিফাতটি কোন সত্তাকে নির্দিষ্টভাবে বুঝাতে পারে না; বরং তাতে অস্পষ্টতা থেকে যায়। যার দরুন সিফাতের মধ্যে অন্য কেউও শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থকে। অতএব সিফাতটি مـانع شركت অংশিদারিত্বের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আর অংশিদারিত্ব توحيد -এর পরিপন্থী। তাই لـفـظ الله -কে সিফাত ধরা হলে لا الـه الا الـلـه কালিমাটি مـفيد توحيد থাকে না। পক্ষান্তরে لفظ الله -কে علم ধরার সূরতে নির্দিষ্ট সত্তার উপর دلالت করে যা অংশিদার স্থাপনে অন্তরায়। কাজেই علم ধরার সূরতে لا اله الا الله তাওহীদ প্রমাণ করতে পারবে। সিফাত ধরার সূরতে পারবেনা।

☆☆☆

وَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ وَصْفٌ فِيْ اَصْلِهِ لٰكِنَّهُ لَمَّا غُلِّبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَايُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِهِ وَصَارَ كَالْعَلَمِ مِثْلُ الثُّرَيَّا وَالصَّعِقِ اُجْرِىَ مَجْرَاهُ فِيْ اِجْرَاءِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ وَاِمْتِنَاعِ الْوَصْفِ بِهِ وَعَدَمِ تَطَرُّقِ اِحْتِمَالِ الشِّرْكَةِ لِاَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اِعْتِبَارِ اَمْرٍ اٰخَرَ حَقِيْقِىٍّ اَوْ غَيْرِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لِلْبَشَرِ فَلَايُمْكِنُ اَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ وَلِاَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلٰى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوْصِ لَمَا اَفَادَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى : وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ مَعْنًى صَحِيْحًا وَلِاَنَّ مَعْنَى الْاِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ اَحَدِاللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْاٰخَرِ فِى الْمَعْنٰى وَالتَّرْكِيْبِ وَهُوَ حَاصِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاُصُوْلِ الْمَذْكُوْرَةِ۔

অনুবাদ :

আর সবচেয়ে প্রাধান্যযোগ্য অভিমত হল, لفظ الله মূলতঃ وصف। কিন্তু যখন আল্লাহর সত্তার জন্য অধিকহারে ব্যবহৃত হতে লাগল যে, অন্যের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার হয়না কাজেই তা علم-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন- ثريا ও صعق শব্দদ্বয়কে علم-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সমস্ত সিফাতের موصوف হওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজে সিফাত না হওয়ার ক্ষেত্রে এবং অংশিদারিত্বের সম্ভাবনা না রাখার ক্ষেত্রে। কেননা, আল্লাহর সত্তা সত্তা হিসেবে কোন প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ সিফাতের প্রতি লক্ষ্য করা ছাড়া মানুষের কাছে অযৌক্তিক বিষয়। সুতরাং তাঁর সত্তার উপর কোন শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা সম্ভব না। তাছাড়া যদি الله শব্দ আল্লাহ তা'লার কোন বিশেষ সত্তা বুঝায় তাহলে আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿وهو الله فى السموٰت﴾ -এর বাহ্যিক গঠন সঠিক অর্থের ফায়দা দিবেনা। তাছাড়া اشتقاق -এর অর্থ হল, দু'টি শব্দের একটি অন্যটির সাথে শরীক হবে অর্থ ও গঠন-পদ্ধতির মধ্যে। আর এ অর্থ الله শব্দ ও উল্লেখিত মূলনীতির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال : شرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর ঃ وَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ وَصْفٌ فِيْ اَصْلِهِ **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এখান থেকে لفظ الله-এর ব্যাপারে তৃতীয় মতের কথা আলোচনা করছেন। আর এটা মুসান্নিফ (রঃ) -এরও অভিমত। কেননা, তিনি এমতটি বর্ণনা করেছেন والاظهر শব্দ দ্বারা।

৩য় অভিমত: لفظ الله মূল গঠন হিসেবে وصف, তথা সত্তাকে বুঝানোর সাথে সাথে গুণবাচক অর্থও বুঝায়। কিন্তু আল্লাহর সত্তার জন্য অধিকহারে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তা علم-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

قوله لكنه لما غلب الخ: এটা দু'টি উহ্য প্রশ্নের জবাব। **প্রথম প্রশ্ন হল-** لفظ الله যদি وصف হয় তাহলে অন্য কোন ইসমের সিফাত হয়না কেন? **দ্বিতীয় প্রশ্ন হল,** لفظ الله -কে وصف মানার সূরতে لا اله الا الله বাক্যটি তাওহীদের প্রমাণ বহন করবেনা। কেননা, وصف টি অংশিদারকে উপস্থাপন করতে প্রতিবন্ধক হয়না।

প্রশ্ন দু'টির উত্তর হল- الله শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়; অন্য কারো জন্য এ শব্দটির ব্যবহার চলেনা। তাই এটা আল্লাহর সত্তার সাথে খাছ হয়ে গেছে এবং عـــلـــم -এ পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং যেভাবে عـلـم -এর সিফাত উল্লেখ করা হয়, সেভাবে الـلـه শব্দের পরেও সিফাত উল্লেখ করা হয় এবং عـلـم যেভাবে অংশিদারিত্বকে নফী করে সেভাবে الـله শব্দেও কোন অংশিদারিত্ব থাকবে না। যেমন- ثريا ও صعق শব্দদ্বয় এক সময় وصف ছিল কিন্তু পরে علم -এ পরিণত হয়ে গেছে।

قوله: مثل الثريا والصعق : ثريا এটা ثروى -এর تصغير আর ثروى শব্দটা ثروان -এর مونث। সম্পদশালী মহিলাকে ثروى বলা হয়। পরে এ শব্দটি এক বিশেষ তারকার নাম হিসেবে প্রকাশ পায়।

صعق বলা হয় বিকট আওয়াজকে। অত:পর এটা خويلد بن نفيل -এর নাম হয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, একবার সে খাবার তৈরী করে রাখল হঠাৎ দমকা বাতাস এসে খাবার সহ তার পাত্রগুলো উল্টে দিল, ফলে খাবার মাটিতে পড়ে গেল। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের প্রতি অশ্লীল বাক্য ও লা'নত করল। ফলে আল্লাহর হুকুমে এক বিকট আওয়াজ তাকে ধবংস করে দিল। এরপর থেকে তাকে صعق বলা হত।

لفظ الله সিফাত হওয়ার তিন দলীল:

১. আল্লাহ তা'লার সত্তার পরিচয় তাঁর সিফাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সিফাত ব্যতীত তাঁর সত্তাকে চিনা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। কথাটি একটু বিশ্লেষণ সহকারে শুনুন! الـله শব্দকে যদি আল্লাহর নির্দিষ্ট সত্তার নাম ধরা হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে যে, الــلـــه শব্দের গঠনকারী কে? এর গঠনকারী সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়ত এর গঠনকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ অথবা মানুষ। কিন্তু এ দু'টির কোনটিই সঠিক নয়। তাই الـلـه শব্দকে عـلـم ধরাও সঠিক নয়। এখন বুঝতে হবে, উপরোক্ত দুই সম্ভাবনার কোন একটি সঠিক নয় কেন? এর কারণ হল- কোন শব্দকে কোন অর্থের বিপরীতে গঠন করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শব্দটি বলার সাথে সাথে এই অর্থ আমাদের বুঝে আসবে। আর একথা পরিস্কার যে, এটা কল্পনা করা যায় কেবল ঐ সকল অর্থের মধ্যে যা মানুষের আকলের আওতাধীন। আর যে অর্থগুলো মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত সেগুলো সম্পর্কে একথা বলা যে, "এ অর্থগুলো বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'লা অমুক শব্দকে গঠন করেছেন" এটা একটা অযৌক্তিক কথা । তাছাড়া কোন অর্থের জন্য কোন শব্দকে গঠন করা এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে, এ অর্থটি গঠনকারীর বোধগম্য হতে হবে। এখন যেহেতু আল্লাহর সত্তার হকীকত মানুষের আকলের উর্ধ্বে তাই একথা বলা যে, "মানুষ আল্লাহ তা'লার সত্তার নাম হিসেবে الـلـه শব্দটিকে গঠন করেছে" এটা অযৌক্তিক কথা। মোটকথা الله শব্দকে علم বলা একটি অমূলক কথা।

২। لفظ الله -কে যদি علم ধরা হয় তাহলে আল্লাহর বাণী ﴿وهو الله فى السموات﴾ -এর বাহ্যিক গঠন থেকে কোন সঠিক অর্থ বের হবেনা। কেননা, সেই সময় অর্থাৎ الله শব্দকে علم ধরা হলে তখন অর্থ হবে- সেই সত্তা যিনি স্বশরীরে আকাশে বিদ্যমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ সূরতে আকাশ আল্লাহর জন্য বাসস্থান হওয়া এবং তিনি দেহবিশিষ্ট হওয়া লাযেম আসছে। অথচ আল্লাহ তা'লা স্থান ও দেহ হতে পবিত্র। পক্ষান্তরে لفظ الله -কে وصف ধরা হলে আয়াত থেকে কোন ভুল অর্থ প্রকাশ পাবেনা। لفظ الله -এর গুণবাচক অর্থ হল- মা'বূদ বা উপাস্য। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে- তিনি আকাশে উপাস্য। অর্থাৎ আকাশেও তাঁর ইবাদত করা হয়। আর এ অর্থটি একেবারে সঠিক। কেননা, আকাশের মধ্যে অগণিত ফেরেশতারা তাঁর ইবাদত করে থাকেন। সুতরাং الله শব্দকে وصف ধরা হলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না তাই لفظ الله টি وصف ।

৩। لـفـظ الله টি প্রথম অভিমতের আলোচনায় বর্ণিত সাতটি জিনিসের যেকোন একটি হতে مشتق হয়েছে। কেননা, اشـتـقـــاق -এর অর্থ হল, দু'টি শব্দ একটি অপরটির সাথে অর্থ ও মূল অক্ষরের বিচারে শরীক হওয়া। আর এ অর্থটি لـفـظ الله ও উল্লেখিত সাতটি জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই বুঝা গেল, لفظ الله উল্লেখিত সাতটি জিনিসের যে কোন একটি হতে مشتق হয়েছে।

☆☆☆

وَقِيْلَ اَصْلُهُ لَاهًا بِالسِّرْيَانِيَّةِ فَعُرِّبَ بِحَذْفِ الْاَلِفِ الاَخِيْرَةِ وَاِدْخَالِ اللَّامِ عَلَيْهِ۔

অনুবাদ:

আর কেউ কেউ বলেন যে, لفظ الله মূলত لاها ছিল যা সুরিয়ানি ভাষার শব্দ। অত:পর শেষের আলিফকে হযফ করে শুরুতে আলিফ-লাম দাখিল করে আরবী বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح العبارة المذكورة

উত্তর ঃ قو له وقيل اصله لاها الخ : এখান থেকে لفظ الله সম্পর্কে চতুর্থ অভিমতের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

৪র্থ অভিমত: لـفـظ الله টি আরবী নয়; বরং সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার আসল ছিল لاهـا যার অর্থ হল মা'বূদ। অত:পর শেষের আলিফকে হযফ করে শুরুতে আলিফ-লাম দাখিল করে আরবী বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

ফায়দা ঃ বনী ইসরাঈলের ভাষাকে বলা হয় ইবরানী ভাষা, আর আদম (আঃ) -এর ভাষাকে বলা হয় সুরিয়ানি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, আদম (আ.) জান্নাতে থাকা অবস্থায় এবং দুনিয়াতে আসার পরেও তাঁর ভাষা ছিল আরবী ভাষা। কিন্তু পরবর্তীতে এই ভাষাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটতে ঘটতে নতুন এক ভাষায় রুপান্তরিত হয়। আর এই বিকৃত ভাষার নামই হলো সুরিয়ানী ভাষা। সুরিয়ানী শব্দটি সুরিয়ানা -এর দিকে সম্বন্ধকৃত। সুরিয়ানা একটা ভূ-খন্ডের নাম। এ ভূ-খন্ডেই প্লাবনের পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় বসবাস করতেন।

চতুর্থ অভিমতটি দূর্বলঃ

মুসান্নিফ (র.) এই চতুর্থ অভিমত উল্লেখ করেছেন قـيـــل শব্দ যোগে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মতে এ অভিমতটি দূর্বল। কারণ, কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কোন শব্দকে অনারবী বলা অযৌক্তিক।

☆☆☆

وَتَفْخِيْمُ لَامِهِ اِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهُ اَوْ اِنْضَمَّ سُنَّةٌ وَقِيْلَ مُطْلَقًا وَحَذْفُ اَلِفِهِ لَحْنٌ تُفْسِدُ بِهِ الصَّلٰوةُ وَلَايَنْعَقِدُ بِهِ صَرِيْحُ الْيَمِيْنِ وَقَدْ جَاءَ لِضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ: اَلَا لَابَارَكَ اللّٰهُ فِيْ سُهَيْلٍ ☆ اِذَا مَا اللّٰهُ بَارَكَ فِي الرِّجَالِ۔

অনুবাদ :

الله শব্দের لام -কে মোটা করে পড়া ক্বারীগণের চিরাচরিত নিয়ম। যখন তার পূর্বে مفتوح বা مضموم হবে। কেউ কেউ বলেন, সর্বাবস্থায় মোটা করে পড়া হবে। الله শব্দের আলিফ (তথা لام ও هـاء -এর মাঝখানের আলিফ) কে হযফ করা এমন ভুল যার কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যায় এবং সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হয়না। তবে কবিতার মধ্যে কবিতার প্রয়োজনের তাগিদে আলিফটি হযফ হয়ে এসেছে। কবিতা হল- الا لا بارك الله الخ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: وتفخيم لامه اذا انفتح ما قبله او انضم الخ

السوال: (الف) الام اشار المفسر العلام بهذه العبارة ؟ بين بالتفصيل

(ب) بين مراد المصنف العلام بقوله: وحذف الفه لحن الخ

উত্তর ঃ (الف)

قوله وتفخيم لامه اذا انفتح الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা :** এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (রঃ) الله শব্দ সম্পর্কীয় কেরাতের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

الله শব্দের কেরাত বা পঠন-পদ্ধতি: لفظ الله মহান আল্লাহ্ তা'লার মোবারক নাম। তাই الله শব্দের মর্যাদার চাহিদা হল যে, তাকে মুখ ভরে আদায় করা। এজন্য ক্বারীগণের চিরাচরিত নিয়ম হল- الله শব্দের لام -কে মোটা করে পড়া যখন তার পূর্বে مفتوح বা مضموم হবে। আর কেউ কেউ তো সর্বাবস্থায় মোটা করে পড়েন।

নোট: এখানে সুন্নত শব্দ দ্বারা আভিধানিক সুন্নত উদ্দেশ্য। সুন্নতের আভিধানিক অর্থ হল- চিরাচরিত নিয়ম।

(ب) لفظ الله সম্পর্কীয় দু'টি ফেকহী মাসআলা ঃ

قوله وحذف الفه الخ: মুসান্নিফ (রঃ) এখান থেকে لفظ الله সম্পর্কীয় দু'টি ফেকহী মাসআলা শুরু করেছেন।

১ম মাসআলা: শাফেয়ীগণের মতে, নামাযের মধ্যে الله শব্দের لام ও هـا -এর মধ্যবর্তী আলিফকে বাদ দিয়ে পড়লে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ তাদের মতে, بسم الله হচ্ছে সূরা ফাতেহার অংশ, আর সূরা ফাতেহা পড়া তাদের নিকট ফরয। আর الله শব্দের আলিফকে বাদ দেয়া পূর্ণ শব্দকে বাদ দেয়ার নামান্তর। আর পূর্ণ الله শব্দকে বাদ দেয়াতে পূর্ণ بسم الله -কে বাদ দেয়া বুঝায়। এভাবে সে যেন পূর্ণ ফাতিহাকেই বাদ দিল। সূরা ফাতেহা যেহেতু তাদের মতে, ফরয তাই নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, এসম্পর্কে আহনাফের অভিমতটিও জেনে নেয়া দরকার। ফিকহের কিতাবাদি অধ্যায়নের

পর যে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া গেছে তা হল এই যে, الله শব্দের আলিফ বাদ দিলে নামায ফাসিদ হবেনা। কেননা, হানাফীদের নিকট ভুল কেরাতের কারণে নামায ফাসিদ হতে হলে অর্থের মধ্যে মারাত্নক পরিবর্তন আসতে হবে। অর্থাৎ কেরাতে যদি এমন ভুল হয় যার দরুন অর্থের মধ্যে মারাত্নক পরিবর্তন আসে তাহলে নামায ফাসিদ হবে অন্যথায় নয়। আর একথা পরিস্কার যে, الـلـه শব্দের আলিফ বাদ দিলে অর্থের মধ্যে মারাত্নক কোন পরিবর্তন আসেনা। তাছাড়া এক লোগাতের মধ্যে الـلـه শব্দের আলিফ বাদ দেয়া আছে।

মোটকথা আমাদের বিশ্লেষণ মতে الـله শব্দের আলিফ বাদ দেয়ার কারণে আহনাফের নিকট নামায ফাসিদ হবেনা। (মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া সাহেব রচিত তাকরীরে কাসিমী)

২য় মাসআলা: الله শব্দের আলিফ বাদ দিয়ে যদি শপথ খায় যেমন بِاللّٰهِ বলল তাহলে صريح يمين তথা সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হবেনা। কেননা, সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হতে হলে পূর্ণ الله শব্দ থাকা শর্ত। আর আলিফকে বাদ দেয়া পূর্ণ শব্দকে বাদ দেয়ার নামান্তর। তাই সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি শপথের নিয়ত করে নেয় তাহলে শপথটি কার্যকর হয়ে যাবে।

وقد جاء لضرورة الشعر الخ: এখানে মুসান্নিফ (রঃ) একথা বলতে চাচ্ছেন যে, الـله শব্দের আলিফকে হযফ করা যদিও ভুল, কিন্তু কবিতার প্রয়োজনের তাগিদে আলিফ বাদ দেয়া যায়। কেননা, জরুরতের কারণে অবৈধ জিনিস বৈধ হয়ে যায়। যেমন জনৈক কবির কবিতায় الـله শব্দের আলিফকে বাদ দেয়া হয়েছে। কবিতা হল-

الا لا بارك اللّٰه فى سهيل ☆ اذا ماالله بارك فى الرجال

কবিতার অর্থ: (কবি বলেন আমার কামনা) আল্লাহ সুহায়েল নামক ব্যক্তিকে রহম না করুন, যখন তিনি অন্যান্য ব্যক্তিকে রহম করেন।

একবিতার মধ্যে الـلـه শব্দ দু'বার এসেছে। প্রথমটি হল محل استشهاد , এখান থেকে আলিফকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেন, উভয়টি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অত এব তাদের মতে, উভয়টি محل استشهاد ।

﴿اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ اِسْمَانِ بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ كَالْغَضْبَانِ مِنْ غَضِبَ وَالْعَلِيْمِ مِنْ عَلِمَ وَالرَّحْمَةُ فِى اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَاِنْعِطَافٌ يَقْتَضِى التَّفَضُّلَ وَالْاِحْسَانَ وَمِنْهُ اَلرَّحْمُ لِاِنْعِطَافِهَا عَلٰى مَا فِيْهَا

অনুবাদ :

رحمن ও رحيم এমন দুই ইসম যাকে مبالغه (আধিক্য) বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। رحم থেকে নির্গত, যেরকম غضبان টি غضب এবং عليم টি علم থেকে নির্গত হয়েছে। অভিধানে رحمت বলা হয় অন্তরের এমন কোমলতা ও আকর্ষণকে যা দয়া ও অনুগ্রহকে কামনা করে। আর তা থেকেই رحم (মহিলার জরায়ু) নির্গত। কেননা, জরায়ুও তার মাঝে অবস্থিত জিনিস বা বাচ্চার প্রতি কোমল হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال ﴿الرحمن الرحيم﴾ من اى صيغة؟ اكتب مع اقوال العلماء فيهما

উত্তর ঃ رحمن ও رحيم কোন সীগাহ্ এব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের মতে, উভয়টি صفة مشبه -এর সীগাহ্। তবে অর্থ দিবে مبالغه -এর। ইমাম সিবাওয়ায়হ (রঃ) -এর মতে, رحمن টি صفة مشبه এবং رحيم টি مبالغه -এর সীগাহ্। কেউ কেউ বলেন, উভয়টি مبالغه -এর সীগাহ্।

ফায়দাঃ

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: رحمن ও رحيم উভয়টিকে صفة مشبه ধরা হোক অথবা শুধু رحمن -কে صفة مشبه ধরা হোক উভয় সূরতে একটি প্রশ্ন জাগে যে, صفة مشبه তো فعل لازم থেকে গঠিত হয়, فعل متعدى থেকে গঠিত হয়না। অথচ এখানে رحمن ও رحيم গঠিত হয়েছে رحم থেকে। আর رحم হল فعل متعدى ।

এর উত্তর হল- কোন কোন ক্ষেত্রে فعل متعدى -কে فعل لازم -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। অত:পর তার থেকে صفة مشبه গঠন করা হয়। তাই এখানেও رحم ফে'লে মুতাআদ্দীকে لازم -এর স্থলাভিষিক্ত করে তা থেকে صفة مشبه গঠন করা হয়েছে।

السوال : ما معنى الرحمة لغة واصطلاحا وما هو المراد بها ههنا؟
وفاق المدارس: ١٩, ٢٥, ١٧, ٢٢هج

উত্তর ঃ رحمة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ: رحمة -এর আভিধানিক অর্থ হল- অন্তরের কোমলতা ও আকর্ষণ। আর পরিভাষায় رحمة বলা হয় অন্তরের এমন কোমলতা ও আকর্ষণকে যা দয়া ও অনুগ্রহের কামনা করে। তবে এখানে انعام বা পুরস্কার প্রদান করা অর্থ উদ্দেশ্য।

☆☆☆

وَاَسْمَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَايَاتِ الَّتِىْ هِىَ اَفْعَالٌ دُوْنَ الْمَبَادِى الَّتِىْ تَكُوْنُ اِنْفِعَالَاتٌ

অনুবাদ :

আর আল্লাহ তা'লার নামসমূহকে গ্রহণ করা হয় চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, যা افعال বা প্রভাব বিস্তার কার্যের অন্তর্ভুক্ত। নামের উদ্ভাবন বা মৌলিকত্বের ভিত্তিতে নয়, যা انفعال বা প্রভাব গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:شرح قوله واسماء الله تعالى انما تؤخذ الخ

উত্তর ঃ قوله واسماء الله تعالى الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- আপনি رحمة -এর অর্থ করেছেন "হৃদয়ের প্রবণতা ও আত্মিক আকর্ষণ" দ্বারা। আর আত্মা বা মন বিকর্ষিত হওয়া এবং প্রবণতা হওয়া এটা মনের সেসব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ যা দৈহিক স্বভাবের আয়ত্তাধীন, অর্থাৎ প্রথমে দৈহিক স্বভাব কোন ক্রিয়া গ্রহণ করে, তারপর মনের মধ্যে এই অবস্থা সংক্রমিত হয়। এখন যদি আল্লাহর ক্ষেত্রে رحمن ও رحيم -এর ব্যবহার করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার জন্য আত্মা ও দেহ সাব্যস্ত করতে হবে এবং আল্লাহ তা'লা অন্যের ক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল হওয়া আবশ্যক হবে। আর এসব জিনিস তো সম্ভাব্যকে আবশ্যক করে তুলে এবং আল্লাহ তা'লা সম্ভাব্য বস্তু হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'লা সম্ভাব্য সত্তা নন; বরং অপরিহার্য সত্তা। কাজেই رحمن ও رحيم -এর ব্যবহার আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভব হল?

উত্তর হল- আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে رحمن ও رحيم জাতীয় নামগুলো غايت বা পরিণতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। غايت হল افعال বা ক্রিয়া সৃষ্টিকারী বস্তু। এজাতীয় নাম তার প্রাথমিক অবস্থা যেমন দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদির অর্থ দিতে ব্যবহৃত হয়নি যা মূলত انفعال ক্রিয়া গ্রহণকারী।

افعال বলা হয় যা اثر বা ক্রিয়া সৃষ্টি করে আর انفعال বলা হয় যা متأثر বা ক্রিয়াশীল হয়। এখানে رحيم ও رحمن -কে আল্লাহ তা'লার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আল্লাহ তা'লার জন্য প্রযোজ্য হতে পারেনা। কিন্তু এগুলোকে প্রয়োগ করা হয়েছে رحمة -এর পরিণতিতে যা আসে তার জন্য। আর رحمة বা দয়ার পরিণতিতে আসে انعام বা পুরস্কার। আর এটা হল افعال কেননা, আল্লাহ তা'লা পুরস্কার দান করেন; অন্যে তা গ্রহণ করে।

কিন্তু এখানে رحمة অর্থ 'দয়া' এই অর্থ ধরে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবেনা। কেননা দয়া অন্যের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন যদি এটাকে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'লা অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া আবশ্যক হয়। কাজেই এই انفعال -কে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে ধরা যাবেনা; বরং افعال বা غايت -কে ধরতে হবে। আর তা হল পুরস্কার প্রদান।

মোটকথা যেখানে এমন নাম উল্লেখ করা হয় যা আল্লাহ তা'লার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারেনা সেখানে তার অর্থ ধরা হবে افعال হিসেবে, انفعال হিসেবে ধরা যাবে না।

وَالرَّحْمٰنُ اَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيْمِ لِاَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلٰى زِيَادَةِ الْمَعْنٰى كَمَا فِيْ قَطَعَ وَ قَطَّعَ وَكُبَارٍ وَ كُبَّارٍ وَذَالِكَ اِنَّمَا تُوْخَذُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَّةِ وَاُخْرٰى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ فَعَلَى الْاَوَّلِ قِيْلَ يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا لِاَنَّهٗ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّهٗ يَخْتَصُّ الْمُؤْمِنَ وَعَلَى الثَّانِيْ قِيْلَ يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَ الدُّنْيَا لِاَنَّ النِّعَمَ الْاُخْرَوِيَّةَ كُلَّهَا جِسَامٌ وَاَمَّا النِّعَمُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَجَلِيْلَةٌ وَحَقِيْرَةٌ

অনুবাদ :

আর رحمن **শব্দটি** رحيم **শব্দের তুলনায় বেশী** مبالغه (তথা বেশী রহমত) বুঝায়। কেননা, হরফের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতার উপর دلالت করে। যেমন- قَطَعَ ও قَطَّعَ এবং كُبَارٌ ও كُبَّارٌ । আর এই আধিক্যতা কখনো সংখ্যা আবার কখনো মর্যাদার বিচারে নির্ণয় করা হয়। সুতরাং সংখ্যার বিচারে يارحمن الدنيا ورحيم الاخرة বলা হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে মুমিন ও কাফির উভয়ের প্রতি রহম করেন। আর আখেরাতে রহম করেন কেবল মুমিনের প্রতি। আর মর্যদার বিচারে يا رحمن الدنيا و رحيم الاخرة এবং يا رحيم الدنيا বলা হয়। কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সবই বড় বড় আর দুনিয়ার নেয়ামত বড়ও হয় ছোটও হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله الرحمن ابلغ من الرحيم الخ

السوال: اوضح مراد العبارة ايضاحا تاما

উত্তর ঃ

قوله الرحمن ابلغ من الرحيم الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (রঃ) رحمن ও رحيم -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করছেন।

رحمن ও رحيم -এর মধ্যে পার্থক্য: رحمن ও رحيم উভয়টি مبالغه বুঝায়। কিন্তু رحمن -এর মধ্যে مبالغه বেশী আর رحيم -এর মধ্যে مبالغه কম। কেননা, কায়দা হল, যে শব্দের মধ্যে অক্ষর বেশী থাকে তা অর্থ দানের ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝায়।

সুতরাং যেহেতু رحمن -এর মধ্যে অক্ষর বেশী কাজেই তা অর্থও দিবে বেশী অর্থাৎ অধিক مبالغه বুঝাবে। পক্ষান্তরে رحيم -এর মধ্যে অক্ষর কম কাজেই তার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কম مبالغه পাওয়া যাবে। যেমন- قطع অর্থ- কর্তন করা আর قطّع অর্থ- বারবার কর্তন করা। প্রথমটির মধ্যে অক্ষর কম বলে অর্থও কম বুঝিয়েছে, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে অক্ষর বেশী হওয়ার কারণে অর্থও অধিক বুঝিয়েছে। এমনিভাবে كبار অর্থ- বড়, আর كبّار অর্থ- অনেক বড়।

অত:পর বায়যাবী (রঃ) বলেন, رحمن -এর মধ্যে অর্থের আধিক্যতা كمية (সংখ্যা) ও كيفية (মর্যাদা) উভয়ের বিচারে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ رحمن শব্দটি রহমতের আধিক্যতা ও মর্যাদা উভয়টি বুঝায়। যদি সংখ্যার বিচারে رحمن -কে رحيم -এর তুলনায় বেশী مبالغه ধরা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে যে, رحمن -এর মধ্যে রহমতের সদস্য বেশী আর رحيم -এর মধ্যে কম। যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহ

তা'লার রহমত মুমিন ও কাফির উভয়ের মধ্যে ব্যাপক, আর আখেরাতের রহমত শুধু মুমিনের জন্য নির্ধারিত। এজন্য যখন يارحمن الدنيا ورحيم الاخرة বলা হবে, তখন অর্থ হবে- হে ঐ সত্তা! যিনি দুনেয়াতে সমস্ত সৃষ্টিজীবের প্রতি অসংখ্য অনুগ্রহ করেন। আর رحيم الاخرة অর্থ হবে- আখেরাতে যার রহমত শুধু মুমিনের জন্য নির্ধারিত।

আর যদি رحمن -কে মর্যাদার বিচারে অধিক مبالغه ধরা হয় তাহলে رحمن টি রহমতের মর্যাদা বুঝাবে। আর এ হিসেবে يارحمن الدنيا والاخرة ورحيم الدنيا বলা হবে। অর্থাৎ رحمن -এর اضافت হবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির প্রতি, আর رحيم -এর اضافت হবে শুধু দুনিয়ার প্রতি।

কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সবই বড় বড়, আর দুনিয়ার নেয়ামত বড়ও আছে আবার ছোটও আছে। তাই ছোট নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে رحيم الدنيا বলা হয়েছে। رحمن الدنيا والاخرة অর্থ হবে- হে দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় ও আখেরাতের মধ্যে সমস্ত নেয়ামত দাতা! আর رحيم الدنيا অর্থ হবে- হে দুনিয়ার মধ্যে ছোট ছোট নেয়ামত দাতা!

☆☆☆

وَاِنَّمَا قُدِّمَ وَالْقِيَاسُ اَلتَّرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى لِتَقَدُّمِ رَحْمَةِ الدُّنْيَا وَلِاَنَّهٗ صَارَ كَالْعَلَمِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَايُوْصَفُ بِه غَيْرُهٗ لِاَنَّ مَعْنَاهُ اَلْمُنْعِمُ الْحَقِيْقِىُّ الْبَالِغُ فِى الرَّحْمَةِ غَايَتَهَا وَذٰلِكَ لَايُصْدَقُ عَلٰى غَيْرِه لِاَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِيْضٌ بِلُطْفِه وَاِنْعَامِه يُرِيْدُ بِه جَزِيْلَ ثَوَابٍ اَوْ جَمِيْلَ ثَنَاءٍ اَوْ مُزِيْحَ رِقَّةِ الْجِنْسِيَّةِ اَوْ حُبَّ الْمَالِ عَنِ الْقَلْبِ ثُمَّ اَنَّهٗ كَالْوَاسِطَةِ فِىْ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ ذَاتُ النِّعَمِ وَوُجُوْدُهَا وَالْقُدْرَةُ عَلٰى اِيْصَالِهَا وَالدَّاعِيَةُ الْبَاعِثَةُ عَلَيْهِ وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهَا وَالْقُوٰى الَّتِىْ بِهَا يَحْصِلُ الْاِنْتِفَاعُ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ خَلْقِه لَايَقْدِرُ عَلَيْهَا اَحَدٌ غَيْرُهٗ اَوْ لِاَنَّ الرَّحْمٰنَ لَمَّا دَلَّ عَلٰى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَاُصُوْلِهَا ذَكَرَ الرَّحِيْمَ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَيَكُوْنُ كَالتَّتِمَّةِ وَالرَّدِيْفِ لَهٗ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْاٰىِ

অনুবাদ:

যদিও ছোট গুণ হতে বড় গুনের দিকে উন্নীত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু رحمن -কে (رحيم থেকে) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ (ক) দুনিয়ার রহমত (আখেরাতের রহমতের) পূর্বে আসে (খ) এবং একারণে যে, رحمن এটা علم -এর রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কেননা, رحمن এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সিফাত হয়না। কারণ, رحمن -এর অর্থ হল, সেই প্রকৃত নেয়ামত

দাতা যিনি অনুকম্পা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন। আর এ অর্থটি অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যান্যরা দয়া ও নেয়ামত দানের মাধ্যমে প্রতিদানের আকাঙ্খা রাখে। (যেমন-) অন্যান্য লোকেরা দানের বিনিময়ে প্রচুর নেকী অর্জনের, উত্তম প্রশংসা লাভের, সমমনাপ্রীতি দূর করার, অন্তর হতে সম্পদপ্রীতি ত্যাগ করার আকাঙ্খা রাখে। তাছাড়া বান্দা দানের ক্ষেত্রে মাধ্যম মাত্র। কেননা, নেয়ামতসমূহ ও তার অস্তিত্ব দান এবং তা পৌছনোর ক্ষমতা দানে উৎসাহ দানকারী মাধ্যম, নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ অর্জন এবং সেই শক্তি যার প্রভাবে অন্যান্য সৃষ্টিজীবের কাছে উপকার পৌছানো যার এসব কিছুর আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ সামর্থবান নয়। (গ) এবং একারণে رحـمـن -কে আগে ব্যবহার করা হয়েছে যে, যখন رحـمـن বড় বড় ও মূল নেয়ামতের উপর দালালত করে কাজেই رحيم -কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে যেন رحمن -এর আওতাবহির্ভূত নেয়ামতসমূহকে শামিল করে নেয়। সুতরাং رحيم শব্দটি পরিশিষ্ট ও অনুগামীর মত হবে। (ঘ) অথবা আয়াতের অন্তমিল রক্ষার্থে رحيم -কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم قدم الرحمن على الرحيم؟ اوضح ايضاحا تاما
وفاق المدارس: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর ঃ رحمن - কে رحيم -এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ ঃ

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে আমরা জানতে পেরেছি رحـمـن অধিক অর্থ দিয়ে থাকে আর رحيم তার তুলনায় কম অর্থ দিয়ে থাকে। আর সাধারণ নিয়ম ও বিবেকের চাহিদা হল, গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ও ক্ষুদ্র গুণকে উল্লেখ করে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে বড়গুলোকে উল্লেখ করা হবে। কেননা, প্রথমে বড়গুলোকে উল্লেখ করলে ছোট ও ক্ষুদ্রকে উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকেনা। কারণ, সেই বড় গুণের মধ্যে ছোট গুণও তো শামিল আছে। কাজেই বড় গুণ উল্লেখ করার পর ছোট গুণ উল্লেখ করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই; বরং উপকারিতা হল ছোট গুণ উল্লেখ করার পর বড় গুণ উল্লেখ করার মধ্যে। কেননা, তখন প্রথমে ছোট গুণ জানা হবে তারপর আরেকটু বড় এভাবে বর্ণনা করলে সম্বোধিত ব্যক্তি গুণান্বিত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে বেশী।

কিন্তু যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে আমরা দেখি যে, رحمن ও رحيم -এর মধ্যে এই নিয়মের বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে। কেননা, رحـمـن অধিক অর্থ দেয়ার কারণে আল্লাহর বড় গুণ, পক্ষান্তরে رحيم তার চেয়ে কম অর্থ দেয়ার কারণে ছোট গুণ, তথাপি বড় গুণকে আগে ও ছোট গুণকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত হয়েছে। কাজেই এখানে নিয়মবহির্ভূত ব্যবহারের কারণ কি?

উত্তর: চার কারণে رحمن -কে رحيم -এর পূর্বে আনা হয়েছে। যথা:-

১। رحمن সংখ্যাধিক্য হিসেবে দুনিয়ার রহমতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এদিকে দুনিয়ার রহমত আখেরাতের রহমতের পূর্বে অস্তিত্বে আসে। আর অখেরাতের রহমত পরে অস্তিত্বে আসে। এই দিক লক্ষ্য করেই رحمن -কে প্রথমে আনা হয়েছে।

২। رحمن শব্দটি আল্লাহ শব্দের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ। কেননা, যেভাবে الله শব্দটি আল্লাহ

তা'লা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনা, অনুরূপভাবে رحمن শব্দটিও আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়না। সুতরাং رحمن টি الله শব্দের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখার কারণে علم -এর মত হয়ে গেছে। আর যেহেতু علم ও وصف একসাথে বর্ণিত হলে علم -কে আগে উল্লেখ করা হয়, তারপর صفت -কে উল্লেখ করা হয়। এজন্য رحمن -কে رحيم -এর পূর্বে আনা হয়েছে।

পক্ষান্তরে رحيم আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم﴾ এখানে رحيم -কে রাসূলের সিফাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩। رحمن শব্দটি মর্যাদার বিচারে বড় বড় নেয়মাতকে বুঝায় (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। আর আল্লাহ তা'লার বড়ত্ব প্রকাশের চাহিদা হল, তাঁকে মহান নেয়ামত দাতা বলা। কাজেই প্রথমে আল্লাহ তা'লার বড় গুণ তথা رحمن -কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে এ সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত আল্লাহর কাছে ছোট নেয়ামতের প্রার্থনা করা সমীচীন নয়, তাই এ সন্দেহকে দূরীভূত করার জন্য শেষে رحيم শব্দকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪। আয়াতের অন্তমিল রক্ষার্থে رحمن -কে আগে আনা হয়েছ এবং رحيم পরে আনা হয়েছে। কেননা, যদি رحيم -কে পরে আনা না হত তাহলে পরবর্তীতে যে আয়াতের শেষাংশের মিল রয়েছে যেমন- عالمين - رحيم - يوم الدين - نستعين ইত্যাদি এই মিল থাকত না।

☆☆☆

وَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَاِنْ حَظَرَ اِخْتِصَاصُهُ بِاللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مُؤَنَّثٌ عَلٰى فَعْلٰى اَوْ فَعْلَانَةٍ اِلْحَاقًا لَهُ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ فِيْ بَابِه

অনুবাদ :

অধিক সুস্পষ্ট কথা হল, رحمن শব্দটি غير منصرف । যদিও আল্লাহ তা'লার সাথে খাছ হওয়ার কারণে তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى বা فعلانة -এর ওযনে আসার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। (তথাপি غير منصرف পড়া হবে) সেসব শব্দাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে যেগুলো অধিকাংশ সময় غير منصرف হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:﴿رحمن﴾ منصرف ام غير منصرف؟
وفاق المدارس: ١٩، ٢٠، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর ঃ رحمن শব্দ منصرف না غير منصرف :

رحمن শব্দ منصرف না غير منصرف তা নির্ণয় করার পূর্বে একথাটি মনে রাখতে হবে যে, رحمن শব্দটি الف ونون زائدتان বিশিষ্ট শব্দ। আর الف ونون زائدتان টি غير منصرف -এর ৯ সববের এক সবব। তবে তার জন্য কিছু শর্তও রয়েছে। যদি الف ونون زائدتان বিশিষ্ট শব্দ صفت না হয়; বরং اسم

হয় তাহলে তার জন্য علم হওয়া শর্ত। আর صفت হলে তার জন্য কি শর্ত এব্যাপারে নাহুবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার مؤنث টি فعلى -এর ওযনে আসা শর্ত। আর কেউ কেউ বলেন, তার مؤنث টি فعلانة -এর ওযনে না আসা শর্ত।

সুতরাং যারা فعلانة -এর ওযনে না আসার শর্ত করেছেন তাদের মতে, رحمن টি غير منصرف -ই হওয়া উচিত। কেননা, তার مؤنث টি فعلانة -এর ওযনে আসা তো দূরে থাক এমনকি তার مؤنث -ই নেই। না। আর যারা فعلى -এর ওযনে আসার শর্ত করেছেন তাদের মতে, رحمن টি منصرف হবে। কেননা, তার مؤنث টি فعلى -এর ওযনেও আসেনা। এখন ফলাফল এই দাঁড়াল যে, رحمن শব্দকে غير منصرف ও منصرف উভয়টি বলা যাবে, আর একথা পরিষ্কার যে, একই শব্দের মধ্যে দুই হুকুম ধরা অযৌক্তিক। তাই যে কোন একটি নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে গেল হয়ত منصرف হবে না হয় غير منصرف। তাই কাযী বায়যাবী (রঃ) বলেন, সুস্পষ্ট কথা হল, رحمن শব্দটি غير منصرف। এসম্পর্কে তিনি বলেন, رحمن শব্দ যেহেতু আল্লাহ তা'লার জন্য নির্ধারিত কাজেই তার مؤنث কোন ওযনেই আসতে পারেনা। না فعلى -এর ওযনে আর না فعلانة -এর ওযনে। যদি তার مؤنث টি কোন ওযনে আসতে পারত তাহলে فعلى -এর ওযনে হওয়ার অথবা فعلانة -এর ওযনে না হওয়ার কারণে منصرف বা غير منصرف -এর হুকুম লাগানো যেত। তাই فعلى -এর ওযনে না হওয়ার কারণে তাকে منصرف বলা অথবা فعلانة -এর ওযনে না আসায় তাকে غير منصرف বলা কিছুতেই সম্ভব না। কাজেই رحمن শব্দ منصرف না غير منصرف তা নির্ণয় করতে হবে অন্য কোন পন্থায়। আর এ পন্থাটি হল- رحمن -কে সেসব সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, যেগুলোর অধিকাংশের مؤنث আসে فعلى -এর ওযনে। তাই رحمن টিও সেই সকল শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে غير منصرف হবে।

☆☆☆

وَاِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ اَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِاَنْ يُسْتَعَانَ بِهٖ فِىْ مَجَامِعِ الْاُمُوْرِ هُوَ الْمَعْبُوْدُ الْحَقِيْقِىُّ الَّذِىْ هُوَ مُوْلِى النِّعَمِ كُلِّهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا جَلِيْلِهَا وَحَقِيْرِهَا فَيَتَوَجَّهُ بِشَرَاشَرِهٖ اِلٰى جَنَابِ الْقُدْسِ وَيَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ التَّوْفِيْقِ وَيَشْغُلُ سِرَّهٗ بِذِكْرِهٖ وَالْاِسْتِمْدَادِ بِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ

অনুবাদ :

بسم الله -এর মধ্যে বিশেষভাবে এই ইসমগুলো তথা الله ও رحمن - رحيم -এই সিফাতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেন আল্লাহমুখী ব্যক্তি একথা জেনে নিতে পারে যে, সমস্ত বিষয়ের সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত হলেন সেই প্রকৃত মা'বুদ যিনি নগদ-বাকি, বড়-ছোট সকল নেয়ামত দানের অধিকারী। অত:পর পূর্ণরূপে মহা পবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং অনুগ্রহের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। তার অভ্যন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকবে এবং অন্য সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে তাঁরই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: لم اختير الله الرحمن و الرحيم من اسماء الله تعالى وما حسن الترتيب بين الاسماء الثلاثة؟ وفاق المدارس: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর ঃ بسم الله **-এর মধ্যে বিশেষভাবে** الله - رحمن **ও** رحيم **এই তিনটি ইসমকে উল্লেখ করার কারণ ঃ** এর কারণ বুঝার আগে একটি নিয়ম বুঝে নিন। নিয়মটি হল, যদি কোন وصف -এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয় তাহলে সেই وصف টি উক্ত হুকুমের জন্য علت (কারণ) হয়ে থাকে এবং সেই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সেই গুণাবলীর কারণে সেই হুকুমের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

এবার মূল আলোচনার প্রতি যাওয়া যাক। কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর মতে بسم الله -এর باء হল استعانت -এর জন্য (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। তাহলে بسم الله الرحمن الرحيم -এর অর্থ হবে اقرء مستعينا بمسمى هذه الاسماء الثلاثة অর্থ: আমি এই তিন নাম বিশিষ্ট সত্তার সাহায্যে প্রার্থনা করে পাঠ করছি। সুতরাং এখানে এই তিন নামের পরিপ্রেক্ষিতে حكم استعانت বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী এই তিন নাম বিশিষ্ট সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করার কারণই হল, তিনি যেহেতু আল্লাহ তথা প্রকৃত মা'বুদ, তিনি রাহমান তথা বড় বড় নেয়ামতদাতা, তিনি রাহীম তথা ছোট-বড় নগদ-বাকি সমস্ত নেয়ামত দানের অধিকারী। তাই আল্লাহমুখি ব্যক্তি যখন بسم الله الرحمن الرحيم বলবে তখন সে বুঝে নিতে পারবে যে, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করার উপযোক্ত হওয়ার কারণই হল, যেহেতু তিনি প্রকৃত মা'বুদ এবং সমস্ত নেয়ামত দানের অধিকারী তিনিই। আর যখন সে একথা বুঝে নিতে পারবে, তখন পূর্ণরূপে মহাপবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং তার অভ্যন্তরকে আল্লাহর যিকির ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখবে। এবং অন্য সবকিছু হতে তার অভ্যন্তরকে বিরত রাখবে।

﴾اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴿

{ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য }

اَلْـحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْإِخْتِيَارِىِّ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا وَالْمَدْحُ هُوَ الثَّنَاءُ عَـلَـى الْـجَمِيْلِ مُطْلَقًا تَقُوْلُ حَمِدْتُ زَيْدًا عَلَى عِلْمِه وَ كَرَمِه وَلَاتَقُوْلُ حَمِدْتُهٗ عَلَى حُسْـنِـه بَـلْ مَـدَحْتُـهٗ وَقِيْـلَ هُمَا اَخَوَان وَالشُّكْرُ مُقَابِلَةُ النِّعْمَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاِعْتِقَادًا قَـالَ:ـ اَفَـادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّىْ ثَلٰثَةً ☆ يَدِىْ وَلِسَـانِـىْ وَالضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا. فَهُوَ اَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَاَخَصُّ مِنْ اٰخَرَ

অনুবাদ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য। حـمـد বলা হয় নেয়ামতের বিনিময়ে বা নেয়ামত ছাড়াই ঐচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা। আর مـــدح বলা হয় ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা। তুমি বলবে- حمدت زيدا على علمه وكرمه কিন্তু حمدته على حسنه বলবেনা; বরং مدحته বলবে। কেউ কেউ বলেন, এই উভয়টা সমার্থবোধক। আর شكر নেয়ামতের বিনিময়ে কথা, কাজ ও অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। কবি বলেন- افـادتكم النعماء.........الخ সুতরাং شكر এটা حمد و مدح হতে একদিক বিচারে ব্যাপক আর অন্য দিক বিচারে খাছ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى الحمد والمدح والشكر وما الفرق بين هذه الثلاثة؟

(ب) علام استشهد المفسر بقول الشاعر.

افادتكم النعماء منى ثلثة☆ يدى ولسانى والضمير المحجبا

وفاق المدارس: ١٨ , ٢٣ـ ازاد دينى: ٢١ هج

উত্তর ঃ حمد -এর পরিচয় ঃ

الحمد هو الثناء على الجميل الاختيارى من نعمة او غيرها

অর্থাৎ, حمد বলা হয় ঐচ্ছিক ভাল কাজের জন্য (মুখে) প্রশংসা করা চাই সেই প্রশংসা কোন দানের প্রেক্ষিতে হোক বা না হোক।

مدح -এর পরিচয় ঃ المدح هو الثناء على الجميل مطلقا من نعمة او غيرها

অর্থাৎ, مـــدح বলা হয় ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা চাই নেয়ামতের বিনিময়ে হোক বা নেয়ামত ছাড়াই হোক।

شكر -এর পরিচয়: الشكر هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والاركان অর্থাৎ, নেয়ামতের বিনিময়ে সম্মানার্থে মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভাল কাজের প্রশংসা করা।

حمد - مدح ও شكر -এর মধ্যে পার্থক্য

এই তিনটি শব্দের মধ্যে দুই ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (১) অর্থগত পার্থক্য এবং (২) ব্যবহারগত পার্থক্য।

অর্থগত পার্থক্য তিনটি ঃ যথা–

১. حمد ও مدح -এর মধ্যে عموم خصوص مطلق বা সাধারণ বিশেষ সম্পর্ক। حمدَ হল خاص বা বিশেষ আর مدح হল عام বা সাধারণ। যেখানে حمد পাওয়া যাবে সেখানে مدح-ও পাওয়া যাবে। কেননা, مدح সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেখানে مدح পাওয়া যাবে সেখানে حمد পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। কেননা, حمد বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

যেমন- حمدت زيدا على علمه وكرمه এক্ষেত্রে مدحت -ও ব্যবহার করা যাবে। কেননা, مدح ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত পারে। এখানে ঐচ্ছিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু حمدته على حسنه বলা যাবেনা; বরং مدحته বলতে হবে। কেননা, حمد হল خاص যা কেবল ঐচ্ছিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর حسن তো অনৈচ্ছিক বিষয়। তবে مدح যেহেতু ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এজন্য مدح ব্যবহৃত হতে পারবে।

২. কারো মতে, حمد ও مدح উভয়টি সমার্থবোধক।

৩. আর যদি حمد و مدح -কে একদিকে রাখা হয় এবং شكر -কে আরেক দিকে রাখা হয় তাহলে এই দুই শ্রেণীর মাঝে عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক হবে।

عموم وخصوص من وجه হল এক হিসেবে عام হওয়া আর এক হিসেবে خاص হওয়া। আর এই অর্থ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, حمد ও مدح তার متعلق -এর বিচারে عام । তার متعلق হল নেয়ামত ও গায়রে নেয়ামত। কিন্তু مورد বা প্রকাশস্থলের বিচারে خاص । কেননা, তার প্রকাশস্থল মুখ বা জিহবা। আর شكر তার متعلق -এর বিচারে خاص । কেননা, তার متعلق হল কেবল "নেয়ামত"। কিন্তু مورد -এর বিচারে عام কেননা, তার مورد বা প্রকাশস্থল হল মুখ, হাত ও অন্তর এই তিনটি।

ব্যবহারগত পার্থক্যঃ

حمد আসে ذم -এর বিপরীতে, مدح আসে لوم -এর বিপরীতে, আর شكر আসে كفر -এর বিপরীতে।

(ب) علام استشهد المفسر بقول الشاعر.

افادتكم النعماء مني ثلثة ☆ يدى ولسانى والضمير المحجبا

উত্তর ঃ

কবিতার অর্থ: তোমাদের অনুদান সমূহ তোমাদেরকে আমার তিনটি জিনিস দিয়েছে। আমার হাত, মুখ এবং অভ্যন্তর। অর্থাৎ আমি তোমাদের অনুদান সমূহের বিনিময়ে আমার এই তিনটি অঙ্গ দ্বারা তোমাদের সম্মান জানাব।

محل استشهاد : পূর্বে মুসান্নিফ (রঃ) এই দাবী করে আসছিলেন যে, حمد তার متعلق -এর বিচারে عام কেননা, তার متعلق হল নেয়ামত ও গায়রে নেয়ামত। পক্ষান্তরে شكر তার متعلق -এর বিচারে خاص কেননা, شكر কেবল নেয়ামতের বিনিময়ে হয়ে থাকে। তবে شكر তার مورد তথা

প্রকাশস্থলের বিচারে عام কেননা তার প্রকাশস্থল হল মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পক্ষান্তরে حمد তার مورد -এর বিচারে خاص কেননা, তার প্রকাশস্থল হল কেবল মুখ। মুসান্নিফ (রঃ) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে উপরোক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, شكر -এর متعلق হল কেবল নেয়ামত, আর مورد হল মুখ, হাত ও জিহবা।

☆☆☆

وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعَبِ الشُّكْرِ اَشْيَعُ لِلنِّعْمَةِ وَاَدَلُّ عَلٰى مَكَانِهَا لِخَفَاءِ الْاِعْتِقَادِ وَمَا فِيْ اٰدَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْاِحْتِمَالِ جُعِلَ رَأْسَ الشُّكْرِ وَالْعَمْدَةَ فِيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ مَنْ لَمْ يَحْمَدْهُ وَالذَّمُّ نَقِيْضُ الْحَمْدِ وَالْكُفْرَانُ نَقِيْضُ الشُّكْرِ

অনুবাদ:

যখন شكر -এর অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে حمد টা নেয়ামতকে অধিক প্রকাশ করে এবং নেয়ামতের অস্তিত্বের প্রতি অধিক ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, (شكر -এর অন্যান্য প্রকারের মধ্যে) অন্তরের বিশ্বাস গোপনীয় বিষয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিষ্টাচারের মধ্যে অন্যান্য সম্ভাবনাও রয়েছে, কাজেই রাসূল (সঃ) -এর বাণী- الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده -এর মধ্যেও حمد -কে شكر -এর শীর্ষাংশ বা সর্বোত্তম প্রকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ذم এটা حمد -এর বিপরীত। আর كفر হল شكر -এর বিপরীত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما ذا اراد المفسر العلام بالعبارة المذكورة

উত্তর ঃ قوله ولما كان الحمد الخ **-ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (রঃ) -এর উদ্দেশ্য:**

উল্লেখিত ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (রঃ) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্ন হল- ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ (রঃ) حمد ও شكر -এর মধ্যে عموم خصوص من وجه এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছেন। এই সম্পর্ক সাব্যস্ত করা ঠিক হয়নি। কেননা, عموم خصوص من وجه -এর অর্থ হল- حمد ও شكر -এর মধ্য হতে উভয়টি অন্যটির উপর পূর্ণরূপে কতক মিছালের মধ্যে সত্যায়িত হবে। অথচ রাসূল (সাঃ) -এর হাদীস- الحمد رأس الشكر (হামদ হল شكر -এর অংশ বা মাথা) এই হাদীসের মধ্যে حمد -কে شكر -এর অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, شكر একটি পূর্ণ দেহ আর حمد সেই দেহেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং এই দু'টির মধ্যে كل و جزء -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত হল। যখন كل و جزء -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত হল কাজেই যেভাবে كل (একটি পূর্ণ দেহ) তার جزء (অংশ) -এর মধ্যে সংকুলান হতে পারেনা, এমনিভাবে شكر টি-ও حمد এর উপর সত্যায়িত হতে পারবেনা। কাজেই عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেল। কেননা, من وجه -এর জন্য একটি مادہ اجتماعی জরুরী যার মাধ্যমে

উভয়টি পূর্ণভাবে অপরটির ক্ষেত্রে সত্যায়নকারী হয়। কিন্তু এখানে شكر পূর্ণভাবে حمد -এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারেনা। তাছাড়া হাদীসের অপর বাক্য ما شكر الله من لم يحمده -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, حمد -এর নফী হলে شكر -এর নফী হয়ে যায়, যা عموم خصوص من وجه -এর পরিপন্থী। কেননা, عموم خصوص من وجه -এর মধ্যে عام -এর নফী হলে خاص -এর নফী হওয়া অপরিহার্য হয়না। অবশ্য যদি উভয়টির মধ্যে عام خاص مطلق -এর সম্পর্ক অথবা تساوى -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করা হয় তাহলে حمد -এর নফী হলে شكر -এর নফী হতে পারে। কাজেই حمد ও شكر -এর মধ্যে হয়ত عموم خصوص مطلق কিংবা تساوى -এর সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক হতে পারেনা। সুতরাং মুসান্নিফ (রঃ) যে দাবী করেছিলেন যে, উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক হল عام خاص من وجه -এর সম্পর্ক তা বাতিল হয়ে গেল।

উত্তর: রাসূল (সাঃ) যে এখানে رأس الشكر বলেছেন যার দ্বারা حمد অংশ বা جزء হওয়া সাব্যস্ত হয়, এই جزء দ্বারা বাস্তবিক অংশ উদ্দেশ্য নয়; বরং جزء দ্বারা جزء ادعائى অর্থাৎ দাবির প্রেক্ষিতে 'অংশ' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে যে شكر -এর নফী করেছেন, এই নফীও প্রকৃত নফী নয়; বরং দাবির প্রেক্ষিতে নফী করা হয়েছে। অর্থাৎ حمد-তো মূলত شكر -এর অংশ নয় কিন্তু একটি কারণকে পুঁজি করে অংশ বলে দাবী করেছেন এবং حمد -এর অনুপস্থিতিকে شكر -এর অনুপস্থিতির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে রাসূল (সাঃ) যেকারণে حمد -কে شكر -এর অংশ হওয়ার দাবী করেছিলেন তার কারণ হল- شكر প্রায় তিন জিনিস দ্বারা- (১) لسان মুখের দ্বারা (২) قلب অন্তরের দ্বারা (৩) جوارح অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ-কর্ম দ্বারা। পক্ষান্তরে حمد কেবল لسان বা মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু حمد এটা شكر -এর বাকী দুই প্রকার তথা قلب ও جوارح -এর তুলনায় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে বেশী প্রকাশ করে। কেননা, অন্তর যেহেতু অদৃশ্য একটি অঙ্গ তাই অন্তরের মাধ্যমে যে শোকরিয়া জ্ঞাপন করা হবে তা-ও নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অন্তরের সাহায্যে যে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় তা কেবল কৃতজ্ঞ জ্ঞাপনকারী ব্যক্তিরই জানা থাকে, অন্য কেউ তা জানতে পারেনা। অনুরূপভাবে جوارح বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে শোকরিয়া জ্ঞাপনের মধ্যে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীতও অন্য বিষয়ের সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন- তোমাকে কেউ পুরস্কার দান করল তুমি তাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলে। উপস্থিত লোকেরা তোমার দাঁড়ানোকে যেভাবে আগন্তুক ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হিসেবে ধরে নিতে পারে অনুরূপ তারা একথাও বুঝতে পারে যে, তুমি তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করেছ তার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশায়। অথচ তোমার দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু সে তোমাকে দান করেছিল। বুঝা গেল, সম্মানার্থে তোমার দাঁড়ানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে নিশ্চত নয়; বরং অন্য সম্ভাবনাও রয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, মুখের দ্বারা শোকরিয়া জ্ঞাপন করা যেটাকে حمد-ও বলা হয় এটা যেভাবে পরিস্কারভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে شكر -এর বাকী দুই প্রকার সেভাবে প্রকাশ করতে পারেনা। তাই রাসূল (সাঃ) দাবীর প্রেক্ষিতে شكر لسانى তথা حمد -কে شكر -এর বিরাট অংশ বলেছেন।

وَرَفْعُهُ بِالْاِبْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ لِلّٰهِ وَاَصْلُهُ اَلنَّصْبُ وَقَدْ قُرِئَ بِه اِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ اِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلٰى عُمُوْمِ الْحَمْدِ وَثُبَاتِه لَهُ دُوْنَ تَجَدُّدِه وَحُدُوْثِه وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِىْ تُنْصَبُ بِاَفْعَالٍ مَضْمُوْمَةٍ لَاتَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا

অনুবাদ:

الحمد এটা مبتدا হওয়ার কারণে مرفوع । তার خبر হল لله । তবে الحمد -এর আসল হল منصوب হওয়া। আর نصب -এর একটি কেরাত পাওয়া যায়। তবে نصب হতে رفع -এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে সর্বব্যাপী ও স্থায়ী প্রশংসা বুঝায়। আর حمد সেই সব মাসদারের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উহ্য ফে'লের কারণে منصوب হয়, যেগুলোর সাথে উক্ত মাসদারগুলো সাধারণত ব্যবহৃত হয়না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: بين وجوه الاعراب لقوله تعالى الحمد

উত্তর : الحمد -এর মধ্যে দুই ধরনের اعراب হবে। ১. رفع ২. نصب । তবে نصب টি আসল। نصب থেকে رفع -এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

১. رفع হলে الحمد টি مبتدا হবে এবং لله জার ও মাজরুর متعلق হয়ে خبر ।

২. نصب হলে فعل محذوف -এর مفعول مطلق হবে। তখন মূল ইবারত হবে- نحمد الحمد لله । তাছাড়া مفعول به হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তখন ইবারত হবে- اقرؤا الحمد لله । তবে এই দুই اعراب হতে نصب টি হল আসল।

প্রশ্ন: الحمد টি منصوب হওয়া اصل কেন?

উত্তর: الحمد হল মাসদার, আর কখনো আরবী ইবারতের মধ্যে এমন হয় যে, মাসদারকে فعل -এর স্থানে রেখে তাকে শব্দ ও অর্থের বিচারে فعل -এর স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। যার কারণে فعل -কে হযফ করে দেয়া হয়। আর فعل -কে হযফ করার স্থান সম্পর্কে নাহুবিদগণ বর্ণনা করেন যে,যদি মাসদারের পর فعل -এর فاعل বা مفعول -কে اضافت হিসেবে অথবা حرف جر -এর সাথে উল্লেখ করা হয় এবং সেই مصدر টি نوع (ধরন) বুঝাতে না আসে তাহলে فعل -কে ফেলে দেয়া قياسا (নিয়মানুযায়ী) ওয়াজিব। الحمد لله -এর মধ্যেও এই কায়দা পওয়া গেছে, কেননা, এখানেও الله শব্দ যা حمد ফে'লের مفعول হয়েছে তাকে حمد -এর পর حرف جر -এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ফে'লকে হযফ করা জরুরী হয়েছে। এজন্য ফে'লকে ফেলে দিয়ে মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

نصب থেকে رفع -এর দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ:

الحمد মূলতঃ منصوب ছিল এবং الحمد لله বাক্যটি جمله فعليه ছিল। কিন্তু نصب থেকে رفع -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাকে جملہ اسميه -তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তার কারণ হল- الحمد -এর মধ্যে رفع দেয়া হয় جمله اسميه হিসাবে। আর جمله اسميه এটা عموم وثبوت কোন কাজ স্থায়ী ও সর্বব্যাপি হওয়া বুঝায়। তাই الحمد لله বাক্যকে جمله اسميه ধরা হলে স্থায়ী ও সর্বব্যাপি প্রশংসা

বুঝাবে। কিন্তু نصب -এর সূরতে এই অর্থ পাওয়া যায়না। কেননা, نصب -এর সূরতে منصوب -এর জন্য একটি نصب দাতা فعل -কে উহ্য মানতে হয়, আর উহ্য জিনিস উল্লেখের পর্যায়েই হয়ে থাকে। কাজেই এই نصب দাতা ফে'লও উল্লেখের মতই হবে। আর যখন উল্লেখের ন্যায় ভূমিকা রাখবে, তখন عموم و ثبوت -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে।

عموم -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে এ কারণে যে, ফে'ল এমন একটি فاعل -এর সাথে সম্পর্ক রাখে যা নির্দিষ্ট। কাজেই ব্যাপকতা হারিয়ে এখন সংক্ষিপ্ততায় চলে এসেছে। এ কারণে عموم -এর অর্থ পাওয়া যাবেনা। আর ثبوت -এর অর্থ বাদ পড়বে এ কারণে যে, ফে'ল নির্দিষ্ট কোন কালের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থায়িত্ব দূর হয়ে তাতে ক্ষণত্ব চলে এসেছে। এ কারণে ثبوت -এর অর্থও বাদ পড়ে যায়। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, যদি رفع পড়া হয় তাহলে এর মধ্যে বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু نصب পড়া হলে এই অর্থ পাওয়া যায়না। এ কারণেই نصب থেকে رفع -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

☆☆☆

وَالتَّعْرِيْفُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ اَنَّ الْحَمْدَ مَاهُوَ وَقِيْلَ لِلْاِسْتِغْرَاقِ اِذِ الْحَمْدُ فِي الْحَقِيْقَةِ كُلُّه لَهُ اِذْ مَا مِنْ خَيْرٍ اِلَّا وَهُوَ مُوْلِيْه بِوَاسِطٍ اَوْ غَيْرُ وَاسِطٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ﴾

অনুবাদ:

الحمد -এর মধ্যে لام تعريف এসেছে جنس (জাতীয়তা) বুঝাতে। কেননা, لام تعريف দ্বারা উদ্দেশ্য সেই حمد -এর দিকে ইঙ্গিত করা যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, حمد -এর حقيقت বা প্রকৃত রূপ কি। কেউ কেউ বলেন- الف لام এসেছে استغراق -এর জন্য। কেননা, حمد -এর প্রতিটি অংশই মূলত আল্লাহ তা'লার জন্য। কারণ, যে কোন কল্যাণের দাতা হলেন আল্লাহ তা'লা, মাধ্যম ধরে বা মাধ্যমবিহীন। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ "যেই নেয়ামতই তোমরা প্রাপ্ত হও তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।"

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله والتعريف فيه للجنس الخ

السوال: شرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর ঃ والتعريف فيه للجنس الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা:** উক্ত ইবারতের মধ্যে মুসান্নিফ (রঃ) الحمد -এর الف لام সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এসম্পর্কে তিনি দু'টি অভিমত উল্লেখ করেছেন। ১. جنسى ২. استغراقى । যদি الف لام টি جنسى হয় তাহলে الف لام দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে حمد -এর حقيقت কি তার দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য হবে। কেননা, الف لام جنسى বলা হয় সেই الف لام -কে যার দ্বারা সরাসরি কোন বস্তুর حقيقت -এর দিকে ইশারা করা হয়। আর استغراقى হলে অর্থ হবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত। কেননা, حمد বা প্রশংসা হয়ে থাকে সুন্দর ও ভাল কাজের

উপর। আর সকল ভাল কাজ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অবশ্য কোনটি সরাসরি আল্লাহর মাধ্যমে আর কোনটি গায়রুল্লাহের মাধ্যমে। কাজেই যতই প্রশংসা হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে।

☆☆☆

وَفِيْهِ اِشْعَارٌ بِأَنَّهُ تَعَالٰى حَيٌّ قَادِرٌ مُرِيْدٌ عَالِمٌ اِذِ الْحَمْدُ لَايَسْتَحِقُّهُ اِلَّا مَنْ كَانَ هٰذَا شَانُهُ

অনুবাদ:

الحمد لله-এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লা চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান, নিজ ইচ্ছাধীন কর্তা ও সর্বজ্ঞ। কেননা, حمد বা প্রশংসার উপযুক্ত সেই ব্যক্তিই হতে পারে যে এসব গুণের হকদার।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وفيه اشعار بانه الخ

السوال: شرح العبارة حق التشريح

উত্তর ঃ قوله وفيه اشعار بانه الخ : এখান থেকে علم عقائد সংক্রান্ত একটি মাসআলা আলোচনা করা হচ্ছে। মাসআলা হল- আল্লাহ তা'লা حى (চিরঞ্জীব), قادر (শক্তিমান), مريد (নিজ ইচ্ছাধীন) ও عالم (মহাজ্ঞানী)। কেননা, পূর্বেই حمد -এর উপযুক্ততা আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর প্রশংসার উপযুক্ত সেই ব্যক্তিই হতে পারে যার মধ্যে এই চারটি গুণ বিদ্যমান আছে। কেননা, حمد বলা হয় ঐচ্ছিক ভাল কাজের উপর প্রশংসা করা। আর ঐচ্ছিক ভাল কাজ সেই সত্তা থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে যে সেই কাজের শক্তি রাখে। অর্থাৎ কেউ কোন কাজ করতে তখনই ইচ্ছা করে যখন সে বুঝে যে, সে এই কাজ করতে সক্ষম হবে। কাজেই এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার قادر (শক্তিমান) ও مريد (নিজ ইচ্ছাধীন) হওয়া সাব্যস্ত হয়।

আর যেহেতু কোন কাজের ইচ্ছা তখনই করা হয় যখন পূর্ব থেকেই সে কাজের علم থাকে। এই কারণে আল্লাহ তা'লার عالم হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর যার মধ্যে জ্ঞানের যোগ্যতা রয়েছে তার মধ্যে حيات বা জীবনও থাকবে। কাজেই আল্লাহ তা'লা حى বা চিরঞ্জীবও হবেন।

☆☆☆

وَقُرِئَ اَلْحَمْدُ لُلِّهِ بِاِتْبَاعِ الدَّالِ اللَّامَ وَبِالْعَكْسِ تَنْزِيْلًا لَهُمَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ مَعًا مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

অনুবাদ:

الحمد لله (দাল ও লামে যের দিয়ে)ও পড়া হয়ে থাকে। "দাল"কে লামের অনুগামী করে। আবার বিপরীত তথা "লাম"-কে "দাল"-এর অনুগামী করে الحمد لله (দাল ও লামে পেশ দিয়ে)ও পড়া হয়ে থাকে। উভয়টাকে এক কালেমা ধরে। কেননা, উভয়টা (الحمد ও لله) একই সাথে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قراءة فى قوله الحمد لله

উত্তর ঃ الحمد لله -এর কেরাত:

قوله وقرئ الحمد لله الخ : মুসান্নিফ এখান থেকে الحمد لله -এর অপ্রসিদ্ধ দুই কেরাত সম্পর্কে আলোচনা করছেন। الحمد -এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কেরাতসহ মোট তিনটি কেরাত রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা গেল।

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ কেরাতটি প্রসিদ্ধ।

২. اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ অর্থাৎ الحمد -এর "দাল"-কে لله -এর "লাম"-এর অনুগামী করে "দাল"-এর মধ্যে যের পড়া হবে। এটা হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে।

২. اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ অর্থাৎ لام -কে دال -এর অনুগামী করে لام -কেও مضموم পড়া হবে।

প্রশ্ন জাগে যে, এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের অনুগামী ও تابع সেই সময়ই করা হয় যখন উভয় অক্ষর একই কালিমায় হয়। আর এখানে তো দুই কালিমা, কাজেই এক অক্ষর অন্য অক্ষরের تابع কিভাবে হবে?

উত্তর হল- যেহেতু الحمد ও لله উভয়টি একই সাথে ব্যবহৃত হয়। এজন্য উভয়টাকে একই কালিমা ধরে একটাকে অন্যটার تابع হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

☆☆☆

﴿رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

{যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক}

اَلرَّبُّ فِى الْاَصْلِ اَلتَّرْبِيَةُ وَهِىَ تَبْلِيْغُ الشَّئِ اِلٰى كَمَالِهٖ شَيْئًا فَشَيْئًا ثُمَّ وُصِفَ بِهٖ لِلْمُبَالَغَةِ كَالصَّوْمِ وَالْعَدْلِ وَقِيْلَ هُوَ نَعْتٌ مِنْ رَبَّهٗ يَرُبُّهٗ فَهُوَ رَبٌّ كَقَوْلِكَ نَمَّ يَنُمُّ فَهُوَ نَمٌّ ثُمَّ سُمِّىَ بِهِ الْمَالِكُ لِاَنَّهٗ يَحْفَظُ مَا يَمْلِكُهٗ وَيُرَبِّيْهِ وَلَا يُطْلَقُ عَلٰى غَيْرِهٖ تَعَالٰى اِلَّا مُقَيَّدًا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ﴾

অনুবাদ:

"সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক"। رب মূলত: تـــربيـــب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর تربيت বলা হয় কোন জিনিসকে ধীরে ধীরে পূর্ণতায় পৌছে দেয়া। অত:পর مبـالغه হিসেবে আল্লাহ তা'লার صفت বানিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন- صوم ও عدل। কেউ কেউ বলেন যে, এটা صفت - رب يرب فهو رب হতে উদগত। যেমন বলা হয় نم ينم فهو نم। অত:পর مالك -কেও رب নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, مـــالك তার মালিকানাধীন বস্তুর সংরক্ষণ করে থাকে। আর এটা আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে مقيد বা اضـــافت ব্যতীত ব্যবহৃত হয়না। যেমন- ارجـع الى ربك।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كلمة رب مصدر ام نعت وما ايضاح قوله ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل؟

উত্তর ঃ رب শব্দটি مـصـدر না نـعـت : এব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. رب শব্দটি মূলত: تـــربية যা مـــصـــدر -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর تـــربية অর্থ কোন জিনিসকে ধীরে ধীরে পূর্ণতায় পৌছানো। ২. رب শব্দটি نعت তথা صـفـت مشتقه আর صـفة مشتقه হওয়ার সূরতে اسـم فاعل এবং صـفـت مشبـه উভয়টি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাই কাশশাফ (রঃ) -এর অভিমত হল, رب টি صـفـت مشبه আর মুহাক্বিক্ব উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, رب টি اسم فاعل। মূলতঃ رَابٌّ ছিল।

উভয় অভিমতের উপর প্রশ্ন জাগে। مـــصـــدر হওয়ার সূরতে প্রশ্ন হল- رب মাসদারটি কেমন করে ذات তথা আল্লাহর صفت হল। কেননা, مصدر কোন ذات -এর صفت হতে পরেনা।

এর উত্তর হল- এখানে مبـالغه হিসেবে مصدر -কে ذات -এর صفت বানিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন নাকি صوم ও عدل -কে ذات -এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে مبـالـغه হিসেবে এবং বলা হয়ে থাকে زيد صوم / زيد عدل।

رب টি صفت مشبه হওয়ার সূরতে প্রশ্ন হল- رب এটা متعدى আর صـفـت مشبـه মুতাআদ্দী থেকে গঠিত হয়না; বরং সর্বদা لازم থেকে গঠিত হয়।

এর উত্তর হল- কোন কোন ক্ষেত্রে متـعـدى -কে لازم -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়ে থাকে।এখানেও رب শব্দকে بــاب كـــرم -এর দিকে স্থানান্তরিত করে لازم -এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাই رب এটা

صفت مشبه হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

قوله ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- رب এটা যদি مصدر হয় তাহলে رب টি الله শব্দের صفت হয় কিভাবে। কেননা, مصدر টি ذات -এর صفت হতে পারেনা।

এর উত্তর হল- مصدر টি ذات -এর صفت হতে পারেনা কথাটি একেবারে সঠিক। কিন্তু কোন কোন সময় مبالغه হিসেবে مصدر -কে ذات -এর صفت বানিয়ে নেয়া হয়। যেমন- زيد صوم / زيد عدل -এর মধ্যে صوم ও عدل মাসদারদ্বয়কে مبالغه হিসেবে ذات তথা زيد -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানেও مبالغه হিসেবে رب মাসদারকে الله -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله ثم سمي به المالك........الى ربك : অর্থাৎ رب বা প্রতিপালনকারী থেকে মালিককেও رب বলা হয়। কেননা, মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুকে হেফাজত করে এবং তার প্রতিপালন করে। তবে اضافت -এর সূরত ব্যতীত رب শব্দ গায়রুল্লাহের জন্য ব্যবহৃত হয়না। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশার দূতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- ارجع الى ربك । এখানে رب -কে ك যমীরের দিকে اضافت করা হয়েছে।

☆☆☆

وَالْعَالَمُ اِسْمٌ لِمَا يُعْلَمُ بِه كَالْخَاتَمِ وَالْقَالَبِ غُلِّبَ فِيْمَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ وَهُوَ كُلُّ مَا سَوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ فَاِنَّهُمَا لِاِمْكَانِهَا وَافْتِقَارِهَا اِلٰى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ تَدُلُّ عَلٰى وُجُوْدِه اِنَّمَا جَمَعَهُ لِيَشْمُلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْاَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَغُلِّبَ الْعُقَلَاءُ مِنْهُمْ فَجَمَعَهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ كَسَائِرِ اَوْصَافِهِمْ وَقِيْلَ اِسْمٌ وُضِعَ لِذَوِى الْعِلْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ وَتَنَاوُلُهُ لِغَيْرِهِمْ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِتْبَاعِ وَقِيْلَ عَنٰى بِه النَّاسَ هٰهُنَا فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مِنْهُمْ عَالَمٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلٰى نَظَائِرِ مَا فِى الْعَالَمِ الْكَبِيْرِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ يُعْلَمُ بِه الصَّانِعُ كَمَا يُعْلَمُ بِمَا اَبْدَعَهُ فِى الْعَالَمِ وَلِذَالِكَ سَوّٰى بَيْنَ النَّظْرِ فِيْهِمَا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ﴿ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَاتُبْصِرُوْنَ ﴾

অনুবাদ:

عالم হল সেই বস্তুর নাম যার মাধ্যমে কোন জিনিসের জ্ঞান লাভ হয়। যেমন- خاتم (সীলমোহর বা মোহরাঙ্কনের মাধ্যম) এবং قالب (ছাঁচের মাধ্যম)। عالم বিশেষভাবে এমন সব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে জানা যায়। আর আল্লাহ তা'লা ব্যতীত সকল মৌলিক ও যৌগিক বস্তু হল عالم । কেননা, এসকল বস্তুর সৃষ্টি হওয়া এবং অপরিহার্য স্রষ্টার দিকে মুখাপেক্ষি হওয়া তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। عالم -কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে যেন

عــــالـم -এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার جـــنـــس -কে শামিল করে নেয় এবং তাদের মধ্য হতে জ্ঞানসম্পন্নদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাজেই عـالـم -কে يـاء - نون দ্বারা বহুবচন আনা হয়েছে তাদের অন্যান্য সকল গুণাবলীর মত। কেউ কেউ বলেন عـــالـم হল এমন ইসম যা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী তথা ফেরেশতা, জ্বিন মানুষদের জন্য গঠিত হয়েছে। আর এদের ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীগুলোকে শামিল করেছে অধীন হিসেবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, عـــــالـــم দ্বারা এখানে মানুষ উদ্দেশ্য। কেননা, প্রতিটি মানুষ একটি 'জগত' এ হিসেবে যে, বিশাল জগতে যেসব মৌলিক ও যৌগিক বস্তু রয়েছে মানুষ তার দৃষ্টান্তের উপর ব্যাপৃত। (কেননা) মানুষের সাহায্যে স্রষ্টাকে জনা যায়। যেমন নাকি জগতের নব আবিষ্কৃত বিষয় দ্বারা স্রষ্টকে জানা যায়। একারণেই সৃষ্টিজগত ও মানুষের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করাকে সমানভাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লা বলেছেন- "আর তোমাদের মাঝেও নিদর্শন রয়েছে তোমরা কি তা অবলোকন করনা।"

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى العالم؟ وما وجه تسمية به؟ ولم ذكر بلفظ الجمع؟
وفاق المدارس: ١٥، ١٨، ٢٣، ٢٤ هجرى

উত্তর ঃ عالم শব্দের অর্থ:

মুসান্নিফ (রঃ) عالم -এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, عالم দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এসম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। (১) আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত মাখলুকাত (২) কেবল জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী তথা জ্বিন, মানুষ ও ফেরেশতা।

প্রথম অভিমত ঃ عـالـم শব্দটি فـاعل -এর ওযনে اسـم الله -এর সীগাহ। আর اسـم الله -এর সীগাহ যেভাবে مفعل ও مفعال -এর ওযনে আসে এমনিভাবে فاعل -এর ওযনেও আসে।

عالم এটা علم থেকে নির্গত। এর অর্থ হল- ما يعلم به الشئ তথা যার মাধ্যমে কোন জিনিসের জ্ঞার লাভ হয়। যেমনিভাবে خـــاتـم শব্দ মোহরাঙ্কিত করার মাধ্যম এবং قـــالـب শব্দ পাল্টানোর মাধ্যম বা হাতিয়ার, এমনিভাবে عـالـم-ও জানার মাধ্যম। পরে প্রাধান্যতার ভিত্তিতে সেইসব جـــنـــس -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান লাভ হয়। কেননা, এসকল বস্তুর সৃষ্ট হওয়া এবং অপরিহার্য স্রষ্টার দিকে মুখাপেক্ষি হওয়া তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

عـــالـم শব্দকে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ: এখানে প্রশ্ন হল যে, عـالـم বলতে সমস্ত সৃষ্টিকুল বুঝায় তাই عـــالـم শব্দকে একবচন ব্যবহার করলেই চলবে। অথচ এখানে عـالـم শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন হিসাবে। তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- একবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে যদিও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়, তারপরও এর মধ্যে বিপরীত উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রয়ে যায় যে, عـالـم -এর ব্যবহার যেহেতু এক جـنـس -এর ক্ষেত্রেও রয়েছে যেমন, عـالـم انسان (মানবজাতি)। কাজেই যদি عـالـم -কে একবচন ব্যবহার করা হত এবং তার উপর الف ولام প্রবিষ্ট করা হত তাহলে এই আশঙ্কা হত যে, এক جـــنـــس -এর সমস্ত افـراد -এর উপর প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অথচ বাস্তবে উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রকার ও সকল جـنـس -এর সকল افراد -এর উপর প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা।

মোটকথা, যদি عـالم -কে একবচন ব্যবহার করা হত তাহলে সুনিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্য হাসিল হতনা; বরং অন্য কিছুর সম্ভাবনাও থেকে যেত। তাই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হল যে, واو - نون বা يا -نون দ্বারা কোন শব্দের বহুবচন আনতে হলে শব্দটি ذوی العقول (জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী) -এর صفت বা علم হতে হবে। যেমন সিফাত হয়েছে তার উদাহরণ- ضاربون । আর علم হয়েছে তার উদাহরণ- زيدون ।

আর এখানে عـالمين শব্দটি ذوی العقول- এর সরাসরি সিফাতও না আবার ذوی العقول -এর علمও নয়; বরং ذوی العقول ও غير ذوی العقول সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তারপরও يان - نون দ্বারা বহুবচন কিভাবে আনা হলো?

উত্তর হল- এখানে يا - نون দ্বারা বহুবচন ব্যবহার করে ذوی العقول- কে غير ذوی العقول -এর উপর তাদের সম্মানের কারণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেমনিভাবে ذوی الـعـقـول -এর অন্যান্য সিফাতের বহুবচন واو نون দ্বারা আনা হয়, এমনিভাবে عالم -এরও বহুবচন আনা হয়েছে واو نون দ্বারা।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ عـــالـم শব্দ দ্বারা জ্ঞানস্পন্ন প্রাণী তথা জ্বিন, ইনসান ও ফেরেশতা উদ্দেশ্য। তবে জ্ঞানহীন প্রাণীকেও আবশ্যকীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, যখন আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী (যা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) এর প্রভূ কাজেই যা নিকৃষ্ট বা কম মর্যাদা রাখে তার প্রভু তো আরো আগেই হবেন। তবে প্রশংসার ক্ষেত্রে যেহেতু ভালকেই উল্লেখ করা হয় এজন্য আশরাফুল মাখলুকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর আরযালুল মাখলুকাতকে উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয় অভিমত ঃ এখানে عـالم দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষ। কেননা, মানুষের মধ্যে প্রত্যেকটি فرد হল এক একটি عالم । আর মানুষ হল ছোট عالم । আর দুনিয়া হল বড় عالم । কেননা, দুনিয়ার সকল বস্তুর নমুনা মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় আছে, মানুষের মধ্যেও তার নমুনা হিসেবে হাড় আছে। সমুদ্রের নমুনা হল মানুষের চক্ষু, বৃষ্টির নমুনা হল তার ঘাম। একারণেই সৃষ্টিজগত ও মানুষের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করাকে সমানভাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লা বলেছেন- "আর তোমাদের মাঝেও নিদর্শন রয়েছে তোমরা কি তা অবলোকন কর না।"

☆☆☆

وَقُـرِئَ رَبَّ الْـعَـالَـمِيْنَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَدْحِ اَوِ النِّدَاءِ اَوِ الْفِعْلِ الَّذِىْ دَلَّ عَلَيْهِ الْـحَـمْدُ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْمُمْكِنَاتِ كَمَا هِيَ مُفْتَقِرَةٌ اِلَى الْمُحْدِثِ حَالَ حُدُوْثِهَا فَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ اِلَى الْمُبْقِيْ حَالَ بَقَائِهَا

অনুবাদ:

আর نصب দিয়ে رَبَّ الْـعَالَمِيْنَ ও পড়া হয়ে থাকে مدح (তথা امدح ফে'লের مفعول به) হিসাবে অথবা نداء হিসেবে অথবা এমন ফে'লের কারণে যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে حمد শব্দটি। এ আয়াতে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, সকল সম্ভাব্য বস্তু যেমনিভাবে স্বীয় অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে এক অস্তিত্ব দানকারীর মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ টিকে থাকার জন্য একজন স্থায়ীত্ব দানকারীর দিকে মুখাপেক্ষী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال :(الف) كم وجها للاعرّاب فى رب العالمين؟
(ب) اوضح قول المفسر العلام وفيه دليل على ان الممكنات كما هو مفتقرة الخ

উত্তর ঃ رب العالمين শব্দের اعراب দুই রকম। যথা-

(১) আল্লাহ শব্দের সিফাত হিসেবে مجرور। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দ মাওসূফ, আর رب العلمين মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে সিফাত। মাওসূফ যেহেতু مجرور কাজেই সিফাতও مجرور হবে। কেননা, صفت ও موصوف-এর মাঝে اعراب-এর দিক থেকেও মিল থাকা জরুরী।

(২) رب শব্দ منصوب হবে। منصوب পড়া হবে তিন কারণে।

(ক) مدح হিসেবে অর্থাৎ امدح ফে'লকে উহ্য মেনে তার مفعول মেনে منصوب পড়া হবে। যেমন- اَمْدَحُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

(খ) حرف نداء-কে উহ্য মেনে منصوب পড়া হবে। যেহেতু حرف نداء-এর منادى টি مضاف হলে منصوب হয়ে থাকে কাজেই এখানেও منصوب হবে।

(গ) حمد যে ফে'লের উপর دلالت করে সেই ফে'লের মাধ্যমে منصوب হবে। যেমন- نَحْمَدُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ।

(ب) اوضح قول المفسر العلام وفيه دليل على ان الممكنات كما هو مفتقرة الخ

উত্তর ঃ قوله وفيه دليل على ان الممكنات.....الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইলমে আকাইদ সংক্রান্ত একটি আলোচনা শুরু করছেন। আলোচনাটি হল- رب العالمين এ আয়াতটি একথার প্রমাণ যে, যেভাবে পৃথিবীর সকল সম্ভাব্য বস্তু সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে একজন সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হয়, এমনিভাবে ঐ বস্তুগুলো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একজন অস্তিত্ব রক্ষাকারীরও মুখাপেক্ষী। কেননা, আল্লাহ তা'লা সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। আর প্রতিপালক হওয়াকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর বস্তু সমূহের প্রতিপালন এভাবেই হতে পারে যে, সেগুলোকে পতন ও সজ্ঘাত থেকে সংরক্ষণ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলিপিতে লিখিত ভাগ্য পূর্ণতায় পৌঁছে যাবে। আর পতন ও সংঘাত হতে সংরক্ষিত থাকার নামই হচ্ছে অস্তিত্ব টিকে থাকা। সুতরাং আল্লাহ তা'লা যখন প্রতিপালক হওয়ার বিষয়টি নিজের জন্য সাব্যস্ত করলেন কাজেই রক্ষকারীর বিষয়টিও এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সমস্ত সম্ভাব্য বস্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় আল্লাহ তা'লার মুখাপেক্ষী।

☆☆☆

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

{ যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু }

كَرَّرَهُ لِلتَّعْلِيْلِ عَلٰى مَا سَنَذْكُرُهُ

অনুবাদ:

﴿ الرحمن الرحيم ﴾ (যিনি দয়াময়, করুনাময়) এই আয়াতটিকে حمد -এর যোগ্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে আনা হয়েছে। যার বর্ণনা আমরা অচিরেই করব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اشرح قول المفسر العلام ـ كرره للتعليل على ما سنذكره

উত্তর ঃ قوله كرره للتعليل على ما سنذكره **ইবারতের ব্যাখ্যা:** যারা بسم الله -কে ফাতেহার অংশ মানেন না তারা الرحمن الرحيم -এর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চান যে, যদি بسم الله -কে সূরা ফাতেহার অংশ ধরা হয়, তাহলে بسم الله -এর মধ্যে الرحمن الرحيم উল্লেখ করার পর আবার ফাতেহায় الرحمن الرحيم -কে উল্লেখ করার দ্বারা تكرار (ডাবল উল্লেখ করা) আবশ্যক হয়। আর تكرار তো সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে, কাজেই بسم الله সূরা ফাতেহার অংশ হবে না।

তবে কাযী বায়যাবী (র.) যেহেতু শাফেয়ী মতাবলম্বী, এজন্য তিনি بسم الله -কে সূরা ফাতেহার অংশ ধরেই الحمد لله -এর মধ্যে الرحمن الرحيم -কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এখানে تكرار -এর কারণে সৌন্দর্য বিনষ্ট হবেনা; বরং এখানে তাকরার এজন্য করা হয়েছে যে, এই الرحمن الرحيم এটা علت বর্ণনা করেছে। কেননা, এখানে الرحمن الرحيم হল استحقاق حمد -এর علت (কারণ)। আর কোন وصف -এর কারণে যদি কোন হুকুম লাগানো হয় তাহলে সেই وصف টি হুকুমের জন্য علت বা কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং الرحمن الرحيم হল وصف ও علت আর হুকুম হল استحقاق حمد (প্রশংসার উপযুক্ততা)। কাজেই الرحمن الرحيم -কে পুনরুল্লেখ করা দূষণীয় হয়নি।

☆☆☆

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾

{ যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক }

قَرَأَهُ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوْبُ وَيَعْضُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى: يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. وَقَرَأَ الْبَاقُوْنَ: مَلِكِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِاَنَّهُ قِرَاءَةُ اَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. وَلِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَالْمَالِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْاَعْيَانِ الْمَمْلُوْكَةِ كَيْفَ شَاءَ مِنَ الْمِلْكِ وَالْمَلِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي

اَلْمَـاْمُوْرِيْنَ مِنَ الْمُلْكِ وَقُرِئَ مَلْكِ بِالتَّخْفِيْفِ وَمَلَكَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ وِمَالِكًا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَـدْحِ اَوِ الْحَالِ وَمَالِكٌ بِالرَّفْعِ مُنَوَّنًا اَوْ مُضَافًا عَلَى اَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ وَمَلِكُ مُضَافًا بِالرَّفْعِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ

অনুবাদ:

"যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক"। ক্বারী আসেম, কাসায়ী ও ইয়াকুব مَـــــالِكِ পড়েছেন। এ মতের সমর্থন করে আল্লাহ তা'লার বাণী- يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله । আর অন্যনান্য ক্বারীগণ مَـلِكِ পড়েছেন। আর এটাই হল উত্তম বা পছন্দনীয় মত। কেননা, মক্কা-মদীনার অধিবাসীগণের ক্বেরাত এটা। তাছাড়া আল্লাহ তা'লার বাণী রয়েছে- لمن الملك اليوم (আজ কর্তৃত্ব কার?)। আর এর মধ্যে আল্লাহ তা'লার প্রতি সম্মানের বিষয় রয়েছে। مـــــالك বলা হয় যিনি নিজ আয়ত্তাধীন বস্তুতে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করেন। এটা مِـلْكٌ হতে নির্গত। আর مُـلْكٌ হতে নির্গত مَـلِكٌ বলা হয় নিজের আদেশপ্রাপ্তদেরকে আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরিচালনা করেন। আর কেউ কেউ সহজ করে مَلْكٌ পড়েছেন এবং فعل ماضى -এর ওযনে مَلَكَও পড়েছেন। কেউ কেউ مدح ও حال -এর উপর ভিত্তি করে نصب দিয়ে مـالكا পড়েছেন। আবার কেউ কেউ উহ্য مبتداء -এর خبر হিসেবে رفع -এর সাথে مَالِكٌ পড়েছেন তানভীন দিয়ে বা اضافت করে। আর اضافت করে رفع ও نصب দিয়ে مَلِكَ পড়েছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قرائة فى مالك يوم الدين؟ هاتوا كل قرائة بالوضاحة وما هو المختار عند البيضاوى

উত্তর ঃ مالك يوم الدين -এর মধ্যে সর্বমোট ক্বেরাত নয়টি। যথা-

(১) مَالِكِ يومِ الدين এটা ক্বারী আসেম, কাসায়ী ও ইয়াকুবের মতে।

(২) مَلِكِ يومِ الدين কাযী বায়যাবী (র.) -এর নিকট এ ক্বেরাতটি পছন্দনীয়।

(৩) مَلْكِ يومِ الدين (লামের সুকুন দিয়ে)।

(৪) مَـلَكَ يَـوْمَ الدِّيْنِ (ফে'লে مـاضى -এর ওযনে। তখন يوم টি مـفعول হিসেবে منصوب হবে)।

(৫) مَالِكًا يومَ الدين (مالك -কে نصب দিয়ে امدح উহ্য ফে'লের مفعول হিসেবে অথবা لفظ الله থেকে حال হিসেবে)।

(৬) مالكٌ يومَ الدين (كاف -এর رفع দিয়ে তানভীন সহকারে)।

(৭) مالكُ يوم الدين (كاف -এর رفع দিয়ে اضافت করে)।

(৮) مَلِكُ يومِ الدين (مالك -এর আলিফ বাদ দিয়ে اضافت সহকারে رفع দিয়ে)।

উল্লেখ্য যে, مالك -কে رفع দিয়ে পড়লে هو উহ্য مبتداء -এর خبر হবে।

(৯) مَلِكَ يوم الدين (ملك -কে لفظ الله হতে حال বানিয়ে منصوب পড়া হবে)।

☆☆☆

﴿يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَمِنْهُ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ وَبَيْتُ الْحَمَاسَةِ -
وَلَمْ يَبْقَ سِوٰى الْعُدْوَا ☆ ن دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوْا.

অনুবাদ:

يوم الدين অর্থ প্রতিদান দিবস। এ অর্থ থেকেই كما تدين تدان (যেমন কর্ম তেমন ফল) ব্যবহৃত হয়। হামাসা কবির পংক্তি- ولم يبق......الخ (তরজমা বিশ্লেষণে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى الدين وما المراد ههنا؟ اكتب موضحة

(ب) ولم يبق سوى العدوا ☆ ن دناهم كما دانوا. لمن هذا الشعر وما معناه وعلام استشهد به المفسر العلام؟

উত্তর ঃ মুসান্নিফ (র.) دين শব্দের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

(১) দ্বীন অর্থ প্রতিদান। অতএব يوم الدين -এর অর্থ হবে প্রতিদান দিবস।

(২) দ্বীন অর্থ শরীয়ত। অতএব يوم الدين -এর অর্থ হবে শরীয়ত দিবস।

(৩) দ্বীন অর্থ আনুগত্যতা। এ হিসেবে يوم الدين -এর অর্থ হবে আনুগত্যতা দিবস। এখানে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য।

ولم يبق سوى العدوا ☆ ن دناهم كما دانوا

কবির নাম: এ কবিতার কবি হলেন سهل بن شيبان الزماني । পূর্ণ কবিতাটি নিম্নরূপ-

فلما صرح الشر وامسى وهو عريان

ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا

তরজমা: যখন সে অনিষ্টতা পূর্ণরূপে প্রকাশ করল এবং অন্যায় ও অনাচার ব্যতীত কোন কিছু বাকী থাকলনা, তখন আমরা তাকে এমনই প্রতিদান দিয়েছি যেমনটি সে আমাদের সাথে করেছে।

محل استشهاد ঃ মুসান্নিফ (র.) دين শব্দের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম অর্থ হল প্রতিদান। এ অর্থের উপর প্রমাণ হিসেবে তিনি উল্লেখিত কবিতা পেশ করেছেন। এ কবিতায় دناهم كما دانوا হল محل استشهاد । এর অর্থ হল- جزيناهم كما فعلوا । কাজেই دين -এর এক অর্থ হল প্রতিদান।

اَضَافَ اِسْمَ الْفَاعِلِ اِلَى الظَّرْفِ اِجْرَاءً لَهٗ مَجْرَى الْمَفْعُوْلِ بِه عَلَى الْاِتِّسَاعِ كَقَوْلِهِمْ: يَا سَارِقَةَ اللَّيْلَةِ اَهْلَ الدَّارِ. وَمَعْنَاهُ مَلَكَ الْاُمُوْرَ يَوْمَ الدِّيْنِ عَلٰى طَرِيْقَةِ وَنَادٰى بِاَصْحَابِ الْجَنَّةِ. اَوْ لَهُ الْمُلْكُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِمْرَارِ لِتَكُوْنَ الْاِضَافَةُ حَقِيْقِيَّةً مُعِدَّةً لِوُقُوْعِه صِفَةً لِلْمَعْرِفَةِ

وَقِيْلَ اَلدِّيْنُ: اَلشَّرِيْعَةُ وَقِيْلَ: اَلطَّاعَةُ وَالْمَعْنٰى : يَوْمُ جَزَاءِ الدِّيْنِ

অনুবাদ:

اسم فاعل তথা مالك -কে- ظرف তথা يوم -এর দিকে اضافت করা হয়েছে ব্যাপকতার ভিত্তিতে مفعول به -কে- ظرف -এর স্থলাভিষিক্ত করে। যেমন– আরবদের ভাষ্য, "হে রাতের অন্ধকারে ঘরের অধিবাসীদের সম্পদ অপহরণকারী!"। আর তখন অর্থ হবে– আল্লাহ তা'লা প্রতিদান দিবসে সকল কিছুর মালিক ونادى اصحاب الجنة এই আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী। অথবা অর্থ হবে– সেদিন আল্লাহর জন্য হবে চিরস্থায়ী রাজত্ব। (এ অর্থ এজন্য নেয়া হবে) যেন اضافت টি حقيق তথা اضافت معنوى হয়, যা معرفه -এর صفت হওয়ার জন্য সহায়ক।

কেউ কেউ বলেছেন যে, دين অর্থ শরীয়ত আর কেউ কেউ বলেছেন, دين অর্থ اطاعت বা ইবাদত। (এই উভয় সূরতে) অর্থ হবে– শরীয়ত ও আনুগত্যের পুরস্কারের দিন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح قول القاضى : اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء ......اهل الدار

উত্তর ঃ قوله اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء ......اهل الدار **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি বুঝার আগে দু'টি কথা জেনে নিন। (ক) موصوف وصفت -এর মাঝে تعريف وتنكير -এর দিক দিয়ে মিল থাকা জরুরী। অর্থাৎ موصوف টি معرفه হলে صفت ও معرفه হতে হবে, আর موصوف টি نكره হলে صفت ও نكره হতে হবে। (খ) اضافت দুই প্রকার: اضافت لفظى ও اضافت معنوى ।

اضافت معنوى -এর সূরতে যদি مضاف اليه টি معرفه হয় তাহলে এই اضافت -এর মাধ্যমে مضاف ও معرفه হয়ে যায়। আর مضاف اليه টি نكره হলে এই اضافت দ্বারা مضاف -এর মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে اضافت لفظى টি تعريف و تنكير -এর ফায়দা দেয়না। অর্থাৎ مضاف اليه টি معرفه বা نكره যাই হোক না কেন مضاف টি نكره -ই থেকে যায়।

এখন প্রশ্ন হল– مالك يوم الدين এই আয়াতটি الله শব্দের সিফাত হয়েছে, আর الله শব্দ علم হওয়ার দরুন معرفه । কিন্তু তার সিফাত হল نكره । কেননা, يوم الدين -এর দিকে مالك -এর اضافت টি হল اضافت لفظى যা تعريف و تنكير কোনটিরই ফায়দা দেয়না। সুতরাং الله শব্দ ও مالك يوم الدين এই موصوف و صفت -এর মাঝে সামঞ্জস্যতা পাওয়া গেল না। অথচ এ দুইয়ের মাঝে সমঞ্জস্য বিধান জরুরী?

এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর রয়েছে। ১ম উত্তর হল– يوم -এর দিকে مالك -এর اضافت -কে

لفظی সাব্যস্ত করে আপনার প্রশ্ন উত্থাপনই সঠিক হয়নি। কেননা, এখানে اضافت لفظی পাওয়া যায়নি। কারণ, اضافت لفظی বলা হয় صفت -এর সীগাহ তার معمول -এর দিকে مضاف হওয়া। এখানে مالك হল সিফাতের সীগাহ। কিন্তু এই صيغه صفت -এর আসল معمول হল امور শব্দটি। আর এই আসল معمول -কে ফেলে দিয়ে يوم যা ظرف -এর অর্থ দেয় একে توسعا (ব্যাপকতা বুঝানোর উদ্দেশ্যে) مفعول به তথা امور শব্দের স্থলাভিষিক্ত করে مالك -কে তার দিকে اضافت করা হয়েছে। অনুরূপভাবে مالك -এর আসল ইবারত হবে– مالك الامور يوم الدين কিন্তু যখন তাতে وسعت দেয়া হয়েছে, এখন يوم -কে مملوك অর্থে নেয়া হয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে আসল معمول উল্লেখ নেই, আর اضافت মূল معمول -এর দিকেও হয়নি; বরং যা معمول নয় তার দিকে হয়েছে। আর غير معمول -এর দিকে اضافت হলে তাকে اضافت معنوى বলা হয়। আর اضافت معنوى টি -এর সূরতে مضاف اليه টি معرفه হলে مضاف টি معرفه হয়ে যায়। কাজেই اضافت দ্বারা مالك টি معرفه হয়ে যাবে এবং موصوف و صفت -এর মাঝে সমঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে।

২য় উত্তর হল– যদি বলা হয় যে, এখানে আসল معمول বা مفعول به উহ্য নেই; বরং يوم -ই হল আসল معمول ও مفعول به। তাহলে আমরা বলব যে, এখানে اسم فاعل অর্থাৎ مالك শব্দটি عمل -ই করেনি, معمول ও غير معمول -এর আলাপ তো অনেক দূরের বিষয়। কেননা, اسم فاعل -এর আমল করার জন্য শর্ত হল, সেটি حال বা استقبال -এর অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। কিন্তু مالك শব্দটি حال বা استقبال -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছেনা; বরং হয়ত ماضى -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা دوام و استمرار -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদি ماضى -এর অর্থে ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে– ملك الامور يوم الدين অর্থাৎ তিনি প্রতিদান দিবসে সকল কিছুর মালিক হয়েছেন। যেহেতু ماضى সুনিশ্চিতরূপে কোন জিনিস সাব্যস্ত হওয়াকে বুঝায়, আর আল্লাহ তা'লার প্রতিদান দিবসে মালিক হওয়াও সুনিশ্চিত। কাজেই مستقبل -এর অর্থে ব্যবহৃত اسم فاعل -কে ماضى -এর অর্থের স্থলাভিষিক্ত করে নেয়া হয়েছে, যাতে مستقبل টি সুনিশ্চিতের অর্থ দিতে পারে। যেমনিভাবে ونادى اصحاب الجنة -এর মধ্যে نادى হল فعل ماضى। এটা উপরোল্লেখিত কায়দানুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যদি دوام و استمرار -এর অর্থ দেয়, তাহলে ইবারত হবে– له الملك فى يوم الجزاء على وجه الاستمرار! (প্রতিদান দিবসে আল্লাহ তা'লার জন্য স্থায়ীভাবে মালিকানা বিদিত)। এই সূরতেও مالك -এর মধ্যে اسم فاعل -এর শর্ত পাওয়া যাচ্ছেনা। যখন উভয় সূরতেই اسم فاعل -এর শর্ত পাওয়া যাচ্ছেনা কাজেই مالك টি তার আসল معمول -এর দিকে مضاف হবেনা। আর যখন আসল معمول -এর দিকে مضاف হচ্ছেনা কাজেই يوم -এর দিকে مالك -এর اضافت টি اضافت لفظى না হয়ে اضافت معنوى হবে, যা تعريف -এর ফায়দা দেয়। কাজেই اضافت দ্বারা مالك টি معرفه হয়ে যাবে এবং موصوف و صفت -এর মাঝে সমঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে। فلا اشكال فيه

وَتَخْصِيْصُ الْيَوْمِ بِالْإِضَافَةِ إِمَّا لِتَعْظِيْمِه اَوْ لِتَفَرُّدِه تَعَالٰى بِنُفُوْذِ الْاَمْرِ فِيْه

অনুবাদ:

اضـافـت -এর মাধ্যমে يـوم -কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে। অথবা একারণে যে, সেদিন এককভাবে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح قول المصنف : وتخصيص اليوم بالاضافة اما لتعظيمه الخ

উত্তর ঃ قـولـه وتـخـصـيـص الـيـوم بـالاضافة اما لتعظيمه الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা:** এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল– আল্লাহ তা'লার মালিকানা তো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তারপরও স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠাকে বিশেষ করে আখেরাত দিবসের সাথে কেন খাছ করলেন?

এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর–

১. আখেরাত দিবস হল নিজের অবস্থা ও পরিস্থিতির দরুন অত্যন্ত বড় ও গুরুত্ববহ একটি দিবস। কাজেই মালিকানাকে আখেরাত দিবসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে মালিকানাও বড় ও মহান জিনিসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. আখেরাত দিবসের সাথে মালিকানাকে এজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সবকিছুর মালিকানা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'লার জন্যই প্রমাণিত। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষও দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক। কাজেই এক্ষেত্রে মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও সন্দিহান থেকে যায়। পক্ষান্তরে আখেরাতে মালিকানা প্রকৃতভাবে ও সাধারণ দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য প্রতিষ্ঠিত, অন্য কেউ সেই দিবসের মালিকানায় শরীক হওয়ার সন্দেহ নেই। কেবল এক আল্লাহ তা'লার জন্য। এই একত্বকে বুঝানোর জন্যেই মালিকানার সম্বন্ধ বিশেষভাবে আখেরাত দিবসের দিকেই করা হয়েছে।

☆☆☆

وَاِجْرَاءِ هٰذِهِ الْاَوْصَافِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لِكَوْنِهِ مُوْجِدًا لِلْعَالَمِيْنَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَاٰجِلِهَا مَالِكًا لِاُمُوْرِهِمْ يَوْمَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِلدِّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْحَقِيْقُ بِالْحَمْدِ لَا اَحَدٌ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ لَايَسْتَحِقُّهُ عَلٰى الْحَقِيْقَةِ سِوَاهُ فَاِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَتِهِ لَهُ وَالْاِشْعَارُ مِنْ طَرِيْقِ الْمَفْهُوْمِ عَلٰى اَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَايَسْتَاْهِلُ لِاَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ اَنْ يُعْبَدَ لِيَكُوْنَ دَلِيْلًا عَلٰى مَا بَعْدَهُ

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলী তথা অল্লাহ তা'লা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা হওয়া, তাদের প্রতিপালক হওয়া, তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, নগদ-বাকি সকল নেয়ামতের দাতা হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তির দিবসে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মালিক হওয়া, এসবের প্রয়োগ করা হয়েছে একথা বুঝাতে যে, তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত, তাঁর থেকে কেউ অধিক প্রশংসার উপযুক্ত নয়। বরঞ্চ মূলতই তিনি ব্যতীত কেউ প্রশংসার উপযুক্ত নেই। কেননা, কোন وصف -এর ভিত্তিতে হুকুম লাগানো হলে وصف টি সেই হুকুমের علت (কারণ) হয়। এর বিপরীত অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত নয়, সে প্রশংসার উপযুক্ত নয়। ইবাদতের উপযুক্ততার তো প্রশ্নই উঠেনা। যেন পরবর্তী আয়াতের দলীল হতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم خص بالذكر رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين ؟

উত্তর ঃ رب العلمين - الرحمن - الرحيم - مالك يوم الدين ও **এই চারটি গুণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ:**

সূরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তা'লার জন্য উপরোক্ত চারটি গুণকে বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'লাই প্রশংসার উপযুক্ত। তাঁর থেকে কেউ অধিক প্রশংসার উপযোক্ত নেই। কেননা, যিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা,তাদের প্রতিপালক, তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, নগদ-বাকি সকল নেয়ামতের দাতা প্রতিদান ও শাস্তির দিবসে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মালিক, একমাত্র তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত হবেন। এ চারটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে বিপরীত অর্থে একথাও প্রমাণিত হল যে, যার মাঝে এ চার গুণ নেই সে প্রশংসার উপযুক্ত হবে না। আর যখন প্রশংসার উপযুক্ত হতে পারল না , কাজেই পরবর্তী বিষয় তথা اياك نعبد -এর মধ্যে যে ইবাদত রয়েছে এই ইবাদতেরও উপযুক্ত হতে পারবে না।

☆☆☆

فَالْوَصْفُ الْاَوَّلُ لِبَيَانِ مَا هُوَ الْمُوْجِبُ لِلْحَمْدِ وَهُوَ الْاِيْجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ وَالثَّانِىْ وَالثَّالِثُ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهُ مُتَفَضِّلٌ لِسَوَابِقِ الْاَعْمَالِ حَتّٰى يَسْتَحِقَّ لَهُ الْحَمْدُ وَالرَّابِعُ لِتَحْقِيْقِ الْاِخْتِصَاصِ فَاِنَّهُ مِمَّا لَايَقْبَلُ الشَّرْكَةَ فِيْهِ وَتَضْمِيْنُ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِيْنَ وَالْوَعِيْدُ لِلْمُعْرِضِيْنَ۔

অনুবাদ:

প্রথম সিফাত প্রশংসার উপযুক্তাকে বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর তা (প্রশংসার উপযুক্ততা প্রমাণকারী) হল অভিনব সৃষ্টি ও প্রতিপালন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিফাতকে একথা বুঝাতে আনা হয়েছে যে, তিনি নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন ও স্বেচ্ছায় দান করেছেন। কোন কর্তব্যের তাগিদে এটা তাঁর থেকে প্রকাশ পায়নি অথবা পূর্ববর্তী কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দেয়া তাঁর উপর আবশ্যক নয়, বরং স্বেচ্ছায় দানের ফলে প্রশংসার উপযুক্ত হয়েছেন। চতুর্থ সিফাতটি আনা হয়েছে অল্লাহর সাথে হামদকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করণার্থে। কেননা, অল্লাহ তা'লা এমন এক সত্তা যিনি অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করেন না। আর (চতুর্থ সিফাতটি আনা হয়েছে) প্রশংসাকারীদের জন্য প্রতিশ্রুতি আর বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের জন্য শাস্তিকে প্রতিভাত করানোর জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله فالوصف الاول لبيان ما هو الموجب للحمد ....للمعرضين
اوضح العبارة المذكورة حق الايضاح

উত্তর ঃ قوله فالوصف الاول الخ **ইবারতের বিশ্লেষণঃ** মুসান্নিফ (র.) উল্লেখিত চতুষ্ট গুণাবলীর উপকারিতা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করার পর এখান থেকে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন– প্রথম গুণ ছিল رب العالمين। যেহেতু رب العالمين দ্বারা সৃষ্টি করা ও প্রতিপালন করা অর্থ বুঝে আসে, আর সৃষ্টি করা ও প্রতিপালন করার মত কাজ প্রশংসার দাবীদার। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, رب العالمين গুণকে আনার কারণ প্রশংসার উপযোগিতাকে বর্ণনা করা।

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিফাত তথা رحمن ও رحيم-কে আনা হয়েছে একথা বুঝাতে যে, আল্লাহ তা'লা সব ধরনের নেয়ামত প্রদানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন কর্তা। অর্থাৎ তিনি সব ধরনের নেয়ামত দান করেন নিজ অনুগ্রহ ও কৃপার ফলশ্রুতিতেই, কোন ধরনের জোরজবরদস্তিতার ক্ষেত্রে নয়।

চতুর্থ গুণ ছিল مالك يوم الدين-এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার প্রশংসার উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা, যখন প্রশংসার উপযুক্ততাকে مالك يوم الدين-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কাজেই এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রতিদান দিবসের মালিক হওয়া প্রশংসার উপযুক্ত হওয়ার কারণ। আর এই কারণ অন্যের মাঝে মুটেই পাওয়া যায়না। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসা কেবল আল্লাহ তা'লার জন্যেই হতে পারে, অন্য কেউ এতে শরীক নেই।

তাছাড়া এই সিফাতের মধ্যে প্রশংসাকারীদের জন্য রয়েছে ভাল প্রতিদানের অঙ্গীকার। আর যারা প্রশংসা করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির হুমকি।

☆☆☆

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾
{ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই }

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْحَقِيْقَ بِالْحَمْدِ وَصَفَ بِصِفَاتٍ عِظَامٍ تُمَيِّزُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الذَّوَاتِ وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُوْمٍ مُعَيَّنٍ خُوْطِبَ بِذَالِكَ أَيْ يَا مَنْ هٰذَا شَانُهُ نُخِصُّكَ بِالْعِبَادَةِ لِيَكُوْنَ أَدَلَّ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ وَلِلتَّرَقِّيْ مِنَ الْبُرْهَانِ إِلَى الْعِيَانِ وَالْإِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الشُّهُوْدِ فَكَأَنَّ الْمَعْلُوْمَ صَارَ عِيَانًا وَالْمَعْقُوْلَ مُشَاهَدًا وَالْغَيْبَةَ حُضُوْرًا

অনুবাদ:

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। অত:পর যখন প্রশংসার উপযুক্ততাকে বর্ণনা করা হল এবং এমন সব বড় বড় গুণে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হল যার মাধ্যমে অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন এবং শ্রোতার অনুভূতি এক নির্দিষ্ট সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, কাজেই এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ হে সেই মহান সত্তা যাঁর শান এত বড়! আমরা আপনাকে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা নির্দিষ্ট করছি। যাতে এ সম্বোধন নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে অধিক دلالت করে। আর প্রমাণ থেকে প্রত্যক্ষের দিকে উন্নীত হয় এবং অনুপস্থিত হতে উপস্থিতির দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং কেমন যেন জ্ঞাত বিষয়টি প্রকাশ্য হয়ে গেছে আর যৌক্তিক বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে গেছে আর অনুপস্থিত উপস্থিত হয়ে গেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كيف صح خطاب الله تعالى بعد ذكره على وجه الغيبة وما هى الفائدة فيه؟

প্রশ্ন : اياك -এর আগ পর্যন্ত তো আল্লাহ তা'লাকে غيب বা অনুপস্থিত রেখে আলোচনা করা হচ্ছিল। সুতরাং এই বর্ণনা ধারার চাহিদা ছিল ضمير غيب -এর- اياك نعبد وايا ك نستعين -কেও দ্বারা উল্লেখ করা। তদুপরি এই নিয়মকে উপেক্ষা করে غيب থেকে خطاب -এর ধারায় বর্ণনা করা হল কেন?

উত্তর ঃ এখানে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। একটি হল غيب থেকে خطاب -এর ধারায় বর্ণনা করা কিভাবে শুদ্ধ হল, দ্বিতীয়টি হল غيب থেকে خطاب -এর দিকে التفات করা হল কেন।

১. غيب থেকে خطاب -এর ধারায় বর্ণনা করা কিভাবে বিশুদ্ধ হল :

প্রারম্ভিকা: কাউকে خطاب বা সম্বোধন করা তখন শুদ্ধ হয় যখন সম্বোধিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আর তার এই উপস্থিতির কারণে যে নির্দিষ্টতা হাসিল হয় তাকে تعين حسى (অনুভূতমূলক নির্দিষ্টতা) বলা হয়। তবে কোন কোন সময় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলেও তার গুণাবলীর আলোচনার দ্বারা সে নির্দিষ্ট হয়ে অন্যান্য সত্তা হতে পৃথক হয়ে যায়। এজাতীয় নির্দিষ্টতাকে تعين علمى (জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা) বলা হয়। আর তখন خطاب বা সম্বোধন করা শুদ্ধ হয়না। তবে হ্যাঁ! কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা এমন প্রবল হয় যে, তা অনুভূতমূলক নির্দিষ্টতার ন্যায় দৃঢ়তার ফায়দা দেয় এবং তখন সম্বোধনও শুদ্ধ হয়ে যায়।

মূল বক্তব্য: সূরা ফাতেহার শুরুতে প্রথমে আল্লাহর যিকির রয়েছে, অত:পর তাঁর এমন গুণাবলী আনা হয়েছে যার দরুন তিনি অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন। আর যখন তিনি অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন, কাজেই তিনি এখন এমনভাবে নির্দিষ্টতা লাভ করেছেন যেন শ্রোতা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছে। সুতরাং এ হিসেবে ايـاك দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করা শুদ্ধ হয়ে গেল। অতএব আয়াতের মূল ইবারত হবে– ايهـا الـذات الـموصوفة بالصفات المذكورة نحن نخصك بالعبادة والاستعانة অর্থাৎ হে সেই মহান সত্তা যিনি উল্লেখিত গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত! আমরা আপনাকে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা নির্দিষ্ট করছি। অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি, আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

২. غيب থেকে خطاب -এর দিকে التفات করার কারণ:

غيب থেকে خطاب -এর দিকে التفات করা হয়েছে দুই কারণে। প্রথম কারণ: এর দ্বারা حصر ও اختصاص বুঝানো সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা যা আল্লাহ তা'লার মাঝেই সীমাবদ্ধ এ বিষয়টি অধিক ও উত্তমরূপে বুঝানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি এই التفات -কে অবলম্বন না করে সরাসরি غيب -এর সীগা ব্যবহার করা হত এবং ايـاه نـعبد واياه نستعين বলা হত তাহলেও حصر ও اختصاص পাওয়া যেত তবে এই التفات -এর মাধ্যমে যে পরিমাণ পাওয়া গেছে সে পরিমাণ অবশ্যই পওয়া যেতনা। কেননা, اياه نعبد واياه نستعين -এর মধ্যে যদিও حصر ও اختصاص পাওয়া যায় تقديم ما حقه التاخير -এর কায়দানুযায়ী। কিন্তু اياك نعبد واياك نستعين -এর সূরতে تقديم ما حقه التاخير -এর ফায়দার সাথে সাথে আরো একটি ফায়দা এতে নিহিত রয়েছে। আর সেটি হল– এখানে كاف خطاب টি নিজের মৌলিক অর্থ তথা সম্বোধন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এখানে উল্লেখিত চারটি গুণের কারণে تخصيص علمى (জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা) -কে চাক্ষুস দর্শন ও উপস্থিতির স্থলাভিষিক্ত করে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ কারণেই ايـاك -এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এবং ايـاك -এর পর عبـادت و استعانت -কে আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই সম্বোধনের পর عبـادت و استعـانت -কে বর্ণনা করার অর্থ হল চার গুণের পর عبـادت و استعـانت -কে উল্লেখ করা। আর পূর্বে আমরা জনাতে পেরেছি যে, কোন সিফাতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম লাগানো হলে সেই সিফাতটি হুকুমের علت (কারণ) হয়। এই কায়দানুযায়ী ايـاك نـعبـد وايـاك نستعين -এর অর্থ হবে– আমরা আপনার ইবাদত করি ও আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি উল্লেখিত গুণাবলীর সাথে আপনার সম্পৃক্ততার কারণে। আর এই গুণাবলী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায়না। কাজেই ইবাদতের উপযুক্তও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা।

মোটকথা, خطاب -এর সূরতে حصر লাভ হয় দুই হিসেবে। ১. تقديم ما حقه التاخير -এর কায়াদানুযায়ী। ২. كاف خطاب -এর মাধ্যমে বিশেষ হুকুম লাগানোর কারণে। কিন্তু غيبت -এর সূরতে কেবল تقديم ما حقه التاخير -এর কায়দার ভিত্তিতেই حصر লাভ হয়। এ কারণেই غيبت থেকে خطاب -এর দিকে التفات করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হল– خطاب -এর সূরতে برهان থেকে عيان -এর দিকে অগ্রগতি হয়। برهان -এর অর্থ হল দলীল-প্রমাণ। عيان -এর অর্থ হল উপস্থিত বা চাক্ষুস দর্শন। আর এখানে برهان থেকে عيان -এর দিকে অগ্রগতি এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'লা প্রথমত স্বীয় সত্তার নাম তথা الله শব্দকে উল্লেখ করেছেন। তারপর কয়েকটি গুণবাচক নাম বর্ণনা করে নিজেকে প্রশংসার উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এই

সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর প্রশংসার উপযুক্ত হওয়ার দলীল ও প্রমাণ। সুতরাং مـــالك يــوم الـــديــن পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার পরিচয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা হয়েছে। সাথে সাথে এই সকল গুণাবলী উল্লেখ করার কারণে আল্লাহ তা'লার সত্তা অন্যান্য সত্তা থেকে পৃথক হয়ে কেমন যেন চাক্ষুস দর্শনের মতে হয়ে গেছে। এখন خـطـاب করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সমস্ত দলীল-প্রমাণের পর তাঁর সত্তা আর غـيـــب রয়নি; বরং চাক্ষুস দর্শন ও সম্মুখস্থিত সত্তার ন্যায় হয়ে গেছে এবং অনুপস্থিত থেকে উপস্থিতির পর্যায় উত্তরণ হয়েছে। সুতরাং যে জিনিস দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিল তা এখানে সরাসরি সামনে এসে গেছে এবং দলীল-প্রমাণের পর্যায় থেকে উপস্থিতি ও চাক্ষুস দর্শনের পর্যায়ে চলে এসেছে। ফলে যে জিনিস পূর্ব জ্ঞাত ও যুক্তিযুক্ত ছিল তা এখন বাস্তবে ও সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেছে এবং غيبت পরিবর্তন হয়ে গেছে حضور (উপস্থিত) দ্বারা।

☆☆☆

بُنِيَ اَوَّلُ الْكَلَامِ عَلٰى مَا هُوَ مَبَادِئُ حَالِ الْعَارِفِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالتَّأَمُّلِ فِيْ اَسْمَائِه وَالنَّظْرِ فِيْ اٰلَائِه وَالْإِسْتِدْلَالِ بِصَنَائِعِه عَلٰى عَظِيْمِ شَانِه وَبَاهِرِ سُلْطَانِه ثُمَّ قَفّٰى بِمَا هُوَ مُنْتَهٰى اَمْرِه وَهُوَ اَنْ يَخُوْضَ لُجَّةَ الْوُصُوْلِ وَيَصِيْرُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَرَاهُ عِيَانًا وَيُنَاجِيْه شَفَاهًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِيْنَ اِلَى الْعَيْنِ دُوْنَ السَّامِعِيْنَ لِأَثْرٍ

অনুবাদ:

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে عـــارف (অল্লাহ মুখী বান্দা) -এর প্রাথমিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আল্লাহর যিকির-ফিকির করা, তাঁর নামসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা, তাঁর নিদর্শনাবলীতে গভীর দৃষ্টি দেয়া, তাঁর অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মহামর্যাদাবন ও প্রতাপশালী রাজত্বের উপর প্রমাণ পেশ করা। অত:পর عـارف -এর চূড়ান্ত অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তার চূড়ান্ত অবস্থা হল- প্রভূর মিলন সাগরের তরঙ্গে অবগাহন করা এবং দর্শন লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। অত:পর তাঁকে চাক্ষুস দর্শন করা এবং সরাসরি একান্তে কথা বলা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে স্বচক্ষে দর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো। তোমার খবর শ্রবণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله بنى اول الكلام على ما هو مبادى حال العارف......لاثر
اوضح غرض اللمصنف بهذه العبارة حق الايضاح

উত্তর ঃ قـولـه وبـنى اول الكلام الخ **ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) -এর উদ্দেশ্যঃ** এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্নটি হল– ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, خـطــاب -এর মাধ্যমে بـرهـان থেকে عـيـان -এর দিকে অগ্রগতি হওয়ার উপকারিতা লাভ হয়। কিন্তু এই অগ্রগতি লাভের তো কোন পদ্ধতি বলে দেয়া হয়নি।

তাই মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। জবাবটি বুঝার আগে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বুঝে নিতে হবে।

১. যারা সৃষ্টিকে ছেড়ে আল্লাহ তা'লার অভিমুখী হয় তাদেরকে ধারাবহিকভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরে অবস্থানকারীকে سالك বলা হয়। سالك সেই ব্যক্তিকে বলে, যে নিজের বাহ্যিক দিককে কু-কর্ম এবং অভ্যন্তরকে মন্দ স্বভাব থেকে পাক-সাফ করে শরীয়তে হুকুম-আহকামের উপর আমল করবে।

سالك -এর প্রাথমিক অবস্থা হল– সে শরীয়তের হুকুম-আহকামের উপর আমল করবে। আর চূড়ান্ত অবস্থা হল– নিজেকে সু-স্বভাব দ্বারা সুসজ্জিত করবে। এর পরবর্তী স্থরে অবস্থন করলে তাকে বলা হবে عارف।

عارف সেই ব্যক্তিকে বলে, যে আল্লাহ তা'লার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খী হয়।

عارف -এর প্রাথমকি অবস্থা হল– রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার নাম জপে, তাঁর সত্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহে চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর নেয়ামতসমূহে গভীর চিন্তার মাধ্যমে তাঁর অভূতপূর্ণ বড়ত্ব ও তাঁর প্রতাপশালী রাজত্বের ব্যাপারে প্রমাণাদি পেশ করে আল্লাহ তা'লার দিকে মনোনিবেশ করা। আর তার চূড়ান্ত অবস্থা হল– আল্লাহ তা'লাকে পাওয়ার চেষ্টা-সাধনা চালানো। এর পরবর্তী স্থরে আরোহন করলে তাকে বলা হবে واصل।

واصل সেই ব্যক্তিকে বলে, যার مشاهده -এর স্তর অর্জিত হয়েছে। مشاهده বলতে সেই অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থা বান্দার অর্জিত হয় সকল মাখলুক থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ তা'লার দিকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করার পর।

এবার মূল ইবারত সহজেই বুঝা যাবে যে, برهان থেকে عيان -এর দিকে অগ্রগতি এভাবে হয়েছে যে, সূরা ফাতেহার প্রাথমিক অংশ عارف -এর প্রাথমিক অবস্থাই বুঝাচ্ছে। কেননা, এ সূরার প্রথম অংশে غيبوبة বা অনুপস্থিতি শব্দ দ্বারা সত্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার সত্তাগত নাম উল্লেখ করা অত:পর গুণবাচক নামসমূহের বর্ণনা করা একথাই বুঝাচ্ছে যে, তাঁর সত্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহে ও তাঁর নেয়ামতসমূহে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো, তাঁর অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মহামর্যাদাবন ও প্রতাপশালী রাজত্বের উপর প্রমাণ পেশ করো। আর এটাই হল عارف -এর প্রাথমিক অবস্থা।

মোটকথা, সূরা ফাতেহার প্রথম অংশে عارف -এর প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। আর خطاب তথা اياك نعبد واياك نستعين -এর দ্বারা عارف -এর চূড়ান্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, عارف -এর চূড়ান্ত অবস্থা হল مشاهده। আর خطاب দ্বারাও উদ্দেশ্য হল مشاهده। কাজেই এভাবে برهان থেকে عيان -এর দিকে অগ্রগতি হয়ে গেছে।

وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ اَلتَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ وَالْعُدُوْلُ مِنْ اُسْلُوْبٍ اِلٰى اٰخَرَ تَطْرِيَةً لَهٗ وَتَنْشِيْطًا لِلسَّامِعِ فَيَعْدِلُ مِنَ الْخِطَابِ اِلٰى الْغَيْبَةِ وَمِنَ الْغَيْبَةِ اِلٰى التَّكَلُّمِ وَبِالْعَكْسِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى: حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ. وَقَوْلِهٖ: وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ. وَقَوْلِ اِمْرَأِ الْقَيْسِ:ـ

تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْاَثْمُدِ ☆ وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ

وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهٗ لَيْلَةٌ ☆ كَلَيْلَةِ ذِيْ الْعَائِرِ الْاَرْمُدِ

وَذٰلِكَ مِنْ نَبَأٍ جَاءَ نِيْ ☆ وَخَبَرْتُهٗ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ

অনুবাদ:

আরব বাসীদের অভ্যাস হল, বক্তব্যের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা এবং এক ধারার বর্ণনা হতে অন্য ধারার দিকে ফিরে যাওয়া শ্রোতার আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে। সুতরাং তখন خطاب হতে غيبة আর غيبة হতে تكلم অথবা এর বিপরিত দিকে ফিরে যাওয়া হয়। যেমন, আল্লাহ তা'লার বাণী- حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم এবং والله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه আর ইমরুল কাইসের কবিতা- تطاول ليلك بالاثمد الخ (তরজমা বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

التفات -এর সাধারণ ফায়দা :

قوله ومن عادة العرب التفنن فى الكلام الخ : পূর্বে غيبت থেকে خطاب -এর দিকে التفات -এর দু'টি ফায়দার কথা বলা হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ ফায়দাটি এতক্ষণ যাবৎ বর্ণনা করা হল। এখণ সাধারণ ফায়দা যা আরববাসীদের স্বভাবের সাথে সম্পৃক্ত তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাধারণ ফায়দা বলতে علم معانى -এর মধ্যে التفات -এর যে ফায়দা বর্ণনা করা হয় সেটাই মূলত এখানে উদ্দেশ্য। তবে এই সাধারণ ফায়দা বুঝার পূর্বে التفات -এর সংজ্ঞার ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে তা বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

التفات -এর সংজ্ঞা : জমহুরের মতে, التفات হল– শব্দকে উপস্থাপন করার যে তিন পদ্ধতি তথা غائب - حاضر ও متكلم এই তিন পদ্ধতির যে কোন এক পদ্ধতিতে বক্তব্যকে উপস্থাপন করার পর অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা।

এর থেকে বুঝা গেল যে, জমহুরের নিকট তিন পদ্ধতির মধ্য হতে কোন এক পদ্ধতিতে প্রথমে উপস্থাপন করার পর পুনরায় সেই পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা শর্ত।

তবে আল্লামা سكاكى বলেন, স্বাভাবিক চাহিদার পরিপন্থী বক্তব্যকে উপস্থাপন করার নাম হল التفات। অর্থাৎ কোন স্থানে ব্যবহরা করার কথা عائب সেখানে غائب ব্যবহার না করে حاضر বা متكلم ব্যবহার করা। চাই এতে পূর্ব পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য পদ্ধতি অবলম্বিত হোক বা না হোক।

এখন বুঝুন التفات -এর সাধারণ ফায়দা কি? সাধারণ ফায়দা হল, আরবের লোকেরা নিজেদের

অভ্যাস অনুযায়ী কথার মধ্যে تـفـنـن (অভিনবত্ব) পছন্দ করে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ঢং ও পদ্ধতিতে বর্ণনা করে কথা ব্যক্ত করে থাকে এবং বর্ণনার এক ধারা হতে অন্য ধারা অবলম্বন করে থাকে। আর তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে দু'কারণে– ১. কথায় অভিনবত্ব ও নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। ২. কথা শ্রবণে শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, কথায় আছে, "প্রত্যেক নতুন বস্তু হয় সু-স্বাদু আর এরই পতি মানুষ আগ্রহান্বিত হয়"। সে কারণেই التفات করা হয়।

التـفـات -এর প্রকারভেদ ঃ মুসান্নিফ (র.) التـفـات -এর সাধারণ ফায়াদা বর্ণনা করার পর এখন التفات -এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

التفات ছয় প্রকার-

১. غيبت থেকে خطاب -এর দিকে التفات

২. غيبت থেকে تكلم -এর দিকে التفات

৩. خطاب থেকে غيبت -এর দিকে التفات

৪. خطاب থেকে تكلم -এর দিকে التفات

৫. تكلم থেকে غيبت -এর দিকে التفات

৬. تكلم থেকে خطاب -এর দিকে التفات।

মুসান্নিফ (র.) এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ছয় প্রকারকে ব্যক্ত করেছেন। ১. خـطـاب থেকে غيـبـت -এর দিকে ২. غيبت থেকে تـكـلم -এর দিকে। আর অবশিষ্ট চার প্রকার وبـالـعكس বলে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উদাহরণ দিতে গিয়ে তিন প্রকারের উদাহরণ দিয়েছেন।

التفات -এর উদাহরণঃ

১. ﴿حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم﴾ এখানে প্রথমে كنتم (حاضر -এর সীগা) ব্যবহার করেছেন এবং পরে بهم -এর মধ্যে بكم না বলে غائب -এর শব্দ بهم ব্যবহার করেছেন। অতএব এটা خطاب থেকে غيبت -এর দিকে التفات -এর মিছাল।

২. ﴿والله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾ এটা غيبت থেকে تكلم -এর দিকে التفات -এর উদাহরণ। তা এভাবে যে, এখানে প্রথমে غـــائـب -এর সীগা ارسـل ব্যবহার করেছেন এবং পরে متكلم -এর সীগা سقنا ব্যবহার করেছেন।

৩. ইমরাউল কাইসের আরবী কবিতা–

تطاول ليلك بالاثمد ☆ ونام الخلى ولم ترقد
وبات وباتت له ليلة ☆ كليلة ذى العائر الارمد
وذالك من نبأ جاء نى ☆ وخبرته عن ابى الاسود

কবিতার অর্থ: ☆হে মন! আছমুদ নামক স্থানে তোমার রজনী দীর্ঘ হয়ে গেছে। প্রেমমুক্ত ব্যক্তি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু তোমার নিদ্রা আসে না।

☆ তুমি রজনী অতিক্রান্ত করেছ আর রজনীও অতিবাহিত হয়ে গেছে। চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তির রাত্রি অতিবাহিত করার ন্যায়।

☆ এই চিন্তাসগ্নতা ও অনিদ্রা সেই মহা দুঃসংবাদের কারণে হয়েছে যেই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। আর আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে আবুল আসওয়াদের মৃত্যু সংবাদের।

উপরোক্ত কবিতার মধ্যে জমহুরের মাযহাব অনুযায়ী দু'টি, আর সাক্কাকীর মাযহাব অনসারে তিনটি التفات রয়েছে। প্রথম التفات হল ليلك -এর মধ্যে। স্বাভাবিক বর্ণনার দাবী ছিল, এখানে ليلك না হয়ে ليلي হত। তাই এখানে تكلم থেকে خطاب -এর দিকে التفات হয়েছে। তবে এ التفات টি সাক্কাকীর মাযহাব অনুসারে হবে; জমহুরের মাযহাব অনুসারে ليلك -এর মধ্যে কোন التفات নেই। দ্বিতীয় التفات হল- بات -এর মধ্যে। কেননা, প্রথমে ليلك -এর মধ্যে خطاب ছিল এখন بات -এর মধ্যে غيبت -এর দিকে التفات হয়েছে। তৃতীয় التفات হল جاءني -এর মধ্যে। এখানে غيبت থেকে تكلم -এর দিকে التفات হয়েছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ মুসান্নিফ (র.) -এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার নিকট সাক্কাকীর মাযহাব সঠিক। কেননা, এই কবিতার দ্বারা যে উদাহরণ দিতে চাচ্ছেন তা সাক্কাকীর মাযহাব অনুসারে التفات হয়। অর সেটা হল ليلك -এর মধ্যে। এই এক التفات ভিন্ন অন্য যে দুই التفات দেখানো হয়েছে তা মূলতঃ মুসান্নিফের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ দুই التفات পূর্বের দুই উদাহরণ দ্বারা বুঝে এসেছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, উদাহরণ দেয়া হয়েছে সাক্কাকীর সংজ্ঞা মতে, আর এটা মুসান্নিফের মতেও সঠিক।

☆☆☆

وَإِيَّا ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ وَمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْيَاءِ وَالْكَافِ وَالْهَاءِ حَرْفٌ زِيْدَتْ لَهُ لِبَيَانِ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ كَالتَّاءِ فِيْ اَنْتَ وَالْكَافِ فِيْ أَرَأَيْتُكَ وَقَالَ الْخَلِيْلُ: إِيَّا مُضَافٌ إِلَيْهَا وَاحْتَجَّ بِمَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ ـ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ فِي السِّتِّيْنَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَابِّ. وَهُوَ شَاذٌّ لَايُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَقِيْلَ: هِيَ الضَّمِيْرُ وَإِيَّا عَمَدَةٌ فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِّلَتْ عَنِ الْعَوَامِلِ تَعَذَّرَ النُّطْقُ بِهَا مُفْرَدَةً فَضُمَّ إِلَيْهَا إِيَّا لِتَسْتَقِلَّ بِه وَقِيْلَ: اَلضَّمِيْرُ هُوَ الْمَجْمُوْعُ وَقُرِئَ اَيَّاكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهَيَّاكَ بِقَلْبِهَا هَاءً

অনুবাদ:

ايا হল ضمير منفصل । আর তার সাথে যে ياء - كاف ও هاء সংযুক্ত হয় তা এমন হরফ যাকে تكلم - خطاب ও غيبت -কে বর্ণনা করার জন্য অতিরিক্ত আনা হয়। এর মধ্যে اعراب দানের কোন স্থান নেই। যেমন— انت -এর মধ্যে تاء এবং ارأيتك -এর মধ্যে كاف । আর খলীল নাহভী বলেন, ايا এসকল হরফের দিকে مضاف হয়েছে। তিনি দলীল পেশ করেন আরবের কথিত প্রবাদ বাক্য দ্বারা— اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب (যখন কোন ব্যক্তি ষাট বছরে পদার্পন করে তখন সে যেন যুবতী মহিলাদের থেকে দূরে থাকে)। তবে তা দুর্লভ ও অগ্রহণীয় দৃষ্টান্ত। আর কেউ কেউ বলেন, এ সংযুক্ত হরফগুলোই হল ضمير আর ايا হল সেগুলোর জন্য স্তম্ভস্বরূপ। কেননা, এ হরফসমূহকে যখন عامل হতে পৃথক করে দেয়া হয়েছে তখন এককভাবে সেগুলোর উচ্চারণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ايا -কে সেগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যাতে তার দ্বারা সেগুলো স্বতন্ত্র হয়ে যায়। আর কেউ কেউ বলেন, ايا এবং তার পরবর্তী হরফের সমষ্টিই হল

ضمير । আর اياك (হামযার যবর দ্বারা)ও পড়া হয়ে থাকে। এবং هياك (হামযাকে هاء বানিয়ে)ও পড়া হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وايا ضمير منفصل الخ : এখান থেকে اياك সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হচ্ছে। اياك -এর মধ্যে ضمير কোনটি? শুধু ايا টি না كاف না উভয়টি? এ সম্পর্কে চারটি অভিমত রয়েছে।

১. জমহুরের মতে, শুধু ايا টি হল ضمير । আর তার শেষে যে ياء - كاف ও هاء ইত্যাদি সংযুক্ত হয় তা হল এমন হরফ যাকে تكلم - خطاب ও غيبت -এর অর্থ দেয়ার জন্য বৃদ্ধি করা হয়। এগুলোর কেন محل اعراب (اعراب দেয়ার স্থান) নেই। যেভাবে انت -এর মধ্যে تاء এবং ارأيتك -এর মধ্যে كاف -এর কোন محل اعراب নেই।

২. খলীল নাহভীর মতেও শুধু ايا টি ضمير তবে জমহুরের সাথে তার মতবিরোধ হল ايا -এর শেষে যে كاف - هاء ও ياء ইত্যাদি শব্দাবলী সংযুক্ত হয় সেগুলো নিয়ে। জমহুর সেগুলোকে হরফ বলেছেন, আর খলীল নাহভী সেগুলোকে ইসিম বলেছেন। তিনি বলেন, ايا টি مضاف আর তার সাথে সংযোজিত শব্দগুলো مضاف اليه । তিনি আরবের এক প্রবাদ বাক্য দ্বারা দলীল পেশ করেন। প্রবাদ বাক্যটি হল– اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب এখানে ايا -কে الشواب -এর দিকে اضافت করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে এই উক্তির মধ্যে ايا শব্দটি مضاف হয়েছে ঠিক তদ্রূপ اياه - اياك - اياى এগুলোর মধ্যেও مضاف হবে।

তবে মুসান্নিফ (র.) এই মতকে هو شاذ لايعتمد عليه বলে খণ্ডন করেছেন। কেননা, এখানে ضمير -এর اضافت হচ্ছে ইসমের দিকে অথচ ضمير কখনো مضاف হয় না।

৩. কিছুসংখ্যক নাহভীদের মতে, كاف - هاء - ياء ইত্যাদি হল ضمير আর ايا যমীর নয়; বরং উল্লেখিত ضمير সমূহের শক্তিসঞ্চয়ী বা নির্ভর। এই ضمير গুলোর সাথে ايا -কে সংযুক্ত করার কারণ হল, এ ضمير গুলো যখন عامل থেকে আলাদা ব্যবহার হয় তখন আলাদা এগুলোকে ব্যবহার করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই এগুলোর সাথে ايا -কে সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোর শক্তিসঞ্চয়ী বা নির্ভর হিসাবে।

৪. উভয়টা মিলে হল ضمير অর্থাৎ ايا ও هاء - يا - كاف এই উভয় জিনিস মিলে পূর্ণ একটি ضمير -এর আকৃতি ধারণ করবে। অর্থাৎ এটা مركب নয় বরং مفرد ।

السوال: كم قراءة فى اياك؟ وما هى؟

উত্তর ঃ اياك -এর কেরাত ঃ اياك -এর মধ্যে আরো দু'টি কেরাত রয়েছে। মোট তিনটি কেরাত–

১. إِيَّاكَ (হামযার যের দিয়ে)।

২. أَيَّاكَ (হামযার যবর দিয়ে)।

৩. هَيَّاكَ তথা همزه مفتوحه -কে هاء দ্বারা পরিবর্তন করে।

☆☆☆

কাফি ক-১/৫

وَالْعِبَادَةُ اَقْصٰى غَايَةِ الْخُضُوْعِ وَالتَّذَلُّلِ وَمِنْهُ طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ اَىْ مُذَلَّلٌ وَثَوْبٌ ذُوْ عَبَدَةٍ اِذَا كَانَ فِىْ غَايَةِ الصَّفَاقَةِ وَلِذَالِكَ لَاتُسْتَعْمَلُ اِلَّافِى الْخُضُوْعِ لِلّٰهِ تَعَالٰى

অনুবাদ:

ইবাদত বলা হয় অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা। আর এর থেকেই বলা হয় طريق معبَّد অর্থাৎ পদদলিত পথ, আরো বলা হয় ثوب ذو عبدة (মজবুত করে তৈরী কাপড়) যখন তা অত্যধিক মোটা হয়, (যেহেতু ইবাদতের অর্থ অতিশয় লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা) একারণে ইবাদত শব্দটি আল্লাহ তা'লার জন্য বিনম্র হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

سوال: ما معنى العبادة لغة واصطلاحا؟

উত্তর ঃ معنى العبادة لغة **(ইবাদতের আভিধানিক অর্থ ঃ)**

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হল– অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা। এই অর্থ থেকেই রাস্তাকে বলা হয় طريق معبَّد (পদদলিত পথ) এবং মজবুত করে তৈরী কাপড়কে বলা হয় ثوب ذو عبدة । কেননা, এই কাপড় দ্বারা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয় এবং অধিক ব্যবহারের কারণে জীর্ণ ও মলিন হয়ে যায়। ইবাদতের অর্থ যেহেতু অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা, এই কারণে ইবাদত শুধু আল্লাহ তা'লার জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কারো জন্য ইবাদত শব্দের ব্যবহার বৈধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতেও নয়, যুক্তির দৃষ্টিতেও নয়। কেননা, অতিশয় বিনয়-নম্রতা প্রকাশের উপযুক্ত সেই সত্তা যিনি বৃহৎ বৃহৎ নেয়ামতদাতা। যেমন– হায়াত ও রিযিক দান করা, আর এই জাতীয় নেয়ামতের দাতা কেবল আল্লাহ তা'লাই। কাজেই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'লাই হবেন।

معنى العبادة اصطلاحا **ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ ঃ**

ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইবাদত সেই কাজকে বলে, যাকে আল্লাহ তা'লা বান্দার দাসত্ব প্রকাশের নিমিত্তে আমল সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইবাদত সেই ইচ্ছাধীন কর্মকে বলে যা মনের চাহিদার পরিপন্থী হয়, তদুপরি তা আঞ্জাম দেয়া হয় কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায়।

وَالْإِسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ وَهِيَ إِمَّا ضَرُوْرِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَالضَّرُوْرِيَّةُ مَا لَايَتَأَتَّى الْفِعْلُ دُوْنَهُ كَاقْتِدَارِ الْفَاعِلِ وَتَصْوِيْرِه وَحُصُوْلِ آلَةٍ وَمَادَّةٍ يُفْعَلُ بِهَا فِيْهَا وَعِنْدَ اِسْتِجْمَاعِهَا يُوْصَفُ الرَّجُلُ بِالْإِسْتِطَاعَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ أَوْ يَسْهَلُ كَالرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ يَقْرُبُ الْفَاعِلُ إِلَى الْفِعْلِ وِيحِثُّهُ عَلَيْهِ وَهٰذَا الْقِسْمُ لَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ التَّكْلِيْفِ

অনুবাদ:

استعانت -এর অর্থ হল সাহায্য চাওয়া। আর সাহায্য হয়ত আবশ্যকীয় হবে অথবা অনাবশ্যকীয় হবে। معونت ضروريه বা আবশ্যকীয় সাহায্য বলা হয় সেই সাহায্যকে যা ব্যতীত কোন কাজ করা সম্ভবই হয় না। যেমন– কোন কাজের কর্তা সেই কাজের ব্যাপারে শক্তিমান হওয়া ও সুষ্ঠু ধারণা থাকা। এমন মাধ্যম ও মৌল উপকরণ উপস্থিত বা অর্জন করা যেই মাধ্যমকে সেই মৌলিক উপকরণের মধ্যে ব্যবহার করে কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। এই আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকার পরই কোন ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলা হবে। আর তাকে শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা বৈধ হবে। معونت غير ضروريه বা অনাবশ্যকীয় সাহায্য হল এমন জিনিস অর্জন করা যা দ্বারা কার্যসম্পাদন সহজ হয়। যেমন– পদব্রজে চলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। অথবা সেই জিনিস কর্তাকে কার্য সম্পাদনের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাকে সেই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের উপর শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা নির্ভরশীল নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الاستعانة وكم قسما للمعونة وما هي؟

উত্তর ঃ استعانت -এর অর্থ ও معونت -এর প্রকারভেদ:

استعانت শব্দটি باب استفعال -এর মাসদার। অর্থ হল طلب المعونت (সাহায্য প্রার্থনা করা)। معونت বা সাহায্য দুই প্রকার– ১. معونت ضروريه (আবশ্যকীয় সাহায্য) ২. معونت غير ضروريه (অনাবশ্যকীয় সাহায্য)।

معونت ضروريه সেই সাহায্যকে বলা হয়, যা ব্যতীত কোন কাজ করা সম্ভবই হয় না। যেমন– কোন কাজ করার জন্য কর্তা সেই কাজের ব্যাপারে শক্তিমান ও সক্ষম হওয়া, সেই কাজের ব্যাপারে তার পূর্বজ্ঞান থাকা এবং সেই কাজের মৌলিক উপাদান ও হাতিয়ার থাকা যা দ্বারা সে কার্য সম্পাদন করবে। এই আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকার পরই কোন ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলা হবে। আর তাকে শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা বৈধ হবে।

معونت غير ضروريه বা অনাবশ্যকীয় সাহায্য হল এমন জিনিস অর্জন করা যা দ্বারা কার্যসম্পাদন সহজ হয়। যেমন– পদব্রজে চলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। অথবা সেই জিনিস কর্তাকে কার্য সম্পাদনের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাকে সেই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের উপর শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা নির্ভরশীল নয়।

وَالْمُرَادُ طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ كُلِّهَا اَوْ فِيْ اَدَاءِ الْعِبَادَاتِ

অনুবাদ:

(আল্লাহ তা'লার বাণী ايـاك نستعين দ্বারা) উদ্দেশ্য হল সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অথবা সকল ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هو المستعان فيه في اياك نستعين؟

উত্তর ঃ اياك نستعين **বলে কিসের সাহায্য কামনা করা হচ্ছে?**

ايـاك نستعين "আমরা তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি"। এখানে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করা হচ্ছে তার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা আপনার কাছে সাহায্য কামনা করছি। ২. ইবাদত আদায় করা অর্থাৎ ইবাদত আদায় করার ব্যাপরে সাহায্য কমানা করি।

☆☆☆

وَالضَّمِيْرُ الْمُسْتَكَنُّ فِي الْفِعْلَيْنِ لِلْقَارِئْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْحَفَظَةِ وَحَاضِرِيْ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ اَوْ لَهُ وَلِسَائِرِ الْمُوَحِّدِيْنَ اَدْرَجَ عِبَادَتَهُ فِيْ تَضَاعِيْفِ عِبَادَتِهِمْ وَخَلَطَ حَاجَتَهُ بِحَاجَتِهِمْ لَعَلَّهَا تُقْبَلُ بِبَرْكَتِهَا وَتُجَابُ اِلَيْهَا وَلِهٰذَا شُرِعَتِ الْجَمَاعَةُ

অনুবাদ:

উভয় ফে'ল তথা نعبد ও نستعين -এর মধ্যকার ضمير مستتر টি পাঠক তার সাথের হেফাজতাকারী ফেরেশতা এবং জামাতে উপস্থিত মুসল্লিগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে এসেছে। অথবা পাঠক ও সমস্ত মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করতে এসেছে। সে তার ইবাদতকে অসংখ্য ইবাদতের সাথে মিলিয়ে নেবে এবং তার প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজনের সাথে একাকার করে নেবে। যেন তাদের ইবাদতের উসিলায় নিজের ইবাদতকে কবুল করা হয় এবং তার ডাকে সাড়া দেয়া হয়। এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখেই জামাতকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

جمع বা বহুবচনের সীগার مصداق কি?

উত্তর ঃ نعبد ও نستعين হল جمع متكلم -এর সীগা। আর جمع متكلم মূলতঃ সংখ্যার আধিক্য বুঝাতে আসে। তবে অনেক সময় جمع متكلم দ্বারা সম্মান বুঝানোও উদ্দেশ্য হয়। যেমন– আল্লাহ তা'লা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নিজের জন্য جمع متكلم -এর সীগা ব্যবহার করেছেন। তবে এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ স্থানটি হল ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার স্থান, যা সম্মান প্রকাশের স্থান নয়; বরং এটা নিজের অক্ষমতা প্রকাশের স্থান। কাজেই نعبد ও نستعين -কে সম্মান প্রকাশের ক্ষেত্রে

ব্যবহার করা যাবে না; বরং পাঠকদের সংখ্যার আধিক্যতা প্রকাশক হিসেবে গণ্য করা যাবে। এখন বুঝতে হবে যে, এখানে কিভাবে পাঠকদের সংখ্যার আধিক্যতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। তার সূরত হল এভাবে যে, اياك نعبد و اياك نستعين -এর পাঠকের দুই অবস্থা–

১. হয়ত পাঠক নামাজের বাইরে এটা পাঠ করবে। অথবা–

২. নামাজের ভিতরে। যদি নামাজের বাইরে পাঠ করে, তাহলে বহুবচনের সীগা ব্যবহারের مصداق হবে তিনটি–

ক. পাঠকারী নিজে।

খ. সকল তাওহীদপন্থীগণ।

গ. সকল মুমিন-মুসলমান এবং মুমিন-মুসলমানের হেফাজতকারী ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর যদি নামাজের ভিতরে পাঠ করে, তাহলে তার দুই সূরত–

১. একাকী নামাজ আদায়কারী হবে অথবা ২. জামাতের সাথে আদায়কারী হবে। যদি একাকী হয়, তাহলে جمع -এর সীগার مصداق হবে নামাজ আদায়কারী নিজে ও হেফাজতকারী ফেরেশতারা। যেহেতু এই সূরতে সংখ্যা একাধিক, এজন্য جمع -এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যদি জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী হয়, তাহলে جمع -এর সীগার مصداق হবে নিজে ও জামাতে উপস্থিত সকলে। এই সূরতেও সংখ্যা একাধিক। কাজেই جمع -এর সীগা ব্যবহার করা বৈধ হয়েছে।

বহুবচনের সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য কি?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বে আমারা বহুবচনের সীগার مصداق জানতে পালাম। এখন বহুবচনের সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য কি এবং সাথে সাথে তাওহীদপন্থী ও মুমিনদেরকে শরীক করার পিছনে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি কি তা জানবো।

এখানে জমা'র সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য ও তাওহীদপন্থী সকল মুমিনদেরকে শরীক করার পিছনে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি হল এই যে, যখন ইবাদতকারী নিজের ইবাদতকে তাওহীদপন্থিদের ইবাদতের সাথে শরীক করে নিবে এবং নিজের প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজন সমূহের সাথে মিলিয়ে নিবে, তখন তাদের ইবাদত ও প্রয়োজন পূরণের বরকতে ইবাদতকারীর নিজের ইবাদত ও প্রয়োজন কবুল হয়ে যাবে। কেননা, যখন সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নিজের ইবাদতেকে শামিল করে আল্লাহ তা'লার দরবারে পেশ করবে, তখন হয়ত (ক) আল্লাহ তা'লা সকলের ইবাদতকেই প্রত্যাখ্যান করবেন অথবা (খ) সকলের ইবাদতেক কবুল করে নিবেন। অথবা (গ) কারো কারো ইবাদতকে কবুল করে নিবেন আর (ঘ) কারো কারো ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করবেন। এই কয়েকটি সূরত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন দেখা যায়না যে, আল্লাহ তা'লা সকলের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করবেন। কেননা, তাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা রয়েছেন যাদের প্রয়োজন ও দো'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। যেমন– আল্লাহর ওলীগণ। আবার এমনও হতে পারে না যে, কিছু প্রত্যাখ্যান করবেন আর কিছু কবুল করবেন। কেননা, এটা দয়াময় ও দাতা আল্লাহ তা'লার শানের পরিপন্থি। সুতরাং উপরের উভয় সম্ভাবনাই বাতিল হয়ে গেল। যখন সকলের দো'আকে প্রথ্যাখ্যান করা বা কিছু দো'আকে কবুল করা আর কিছু দো'আকে প্রত্যাখ্যান করা উভয় সূরত বাতিল হয়ে গেল। এখন সকলের দো'আ কবুল হওয়ার সূরত বাকি রয়ে গেল। সুতরাং যখন বান্দা اياك نعبد و اياك نستعين বলে এবং এ কথা বলে– "হে আল্লাহ ! আমার ইবাদত নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু আমি

আমার ইবাদতকে তোমার প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলিয়ে নিলাম, যেন তাদের সঠিক ও বিশুদ্ধ ইবাদতের সাথে আমার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতকে কবুল করে নেয়া হয়। আমার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করে কবুল না করা এটা তোমার কৃপা ও মহিমার শানের পরিপন্থী কাজ হবে। বরং তুমি তোমার শানের খাতিরে কবুল করে নিবে"।

এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে জামাতে নামাজ পড়াকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সুন্নাতে মোআক্কাদা সাব্যস্ত হয়েছে। যাতে বান্দারা একত্রিত হয়ে ইবাদত ও দো'আ করে এবং তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মাকবুল হয়।

☆☆☆

وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلتَّعْظِيْمِ وَالْاِهْتِمَامِ بِه وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْحَصْرِ وَلِذَالِكَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ: نَعْبُدُكَ وَلَانَعْبُدُ غَيْرَكَ . وَتَقْدِيْمُ مَا هُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْوُجُوْدِ لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْعَابِدَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ نَظْرُهُ اِلَى الْمَعْبُوْدِ اَوَّلًا بِالذَّاتِ وَمِنْهُ اِلَى الْعِبَادَةِ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا عِبَادَةٌ صَدَرَتْ عَنْهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا نِسْبَةٌ شَرِيْفَةٌ اِلَيْهِ وَوُصْلَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ فَاِنَّ الْعَارِفَ اِنَّمَا يَحِقُّ وُصُوْلُهُ اِذَا اِسْتَغْرَقَ فِيْهِ فِيْ مُلَاحَظَةِ جَنَابِ الْقُدْسِ وَغَابَ عَمَّا عَدَاهُ حَتّٰى اَنَّهُ لَايُلَاحِظُ نَفْسَهُ وَلَا حَالًا مِنْ اَحْوَالِهَا اِلَّا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُلَاحَظَةٌ لَهُ وَمُنْتَسِبَةٌ اِلَيْهِ وَلِذَالِكَ فُضِّلَ مَا حَكَى اللّٰهُ عَنْ حَبِيْبِه حَيْثُ قَالَ: لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. عَلٰى مَا حَكَاهُ عَنْ كَلِيْمِه حَيْثُ قَالَ: اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

অনুবাদ:

مفعول به (তথা (اياك -কে আগে বর্ণনা করা হয়েছে সম্মানার্থে ও مفعول গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হওয়ার কারণে এবং সীমাবদ্ধতা বুঝাতে। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হল– আমরা আপনার ইবাদত করি, আপনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। তাছাড়া সৃষ্টিগত দিক হতে যে অগ্রে তাকে বাস্তবেও আগে ব্যবহার করতে ايـــاك -কে আগে আনা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করতে যে, ইবাদতকারীর দৃষ্টি প্রথমতঃ ইবাদতের যোগ্য সত্তার দিকে হওয়া সমীচীন। তার থেকে ইবাদতের দিকে হবে। তবে এই ধারণা নিয়ে নয় যে, ইবাদত তার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে; বরং এ হিসেবে যে, এই ইবাদত হল তার সাথে পবিত্র সম্পর্কের সূত্র এবং আবিদ ও মা'বুদের মাঝে সেতুবন্ধন। কেননা, عـارف তখনই واصل -এর স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয় যখন সে পবিত্র সত্তার ধ্যানে মগ্ন হয় এবং তাকে ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এমনকি সে তার নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং কোন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। রাখলেও তা এ হিসেবে যে, তাতে আল্লাহর সান্নিধ্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হয় এবং তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'লার ভাষায় উদ্ধৃত তাঁর হাবীবের উক্তি– لاتحزن ان الله معنا -কে হযরত মুসা (আ.) -এর উক্তি– ان معى ربى سيهدين অপেক্ষা অধিক ফযীলত দান করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هى الفائدة لتقديم المفعول على الفعل؟

উত্তর ঃ ايّاك মাফউল বিহিকে فعل -এর পূর্বে আনার পাঁচ কারণ:

ايّاك نعبد واياك نستعين -এর মধ্যে ايّاك হল مفعول به । নিয়ম হল– مفعول به হবে فعل -এর পরে। কিন্তু এখানে مفعول به -কে فعل -এর পূর্বে আনা হয়েছে তার কারণ কি? এর পাঁচটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে–

১. এখানে সম্মানার্থে ايّاك মাফউলে বিহিকে فعل -এর পূর্বে আনা হয়েছে। কেননা, ايّاك দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'লা। আর আল্লাহ তা'লা যে অধিক সম্মানের অধিকারী এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

২. বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে মাফউলকে আগে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এই আয়াত পাঠকারীর বড় উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'লা, যিনি বড়ত্ব ও মহত্বের গুণে গুণান্বিত। যখন আল্লাহ তা'লাই মূল লক্ষ্য, কাজেই সর্বপ্রথম তাঁর আলোচনাই করা সমীচীন এবং অন্তরে তাঁর অবস্থান সর্বপ্রথম হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আল্লাহ তা'লার ব্যাপারটি এমনই গুরুত্ব রাখে, কাজেই এই গুরুত্বের কারণে مفعول -কে আগে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, مفعول দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'লা।

৩. حصر বুঝানোর জন্য ايّاك মাফউলকে আগে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি" এরকম অর্থ প্রকাশের জন্য ايّاك মাফউলকে আগে আনা হয়েছে। কেননা, এখানে مفعول -কে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবহার করলে استعانت ও عبادت এ দু'টি বিষয়ে আল্লাহ তা'লার সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। কিন্তু ايّاك -কে আগে এনে অন্যান্য সত্তা থেকে সীমাবদ্ধ হয়ে কেবল আল্লাহ তা'লার সাথেই সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এখানে অন্যান্য থেকে কাটছাট হয়ে আল্লাহ তা'লার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

৪. আল্লাহ তা'লা হলেন সমস্ত সৃষ্টি জগতের উৎস বা সূচনা। সমস্ত সৃষ্টি জগতের উৎস বা সূচনা হওয়া হিসেবে অস্তিত্বের বিচারে তিনি অগ্রগণ্য। যেহেতু তিনি অস্তিত্বের বিচারে অগ্রগণ্য কাজেই আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে আলোচনা বাস্তবতা অনুযায়ী হয়ে যায়।

৫. ايّاك -কে আগে এনে ইবাদতকারীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমেই দৃষ্টি মা'বুদ বা আল্লাহ তা'লার দিকে ফিরানো উচিত। নিজের ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়; বরং প্রথমে মা'বুদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাঁর থেকে নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তা আবার এই হিসেবে যে, নিজের এই ইবাদতটা হল শুধুমাত্র আমাদের ও আল্লাহ তা'লার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী একটি মাধ্যম। এরকম মনে করবে না যে, ইবাদত আমাদের থেকে আমাদের শক্তি সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

السوال: اذكر وجه فضل قوله : ان الله معنا" "على قوله: ان معى ربى"

উত্তর ঃ যেহেতু আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হওয়া وصــول الــى الــلــه -এর ভিত্তি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অগ্রগণ্য রাখা, তাঁর স্মরণকে প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই সাধনার সার্থকতা। তাই আল্লাহ তা'লা কর্তৃক বর্ণিত তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা.) -এর উক্তি– ان الــلــه مــعــنــا -কে হযরত মুসা (আ.) থেকে বর্ণিত উক্তি– ان معى ربى سيهدين -এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কেননা, ان الله معنا -এর মধ্যে আল্লাহ তা'লাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ان مـعـى ربى سيهدين -এর মধ্যে আল্লাহর পূর্বে নিজেকে তুলে ধরা হয়েছে।

☆☆☆

وَكَرَّرَ الضَّمِيْرَ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَى اَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِه لَا غَيْرُ

অনুবাদ:

اياك যমীরকে পুনরুল্লেখ করেছেন এবিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য যে, তাঁর কাছেই কেবল সাহায্য প্রার্থনা করা হবে, অন্য কারোর কাছে নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما فائدة فى تكرير الضمير اياك؟

উত্তর ঃ اياك -কে দু'বার উল্লেখ করার কারণ:

اياك نعبد واياك نستعين-এর মধ্যে اياك -কে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এখানে দু'বার উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, উভয় ايـــــاك দ্বারা আল্লাহ তা'লা উদ্দেশ্য। তথাপি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হল– ايــــاك -কে দু'বার উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'লা একক মা'বুদ তেমনিভাবে তিনি مستعان-ও (তাঁর কাছে সাহায্য কামনার তিনিই উপযুক্ত ও সাহায্যদাতা)। কেননা, اياك -কে যদি দু'বার উল্লেখ না করে واو -এর মাধ্যমে এভাবে বলা হতো– اياك نعبد ونستعين তখন এই ধারণা হতে পারত যে, معبود ও مستعان -এর সমষ্টি তো আল্লাহ তা'লা, কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে এই দু'টি আল্লাহ তা'লার উপর সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণাকে নির্মূল করতেই দু'বার اياك -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقُدِّمَ الْعِبَادَةُ عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ لِيَتَوَافَقَ رُؤُسَ الْآىِ وَيُعْلَمَ مِنْهُ اَنَّ تَقْدِيْمَ الْوَسِيْلَةِ عَلٰى طَلَبِ الْحَاجَةِ اَدْعٰى اِلَى الْاِجَابَةِ وَاَقُوْلُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ اِلٰى نَفْسِه اَوْهَمَ ذَالِكَ اِعْتِدَادًا مِنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِه وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ الْعِبَادَةَ اَيْضًا مِمَّا لَايَتِمُّ وَلَايَتَسَبَّبُ لَهٗ اِلَّا بِمَعُوْنَتِه مِنْهُ وَتَوْفِيْقِه

অনুবাদ:

عبادت -কে استعانت -এর পূর্বে আনা হয়েছে আয়াতের অন্তমিল রক্ষার জন্য এবং এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য যে, প্রার্থনার পূর্বে কোন উসিলা পেশা করা প্রার্থনা কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক সহায়ক। আর আমি (গ্রন্থকার) বলব যে, যখন পাঠক ইবাদতকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করে তখন এটা তার মনে গর্ব করার ও নিজেকে বিশেষভাবে গণ্য করার সংশয় সৃষ্টি করে যে, ইবাদত তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে (এই কারণে). نعبد -এর পর نستعين -কে উল্লেখ করা হয়েছে যেন এ কথা বুঝায় যে, ইবাদতও তাঁর সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া পূর্ণ ও শুদ্ধ হয় না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هى النكتة فى تقديم العبادة على الاستعانة؟

উত্তর ঃ عبادت-কে استعانت -এর পূর্বে আনার তিন কারণ:

১. আয়াতের শেষাংশের মিল রক্ষার জন্য نعبد -কে نستعين -এর পূর্বে আনা হয়েছে। কেননা, সূরা ফতেহার বিশেষ অবস্থা হল– আয়াতের শেষাক্ষরের পূর্বে يـاء سـاكن হওয়া। যেমন– الدين - رحيم - عالمين । এখন যদি نعبد -কে আগে না এনে نستعين -কে আগে আনা হত, তাহলে আয়াতের শেষ শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। এই মিল রক্ষার্থে نعبد -কে আগে এনে نستعين -কে পরে আনা হয়েছে।

২. عبادت -কে হাদিয়া স্বরূপ استعانت -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, استعانت মূলতঃ একটি দরখাস্ত। আর দরখাস্ত পেশ করার নিয়ম হল, দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে কিছু হাদিয়া-তুহফা পেশ করা। কারণ, দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে যদি কিছু হাদিয়া-তুহফা দেয়া হয়, তাহলে দরখাস্তটি মঞ্জুর হওয়ার ব্যাপারে বেশী আশা করা যায়। কাজেই استعانت -এর পূর্বে عبادت -কে হাদিয়া-তুহফা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. عبادت -কে استعانت -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বান্দার মনের অহংকারকে দূরীভূত করার জন্য। কেননা, ইবাদতের উদ্দেশ্য হল– নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্বকে প্রকাশ করা। এই উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হবে, যখন বান্দা ইবাদতকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করবে এবং নিজেকে আবিদ ও আল্লাহকে মা'বুদ সাব্যস্ত করবে। এখন এর দ্বারা বান্দার অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আমি ইবাদতের ন্যায় এত বড় কাজ-করে ফেলেছি, যা অক্ষমতা প্রকাশের পরিপন্থী। এই ধারণা দূর করার জন্য পরে বলে দেয়া হলো وإياك نستعين "ইবাদতও তোমার সাহায্য ও সহযোগিতায় হবে, আমার তাতে কোন দখল নেই"। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে যে ইবাদত হবে, তাও আবার আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হতে পারবে না। এই বিশেষ কারণে عبادت -কে استعانت -এর পূর্বে আনা হয়েছে।

وَقِيْلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمَعْنٰى نَعْبُدُكَ مُسْتَعِيْنِيْنَ بِكَ . وَبِكَسْرِ النُّوْنِ فِيْهِمَا وَهِيَ لُغَةُ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَاِنَّهُمْ يَكْسِرُوْنَ حُرُوْفَ الْمُضَارَعَةِ سِوٰى اِذَا لَمْ يَضُمَّ مَا بَعْدَهَا

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেছেন যে, واو টি حال -এর অর্থ দিতে এসেছে। অর্থ হবে– نعبدك مستعينين بك "আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা অবস্থায় তোমার ইবাদত করি"। আর উভয় ফে'লে নূনের মধ্যে كسره দিয়েও পড়া হয় (অর্থাৎ نِسْتَعِيْنُ ও نِعْبُدُ)। এটা বনু তামীমের কেরাত। কেননা, তারা ياء ব্যতীত علامت مضارع গুলোকে কাছরা দিয়ে পড়ে থাকে যদি علامت مضارع -এর পরে ضمه না হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قراءة فى نعبد ونستعين؟

উত্তর ঃ نعبد ونستعين -এর মধ্যে দুই কেরাত–

১. نَعبد ونَستعين (উভয়টির প্রথম নূনে فتحه দিয়ে)। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. نِعبد ونِستعين (উভয়টির প্রথম নূনে كسره দিয়ে)। এটা বনু তামীমের কেরাত। তারা ياء ব্যতীত علامت مضارع গুলোকে কাছরা দিয়ে পড়ে থাকে যদি علامت مضارع -এর পরে ضمه না হয়।

☆☆☆

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾

{ আপনি আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন }

بَيَانٌ لِلْمَعُوْنَةِ الْمَطْلُوْبَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أُعِيْنُكُمْ؟ فَقَالُوْا اِهْدِنَا اَوْ اِفْرَادٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ الْاَعْظَمُ

অনুবাদ:

এই আয়াত উদ্দিষ্ট সাহায্যের বর্ণনা। কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বললেন– আমি কিভাবে তোমাদের সাহায্য করব? তখন বান্দারা বলল যে, اهدنا (আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করুন)। অথবা (نستعين -এর মধ্যে) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اكتب ربط الاية بما قبلها

উত্তর ঃ পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক দুইভাবে হতে পারে। ১. প্রশ্নোত্তরের সম্পর্ক। অর্থাৎ এ আয়াতটি واياك نستعين হতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছে। তার বিবরণ হল– যখন اياك نستعين -এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, চাই সেই প্রার্থনা ইবাদত

আদায় করার ব্যাপারে হোক বা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে হোক। এরকম প্রার্থনার পর কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বান্দাকে প্রশ্ন করলেন যে, হে বান্দা ! আমি তোমার কিরকম সাহায্য-সহযোগিতা করব? তখন বান্দা আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলে যে, اهدنا الصراط المستقيم (আপনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে সাহায্য করো)। ২. পূর্বের সাথে এই আয়াতের প্রশ্নোত্তরের কোন সম্পর্ক নেই; বরং আয়াতটি পৃথক একটি দরখাস্ত হিসেবে এসেছে। তার বিবরণ হল– বান্দা نستعين -এর মাধ্যমে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য কামনা করে একথার সংবাদ দিল যে, সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনার উপযোগী একমাত্র আল্লাহ তা'লার সত্তা। তারপর পুনরায় اهدنا الصراط المستقيم -এর মাধ্যমে পৃথকভাবে সেই জিনিস কামনা করছে যা সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য অর্থাৎ সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করা।

☆☆☆

وَالْهِدَايَةُ دَلَالَةٌ بِلُطْفٍ وَلِذَالِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ . عَلَى التَّهَكُّمِ وَمِنْهُ اَلْهَدْيَةُ وَهَوَادِى الْوَحْشِ لِمُقَدَّمَاتِهَا

অনুবাদ:

هداية বলা হয় ইবাদতের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা। এ কারণেই কল্যাণ বা ভাল অর্থের ক্ষেত্রে হেদায়াত ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য فاهدوهم الى صراط الجحيم (তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করো) এটা উপহাসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এ অর্থ থেকেই هديه ব্যবহৃত হয় এবং অগ্রে চলার কারণে هوادى الوحش ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الهداية؟

উত্তর ঃ هداية -এর অর্থ:

هدايت -এর অর্থ হল دلالة بلطف অর্থাৎ ইবাদতের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা। এজন্য هدايت শব্দটি ভাল অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে فاهدوهم الى صراط الجحيم (তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করো) এই আয়াতের মধ্যে যে هدايت মন্দ অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিদ্রূপাত্মক হিসেবে। অথবা এ-ও বলা যেতে পারে যে, এখানে هدايت "পথ প্রদর্শন করা" অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং "নিয়ে যাওয়া" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। هدايت থেকে هدية শব্দ এসেছে। কেননা, হাদিয়া এটা প্রীতি ও ভালবাসার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। এমনিভাবে هوادى الوحش শব্দও هدايت থেকে এসেছে। এর মধ্যেও পথপ্রদর্শনের অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, হরিণ বা জঙ্গলী গাভী ইত্যাদির পালের মধ্যে অগ্রে চলমান হরিণ বা গাভী, যে অন্যান্যগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই এর মধ্যেও পথপ্রদর্শনের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

☆☆☆

وَالْفِعْلُ مِنْهُ هَدٰى وَاَصْلُهُ اَنْ يُعَدّٰى بِاللَّامِ اَوْ اِلٰى ، فَعُوْمِلَ مَعَهُ مُعَامَلَةَ اِخْتَارَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ

অনুবাদ:

هداية মাসদার হতে فعل হল هدى। আর তার আসল হল لام বা الى -এর মাধ্যমে متعدى হওয়া। কিন্তু তার সাথে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য– واختار موسى قومه -এর মতো অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: مالمراد بقوله واصله ان يعدى باللام......قومه

উত্তর ঃ قوله واصله ان يعدى باللام الخ **ইবারতের উদ্দেশ্য:** এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি বুঝার আগে هداية শব্দের ব্যবহার নীতি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তার ব্যবহার নীতি হল এই– هداية শব্দটি দুই مفعول -এর দিকে متعدى হয়। প্রথম مفعول -এর দিকে সরাসরি متعدى হয় এবং দ্বিতীয় مفعول -এর দিকে متعدى হয় لام অথাব الى -এর মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হল– উপরোল্লেখিত নীতি অনুসারে اهدنا الصراط المستقيم আয়াতটি হয়তো اهدنا للصراط المستقيم কিংবা اهدنا الى الصراط المستقيم এরকম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখানে সরাসরি اهدنا الصراط المستقيم বলা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত।

এর উত্তর হল– هداية শব্দের যে ব্যবহার পদ্ধতি বলা হয়েছে তা একেবারে বিশুদ্ধ। তবে কোন কোন সময় তার صله বা মাধ্যমকে হযফ করে هداية -কে সরাসরি مفعول -এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। যেমনিভাবে واختار موسى قومه এই আয়াতে صله বা মাধ্যমকে হযফ করে اختار ফে'লকে সরাসরি مفعول -এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা, اختار الخ -এর আসল রূপ ছিল واختار موسى من قومه অর্থাৎ من -এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে, কিন্তু من -কে হযফ করে اختار ফে'লকে সরাসরি তার মাফউল قومه -এর দিকে متعدى করা হয়েছে। তদ্রূপ এখানেও صله বা মাধ্যমকে ফেলে দিয়ে اهد ফে'লকে সরাসরি তার মাফউল الصراط المستقيم -এর দিকে متعدى করা হয়েছে। فلا اشكال

وَهِدَايَةُ اللّٰهِ تَتَنَوَّعُ اَنْوَاعًا لَا يُحْصِيْهَا عَدٌّ لٰكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِيْ اَجْنَاسٍ مُتَرَتِّبَةٍ اَلْاَوَّلُ: اِفَاضَةُ الْقُوَى الَّتِيْ بِهَا يَتَمَكَّنُ الْمَرْءُ مِنَ الْاِهْتِدَاءِ اِلٰى مَصَالِحِه كَالْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ وَالْمَشَاعِرِ الظَّاهِرَةِ. اَلثَّانِيْ: نَصْبُ الدَّلَائِلِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ حَيْثُ قَالَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَقَالَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى وَالثَّالِثُ: اَلْهِدَايَةُ بِاِرْسَالِ الرُّسُلِ وَاِنْزَالِ الْكُتُبِ وَاِيَّاهَا عَنٰى بِقَوْلِه وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ. وَالرَّابِعُ: اَنْ يَكْشِفَ عَلٰى قُلُوْبِهِمُ السَّرَائِرَ وَيُرِيْهِمُ الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ بِالْوَحْيِ اَوْ بِالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامَاتِ الصَّادِقَةِ وَهٰذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَاِيَّاهُ عَنٰى بِقَوْلِه اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. وَقَوْلِه وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লার হেদায়াত বিভিন্ন প্রকার। কোন সংখ্যা একে গণনার আওতায় আনতে পারবে না। তবে এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কয়েক স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ বান্দাকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দান করা, যার মাধ্যমে সে নিজের কল্যাণকর বিষয়াবলী বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন– জ্ঞানগত শক্তি, আভ্যন্তরিণ অনুভূতি শক্তি এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তি। দ্বিতীয়তঃ সত্য-মিথ্যা, বিশুদ্ধতা-অশুদ্ধতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী প্রমাণাদি পেশ করা। আর এদিকেই আল্লাহ তা'লা ইঙ্গিত করে বলেছেন– আমি তাকে কল্যাণ-অকল্যাণের দু'টি পথই দেখিয়েছি। আরো বলেছেন– আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছি কিন্তু তারা পথপ্রদর্শনের উপর অন্ধত্বকে বেছে নিয়েছে। তৃতীয়তঃ রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে এবং কিতাব অবতরণের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করা। এরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার ভাষ্যে– আমি তাদেরকে ইমাম বা নেতা বানিয়েছি তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পরিচালিত করবে। আরো উক্তি– এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পরিপূর্ণ সোজা। চতুর্থতঃ মানুষের অন্তরে গোপন রহস্যাবলী উদঘাটন করা এবং তাদেরকে বস্তুসমূহের তথ্যাদি দেখানো। যেমন নাকি ওহীর মাধ্যমে হয় অথবা ইলহামের মাধ্যমে বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়। হেদায়াতের এ স্তর হাসিল করা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সাথে নির্দিষ্ট। এরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য দ্বারা যে, ঐ সব লোক যাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর। অন্য উক্তি– আর যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথপ্রদর্শন করব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: كم قسما للهداية من حيث الاجناس المترتبة واى قسم من الهداية يختص بنيل الانبياء والاولياء؟

উত্তর ঃ هداية -এর جنس চার প্রকার:

হেদায়াত যদিও প্রকার হিসেবে অগণিত অর্থাৎ তার প্রকারের সঠিক কোন সংখ্যা নেই যাকে গণনার আওতায় এনে সংখ্যাভুক্ত করবে। তবে جنس হিসেবে তাকে সংখ্যাভুক্ত করা যায়। মোট চার জাতীয় হেদায়াত আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের করে থাকেন, যেগুলো ক্রমান্নয়ে একটির পর আরেকটি এসে থাকে। যথা–

১. প্রথম প্রকার হল– বান্দাকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দান করা, যার মাধ্যমে সে নিজের কল্যাণকর বিষয়াবলী বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন– জ্ঞানগত শক্তি, আভ্যন্তরীণ অনুভূতি শক্তি (তথা ক্ষুধা, পিপাসা, পরিতৃপ্তি ও সঙ্গমের স্বাদ ইত্যাদি অনুভব করার শক্তি) এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তি (তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তক)

২. দ্বিতীয় প্রকার হল– সত্য-মিথ্যা, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার মাঝে পার্থক্যকারী প্রমাণাদি পেশ করা। আর এই দ্বিতীয় প্রকার হেদায়াতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন আয়াত وهديناه النجدين এবং فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى -এর মাধ্যমে।

৩. তৃতীয় প্রকার হল– রাসূলগণ প্রেরণ করে এবং আসমানী কিতাবদি অবতীর্ণ করে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করে দেয়া। এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا এবং ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে।

৪. চতুর্থ প্রকার হল– আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খাছ বান্দাদের অন্তরে নিজের রহস্যাবলী ঢেলে দেন এবং বস্তুসমূহের হকীকত উদঘাটন করে দেন। এটা ওহীর মাধ্যমেও হতে পারে আবার ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে। হেদায়াতের এ স্তর হাসিল করা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সাথে নির্দিষ্ট।

☆☆☆

فَالْمَطْلُوْبُ إِمَّا زِيَادَةُ مَا مُنِحُوْهُ وَالثُّبَاتُ عَلَيْهِ اَوْ حُصُوْلُ الْمَرَاتِبِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ الْوَاصِلُ عَنَّى بِه : اَرْشِدْنَا طَرِيْقَ السَّيْرِ فِيْكَ لِتَمْحُوَ عَنَّا ظُلُمَاتُ اَحْوَالِنَا وَغَوَاشِىْ اَبْدَانِنَا لِنَسْتَضِئَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ وَنَرَاكَ بِنُوْرِكَ

অনুবাদ:

اهدنا الصراط المستقيم এই আয়াতের তাৎপর্য হল– বান্দার প্রাপ্ত হেদায়াতকে আরো বৃদ্ধি করা এবং সেই প্রাপ্ত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অথবা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্তর হাসিল করা। সুতরাং যখন عارف ও واصل একথা বলবে তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে "আপনি আমাদেরকে আপনার মাঝে নিমগ্ন থাকার পথপ্রদর্শন করুন। যেন আমাদের থেকে আমাদের তমসাচ্ছন্ন অবস্থা

দূরীভূত হয় এবং আমাদের দৈহিক আবরণ উঠে যায়, যেন তোমার পবিত্র নূর দ্বারা আলোক লাভ করি। ফলে তোমার নূর দ্বারা তোমাকে দেখতে পাই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح ما قاله البيضاوى تحت تفسير هذه الاية. فالمطلوب اما زيادة ما منحوه من الهدى او الثبات عليه او حصول المراتب المرتبة عليه . اى قسم من الهداية مراد فى الاية؟ اكتبوا متفكرين

উত্তর ঃ قوله فالمطلوب اما زيادة ما منحوه الخ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল– যখন বান্দা সূরার প্রারম্ভ থেকে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁকে صفات كماليه বা পরীপূর্ণ গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং তাঁকেই مستعان ও معبود সাব্যস্ত করেছে। বান্দার এ কাজগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দা হেদায়াতপ্রাপ্ত। তারপরও اهدنا বা "হেদায়াত দিন" বলার অর্থ কি? এর দ্বারা তো تحصيل حاصل অর্থাৎ অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করা হচ্ছে যা অনর্থক কাজ।

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হল– এখানে تحصيل حاصل অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করা অপরিহার্য হচ্ছে না। কেননা, اهدنا এই দোআ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে প্রকারের হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে তাতে দৃঢ়তা দান করা অথবা এর উচ্চ স্তরের হেদায়াত দান করা। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে تحصيل حاصل অপরিহার্য হচ্ছে না।

আর বিশ্লেষণ সহকারে তার উত্তর হল– এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (১) زيادة ما منحوه (২) الثبات عليه (৩) حصول المراتب এই তিনটি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং زيادة ما منحوه বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চতুর্থ প্রকারের হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন اهدنا বলবে তখন অর্জিত হেদাযাতের ক্ষেত্রে আধিক্য ও গভীরতা কামনা করা বুঝাবে।

আর الثبات عليه বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন প্রথম স্তরের হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি اهدنا বলবে তখন প্রাপ্ত হেদায়াতে দৃঢ়তা উদ্দেশ্য হবে।

আর حصول مراتب বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন اهدنا বলবে তখন পরবর্তী স্তরের হেদায়াত প্রাপ্তি কথা বুঝাবে।

وَالْاَمْرُ وَالدُّعَاءُ يَتَشَارَكَانِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَيَتَفَاوَتَانِ بِالْاِسْتِعْلَاءِ وَالتَّسَفُّلِ وَقِيْلَ بِالرُّتْبَةِ . .

অনুবাদ:

امر ও دعاء উভয়টি শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে শরীক। তবে বড়ত্ব ও নীচুত্বের দিক থেকে উভয়টার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, মর্যাদার ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما الفرق بين الامر والدعاء؟

উত্তর ঃ امر ও دعاء -এর মধ্যে পার্থক্য:

اهد । হল امر -এর সীগা। এখানে امر টি দোআর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও امر ও دعاء এ উভয়টির মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে। শব্দগত সামঞ্জস্য হল উভয়টি একই সীগা হয়ে থাকে। আর অর্থগত সামঞ্জস্য হল উভয়টির মধ্যে طلب -এর অর্থ পাওয়া যায়। তথাপি উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য হল– امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা নিজেকে বড় মনে করে নির্দেশ দেয়, বাস্তবে বড় হোক বা না হোক।

আর دعاء বলা হয় যাতে داعى বা প্রার্থনাকারী নিজেকে ছোট করে প্রার্থনা করে, বাস্তবে ছোট হোক বা না হোক।

আর কেউ কেউ এ উভয়টির মধ্যে এভাবে পার্থক্য করে থাকেন যে, امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা বাস্তবে বড় হয়। নিজেকে সে বড় মনে করুক বা না করুক।

আর دعاء বলা হয় যাতে প্রার্থনাকারী বাস্তবে ছোট হয়, নিজেকে ছোট মনে করুক বা না করুক।

☆☆☆

وَالسِّرَاطُ مِنْ سَرِطَ الطَّعَامَ اِذَا اِبْتَلَعَ فَكَأَنَّهٗ يَسْرَطُ السَّابِلَةَ وَلِذَالِكَ سُمِّيَ الطَّرِيْقُ لُقْمًا لِاَنَّهٗ يَلْتَقِمُهُمْ وَالصِّرَاطُ مِنْ قَلْبِ السِّيْنِ صَادًا لِيُطَابِقَ فِي الْاِطْبَاقِ وَقَدْ يُشَمُّ الصَّادُ صَوْتَ الزَّاءِ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْمُبْدَلِ عَنْهُ

অনুবাদ:

سراط শব্দটি سرط الطعام থেকে উদগত। سرط الطعام বলা হয় যখন খাদ্যগ্রহণকারী তা গিলতে থাকে। কেমন যেন রাস্তা কাফেলাকে গিলতে থাকে, একারণেই রাস্তাকে لقم ও বলা হয়। কেননা, রাস্তা তাদেরকে লোকমা বানিয়ে নেয়। আর صراط শব্দটি سين -কে صاد দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে এসেছে। যাতে صاد হরফটি طاء হরফের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায় صفت اطباق -এর

দিক থেকে। আর কখনো صاد -কে زاء -এর আওয়াজে اشمام করা হয়। যেন صاد হরফটি তার مبدل عنه তথা سين -এর খুব কাছাকাছি হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: اكتب حل لغات: الصّراط

উত্তর ঃ صراط শব্দের বিশ্লেষণ:

صراط শব্দটির صاد -কে আসলে কি পড়া হবে এব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. صراط -এর صاد -কে سين পড়া হবে। অর্থাৎ صراط মূলঃ سراط ছিল। কেননা, এটা سرط الطعام থেকে উদগত। কিন্তু سين -কে صاد দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, سراط -এর শেষাক্ষর হল طاء। আর طاء -এর মধ্যে হল صفت اطباق এবং سين -এর মধ্যে হল صفت همس। আর এ উভয়টি صفات متضاده (বিরোধপূর্ণ সিফাত) থেকে। কাজেই উভয়টার একযোগে আদায় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এজন্য سين -কে صاد দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কেননা, صاد হরফটি طاء -এর মত حروف مطبقه থেকে।

২. صراط -এর صاد -কে اشمام -এর সাথে পড়া হবে।

اشمام বলা হয় এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের আওয়াজে পড়া। এখানে صاد -কে زاء -এর আওয়াজে পড়া উদ্দেশ্য। اشمام -এর সাথে পড়ার কারণ হল– اشمام করার দ্বারা صاد তার مبدل عنه তথা سين -এর খুব কাছাকাছি হয়ে যায়। কেননা, سين -এর ন্যায় زاء -এর মধ্যেও انفتاح ও انخفاض রয়েছে। যাই হোক سراط শব্দটি سرط الطعام হতে উদগত। سرط الطعام অর্থ খাদ্য গিলে ফেলা। যেহেতু রাস্তা দিয়ে চলমান ব্যক্তিকে কেমন যেন রাস্তা তাকে গিলে ফেলে তাই রাস্তাকে صراط বলা হয়।

৩. صاد -এর সাথে তথা صراط পড়া হবে।

☆☆☆

وَقَـرَأَ اِبْـنُ كَثِيْـرٍ بِـرِوَايَةِ قُـنْبُـلٍ وَرُوَيْـسٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بِالْاَصْلِ وَحَمْزَةُ بِالْإِشْمَامِ وَالْبَـاقُـوْنَ بِـالـصَّـادِ وَهُـوَ لُغَةُ قُرَيْشٍ وَالثَّابِتُ فِي الْإِمَامِ وَجَمْعُهُ سُرُطٌ كَكُتُبٍ وَهُوَ كَالطَّرِيْقِ فِي التَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ

অনুবাদ:

ইবনে কাছীর (র.) কারী কুম্বুলের সূত্রে এবং রুয়াইস ইয়াকুবের সূত্রে (صراط) -কে আসলের সাথে তথা سين -এর সাথে পাঠ করেছেন। আর হামযা (র.) اشمام -এর সাথে পাঠ করেছেন। অন্যান্যরা صاد -এর সাথে পাঠ করেছেন। এটাই কুরাইশের ভাষা এবং মাছহাফে উসমানীতে এরকমই রয়েছে।

سراط -এর বহুবচন سُرُط (راء ও سين -তে পেশ)। যেমন নাকি كتاب -এর বহুবচন كُتُب। سراط টি طريق -এর মত مذكر ও مونث উভয় রকম ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: كم قرائة فى صراط وما هى؟

উত্তর ঃ صراط শব্দের তিন কেরাত:

১. سِرَاطٌ (سين -এর সাথে) এটা কারী কুম্বুলের সূত্রে ইবনে কাছীরের কেরাত।

২. اشمام -এর সাথে। অর্থাৎ سين -কে زاء -এর আওয়াজ দ্বারা উচ্চারণ করে। এটা হামযা (র.) -এর কেরাত।

৩. صِرَاطٌ (صاد -এর সাথে) এটা অন্যান্য কারীগণের কেরাত।

☆☆☆

وَالْمُسْتَقِيْمُ: اَلْمُسْتَوِىُّ وَالْمُرَادُ بِه طَرِيْقُ الْحَقِّ وَقِيْلَ هُوَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ

অনুবাদ:

مستقيم অর্থ مستوى অর্থাৎ সোজা ও বরাবর। আর صراط مستقيم দ্বারা উদ্দেশ্য হল সত্যের পথ। আর কেউ কেউ বলেন ইসলাম ধর্ম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما المراد بالصراط المستقيم؟

উত্তর ঃ صراط مستقيم দ্বারা উদ্দেশ্য:

صراط مستقيم দ্বারা উদ্দেশ্য কি, কাযী বায়যাবী (র.) এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত বর্ণনা করেছেন।

১. صراط مستقيم দ্বারা সত্য পথ উদ্দেশ্য। এই তাফসীর অনুযায়ী সকল আম্বিয়া কেরামের ধর্ম صراط مستقيم -এর অন্তর্ভুক্ত।

২. صراط مستقسم দ্বারা ইসলাম ধর্ম উদ্দেশ্য। মুসান্নিফ (র.) -এর মতে, প্রথম তাফসীরটি راجح। এজন্য তিনি এটাকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

☆☆☆

﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

{ তাদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন }

بَدْلٌ مِنَ الْاَوَّلِ الْكُلُّ وَهُوَ فِىْ حُكْمِ تَكْرِيْرِ الْعَامِلِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّسْبَةِ فَائِدَتُهُ اَلتَّاكِيْدُ وَالتَّنْصِيْصُ عَلَى اَنَّ طَرِيْقَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ بِالْاِسْتِقَامَةِ عَلَى اٰكَدَّ وَجْهٍ وَاَبْلَغِه لِاَنَّهُ جُعِلَ كَالتَّفْسِيْرِ وَالْبَيَانِ لَهُ فَكَاَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ الَّذِىْ لَاخِفَاءَ فِيْهِ اَنَّ طَرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمِ مَا يَكُوْنُ طَرِيْقُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ:

صراط الذين انعمت عليهم এই আয়াতটি الصراط المستقيم থেকে প্রথম بدل الكل হয়েছে। আর بدل الكل এটা تكرار عامل -এর হুকুমে হয়। কেননা, بدل الكل টি মূখ্য উদ্দেশ্য। بدل -এর ফায়দা হল– তাকীদ সৃষ্টি করা। আর একথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যে, মুসলমানদের পথ হল– পরিপূর্ণরূপে দৃঢ়তার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পথ। কেননা, بدل টি مبدل منه -এর তাফসীর ও বর্ণনার মত। সুতরাং بدل টি এমন স্পষ্ট বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, সহজ পথ হল– মুমিনদের পথ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اكتب ربط الاية بما قبلها

উত্তর ঃ **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র :**

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক হল– صراط الذين انعمت عليهم আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াত اهدنا الصراط المستقيم -এর الصراط المستقيم থেকে প্রথম بدل الكل হয়েছে, তবে عطف بيان নয়। কেননা, بدل টি تكرار عامل -এর হুকুমে হয়। আর عطف بيان و بدل -এর মধ্যে পার্থক্য হল– بدل -এর মধ্যে نسبت দ্বারা بدل টিই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে عطف بيان -এর মধ্যে عطف بيان নয়; বরং তার متبوع টি উদ্দেশ্য হয়।

মোটকথা صراط الذين انعمت عليهم এই আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যকার الصراط المستقيم হতে بدل الكل হয়েছে। এই بدل -এর ফায়দা হল দুইটি– ১. তাকীদের ফায়দা ২. তানছীছের ফায়দা। তাকীদ অর্থ দৃঢ় করা এবং তানছীছ অর্থ স্পষ্ট করা।

তাকীদের ফায়দা এভাবে যে, الصراط المستقيم টি হল مبدل منه এবং صراط الذين انعمت عليهم হল بدل । আর দ্বিতীয় صراط দ্বারা মুমিনদের পথ উদ্দেশ্য এবং الصراط দ্বারা সোজা রাস্তা উদ্দেশ্য। এখন এই بدل উল্লেখ করে দৃঢ়তার সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুমিনদের পথই হল সেই সোজা পথ।

তানছীছের ফায়দা এভাবে যে, مبدل منه -এর মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা থাকে। আর এই অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য بدل ব্যবহার করা হয়। এই হিসেবে الصراط المستقيم -এর মধ্যেও অস্পষ্টতা থাকবে অর্থাৎ সোজা পথ বলতে কোন পথকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এখন صراط الذين انعمت عليهم উল্লেখ করে সেই অস্পষ্টতাকে দূরীভূত করা হয়েছে। সুতরাং بدل টি এমন স্পষ্ট বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, সহজ পথ হল– মুমিনদের পথ।

وَقِيْلَ اَلَّـذِيْـنَ اَنْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ : اَلْاَنْبِيَاءُ وَقِيْلَ اَصْحَابُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَبْلَ التَّحْرِيْفِ وَالنَّسْخِ وَقُرِئَ : صِرَاطَ مَنْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অনুবাদ:

কেউকেউ বলেন যে, الـذيـن انـعـمـت عليهم -এর مـصداق হল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)। আবার কেউ কেউ বলেন, এর مـصـداق হল রহিতকরণ ও পরিবর্তনের পূর্বে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) -এর সাহাবীগণ। আর صراط من انعمت عليهم ও পড়া হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: من هم المراد بالمنعم عليهم؟

উত্তর ঃ الذين انعمت عليهم **দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?**

منعم عليهم (নেয়ামতপ্রাপ্ত) কারা বা الـذيـن انعمت দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এব্যাপারে মুসান্নিফ (র.) তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এর বাইরেও আরো একটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। মোট চারটি মত এব্যাপারে রয়েছে–

১. একটু পূর্বে মুসান্নিফ (র.) বলে এসেছেন– ان الـطريق المستقيم ما يكون طريق المومنين অর্থাৎ الـذيـن انـعـمـت عـلـيهـم দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাধারণ ও সকল মুমিন। এতে বিশেষ কোন প্রকারের মুমিন উদ্দেশ্য নয়।

২. আম্বিয়ায়ে কেরাম।

৩. হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) -এর উম্মত। যারা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) -এর মাযহাব ও কিতাব বিকৃত ও রহিত হওয়ার পূর্বে ছিল।

৪. الذين انعمت عليهم দ্বারা উদ্দেশ্য হল আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীন। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এবং এটা প্রসিদ্ধ।

☆☆☆

وَالْاِنْـعَامُ اِيْصَالُ النِّعْمَةِ وَهِيَ فِي الْاَصْلِ اَلْحَالَةُ الَّتِيْ يَسْتَلِذُّهَا الْاِنْسَانُ فَاُطْلِقَتْ لِمَا يَسْتَلِذُّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَهُوَ اللِّيْنُ

অনুবাদ:

انـعـام অর্থ ঃ নেয়ামত পৌঁছনো। মূলতঃ নেয়ামত হল সেই অবস্থা যাকে মানুষ সুস্বাদু অনুভব করে। পরবর্তীতে সেসব বস্তুর জন্য ব্যবহৃত থাকে যা সুস্বাদু হয়। انعام এটা نعمة হতে নির্গত। অর্থ হল– নম্রতা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الانعام؟

উত্তর ঃ انعام **শব্দের অর্থ:**

انعام শব্দটি باب افعال -এর মাসদার, نَعْمَةٌ হতে নির্গত। অর্থ হল– বিনম্র হওয়া। আর انعام -এর

অর্থ– নেয়ামত পৌছানো, নেয়ামত দান করা। মৌলিক অর্থে নেয়ামত সেই অবস্থাকে বলে, যা মানুষের কাছে পছন্দনীয় ও সুস্বাদু অনুভূত হয়। পরবর্তীতে এর ব্যবহার সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে শুরু হয়, যাকে মানুষ সুস্বাদু ও পছন্দনীয় মনে করে।

☆☆☆

وَنِعَمُ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَتْ لَاتُحْصٰى كَمَا قَالَ تَعَالٰى: وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا. تَنْحَصِرُ فِيْ جِنْسَيْنِ : دُنْيَوِيٌّ وَاُخْرَوِيٌّ وَالْاَوَّلُ قِسْمَانِ: رُوْحَانِيٌّ كَنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ وَاِشْرَاقِه بِالْعَقْلِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الْقُوٰى كَالْفَهْمِ وَالْفِكْرِ وَالنُّطْقِ. وَجِسْمَانِيٌّ: كَتَخْلِيْقِ الْبَدَنِ وَالْقُوَى الْحَالَّةِ الَّتِيْ فِيْهِ وَالْهِيَّاتُ الْعَارِضَةُ لَهُ مِنَ الصِّحَّةِ وَكَمَالِ الْاَعْضَاءِ. وَالْكَسَبِيُّ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَنِ الرَّذَائِلِ وَتَحْلِيَتُهَا بِالْاَخْلَاقِ وَالْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ وَتَزْيِيْنُ الْبَدَنِ بِالْهَيَّاتِ الْمَطْبُوْعَةِ وَالْحُلَى الْمُسْتَحْسَنَةِ وَحُصُوْلُ الْجَاهِ وَالْمَالِ . وَالثَّانِيْ : اَنْ يَغْفِرَ مَا فَرَطَ مِنْهُ وَيَرْضٰى عَنْهُ وَيُبَوِّئَهُ فِيْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَالْمُرَادُ هُوَ الْقِسْمُ الْاٰخِيْرُ وَمَا يَكُوْنُ وُصْلَةً اِلٰى نَيْلِه مِنَ الْقِسْمِ الْاٰخِرِ فَاِنَّ مَا عَدَا ذَالِكَ يَشْتَرِكُ فِيْهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লার নেয়ামতসমূহ যদিও অগণিত, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন– যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তাহলে তোমরা গণনা করে তা শেষ করতে পারবে না। তথাপি তা দুই ধরনের নেয়ামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহলৌকিক, পরলৌকিক। প্রথমটি দুই প্রকার ঃ وهبى বা আল্লাহ প্রদত্ত ও كسبى বা উপার্জিত নেয়ামত। وهبى নেয়ামত আবার দুই প্রকার ঃ আত্মিক যেমন– বান্দার মাঝে রূহ ফুঁকে দেয়া জ্ঞান ও জ্ঞানের আনুষাঙ্গিক শক্তি তথা বুঝশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি দানের মাধ্যমে আলোকিত করা। দ্বিতীয় প্রকার হল– শারীরিক নেয়ামত, যেমন– দেহ সৃষ্টি করা, দেহের লব্ধ শক্তি, বিরাজমান অবস্থা তথা সুস্থতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। كسبى বা উপার্জিত নেয়ামতের উদাহরণ হল– আত্মাকে নিকৃষ্ট কাজ হতে পরিশুদ্ধ রাখা, আত্মাকে সৎস্বভাব ও উৎকৃষ্ট যোগ্যতা দ্বারা সুসজ্জিত করা, দেহকে উত্তম গঠন ও সুন্দর অলংকারাদি দ্বারা সাজানো, সম্মান ও সম্পদ অর্জন করা। দ্বিতীয় প্রকার পরলৌকিক নেয়ামত হল– আল্লাহ তা'লা বান্দার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে স্থান দেয়া।

আয়াতের মধ্যে নেয়ামতের সর্বশেষ প্রকার তথা পরলৌকিক নেয়ামত উদ্দেশ্য এবং শেষ প্রকার নেয়ামত হাসিলের যা মাধ্যম হয় তা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: كم نوعا للنعمة؟ اكتبوا الانواع كلها كما فى كتابكم

উত্তর ঃ اقسام النعمة **(নেয়ামতের প্রকারভেদ):**

আল্লাহ তা'লার নেয়ামত অগণিত-অসংখ্য। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন– وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (যদি তোমরা আল্লাহ তা'লার নেয়ামতরাজি গণনা কর তাহলে তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না) তথাপি নেয়ামত جنس হিসেবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত–

১. دنيوى (ইহলৌকিক)।

২. اخروى (পরলৌকিক)। ইহলৌকিক নেয়ামত আবার দু' প্রকার–

১ وهبى (আল্লাহ প্রদত্ত)।

২. كسبى (উপার্জিত)। وهبى নেয়ামত আবার দুই প্রকার–

১. روحانى (আত্মিক)।

২. جسمانى (দৈহিক)।

روحانى নেয়ামত যেমন মানুষের ভিতর রূহ ফুঁকা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার পরিপার্শ্বিক বিষয়াদি দান করা। আর جسمانى নেয়ামত যেমন মানুষের দেহ সৃষ্টি করা, তার মধ্যে শক্তি দান করা এবং দেহের পারিার্শ্বিক অবস্থা, যেমন সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি।

كسبى নেয়ামত আবার দু' প্রকার– ১. روحانى যেমন সকল মন্দ স্বভাব থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করা এবং আত্মাকে প্রশংসনীয় চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীতে শোভিত করা।

২. جسمانى (দৈহিক) যেমন দেহকে প্রিয় ও উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করা এবং সম্মান-প্রতিপত্তি ধন-সম্পদ অর্জন করা।

اخروى (পরলৌকিক) নেয়ামতের দৃষ্টান্ত হল, বান্দার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইল্লিয়্যীনের সুউচ্চ আবাস স্থলে ফেরেশতাদের সাথে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা।

আয়াতে নেয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য:

বক্ষমান আয়াতে উদ্দিষ্ট নেয়ামত হল, اخروى (পারিত্রিক) নেয়ামত এবং دنيوى (পার্থিব) নেয়ামতের মধ্যে ঐ প্রকার নেয়ামত উদ্দেশ্য যা اخروى নেয়ামত লাভের জন্য সহায়ক হয়; যেমন আত্মশুদ্ধি, উত্তম চরিত্র ও গুনাবলী অর্জন করা। কেননা, এই দুই ধরনের নেয়ামত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নেয়ামত মুমিন-কাফির সবার জন্য। অতএব তা দ্বারা মুমিনরে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ হয় না।

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾

{ তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট }

بَدْلٌ مِنَ الَّذِيْنَ عَلى مَعْنى: اِنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِيْنَ سَلِمُوا مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ اَوْ صِفَةٌ لَهٗ مَبَيِّنَةٌ اَوْ مُقَيِّدَةٌ عَلى مَعْنى اِنَّهُمْ جَعَلُوْا بَيْنَ النِّعْمَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِىَ نِعْمَةُ الْاِيْمَانِ وَبَيْنَ نِعْمَةِ السَّلَامَةِ مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ

অনুবাদ:

غير المغضوب الخ হল الذين থেকে بدل । অর্থ হল– নেয়ামতপ্রাপ্ত তারাই যারা ক্রোধ ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে। অথবা غير المغضوب হল الذين -এর صفة مبينه অথবা صفة مقيده । অর্থ হল– তারা সাধারণ নেয়ামত তথা ঈমানের নেয়ামত ও ক্রোধ ও ভ্রষ্টতা হতে নিরাপত্তার নেয়ামতের মাঝে সমন্বিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السول: غير المغضوب ما محله من الاعراب؟

উত্তর ঃ غير শব্দের قرات ও اعراب :

غير শব্দটিতে দু'টি কেরাত রয়েছে– ১. غير শব্দটি جر দিয়ে পড়া। আর এটা দুই কারণে হতে পারে।

ক. পূর্ববর্তী الذين -এর بدل হিসাবে।

খ. কারো কারো মতে, পূর্বের عليهم -এর هم যমীর থেকে بدل হিসাবে।

২. غير শব্দটি نصب দিয়ে পড়া। এমতাবস্থায় তারকীবের দিক দিয়ে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. পূর্বের عليهم -এর هم যমীর থেকে حال হয়েছে।

২. اعنى উহ্য ফে'লের مفعول হয়েছে।

৩. استثناء -এর কারেণে।

☆☆☆

وَذَالِكَ اِنَّمَا يَصِحُّ بِأَحَدِ التَّاوِيْلَيْنِ اِجْرَاءَ الْمَوْصُوْلِ مَجْرَى النَّكِرَةِ اِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَعْهُوْدٌ كَالْمُحَلَّى فِيْ قَوْلِهِ۔

وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِيْ ☆ فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ فَقُلْتُ لَا يَعْنِيْنِيْ

وَقَوْلِهِمْ: وَاِنِّيْ لَاَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُكَ فَيُكْرِمُنِيْ . اَوْ جَعْلِ غَيْرٍ مَعْرِفَةً بِالْاِضَافَةِ لِاَنَّهُ اُضِيْفَ اِلٰى مَا لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ وَهُمُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ فَيَتَعَيَّنُ تَعَيُّنَ الْحَرْكَةِ مِنْ غَيْرِ السُّكُوْنِ

অনুবাদ:

আর এটা দুই ব্যাখ্যার কোন একটির মাধ্যমে সহীহ হয়েছে। موصول -কে- نكره -এর স্থলাভিষিক্ত করে, কেননা, موصول দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কিছু উদ্দেশ্য নয়। যেমন কবির ভাষায়– ولقد امر........يعنيني আর আরববাসীদের উক্তি وانى لامر.... অথবা غير -কে- اضافت -এর মাধ্যমে معرفه বানিয়ে নেয়া হবে। কেননা, غير -কে এমন এক বিষয়ের দিকে اضافت করা হয়েছে যার একটি মাত্র বিপরীত জিনিস আছে। আর তা হল নেয়মাতপ্রাপ্ত বান্দা। সুতরাং এটা الحركة من غير السكون -এর মত নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كيف صح وقوع لفظ غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وان اضيف الى معرفة

উল্লেখ্য যে, غير المغضوب عليهم -এর কয়েকভাবে তারকীব হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল– এটা পূর্বোক্ত الذين انعمت عليهم থেকে صفت হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল– الذين ইসমে মাওসূল মা'রেফা। আর غير শব্দটি نكره। কেননা, غير শব্দটি معرفه -এর দিকে مضاف হওয়া সত্ত্বেও معرفه হয় না। বরং نكره থাকে। তাহলে نكره -কে- معرفه -এর صفة কিভাবে বলা যাবে?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর দেয়া যেতে পারে।

প্রথমত: اجراء الموصول مجرى النكرة তথা الذين ইসমে মাওসূলকে نكره -এর স্থলাভিষিক্ত বানানো হবে। অর্থাৎ নেয়ামতপ্রাপ্ত কারা বা কোন যুগের এটা যেহেতু নির্দিষ্ট নয়। তাই الذين ইসমে মাওসূল হওয়া সত্ত্বেও نكره রয়েছে। তাই غير শব্দটি نكره হওয়া সত্ত্বেও الذين -এর صفت হতে পেরেছে। যেমনভাবে ولقد امر على اللئيم يسبنى এখানে اللئيم শব্দে ال হওয়া সত্ত্বেও শব্দটি نكره হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়ত: جعل غير معرفة بالاضافة لانه اضيف الى ما له ضد واحد অর্থাৎ غير -কে- اضافت -এর মাধ্যমে معرفه বানানো হয়েছে। কেননা, এটাকে এমন বস্তুর দিকে اضافت করা হয়েছে যার মাত্র একটাই প্রতিপক্ষ রয়েছে। আর তা হল المنعم عليهم বা নেয়ামতপ্রাপ্তগণ। সুতরাং এখানে غير -এর অনির্দিষ্টতা ধর্তব্য নয়। যেমন غير سكون বা শান্ত না হওয়া মানেই গতিময়তা।

عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ عَنِ الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ وَالْعَامِلُ اَنْعَمْتَ اَوْ بِاِضْمَارِ اَعْنِىْ اَوْ بِالْاِسْتِثْنَاءِ اِنْ فُسِّرَ النِّعَمُ بِمَا يَعُمُّ الْقَبِيْلَتَيْنِ

অনুবাদ:

আবু কাছীর থেকে একটি কেরাত নসবের সাথে বর্ণিত আছে। তখন ضمير مجرور (তথা عليهم-এর هم যমীর) থেকে حال হবে। তার عامل হলো انعمت। অথবা اعنى কিংবা استثناء -এর মাধ্যমে। যদি নেয়ামত দ্বারা এমন নেয়ামত উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যা কাফির ও মুমিন উভয় দলকে শামিল রাখে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قراءة فى غير وما هى؟ بين على نهج المفسر

উত্তর ঃ غير শব্দের দু'টি কেরাত ঃ غير শব্দের মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। (১) غَيْرِ (তথা غير শব্দকে জর দিয়ে)। (২) غَيْرَ (নসব দিয়ে)। দ্বিতীয় কেরাতটি ইমাম আবু কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। غير শব্দটি نصب হবে তিন কারণে। (ক) পূর্বের عليهم-এর هم যমীর থেকে حال হওয়ার কারণে। তখন তার عامل হবে انعمت (খ) اعنى উহ্য ফে'লের مفعول به হওয়ার কারণে। (গ) استثناء হওয়ার কারণে।

☆☆☆

وَالْغَضَبُ ثَوْرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْاِنْتِقَامِ فَاِذَا اُسْنِدَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اُرِيْدَ بِهِ الْمُنْتَهٰى وَالْغَايَةُ عَلٰى مَا مَرَّ

অনুবাদ:

غضب অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকালে রক্ত উত্তেজিত হওয়া। তবে যখন غضب-কে আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন তার দ্বারা পরিণাম ও প্রান্তিক অবস্থা বুঝানো হয় পূর্বের বর্ণনানুযায়ী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الغضب؟ وكيف صح صفته تعالى بالغضب وهو من الاعراض النفسانية؟

উত্তর ঃ غضب শব্দের অর্থ:

غضب শব্দের অর্থ হল– ثوران النفس عند ارادة الانتقام অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণকালে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া বা ভীষণ রাগান্বিত হওয়া।

এখানে একটি প্রশ্ন হল– غضب তথা মনের উত্তেজনা বা রাগান্বিত হওয়া একটি عرض যা অপরের সাহায্যে কায়েম হয়। সুতরাং এটা কিভাবে আল্লাহর গুণ হতে পারে? এর উত্তর হল– غضب শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয় তখন غضب-এর ফলাফল অর্থাৎ انتقام বা প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ তখন غضب শব্দটি আল্লাহর জন্য রূপকার্থে (مجازا) ব্যবহার হয়। এখানেও রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

وَعَلَيْهِمْ فِيْ مَحَلِّ الرَّفْعِ لِاَنَّهُ نَائِبٌ مُنَابَ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ

অনুবাদ:

عليهم এটা رفع -এর স্থলে এসেছে। কেননা, এটা نائب فاعل বা فاعل -এর স্থানাধিকারী। তবে প্রথমটা (তথা انعمت عليهم -এর মধ্যকার عليهم) -এর পরিপন্থী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله عليهم فی ای محل من الاعراب

উত্তর ঃ عليهم -এর তারকীব:

المغضوب عليهم -এর মধ্যকার عليهم এটা المغضوب -এর نائب فاعل । আর نائب فاعل যেহেতু مرفوع হয় কাজেই এখানে عليهم ও نائب فاعل হিসেবে مرفوع হবে। তবে على আসার কারণে সরাসরি তো مرفوع হতে পারে না, কাজেই তা হবে محل رفع বা مرفوع -এর স্থলে।

তবে انعمت عليهم -এর মধ্যে عليهم এটা انعمت -এর مفعول به হিসেবে হরফে জরের মাধ্যমে محلا منصوب হবে।

☆☆☆

وَلَا مَزِيْدَةٌ لِتَاكِيْدِ مَا فِيْ غَيْرٍ مِنْ مَعْنَى النَّفْيِ فَكَاَنَّهُ قَالَ: لَا الْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ وَلِذَالِكَ جَازَ اَنَا زَيْدًا غَيْرُ ضَارِبٍ وَاِنْ اِمْتَنَعَ اَنَا زَيْدًا مِثْلُ ضَارِبٍ وَقُرِئَ: غَيْرَ الضَّالِّيْنَ

অনুবাদ:

لا শব্দটি غير -এর মধ্যে যে نفی -এর অর্থ রয়েছে তার تاكيد বুঝাতে অতিরিক্ত এসেছে। কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বললেন– لا المغضوب عليهم ولا الضالين । একারণেই انا زيدا غير ضارب বাক্যটি বৈধ। যদিও انا زيدا مثل ضارب বাক্যটি নিষিদ্ধ। غير الضالين (غير -এর শেষে যের দিয়েও) পড়া হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح قوله: ولا مزيدة لتاكيد ما فی غير من معنى النفی الخ

উত্তর ঃ قوله ولا مزيدة الخ **ইবারতের ব্যাখ্যা:**

মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারতে ولا الضالين -এর لا সম্পর্কে আলোচনা করছেন। لا এটা حروف زائده -এর মধ্য থেকে। তবে واو عاطفه -এর পরে لا অতিরিক্ত আনতে হলে শর্ত হল– তার পূর্বে نفی বা نهی থাকতে হবে। যেমন ما جاء نی زيد ولا عمرو । এই لا শব্দটি অতিরিক্ত আনা হয় পূর্বের نفی -কে تاكيد করার জন্য। তাছাড়া একথা পরিস্কার করে বুঝানোর জন্য যে, এ نفی টির সম্পর্ক معطوف ও معطوف عليه উভয়টির সাথে।

মোটকথা, واو عاطفه -এর পরে لا -কে অতিরিক্ত আনতে হলে তার পূর্বে نهی বা نفی থাকা শর্ত। কিন্তু ولا الضالين -এর মধ্যে لا -কে অতিরিক্ত আনা হয়েছে, অথচ তার পূর্বে نهی বা نفی কোনটিই

নেই। এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারত এনেছেন।

জবাব হল– لا -কে অতিরিক্ত আনার শর্ত এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, এর পূর্বে غير শব্দ রয়েছে, যার মধ্যে التزاما (আবশ্যকীয়ভাবে) نفي -এর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। غير -এর মধ্যে نفي -এর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে এভাবে যে, غير শব্দের মধ্যে আসল হল, غير শব্দটি مغايرة (ভিন্নতা) বুঝাবে। আর مغايرة -এর মধ্যে نفي -এর অর্থ বিদ্যমান। সুতরাং غير المغضوب -এর মধ্যে غير শব্দ مغايرة -কে সাব্যস্ত কারার জন্য এসেছে। অর্থাৎ غير -এর ما قبل ও তার পরবর্তী অংশের মধ্যখানে ভিন্নতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। منعم عليهم ও مغضوب عليهم উভয়ের মধ্যে পরস্পর বৈপরিত্ব রয়েছে। সুতরাং বান্দা صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم বলে একথা বুঝাচ্ছে যে, আমাদেরকে নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের পথে পরিচালিত করুন, যা مغضوب عليهم তথা অভিশপ্তদের ভিন্ন পথ। এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে এ মর্ম বের হয়ে আসে যে, আমাদেরকে منعم عليهم -এর পথে পরিচালিত করুন; مغضوب عليهم -এর পথে নয়। অতএব غير المغضوب عليهم -এর অর্থ হবে لا المغضوب عليهم । কাজেই ولا الضالين -এর পূর্বে যেহেতু نفى বিদ্যমান তাই لا অতিরিক্ত করে ولا الضالين বলাতে কোন প্রশ্ন থাকল না।

قوله ولذالك جاز انا زيدا غير ضارب كما جاز الخ : অর্থাৎ غير শব্দের মধ্যে نفي -এর অর্থ বিদ্যমান থাকায় انا زيدا لا ضارب -এর মত انا زيدا غير ضارب বাক্যটিও শুদ্ধ। যদিও انا زيدا مثل ضارب বাক্যটি অশুদ্ধ। তার কারণ বুঝার পূর্বে নাহুর একিট কায়দা বুঝে নিন। কায়দা হলো– مضاف -এর مضاف اليه যেরকম তার مضاف -এর পূর্বে আসতে পারে না তদ্রূপ مضاف اليه -এর معمول টিও مضاف -এর পূর্বে আসে না। সুতরাং انا مثل ضارب زيدا বাক্যে زيدا (যা ضارب মুযাফ ইলাইহির معمول)-কে مثل মুযাফের পূর্বে এনে انا زيدا مثل ضارب বলা জায়েয নেই। অবশ্য انا زيدا لا ضارب বলা জায়েয আছে। কেননা, এ মিছালটির মধ্যে ضارب -এর মা'মুল زيدا টি যদিও لا -এর পূর্বে এসেছে, কিন্তু لا যেহেতু ضارب -এর مضاف নয় কাজেই এখানে مضاف اليه -এর মা'মুল مضاف -এর পূর্বে আসছে না।

এখন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। কাযী বায়যবী (র.) বলেন, غير শব্দ نفي -এর অর্থ ধারণ করার কারণে لا -এর স্থানাধিকারী। আর لا -এর পূর্বে তার مدخول -এর معمول টি আসতে পারে। সুতরাং انا زيدا لا ضارب বলা বিশুদ্ধ হবে। তদ্রূপ انا زيدا غير ضارب ও বিশুদ্ধ। غير শব্দ لا -এর স্থানাধিকারী হওয়ার কারণে غير ضارب টি لا ضارب -এর স্থানাধিকারী। আর لا ضارب -এর মধ্যে اضافت নেই, অনুরূপ غير ضارب -এর মধ্যেও اضافت না থাকারই মত। এজন্যই غير ضارب -এর মধ্যে ضارب -এর معمول -কে غير -এর পূর্বে আনা বিশুদ্ধ।

وَالضَّلَالُ اَلْعُدُوْلُ عَنِ الطَّرِيْقِ السَّوِيِّ عَمَدًا اَوْ خَطَأً وَلَهٗ عَرْضٌ عَرِيْضٌ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ اَدْنَاهُ وَاَقْصَاهُ كَثِيْرٌ

অনুবাদ:

ضلال অর্থ ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া। এর সীমারেখা বিস্তীর্ণ। তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الضلال؟

উত্তর ঃ ضلال শব্দের অর্থ:

ضلال শব্দটি باب ضرب -এর মাসদার। অর্থ হল– সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া। চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলক্রমে হোক।

এই ضلال -এর সীমারেখা অতি ব্যাপক এবং তার স্তর অনেক রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তরের ভ্রষ্টতা হল– উত্তম বিষয়কে পরিহার করা, আর সর্বোচ্চ স্তরের ভ্রষ্টতা হল স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা বা কুফরী করা। ভ্রষ্টতার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে অনেক স্তর।

☆☆☆

وَقِيْلَ اَلْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ اَلْيَهُوْدُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمِنْهُمْ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَالضَّالِّيْنَ اَلنَّصَارٰى لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَقَدْ رُوِىَ مَرْفُوْعًا وَيَتَّجِهُ اَنْ يُقَالَ اَلْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ اَلْعُصَاةُ وَالضَّالُّوْنَ اَلْجَاهِلُوْنَ بِاللّٰهِ لِاَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ مَنْ وُفِّقَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ لِذَاتِهٖ وَالْخَيْرِ لِلْعَمَلِ بِهٖ فَكَاَنَّ الْمُقَابِلَ لَهٗ مَنِ اخْتَلَّ اِحْدٰى قُوَّتَيْهِ اَلْعَاقِلَةِ وَالْعَامِلَةِ وَالْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ فَاسِقٌ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فِى الْقَاتِلِ عَمَدًا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُخِلُّ بِالْعِلْمِ جَاهِلٌ ضَالٌّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন যে, المغضوب عليهم হল ইয়াহুদী। কেননা, আল্লাহ তা'লা বলেছেন– তাদের মধ্য থেকে কতক লোক এমন রয়েছে, যাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর الضالين হল নাসারা। কেননা, আল্লাহ তা'লা বলেছেন– ইতঃপূর্বে তারা পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। এব্যাপারে مرفوع হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এভাবে বলা উত্তম যে, المغضوب عليهم দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোনাহগার আর الضالين দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ। কেননা, নেয়ামতপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি যার মাঝে আল্লাহ তা'লাকে

জানার সত্য জ্ঞান এবং বাস্তব আসলের জন্য উত্তম বুদ্ধির মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুতরাং এর প্রতিপক্ষ হবে সেই ব্যক্তি যার মাঝে قوت عاقله ও قوت عامله-এর মধ্য হতে কোন একটির মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আমলে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী হল আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত, ফাসেক। কেননা, আল্লাহ তা'লা স্বেচ্ছায় হত্যাকরীর ব্যাপারে বলেছেন– আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন। আর জ্ঞানের ত্রুটিকারী ব্যক্তি মূর্খ, পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'লা বলেছেন– সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: من هم المراد في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟

উত্তর ঃ المغضوب عليهم এবং الضالين দ্বারা উদ্দেশ্য কারা সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত তুলে ধরেছেন।

১. المغضوب عليهم দ্বারা ইয়াহুদী জাতি উদ্দেশ্য। কেননা, ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, فمنهم لعنه الله وغضب عليه এতে তাদের ব্যাপারে غضب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আর الضالين দ্বারা খৃস্টান জাতি উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা অন্যত্র ইরশাদ করেন, قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا এতে খৃষ্টনদের ব্যাপারে ضلال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. المغضوب عليهم দ্বারা পাপিষ্ঠলোক উদ্দেশ্য। আর الضالين দ্বারা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞলোক উদ্দেশ্য। কেননা, منعم عليهم হল যাদেরকে আল্লাহর পবিত্র সত্তার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করা হয়েছে।

অতএব এর বিপরীতে কর্মগত অপরাধীকে ফাসিক (পাপিষ্ঠ) এবং المغضوب عليهم বলা হয়। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে– غضب الله عليهم আর বিশ্বাসগত অপরাধীকে ضالين বলা হয়। কারণ কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فما ذا بعد الحق الا الضلال ।

☆☆☆

﴿امِيْنَ﴾

اميــن শব্দের মধ্যে চারটি আলোচনা রয়েছে– (১) اميــن শব্দের অর্থ (২) তার পঠন পদ্ধতি (৩) তার ফযীলত (৪) ফেকহী মাসআলা। মুসান্নিফ (র.) একেকটি করে প্রত্যেকটির আলোচনা করবেন। নিম্নের ইবারতে امين -এর অর্থ ও তার পঠন পদ্ধতি বর্ণনা করছেন।

امِيْنَ اِسْمُ الْفِعْلِ الَّذِىْ هُوَ اِسْتَجِبْ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ اِفْعَلْ بُنِىَ عَلَى الْفَتْحِ كَأَيْنَ لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَجَاءَ مَدُّ اَلِفِه وَقَصْرِهَا قَالَ: وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنًا وَقَالَ اٰخَرُ اٰمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا

অনুবাদ:

امين শব্দের অর্থ

امين শব্দটি اسم فعل যা استجب (কবুল করুন) -এর অর্থ দিচ্ছে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত– আমি রাসূল (সা.) -কে এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, افــعــل । দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার করাণে اميــن শব্দের শেষাক্ষরকে فتــحــه -এর উপর مبنـى করা হয়েছে। যেমন اين । امين -এর আলিফকে টেনে ও খাটো করে উভয়ভাবে পড়া যায়। কবি বলেন– يـرحـم الله عبدا قال امينا । অন্য একজন বলেছেন– امين فزاد الله ما بيننا بعدا

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: حقق لفظ امين

উত্তর ঃ امين শব্দটি استجب অর্থে اسم فعل । অর্থাৎ امين হল اسم فعل , যার অর্থ হল استجب (কবুল করুন)।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) -কে اميــــــن সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, افعل অর্থাৎ افعل فعل الاستجابة । (আপনি কবূল করুন)।

প্রশ্ন: امين শব্দ যেহেতু اسم فعل , আর اسم فعل টি مبنى হয়। আর مبنى -এর আসল হল سكون । তাহলে امين টি مبنى على الفتحه কেন?

উত্তর: اميـن -এর মধ্যে যেহেতু يـا টি সাকিন কাজেই এখন نـون -কেও সাকিন করলে اجتـمـاع ساكنين আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা নাজায়েয। তাই نون -কে فتحه দেয়া হয়েছে।

امين শব্দের পঠন-পদ্ধতি:

امين -এর همزه -কে টেনে ও খাটো করে উভয় রকম পড়া যায়। মুসানিফ (র.) امين -এর همزه -কে টেনে পড়ার উপর প্রমাণস্বরূপ ويـرحـم الله عبدا قال امينا এই পংক্তিটি উল্লেখ করেছেন। আর খাটো করে পড়ার উপর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন امين فزاد الله ما بيننا بعدا ।

☆☆☆

وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وِفَاقًا لٰكِنْ يُسَنُّ خَتْمُ السُّوْرَةِ بِه لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَلَّمَنِىْ جِبْرَئِيْلُ اٰمِيْنَ عِنْدَ فِرَاغِىْ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: اِنَّهٗ كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ وَفِىْ مَعْنَاهُ قَوْلُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ خَتَمَ بِه دُعَاءَ عَبْدِه

অনুবাদ:

امين পাঠের ফযীলত

সর্বসম্মতিক্রমে امين শব্দটি কুরআনের অংশ নয়। তবে এর দ্বারা সূরা ফাতেহা শেষ করা সুন্নাত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন– জিবরাঈল (আ.) আমাকে امين বলা শিক্ষা দিয়েছেন সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করার মুহূর্তে। আর বলেছেন যে, امين হল চিঠিতে সীলমোহর মারার সমতুল্য। এই অর্থে হযরত আলী (রা.) -এর ভাষ্যও রয়েছে যে, امين হল রাব্বুল আলামীনের সীলমোহর। এর দ্বারা তিনি স্বয়ং বান্দার দো'আতে মোহর এঁটে দেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ﴿امين﴾ جزء من القرأن ام لا وما الاختلاف فيه؟ بين مع ترجيح الراجح

উত্তর ঃ امين সম্পর্কে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এটা কুরআনের অংশ নয়। একারণেই সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করে একটু থেমে امين বলা সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মুজাহিদ (র.) -এর মতে, এটা কুরআনের অংশ। কিন্তু তাদের এ উক্তিটি নিতান্ত বাতিল। কেননা, এটা সাহাবা থেকেও বর্ণিত নয়, তাবেঈন থেকেও বর্ণিত নয় এবং ওছমান (রা.) -এর মাসহাফেও ছিল না। তবে সূরা ফাতেহা পড়ার পর امين বলা সুন্নাত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন– জিবরাঈল (আ.) আমাকে امين শিক্ষা দিয়েছেন সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করার মুহূর্তে। আর বলেছেন, امين হল চিঠিতে সীলমোহর মারার সমতুল্য।

☆☆☆

يَقُوْلُهُ الْإِمَامُ وَيُجْهِرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَايَقُوْلُهُ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْهُ اَنَّهُ يُخْفِيْهِ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَاَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا..... وَالْمَامُوْمُ يُؤَمِّنُ مَعَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا امِيْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ امِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

অনুবাদ:

امين সংক্রান্ত ফেকৃহী মাসআলা

ইমাম امين বলবে। উচ্চঃস্বরে কেরাত পড়লে امينও উচ্চঃস্বরে বলবে। কেননা, ওয়ায়েল ইবরে হাজার (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) যখন ولا الضالين পড়তেন তখন তিনি امين বলতেন এবং আওয়াজকে উঁচু করতেন। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণিত যে, ইমাম امين বলবে না। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হল, ইমাম নিচুস্বরে امين বলবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ও আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর মুক্তাদী ইমামের সাথে امين বলবে। কেননা, রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন– যখন ইমাম ولا الضالين বলবে তখন তোমরা امين বলবে। কেননা, যার امين বলা ফেরেশতার امين বলার সাথে হবে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

امين সংক্রান্ত তিনটি ফেকহী মাসআলা:

এব্যাপারে সকলেই একমত যে, একাকী নামাযী ব্যক্তির জন্য امين বলা সুন্নাত। দলীল হল– হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ امين বলে আর আকাশের ফেরেশতারা امين বলে এবং উভয়ের امين বলা একই সাথে হয়, তাহলে সেই امين পাঠকারী ব্যক্তির পিছনের সমস্ত সগীরাহ গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

এই হাদীসে রাসূল (সা.) احدكم শব্দ ব্যবহার করেছেন যা একাকী নামায আদায়কারী ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই শামিল রয়েছে। এই হাদীস দ্বারা সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তিনটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়া জরুরী।

১. যদি জামা'তে নামায আদায় করা হয়, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য আমীন বলা সুন্নাত নাকি যে কোন একজনের জন্য সুন্নাত?

২. একথা তো সর্বজনস্বীকৃত যে, ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে কিন্তু মুক্তাদী আমীন বলবে কি না?

৩. এব্যাপারে তো ঐকমত্য রয়েছে যে, আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের দায়িত্ব কিন্তু আমীন উচ্চস্বরে বলবে না নীচুস্বরে?

উপরোক্ত তিনটি মাসআলাই বিরোধপূর্ণ। সেগুলোকে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম মাসআলা

ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, কেবল মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নাত। ইমামের জন্য নয়। অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, উভয়ের জন্য সুন্নাত।

ইমাম মালিক (র.) -এর দলীল ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন হে মুক্তাদীগণ ! যখন ইমাম ولا الضالين বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে।

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমীন বলবে কেবল মুক্তাদীরা। কেননা, রাসূল (সা.) দু'টি কাজকে ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। ইমামের দায়িত্ব ولا الضالين বলা আর মুক্তাদীর দায়িত্ব আমীন বলা। সুতরাং কেবল মুক্তাদী আমীন বলবে।

অন্য ইমামদের দলীল ঃ স্বয়ং ইমাম মালিক ও অন্য একদল মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন– اذا امن الامام فامنوا যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও (মুক্তাদীরা) আমীন বলো।

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আমীন বলা ইমামেরও দায়িত্ব। কেননা, রাসূল (সা.) ইমামের আমীন বলার পর মুক্তাদীর আমীন বলাকে معلق করেছেন। কাজেই আগে ইমামের আমীন বলতে হবে, তারপর মুক্তাদী আমীন বলবে। বুঝা যাচ্ছে, আমীন বলা ইমামেরও দায়িত্ব আবার মুক্তাদীরও দায়িত্ব।

ইমাম মালিকের হাদীসের উত্তর হল

আপনি যে হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তার শেষে বলা হয়েছে فان الامام يقوله কেননা, ইমাম আমীন বলবে। এর দ্বারা ইমামের আমীন বলা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা

আহনাফ ও শাওয়াফে' এব্যাপারে একমত যে, سرى নামাযে ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে কিন্তু মুক্তাদী سرى নামাযে আমীন বলবে কি-না এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, سرى নামাযে মুক্তাদীও আমীন বলবে।

দলীল হল– মুক্তাদীর উপরে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। আর আমীন হল সূরা ফাতেহার মোহর। সুতরাং যার দায়িত্বে রয়েছে সূরা ফাতেহা পাঠ করা তার দায়িত্বে আমীন বলাও সুন্নাত হবে। কাজেই মুক্তাদীকে আমীন বলতে হবে।

হানাফী ইমামদের এব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কিছুসংখ্যক হানাফী ইমামগণ বলেন যে, যদি سرى নামাযে ইমাম ولا الضالين বলে আর মুক্তাদী তা শ্রবণ করে, তাহলে শ্রবণকারীর দায়িত্ব হল আমীন বলা।

আর কিছুসংখ্যক হানাফী ইমাম বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর আমীন বলার দায়িত্ব নেই।

উপরোল্লেখিত দু'টি মতের ভিত্তিতে একথা জানা গেল যে, যদি ইমামের আওয়াজ কর্ণগোচর না হয়, তাহলে কোন হানাফী ইমামের মতে আমীন বলা মুক্তাদীর দায়িত্ব নয়।

তৃতীয় মাসআলা

এব্যাপারে উভয় ইমাম একমত যে, جهرى নামাযে আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের দায়িত্ব। কিন্তু আমীন সশব্দে বলবে না নিঃশব্দে বলবে এব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

আহনাফ বলেন যে, উভয়ের উপর নিঃশব্দে আমীন বলা জরুরী।

শাওয়াফে' বলেন, উভয়ের উপর সঃশব্দে আমীন বলা জরুরী।

শাফেয়ীর (র.) দলীল

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন ولا الـضـالـين বলতেন তখন সাথে সাথে امين বলতেন এবং উচ্চ আওয়াজে বলতেন।

আহ্নাফের দলীল

হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তার পিতা আলকামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলের (সা.) পিছনে নামায পড়েছেন। যখন রাসূল (সা.) غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলেছেন, তখন তিনি আমীন বলেছেন এবং আমীনের মধ্যে আওয়াজকে হীন করেছেন"। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) আমীনের মধ্যে আওয়াজকে নিচু ও হীন করেছেন। কাজেই আমীন আস্তে বলবে।

ইমাম শাফেয়ীর (র.) হাদীসের উত্তর

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা.) থেকে অন্য সনদে এভাবে বর্ণিত আছে যে, وخفض بها صوته অর্থাৎ রাসূল (সা.) আওয়াজকে নিচু করেছেন। কাজেই একই রাবীর রেওয়ায়াতের মধ্যে যেহেতু বিভিন্নতা রয়েছে, এজন্য এ দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

☆☆☆

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لِأُبَيِّ اَلَا اُخْبِرُكَ بِسُوْرَةٍ لَمْ تَنْزِلْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ اِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ بَيْنَنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ: اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ تَقْرَاُ حَرْفًا مِنْهَا اِلَّا اُعْطِيْتَهٗ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اِنَّ الْقَوْمَ يَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَيَقْرَاُ صَبِىٌّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ فِى الْكِتَابِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَسْمَعُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَالِكَ الْعَذَابَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

অনুবাদ:

সূরা ফাতেহার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) হযরত উবাই (রা.) -কে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন এক সূরা সম্পর্কে সংবাদ দিব যার সমমর্যাদার সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও

কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ (বলুন) হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন, ফাতেহাতুল কিতাব, এটা সাবয়ে মাছানী এবং সেই মহা কুরআন যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা আমরা রাসূলের (সা.) নিকট ছিলাম। হঠাৎ তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন। এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের সংবাদ দিচ্ছি যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনার পূর্বে কোন নবী তা প্রাপ্ত হয়নি। তা হল ফাতেহাতুল কিতাব ও বাকারার শেষ আয়াতসমূহ।-এর কোন একটি অক্ষর পাঠ করলেই আপনাকে সেই নূর দেয়া হবে। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, কোন জাতির প্রতি আল্লাহ সুনিশ্চিতরূপে শাস্তি প্রেরণ করবেন, ফলে তাদের বাচ্চাদের মধ্যে কোন বাচ্চা কুরআনের الحمد لله رب العالمين পাঠ করবে। আল্লাহ তা'লা তা শ্রবণ করে তাদের থেকে সেই শাস্তি চল্লিশ বৎসরের জন্য উঠিয়ে নেবেন।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ ايُهَا مِأَتَان وَسَبْعٌ وَثَمَانُوْنَ

সূরা বাকারা মদীনাবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি }

﴿الم﴾

{ আলিফ-লাম মীম }

الـم শব্দের মধ্যে চারটি আলোচনা। ১ম আলোচনা: الـم শব্দের বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: তার ব্যাখ্যা। ৩য় আলোচনা: তারকীব। ৪র্থ আলোচনা: الم এবং অন্যান্য حـروف مـقطعات আয়াত কি না।

الٓمٓ وَسَائِرُ الْاَلْفَاظِ الَّتِىْ يُتَهَجَّأُ بِهَا اَسْمَاءُ مُسَمَّيَاتُهَا اَلْحُرُوْفُ الَّتِىْ رُكِّبَتْ مِنْهَا الْـكَـلِمُ لِدُخُوْلِهَا فِىْ حَدِّ الْاِسْمِ وَاِعْتِوَارِ مَا يَخْتَصُّ بِه مِنَ التَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّصْغِيْرِ وَنَحْوِ ذَالِكَ عَلَيْهَا وَبِه صَرَّحَ الْخَلِيْلُ وَاَبُوْ عَلِيٍّ وَمَا رَوٰى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رض ـ اَنَّـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الـم حَـرْفٌ بَـلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ ـ فَالْمُرَادُ بِه غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِىْ اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ فَاِنَّ تَخْصِيْصَ الْحَرْفِ بِه عُرْفٌ مُجَدَّدٌ بَلِ الْمَعْنَى اللُّغَوِىُّ وَلَعَلَّهٗ سَمَّاهُ بِاِسْمِ مَدْلُوْلِه

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: الم শব্দের বিশ্লেষণ

সূরা বাকারা মদীনাবতীর্ণ। এতে দু'শত সাতাশটি আয়াত রয়েছে। الـم ও আন্যান্য تهـجـى শব্দগুলো হল اسم । যার مسمى (নামীয় বস্তু) হল ঐ সকল অক্ষর যদ্বারা শব্দ গঠিত হয়। (تهجى -এর শব্দাবলীকে اسم বলা হয়েছে) কেননা, এগুলো اسم -এর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এবং اسم -এর বৈশিষ্ট্য তথা মা'রেফা হওয়া, নাকেরা হওয়া, বহুবচন হওয়া এবং তাছগীর হওয়া এসব একে একে তার মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া নাহুবিশারদ আল্লামা খলীল এবং আবু আলী اسـم হওয়ার অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর ইবনে মাসউদ (রা.) যে উক্তি করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য (দুনয়িাতে) এক নেকী লাভ হবে এবং (আখেরাতে) সেই এক নেকীর বদলা দশগুণ নেকী লাভ হবে। আমি একথা

বলব না যে, الـــم হল একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। সুতরাং এর দ্বারা সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয় যার উপর পরিভাষা কায়েম হয়েছে। কেননা, হরফের এ বিশেষ অর্থের সাথে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া এটা নতুন পরিভাষা; বরং হরফ দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। আবার এও হতে পারে যে, রাসূল (সা.) সেগুলোকে তার مـــدلـــول -এর নাম দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السـوال: الـم اى قسـم مـن اقسام الكلمات الثلاث؟ ان كان اسما فما معنى قوله الف حرف الخ وان كان حرفا فكيف قول المفسر اسما مسمياتها الخ اوضح الجواب

উত্তর ঃ الم ইসিম না হরফ?

الم ও এ জাতীয় যত الفاظ تهجى রয়েছে সবগুলো হল اسم । আর সেগুলোর مسمى (নামীয় বস্তু) হল এমন হরফসমূহ যদ্বারা আরবী শব্দমালা গঠিত হয়। الـم ও অন্যান্য الـفـــاظ تهـجـى ইসিম হওয়ার স্বপক্ষে আল্লামা বায়যাবী (র.) তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১..এগুলো اسم -এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। কেননা, যে كـلـمـه স্বনির্ভর অর্থ প্রদান করে এবং তিন কালের কোন এক কালের সাথে সম্পর্ক রাখে না তাকে اسـم বলে। আর الــفـــاظ تهــجــى গুলোও স্বনির্ভরভাবে কোন কালের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যতীতই حروف مبانى বুঝায়।

২. এগুলোর মাঝে اســـــم -এর বৈশিষ্ট্য তথা মা'রেফা হওয়া, নাকেরা হওয়া এবং তাছগীর হওয়া এসব একে একে সেগুলোর মাঝে পাওয়া যায়। যেমন: الالف , الف এবং তার তাছগীর اليف ।

৩. নাহুবিশারদ আল্লামা খলীল এবং আবু আলী এগুলো اســــم হওয়ার অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হল– হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন– مـن قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف بـل الف حرف الخ এ হাদীসে حـرف هـجائى -কে حرف বলা হয়েছে। অতএব এগুলো اسم হওয়ার দাবী করা বাতিল হয়ে গেল। এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে হরফ দ্বারা নাহভীদদের পারিভাষিক حــــرف উদ্দেশ্য নয়। কেননা, হরফের সংজ্ঞা নব সৃষ্টি যা রাসূলের যুগে ছিল না। বরং এখানে হরফ দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। حرف -এর আভিধানিক অর্থ হল, كلمه (শব্দ), طرف (পার্শ্ব)। অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোকে রূপকভাবে مدلول অর্থাৎ حروف هجاء -এর নামে নামকরণ করেছেন।

وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا حُرُوْفًا وِحْدَانًا وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ صَدَرَتْ بِهَا لِيَكُوْنَ تَادِيَتُهَا بِالْمُسَمَّى أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ السَّمْعَ وَاسْتُعِيْرَتِ الْهَمْزَةُ مَكَانَ الْاَلِفِ لِتَعَذُّرِ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا

অনুবাদ:

যেহেতু الفاظ تهجى -এর مسمى গুলো একক অক্ষর অথচ الفاظ تهجى হল مركب (যুক্তাক্ষর)। কাজেই الفاظ تهجى -কে তার مسمى দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে সর্বপ্রথম গোচরীভূত শব্দটি الفاظ تهجى -এর مسمى -এর উচ্চারণ হয়। আর আলিফ দ্বারা প্রারম্ভ অসম্ভব বলে আলিফের স্থলে হামযাকে আনা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح قول المفسر: ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا الخ

উত্তর ঃ قوله ولما كانت مسمياتها الخ: এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল– আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, الفاظ تهجى যেমন: الف. باء. تاء. ثاء ইত্যাদিকে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে এবং লেখার ক্ষেত্রে مسمى যেমন: ا. ب. ت. ث -কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়। তার কারণটা কি?

উত্তর হল– الفاظ تهجى -এর مسمى গুলো একক অক্ষর এবং بسيط পক্ষান্তরে তার اسم গুলো হল مركب। এখন এ ইসিমগুলোর মূল অক্ষরগুলোকে বিন্যাস দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম তার مسمى -কে উল্লেখ করা হবে। যাতে প্রথমেই مسمى -এর উচ্চারণ শ্রোতাকে সতর্ক করে দেয় যে, এটা অমূক حرف -এর ইসিম।

এখন প্রশ্ন হবে যে, আপনি যে বলেছেন, الفاظ تهجى -এর উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে বা তা লেখার ক্ষেত্রে مسمى -কে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হল– শ্রোতা যেন বুঝে নেয় যে, "এটা অমূক অক্ষরের ইসিম" একথাটা তো আলিফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, আলিফকে হামযা দ্বারা শুরু করা হয়। কাজেই বলতে হবে যে, হয়ত আপনার কথা ঠিক নেই অথবা হামযা দ্বারা লেখা ঠিক নেই। আসলে ব্যাপারটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হল– আলিফের مسمى অর্থাৎ ا (আলিফ) হল সাকিন। এখন যদি এটাকে শুরুতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ساكن দ্বারা শুরু করা আবশ্যক হবে। অথচ ساكن দ্বারা শুরু করা অসম্ভব। তাই এ অসম্ভবকে দূর করার জন্য হামযা আনা হয়েছে।

وَهِيَ مَا لَمْ تَلِهَا الْعَوَامِلُ مَوْقُوْفَةٌ خَالِيَةٌ عَنِ الْإِعْرَابِ لِفَقْدِ مُوْجِبِه وَمُقْتَضِيْه لٰكِنَّهَا قَابِلَةٌ إِيَّاهُ مُعْرِضَةٌ لَهُ إِذْ لَمْ تُنَاسِبْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ وَلِذَالِكَ قِيْلَ صَ و قَ مَجْمُوْعًا فِيْهِمَا بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ وَلَمْ يُعَامَلْ مُعَامَلَةَ أَيْنَ وَهٰؤُلَاءِ

অনুবাদ:

এ الفاظ تهجى ওয়াক্বফ (সাকিন) হবে এবং اعراب মুক্ত থাকবে যতক্ষণপর্যন্ত এগুলো عامل -এর সাথে যুক্ত হবে না। কেননা, তখন সেগুলোর মধ্যে اعراب -এর কারণ পাওয়া যায় না। তবে সেগুলোর মধ্যে اعراب গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে। কেননা, সেগুলো مبنى اصل -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। আর এগুলো ওয়াক্বফ হিসেবে সাকিন হওয়ার কারণেই ص. ق -কে দুই সাকিন একত্রিত

অবস্থায় পাঠ করা হয় এবং শেষে فتحه দিয়ে اين -এর মত ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: الٓم وغيرها من المقطعات معربة ام مبنية؟ اجب مع بيان الوجه

উত্তর ঃ الفاظ تهجى গুলো معرب নাকি مبنى

قوله وهى ما لم تلها العوامل الخ : এখান থেকে الفاظ تهجى গুলো ম'রাব না মাবনী? তার আলোচনা শুরু করছেন। الم ও অন্যান্য الفاظ تهجى মু'রাব না মাবনী সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন– এ হরফগুলো عامل -এর সাথে যুক্ত না হলে مبنى হবে। তবে যেহেতু এ হরফগুলো مبنى اصل -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না তাই معرب হওয়ারও যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ এগুলোর পূর্বে عامل আসলে معرب হবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্বফ অবস্থায় এগুলোর শেষে যে ساكن হয় তা مبنى -এর سكون নয়; বরং এ سكون টা ওয়াক্বফ হিসেবে হয়ে থাকে। اين ইত্যাদির শেষে اجتماع ساكنين থেকে বাঁচার জন্য যেরূপ হরকত দেয়া হয়, الفاظ تهجى -এর শেষে اجتماع ساكنين থেকে বাঁচার জন্য সেরকম হরকত দেয়া হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, الفاظ تهجى গুলো মু'রাব।

☆☆☆

ثُمَّ اِنَّ مُسَمَّيَاتِهَا لَمَّا كَانَتْ عُنْصُرُ الْكَلَامِ وَبَسَائِطُ الَّتِىْ تَرَكَّبَ مِنْهَا اِفْتَتَحَتِ السُّوَرُ بِطَائِفَةٍ مِنْهَا اِيْقَاظًا لِمَنْ تَحَدّٰى بِالْقُرْاٰنِ وَتَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمَتْلُوَّ عَلَيْهِمْ كَلَامٌ مَنْظُوْمٌ مِمَّا يَنْظِمُوْنَ مِنْهُ كَلَامَهُمْ فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَمَا عَجِزُوْا عَنْ اٰخِرِهِمْ مَعَ تَظَاهُرِهِمْ وَقُوَّةِ فَصَاحَتِهِمْ عَنِ الْاِتْيَانِ بِمَا يُدَانِيْهِ وَلِيَكُوْنَ اَوَّلَ مَا يَقْرَعُ الْاَسْمَاعَ مُسْتَقِلًّا بِنَوْعٍ مِنَ الْاِعْجَازِ فَاِنَّ النُّطْقَ بِاَسْمَاءِ الْحُرُوْفِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ خَطَّ وَدَرَسَ فَاَمَّا مِنَ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ لَمْ يُخَالِطِ الْكُتَّابَ فَمُسْتَغْرُبٌ مُسْتَبْعَدٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كَالْكِتَابَةِ وَالتِّلَاوَةِ سِيَّمَا وَقَدْ رَاعٰى فِىْ ذَالِكَ مَا يُعْجِزُهُ عَنْهُ الْاَدِيْبُ الْاَرِيْبُ الْفَائِقُ فِىْ فَنِّه

অনুবাদ:

অত:পর الفاظ تهجى -এর مسمى গুলো যেহেতু বাক্যের মূল অক্ষর ও তার এমন একক অক্ষর যার মাধ্যমে বাক্য গঠিত হয়। এজন্য সূরাকে (অর্থাৎ সূরা বাকারাকে) الفاظ تهجى -এর একটি অংশ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদেরকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করার করতে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে যে, পঠিতব্য কুরআন সেসব অক্ষর

দ্বারা গঠিত কালাম যার দ্বারা তারা তাদের কথাকে গেঁথে থাকে। সুতরাং যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে তারা নিজেদের সাহিত্যালংকারের ক্ষুরধারত্ব ও পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সেই কালামের অনুরূপ কালাম উপস্থাপন করতে অক্ষম হতো না। আর (এ কারণে শুরুতে আনা হয়েছে) যাতে সর্বপ্রথম গোচরীভূত শব্দ এক ধরনের স্বতন্ত্র অলৌকিক বস্তুতে পরিণত হয়। কেননা, الـفـاظ تهـجـى -এর মাধ্যমে কথা-বার্তা বলা সেই ব্যক্তির সাথে খাছ যে লেখা-পড়া জানে। আর সেই অশিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন লেখক ব্যক্তির সাথে উঠা-বসা করে নি তার থেকে এসব কথা-বার্তা দুর্লভ, দুর্বোধ্য ও স্বভাব বহির্ভূত ব্যাপার। যেমন (অশিক্ষিতের জন্য) লেখাপড়া (এক দুর্বোধ্য বিষয়)।

বিশেষ করে (স্বভাব বহির্ভূত হবে তখনই) যখন সে সেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যেগুলো থেকে পারদর্শি সাহিত্যিকও অক্ষম হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: الحروف المقطعات ما هى ولم افتتحت سورة القرآن بها؟

উত্তর ঃ حروف مقطعات-দ্বারা কুরআনের সূরা আরম্ভ করার কারণ

আল-কুরআনের ২৯টি সূরার প্রারম্ভে الـــــــــم এধরনের হরফ স্থান পেয়েছে। ইলমে তাফসীরের পরিভাষায় এগুলোকে الحروف المقطعات তথা স্বতন্ত্র উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন শব্দমালা বলে।

حروف مقطعات দ্বারা সূরা আরম্ভ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি কারণ প্রদর্শন করেছেন।

১. ايقـاظـا لـمـن تحدى بالقرآن অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা নিয়ে কাফিরদের সন্দেহ পোষণ করায় আল-কুরআন তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছিল। এসব حـــــرف ব্যবহার করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে যেসকল বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা উল্লেখ করা হয়েছে এ গ্রন্থখানি সে সকল বর্ণমালা দ্বারাই গঠিত। আর এ সকল হরফ তোমরা নিজেদের কথোপকথন, রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করে থাকো। এ পবিত্র গ্রন্থ যদি আল্লাহর কিতাব না হয়ে মানব রচিত হতো তাহলে তোমরাও অবশ্যই অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারতে।

২. حروف مقطعات দ্বারা সূরা আরম্ভ করার আকেটি কারণ হল– সূরার প্রারম্ভকালেই যে বিচ্ছিন্ন বর্ণের নাম তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তা যেন স্বতন্ত্রভাবে মু'জিযারূপে প্রকাশিত হয়। কেননা, এ বর্ণগুলোর নামসহ সঠিক উচ্চারণ কেবল মাত্র লেখাপড়া জানা ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। পক্ষান্তরে নিরক্ষর ব্যক্তি থেকে এর উচ্চারণ নিশ্চয় অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) যেহেতু امـــــى তথা নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর দ্বারা এগুলো উচ্চারণ হওয়া তাঁর অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে এবং আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়া বুঝায়।

وَهُوَ اَنَّهُ اَوْرَدَ فِيْ هٰذِهِ الْفَوَاتِحِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ اَسْمَاءَ هِيَ نِصْفُ اَسَامِيْ حُرُوْفِ الْمُعَجَّمِ اِنْ لَمْ تُعَدَّ فِيْهَا الْاَلِفُ حَرْفًا بِرَأْسِهَا وَفِيْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ سُوْرَةً بِعَدَدِهَا اِذَا عُدَّ فِيْهَا الْاَلِفُ مُشْتَمِلَةً عَلٰى اَنْصَافِ اَنْوَاعِهَا

অনুবাদ:

সেই (লক্ষণীয়) বিষয় হল– তিনি এসব সূরার শুরুতে এমন চৌদ্দটি শব্দ এনেছেন যেগুলো حروف المعجم -এর অর্ধেক, যদি আলিফকে তাতে পৃথক কোন অক্ষর গণনা করা না হয়। তারই সংখ্যা অনুরূপ উনত্রিশটি সূরার মধ্যে যখন তাতে আলিফকে গণনা করা হবে (আর) সেগুলো حروف معجم -এর বিভিন্ন প্রকারের অর্ধেক অর্ধেক হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন ঃ সূরার শুরুতে الفاظ تهجى আনার কারণে অলৌকিকতা কিভাবে প্রকাশ পেল?

উত্তর ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, সূরার শুরুতে حروف مقطعات আনার কারণে রাসূলের অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হল– এ অলৌকিকতা কিভাবে প্রকাশ পেল।

এর উত্তর হল– আমরা জানি যে, আরবী হরফ ২৯টি। সর্বপ্রথম অক্ষর الف আর সর্বশেষ অক্ষর ياء তবে আবুল আব্বাসের নিকট আরবী হরফ ২৮টি। সর্বপ্রথম হরফ باء আর সর্বশেষ অক্ষর ياء । কেমন যেন আবুল আব্বাস الف -কে অক্ষর হিসেবে গ্রহণ করেন নি। আর আমরা সাধারণ মানুষরা الف -কে অক্ষর হিসাবে গ্রহণ করে থাকি।

একদিকে আরবী অক্ষর ২৯টি। অপরদিকে ২৯টি সূরার শুরুতে حروف مقطعات -কে আনা হয়েছে। ৮টি সূরার মধ্যে এসেছে الم ৫টি সূরাতে এসেছে الر , ৬টি সূরার মধ্যে এসেছে حم , ২টি সূরার মধ্যে طسم , ১টি সূরাতে এসেছে يس , ১টি সূরাতে এসেছে كهيعص , ১টি সূরাতে এসেছে طه , ১টি সূরাতে এসেছে طس , ১টিতে এসেছে حمعسق , ১টিতে এসেছে ق , আর ১টিতে এসেছে ص , আর ১টিতে এসেছে ن । মোট ২৯টি সূরার মধ্যে حروف مقطعات এসেছে ৭৬টি। কিন্তু ডবলগুলো বাদ দিলে বাকি থাকে ১৪টি।

যদি সাধারণ মানুষের হিসাব মতো الف -কে حروف معجم -এর মধ্যে গণনা করি, তাহলে তার সংখ্যা দাড়ায় ২৯টি। আর এ حروف معجم এসেছে ২৯টি সূরার মধ্যে। এটি একটি অপূর্ব মিলের বিষয়। আর যদি আবুল আব্বাসের মতানুযায়ী الف -কে বাদ দিয়ে حروف معجم গণনা করি, তাহলে তার সংখ্যা দাড়ায় ২৮টি। আর ২৯টি সূরার মধ্যে حروف معجم -এর যেসব শব্দ ডবল বাদ দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা হল ২৮ এর অর্ধেক ১৪টি। এটি একধরনের মিলগত বিষয়।

তাছাড়া অক্ষরসমূহ যে পদ্ধতিতে উচ্চারিত হয়, তাকে صفت বলে। حروف معجم -এর প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে এবং তার আলাদা সিফাত রয়েছে।

তার সিফাত মোট ১৭টি।

همس. جهر. شدت. رخوت. استعلاء. استفال. اطباق. انفتاح. اذلاق. اطباق. صفير. قلقله. لين. انحراف. تكرير. تفشى. استطالت.

এ প্রত্যেকটি সিফাতের আওতায় কিছু কিছু অক্ষর রয়েছে, সেই অক্ষরগুলোর অর্ধেক অক্ষর হল সেই ২৮ এর অর্ধেক ১৪টির মধ্য হতে নির্বাচিত। যেমন مهموسه-এর অক্ষর ১০টি। এর মধ্যে ১০টির অর্ধেক ৫টি অক্ষর হল সেই ১৪টি অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে مجهوره-এর অক্ষর হল ১৮টি। এ ১৮ এর অর্ধেক ৯টি অক্ষর হল সেই ১৪টির অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে সবগুলোর ক্ষেত্রে এরকম হবে। এটা তো আশ্চর্যজনক এবং সুদূরপরাহত একটি মিলের বিষয়। সামনে সেই অকল্পনীয় এবং দুঃসাধ্য মিলের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে ইনশা আল্লাহ।

☆☆☆

فَذَكَرَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ وَهِيَ مَا يَضْعُفُ الْإِعْتِمَادُ عَلٰى مَخْرَجِه وَيَجْمَعُهَا : سَتَشْحَثُكَ خَصَفَةٌ نِصْفَهَا. اَلْحَاءُ ـ وَالْهَاءُ ـ وَالصَّادُ ـ وَالسِّيْنُ ـ وَالْكَافُ وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمَجْهُوْرَةِ نِصْفَهَا يَجْمَعُهُ لَنْ يَقْطَعَ اَمْرٌ وَمِنَ الشَّدِيْدَةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَجْمُوْعَةِ فِيْ اَجِدْتُ طَبْقَكَ اَرْبَعَةٌ يَجْمَعُهَا اَقِطُكَ وَمِنَ الْبَوَاقِيْ اَلرِّخْوَةَ عَشَرَةَ يَجْمَعُهَا حَمْسٌ عَلٰى نَصْرِه وَمِنَ الْمُطْبِقَةِ الَّتِيْ هِيَ الصَّادُ وَالضَّادُ وَالطَّاءُ وَالظَّاءُ نِصْفَهَا وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمُنْفَتِحَةِ نِصْفَهَا وَمِنَ الْقَلْقَلَةِ وَهِيَ حُرُوْفٌ تَضْطَرِبُ عِنْدَ خُرُوْجِهَا وَيَجْمَعُهَا قَدْ طَبَجَ نِصْفَهَا نِصْفَهَا الْاَقَلَّ لِقِلَّتِهَا وَمِنَ اللَّيِّنَتَيْنِ اَلْيَاءِ لِاَنَّهَا اَقَلُّ ثِقْلًا مِنَ الْمُسْتَعْلِيَةِ وَهِيَ الَّتِيْ يَتَصَعَّدُ الصَّوْتُ بِهَا فِي الْحَنِكِ الْاَعْلٰى وَهِيَ سَبْعَةٌ اَلْقَافُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالْخَاءُ وَالْغَيْنُ وَالضَّادُ وَالظَّاءُ نِصْفَهَا الْاَوَّلَ وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمُنْخَفِضَةِ نِصْفَهَا فِي الْإِدْغَامِ مِنَ الْخِفَّةِ وَالْفَصَاحَةِ وَمِنَ الْاَرْبَعَةِ الَّتِيْ لَاتُدْغَمُ فِيْمَا يُقَارِبُهَا وَيُدْغَمُ فِيْهَا مُقَارِبُهَا وَهِيَ الْمِيْمُ وَالرَّاءُ وَالشِّيْنُ وَالْفَاءُ نِصْفَهَاوَمِنْ حُرُوْفِ الْبَدْلِ وَهِيَ اَحَدَ عَشَرَ عَلٰى مَا ذَكَرَهُ سِيْبَوَيْهِ وَاِخْتَارَهُ اِبْنُ جِنِّيْ وَيَجْمَعُهَا اَجِدُ طَوَيْتُ مِنْهَا السِّتَّةَ الشَّائِعَةَ الَّتِيْ يَجْمَعُهَا اَهْطَمِيْنَ قَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ سَبْعَةً اُخْرٰى وَهِيَ اللَّامُ فِيْ اَصِيْلَالٍ وَالصَّادُ وَالزَّاءُ فِيْ صِرَاطٍ وَزِرَاطٍ وَالْفَاءُ فِيْ جَدَفٍ وَالْعَيْنُ فِيْ اَعِنْ وَالثَّاءُ فِيْ ثَرُوْعِ الدَّلْوِ وَالْبَاءُ فِيْ بِاسْمِكَ حَتّٰى صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهَا تِسْعَةً اَلتِّسْعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

وَاللَّامُ وَالصَّادُ وَالْعَيْنُ وَمِمَّا يُدْغَمُ فِيْ مِثْلِهِ وَلَايُدْغَمُ فِي الْمُقَارِبِ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ اَلْهَمْزَةُ وَالْهَاءُ وَالْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالْمِيْمُ وَالْيَاءُ وَالْخَاءُ وَالْغَيْنُ وَالضَّادُ وَالظَّاءُ وَالشِّيْنُ وَالزَّاءُ وَالْفَاءُ وَالْوَاوُ نِصْفُهَا الْاَقَلُّ وَمِمَّا يُدْغَمُ فِيْهِمَا وَهِيَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ نِصْفُهَا الْاَكْثَرَ اَلْحَاءُ وَالْقَافُ وَالْكَافُ وَالرَّاءُ وَالسِّيْنُ وَاللَّامُ وَالنُّوْنُ لِمَا فِي الْاِدْغَامِ مِنَ الْخِفَّةِ وَالْفَصَاحَةِ وَمِنَ الْاَرْبَعَةِ الَّتِيْ لَاتُدْغَمُ فِيْمَا يُقَارِبُهَا وَيُدْغَمُ فِيْهَا مُقَارِبُهَا وَهِيَ الْمِيْمُ وَالرَّاءُ وَالشِّيْنُ وَالْفَاءُ نِصْفُهَا

অনুবাদ: সুতরাং مهموسه -এর মধ্যে مهموسه বলা হয় সেসব অক্ষরকে যার ভিত্তি স্বীয় মাখরাজের উপর খুব হালকা হয় আর এসব অক্ষরের সমষ্টি হলো ستشحثك خصفه তার অর্ধেক অর্থাৎ هاء. حاء. كاف. سين. صاد. -কে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অবশিষ্টগুলোর মধ্যে রয়েছে مجهوره যার অর্ধেককে لن يقطع امر একত্রিত করেছে। شديده -এর আট অক্ষর যেগুলোর সমষ্টি হলো احدث طبقك । (এর থেকে) চারটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে اقطك একত্রিত করেছে। আর অবশিষ্টগুলোর মধ্যে রয়েছে رخـــوه এর দশটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে একত্রিত করেছে حمس على نصره । আর مطبقه থেকে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্ধেক তথা صاد. طاء. ظاء -কে। অবশিষ্ট রয়েছে منفتحه তার অর্ধেত উল্লেখ করা হয়েছে। আর قلقله থেকে (قلقله এমন অক্ষর যেগুলোকে উচ্চারণের সময় কম্পন সৃষ্টি হয়) তার কম অর্ধেককে উল্লেখ করা হয়েছে, তা কম হওয়ার কারণে। আর দুই لين -এর মধ্যে থেকে يـاء -কে নেয়া হয়েছে। কেননা, এটা কম কঠিন। আর مستعليه থেকে (مستعليه বলা হয় যার মধ্যে আওয়াজ উপরের তালুর দিকে উঠে যায়) তার অক্ষর হল সাতটি ضاد. غين. خاء. طاء. صاد. قاف. ظاء তার কম অর্ধেক নেয়া হয়েছে। আর অবশিষ্ট রইল منخفضه তার থেকে নেয়া হয়েছে অর্ধেক।

حروف بدل যার সংখ্যা سيبويه -এর বর্ণনা এবং ابن جنى -এর পছন্দ মতানুযায়ী ১১টি। যার সমষ্টি হচ্ছে احد طويت منها থেকে প্রসিদ্ধ ৬টি -কে নেয়া হয়েছে, যার সমষ্টি হল اهطمين ؛ কেউ কেউ حروف بدل -এর ক্ষেত্রে আরো ৭টি হরফ অতিরিক্ত করেছেন। আর সেগুলো হচ্ছে اصيلال -এর عين এবং اعن -এর فاء এবং جدف -এর زاء ও صاد এর- زراط ও صراط এবং لام -এর باء এবং باسمك -এর ثاء এবং ثروع الدلو -এর ثاء । ফলে হরফে বদলের সংখ্যা ১৮ হয়েছে। উল্লেখিত ১৮টি থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি। পূর্বোল্লেখিত ৬টি এবং لام. صـــاد. عيـن । আর ঐ সমস্ত হরফ যেগুলো তার একই (অনুরূপ) মাখরাজের হরফের মাঝে ইদগাম হয়; কিন্তু নিকটবর্তী মাখরাজের মাঝে ইদগাম হয় না। যার সংখ্যা ১৫টি। আর সেগুলো হল– همزه. هاء. عين. صاد. طاء. ميم. ياء. خاء. غين. ضاد. ظاء. شين. زاء. فاء. واو. তা থেকে তার কম অর্ধেক নেয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত হরফ উভয় মাখরাজের মধ্যে ইদগাম হয় সেগুলো হচ্ছে অবশিষ্ট ১৩টি। তার বেশ অর্ধেক তথা حاء. قاف. كاف. راء. سين. لام. نون. -কে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ইদগামের মধ্যে রয়েছে সহজতা (তাই বেশ অর্ধেককে নেয়া হয়েছে)। আর অবশিষ্ট ৪টি অক্ষর যেগুলো তার

নিকটবর্তী মাখরাজের মধ্যে ইদগাম হয় না; তবে তার মধ্যে তার নিকটবর্তী মাখরাজের ইদগাম হয়। আর সেগুলো হল– قاف . شيـن. راء. ميـم তা থেকে নেয়া হয়েছে অর্ধেক (তথা راء ও ميم) -কে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

فـذكر من المهموسة الخ : এখান থেকে الـفاظ تهجى -এর সিফাতের প্রকারভেদে অর্ধেক অর্ধেক ঐ ১৪টির মধ্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদের মধ্যেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। সেখানে দেখে নাও।

☆☆☆

وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُوْفُ الذَّلِيْقَةُ الَّتِيْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا بِذَلَقِ اللِّسَانِ وَهِيَ سِتَّةٌ يَجْمَعُهَا رُبَّ مُنَفَّلٍ وَالْحَلْقِيَّةُ الَّتِيْ هِيَ الْحَاءُ وَالْخَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْهَاءُ وَالْهَمْزَةُ كَثِيْرَةُ الْوُقُوْعِ فِي الْكَلَامِ ذَكَرَهَا ثُلُثَيْهَا وَلَمَّا كَانَتْ اَبْنِيَةُ الْمَزِيْدِ لَاتَتَجَاوَزُ عَنِ السُّبَاعِيَّةِ ذَكَرَ مِنَ الزَّوَائِدِ الْعَشَرَةِ الَّتِيْ يَجْمَعُهَا اَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ مِنْهَا تَنْبِيْهًا عَلٰى ذَالِكَ وَلَوْ اِسْتَقْرَيْتَ الْكَلِمَ وَتَرَاكِيْبَهَا وَجَدْتَ الْحُرُوْفَ الْمَتْرُوْكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَكْثُوْرَةً بِالْمَذْكُوْرَةِ ثُمَّ اِنَّهٗ ذَكَرَهَا مُفْرَدَةً وَثُنَائِيَّةً وَثُلَاثِيَّةً وَرُبَاعِيَّةً وَخُمَاسِيَّةً اِيْذَانًا بِأَنَّ الْمُتَحَدّٰى بِه مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَاتِهِمُ الَّتِيْ اُصُوْلُهَا كَلِمَاتٌ مُفْرَدَةٌ وَمُرَكَّبَةٌ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا اِلٰى خَمْسَةٍ وَذَكَرَ ثَلَاثَ مُفْرَدَاتٍ فِيْ ثَلَاثِ سُوَرٍ لِاَنَّهَا تُوْجَدُ فِي الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ : اَلْاِسْمُ وَالْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَاَرْبَعُ ثُنَائِيَّةٍ لِاَنَّهَا تَكُوْنُ فِي الْحَرْفِ بِلَا حَذْفٍ كَبَلْ وَفِي الْفِعْلِ بِحَذْفٍ كَقُلْ وَفِي الْاِسْمِ بِغَيْرِ حَذْفٍ كَمَنْ وَبِه كَدَمٍ وَفِيْ تِسْعِ سُوَرٍ لِوُقُوْعِه فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَوْجُهٍ فَفِي الْاَسْمَاءِ اِذْ وَذُوْ وَمَنْ وَفِي الْاَفْعَالِ قُلْ وَبِعْ وَخَفْ وَفِي الْحُرُوْفِ اَنَّ وَمِنْ وَمُذْ عَلٰى لُغَةِ مَنْ جَرَّ بِهَا وَثَلَاثَ ثُلَاثِيَّاتٍ لِمَجِيْئِهَا فِي الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِيْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سُوْرَةً تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ اُصُوْلَ الْاَبْنِيَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ عَشَرَةٌ مِنْهَا لِلْاَسْمَاءِ وَثَلَاثَةٌ لِلْاَفْعَالِ وَرُبَاعِيَّتَيْنَ وَخُمَاسِيَّتَيْنِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا اُصُوْلًا كَجَعْفَرٍ وَسَفَرْجُلٍ وَمُلْحَقًا كَقَرْدَدٍ وَحَجَنْفَلٍ

অনুবাদ:

আর যেহেতু حروف ذلقه যেগুলোর উপর জিহবার পার্শ্ব নির্ভর করে, তা ৬টি। যার সমষ্টি হল رب منفل। এবং حروف حلقيه তথা حاء. خاء. عين. غين. هاء. همزه এগুলো বাক্যের মধ্যে অধিক ব্যবহার হয় তাই এগুলোর দুই তৃতীয়াংশ নেয়া হয়েছে। আর যেহেতু مزيد -এর ভিত্তি সাত অক্ষরের উর্ধ্বে নয়, তাই حروف زوائد দশটি যার সমষ্টি হল اليوم تنساه এগুলো থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি। (৭টি নেয়া হয়েছে) সে বিষয়ের উপর সতর্ক করার জন্য। আর যদি শব্দাবলী ও সেগুলোর বিন্যাসকে তালাশ করো তাহলে দেখবে যে, পূর্বোল্লেখিত হরফের প্রকারাদির প্রত্যেকটির তুলনায় ঐ সকল হরফের ব্যবহার কম যেগুলোকে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি।

অত:পর حروف مقطعات -কে এক অক্ষর বিশিষ্ট, দুই অক্ষর বিশিষ্ট, তিন অক্ষর বিশিষ্ট, চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, যে কুরআনের চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তা তাদের সেসব শব্দাবলীর দ্বারা গঠিত যেগুলোর মূল এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ এবং দুই অক্ষর থেকে পাঁচ অক্ষর দ্বারা গঠিত। এক অক্ষর বিশিষ্ট তিনটি حرف مقطعات -কে তিনটি সূরার শুরুতে আনা হয়েছে। কেননা, এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ তিনো প্রকার কালেমা তথা ইসিম, ফে'ল এবং হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। আর দুই অক্ষর বিশিষ্ট مقطعات আনা হয়েছে ৪টি। কেননা, দুই হরফী কালেমা (চার প্রকার:) (১) হরফের মাঝে হরফ ব্যতীত যেমন بل এবং (২) হযফের সাথে فعل -এর মাঝে যেমন قل এবং (৩) ইসমের মাঝে হযফ ছাড়া যেমন مَنْ ও (৪) ইসমের মাঝে হযফের সাথে যেমন دم । আর এগুলোকে নয়টি সূরার প্রথমে উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, كلمه -এর তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের মাঝে এগুলো তিনভাবে পাওয়া যায়। যেমন ইসমের মাঝে من. ذو. اذ এবং فعل -এর মাঝে قل. بع. خف ও হরফের মাঝে مذ. ان. من ইত্যাদি। তবে مذ ঐ সমস্ত লোকদের মতে যারা তাকে হরফে জার মনে করেন।

আর তিন হরফ বিশিষ্ট তিনটি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে كلمه -এর তিন প্রকারের মাঝে পাওয়া যাওয়ার কারণে, আর এগুলোকে আবার ১৩ সূরার প্রারম্ভে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, ব্যবহৃত সীগাহ -এর اصول (মূল ওযন) ১৩টি। ইসমের মাঝে ১০টি এবং فعل -এর মাঝে ৩টি। এমনিভাবে দু'টি حروف تهجى -কে رباعى ও خماسى উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, উতদুভয়ের প্রত্যেকটি اصلا (মৌলিক ওযনে)ও হয়। যেমন جعفر ও سفرجل এবং ملحقا (স্বাতিরিক্ত ওযনে)ও হয় যেমন قردد ও حجنفل ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

حروف ذلقيه: বলা হয় সেই সমস্ত হরফকে যেগুলোর উচ্চারণ জিহবার প্রান্ত থেকে হয়।

حروف حلقيه : বলা হয় সেইসব হরফকে যেগুলোর উচ্চারণ হলক্ব তথা গলার মধ্য হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, এ উভয় প্রকারের হরফ যেহেতু অধিক ব্যবহৃত হয় তাই সূরার প্রারম্ভে এগুলোকে অধিক পরিমাণে আনা হয়েছে।

حروف زوائد : বলা হয় সেইসব হরফকে যেগুলোকে কোন বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সংযুক্ত করা হয়। তার সংখ্যা ১০টি। যার সমষ্টি اليوم تنساه । এগুলো থেকে ৭টিকে সূরার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, বৃদ্ধি করার পরে حروف بنائيه সাতটির অধিক হয় না। আর বাস্তবেও তাই। কেননা, সাত হরফের অধিক কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সাত হরফ বিশিষ্ট শব্দ বিদ্যমান আছে। যেমন قزعبلات ।

وَلَعَلَّهَا فُرِّقَتْ إِلَى السُّوَرِ وَلَمْ تُعَدَّ بِأَجْمَعِهَا فِيْ أَوَّلِ الْقُرْاٰنِ لِهٰذِهِ الْفَائِدَةِ مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ إِعَادَةِ التَّحَدِّيْ وَتَكْرِيْرِ التَّنْبِيْهِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيْه وَالْمَعْنٰى اِنَّ هٰذَا الْمُتَحَدّٰى بِه مُؤَلَّفٌ مِنْ جِنْسِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ أَوِ الْمُؤَلَّفُ مِنْهَا كَذَا

অনুবাদ:

সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই حروف مقطعات -কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে। তাছাড়া এতে চ্যালেঞ্জ এবং সতর্ক করাটি বারবার হয়। (এ ব্যাখ্যানুযায়ী الم -এর) অর্থ দাঁড়াবে– এ কিতাব যার দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তা الم ইত্যাদি হরফ দ্বারা গঠিত। অথবা যে শব্দ উল্লেখিত হরফ দ্বারা গঠিত তা-ই হল মুতাহাদ্দাবিহী তথা তার দ্বারাই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم فرقت حروف المقطعات الى سور القرأن ولم تعد بأجمعها فى اول القرأن؟

এখানে প্রশ্ন হল– حروف مقطعات -কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে। তার কারণটা কি?

উত্তর ঃ দুই কারণে حروف مقطعات -কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে –

১. পৃথকভাবে বর্ণনা করার দ্বারা উদাহরণতঃ তিন হরফকে তিন সূরার প্রারম্ভে আনার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, حروف مفرده শুধুমাত্র كلمات ثلثه তথা ইসিম, ফে'ল ও হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। । অথবা ১৩টি সূরার শুরুতে তিনটি হরফে মফরাদকে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসিম ও ফে'লের ওযন মাত্র ১৩টি।

২. এগুলোকে বারবার উল্লেখ করা দ্বারা তাদেরকে বারবার চ্যালেঞ্জ এবং সতর্ক করা হবে। তা হল এভাবে যে, যখন এগুলোকে বারবার উল্লেখ করা হবে তখন তাদেরকে একথা বুঝানো হবে যে, যেমনিভাবে তোমাদের কথাগুলো এই হরফ দ্বারা গঠিত তদ্রূপ কুরআনের কথাও এই হরফ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং তোমরা এর ন্যায় কিছু বানিয়ে দেখাও। এভাবে বারবার চ্যালেঞ্জ করা পাওয়া গেল।

আর বারবার সতর্ক করা হবে এভাবে যে, আমাদের এবং তোমাদের কথাগুলো একই হরফ দ্বারা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এরূপ কালাম গঠন করতে সক্ষম হচ্ছ না, তাহলে বুঝে নাও যে, এটা গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত কালাম।

☆☆☆

وَقِيلَ هِىَ اَسْمَاءُ السُّوَرِ وَعَلَيْهِ اِطْبَاقُ الْاَكْثَرِ سُمِّيَتْ بِهَا اِشْعَارًا بِأَنَّهَا كَلِمَاتٌ مَعْرُوْفَةُ التَّرْكِيْبِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَحْيًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَمْ تَتَسَاقَطْ مَقْدِرُهُمْ دُوْنَ مُعَارَضَتِهَا وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُفْهِمَةً كَانَ الْخِطَابُ بِهَا كَالْخِطَابِ بِالْمُهْمَلِ وَالتَّكَلُّمِ بِالزِّنْجِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْاٰنُ بِأَسْرِهِ بَيَانًا وَهُدًى وَلَمَا أَمْكَنَ التَّحَدِّيْ بِهِ وَاِنْ كَانَتْ مُفْهِمَةً فَاِمَّا يُرَادُ بِهَا السُّوَرُ الَّتِيْ هِىَ مُسْتَهِلُّهَا عَلٰى اَنَّهَا اَلْقَابُهَا اَوْ غَيْرُ ذَالِكَ وَالثَّانِيْ بَاطِلٌ لِاَنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ وَظَاهِرٌ اَنَّهُ لَيْسَ كَذَالِكَ أَوْ غَيْرُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى لُغَتِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيْنٍ. فَلَايُحْمَلُ عَلٰى مَا لَيْسَ فِيْ لُغَتِهِمْ لَا يُقَالُ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ مَزِيْدَةً لِلتَّنْبِيْهِ وَالدَّلَالَةِ عَلٰى اِنْقِطَاعِ كَلَامٍ وَاِسْتِيْنَافِ اٰخَرَ كَمَا قَالَهُ قُطْرُبٌ أَوْ اِشَارَةٌ اِلٰى كَلِمَاتٍ هِىَ مِنْهَا اُقْتُصِرَتْ عَلَيْهَا اِقْتِصَارَ الشَّاعِرِ فِيْ قَوْلِهِ: قُلْتُ لَهَا قِفِيْ فَقَالَتْ لِيْ قَافْ. كَمَا رُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ قَالَ: اَلْاَلِفُ اٰلَاءُ اللّٰهِ وَاللَّامُ لُطْفُهُ وَالْمِيْمُ مُلْكُهُ. وَعَنْهُ اَنَّ الٓرٰ وحٰمٓ ونٓ مَجْمُوْعُهَا اَلرَّحْمٰنُ وَعَنْهُ اَنَّ الٓمٓ مَعْنَاهُ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَنَحْوُ ذَالِكَ سَائِرُ الْفَوَاتِحِ وَعَنْهُ اَنَّ الْاَلِفَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللَّامَ مِنْ جِبْرِيْلَ وَالْمِيْمَ مِنْ مُحَمَّدٍ أَيْ اَلْقُرْاٰنُ مُنَزَّلٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِلِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ اِلٰى مُدَدِ اَقْوَامٍ وَاٰجَالٍ بِحِسَابِ الْجُمَلِ كَمَا قَالَهُ اَبُوالْعَالِيَةِ مُتَمَسِّكًا بِمَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اَتَاهُ الْيَهُوْدُ تَلَا عَلَيْهِمْ الٓمٓ الْبَقَرَةَ فَحَسِبُوْهُ وَقَالُوْا كَيْفَ نَدْخُلُ فِيْ دِيْنٍ مُدَّتُهُ اِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا هَلْ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ الٓمٓصٓ وَالٓرٰ وَالٓمٓرٰ فَقَالُوْا خَلَطْتَ عَلَيْنَا فَلَانَدْرِيْ بِأَيِّهَا نَأْخُذُ؟ فَاِنَّ تِلَاوَتَهُ اِيَّاهَا بِهٰذَا التَّرْتِيْبِ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيْرِهِمْ عَلٰى اِسْتِنْبَاطِهِمْ دَلِيْلٌ عَلٰى ذَالِكَ وَهٰذِهِ الدَّلَالَةُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً لٰكِنَّهَا لِاِشْتِهَارِهَا فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ حَتّٰى الْعَرَبِ تَلْحَقُهَا بِالْمُعَرَّبَاتِ كَالْمِشْكَاةِ وَالسِّجِّيْلِ وَالْقِسْطَاسِ أَوْ دَالَّةً عَلَى الْحُرُوْفِ الْمَبْسُوْطَةِ مُقْسَمًا بِهَا لِشَرْفِهَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا بَسَائِطُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَادَّةُ خِطَابِهِ هٰذَا وَاِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا اَسْمَاءُ السُّوَرِ يُخْرِجُهَا اِلٰى مَا لَيْسَ فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ لِاَنَّ التَّسْمِيَةَ بِثَلَاثَةِ اَسْمَاءَ فَصَاعِدًا مُسْتَنْكَرَةٌ عِنْدَهُمْ وَتُؤَدِّيْ اِلٰى اِتِّحَادِ الْاِسْمِ وَالْمُسَمّٰى وَتَسْتَدْعِيْ تَأَخُّرَ الْجُزْءِ عَنِ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْاِسْمَ يَتَأَخَّرُ مِنَ الْمُسَمّٰى بِالرُّتْبَةِ

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন حروف مقطعات হল সেগুলো দ্বারা গঠিত সূরাসমূহের নাম। এ অভিমতটির উপর অধিকাংশ আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। (তাদের কথা হল) এ হরফসমূহ দ্বারা সূরাগুলোর নাম রাখা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এই সূরাগুলো এমন কালেমা দ্বারা গঠিত যেগুলোর বিন্যাস ভঙ্গি (আরবীদের কাছে) পরিচিত। সুতরাং এ সূরাগুলো যদি গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এগুলোর মত কিছু বানিয়ে আনতে অক্ষম হতো না। (তাদের) দলীল হল– যদি এ হরফগুলোর কোন অর্থ না থাকে, তাহলে এগুলো দ্বারা সম্বোধন করা অনর্থক হয়ে যাবে। এবং অনারবী লোকের সাথে আরবী ভাষায় কথা বলার মতো হয়ে যাবে (অথচ এটা ফালতুমি ছাড়া বৈ কিছু নয়, যা থেকে আল্লাহ তা'লা মুক্ত ও পবিত্র)।

তাছাড়া কুরআনের পূর্ণাংশ দ্বারা বয়ান ও হেদায়াত জারি হতো না। তদ্রূপ কুরআন দ্বারা চ্যালেঞ্জ করাও সম্ভব হতো না।

আর যদি এ হরফগুলো অর্থবোধক হয় তাহলে হয়তো এগুলো দ্বারা ঐ সমস্ত সূরা উদ্দেশ্য যার শুরুতে এগুলোকে উপাধি হিসেবে আনা হয়েছে। অথবা উল্লেখিত সূরা ভিন্ন অন্যান্য সূরা উদ্দেশ্য হবে। দ্বিতীয় সূরত বাতিল। কারণ, এই الفاظ দ্বারা হয়তো ঐ অর্থ উদ্দেশ্য হবে যার জন্য এই الفاظ -কে আরবী ভাষায় وضع করা হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় এই الفاظ -কে কোন অর্থের জন্যই وضع করা হয় নি। (তাই তা অবাঞ্ছিত)। অথবা এটা ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এটাও বাতিল। কারণ, কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। সুতরাং উল্লেখিত الفاظ দ্বারা এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না যা আরবী ভাষায় নেই। একথা বলা যাবে না যে, الفاظ تهجى সতর্কতা এবং একটি বাক্য শেষ হয়ে অপর বাক্য শুরু হওয়া বুঝানোর জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছ। যেমন কুতরুবের অভিমত। অথবা (উল্লেখিত الفاظ تهجى দ্বারা) ঐ সমস্ত কালেমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো থেকে এই الفاظ تهجى নেয়া হয়েছে এবং সংক্ষেপে الفاظ تهجى -কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কবি তার পঙতি قلت لها قفى فقالت لى قاف -এর মাঝে সংক্ষেপ করেছেন। আর এমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন الف দ্বারা الاء الله (আল্লাহর নেয়ামতসমূহ) لام দ্বারা لطفه (তাঁর অনুগ্রহ) এবং ميم দ্বারা ملكه (তাঁর রাজত্ব) উদ্দেশ্য। ইবনে আব্বাস থেকে আঁরো বর্ণিত আছে, الرحمن হচ্ছে - الر - حم ও ن -এর সমষ্টি। তার থেকে এও বর্ণিত আছে যে, الم -এর অর্থ হচ্ছে انا الله اعلم (আমি আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)। অবশিষ্ট فواتح سور ও এমনই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, الف টা الله শব্দের لام টা جبرئيل -এর এবং ميم টা محمد -এর সংক্ষিপ্তরূপ। (সুতরাং অর্থ দাড়ায়–) এই কুরআন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মারফত হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

অথবা الفاظ تهجى দ্বারা আরবী অক্ষরের গাণিতিক মান হিসেবে কতেক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সময়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমনটি আবুল আলিয়া (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর এই হাদীস পেশ করেন, যাতে আছে, ইহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদের নিকট الم তথা

সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন। তা শোনে ইহুদীরা الــم -এর সংখ্যা একত্রে হিসাব করে বলতে লাগলো, আমরা কিভাবে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে পারি যার সময়কাল মাত্র ৭১ বছর। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হাসলেন। অতঃপর তারা বললো, এগুলো ছাড়া আরো আছে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, المص - الر - المر তারা এটা শোনে বললো, আপনি আমাদেরকে সন্দেহের মাঝে ফেলে দিলেন। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে, কোনটাকে গ্রহণ করবো? (লক্ষ করুন) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উল্লেখিত حــروف تهـجـى এই তারতীবে পাঠ করা একথার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এগুলো দ্বারা কতেক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সময়কালের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর (الــفـــاظ تهـجـى -এর) এই ইঙ্গিত যদিও আরবী নয়, কিন্তু এগুলো মানুষের মাঝে এমনকি আরবদের মাঝেও সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার দরুন এগুলোকে আরবী শব্দসমূহের সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেরূপভাবে مشـكـاة - سـجيل ও - قسـطـاس শব্দাবলিকে আরবীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অথবা الـفاظ تهجى দ্বারা حروف بسيط উদ্দেশ্য, যার শপথ খাওয়া হয়েছে। কারণ, এগুলো আল্লাহ্ তা'লার নামসমূহের حــــروف بسـيــط (একক হরফ) এবং কালামে পাকের মূলবর্ণ (ভাষা মাধ্যম) হওয়ার দরুন বিশেষ মর্যাদা রাখে। আর (এমনিভাবে একথাও বলা যাবে না যে,) الــفـــاظ تهجى -কে اسماء سور বলা, এটা আরবী ভাষার নীতি বহির্ভূত। কেননা, তিন বা ততোধিক নামকে একত্রিত করে একটি বস্তুর নামকরণ করা আরবী ভাষাভাষীদের নিকট অসম্ভব ও অপছন্দনীয় বিষয়। তথাপি এমতাবস্থায় اسم ও مسمى এক হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে; আর جزء টা كل -এর পূর্বে আসাকে দাবি করে। কেননা, اسـم -এর অবস্থান رتـبــه (মর্যাদার দিক থেকে) مـســمى -এর পরে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: সূরাসমূহের শুরুর الفاظ تهجى দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে যেসব الفاظ تهجى এসেছে তার দ্বারা ১৪টি জিনিস উদ্দেশ্য।

১. যাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদেরকে জাগ্রত করা ও এব্যাপারে সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

২. এগুলো সূরার নাম।

৩. সতর্কীকরণের জন্য অতিরিক্ত এসেছে এবং এক বাক্যের সমাপ্তি ও অপর বাক্যের সূচনা বুঝাতে এসেছে।

৪. দীর্ঘ বাক্যকে সংক্ষিপ্তকরণের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। যেমন কবি তার কবিতায় করেছেন। কবিতা হল– قلت لها قفي فقالت لى قاف এখানে وقفت -কে সংক্ষেপ করে শুধু قاف বলা হয়েছে।

৫. الم -এর মধ্যে الف দ্বারা উদ্দেশ্য الاء الـلـه বা আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহ। لام দ্বারা উদ্দেশ্য لطفه বা তাঁর অনুগ্রহ। আর ميم দ্বারা উদ্দেশ্য হল ملكه বা তাঁর রাজত্ব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটা বর্ণিত।

৬. الر - حم - ن এ সবগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য الـرحـمـن । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটা বর্ণিত।

৭. الم দ্বারা উদ্দেশ্য হল انا الله اعلم এটাও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত।

৮. الف দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ। لام দ্বারা উদ্দেশ্য জিবরাঈল। আর ميـــم দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা.)। অর্থাৎ

القران منزل من الله تعالى بلسان جبرئيل على محمد ﷺ

৯. আরবী অক্ষরের গাণিতিক মান হিসেবে কতেক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেচে থাকার সময়ের দিকে ইঙ্গিত দেয়া উদ্দেশ্য।

১০. সূরার শুরুতে حروف بسـائط -এর উপর دلالت করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তা'লার নাম ও তাঁর সিফাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১১. এগুলো কুরআনের নাম।

১২. এগুলো আল্লাহ তা'লার নাম। হযরত আলী (রা.) কখনো কখনো এভাবে বলতেন– يـــا حـم عسق. يا كهيعص ।

১৩. الف এটা গলার শেষ প্রান্ত হতে উচ্চারিত হয় আর এটা মাখরাজের শুরু। لام এটা জিহ্বার কিনারা হতে উচ্চারিত হয় আর এটা হল মাখরাজের মধ্যখান। ميـــم এটা ঠোঁট হতে উচ্চারিত হয়। আর এটা মাখরাজের শেষ ভাগ। এরকম সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বান্দার উচিত, সে তার কথার সূচনা, মধ্যখান ও সমাপন প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ তা'লার স্মরণকে মুখ্য মনে করে।

১৪. এটা এমন একটা রহস্য যাকে আল্লাহ তা'লা নিজের জ্ঞানের সাথে বিশেষিত করে রেখেছেন।

☆☆☆

لِاَنَّا نَقُوْلُ هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ لَمْ تُعْهَدْ مَزِيْدَةً لِلتَّنْبِيْهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْاِنْقِطَاعِ وَالْاِسْتِيْنَافِ يَلْزَمُهَا وَغَيْرَهَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا فَوَاتِحُ السُّوَرِ وَلَايَقْتَضِيْ ذَالِكَ اَنْ لَايَكُوْنَ لَهَا فِيْ حَيِّزِهَا وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ لِإِخْتِصَارٍ مِنْ كَلِمَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فِيْ لُغَتِهِمْ اَمَّا الشِّعْرُ فَشَاذٌّ وَاَمَّا قَوْلُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَتَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ هٰذِهِ الْحُرُوْفَ مَنْبَعُ الْاَسْمَاءِ وَمَبَادِى الْخِطَابِ وَتَمْثِيْلٌ بِاَمْثِلَةٍ حَسَنَةٍ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ عَدَّ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ كَلِمَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ لَاتَفْسِيْرَ وَلَاتَخْصِيْصَ بِهٰذِهِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ غَيْرِهَا اِذْ لَامُخَصِّصَ لَفْظًا وَمَعْنًى

অনুবাদ:

(উল্লেখিত সমস্ত প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়) কারণ, (এর উত্তরে) আমরা বলবো যে, এই الفـاظ تهجى -কে সতর্কতা এবং বাক্য শেষ হওয়ার উপর দালালত করার জন্য অতিরিক্ত করা হয়, এ অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। আর الفـاظ تهجى কোন বাক্য শুরু হওয়ার দালালত করাটা তার এবং الفـاظ تهجى ভিন্ন অন্য শব্দের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় (সেই ভিন্ন শব্দ) فـواتح سـور হওয়া হিসেবে। আ

এটা (استيناف -কে আবশ্যক করা) বাস্তবে الفاظ تهجى -এর ভিন্ন কোন অর্থ নেই, এ কথার দাবি করে না। (বরং استيناف ছাড়া) الفاظ تهجى -এর অন্য অর্থও থাকতে পারে। এমনিভাবে الفاظ تهجى আরবী ভাষায় কোন নির্দিষ্ট শব্দমালার সংক্ষেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তবে পংক্তি দিয়ে যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা হলো শায ও বিরল। অপর দিকে ইবনে আব্বাসের উক্তির ক্ষেত্রে আমরা বলবো, তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, এ সমস্ত হরফ আল্লাহর নামের উৎসস্থল এবং কালামে পাকের ভূমিকা। তিনি এ বিষয়ের কয়েকটি সুন্দর উপমা পেশ করেছেন মাত্র। তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, তিনি প্রতিটি হরফ অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সংক্ষেপ বিবেচনা করেছেন। ব্যাখ্যা করা এবং শুধুমাত্র এই অর্থের সাথেই বিশেষিত অন্য অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় না, এটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কেননা, لفظا ও معنى কোনো প্রকারের مخصص বা বিশেষিতকারী বস্তু নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله ولم تستعمل الخ : এটা পূর্ববর্তী ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উক্তি দ্বারা পেশকৃত দলীলের উত্তর। সেখানে বলা হয়েছিল যে, الفاظ تهجى দ্বারা দীর্ঘ বাক্যের দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইশারা করা হয়েছে।

তার উত্তর হলো– এটা সম্পূর্ণরূপে ধারণা প্রসূত কথা। তাছাড়া আরবদের পরিভাষায়ও এর প্রচলন নেই। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যে বলেছেন الف দ্বারা الـــلــــه আর لام দ্বারা জিবরাইল ইত্যাদি উদ্দেশ্য, তার উত্তর হলো– এ কথার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য তাফসীর বা এটাকে খাস করা নয়। কেননা, খাস করার জন্য নিশ্চয়ই একজন খাসকারী দরকার। আর এখানে কোনো খাসকারী নেই। সুতরাং এটা বাতিল। আর কবিতা দ্বারা যে দলীল প্রদান করা হয়েছিলো তার উত্তর হলো– এটা শায বা বিরল বিষয়, যা কোনোক্রমেই দলীল হতে পারে না।

وَلَا بِحِسَابِ الْجُمَلِ فَتُلْحَقَ بِالْمُعَرَّبَاتِ وَالْحَدِيْثُ لَا دَلِيْلَ فِيْهِ لِجَوَازِ اَنَّهُ تَبَسَّمَ تَعَجُّبًا مِنْ جَهْلِهِمْ وَجَعْلُهَا مُقْسَمًا بِهَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لٰكِنَّهُ يُحُوْجُ اِلَى اِضْمَارِ اَشْيَاءَ لَادَلِيْلَ عَلَيْهَا وَالتَّسْمِيَةُ بِثَلَاثَةِ اَسْمَاءَ اِنَّمَا يَمْتَنِعُ اِذَا رُكِّبَتْ وَجُعِلَتْ اِسْمًا وَاحِدًا عَلٰى طَرِيْقَةِ بَعْلَبَكَّ فَاَمَّا اِذَا نُثِرَتْ نَثْرَ اَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَلَا وَنَاهِيْكَ بِتَسْوِيَةِ سِيْبَوَيْهِ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ بِالْجُمْلَةِ وَالْبَيْتِ مِنَ الشِّعْرِ وَطَائِفَةٍ مِنْ اَسْمَاءِ حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ وَالْمُسَمّٰى هُوَ مَجْمُوْعُ السُّوْرَةِ وَالْاِسْمُ جُزْءُهَا فَلَا اِتِّحَادَ وَهُوَ مُقَدَّمٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهٖ وَمُؤَخَّرٌ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ اِسْمًا فَلَا دَوْرَ وَالْوَجْهُ الْاَقْرَبُ اِلَى التَّحْقِيْقِ وَاَوْفَقُ لِلطَّائِفِ وَالتَّنْزِيْلِ وَاَسْلَمُ مِنْ لُزُوْمِ

النَّقْلِ وَوُقُوْعِ الْاِشْتِرَاكِ فِى الْاَعْلَامِ مِنْ مَوَاضِعَ وَاحِدٍ فَاِنَّهُ يَعُوْدُ بِالنُّقْصِ عَلٰى مَا هُوَ مَقْصُوْدُ الْعَلَمِيَّةِ وَقِيْلَ اِنَّهَا اَسْمَاءُ الْقُرْاٰنِ وَلِذَالِكَ اُخْبِرَ عَنْهَا بِالْكِتَابِ وَالْقُرْاٰنِ وَقِيْلَ اِنَّهَا اَسْمَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ كَانَ يَقُوْلُ يَا كٓهٰيٰعٓصٓ يَا حٰمٓ عٓسٓقٓ وَلَعَلَّهٗ اَرَادَ يَا مُنَزِّلَهُمَا

অনুবাদ:

অনুরূপভাবে الفاظ تهجی -কে জাতির সময়কাল -এর জন্যও বানানো হয়নি, যার ফলে আরবী শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর উল্লেখিত হাদীসের মাঝে (প্রশ্নকারীর জন্য) কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদীদের মূর্খতার উপর আশ্চর্যান্বিত হয়ে মুচকি হাসি হেসেছেন। অবশ্য الفاظ تهجی -কে مقسم (যার দ্বারা শপথ খাওয়া হয়েছে) বানানো যদিও অসম্ভব কিছু নয়, তথাপি এ অবস্থায় এমন কিছু বিষয় উহ্য মানতে হয় যেগুলোর উপর কোনো প্রমাণ নেই। আর তিনটি নামকে (একত্রিত করে) একটি বস্তুর নামকরণ কেবল তখনই নিষিদ্ধ যখন তিনটি নামকে بعلبك -এর মতো একটি নাম বানানো হবে। কিন্তু যদি اسماء عدد -এর মতো পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয় তাহলে এতে অসম্ভবের কিছু নয়। (প্রমাণের জন্য) ইমাম সিবাওয়ায়েহ্ (র.) -এর এই কাজটি তোমার জন্য যথেষ্ট যে তিনি একই কালামকে بيت من الشعر আর جملة ও طائفة من اسماء حروف المعجم এ তিন নামের মাঝে সমতা সাব্যস্ত করেছেন। আর مسمى হচ্ছে সূরার সমষ্টি। পক্ষান্তরে اسم হচ্ছে সূরার একাংশ। সুতরাং (এতদুভয়ের মাঝে) কোনো اتحاد নেই। جزء যাতের কি থেকে অগ্রগামী আর اسم সূরার বিবেচনায় পশ্চাতে। তাই দাওর আবশ্যক হয় না।

(উল্লেখিত আটটি অভিমতের মধ্যে) প্রথম অভিমতটি বাস্তবতার অধিক কাছাকাছি। কুরআনের সূক্ষ্মতা ও রহস্যের জন্য বেশি উপযোগী। তাছাড়া ঐ সমস্ত اعلام (তথা নামসমূহের) মাঝে নকল ও অংশিদারিত্বও মানতে হয় না, যা একই গঠন থেকে প্রমাণিত। কেননা, নকল ও অংশিদারিত্ব পাওয়া যাওয়া علميت -এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেছেন যে, الفاظ تهجی কুরআনের নাম। আর এ কারণেই قرآن ও كتاب -কে তার خبر হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার নাম। তার দলীল হচ্ছে, হযরত আলী (রা.) বলতেন–

يا كهيعص يا حم عسق (এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে,) হতে পারে, আলী (রা.) উদ্দেশ্য নিয়েছেন يا منزلهما অর্থাৎ হে এ সমস্ত শব্দাবলীকে অবতীর্ণকারী।

فَإِنْ جَعَلْتَهَا اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالٰى أَوِ الْقُرْاٰنِ أَوِ السُّوَرِ كَانَ لَهَا حَظٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ أَوْمَا الرَّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ أَوِ الْخَبَرِ أَوِ النَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ فِعْلِ الْقَسْمِ عَلٰى طَرِيْقَةِ : اَللّٰه لَأَفْعَلَنَّ بِالنَّصْبِ أَوْ غَيْرِه كَأُذْكُرْهُ أَوِ الْجَرِّ عَلٰى إِضْمَارِ حَرْفِ الْقَسْمِ وَيَتَأَتّٰى الْإِعْرَابُ لَفْظًا وَالْحِكَايَةُ فِيْمَا كَانَتْ مُفْرَدَةً أَوْ مُوَازَنَةً لِمُفْرَدٍ كَحٰمٓ فَإِنَّهٗ كَهَابِيْلٍ وَالْحِكَايَةُ لَيْسَتْ إِلَّا فِيْمَا عَدَا ذَالِكَ وَسَيَعُوْدُ إِلَيْكَ ذِكْرُهٗ مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنْ بَقِيْتَهَا عَلٰى مَعَانِيْهَا فَإِنْ قَدَّرْتَ بِالْمُؤَلَّفِ مِنْ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ كَانَ فِيْ حَيِّزِ الرَّفْعِ بِالْإِبْتِدَاءِ أَوِ الْخَبَرِ عَلٰى مَا مَرَّ وَإِنْ جَعَلْتَهَا مُقْسَمًا بِهَا يَكُوْنُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا مَنْصُوْبًا أَوْ مَجْرُوْرًا عَلَى اللُّغَتَيْنِ فِى اللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ وَيَكُوْنُ جُمْلَةً قَسْمِيَةً بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لَهٗ وَإِنْ جَعَلْتَهَا أَبْعَاضَ كَلِمَاتٍ أَوْ أَصْوَاتًا مَنْزِلَةَ حُرُوْفِ التَّنْبِيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ كَالْجُمَلِ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْدُوْدَةِ وَيُوْقَفُ وَقْفَ التَّمَامِ إِذَا قَدَّرْتَ بِحَيْثُ لَايَحْتَاجُ إِلٰى مَابَعْدَهَا

অনুবাদ:

সুতরাং যদি ঐ সমস্ত الفاظ تهجى -কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বা কুরআনের নাম সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সেগুলোতে যে কোন একটি اعراب প্রযোজ্য হবে। হয়তো خبر বা مبتداء হিসেবে رفع হবে। فعل قسم উহ্য থাকার ভিত্তিতে نصب হবে। যেমন الله لافعلن كذا ।

অথবা সেগুলো منصوب হবে فعل قسم ব্যবতীত অন্য কোন فعل উহ্য থাকার কারণে। যেমন اذكر ইত্যাদি। অথবা সেগুলো حرف جر উহ্য থাকার কারণে مجرور হবে।

আর যেগুলো مفرد বা مفرد -এর সমওযনীয় যেমন حم কেননা, সেটি هابيل -এর ওযনে, তার মধ্যে اعراب لفظى ও হতে পারে আবার اعراب حكائى ও হতে পারে। আর যেগুলো না مفرد আর না مفرد -এর ওযনে, সেগুলোতে শুধুমাত্র اعراب حكائى হবে। সামনে তার বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

আর যদি ঐ সমস্ত الفاظ تهجى -কে তার মূল অর্থের উপরই সীমাবদ্ধ রাখো, তাহলে যদি সেগুলোকে المؤلف من هذه الحروف -এর تاويل করা হয়, তাহলে এগুলো مبتداء বা خبر -এর ভিত্তিতে محل رفع তে হবে। যেমন এব্যাপারে আলোচনা পূর্বেই গেছে।

আর যদি সেগুলোকে مقسم به ধরা হয়, তাহলে যেভাবে الله لافعلن كذا -এর মধ্যে দুই লুগাত রয়েছে, তদ্রূপ এগুলোর প্রত্যেকটিতেও প্রচলিত হবে। অর্থাৎ نصب অথবা جر । আর فعل مقدر -এর সাথে মিলিত হয়ে এগুলো جملہ قسمیه হয়ে যাবে। আর যদি সেগুলিকে حروف التنبيه -এর স্থলে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন কালেমার অংশ ও আওয়াজ সাব্যস্ত করো তাহলে جملہ مستانفه ও مفرده

معدود -এর মতো এগুলোর কোন اعراب -এর স্থান থাকবে না (অর্থাৎ اعراب মুক্ত থাকবে) এবং এগুলোর উপর وقف تام করা হবে যখন এমনভাবে উহ্য ধরা হয় যে, পরবর্তীর দিকে তা মুখাপেক্ষি না হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله فان جعلتها الخ.....الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) الفاظ تهجى গুলোর بناء ও اعراب -এর অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন– সূরাসমূহের প্রারম্ভিক অবস্থাগুলোর ছয়টি সূরত হতে পারে। তিনটি হল– যখন এগুলো তার আসল অর্থ হতে বর্ণিত হবে, আর তিনটি হল– যখন আসল অর্থ হতে বর্ণিত হবে না।

আসল অর্থ হতে বর্ণিত হওয়ার তিনটি হল– এগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার নাম অথবা কুরআনের নাম অথবা সূরার নাম যাই ধরা হোক না কেন, তখন তার উপর رفع. نصب. جر -তিনটি অবস্থা হতে পারে। رفع হবে مبتداء বা خبر হওয়ার কারণে। نصب হবে উহ্য ফে'লের কারণে। এখন فعل টি فعل قسم ও হতে পারে আবার সাধারণ فعل ও হতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ الله لافعلن كذا -এর মূল ইবারত হল اقسم الله لافعلن كذا । অথবা অন্য কোন فعل উহ্য থাকবে। যেমন اذكر الم । আর ঐ সমস্ত হরফের নিচে যেরও হতে পারে। তখন قسم শব্দ উহ্য মানতে হবে।

তবে এই তিন সূরতে ই'রাব لفظا হবে না حكاية হবে? সে ব্যাপারে কথা হল, الفاظ مفرده বা এর সমওযনে হলে ই'রাব لفظا ও حكاية উভয় প্রকারই হবে। সমওযনের উদাহরণ হল حم এটি هابيل -এর ওযনে। আর هابيل হল مفرد । এতদ্ব্যতীত অন্যগুলোর মধ্যে ই'রাব হবে حكائى

আর যখন সেগুলোকে منقول না মানা হয় (তথা তার আসল অর্থ হতে বর্ণিত হয় নি)। তাহলে তার তিন অবস্থা হতে পারে।

ক. সেগুলোকে শুধুমাত্র বাক্যের অংশ মনে করা হবে। তখন তার কোন ই'রাব হবে না। যেমন- جمله مستانفه۔ زيد۔ عمرو۔ بكر ইত্যাদি। এটি হল কুতরুব -এর অভিমত।

খ. এগুলোকে مقسم به বানানো হবে এবং উহ্য فعل -এর কারণে منصوب হবে। অথবা হরফে কৃসম উহ্য থাকার কারণে مجرور হবে।

গ. তাদেরকে তাদের অর্থের উপর বাকি রাখা হবে। তখনো مبتداء বা خبر হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا اٰيَةٌ عِنْدَ غَيْرِ الْكُوْفِيِّيْنَ فَاَمَّا عِنْدَهُمْ فَالٓمّٓ فِيْ مَوَاقِعِهَا وَالٓمّٓصٓ وَكٓهٰيٰعٓصٓ وَطٰهٰ وَطٰسٓمّٓ وَيٰسٓ وَحٰمٓ عٓسٓقٓ اٰيَتَانِ وَالْبَوَاقِيْ لَيْسَتْ بِاٰيَاتٍ وَهٰذَا تَوْقِيْفٌ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيْهِ

অনুবাদ:

حروف مقطعات পৃথক কোন আয়াত কি না

আর কূফাবসীগণ ব্যতীত কারো মতেই الفاظ تهجى -এর কোনটিই পূর্ণ আয়াত নয়। তবে কূফাবাসীদের নিকট الم এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াতের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর المص۔ كهيعص۔ يس۔ طسم۔ طه ও حم এগুলো এক আয়াত। আর حم عسق হল দু'আয়াত। আর বাকি যে সমস্ত الفاظ تهجى রয়েছে সেগুলো কূফাবাসীদের নিকটও আয়াত নয়। আর কোন জিনিস এক আয়াত বা দু'আয়াত হওয়ার ব্যাপারটি হল توقيفى তথা শ্রুতনির্ভর বিষয়, তাতে কেয়াসের কোন দখল নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وليس شيئ الخ........الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সূরার শুরুস্থ حروف مقطعات গুলো পূর্ণ আয়াত না অপূর্ণ আয়াত সে প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন– কূফাবাসীগণ ব্যতীত অন্য সকলের মতে, এর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। তবে কূফাবাসীগণ এগুলোকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন–

এক. এগুলো অয়াত নয়।

দুই. পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয় তবে আয়াতের স্থলাভিষিক্ত। এটি শুধুমাত্র الم -এর জন্য প্রযোজ্য।

তিন. এগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। সেগুলো হল– المص۔ كهيعص۔ طه۔ طس۔ يس۔ حم এ কয়টি।

চার. حـــم عســق এটি দু'আয়াত। শেষের তিন প্রকার ব্যতীত বাকি সবগুলোই প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

☆☆☆

﴿ذَالِكَ الْكِتَابُ﴾
{ ঐ কিতাবটি }

মুসান্নিফ (র.) এখানে দু'টি আলোচনা করবেন। প্রথম আলোচনা হল ذالك -এর مشار اليه কি? এবং দ্বিতীয় আলোচনা হল كتاب শব্দের অর্থ কি? সুতরাং তিনি বলেন–

ذَالِكَ اِشَارَةٌ اِلَى الٓمٓ اِنْ اُوِّلَ بِالْمُؤَلَّفِ مِنْ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ اَوْ فُسِّرَ بِالسُّوْرَةِ اَوِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ لَمَّا تَكَلَّمَ بِهٖ وَتَقَضّٰى اَوْ وَصَلَ مِنَ الْمُرْسِلِ اِلَى الْمُرْسَلِ اِلَيْهِ صَارَ مُتَبَاعِدًا وَاُشِيْرَ اِلَيْهِ بِمَا يُشَارُ اِلَى الْبَعِيْدِ وَتَذْكِيْرُهٗ مَتٰى اُرِيْدَ بِالٓمٓ اَلسُّوْرَةُ لِتَذْكِيْرِ الْكِتَابِ فَاِنَّهٗ خَبَرُهٗ اَوْ صِفَتُهُ الَّذِيْ هُوَ هُوَ اَوْ اِلَى الْكِتَابِ فَيَكُوْنُ صِفَتَهٗ وَالْمُرَادُ بِهٖ اَلْكِتَابُ الْمَوْعُوْدُ اِنْزَالُهٗ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى : اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا. وَنَحْوُهٗ اَوْ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَفْعُوْلَ لِلْمُبَالَغَةِ اَوْ فِعَالٌ بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ كَاللِّبَاسِ ثُمَّ اُطْلِقَ عَلَى الْمَنْظُوْمِ عِبَارَةً قَبْلَ اَنْ يُكْتَبَ لِاَنَّهٗ مِمَّا يُكْتَبُ وَاَصْلُ الْكُتُبِ اَلْجَمْعُ وَمِنْهُ اَلْكَتِيْبَةُ

অনুবাদ:

যদি الم -এর ব্যাখ্যা المؤلف نت هذه الحروف (তথা الم দ্বারা উদ্দেশ্য الم থেকে গঠিত বাক্য) আথবা الم -এর ব্যাখ্যা সূরা বা কুরআন হয়, তাহলে ذالك -এর مشاراليه হবে الم । কেননা, الم যখন উচ্চারণ করা হয়েছে এবং তার অক্ষরগুলো মুখ থেকে দূরে চলে গেছে বা مرسل (প্রেরক) -এর নিকট হতে مرسل اليه (যার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে) তার নিকট পৌছে গেছে, তখন (প্রেরণকারীর নিকট হতে) দূরে চলে গেছে। আর এজন্য তার দিকে সেই اسم اشاره দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যার দ্বারা ইশারা করা হয় দূরবর্তী বস্তুর দিকে। আর যখন الم দ্বারা সূরা উদ্দেশ্য নেয়া হবে, তখন ذالك -কে مذكر নেয়া হয়েছে الكتاب টি مذكر হওয়ার কারণে। কেননা, الكتاب এটা ذالك -এর خبر অথবা সেই صفت যা ذالك ও الكتاب বস্তুত: একই বস্তু। অথবা الكتاب এর- ذالك টি الكتاب হল مشار اليه এর- ذالك । আর তখন الكتاب হবে صفت এবং ذالك দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই কিতাব যাকে আল্লাহ নাযিল করার অঙ্গীকার করেছেন এই আয়াতে– انا سنلقي عليك قولا ثقيلا অথবা অঙ্গীকার করেছেন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতে।

الكتاب শব্দটি মাসদার। তার দ্বারা লিখিত বস্তুর নাম রাখা হয়েছে مبالغه হিসেবে। অথবা كتاب শব্দটি فعال -এর ওযনে اسم مفعول যেমন لباس (শব্দটি ملبوس -এর অর্থে)। অত:পর কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করার পূর্বে মস্তিষ্কের মধ্যে যা বিন্যস্ত থাকে তা বুঝানোর জন্য كتاب শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা, একটু পরেই তো লিখিত আকারে আত্মপ্রকাশ করবে। كتاب -এর মূল অর্থ একত্রিত করা আর তা থেকেই كتيبة (সৈন্যদল) শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: الام اشار بقوله ذالك وكيف؟

ذالك -এর مشار اليه কি?

উত্তর ঃ ذالك দ্বারা কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. الم -এর তাফসীর যদি (ক) المؤلف من هذه الحروف অথবা (খ) সূরা কিংবা (গ) কুরআন হয়, তাহলে ذالك -এর مشار اليه হবে الم ।

২. الم -এর তাফসীর যদি উল্লেখিত তিনভাবে না করে অন্যভাবে করা হয়, তাহলে ذالك -এর مشار اليه হবে الكتاب । এমতাবস্থায় الكتاب দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঐ কিতাব যাকে অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে انا سنلقى عليك قولا ثقيلا অথবা অনুরূপ আয়াতে। অথবা কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে কিতাব অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে পূর্বেকার অসমরানী কিতাবসমূহে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল— আলোচ্য আয়াতে ذالك -এর مشار اليه নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও اسم اشاره للبعيد ব্যবহার করা হল কেন?

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন।

প্রথমত: যখন الم উচ্চারণ করা হয়েছে এবং খতম হয়ে গেছে, তখন তা বক্তার থেকে দূরে চলে গেছে। বিধায় اسم اشاره للبعيد ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু مرسل তথা প্রেরণকারী থেকে مرسل اليه তথা প্রাপকের নিকট পৌছে গেছে। এবং উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেহেতু এখানে اسم اشاره للبعيد ব্যবহরা করা হয়েছে।

السوال: ما معنى الكتاب؟

উত্তর ঃ كتاب শব্দের বিশ্লেষণ

كتاب শব্দটি মাসদার। ماده হল ك+ت+ب অর্থ একত্রিত করা। এ অর্থ থেকেই সেনাবাহিনীকে كتيبة বলা হয়। কেননা, তার মধ্যে অনেক সৈন্য একত্রিত হয়। আর কিতবাকে كتاب বলা হয় এজন্য যে, তার মধ্যেও অনেক বিষয়বস্তুকে একত্রিত করা হয়।

অথবা كتاب শব্দটি فعال -এর ওযনে اسم مفعول -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন لباس -কে ملبوس অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং كتاب এটা مكتوب -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে।

অত:পর রূপক অর্থে সেসব জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে যা ইবারতের আকৃতিতে মেধায় বিন্যস্ত থাকে, আর এটাকে কিতাব দ্বারা নাম রাখার কারণ হল এটা অচিরেই লেখা হবে।

☆☆☆

﴿لَارَيْبَ فِيْهِ﴾

{ যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই }

মুসান্নিফ এখানে (র.) দু'টি বিষয়ের আলোচনা করবেন। প্রথম আলোচনা হল প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় আলোচনা ريب শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।

مَعْنَاهُ لِوُضُوْحِه وَسُطُوْعِ بُرْهَانِه بِحَيْثُ لَايَرْتَابُ الْعَاقِلُ بَعْدَ النَّظْرِ الصَّحِيْحِ فِيْ كَوْنِه وَحْيًا بَالِغًا حَدَّ الْإِعْجَازِ لَا أَنَّ اَحَدًا لَايَرْتَابُ فِيْهِ أَلَا تَرٰى اِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى: وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه. فَاِنَّهٗ مَا اَبْعَدَهُ الرَّيْبَ عَنْهُمْ بَلْ عَرَّفَهُمُ الطَّرِيْقَ الْمُزِيْحَ لَهٗ وَهُوَ اَنْ يَجْتَهِدُوْا فِيْ مُعَارَضَةِ نَجْمٍ مِنْ نُجُوْمِه وَيَبْذُلَ فِيْهَا غَايَةَ جُهْدِهِمْ حَتّٰى عَجِزُوْا عَنْهَا وَتَحَقَّقَ لَهُمْ اَنْ لَيْسَ فِيْهَا مُجَالُ الشُّبْهَةِ وَلَامَدْخَلَ الرِّيْبَةِ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ لَارَيْبَ فِيْهِ لِلْمُتَّقِيْنَ وَهُدًى حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ اَلظَّرْفُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِلْمَنْفِيِّ وَالرَّيْبُ فِي الْاَصْلِ مَصْدَرُ رَابَنِي الشَّيْءُ اِذَا حَصَلَ فِيْكَ الرِّيْبَةُ وَهِيَ قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا سُمِّيَ بِهِ الشَّكُّ بِهَا لِاَنَّهٗ يُقَلِّقُ النَّفْسَ وَيُزِيْلُ الطَّمَانِيْنَةَ وَفِي الْحَدِيْثِ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ فَاِنَّ الشَّكَّ رِيْبَةٌ وَالصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ. وَمِنْهُ رَيْبُ الْمَنُوْنِ لِنَوَائِبِه

অনুবাদ:

لاريب فيه -এর অর্থ হচ্ছে, কুরআন মজীদ তার সুস্পষ্ট বক্তব্য ও উজ্জল প্রমাণাদির ভিত্তিতে এমন মর্যাদায় সমাসীন যে, কুরআন সম্পর্কে সহীহ গবেষণা করার পর তা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী এবং অলৌকিক হওয়ার ব্যাপারে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য সামান্যতম সংশয় থাকতে পারে না। এ অর্থ নয় যে, কুরআনের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে না। কারণ, কুরআনের এ আয়াত وان كنتم فى ريب -এর মধ্যে আল্লাহ তা'লা কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের নফী করেন নি; বরং এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যার মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়। আর সেই পথটি হচ্ছে (আহলে আরব) কুরআনের আয়াত সমূহ হতে সাধারণ একটি আয়াতের স্বরূপ পেশ করার জন্য তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। তারপর যখন তারা স্বরূপ পেশ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে, তখন এমনিতেই তাদের নিকট একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআনের মাঝে সন্দেহ প্রকাশের কোনই অবকাশ নেই।

আর কেউ কেউ বলেন, لاريب فيه -এর অর্থ لاريب فيه للمتقين অর্থাৎ কুরআনের মাঝে মুত্তাকীদের জন্য কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। هدى শব্দটি فيه -এর ضمير مجرور হতে حال

হয়েছে। আর তার عامل হল ঐ مستقر ظرف যা لاريب রূপি منفى-এর সিফাত।

ريبة শব্দটি رابني الشي -এর মাসদার। এটা তখন বলা হয় যখন কোন বস্তু তোমার মাঝে ريبة বা অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আর ريبة বলা হয় অন্তরের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতাকে। شك (সন্দেহ) -কে ريبة এহিসেবে বলা হয় যে, شك অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এবং মনের স্থিরতাকে দূর করে দেয়। হাদীস শরীফে আছে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন– دع ما يريبك الخ "সংশয় সন্দেহ সৃষ্টিকারী বস্তুকে ছেড়ে সত্য ও নিশ্চিত বস্তুকে গ্রহণ কর"। কেননা, شك তথা সন্দেহ ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এবং সত্যবাদিতা অন্তরে স্থিরতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। আর তা থেকেই ريب المنون (কালের দুর্যোগ) শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كيف نفي الريب من القرأن مطلقا مع ان المرتابين فيه اكثر من غير المرتابين ؟ اجب على نهج المفسر العلام

উত্তর ঃ আল্লাহর বাণী لا ريب فيه দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনুল কারীমে কোনরূপ সন্দেহ নেই। অথচ প্রতি যুগে অসংখ্য লোক কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের সংখ্যাই বেশী। তাহলে সাধারণভাবে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের অস্বীকৃতি করা হল কিভাবে? তাছাড়া কুরআনের অন্যত্র আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ থাকতে পারে।

এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে মুফাস্‌সিরগণ বলেন– বস্তুতঃ অত্র আয়াতে لا ريب فيه দ্বারা কুরআনের ব্যাপারে অবিশ্বাসী ও ভ্রান্তবাদীদের থেকে সন্দেহ সংঘটিত না হওয়ার কথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে যে, আল কুরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন এক গ্রন্থ যা সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। কেউ যদি এতে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে সেটা হবে অবান্তর বিষয়। কারণ, তাতে বাস্তবে কোন সন্দেহ নেই।

এ মর্মে আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেছেন–

معناه انه لوضوحه وسطوح برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الاعجاز-

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এমন একখানি গ্রন্থ, যা স্পষ্টভাষীতায় এবং দালিলিক ও প্রমাণিক সুস্পষ্টতায় এমন স্তরের যে, কোন পরিশুদ্ধ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে এ কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই বুঝতে পারবে যে, এটা নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীগ্রন্থ; যা মানুষ রচনা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হল, لا ريب فيه للمتقين অর্থাৎ একিতাবের ব্যাপারে মুত্তাকীদের কোন সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় فيه শব্দটি ريب -এর সিফাত হবে। আর متقين শব্দটি لا -এর খবর।

السوال: ما معنى الريب؟

ريب **শব্দের অর্থ:** ريب শব্দটি باب ضرب -এর মাসদার। এর অর্থ হল قلق النفس واضطرابها অর্থাৎ মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। যেমন আরবী ভাষীরা বলেন– رابني الشيئ (অমুক বস্তুটি আমাকে

অস্থির করে তুলেছে)। সন্দেহ-সংশয় যেহেতু মানুষকে ব্যাকুল ও অস্থির করে তুলে তাই সন্দেহ-সংশয়কে আরবী ভাষায় ريب বলা হয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الشك ريبة والصدق طمانينة অর্থ- যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে তা বর্জন করে যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তা গ্রহণ কর। কেননা, সন্দেহ বিপন্নকারী আর সততা প্রশান্তিদায়ক''। উক্ত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়কে ريبة বলা হয়েছে।

মুসিবত ও দুর্বিপাক অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিধায় কালের দুর্বিপাককে ريب الزمان বলা হয়।

☆☆☆

﴿هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

{মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ}

মুসান্নিফ (র.) এ বাক্যের অধীনে চারটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: هدى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার শাব্দিক বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: দু'টি প্রশ্নের জবাব। ৩য় আলোচনা: মুত্তাকীর পরিচয়, তাক্বওয়ার অর্থ ও তার বিভিন্ন স্তরের। ৪র্থ আলোচনা: الم থেকে নিয়ে هدى للمتقين পর্যন্ত বাক্যগুলোর তারকীব।

يَهْدِيْهِمْ اِلَى الْحَقِّ وَالْهُدٰى فِى الْاَصْلِ: مَصْدَرٌ كَالسُّرٰى وَالتُّقٰى وَمَعْنَاهُ: اَلدَّلَالَةُ وَقِيْلَ: اَلدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْبُغْيَةِ لِاَنَّهٗ جُعِلَ مُقَابِلَ الضَّلَالِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ. وَلِاَنَّهٗ لَايُقَالُ مَهْدِىٌّ اِلَّا لِمَنِ اهْتَدٰى اِلَى الْمَطْلُوْبِ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: هدى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার শাব্দিক বিশ্লেষণ

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মানুষদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আর سرى ও تقوى-এর ন্যায় هدى শব্দটি এখানে মাসদার হয়েছে। তার অর্থ হল, ইবাদতের সামর্থ্য দান করে পথ প্রদর্শন করা। আবার কেউ বলেছেন, هدى দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন পথ প্রদর্শন যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়। কেননা, আল্লাহর বাণী لعلى هدى او فى ضلال مبين -এর মধ্যে هدى- কে ضلال -এর বিপরীতে আনা হয়েছে। আরো একটি কারণ হল مهدى (ইসমে মাফউল) ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما المراد بهدى للمتقين؟ ثم اوضح معنى هدى

উত্তর ঃ هدى للمتقين দ্বারা উদ্দেশ্য

هدى للمتقين বাক্যের মধ্যে বলা হয়েছে যে, কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। কিন্তু কুরআন

কোন দিকে পথ প্রদর্শন করে, তা আয়াতের মধ্যে পরিস্কার নয়। তাই মুসান্নিফ (র.) তার ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, يهديهم الى الحق অর্থাৎ কুরআন মুত্তাকীদেরকে সঠিক পথের পথ প্রদর্শন করে।

هدى শব্দের বিশ্লেষণ

هدى এটা মাসদার। যেভাবে سرى ও تقى শব্দ দু'টি মাসদার। سرى অর্থ হল রাত্রে বিচরন করা আর تقى অর্থ হল অতিমাত্রায় সংযম অবলম্বন করা। কাযী বায়যাবী (র.) هدى শব্দের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. ইবাদতের সামর্থ্য দান করে পথ প্রদর্শন করা।

২. এমন পথ প্রদর্শন করা যা বান্দাকে গন্তব্য স্থানে পৌছে দেয়। আর এ দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি দলীল পেশ করেছেন–

ক. আল কুরআনের আয়াত– لعلى هدى او فى ضلال مبين এ আয়াতে هدى -কে ضلال -এর বিপরীতে আনা হয়েছে। আর ضلال -এর অর্থ হল লক্ষ্যে পৌছানোর পথ গুম করে দেয়া। কাজেই তার বিপরীত অর্থ হবে, লক্ষ্যে পৌছনোর পথ প্রদর্শন করা।

বুঝা গেল যে, هدى -এর অর্থ হল এমন পথ প্রদর্শন করা যা গন্তব্য স্থানে পৌছে দেয়।

খ. هدى থেকে اسم مفعول হল مهدى । আর مهدى সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে লক্ষ্যে পৌছে যায়। কাজেই বুঝা গেল যে, هدى -এর অর্থও লক্ষ্যে পৌছে দেয়া।

☆☆☆

هدى للمتقين -এর উপর দু'টি প্রশ্ন আরোপিত হয়। প্রথম প্রশ্ন হল, হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল কেন? অথচ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সারা বিশ্বের মানুষের হেদায়াতের জন্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পূর্ণ কুরআনকে هدى বলা সঠিক নয়। কেননা, কুরআন হল كلام বা কথা। আর কথা দ্বারা সঠিক পথ তখনই সম্ভব হয় যখন তা বোধগম্য হয়। আর কুরআনের মধ্যে متشابه আয়াতও রয়েছে যার অর্থ দুর্বোধ্য। সুতরাং পূর্ণ কুরআন দ্বারা কিভাবে হেদায়াত পাওয়া সম্ভব?। মুসান্নিফ (র.) নিম্নের ইবারতে প্রথম প্রশ্নের জবাব তুলে ধরেছেন।

وَاخْتِصَاصُهُ بِالْمُتَّقِيْنَ لِأَنَّهُمُ الْمُهْتَدُوْنَ بِهِ وَالْمُنْتَفِعُوْنَ لِنَصْبِهِ وَاِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَامَّةً لِكُلِّ نَاظِرٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ قَالَ: هُدًى لِلنَّاسِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالتَّأَمُّلِ فِيْهِ اِلَّا مَنْ صَقَّلَ الْعَقْلَ وَاسْتَعْمَلَهُ فِيْ تَدَبُّرِ الْاٰيَاتِ وَالنَّظْرِ فِي الْمُعْجِزَاتِ وَتَعْرِيْفُ النَّبُوَّةِ لِأَنَّهُ كَالْغِذَاءِ الصَّالِحِ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ فَاِنَّهُ لَايَجْلِبُ نَفْعًا مَا لَمْ تَكُنِ الصِّحَّةُ حَاصِلَةً وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: দু'টি প্রশ্নের জবাব

(কুরআনে) হেদায়াতকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ কারণে যে, এরাই উক্ত পথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা উপকৃত হবেন। যদিও আল কুরআনের হেদায়াত সকল পাঠকের জন্যই ব্যাপক। এ কারণেই هدى للناس বলা হয়েছে। অথবা এই কারণে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআন দ্বারা গবেষণার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে, যে স্বীয় জ্ঞানকে কুফরের অপবিত্রতা থেকে ঘষে মেজে পরিস্কার করেছে এবং আয়াত ও মু'জিযা'র মধ্যে দৃষ্টান্তের চক্ষু বুলিয়ে নবুওয়াতের দলিলাদিকে বুঝার জন্য ব্যবহার করেছে। কেননা, কুরআনের দৃষ্টান্ত হল, ঐ খাদ্যের ন্যায় যা স্বাস্থ্য রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর স্বাস্থ্যকর খাদ্য ততক্ষণ শরীরের জন্য উপকারী বিবেচিত হতে পারে না যতক্ষণ না তার থেকে পূর্ব থেকেই সুস্থতার গুণ বিদ্যমান না থাকে। আল্লাহ তা'লা وننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين الخ দ্বারা সেই হিকমতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم خصت الهداية بالمتقين فى هدى للمتقين وقد اتى فى قوله تعالى هدى للناس

উত্তর ঃ হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করার কারণ :

মহাগ্রন্থ আল- কুরআন বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন– هدى للناس (মানব জাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ)। তদুপরি هدى للمتقين এই আয়াতে কুরআনের হেদায়াতকে শুধুমাত্র মুত্তাকীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

এর কারণ হল– মুত্তাকীরাই আল- কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং তারাই এর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হয়। মুসলিম-কাফির, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের জন্য কুরআনের হেদায়াত পরিব্যাপ্ত হলেও ফলাফলের দিকে বিবেচনা করে একে মুত্তাকীদের জন্য খাছ করা হয়েছে। সুতরাং তারাই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার উপযুক্ত।

কুরআনের হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য সীমাবদ্ধ করার আরেকটি কারণ হল– কুরআনে গবেষণা ও তাতে চিন্তভাবনা করার পর ঐ ব্যক্তিই কেবল উপকৃত হতে পারে, যে আপন মন-মস্তিষ্ককে সকল বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-বিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা, পূর্ব পুরুষের ভ্রান্তি ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি থেকে পবিত্র করার পর উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মস্তিষ্ক নিয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে। কেননা, কুরআন হল সুস্বাদু ও শক্তিবর্ধক সুখাদ্যের ন্যায়। যেমনিভাবে শক্তিবর্ধক খাদ্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উদরাময় রোগ থেকে সুস্থ হওয়া জরুরী। অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য ঈমানের দ্বারা পরিশুদ্ধ মন-মস্তিষ্ক জরুরী। যেমনটি কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে– وننزل من القرأن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ال خسارا "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং তা জালিমদের ধ্বংসকেই বৃদ্ধি করে"।

☆☆☆

وَلَا يَقْدَحُ مَا فِيْهِ مِنَ الْمُجْمَلِ وَ الْمُتَشَابِهِ فِيْ كَوْنِهٖ هُدًى لِمَا لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ بَيَانِ تَعْيِيْنِ الْمُرَادِ

অনুবাদ:

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব

আর কুরআনের মধ্যে বর্ণিত মুজমাল ও মুতাশাবিহ আয়াত তার هدى হওয়ার ব্যাপারে কোনারূপ প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা, সেগুলোও নির্দিষ্ট অর্থ হতে খালি নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كيف قال هدى للمتقين بالعموم مع ان فيه من المجمل والمتشابه؟

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনের মধ্যে مجمل ও متشابه আয়াত রয়েছে যার অর্থ ও মর্ম মহান প্রভূ আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অপর কেউ জানে না। তদুপরি বক্ষমান আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্পূর্ণ কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত আখ্যায়িত করার কারণ কি?

উত্তর ঃ এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেন– কুরআনের مجمل ও متشابه আয়াত হেদায়াত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, এর মর্ম অনুদঘাটিত নয়। কারণ, راسخ فى العلم (জ্ঞানে পরিপক্ক) ব্যক্তিবর্গ এর মর্ম সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিশুদ্ধ হলেও হানাফী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিশুদ্ধ নয়। কেননা, হানাফীদের মতে, متشابه আয়াতের মর্ম আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ জানেন না। অতএব তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হল– কুরআনের হেদায়াত হওয়ার জন্য তার প্রতিটি অংশ হেদায়াত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তার কিয়দাংশের মর্ম বুঝা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উর্দ্ধে রাখা হয়েছে। যাতে বান্দাদের মধ্যে কে না বুঝেও এর উপর ঈমান আনয়ন করে তা পরীক্ষা হয়ে যায়।

☆☆☆

وَالْمُتَّقِىْ اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَاهُ فَاتَّقٰى وَالْوِقَايَةُ: فَرْطُ الصِّيَانَةِ وَهِىَ فِىْ عُرْفِ الشَّرْعِ: اِسْمٌ لِمَنْ يَقِىْ نَفْسَهُ عَمَّا يَضُرُّهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: اَلْاُوْلٰى اَلتَّوَقِّىْ عَنِ الْعَذَابِ الْمُخَلَّدِ بِالتَّبَرِّىْ عَنِ الشِّرْكِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَالثَّانِيَةُ: اَلتَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثِّمُ مِنْ فِعْلٍ اَوْ تَرْكٍ حَتّٰى الصَّغَائِرِ عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ الْمُتَعَارِفُ بِاِسْمِ التَّقْوٰى فِى الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِه: وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا. وَالثَّالِثَةُ: اَنْ يَتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغُلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَيَتَبَتَّلَ اِلَيْهِ بِشَرَاشِرِه وَهُوَ التَّقْوٰى الْحَقِيْقِىُّ الْمَطْلُوْبُ بِقَوْلِه تَعَالٰى: وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه. وَقَدْ فَسَّرَهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى: هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ عَلَى الْاَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ

অনুবাদ:

মুত্তাকীর পরিচয় এবং তাক্বওয়ার স্তর বিন্যাস

متقى ইসমে ফায়েলের সীগাহ। আরবদের উক্তি وقاه فاتقى থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। আর وقاية বলা হয় অধিক বিরত/বেঁচে থাকা। আর শরীয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজেকে পরকালীন ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর তাক্বওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমতঃ শিরক থেকে বিরত থেকে স্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। আল্লাহর বাণী –والزمهم كلمة التقوى -এর মধ্যে تقوى শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে কোন এমন বিষয় হতে নির্জনতা অবলম্বন করা, যা পাপ কার্যে লিপ্ত করে। চাই তা কর্মমূলক হোক বা পরিত্যাগমূলক হোক। এমনকি কারো কারো মতে, সগীরাহ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। আর শরীয়তের মধ্যে তাক্বওয়ার এই অর্থটি প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'লার বাণী– ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا -এর মধ্যে تقوى শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ এমন বিষয় থেকে পরহেয করা যা নিজের অন্তরকে আল্লাহ তা'লা থেকে দূরে রাখে। এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেস করা। আর এইটাই হল প্রকৃত তাক্বওয়া, যা আল্লাহ তা'লার বাণী– واتقوا الله حق تقاته -এর মূখ্য উদ্দেশ্য। هدى للمتقين -এর তাফসীর এ তিন ধরনেই করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى التقوى لغة وعرفا ومراتب التقوى كم هي وما هي؟ بين كما بين القاضي

উত্তর ঃ তাক্বওয়ার শাব্দিক অর্থ ঃ تقوى শব্দটি وقى মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ-কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা। ভয় করা। বিরত থাকা।

তাক্বওয়ার পারিভাষিক অর্থ ঃ পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং মুত্তাকী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজেকে পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

مراتب التقوى **(তাক্বওয়ার স্তরসমূহ) ঃ** তাক্বওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে–

১. শিরক হতে বেচে থেকে অনন্তকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী الزمهم كلمة التقوى

২. করণীয় কিংবা বর্জনীয় এমন সকল কাজ হতে বিরত থাকা যা মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে। কারো কারো মতে, সগীরাহ গোনাহ থেকেও বেচে থাকা। তাক্বওয়ার এ সংজ্ঞাটি প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লার বাণী ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا

৩. যেসকল বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে তা পরিহার করতঃ তনুমনে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া। এ স্তরের তাক্বওয়াই কামিল ও কাম্য। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর বাণী- واتقوا الله حق تقاته (আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর)।

☆☆☆

وَاعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَوْجُهًا مِنَ الْإِعْرَابِ: أَنْ يَكُوْنَ الٓمٓ مُبْتَدَأً عَلٰى أَنَّهُ اِسْمُ الْقُرْآنِ أَوِ السُّوْرَةِ أَوِ الْمُقَدَّرِ بِالْمُؤَلَّفِ مِنْهَا وَذٰلِكَ خَبَرُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَصَّ مِنَ الْمُؤَلَّفِ مُطْلَقًا وَالْاَصْلُ: أَنَّ الْأَخَصَّ لَايُحْمَلُ عَلَى الْأَعَمِّ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُؤَلَّفُ الْكَامِلُ فِيْ تَالِيْفِهِ الْبَالِغِ أَقْصٰى دَرَجَاتِ الْفَصَاحَةِ وَمَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ وَالْكِتَابُ صِفَةُ (ذَالِكَ) وَأَنْ يَكُوْنَ (الم) خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ وَ(ذَالِكَ) خَبَرًا ثَانِيًا أَوْ بَدْلًا وَالْكِتَابُ صِفَةً

অনুবাদ:____________________________

الم থেকে هدى للمتقين পর্যন্ত বাক্যাবলীর তারকীব

জেনে রাখ যে, এ আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তারকীব হতে পারে। প্রথমতঃ الم হল مبتدا আর তা এভাবে যে, তাকে কুরআনের নাম সাব্যস্ত করা হবে। অথবা তাকে المولف من هذه الحروف (এসব হরফ দ্বারা গঠিত) -এর অর্থে মেনে নেওয়া হবে। আর ذالك হলো তার خبر যদিও المولف من هذه الحروف -এর মোকাবেলায় এটি খাস। আর حمل الشيء على الشيء বা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর আরোপ করা -এ ব্যাপারে কায়দা হল, خاص -এর حمل কখনো عام -এর উপর হয় না। তথাপি এ তারকীব আয়াতের মধ্যে হতে পারে। কেননা, مؤلف দ্বারা উদ্দেশ্য হল مركب যা স্বীয় তারকীবের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং فصاحت ও بلاغت -এর উচ্চ স্তরে। আর الكتاب হল ذالك -এর সিফাত। আর দ্বিতীয় সূরত হল الم হল مبتداء محذوف -এর খবর। আর ذالك হল তার দ্বিতীয় খবর। অথবা بدل এবং الكتاب হল ذالك -এর সিফাত।

☆☆☆

وَ(لَارَيْبَ) فِي الْمَشْهُوْرَةِ مَبْنِيٌّ لِتَضَمُّنِه مَعْنٰى (مِنْ) مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ عَلٰى أَنَّهٗ اِسْمُ (لَا) النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ اَلْعَامِلَةِ عَمَلَ (إِنَّ) لِأَنَّهَا نَقِيْضَتُهَا وَلَازِمَةٌ لِلْاَسْمَاءِ لُزُوْمُهَا وَفِيْ قِرَاءَةِ اِبْنِ الشَّعْثَاءِ مَرْفُوْعٌ (بِلَا) الَّتِيْ بِمَعْنٰى (لَيْسَ) وَ(فِيْه) خَبَرُهٗ وَلَمْ يُقَدَّمْ كَمَا قُدِّمَ فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى: لَا فِيْهَا غَوْلٌ. لِأَنَّهٗ لَمْ يُقْصَدْ تَخْصِيْصُ نَفْيِ الرَّيْبِ بِه مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْكُتُبِ كَمَا قُصِدَ ثَمَّةَ أَوْ صِفَتُهٗ وَ(لِلْمُتَّقِيْنَ) خَبَرُهٗ وَ(هُدًى) نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ أَوِ الْخَبَرِ مَحْذُوْفٌ كَمَا فِيْ (لَاضَيْرَ) وَلِذَالِكَ وُقِفَ عَلٰى (لَارَيْبَ) عَلٰى أَنَّ (فِيْه) خَبَرُ (هُدًى) قُدِّمَ عَلَيْهِ لِتَنْكِيْرِه وَالتَّقْدِيْرُ: لَارَيْبَ فِيْه فِيْه هُدًى وَأَنْ يَكُوْنَ (ذَالِكَ) مُبْتَدَأً وَ(الْكِتَابُ) خَبَرُهٗ عَلٰى مَعْنٰى أَنَّهُ الْكِتَابُ الْكَامِلُ الَّذِيْ يَسْتَأْهِلُ أَنْ يُسَمّٰى كِتَابًا أَوْ صِفَتُهٗ وَمَا بَعْدَهٗ خَبَرُهٗ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ (الٓمٓ)

অনুবাদ:

আর لاريب -কে একটি প্রসিদ্ধ কেরাতে مبنى বলা হয়েছে। কেননা, তা من -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তা نصب -এর স্থানে হয়েছে। তাছাড়া ريب টি لا نفى جنس -এর ইসিম হয়েছে। এমন لا যা ان -এর ন্যায় আমল করে। কারণ, এটা ان -এর বিপরীত। اسم -এর জন্য এমনিভাবে তা জরুরী হয় যেমন ان জরুরী হয়। আর আবুশ শা'ছা এর কেরাত অনুযায়ী لا بمعنى ليس -এর কারণে ريب টি مرفوع হয়েছে। আর فيه সর্বসম্মিতক্রমে لا -এর খবর হয়েছে। এবং সেটাকে لا -এর ইসিমের উপর মুক্বাদ্দাম করা হয়নি, যেমনিভাবে لا فيها غول -এর মধ্যে মুক্বাদ্দাম করা হয়েছিল। কেননা, সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে শুধুমাত্র কুরআন মজীদের সাথে সন্দেহকে نفى ريب করা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি لا فيها غول -এর মধ্যে খাস করার ইচ্ছা করা হয়েছে। অথবা শব্দটি صفت আর للمتقين হল لا -এর খবর এবং هدى শব্দটা حال হওয়ার কারণে نصب -এর স্থানে পতিত হয়েছে। । অথবা لاريب -এর খবর فيه উহ্য আছে যেমন لاضير -এর মধ্যে। আর এজন্যই لا ريب -এর উপর وقف করা হয়েছে। কেননা, فيه টা هدى -এর খবর। তাকে (অর্থাৎ فيه -কে) هدى -এর উপর মুক্বাদ্দাম করা হয়েছে, কারণ হল هدى টা نكره । উহ্য ইবারত হবে لا ريب فيه هدى । আর ذالك টা দ্বিতীয় মুবতাদা এবং الكتاب তার খবর এভাবে যে, এটা এমন পূর্ণ কিতাব যা কিতাব নামকরণের উপযুক্ত। অথবা এটা ذالك -এর সিফাত আর সামনের ইবারত হল لا -এর খবর। অথবা ذالك الكتاب বাক্যটি بتاويل مفرد হয়ে الم -এর খবর হয়েছে।

☆☆☆

وَالْاَوْلٰى اَنْ يُقَالَ اِنَّهَا جُمَلٌ مُتَنَاسِبَةٌ يُقَرِّرُ اللَّاحِقَةُ مِنْهَا السَّابِقَةَ وَلِذَالِكَ لَمْ يَدْخُلِ الْعَاطِفُ بَيْنَهَا فَالم جُمْلَةٌ دَلَّتْ عَلٰى اَنَّ الْمُتَحَدّٰى بِهِ هُوَ الْمُؤَلَّفُ مِنْ جِنْسِ مَا يُرَكِّبُوْنَ مِنْهُ كَلَامَهُمْ وَذَالِكَ الْكِتَابُ جُمْلَةٌ ثَانِيَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِجِهَةِ التَّحَدِّىْ بِاَنَّهُ الْكِتَابُ الْمَنْعُوْتُ بِغَايَةِ الْكَمَالِ ثُمَّ سُجِّلَ عَلٰى كَمَالِهٖ بِنَفْىِ الرَّيْبِ فِيْهِ وَلَا رَيْبَ فِيْهِ ثَالِثَةٌ تَشْهَدُ عَلٰى كَمَالِهٖ اِذْ لَا كَمَالَ اَعْلٰى مِمَّا لِلْحَقِّ وَالْيَقِيْنِ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ بِمَا يُقَدَّرُ لَهٗ مُبْتَدَأٌ رَابِعَةٌ تُؤَكِّدُ كَوْنَهٗ حَقًّا لَا يَحُوْمُ الشَّكُّ بِاَنَّهٗ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

অনুবাদ:

আর উত্তম হল هـدى لـلـمتـقيـن পর্যন্ত চারটি বাক্য মেনে নেয়া। তম্মধ্যে একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত মানা হবে এবং পরের বাক্য আগের বাক্যের বিষয়বস্তুকে দৃঢ় করেছে। একারণেই তো এগুলোর মাঝে কোন حـرف عطف আনা হয়নি। সুতরাং الـم তার উহ্য খবর সহ একটি বাক্য, যা একথার ঘোষণা করছে যে, যে বাক্যের মাধ্যমে আরবদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা হল এই বাক্যের যুক্ত অক্ষরেরই প্রকার দ্বারা। আর ذالك الـكتاب হল দ্বিতীয় জুমলা, যা চ্যালেঞ্জের দিককে এভাবে দৃঢ় করেছে যে, এই কিতাবই চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গতার গুণে গুণান্বিত। অত:পর সন্দেহের نفى করে তার পূর্ণাঙ্গতার মীমাংসা করে দেয়া হয়েছে। আর তৃতীয় জুমলা হল তার সাক্ষী। কেননা, হক্ব ও ইয়াক্বীনের চেয়ে অধিক কেউ পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারে না। আর هـدى لـلـمتـقيـن স্বীয় উহ্য মুবতাদাসহ এ কিত"বের সত্যতার সমর্থন করছে এবং এ কথার প্রমাণ করছে যে, তার আশেপাশেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

☆☆☆

اَوْ تَسْتَتْبِعُ السَّابِقَةَ اللَّاحِقَةُ مِنْهَا اِسْتِتْبَاعَ الدَّلِيْلِ لِلْمَدْلُوْلِ وَبَيَانُهٗ: اَنَّهٗ لَمَّا نَبَّهَ اَوَّلًا عَلٰى اِعْجَازِ الْمُتَحَدّٰى بِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مِنْ جِنْسِ كَلَامِهِمْ وَقَدْ عَجِزُوْا عَنْ مُعَارَضَتِهٖ اِسْتَنْتَجَ مِنْهُ اَنَّهُ الْكِتَابُ الْبَالِغُ حَدَّ الْكَمَالِ وَاِسْتَلْزَمَ الْكَمَالَ اَنَّهٗ لَا يَتَشَبَّثُ الرَّيْبَ بِاَطْرَافِهٖ اِذْ لَا اَنْقَصَ مِمَّا يَعْتَرِيْهِ الشَّكُّ وَالشُّبْهَةُ وَمَا كَانَ كَذَالِكَ لَامَحَالَةَ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অনুবাদ:

অথবা এটা বলা হবে যে, প্রতিটি পরবর্তী বাক্য তার পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য অত্যাবশ্যক, যেমনিভাবে دلـيـل তার مـدلـول -এর জন্য অত্যাবশ্যক। একথাটির ব্যাখ্যা হল– প্রথমতঃ যখন

আল্লাহ তা'লা এই কিতাবের اعــجــاز -এর ব্যাপারে এমনভাবে সতর্ক করেছেন যে, এই কিতাব সম্বোধিত ব্যক্তির কথার ন্যায় বাক্য দ্বারা বাক্য সমষ্টির সমজাতীয়। এতদসত্ত্বেও তারা এর মোকাবিলা করতে অক্ষম, তাই এর দ্বারা একথা আবশ্যক হয় যে, এটিই এমন একটি কিতাব যা পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছেছে। আর পূর্ণাঙ্গতা একথার প্রমাণ বহন করে যে, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, যে সমস্ত জিনিস সন্দেহপূর্ণ হয় তার চেয়ে অধিক অসম্পূর্ণ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আর যে কিতাব দৃঢ়তার এত উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে নিঃসন্দেহে তা মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হতে পারবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله واعلم ان الاية تحتمل الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে ৪র্থ আলোচনা শুরু করছেন। অর্থাৎ الم ذالك الكتاب -এর الم থেকে هدى للمتقين পর্যন্ত সমস্ত বাক্যের তারকীব উল্লেখ করেছেন। প্রথমে الم ذالك الكتاب -এর কয়েকটি তারকীব বর্ণনা করবেন, এরপর لاريب فيه هدى للمتقين -এর তারকীব বর্ণনা করবেন। এরপর الم ذالك الكتاب -এর অবশিষ্ট কিছু তারকীব উল্লেখ করবেন। আমি পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে সব ক'টি তারকীবকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছি।

السوال: اعرب قوله الم ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين

উত্তর ঃ উপরোক্ত আয়াতের ৮টি তারকীব হতে পারে।

১ম তারকীব: যদি الم -কে حروف مقطعات গণ্য করা হয়, তাহলে তার কোন محل اعراب নেই। আর যদি الم -কে আল্লাহ, কোরআন বা সূরার নাম গণ্য করা হয় অথবা তাকে المؤلف من هذه الحروف -এর সংক্ষিপ্ত রূপ গণ্য করা হয়, তাহলে الم হল مبتداء আর ذالك الكتاب হল তার خبر ।

২য় তারকীব: الم হল مبتداء محذوف -এর খবর। অর্থাৎ الم দ্বারা কুরআন বা সূরার নাম উদ্দেশ্য হলে পূর্বে هذا মুবতাদা উহ্য হবে। আর الم তার خبر।

আর الم -কে المؤلف من جنس هذه الخ ব্যাখ্যা করা হলে ذالك الكتاب হবে هذا মুবতাদা মাহযুফের দ্বিতীয় খবর।

৩য় তারকীব: الم দ্বারা কুরআন বা সূরার নাম উদ্দেশ্য হলে পূর্বে هذا মুবতাদা উহ্য হবে। الم তার খবর হবে। আর الم -কে المؤلف من جنس هذه الخ ব্যাখ্যা করা হলে الم হবে مبدل منه আর ذالك الكتاب হবে তার بدل । অত:পর مبدل منه ও بدل মিলে هذا উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

৪র্থ তারকীব: الم মুবতাদা এবং ذالك الكتاب জুমলা হয়ে الم -এর খবর হবে।

৫ম তারকীব: الم প্রথম মুবতাদা। আর ذالك الكتاب হল দ্বিতীয় মুবতাদা। لاريب فيه পূর্ণ বাক্য হয়ে প্রথম খবর। আর هدى للمتقين হল দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে ذالك الكتاب দ্বিতীয় মুবতাদা তার উভয় খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে الم প্রথম মুবতাদার খবর।

৬ষ্ঠ তারকীব: الم মুবতাদা মাহযুফের প্রথম খবর। এবং ذالك الكتاب দ্বিতীয় খবর।

৭ম তারকীব: ذالك الكتاب لاريب উক্তিটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং فيه للمتقين আরেকটি স্বতন্ত্র বাক্য। বিস্তারিত বিশ্লেষণ হল– ذالك الكتاب হল মুবতাদা আর لا হল لا نفي جنس আর ريب তার ইসিম এবং উহ্য فيه উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه خبريه ।

আর فيه هدى للمتقين -এর বিশ্লেষণ হল– فيه উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم ।
আর هدى للمتفين -এর মধ্যে هدى হল শিবহে ফে'ল ও للمتفين হল তার متعلق । পরিশেষে هدى টি مبتداء مؤخر । তারপর خبر مقدم ও مبتداء مؤخر মিলে جمله اسميه হয়েছে।

৮ম তারকীব: الم ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين এখানে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চার জুমলা রয়েছে। আর তা হল–

১ম জুমলা: الم । অর্থাৎ الم টি هذا মুবতাদা মাহযুফের খবর হয়ে جلمه اسميه ।

২য় জুমলা: ذالك الكتاب অর্থাৎ ذالك মুবতাদা আর الكتاب খবর। অত:পর جلمه اسميه ।

৩য় জুমলা: لا ريب فيه । অর্থাৎ لا টি لا نفى جنس আর ريب হল তার ইসিম ও فيه খবর মিলে جلمه اسميه ।

৪র্থ জুমলা: هدى للمتقين । অর্থাৎ هدى মুবতাদা। আর للمتقين তার খবর।

ফায়দাঃ

قوله ولم يقدم كما قدم الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল– لا ريب فيه -এর মধ্যে فيه -কে ريب (ইসম) -এর উপর মুক্বাদ্দাম করা হল না কেন? যেমন আল্লাহ তা'লা জান্নাতের শরাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন– لا فيها غول এখানে তো فيها -কে غول (ইসম) -এর উপর মুক্বাদ্দাম করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হল– খবরকে মুক্বাদ্দাম করা হয় اختصاص বা বিশিষ্টকরণার্থে। সুতরাং যেখানে اختصاص -এর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেখানে খবরকে মুক্বাদ্দাম করা হয়েছে। আর যেখানে اختصاص উদ্দেশ্য নেই সেখানে খবরকে মুক্বাদ্দাম করা হয়নি। এখানে عدم ريب -কে আসমানী কিতাবের তুলনায় শুধুমাত্র কুরআনের সাথে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি তা হয় তাহলে অর্থ হবে কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী কিতাবে সন্দেহ আছে। অথচ কোন আসমানী কিতাবেই সন্দেহ নেই। তাই এখানে فيه -কে মুক্বাদ্দাম করা হয় নি।

পক্ষান্তরে لا فيها غول -এর মধ্যে اختصاص -এর উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাই فيها -কে মুক্বাদ্দাম করা হয়েছে। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, শুধুমাত্র জান্নাতী শরাবের মধ্যে কোন প্রকার নেশা নেই। আর একথা বুঝাতে হলে فيها -কে মুক্বাদ্দাম করতে হবে। তাই فيها -কে মুক্বাদ্দাম করা হয়েছে।

☆☆☆

وَفِيْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نُكْتَةٌ ذَاتُ جَزَالَةٍ فَفِي الْأُوْلٰى: اَلْحَذْفُ وَالرَّمْزُ اِلَى الْمَقْصُوْدِ مَعَ التَّعْلِيْلِ وَفِي الثَّانِيَةِ: فَخَامَةُ التَّعْرِيْفِ وَفِي الثَّالِثَةِ تَاخِيْرُ الظَّرْفِ حَذْرًا عَنْ اِيْهَامِ الْبَاطِلِ وَفِي الرَّابِعَةِ: اَلْحَذْفُ وَالتَّوْصِيْفُ بِالْمَصْدَرِ لِلْمُبَالَغَةِ وَاِيْرَادُهٗ مُنَكَّرًا لِلتَّعْظِيْمِ وَتَخْصِيْصُ الْهُدٰى بِالْمُتَّقِيْنَ بِاِعْتِبَارِ الْغَايَةِ وَتَسْمِيَةُ الْمُشَارِفِ لِلتَّقْوٰى مُتَّقِيًا اِيْجَازًا وَتَفْخِيْمًا لِشَانِهٖ

অনুবাদ:

আর উক্ত চারটি বাক্যের প্রতিটি বাক্যের মধ্যে কোন না কোন সূক্ষ তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। যেমন প্রথম বাক্যের মধ্যে রয়েছে حذف বা বিলুপ্তি, উদ্দেশ্যের সাথে সাথে কারণের দিকে ইশারাকরণ। দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে حرف تعريف -এর উল্লেখ, তৃতীয় বাক্যের মধ্যে বাতিলের অপবাদ থেকে রক্ষার জন্য ظرف -কে مؤخر করণ, চতুর্থ বাক্যের মধ্যে حذف বা বিলুপ্তি এবং مبالغه -এর উদ্দেশ্যে মাসদারকে সিফাত বানানো ও تعظيم -এর উদ্দেশ্যে نكره উল্লেখকরণ অন্যতম। তাছাড়া হেদায়াতকে তার শেষ স্তর হিসেবে متقين -এর সাথে খাস করা হয়েছে। এবং এ বাক্যে এমন ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়েছে যে তাক্বওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সংক্ষিপ্তকরণ এবং ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ﴿ الم. ذالك الكتاب لاريب فيه. هدى للمتقين﴾
السوال: اوضح البلاغة فى هذه الايات

উত্তর ঃ বর্ণিত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটি আয়াতের মধ্যে বালাগাতের কয়েকটি কায়দা পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

প্রথম বাক্য হল الم এতে বালাগাতের তিনটি ক্বায়দা পরিলক্ষিত হয়।

১. বালাগাতের একটি ক্বায়দা হল حذف বা শব্দ ও বাক্য উহ্য থাকা। যাকে ايجاز حذف বলা হয়। আয়াতের প্রথম বাক্য তথা الم -এর মধ্যে এ ক্বায়দা পাওয়া গেছে। কেননা, الم -এর মধ্যে হয়ত مبتداء উহ্য আছে অথবা خبر উহ্য আছে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের বালাগাত হল الم দ্বারা تعليل বা কারণ বর্ণনা করে উদ্দেশ্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হওয়াকে সাব্যস্ত করা।

৩. الم -কে এনে ওহী হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছেন। আর তা এভাবে যে, যেহেতু متحدى به তথা কুরআন তোমাদের কথার শব্দাবলীর দ্বারাই গঠিত। কাজেই তোমরা এর অনুরূপ কালাম উপস্থাপন করো। কিন্তু যখন তোমরা তা উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে গেলে কাজেই এখন তোমরা তা বুঝে নাও যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আনীত।

দ্বিতীয় বাক্য হল ذالك الكتاب এখানে বালাগাতের একটি ক্বায়দা পাওয়া গেছে। তা হল– এখানে الكتاب -কে الف ولام যুক্ত করে معرفه তথা معرف باللام বানানো হয়েছে। আর معرفه হওয়ার কারণে الكتاب টি ذالك -এর অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আর ذالك -এর অর্থ হল "এই কুরআন", এখন الكتاب -এর মধ্যে الف ولام যুক্ত করে كتاب -কে কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নেয়া হয়েছে। কেননা, কুরআন তার পূর্ণাঙ্গতার কারণে এত উঁচু পর্যায়ে চলে এসেছে যে, অন্য কোন কিতাব তার আশেপাশে স্থান পাবে না। কাজেই এ الف ولام আসার কারণে এ সীমাবদ্ধতা লাভ হয়েছে।

তৃতীয় বাক্য হল لاريب فيه । এতে বালাগাতের একটি ক্বায়দা পাওয়া গেছে। তা হল– এ বাক্যের মধ্যে فيه যা خبر ও ظرف -এটাকে শেষে রাখা হয়েছে, আগে আনা হয়নি। যার কারণে অসত্য এক

ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেননা, যদি আগে ব্যবহার করা হতো, তাহলে তার অর্থ হতো "কেবল কুরআনের মধ্যেই কোন সন্দেহ নেই"। অথচ কুরআন ছাড়াও আরো যত আসমানী কিতাব রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই فيه -কে পরে এনে উক্ত সন্দেহকে দূরীভূত করা হয়েছে।

চতুর্থ বাক্য হল هدى للمتقين । এ চতুর্থ বাক্যে পাঁচটি ক্বায়দা পাওয়া গেছে।

১ম ক্বায়দা হল– حذف । এবাক্যের মধ্যে এই ক্বায়দাটি পাওয়া গেছে। কেননা, هدى -এর مبتداء তথা هو -কে حذف করা হয়েছে।

২য় ক্বায়দা হল– এখানে هدى যা مصدر তাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং مصدر -কে حمل প্রয়োগ করা হয়েছে هو -এর উপর। আর هو দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন। এখানে যদিও مصدر -এর حمل কোন ذات বা সত্তার উপর জায়েয নেই। কিন্তু مبالغه হিসেবে এখানে তাই করা হয়েছে। তাই যেন কুরআন হেদায়েত দাতা হিসেবে এত উঁচু পর্যায়ে উপনীত যে, তা নিজেই হেদায়েত হয়ে গেছে।

৩য় ক্বায়দা হল– هدى -কে نكره আনা হয়েছে। আর نكره বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ফায়দা দেয়। তাই هدى -কে نكره ব্যবহার করে কুরআনকে অনেক উঁচু মাপের হেদায়েত দাতা সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে যে, কুরআন এত উঁচু মাপের হেদায়েত দাতা যার হেদায়েতের কোন প্রান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই এখানে هدى -কে نكره ব্যবহার করে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

৪র্থ ক্বায়দা হল– হেদায়েতকে মুত্তাক্বীদের সাথে খাস করা হয়েছে তাদের শেষ পরিণতি ও ফলাফলের বিবেচনায়। কেননা, কুরআন তো মুত্তাক্বী ও গায়রে মুত্তাক্বী সবার জন্য হেদায়েত। কিন্তু যদিও উভয় প্রকারের মানুষের জন্য হেদায়েত তথাপি সর্বশেষে দেখা যায় যে, মুত্তাক্বীরাই কুরআনের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এখানে মুত্তাক্বীদের শেষ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে হেদায়েতকে তাদের সাথে খাস করা হয়েছে।

৫ম ক্বায়দা হল– যে ব্যক্তি এখনও মুত্তাক্বী হয়নি; বরং মুত্তাক্বী হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, তাকে আল্লাহ তা'লা মুত্তাক্বী নাম দ্বারা অভিহিত করেছেন। বালাগাতের পরিভাষায় এ ক্বায়দাকে مجاز ما يؤل বলা হয়। এর দ্বারা দু'টি ফায়দা হয়েছে। (ক) সংক্ষিপ্তকরণ (খ) صائر الى التقوى (তাক্বওয়ার নিকটস্থ) -এর মর্যাদা বৃদ্ধি। অর্থাৎ যে এখনো মুত্তাক্বী হয়নি তবে হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে তার মর্যাদা এত বেশী যে, তাকে মুত্তাক্বী বলা যেতে পারে।

﴿ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ﴾

{ যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন করে }

মুসান্নিফ (র.) এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনটি আলোচনা করেছেন। (ক) الـذيـن -এর তারকীব (খ) ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ (গ) غيب শব্দের বিশ্লেষণ। সুতরাং প্রথম আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত ইবারতের মধ্যে। যেমন তিনি বলেন–

إِمَّا مَوْصُوْلٌ بِالْمُتَّقِيْنَ عَلٰى أَنَّهٗ صِفَةٌ مَجْرُوْرَةٌ مُقَيِّدَةٌ لَهٗ إِنْ فُسِّرَ التَّقْوٰى بِتَرْكِ مَا لَايَنْبَغِيْ مُرَتَّبَةً عَلَيْهِ تَرَتُّبَ التَّحْلِيَةِ عَلَى التَّخْلِيَةِ وَالتَّصْوِيْرِ عَلَى التَّصْقِيْلِ أَوْ مُوَضِّحَةٌ إِنْ فُسِّرَ بِمَا يَعُمُّ فِعْلَ الْحَسَنَاتِ وَتَرْكَ السَّيِّئَاتِ لِإِشْتِمَالِه عَلٰى مَا هُوَ أَصْلُ الْاَعْمَالِ وَأَسَاسُ الْحَسَنَاتِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا أُمَّهَاتُ الْاَعْمَالِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الْمُسْتَتْبَعَةِ لِسَائِرِ الطَّاعَاتِ وَالتَّجَنُّبُ عَنِ الْمَعَاصِيْ غَالِبًا أَلَا تَرٰى إِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى: إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَالزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ. أَوْ مَادِحَةٌ بِمَا تَضَمَّنَهٗ وَتَخْصِيْصُ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ وَإِقَامُ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ بِالذِّكْرِ إِظْهَارًا لِفَضْلِهَا عَلٰى سَائِرِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ إِسْمِ التَّقْوٰى أَوْ عَلٰى أَنَّهٗ مَدْحٌ مَنْصُوْبٌ أَوْ مَرْفُوْعٌ بِتَقْدِيْرِ: أَعْنِيْ أَوْ هُمُ الَّذِيْنَ وَإِمَّا مَفْصُوْلٌ عَنْهُ مَرْفُوْعٌ بِالْإِبْتِدَاءِ وَخَبَرُهٗ أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى فَيَكُوْنُ الْوَقْفُ عَلٰى هُدًى تَامًّا

অনুবাদ:

الـذيـن يـؤمنون بالغيب বাক্যটির সম্পর্ক হয়তো متقين -এর সাথে হবে এ ভিত্তিতে যে, এটা তার জন্য صفت مقيده (সীমাবদ্ধকারী সিফাত) হবে এবং حالت جرى -তে হবে। যদি تقوى -এর তাফসীর করা হয় অনুপযোগী জিনিসকে বর্জন করার দ্বারা। আর متقين -এর উপর তার বিন্যাসটা এমনই হবে যেমন সাজসজ্জার বিন্যাস করা হয় পরিচ্ছনতার উপর এবং অঙ্কন কর্মের বিন্যাস করা হয় বার্নিশ করার উপর। অথবা এ আয়াত হবে متقين -এর صفت موضحه (বিশ্লেষণকারী সিফাত) যদি তাক্বওয়া এর তাফসীর করা হয় সকল সৎকর্ম সম্পাদন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা দ্বারা। কেননা, الـذيـن يـؤمـنـون الخ আয়াত তার পরবর্তী ينفقون পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে এমন জিনিসকে, যা হল সকল আমলের মূল। অর্থাৎ ঈমান, সালাত এবং সাদকা। এগুলোকে আমলের মূল বলার কারণ হল, ঈমান হচ্ছে আত্মার সম্পর্কিত অবস্থার মূল । আর সালাত হচ্ছে শারীরিক আমলের মূল। এবং যাকাত হচ্ছে আর্থিক ইবাদতের মূল। সুতরাং এ সমস্ত

মৌলিক কাজগুলো আবশ্যক করে যে, মানুষ যাবতীয় ইবাদতসমূহকে আদায় করবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকবে। দেখন! আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন– ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر তদ্রূপভাবে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন – الصلوة عماد الدين والزكوة قنطرة الاسلام । অথবা الذين يؤمنون الخ বাক্যটি হল متقين -এর জন্য صفت مادحه ঐ সমস্ত জিনিসকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার দ্বারা যাকে متقين অন্তর্ভুক্ত করে। আর متقين -এর গুণাবলী থেকে বিশেষতঃ অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন, সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদান তিনটিকে উল্লেখ করার কারণ হল, تقوى -এর অধীনে আরো যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে সেগুলোর উপর এগুলোর প্রাধান্য দেওয়া। অথবা এজন্য যে, এটি اعنى উহ্য ফে'লের কারণে منصوب হয়েছে। কিংবা هم উহ্য ضمير -এর কারণে مرفوع হয়েছে। আর এ আয়াতটি পৃথক হওয়ার কারণ হল, পূর্ণ বাক্য بتاويل مفرد হয়ে মুবতাদা আর اولئك على هدى الخ হল তার খবর। এ অবস্থায় متقين -এর উপর وقف تام হবে وقف ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اعرب قوله الذين يؤمنون بالغيب

উত্তর ঃ الذين.......الخ -এর তাকীবঃ

তারকীবের বিবরণ হল– হয়তো পূর্বের المتقين -এর সাথে الذين -এর **সম্পর্ক হবে অথবা হবে না।**

যদি পূর্বের সাথে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তার মধ্যে তারকীব হবে الذين يؤمنون بالغيب হল মুবতাদা আর اولئك على هدى من ربهم হবে তার খবর। আর তখন متقين -এর মধ্যে وقف تام হবে।

আর যদি পূর্বের সাথে সম্পর্ক থাকে, তাহলে তার মধ্যে তিন ধরনের اعراب আসতে পারে। যদি الذين -কে مرفوع ধরা হয়, তাহলে তারকীব হবে الذين يؤمنون بالغيب হল খবর আর তার মুবতাদা হবে উহ্য। মূল ইবারত হবে– هم الذين يؤمنون بالغيب ।

আর যদি منصوب ধরা হয়, তাহলে তার তারকীব হবে الذين يؤمنون بالغيب হল مفعول به এবং তার পূর্বে اعنى বা امدح ফে'ল উহ্য ধরা হবে।

আর যদি مجرور ধরা হয়, তাহলে الذين টি المتقين -এর সিফাত হবে। সিফাত হলে صفت مقيده হবে অথবা صفت موضحه হবে অথবা صفت مادحه হবে।

ফায়দা ঃ

الذين....الخ قوله مرتبة عليه ترتب التحلية : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, يؤمنون بالغيب -এর সম্পর্ক متقين -এর সাথে এরকমই যেরকম تحليه -এর সম্পর্ক হল تخليه -এর সাথে এবং تصوير -এর সম্পর্ক হল تصقيل -এর সাথে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গহনা দ্বারা সজ্জিত হতে চায়, তার জন্য অত্যাবশ্যক হল প্রথমে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিবে। অত:পর গহনা দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করবে। এবং চিত্রাঙ্কনকারীর জন্য জরুরী হল প্রথমে কাষ্ঠকে পরিস্কার করে নিবে অত:পর তার উপর রেখে চিত্র অঙ্কন করবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি করতে চায় তার জন্য জরুরী হল, প্রথমে অনর্থক জিনিস হতে নিজেকে পবিত্র করবে এবং তারপর হেদায়েতের দ্বারা করণীয় কাজগুলো পালন করবে।

☆☆☆

وَالْإِيْمَانُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصْدِيْقِ مَاخُوْذٌ مِنَ الْإِيْمَان كَأَنَّ الْمُصَدِّقَ أَمِنَ الْمُصَدَّقُ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَالْمُخَالَفَةِ وَتَعْدِيَتُهُ بِالْبَاءِ لِتَضْمِيْنِه مَعْنَى الْإِعْتِرَافِ وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْوُثُوْقِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْوَاثِقَ صَارَ ذَا أَمْنٍ وَمِنْهُ مَا اٰمَنْتُ اَنْ اَجِدَ صَحَابَةً. وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ فِيْ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَالتَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ أَنَّهُ مِنْ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَالتَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

অভিধানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাসদীক্ব বা সত্যায়ন করা। এটা امن থেকে নির্গত হয়েছে যেন সত্যায়নকারী ব্যক্তি সত্যায়নকৃতকে মিথ্যায়ন ও বিরোধিতা থেকে নিরাপদ করেছে। আর ايمان -কে باء দ্বারা متعدى বানানো হয়েছে اعتراف -এর অর্থকে তার মধ্যে শামিল করার কারণে। আবার কখনো ايمان শব্দটি وثوق (ভরসা করা) -এর অর্থ প্রদান করে, এ হিসেবে যে, ভরসাকারী ব্যক্তি নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে যায়। এ থেকেই বলা হয়– ما امنت ان اجد صحابة তথা আমি সাথী পাওয়ার উপর ভরসা করি না। আর يؤمنون -এর মধ্যে উভয় অর্থই হতে পারে। আর শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় এমন জিনিসের সত্যায়নকে, যা হুযুর (সা.) -এর আনীত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। যেমন- তাওহীদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান এবং প্রতিদান ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الايمان لغة و شرعا؟

উত্তর ঃ ايمان -এর **শাব্দিক অর্থ:** ايمان শব্দটি باب افعال -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ–
১. আনুগত্য করা। ২. সত্যায়ন করা। ৩. ভরসা করা।

ايمان শব্দটি امن মাদ্দা থেকে নির্গত। امن অর্থ নিরাপদ থাকা। অত:পর باب افعال -এ যাওয়ার পর তা متعدى হয়ে গেছে। অর্থাৎ সত্যায়নকারী (মুমিন) সত্যায়িত সত্তা (আল্লাহ ও তদীয় রাসূল) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিরোধিতা করা থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করেছে।

ايمان -এর **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় এমন জিনিসের সত্যায়ন করাকে যা রাসূল (সা.) -এর অনীত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

বক্ষমান আয়াতে ঈমান শব্দের মধ্যে اعتراف। তথা বিশ্বাস করার সাথে সাথে স্বীকার করার অর্থও রয়েছে। তাই তার صله -এর মধ্যে باء আনা হয়েছে।

☆☆☆

وَمَجْمُوْعُهُ ثَلَاثَةُ اُمُوْرٍ: اِعْتِقَادُ الْحَقِّ وَالْاِقْرَارُ بِهٖ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ فَمَنْ أَخَلَّ بِالْاِعْتِقَادِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَمَنْ أَخَلَّ بِالْعَمَلِ فَفَاسِقٌ وِفَاقًا وَكَافِرٌ عِنْدَ الْخَوَارِجِ خَارِجٌ عَنِ الْاِيْمَانِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْكُفْرِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ التَّصْدِيْقُ وَحْدَهُ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَضَافَ الْاِيْمَانَ اِلَى الْقَلْبِ فَقَالَ: ﴿كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ﴾ ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ﴾ ﴿وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ﴾ ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ﴾ وَعَطَفَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِىْ مَوَاضِعَ لَاتُحْصٰى وَقَرَنَهُ بِالْمَعَاصِىْ فَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا﴾ ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى﴾ ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ قِلَّةِ التَّغْيِيْرِ لِاَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الْاَصْلِ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ بِالْاِرَادَةِ فِى الْاٰيَةِ اِذِ الْمُعَدّٰى بِالْبَاءِ هُوَ التَّصْدِيْقُ وِفَاقًا

অনুবাদ:

জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজিগণের মতে, ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। অন্তরে সঠিক বলে মনে করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। সুতরাং যার শুধুমাত্র বিশ্বাসে ত্রুটি আছে, সে মুনাফিক্, আর যার স্বীকারোক্তিতে ত্রুটি আছে সে স্পষ্ট কাফির, আর যার আমলে ত্রুটি আছে সে ফাসিক। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু খারেজিগণের মতে, তৃতীয় ব্যক্তিও কাফির। আর মু'তাযিলাগণের মতে, সে ঈমান থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে, তবে কুফরিতে প্রবেশ করবে না। আর যারা মনে করে যে, ঈমান শুধু تصديق قلبى বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম তাদের দলীল হল, আল্লাহ তা'লা ঈমানের সম্পর্ক করেছেন কলবের দিকে। আল্লাহ তা'লা বলেন– كتب فى قلوبهم الايمان + وقلبه مطمئن بالايمان + ولم تؤمن قلوبهم + ولما يدخل الايمان فى قلوبهم তাছাড়া অনেক আয়াতের মধ্যে তিনি عمل صالح বা সৎকাজকে ঈমানের উপর عطف করেছেন এবং ঈমানকে কবীরা গুনাহের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন– وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا + يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى + الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم । তাছাড়া (শুধু تصديق قلبى মানার সূরতে) অর্থের মধ্যে পরিবর্তন কম হয়। কেননা, এ অর্থ আভিধানিক অর্থের খুবই কাছাকাছি এবং আয়াতে এই অর্থই সুনির্দিষ্ট।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: الايمان بسيط ام مركب؟ وما هو الاختلاف فيه؟

উত্তর ঃ ঈমান بسيط না مركب তা সম্পর্কে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। بسيط বলা হয় একক

বস্তুকে এবং مركب বলা হয় যুক্ত ও সমষ্টি বস্তুকে।

মতবিরোধ: এসম্পর্কে মোট সাতটি অভিমত রয়েছে। আল্লামা বায়যাবী (র.) তন্মধ্যে দু'টি অভিমতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম অভিমত হল দার্শনিক ফেকাহবিদ ও মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। এবং দ্বিতীয় অভিমত হল জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজিগণের।

মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত ঃ তাদের মতে, ঈমান হল بسيط তথা শুধু تصديق قلبي বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল এ দু'টি বস্তু মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, মৌখিক স্বীকারোক্তি হল দুনিয়াবি হুকুম প্রয়োগ করার জন্য শর্ত। আর আমল হল ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মাধ্যম।

জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজিগণের অভিমত ঃ তাদের মতে, ঈমান হল مركب তথা তিনটি বস্তুর সমষ্টির নাম। (ক) আন্তরিক বিশ্বাস (খ) মৌখিক স্বীকারোক্তি (গ) কার্যে পরিণতকরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসকে বর্জন করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে মুনাফিক। আর যদি এর সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিকে বর্জন করে, তাহলেও সে সর্বসম্মতিক্রমে স্পষ্ট কাফির। কিন্তু যদি কারো মধ্যে উপরোক্ত দু'টি পাওয়া গেল কিন্তু তৃতীয়টি অর্থাৎ আমলে ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে তার ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে সে ঈমান থেকে বের হয়ে কুফরির মধ্যে প্রবেশ করবে কি না? সে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছেন। জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, সে ফাসিক সহ মুমিন থাকবে, খারিজিদের মতে, সে কাফের হয়ে যাবে, আর মু'তাযিলাদের মতে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে তবে কাফির হবে না।

ঈমান সম্পর্কে ইমাম বায়যাবী (র.) -এর অভিমত ঃ ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়ল জামাতের আভিমতকেই আল্লামা বায়যাবী (র.) সমর্থন করেন।

অগ্রগণ্য অভিমত ঃ এ উভয় মাযহাবের মধ্যে মুহাক্কিক্বীন ও বায়যাবী (র.) -এর অভিমতই অগ্রগণ্য। এর প্রমাণ হল–

১. আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'লা ঈমানকে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন–

(ক) ولما يدخل الايمان (খ) ولم تؤمن قلوبهم (গ) وقلبه مطمئن بالايمان (ঘ) كتب فى قلوبهم الايمان في قلوبهم।

কলব দ্বারা কেবল বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অতএব ঈমান مركب হলে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো না।

২. আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে সৎকর্মকে ঈমানের উপর عطف করা হয়েছে। যেমন–

الذين امنوا وعملوا الصالحات

আর স্বতসিদ্ধ ক্বায়দা হল معطوف ও معطوف عليه -এর মধ্যে ভিন্নতা থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الاعمال الصالحه ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. অনেক আয়াতে গুনাহগারদের মুমিন উপাধীতে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব পাপাচারি ফাসিক যদি মুমিন না হতো, তাহলে তাদেরকে মুমিন উপাধীতে সম্বোধন করা হতো না। যেমন–

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

৪. শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানকে শুধু تصديق قلبي তথা আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করা হলে আভিধানিক অর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যতা হয়। আর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞার মাঝে যোগসূত্র থাকাই কাম্য।

৫. يؤمنون بالغيب الخ আয়াতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞাই সুনির্ধারিত। কেননা, ايمان শব্দ متعدى بالباء হলে তার দ্বারা শুধু تصديق অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

মোটকথা, এ পাঁচ দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান হল بسيط তথা শুধু تصديق قلبي-এর নাম। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল এ দু'টি মূল ঈমানের অন্তর্গত নয়।

☆☆☆

ثُمَّ اخْتُلِفَ فِيْ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّصْدِيْقِ بِالْقَلْبِ هُوَ كَافٍ لِأَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ أَمْ لَابُدَّ مِنْ انْضِمَامِ إِقْرَارٍ بِهِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُ ؟ وَلَعَلَّ الْحَقَّ هُوَ الثَّانِيْ لِأَنَّهُ تَعَالٰى ذَمَّ الْمُعَانِدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَمِّ الْجَاهِلِ الْمُقَصِّرِ وَلِلْمَانِعِ أَنْ يَجْعَلَ الذَّمَّ لِلْإِنْكَارِ لَا لِعَدَمِ الْإِقْرَارِ

অনুবাদ:

অত:পর এতসংক্রান্ত ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, নাজাত প্রাপ্তির জন্য কি শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসই যথেষ্ট, কেননা এটাই হল উদ্দেশ্য। না কি যার জন্য সম্ভব হয় তার জন্য সত্যায়নের সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিকে মিলিয়ে নেয়া আবশ্যক। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মতই অধিক প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ তা'লা অস্বীকারকারীর অধিক মন্দত্ব বর্ণনা করেছেন মূর্খদের মন্দত্ব বর্ণনা করার চেয়ে। আর দলীল অস্বীকারকারীদের এ কথা বলার অধিকার আছে যে, কুরআনে যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে, তা অস্বীকারের কারণে করা হয়েছে; স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله ثم اختلف.....الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) মুহাক্কিকীন ও জমহুর মুহাদ্দিসীনের মাযহাবের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তো উভয় পক্ষ একমত যে, ঈমানের হাকীকত হল تصديق বা সত্য বলে স্বীকার করা। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে, তা হল– মৌখিক স্বীকারোক্তি অর্থাৎ শাহাদাতাইনকে অন্তরের স্বীকারোক্তির সাথে মিলানো নাজাত বা পরকালীন মুক্তির জন্য প্রয়োজন কি না? নাকি শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট? এ সম্পর্কে মুহাক্কিকগণ বলেন, শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলীল হল– হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন- "যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান আছে সে স্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে"। তাহলে বুঝা গেল যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি নাজাতের জন্য আবশ্যক নয়। বরং তা হল দুনিয়াবি আহকাম জারি করার জন্য শর্ত।

পক্ষান্তরে জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিও পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য শর্ত। কাযী বায়যাবী (র.) এ দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেন, যে অন্তরে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুখে স্বীকার না করে সে হল معاند বা অবাধ্য। আর যে

ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ অলসতা করে সে হল جاهل مقصر বা অজ্ঞ পাপী। আর আল্লাহ তা'লা جاهل مقصر -এর তুলনায় معاند -এর তিরস্কার কঠোর ভাষায় করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'লা আহলে কিতাবের মূর্খদের সম্পর্কে বলেছেন– منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا يظنون এখানে মূর্খদেরকে لا يعلمون বলেই ক্ষান্ত করেছেন। কিন্তু তাদের আলেম সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন– فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم وويل لهم مما يكسبون তাহলে দেখুন ! এখানে তাদের ব্যপারে কত কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হুযুর (সা.)ও বলেছেন– ويل للجاهل مرة وللعالم الف مرة সুতরাং যদি শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হতো এবং মৌখিক স্বীকারোক্তিকে তার অংশ সাব্যস্ত করা না হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি معاندين -কেও নাজাতপ্রাপ্ত বলছেন। অথচ তারা হল অতি তিরস্কৃত। সুতরাং মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমানের অংশ মেনে নেওয়াই সমীচীন।

দলীলের উপর আপত্তির জবাব: قوله وللمانع ان يجعل....الخ : এখান থেকে বায়যাবী (র.) বলছেন যে, আমাদের দলীলের উপর কেউ আপত্তি করতে পারে যে, যে সমস্ত معاندين -এর কুরআনে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যারা সত্য মনে করা সত্ত্বেও অস্বীকার করে। তারা উদ্দেশ্য নয় যারা সত্য মনে করেও নীরবতা পালন করে। আর এখানে আলোচনা চলছে নীরবতা পালনকারীগণ সম্পর্কে; অস্বীকার কারীগণ সম্পর্কে নয়। সুতরাং অস্বীকার কারীর আয়াত দ্বারা দলীল দেয়া সঠিক হয় নি। এ দলীলের মধ্যে যেহেতু দুর্বলতা রয়েছে তাই لعل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

☆☆☆

وَالْغَيْبُ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَالشَّهَادَةِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَالْعَرَبُ تُسَمِّى الْمُطْمَئِنَّ مِنَ الْاَرْضِ الْخَمْصَةِ الَّتِيْ تَلِي الْكُلْيَةَ غَيْبًا أَوْ فَيْعَلٌ خُفِّفَ كَقِيْلَ وَالْمُرَادُ بِهِ: اَلْخَفِيُّ الَّذِىْ لَايُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَايَقْتَضِيْهِ بِدَاهَةُ الْعَقْلِ وَهُوَ قِسْمَانِ : قِسْمٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِ تَعَالٰى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ. وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحْوَالِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِهِ فِى الْاٰيَةِ وَهٰذَا اِذَا جَعَلْتَهُ صِلَةً لِلْاِيْمَانِ وَ اَوْقَعْتَهُ مَوْقِعَ الْمَفْعُوْلِ بِهِ وَاِنْ جَعَلْتَهُ حَالًا عَلٰى تَقْدِيْرِ مُلْتَبِسِيْنَ بِالْغَيْبِ كَانَ بِمَعْنَى الْغَيْبَةِ وَالْخِفَاءِ وَالْمَعْنٰى اِنَّهُمْ يُؤْمِنُوْنَ غَائِبِيْنَ عَنْكُمْ لَا كَالْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ . أَوْ عَنِ الْمُؤْمَنِ بِهِ لِمَا رَوٰى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ: وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ مَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْ اِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقِيْلَ: اَلْمُرَادُ

بِالْغَيْبِ اَلْقَلْبُ وَالْمَعْنٰى: يُؤْمِنُوْنَ بِقُلُوْبِهِمْ لَا كَمَنْ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَالْبَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ لِلتَّعْدِيَةِ وَعَلَى الثَّانِيْ لِلْمُصَاحَبَةِ وَعَلَى الثَّالِثِ لِلْاٰلَةِ

অনুবাদ:

আর غيب শব্দটি হল মাসদার। তাকে مبالغه স্বরূপ সত্তার গুণ বানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী- ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ -এর মধ্যে شهادة শব্দকে مبالغه স্বরূপ সত্তার গুণ বানানো হয়েছে। আহলে আরব নিচু ভূমি এবং প্লীহার আশেপাশের ছিদ্রকেও غيب বলে থাকে। অথবা غيب শব্দটি فيعل -এর ওযনে সিফাতের সীগাহ ছিল, অত:পর তাকে قيل -এর মত সহজ করা হয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন অদৃশ্য বস্তু যাকে না ইন্দ্রীয় শক্তি অনুভব করতে পারে, আর না আকলের স্বাভাবিকতা তাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। আর غيب দু'প্রকার। এক প্রকার হল যার উপর কোন দলীল গঠন করা হয়নি। আল্লাহ তা'লার বাণী- وعنده مفاتيح الغيب الخ আয়াত দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার হল যার উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর গুণাবলী এবং পরকাল ও তার অবস্থা। আর আয়াতে এটিই উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন তুমি باء -কে ايمان -এর صله মেনে তাকে مفعول به -এর স্থলাভিষিক্ত করবে। আর যদি يؤمنون -এর যমীর থেকে ملتبسين শব্দ উহ্য ধরে بالغيب -কে حال সাব্যস্ত কর, তখন غيب -এর অর্থ হবে غيبة ও خفاء আর আয়াতের অর্থ হবে- ঐ সমস্ত লোক যারা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ঈমান রখে; মুনাফিকের ন্যায় নয়, সে যখন মুমিনের সাথে মিলিত হয় তখন বলে امنا (আমরা ঈমান আনয়ন করলাম) আর যখন নির্জনতায় আপন সাথীদের মিলিত হয় তখন বলে انا معكم (আমরা তোমাদের সাথে আছি)। অথবা এর অর্থ এই যে, তারা নবী করীম (সা.) -এর বহু পরবর্তী যুগে তাঁর অনুপস্থিতে ঈমান রাখে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, কসম ঐ সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, নবী করীম (সা.) -এর অনুপস্থিতে ঈমান আনয়নকারীর চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারো নেই। অত:পর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তর। তখন অর্থ হবে "তারা অন্তর দ্বারা ঈমান আনয়ন করে"। তাদের মত নয় যারা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে বেড়ায় যা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং باء প্রথম অর্থ হিসেবে متعدى বানানোর জন্য, আর দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে مصاحبت -এর জন্য, আর তৃতীয় সূরতে اله বা (استعانت) -এর জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الغيب وكم قسما له وما هى؟

উত্তর ঃ غيب -এর অর্থ: غيب শব্দটি বাবে ضرب -এর মাসদার। এর অর্থ হল- ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি বিহর্ভূত গোপন বিষয়। অত্র আয়াতে غيب শব্দটি সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রায়েছে। ১. غيب শব্দটি মাসদার। আর মাসদার اعراض -এর অন্তর্গত বিধায় ذات -এর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তদুপরি এখানে مبالغه -এর জন্য مصدر -কে اسم فاعل অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. غيب শব্দটি فيعل -এর ওযনে صفت مشبه -এর সীগাহ। অর্থাৎ غيب শব্দটি মূলতঃ غَيِّبٌ

ছিল। সহজ করার জন্য যের বিশিষ্ট ياء -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ বিলুপ্ত করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লামা বায়যাবী (র.) قَيْلٌ শব্দকে উপস্থাপন করেছেন। قَيْلٌ হিময়ারী সম্রাটের উপাধী। যা মূলতঃ قَيِّلٌ ছিল। পরবর্তীতে যের বিশিষ্ট ياء -কে বিলুপ্ত করে قَيْلٌ বলা হয়।

غيب -এর প্রকারভেদ:

غيب দু'প্রকার–

১. قسم لا دليل عليه অর্থাৎ প্রথম প্রকার غيب হল যার ব্যাপারে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বিবেক অনভূতি দ্বারা এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আল্লাহর বাণী– وعنده مفاتح الغيب الخ -এর মধ্যে غيب দ্বারা এ প্রকার غيب -ই উদ্দেশ্য।

২. قسم نصب عليه دليل অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার غيب হল যা শরয়ী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা সুমহান সত্তা ও তাঁর গুণাবলী। পরকাল ও তার অবস্থাদি। অত্র আয়াতে এ প্রকার غيب -ই উদ্দেশ্য।

السوال: أكم تفسيرا للغيب ذكره المفسر العلام في قوله يؤمنون بالغيب

উত্তর ঃ غيب -এর ব্যাখ্যা:

আল্লামা বায়যাবী (র.) غيب -এর মোট চারটি ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

১. غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন অদৃশ্য বিষয় যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির বহির্ভূত এবং স্বতলব্ধ জ্ঞান যা গ্রহণ করে না। এটা আবার দু'প্রকার যা غيب -এর প্রকারভেদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল অনুপস্থিত। তখন আয়াতের অর্থ হবে "তারা তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে ঈমান আনয়ন করে"। অর্থাৎ তারা যেভাবে তোমাদের উপস্থিতেও ঈমান রাখে এমনিভাবে তোমাদের অনুপস্থিতিতেও ঈমান রাখে। মুনাফিকদের মত নয়; যারা সামনে আসলে বলে امنا , আর পশ্চাতে বলে انما نحن مستهزؤون । এমতাবস্থায় الغيب শব্দটি يؤمنون -এর ضمير থেকে حال হবে।

৩. অথবা এর অর্থ এই যে, তারা নবী করীম (সা.) -এর বহু পরবর্তী যুগে তাঁর অনুপস্থিতে ঈমান রাখে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, কসম ঐ সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, নবী করীম (সা.) -এর অনুপস্থিতে ঈমান আনয়নকারীর চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারো নেই। অত:পর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

৪. কারো কারো মতে, غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল কলব বা অন্তর। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হল– তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়ন করে। মুনাফিকদের মত নয়। যারা মুখে এমন কথা বলে, যা অন্তরে পোষণ করে না।

غيب -এর প্রথম তাফসীর অনুযায়ী بالغيب -এর باء হরফটি تعديه -এর জন্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাফসীর অনুযায়ী باء টি مصاحبه -এর জন্য এবং চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী استعانت -এর জন্য গণ্য হবে।

☆☆☆

﴿ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ﴾

{ এবং তারা নামায কায়েম করে }

এ বাক্যের মধ্যে দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হবে। (১) يقيمون الصلوة -এর ব্যাখ্যা (২) الصلوة শব্দের তাহকীক। নিম্নের ইবারতে প্রথম আলোচনাকে তুলে ধরেছেন।

اَىْ يُعَدِّلُوْنَ أَرْكَانَهَا مِنْ أَنْ يَقَعَ زَيْغٌ فِىْ أَفْعَالِهَا مِنْ أَقَامَ الْعَوْدَ اِذَا قَوَّمَهٗ أَوْ يُوَاظِبُوْنَ عَلَيْهَا مِنْ قَامَتِ السُّوْقُ اِذَا نَفَقَتْ وَأَقَمْتَهَا اِذَا جَعَلْتَهَا نَافِقَةً قَالَ:ـ أَقَامَتْ غَزَالَةُ سُوْقَ الضِّرَابِ ☆ لِأَهْلِ الْعِرَاقَيْنِ حَوْلًا قَمِيْطًا. فَاِنَّهٗ اِذَا حُوْفِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ كَالنَّافِقِ الَّذِىْ يُرْغَبُ فِيْهِ وَاِذَا ضِيْعَتْ كَانَتْ كَالْكَاسِدِ الْمَرْغُوْبِ عَنْهُ أَوْ يَتَشَمَّرُوْنَ لِأَدَائِهَا مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ وَلَا تَوَانٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَامَ بِالْأَمْرِ وَأَقَامَهٗ اِذَا جَدَّ فِيْهِ وَتَجَلَّدَ وَضِدُّهٗ قَعَدَ عَنِ الْأَمْرِ وَتَقَاعَدَ أَوْ يُؤَدُّوْنَهَا عَبَّرَ عَنْ أَدَائِهَا بِالْأَقَامَةِ لِاِشْتِمَالِهَا عَلَى الْقِيَامِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِالْقُنُوْتِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّهٗ أَشْهَرُ وَاِلَى الْحَقِيْقَةِ أَقْرَبُ وَأَفْيَدُ لِتَضَمُّنِهِ التَّنْبِيْهَ عَلٰى أَنَّ الْحَقِيْقَ بِالْحَمْدِ مَنْ رَاعٰى حُدُوْدَهَا الظَّاهِرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَحُقُوْقَهَا الْبَاطِنَةَ كَالْخُشُوْعِ وَالْأِقْبَالِ بِقَلْبِه عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَّا الْمُصَلُّوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ وَلِذَالِكَ ذَكَرَ فِىْ سِيَاقِ الْمَدْحِ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَفِىْ مَعْرِضِ الذَّمِّ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

অনুবাদ:

অর্থাৎ তারা নামাযের রুকনসমূহকে যথাযথভাবে পালন করে এবং নামাযকে এমন জিনিস থেকে সংরক্ষিত রাখে যাতে তার কোন আরকানের মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি হতে না পারে। এ অর্থটি নেয়া হয়েছে اقام العود থেকে। এটা বলা হয় যখন কোন কাষ্ঠখন্ডকে সোজা করা হয়। অথবা আয়াতের অর্থ হল, "তারা নামাযের উপর অবিচল থাকে"। এ অর্থটি নেয়া হয়েছে আরবদের উক্তি قامت السوق و اقمت السوق থেকে। এটা তারা তখন বলে যখন বাজার চালু হয়ে যায় এবং তুমি তাকে চালু কর। যেমন কবির বাণী– اقامت غزالة سوق الضراب ☆ لاهل العراقين حولا قميطا (কবিতার তরজমা বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। এর সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য হল এভাবে যে, যখন নামায যথারীতি আদায় করবে তাখন তা এমন চালু জিনিসের ন্যায় হবে যার প্রতি মানুরষের আগ্রহ থাকে। আর যদি অলসতাবশতঃ নামায ত্যাগ করা হয়, তবে তা হবে এমন জিনিসের ন্যায় যা মানুষ অনাগ্রহবশতঃ ফেলে রাখে। অথবা আয়াতের অর্থ হল– তারা নামায আদায়ের জন্য

নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ অর্থটি চয়ন করা হয়েছে আরবদের উক্তি– قام بالامر واقامه থেকে। এটা তখন বলা হয় যখন কোন কাজকে পরিশ্রমের সাথে আদায় করা হয়। আর তার বিপরীত শব্দ হল قعد عن الامر و تقاعد অর্থাৎ অবহেলাবশতঃ কোন কাজ হতে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। অথবা আয়াতের অর্থ হল– "তারা নামায আদায় করে"। এখানে নামাযের মধ্যে যেহেতু قيام তথা দন্ডায়মান হওয়া বিদ্যমান রয়েছে তাই পূর্ণ নামাযকেই قيام বা اقامت বলে দেয়া হয়েছে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে নামাযকে রুকু, কুনূত, সেজদা ও তাসবীহ ইত্যাদি বলা হয়েছে। কারণ, নামাযের মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট। কেননা, সেটাই অধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রকত অর্থের অধিক কাছাকাছি, আর দ্বিতীয় অর্থের তুলনায় সার্বিক উপযোগী। কারণ হল– এ অর্থের মধ্যে এ কথার দিকে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রশংসার যোগ্য হল ঐ ব্যক্তি যে নামাযের বাহ্যিক সীমানা অর্থাৎ ফরয, সুন্নাত এবং বাতেনী হকসমূহ যেমন খুশু', খুযু' ইত্যাদি এবং মনোযোগ আল্লাহ তা'লার দিকে ফিরিয়ে রাখার ব্যাপারে যত্নবান থাকে। তারা প্রশংসার যোগ্য নয় যারা স্বীয় নামাযে অলসতা প্রদর্শন করে। এ কারণেই প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা বলেছেন– والمقيمين الصلوة আর নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে বলেছেন– فويل للمصلين ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم وجها ذكره المصنف فى تفسير اقامة الصلوة وما هى وايها اظهر؟

উত্তর ঃ اقامت صلوة -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লামা বায়যাবী (র.) اقامت صلوة -এর চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা গেল–

১. তারা تعديل اركان -এর সাথে নামায আদায় করে। تعديل اركان হল নামাযের কোন রুকন বা কাজ-কর্মে বক্রতা বা ত্রুটি না থাকা। অর্থাৎ নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। এমতাবস্থায় يقيمون শব্দটি اقام العود থেকে নির্গত হবে। اقام العود অর্থ হল হেলে পড়া বা বক্র বস্তুকে সোজা করা। নামাযের تعديل اركان -কে اقامت اجسام (দেহ সমূহকে সোজা করা) -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অত:পর مشبه به -এর শব্দ اقامت দ্বারা নামাযের تعديل اركان উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এরপর তার থেকে يقيمون ফে'ল নির্গত করা হয়েছে। অর্থাৎ استعاره تبعيه হিসেবে يقيمون দ্বারা নামাযের تعديل اركان উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. তারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় يقيمون الصلوة -কে قامت السوق ও اقمت السوق (যার অর্থ বাজার চালু হওয়া বা করা) থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

৩. তারা অবহেলা ও অবসাদ পরিহার করে উদ্যম ও সোৎসাহসে নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় يقيمون الصلوة অর্থ قام بالامر واقامه যার অর্থ যথাযথ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সাথে কোন কার্য সম্পাদন করা। علاقت لزوم বা علاقت سببيه -এর ভিত্তিতে অত্র আয়াতে اقامت শব্দটি উদ্যম ও যথাসাধ্য চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. তারা নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে قيام থাকার কারণে নামাযকে قيام দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে নামাযকে কুনূত বলা হয়েছে– كانت من القانتين اى المصلين আবার কখনো কখনো সালাতকে রুকূ বলা হয়েছে। যেমন– واركعوا مع الراكعين اى صلوا مع المصلين আবার

কখনো নামাযকে সেজদা বলা হয়েছে। যেমন– وكن من الساجدين আবার কখনো তাসবীহ বলা হয়েছে। যেমন– انه كان من المسبحين اى المصلين ।

اقامت صلوة -এর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) اقامت صلوة -এর চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। অত:পর এর মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাকে সর্বাধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তিনটি কারণ উপস্থাপন করেছেন।

১. এব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী মহামনীষীদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। শ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রথম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে اقامت -এর حقيقى অর্থের সাথে مجازى অর্থের সুস্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা, প্রথম ব্যাখ্যা নামাযের تعديل اركان -এর মধ্যে تسويه বা সোজা করা অর্থ রয়েছে, তেমনিভাবে তার حقيقى অর্থাৎ اقامت اجسام -এর মধ্যে تسويه -এর অর্থ রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরাপর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে اقامت -এর حقيقى ও مجازى অর্থের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩. এ ব্যাখ্যা অধিক ফায়দাদায়ক। কেননা, এ ব্যাখ্যার মধ্যে এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নামাযের বাহ্যিক হুকুক তথা ফরয, সুন্নাত ইত্যাদি এবং বাতেনী হুকুক তথা খুশু-খুযু রাখা ইত্যাদি রক্ষাকারী মুসল্লী-ই কেবলমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত। কেননা, تعديل اركان -এর অর্থই ছিল নামাযের জাহিরী ও বাতেনী বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করা। এ কারণেই যেখানে মুসল্লীদের প্রশংসা করা হয়েছে সেখানে يقيمون الصلوة তথা اقامة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেখানে নিন্দাবাদ বা ধমক দেয়া হয়েছে সেখানে ويل للمصلين الخ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাফসীরের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা হয় নি।

السوال: قول الشاعر: اقامت غزالة سوق الضراب ☆ لاهل العراقين حولا قميطا
ترجم الشعر ثم بين علام استشهد المصنف العلام بهذا الشعر؟

উত্তর ঃ কবিতার অর্থ: গাযালা কূফা ও বসরাবাসীদের জন্য পূর্ণ এক এক বৎসর যুদ্ধের বাজার চালু রেখেছে।

(**ফায়দা ঃ** গাযালা شبيب خارجى -এর এক সাহসী স্ত্রী। হাজ্জাজ তার স্বামীকে হত্যা করেছিল। তাই গাযালা তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খারেজি সম্প্রদায়ের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজ্জাজের বিরোদ্ধে বেরিয়ে পড়ল এবং পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত হাজ্জাজের সাথে যুদ্ধ করে। ফলে হাজ্জাজ তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে টিকিয়ে থাকতে পারে নি। অবশেষে হাজ্জাজ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করল। যুদ্ধ শেষে গাযালা হাজ্জাজের অবমাননার উদ্দেশ্যে তার মসজিদে সূরা বাকারা দ্বারা ফজরের নামায আদায় করল)।

محل أستشهاد : এ কবিতার মধ্যে اقامت শব্দটি হল محل استشهاد যা চালু রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

☆☆☆

وَالصَّلٰوةُ فَعْلَةٌ مِنْ صَلّٰى إِذَا دَعَا كَالزَّكٰوةِ مِنْ زَكّٰى كُتِبَتَا بِالْوَاوِ عَلٰى لَفْظِ الْمُفَخَّمِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْفِعْلُ الْمَخْصُوْصُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدُّعَاءِ وَقِيْلَ أَصْلُ صَلّٰى حَرَّكَ الصَّلْوَيْنِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَفْعَلُهٗ فِيْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ وَاشْتِهَارُ هٰذَا اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الثَّانِيْ مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهٖ فِي الْأَوَّلِ لَايَقْدَحُ فِيْ نَقْلِهٖ عَنْهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّاعِيْ مُصَلِّيًا تَشْبِيْهًا لَهٗ فِيْ تَخَشُّعِهٖ بِالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ

অনুবাদ:

صلوة শব্দের বিশ্লেষণ

صلوة শব্দটি صلى থেকে فعلة -এর ওযনে। অর্থ হল দোআ। যেমন زكوة শব্দ এসেছে زكى থেকে। صلـوة ও زكـوة শব্দদ্বয়কে واو -এর সাথে লেখা হয়ে থাকে زاء ও لام -এর ফাতহাকে ضمه -এর আভাস দিয়ে পড়ার জন্য। আর নির্দিষ্ট কর্ম তথা নামাযকে صلوة (দোআ) বলা হয় এ হিসেবে যে, নামাযের মধ্যে দোআ রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন صـلـى -এর মূল অর্থ হল দুই নিতম্ভকে আন্দোলিত করা। (এ অর্থ থেকে নামাযকে صلوة বলা হয়) কেননা, নামাযী ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাহ এর মধ্যে নিতম্ভ আন্দোলিত করে। আর শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং প্রথম অর্থে প্রসিদ্ধ না হওয়াটা প্রথম অর্থটির منقول عنه হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। আর داعى (প্রার্থনাকারী) -কে মুসাল্লি বলার কারণ হল, তাকে راكع ও ساجد -এর সাথে তুলনা করার জন্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله والصلوة فعلة....الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় আলোচনা অর্থাৎ صلوة **শব্দের বিশ্লেষণ শুরু** করছেন। صـلـوة **শব্দ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথম হল জমহুরের অভিমত।** আর **দ্বিতীয় হল** আল্লামা যামখশরী (র.) -এর অভিমত।

জমহুরের অভিমত ঃ তাদের মতে, صـلـوة শব্দটি فـعـلـة -এর ওযনে এসেছে। মূলতঃ শব্দটি ছিল صَلْوَةٌ । واو متحرك তার পূর্বে حرف صحيح ساكن হওয়ার কারণে واو -এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে পূর্বের অক্ষরকে দেয়া হয়েছে। অত:পর واو -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন صلوة হয়ে গেছে। যেমন زكوة -এর মধ্যে এরূপ তা'লীল হয়েছে। صلوة ও زكوة শব্দদ্বয়কে واو -এর সাথে লেখা হয়েছে كاف ও لام -এর যবরকে পেশের দিকে ধাবিত করে পড়ার জন্য।

صلوة -এর আসল অর্থ হল দোআ। অত:পর তাকে فعل مخصوص তথা নামায অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে। কেননা, নামাযের মধ্যেও দোআ রয়েছে।

আল্লামা যামখশরী (র.) -এর অভিমত ঃ তাঁর মতে, صلوة শব্দটি صلا থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হল নিতম্বদ্বয়কে নড়ানো। অত:পর শব্দটি নামাযের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। কেননা, নামাযী রুকূ ও সিজদার মধ্যে তা করে থাকে।

قوله واشتهار هذا اللفظ فى المعنى الثانى....الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে,

যদি এ দ্বিতীয় মতানুযায়ী صلوة -এর প্রকৃত অর্থ নিতম্বদ্বয় হেলানো নেওয়া হয়, যা হল একটি অপ্রসিদ্ধ অর্থ। আর صلوة নামায অর্থে একটি অতি প্রসিদ্ধ অর্থ। তাই অপ্রসিদ্ধ অর্থ হতে প্রসিদ্ধ অর্থ কিভাবে নির্গত হয়?

উত্তর: صلوة শব্দটি নামায অর্থে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং নিতম্বদ্বয় হেলানো অর্থে অপ্রসিদ্ধ হওয়াতে নামায অর্থের কোন দূষণীয়তা সৃষ্টি হবে না। কেননা, অপ্রসিদ্ধ অর্থ হতে প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া কোন দূষণীয় বিষয় নয়। মূলত: এটা নামায অর্থের জন্য এত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তার প্রকৃত অর্থকে একেবারেই বর্জন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা বায়যাবী (র.) যামখশরী (র.) -এর অভিমতকে قيل দ্বারা ব্যক্ত করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ অভিমতটি দুর্বল।

☆☆☆

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾

{আমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে}

মুসান্নিফ (র.) এ আয়াত প্রসঙ্গে চারটি আলোচনা পেশ করেছেন। (১) رزق শব্দের তাহকীক (২) হারাম বস্তু রিযিক কিনা (৩) انفاق শব্দের তাহকীক ও তাফসীর (৪) مفعول -কে ينفقون -এর উপর মুকাদ্দাম করা এবং من تبعيضيه আনার কারণ।

وَالرِّزْقُ فِي اللُّغَةِ اَلْحَظُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ. وَالْعُرْفُ خَصَّصَهُ بِتَخْصِيْصِ الشَّيْءِ بِالْحَيَوَانِ وَتَمْكِيْنِهِ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ

অনুবাদ:

প্রথম আলোচনা رزق শব্দের বিশ্লেষণ

رزق শব্দের শাব্দিক অর্থ হল হিস্যা বা অংশ। মহান আল্লাহ তা'লা বলেন– وتجعلون رزقكم الخ । আর পরিভাষা রিযিক কোন এক প্রাণীর সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তাকে তা হতে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الرزق لغة وعرفا؟

উত্তর ঃ رزق শব্দের আভিধানিক অর্থ:

رزق শব্দটি راء বর্ণে যবর বিশিষ্ট হলে বাবে نصر ينصر -এর মাসদার। যার অর্থ হল প্রাণীকুলের উপকারী ও কল্যাণকর বস্তুর সুব্যবস্থা করা, প্রাণী ও নিষ্প্রাণ নির্বিশেষে সৃষ্টিকূলের জন্য কল্যাণকর বস্তু সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা।

رزق শব্দটি راء বর্ণে যের বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে– অংশ, জীবিকা, খাদ্য, সৈনিকের মাসিক ভাতা।

رزق -এর পারিভাষিক অর্থ:

تخصيص الشئ بالحيوان تمكينه من الانتفاع به

অর্থাৎ কোন বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রাণীর অধীনস্ত করে দেয়া।

وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا اِسْتَحَالُوْا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ قَالُوْا: اَلْحَرَامُ لَيْسَ بِرِزْقٍ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ تَعَالٰى أَسْنَدَ الرِّزْقَ هٰهُنَا اِلٰى نَفْسِهِ اِيْذَانًا بِأَنَّهُمْ يُنْفِقُوْنَ الْحَلَالَ الطَّلْقَ فَاِنَّ اِنْفَاقَ الْحَرَامِ لَايُوْجِبُ الْمَدْحَ وَذَمَّ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى تَحْرِيْمِ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا . وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْاِسْنَادَ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَى الْاِنْفَاقِ وَالذَّمَّ لِتَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَاخْتِصَاصُ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ لِلْقَرِيْنَةِ وَتَمَسَّكُوْا بِشُمُوْلِ الرِّزْقِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ قُرَّةَ: لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُغْتَذِىْ بِهِ طُوْلَ عُمْرِهِ مَرْزُوْقًا وَلَيْسَ كَذَالِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অনুবাদ:

দ্বিতীয় আলোচনা: হারাম বস্তু রিযিক কিনা?

মু'তাযিলারা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করল যে, তিনি হারামের উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন। কেননা, তিনি তো হারাম হতে উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন এবং তা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা বলে উঠল যে, হারাম রিযিক নয়। তুমি কি দেখ না? আল্লাহ তা'লা উক্ত আয়াতে রিযিকের নিসবত নিজের দিকে করেছেন এ কথা বলার জন্য যে, তারা খাঁটি হালাল মাল ব্যয় করে। কেননা, হারাম জিনিস ব্যয় করা প্রশংসার বিষয় নয়। পক্ষান্তরে মুশরিকদের এ কারণে নিন্দাবাদ করেছেন যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন– قل ارأيتم ما انزل الله الخ ।

আমাদের আসহাবগণ (তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) আল্লাহ তা'লার দিকে রিযিকের নিসবতকে সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহর রাহে খরচ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর মুশরিকদের যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তা এ জন্য যে, তারা হালাল জিনিসকে হারাম বানিয়েছিল। আর আয়াতে ما رزقناهم টি হালালের সাথে খাস হওয়া قرينه -এর কারণে হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিযিককে عام প্রমাণিত করার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে হুযুর (সা.) -এর হাদীসকে পেশ করেছেন, যা হযরত আমর ইবনে কুররা (রা.) -এর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি আমর ইবনে কুররাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'লা তোমাকে পবিত্র হালাল রিযিক দান করেছিলেন, কিন্তু তুমি তার পরিবর্তে এমন রিযিককে গ্রহণ করেছ যা তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া যদি হারাম জিনিস আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি সারাজীবন হারাম রিযিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তাকে তো রিযিকপ্রাপ্ত বলা চলে না, অথচ সেরকম নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন– وما من دابة الخ ।

السوال: الحرام رزق ام لا وما قول اهل الحق فيه؟ بين بالدلائل

উত্তর ঃ হারাম বস্তু রিযিক হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ ঃ

হারাম বস্তু রিযিক কিনা এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও মু'তাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. মু'তাযিলাদের অভিমত: মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, হারাম বস্তু রিযিক নয়। তাদের যুক্তি হল–

১. সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ তা'লা যাবতীয় দোষণীয় কাজ-কর্ম থেকে পবিত্র। হারাম ভক্ষণ করা মন্দ কাজ। হারাম বস্তু বা কাজের সুযোগদান করা একটি মন্দ ও গর্হিত কাজ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে পূতঃপবিত্র। সুতরাং তার দ্বারা হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সুযোগ দেয়া অসম্ভব। অতএব হারাম বস্তু রিযিক হতে পারে না।

২. আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অথচ হারাম মাল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতএব হারাম রিযিক হতে পারে না।

৩. অত্র আয়াত এবং কুরআনুল কারীমের বহুসংখ্যক আয়াতে রিযিককে আল্লাহ্র দিকে নিসবত করা হয়েছে। অথচ খারাপ জিনিস আল্লাহ্র প্রতি নিসবত করা নিষেধ। অতএব প্রমাণিত হয় যে, হারাম বস্তু রিযিক হতে পারে না।

৪. রিযিককে হারাম বলার কারণে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন– قل ارأيتم ما نزل الله من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, হারাম বস্তুও রিযিক। তাদের দলীল হল–

১. এ পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা রিযিক দিচ্ছেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন– وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها অতএব যদি হারাম বস্তু রিযিক না হয়, তাহলে যারা আমরণ হারাম বস্তু ভক্ষণ করে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করে না। এ ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতটি অর্থহীন হয়ে যায়।

২. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বর্ণিত আমর ইবনে কুররার ঘটনা। যাতে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে পূতঃপবিত্র বস্তু রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অথচ তুমি আল্লাহ্র রিযিকের মধ্যে যা হারাম তা গ্রহণ করেছ। (ইবনে মাজা)

এ হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে রিযিকের উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, হারাম বস্তুও রিযিক। তা না হলে রাসূল (সা.) রিযিকের উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করতেন না।

মু'তাযিলাদের উপস্থাপিত যুক্তি খণ্ডন ঃ

১ম যুক্তি খণ্ডন: হারাম ভক্ষণ করার সামর্থ্য দান করা দুষণীয় নয়। যেমনিভাবে অন্যান্য সকল পাপাচারিতা থেকে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন। আবার পাপ কাজ সংঘটনের সামর্থ্যও দিয়েছেন। কেননা, স্বীকৃত নিয়ম হল خلق قبيح قبيح نيست অর্থাৎ মন্দ জিনিস সৃষ্টি করা মন্দ ও দোষণীয় নয়।

وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا اِسْتَحَالُوْا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ قَالُوْا: اَلْحَرَامُ لَيْسَ بِرِزْقٍ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ تَعَالٰى أَسْنَدَ الرِّزْقَ هٰهُنَا إِلٰى نَفْسِهِ إِيْذَانًا بِأَنَّهُمْ يُنْفِقُوْنَ الْحَلَالَ الطَّلْقَ فَإِنَّ إِنْفَاقَ الْحَرَامِ لَا يُوْجِبُ الْمَدْحَ وَذَمَّ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى تَحْرِيْمِ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا . وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالذَّمَّ لِتَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَاخْتِصَاصُ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ لِلْقَرِيْنَةِ وَتَمَسَّكُوْا بِشُمُوْلِ الرِّزْقِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ قُرَّةَ: لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُغْتَذِىْ بِهِ طُوْلَ عُمْرِهِ مَرْزُوْقًا وَلَيْسَ كَذَالِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অনুবাদ:

দ্বিতীয় আলোচনা: হারাম বস্তু রিযিক কিনা?

মু'তাযিলারা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করল যে, তিনি হারামের উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন। কেননা, তিনি তো হারাম হতে উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন এবং তা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা বলে উঠল যে, হারাম রিযিক নয়। তুমি কি দেখ না? আল্লাহ তা'লা উক্ত আয়াতে রিযিকের নিসবত নিজের দিকে করেছেন এ কথা বলার জন্য যে, তারা খাঁটি হালাল মাল ব্যয় করে। কেননা, হারাম জিনিস ব্যয় করা প্রশংসার বিষয় নয়। পক্ষান্তরে মুশরিকদের এ কারণে নিন্দাবাদ করেছেন যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন– قل ارأيتم ما انزل الله الخ ।

আমাদের আসহাবগণ (তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) আল্লাহ তা'লার দিকে রিযিকের নিসবতকে সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহর রাহে খরচ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর মুশরিকদের যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তা এ জন্য যে, তারা হালাল জিনিসকে হারাম বানিয়েছিল। আর আয়াতে ما رزقناهم টি হালালের সাথে খাস হওয়া قرينه -এর কারণে হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিযিককে عام প্রমাণিত করার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে হুযুর (সা.) -এর হাদীসকে পেশ করেছেন, যা হযরত আমর ইবনে কুররা (রা.) -এর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি আমর ইবনে কুররাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'লা তোমাকে পবিত্র হালাল রিযিক দান করেছিলেন, কিন্তু তুমি তার পরিবর্তে এমন রিযিককে গ্রহণ করেছ যা তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া যদি হারাম জিনিস আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি সারাজীবন হারাম রিযিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তাকে তো রিযিকপ্রাপ্ত বলা চলে না, অথচ সেরকম নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন– وما من دابة الخ ।

السوال: ما معنى الانفاق لغة وعرفا؟ وما المراد بانفاق ما رزقهم الله؟

উত্তর ঃ انفاق -এর আভিধানিক অর্থ ঃ انفاق শব্দটি বাবে افعال -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল– খরচ করা, ব্যয় করা।

انفاق -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় انفاق -এর সংজ্ঞায় আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন–

الانفاق صرف المال الى سبيل الخير من الفرض والنفل অর্থাৎ ভাল কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করা চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক।

আয়াতের মধ্যে انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আয়াতের মধ্যে انفاق দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১. সম্পদকে যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা চাই তা ফরয হিসেবে হোক বা নফল হিসেবে হোক।

২. انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য যাকাত আদায় করা। কেননা, مما رزقناهم ينفقون -কে يقيمون الصلوة -এর পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরআনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালাতের পর যাকাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই যাকাতকে নামাযের আপন বোন আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সুতরাং যখন مما رزقناهم ينفقون টি সালাতের পরপরই বর্ণিত হয়েছে তখন এর দ্বারা যাকাতই উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত হবে।

৩. انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সম্পদ ব্যয় করা নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'লা মানুষদের প্রতি যতই معونة দান করেছেন তার মধ্য হতে ব্যয় করা উদ্দেশ্য। معونة হল এমন জিনিস যার দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা পরকালে হোক। সুতরাং এটা জাহেরী নেয়ামত যেমন– ধনসম্পদ ইত্যাদি এবং বাতেনী নেয়ামত যেমন– উত্তম চরিত্র, ইলম ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই ব্যাপক। অতএব আয়াতের অর্থ হবে– আমি মুত্তাকীদের যা কিছুই দিয়েছি, চাই তা দৈহিক জিনিস হোক বা আধ্যাত্মিক জিনিস, সে ঐ সমস্ত জিনিস হতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে। এ কারণেই অনেক সূফি-সাধকগণ مما رزقنا هم -এর অর্থ করে থাকেন مما خصصناهم من انوار المعرفة يفيضون অর্থাৎ আমি মুত্তাক্বীদেরকে যা কিছুই বিশেষভাবে মা'রেফাতের ইলম দিয়েছি, তারা তার আলো ছড়িয়ে থাকেন।

☆☆☆

২য় যুক্তি খন্ডন: রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রশংসা করা, রিযিকের মর্মের মধ্যে হারাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে رزق থেকে হারাম বাদ পড়েছে প্রশংসার স্থলে হওয়ার কারণে। অন্যথায় رزق মূল শব্দের মর্মে হারামও অন্তর্গত।

৩য় যুক্তি খন্ডন: ফরয, ওয়াজিব, মুবাহ, হারাম, হালাল, মুস্তাহাব ইত্যাদি হল বান্দার কর্মের সিফাত। কোন কাজ হারাম ও قبيح তথা মন্দ ও দোষণীয় হয় বান্দার দৃষ্টিকোণে; আল্লাহর কাছে সবকিছুই ভাল; কোন কিছু মন্দ ও দোষণীয় নয়। অতএব হারামের নিসবত আল্লাহর দিকে করার দ্বারা قبيح বা মন্দ জিনিসের নিসবত আল্লাহর দিকে করা আবশ্যক হয় না।

৪র্থ যুক্তি খন্ডন: মুশরিকরা হারামকে রিযিক আখ্যায়িত করেছে বলে আল্লাহ তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন নি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিযিক হারাম করা হয়নি তারা সেগুলোকে হারাম করেছিল। অতএব হালাল রিযিককে হারাম রিযিক আখ্যা দিয়ে তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছিল বিধায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

মোটকথা, হালাল-হারাম সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আর মন্দ বিষয় সৃষ্টি করলেই আল্লাহর মন্দ কাজ করা সাব্যস্ত হয় না। বরং আল্লাহ তা'লা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই কেবল মন্দ সৃষ্টি করেছেন।

☆☆☆

وَاَنْفَقَ الشَّيْءَ وَأَنْفَذَهُ أَخَوَانِ وَلَوْ اِسْتَقْرَيْتَ الْأَلْفَاظَ وَجَدْتَ كُلَّ مَا يُوَافِقُهُ فِي الْفَاءِ وَالْعَيْنِ دَالًّا عَلٰى مَعْنَى الذِّهَابِ وَالْخُرُوْجِ وَالظَّاهِرُ مِنْ اِنْفَاقِ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ صَرْفُ الْمَالِ فِيْ سَبِيْلِ الْخَيْرِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالزَّكٰوةِ ذَكَرَ أَفْضَلَ أَنْوَاعِهِ وَالْأَصْلَ فِيْهِ أَوْ خَصَّصَهُ بِهَا لِاِقْتِرَانِهِ بِمَا هُوَ شَقِيْقَتُهَا

অনুবাদ:____

তৃতীয় আলোচনা: انفاق শব্দের তাহকীক ও তাফসীর

আর انفق ও انفذ শব্দদ্বয় ভ্রাতৃতুল্য। আর যদি তোমরা আরবী ভাষার মধ্যে অনুসন্ধান করতে তাহলে দেখতে পেতে যে, যে শব্দই انفق -এর فاء ও عين কালেমায় শরিক হয় তার অর্থের মধ্যে অবশ্যই ذهاب (গমন করা) এবং خروج (বের হওয়া) -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। বাহ্যতঃ انفاق ما رزقهم الله -এর মধ্যে সম্পদ উত্তম কাজে ব্যয় করা উদ্দেশ্য, চাই তা ফরয হিসেবে হোক বা নফল হিসেবে হোক। আর যিনি ما رزقنا -এর তাফসীর করেছেন زكوة দ্বারা তিনি কল্যাণমূলক কার্যাদির সর্বোত্তম জিনিসটিকে বর্ণনা করে দিয়েছেন। (অথবা তার দ্বারা উদ্দেশ্য) আয়াতকে যাকাত-এর জন্যই খাস করা। কেননা, আয়াত তার সাথে মিলিত হয়ে এসেছে। যার মধ্যে যাকাতের আপন সহোদরা নামাজের আলোচনা রয়েছে।

যাকাতের মধ্যে সামান্য পরিমাণ সম্পদই ব্যয়িত হয়ে থাকে। আর যদি সম্পদ ব্যয় করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সূরতে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়া এবং অপচয় হতে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং এখানে যেহেতু تخصيص ও حصر উদ্দেশ্য আর تخصيص ও حصر হাসিল হয় معمول -কে আগে আনার দ্বারা, কাজেই معمول -কে আগে আনা হয়েছে।

২. আয়াতের ছন্দ মিল রাখার লক্ষ্যে معمول -কে আগে আনা হয়েছে। কেননা, সামনে বলা হয়েছে مفلحون / يوقنون যার শেষে আছে واو ساكن তার পরে نون । সুতরাং যদি معمول -কে আগে আনা না হয়, তাহলে এই ছন্দমিল রক্ষা করা যাবে না।

من تبعيضيه আনার কারণ:

قوله وادخال من التبعيضيه الخ : এখান থেকে ومما رزقناهم -এর মধ্যে من تبعيضيه উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করছেন। দুই কারণে من تبعيضيه আনা হয়েছে। যথা–

১. যদি انفاق তথা ব্যয় করা যাকাত আদায় করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে من হরফটি বাস্তবতা বর্ণনা করার জন্য এসেছে। অর্থ হল– বাস্তবতা হল এই যে, সামান্য পরিমাণ সম্পদই ব্যয় করা হয়।

২. আর যদি সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ সূরতে من হরফটি পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ অপচয় হতে বিরত রাখার জন্য এসেছে।

☆☆☆

﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

{আর যারা ঈমান আনয়ন করে তার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি}

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) তিনটি আলোচনা পেশ করেছেন। প্রথম আলোচনা: الذين يؤمنون بما انزل -এর مصداق কারা? এবং এ আয়াতটি কার উপর عطف হয়েছে? দ্বিতীয় আলোচনা: انزال শব্দের অর্থ, আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার পদ্ধতি এবং ما انزل দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তৃতীয় আলোচনা: কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনার বিধান কি?

هُمْ مُؤْمِنُوْا اَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَضْرَابِه مَعْطُوْفُوْنَ عَلٰى : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ. دَاخِلُوْنَ مَعَهُمْ فِيْ جُمْلَةِ الْمُتَّقِيْنَ دُخُوْلَ أَخَصَّيْنِ تَحْتَ أَعَمَّ إِذِ الْمُرَادُ بِأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَنِ الشِّرْكِ وَالْاِنْكَارِ وَهٰؤُلَاءِ مُقَابِلُوْهُمْ فَكَانَتِ الْاٰيَتَانِ تَفْصِيْلًا لِلْمُتَّقِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ أَوْ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ فَكَأَنَّهٗ قَالَ: هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ عَنِ الشِّرْكِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِمُ الْاَوَّلُوْنَ بِأَعْيَانِهِمْ وَوُسِّطَ الْعَاطِفُ كَمَا وُسِّطَ فِيْ قَوْلِهٖ

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ☆ وَلَيْثِ الْكَتِيْبَةِ فِي الْمُزْدَحِمِ
وَقَوْلِهِ يَا لَهْفَ زَيَّابَةَ لِلْحَارِثِ ☆ اَلصَّابِحِ فَالْغَانِمِ فَالْآئِبِ .
عَلَى مَعْنَى: إِنَّهُمُ الْجَامِعُوْنَ بَيْنَ الْإِيْمَانِ بِمَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ جُمْلَةً وَالْاتِيَانِ بِمَا يُصَدِّقُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَبَيْنَ الْإِيْمَانِ بِمَا لَا طَرِيْقَ إِلَيْهِ غَيْرَ السَّمْعِ

অনুবাদ:

প্রথম আলোচনা: الذين يؤمنون بما انزل -এর مصداق কারা?
এবং এ আয়াতটি কার উপর عطف হয়েছে?

এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল আহলে কিতাবের মুমিনগণ। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সমপর্যায়ের অন্যান্য সাহাবাগণ। (এ আয়াতে তাদেরকে (الذين يؤمنون بالغيب -এর উপর عطف করা হয়েছে। তারা (আহলে কিতাবরা) তাদের (অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়নকারীদের) সাথে المتقين -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন এক عام -এর আওতায় দু'টি خاص অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা, তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা শিরক ও অস্বীকৃতি ছেড়ে ঈমান এনেছে। আর এদের (অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের) দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের বিপরীতরা (অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনগণ)। সুতরাং এ দু'টি আয়াত متقين -এর বিশ্লেষণ হবে। আর এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত। অথবা আয়াতের عطف হবে المتقين -এর উপর। তখন অর্থ হবে– আল্লাহ তা'লা বলতে চাচ্ছেন যে, এ কিতাব ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হেদায়েত হবে যারা শিরক হতে বেঁচে থাকবে এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হেদায়েত হবে যারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পুনরায় তারা হুযুর (সা.) -এর অনুসারী হয়ে গেছে।

আর এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য নেয়া হবে যারা الذين يؤمنون بالغيب -এর মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল। এ সূরতে حرف عطف আনা হয়েছে যেমনটি ব্যবহার করা হয়েছে কবির কবিতার মধ্যে। কবিতা হল– ....يا لهف । (উভয়টির উদ্দেশ্য এক হবে) এ অর্থের ভিত্তিতে যে, তারা বিবেক যার অনুধাবন করতে পারে সংক্ষিপ্তভাবে তার প্রতি ঈমান আনয়ন ও এ ঈমানের সত্যায়নকারী শারীরিক ইবাদত আর্থিক ইবাদতের মাঝে ও শ্রবণ ব্যতীত যা বুঝার কোন পদ্ধতি নেই এমন জিনিসের প্রতি ঈমান আনয়নের মাঝে সমন্বয়কারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك
السوال: ما المراد بهذا الموصول وكم احتمالا فيه؟ ثم بين علام عطف هذه الاية؟

উত্তর ঃ অত্র আয়াতে الذين يؤمنون দ্বারা উদ্দেশ্য কারা সে ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। নিম্নে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও والذين يؤمنون الخ -এর معطوف عليه -এর আলোচনা করা হল।

১. الذين يؤمنون الخ দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছেন তারা উদ্দেশ্য।

যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) আর الذين يؤمنون الخ আয়াতটি الذين يؤمنون بالغيب -এর উপর عطف হয়েছে। আর الذين يؤمنون بالغيب দ্বারা মুশরিকদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতএব উভয় শ্রেণীর মুসলমান পূর্বের আয়াতের متقين -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২. الذين يؤمنون الخ দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীরা উদ্দেশ্য। এ আয়াতটি المتقين -এর উপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম موصول তথা الذين يؤمنون بالغيب আয়াতটি المتقين -এর সিফাত হয়েছে। দ্বিতীয় موصول তথা والذين يؤمنون আয়াতটি المتقين -এর উপর عطف হয়েছে। অর্থ হবে– একিতাবটি মুত্তাকী তথা শিরক পরিহারকারী এবং আহলে কিতাবদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ।

৩. والذين প্রথম الذين -এর উপর عطف হয়েছে। আর উভয় موصول দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নয়।

৪. والذين পূর্বোক্ত الذين موصول -এর উপর عطف হয়েছে এবং প্রথম موصول দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাব মুমিন উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে ফেরেশতাদের اجمالى আলোচনার পর বিশেষভাবে জিবরাঈল, মিকাঈল ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়।

قوله: الى الملك القرم وابن الهمام ☆ ليث الكتيبة فى المزدحم۔

وقوله: يا لهف زيابة للحارث ☆ الصابح والغانم والائب۔

السوال: لمن البيتان ولم اورد المفسر اوضح ايضاحا تاما بعد الترجمة.

উত্তর ঃ প্রথম ছন্দটির তরজমা: এমন বাদশার দিকে যিনি হলেন নেতা, বাহাদুর এবং রণক্ষেত্রের সিংহ।

ছন্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ: القرم – অর্থ এমন ষাঁড়, যাকে আরবরা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। যার কারণে কেউ তার অসম্মানী করত না। অতঃপর এটি নেতা অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। এ কবিতায় নেতা অর্থই উদ্দেশ্য। ابن الهمام : বাহাদুর বাদশা। ليث : সিংহ। الكتيبة : সেনাবাহিনী। المزدحم : রণক্ষেত্র।

দ্বিতীয় ছন্দটির তরজমা: আমার মা যিয়াবার আফসোস! এই হারিসের লুট-তরাজের কারণে, যে প্রভাতে প্রবেশ করেছে অতঃপর লুট-তরাজ করেছে এবং সহীহ-সালামতে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ছন্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ: لهف : আফসোস, অনুতাপ। زيابة : কবির মায়ের নাম। حارث : হারিছ ইবনে হাম্মাম। যিনি কবির এবং তার গোত্রের সকল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে। صابح : সকালে আগমনকারী। غانم : সম্পদ লুণ্ঠনকারী। ائب : সুস্থাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী। এ ছন্দটি বনী তাইম গোত্রের সালামা ইবনে যিয়াবার রচিত।

শে'রটি উপস্থাপনের কারণ:

والذين يؤمنون الخ -এর معطوف عليه কি হবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, والذين يؤمنون الخ বাক্যটি পূর্বোক্ত الذين يؤمنون الخ -এর উপর عطف হয়েছে। প্রথম موصول

দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাবের মুমিন উদ্দেশ্য।
ইমাম বায়যাবী (র.) -এর এ বক্তব্যের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি হল– معطوف ও معطوف عليه -এর মাঝে تغاير বা ভিন্নতা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আলোচ্য আয়াতটিতে الذين يؤمنون তার পূর্বোক্ত الذين -এর উপর عطف হওয়া সত্ত্বেও কোন ভিন্নতা নেই। তাহলে عطف কিভাবে শুদ্ধ হল?

এ প্রশ্নের সমাধানে আল্লামা বায়যাবী (র.) কবিতাংশটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল– আলোচ্য আয়াত ও তার পূর্বোক্ত আয়াতের صله পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্টের। আর صله -এর ভিন্নতার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে। যেমনিভাবে উপস্থাপিত কবিতাংশে সিফাতের ভিন্নতাকে ذاتی ভিন্নতার স্থলাভিষিক্ত করে عطف করা হয়েছে। কবিতাংশে الملك القرم ابن الهمام এবং ليث الكتيبة তিনটিই একই সত্তার বিভিন্ন গুণাবলী। গুণাবলী বিভিন্ন হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

তদ্রূপ يا لهف زيابة الخ ছন্দের মধ্যেও الصابح والغانم والائب গুণগুলো একই সত্তার হলেও গুণের বিভিন্নতার কারণে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আয়াতের মধ্যে تغاير صله কিভাবে হল?

উত্তর: প্রথম موصول তথা الذين يؤمنون بالغيب -এর صله -এর অর্থ হল– তারা অদৃশ্যের উপর ঈমান রাখে আর শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত সম্পাদন করে। আর দ্বিতীয় موصول তথা والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك -এর صله -এর অর্থ হল– তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও তার পূর্ববর্তী অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। কাজেই দু'টির صله -এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। আর এই ভিন্নতার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

☆☆☆

وَكَرَّرَ الْمَوْصُوْلَ تَنْبِيْهًا عَلٰى تَبَايُنِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُؤْمِنُوْا اَهْلِ الْكِتَابِ ذَكَرَهُمْ مُخَصَّصِيْنَ عَنِ الْجُمْلَةِ كَذِكْرِ جَبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ بَعْدَ الْمَلَائِكَةِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهِمْ وَتَرْغِيْبًا لِاَمْثَالِهِمْ

অনুবাদ:

একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব

اسم موصول তথা الذين -কে তাকরার আনা হয়েছে ঈমানের দু'টি পথের ভিন্নতার উপর সতর্ক করার জন্য। অথবা (আয়াত দ্বারা) الذين يؤمنون بالغيب -এর একদল উদ্দেশ্য আর তারা হল আহলে কিতাবের মুমিনগণ। তাদেরকে সমষ্টি হতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ফেরেশতাদের উল্লেখ করার পর জিবরাইল, মীকাইলকে উল্লেখ করার মত, তাদের শানের মাহাত্ম্য বুঝাতে এবং তাদের সমমর্যাদার লোকদেরকে উৎসাহিত প্রদানের লক্ষ্যে।

السوال: قوله وكرر الموصول.................لامثالهم
اوضح غرض المفسر بهذه العبارة ايضاحا تاما

উত্তর ঃ قوله وكرر الموصول الخ : এই ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) -এর উদ্দেশ্য হল একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্নটি হল– পূর্বে বলা হয়েছে যে, উভয় موصول দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য। কাজেই موصول -কে দু'বার উল্লেখ না করে শুধু প্রথম موصول -কে উল্লেখ করে দ্বিতীয় موصول -কে উল্লেখ না করে তার صله -কে প্রথম موصول -এর صله -এর উপর عطف করলেই তো যথেষ্ট ছিল; কিন্তু নিষ্প্রোয়োজন দু'বার موصول -কে উল্লেখ করা হল কেন?

মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্নটির জবাব হল– যদিও এখানে উভয় موصول দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য; কিন্তু موصول -কে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে এব্যাপারে সতর্ক করে দিতে যে, এখানে দুই ঈমানের পথ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম প্রকার ঈমান অর্জন করার পথ হল আকল বা বিবেক। আর দ্বিতীয় প্রকার ঈমান অর্জনের পথ হল نقل বা ঐতিহ্য। এখানে যদিও موصول -কে দু'বার উল্লেখ না করেও পথের বিভিন্নতার ব্যাপারে সতর্ক করা যেত, তথাপি দু'বার উল্লেখ করার কারণে বিষয়টি যতটুকু শক্তিশালী হয়েছে; একবার উল্লেখ করার দ্বারা সেই পরিমাণ শক্তিশালী হত না। এজন্য দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

☆☆☆

وَالْاِنْزَالُ: نَقْلُ الشَّيْءِ مِنَ الْاَعْلٰى اِلَى الْاَسْفَلِ وَهُوَ اِنَّمَا يُلْحَقُ الْمَعَانِيْ بِتَوَسُّطِ لُحُوْقِهِ الذَّوَاتِ الْحَامِلَةِ لَهَا وَلَعَلَّ نُزُوْلَ الْكُتُبِ الْاِلٰهِيَّةِ عَلَى الرُّسُلِ بِأَنْ يَتَلَقَّفَهُ الْمَلَكُ مِنَ اللّٰهِ تَلَقُّفًا رُوْحَانِيًّا اَوْ يَحْفَظُهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ فَيَنْزِلُ بِه فَيُلْقِيْه عَلَى الرُّسُلِ وَالْمَرَادُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ اَلْقُرْاٰنُ بِاَسْرِه وَالشَّرِيْعَةُ عَنْ اٰخِرِهَا وَاِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِيْ وَاِنْ كَانَ بِبَعْضِه مُتَرَقَّبًا تَغْلِيْبًا لِلْمَوْجُوْدِ عَلٰى مَا لَمْ يُوْجَدْ اَوْ تَنْزِيْلًا لِلْمُنْتَظِرِ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ وَنَظِيْرُهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى: اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ـ فَاِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَسْمَعُوْا جَمِيْعَهٗ وَلَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ كُلُّهٗ مُنَزَّلًا حِيْنَئِذٍ وبِمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سَائِرُ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ

অনুবাদ:

(দ্বিতীয় আলোচনা: انزال শব্দের অর্থ, আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার পদ্ধতি এবং ما انزل দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আর انزال -এর অর্থ হল কোন জিনিসকে উপর থেকে নিচের দিকে স্থানান্তরিত করা। আর এই

স্থানান্তরকরণ যুক্ত হয় দেহবিশিষ্ট জিনিসের সত্তার মাধ্যমে। সম্ভবতঃ রাসূলগণের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা এ পদ্ধতিতে হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ তা'লার নিকট হতে জিবরাঈল (আ.) আধ্যাত্মিকভাবে অর্জন করেছেন। অথবা লওহে-মাহফুয হতে মুখস্থ করে নিয়েছেন, অতঃপর এসে রাসূলগণ পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। আর مـــا انــزل اليك (যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে) দ্বারা পূর্ণ কুরআন মজীদ এবং পূর্ণ দ্বীন উদ্দেশ্য। আর انـزل -কে مـاضى -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তার কিছু অংশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ রকম করার কারণ হল– مــوجـــود বা উপস্থিত জিনিসকে অনুপস্থিত জিনিসের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং অপেক্ষমাণ জিনিসকে অবশ্যম্ভাবীর স্তরে রাখার কারণে হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল আল্লাহর বাণী– انـا سمعنا كتابا انزل من بـعد موسى (আমরা এমন কিতাব শ্রবণ করেছি যা মুসা (আ.) -এর পর অবতীর্ণ হয়েছে)। কেননা, জিনেরা তো পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেনি। আর পূর্ণ কুরআনও তখন অবতীর্ণ হয় নি। আর ما انزل من قبلك দ্বারা পূর্বের যাবতীয় আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السـوال: (الف) ما معنى الانزال وما المراد بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما وجه التعبير بلفظ الماضى؟ بين على نهج المفسر۔

উত্তর ঃ انــزال শব্দের অর্থ: انــزال শব্দটি বাবে افـعـــال -এর মাসদার। এর অর্থ হল– কোন জিনিসকে উপর হতে নিচের দিকে স্থানান্তরিত করা।

مـا انزل اليك দ্বারা উদ্দেশ্য এবং انزل -কে مـاضى -এর সীগাহ দ্বারা উল্লেখ করার কারণ: অত্র আয়াতে ما انزل اليك দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআন ও পরীপূর্ণ শরীয়ত উদ্দেশ্য। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হল– الـذيـن يـؤمنون بما انزل اليك আয়াতখানা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন যেমন সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়নি তেমনিভাবে শরীয়তও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। তথাপি অত্র আয়াতে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ তথা انزل ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন কুরআন সম্পূর্ণভাবে রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়।

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন।

১. مجاز مرسل হিসেবে কুরআনের মওজুদ অংশকে অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য দিয়ে ماضى -এর সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

২. استـعـاره تبعيه হিসেবে অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশিত বস্তুকে বাস্তবায়িত বিষয়ের সাথে তুলনা করে فعل ماضى -এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

وما انزل من قبلك দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পূববর্তী যাবতীয় আসমানী কিতাব।

السوال: اكتب كيفية نزول الكتب الالٰهية على الرسل

উত্তর ঃ ঐশি গ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণ পদ্ধতি ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) ঐশিগ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরনের দু'টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

১. ঐশিবাণী বাহক ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে রূহানীভাবে বাণীসমূহ আত্মস্থ

করে রাসূলগণের কাছে পৌঁছে দিতেন।

২. জিবরাঈল (আ.) লওহে মাহফূয থেকে পড়ে মুখস্থ করে তা নবীগণের উপর অবতীর্ণ করতেন।

☆☆☆

وَالْإِيْمَانُ بِهِمَا جُمْلَةً فَرْضُ عَيْنٍ وَبِالْاَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِيْ تَفْصِيْلًا مِنْ حَيْثُ اِنَّا مُتَعَبَّدُوْنَ بِتَفَاصِيْلِهِ فَرْضٌ وَلٰكِنْ عَلَى الْكِفَايَةِ لِاَنَّ وُجُوْبَهُ عَلٰى كُلِّ اَحَدٍ يُوْجِبُ الْحَرَجَ وَفَسَادَ الْمَعَاشِ

অনুবাদ:

(তৃতীয় আলোচনা: কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনার বিধান কি?)

আর কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর اجمالی ভাবে ঈমান আনা ফরযে আইন। আর কুরআনের উপর تفصیلا বা বিস্তারিতভাবে ঈমান ফরয; তবে ফরযে কেফায়া, এ হিসেবে যে, আমরা তার বিস্তারিত আহকামের অনুগত। কেননা, প্রত্যেকের জন্য বিস্তারিতভাবে ঈমানকে ফরয করাটা অসম্ভব এবং সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما حكم الايمان بالقران والكتب السابقة؟ اكتب على نهج المفسر العلام

উত্তর ঃ পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাব এবং কুরআন মজীদের উপর ইজমালী বা সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান রাখা ফরযে আইন। কিন্তু উভয়ের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান রাখা তো ফরযে আইন নয়; তবে কুরআনের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান রাখা ফরযে কেফায়া। কুরআন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখা ফরযে আইন হওয়ার কারণ হল এই যে, আল্লাহ তা'লা الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك উল্লেখ করার পর বলেছেন– اولئك هم المفلحون অর্থাৎ তারা হলো সফলকাম। এখানে সফলতাকে ঐ মুমিনদের উপর সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল যে, ما انزل اليك এবং ما انزل من قبلك -এর উপর ঈমান আনয়নকারীরাই সাফল্য অর্জন করতে পারবে। তারা ব্যতীত আর কেউ সফলকাম নয়। আর এই يؤمنون -এর মধ্যে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হল ايمان اجمالی বা সংক্ষিপ্ত ঈমান।

পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা ফরযে আইনও নয় এবং ফরযে কেফায়াও নয়। কেননা, আমরা পূর্ববর্তী কিতাবের বিস্তারিত বিধানের مکلف বা বাধ্য নই। তবে যেহেতু কুরআনের বিস্তারিত আহকামে আমরা বাধ্য, তাই কুরআনের উপর ایمان تفصیلی রাখা ফরয। তবে ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া।

ফরযে আইন না হওয়ার কারণ হল– যদি ফরযে আইন সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মানুষদের জন্য

এটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে তাদের সামাজিক জীবন যাপন। **অর্থাৎ ঈমানে তাফসীলী হল** ইলমে তাফসীলীর শাখা। সুতরাং যদি কুরআনের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হয়, তাহলে অবশ্যই তার ইলমে তাফসীলী (বিস্তারিত ইলম) অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হবে। আর যদি প্রত্যেকেই ইলম অর্জনে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে জীবিকা উপার্যন করবে কারা? ফলে সকলের জন্য এটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং কুরআনের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

☆☆☆

﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

{ এবং এরাই পরকালের উপর ঈমান রাখে }

মুসান্নিফ (র.) এই বাক্য সম্পর্কে পাঁচটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: বাক্যটির মর্ম। ২য় আলোচনা: بالاخرة এবং مسند اليه তথা هم -কে মুকাদ্দাম করার কারণ। ৩য় আলোচনা: يقين শব্দের বিশ্লেষণ। ৪র্থ আলোচনা: اخرة শব্দের তাহকীক। ৫ম আলোচনা: اخرة এবং يوقنون -এর কেরাতসমূহ।

اَیْ یُوْقِنُوْنَ اِیْقَانًا زَالَ مَعَهٗ مَا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنْ اَنَّ الْجَنَّةَ لَایَدْخُلُهَا اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰی وَاَنَّ النَّارَ لَنْ تَمَسَّهُمْ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً وَاِخْتِلَافُهُمْ فِیْ نَعِيْمِ الْجَنَّةِ اَهُوَ مِنْ جِنْسِ نِعَمِ الدُّنْيَا اَوْ غَيْرِه وَفِیْ دَوَامِه وَاِنْقِطَاعِه

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: وبالاخرة هم يوقنون -এর মর্ম

(وبالاخرة هم يوقنون) -এর মর্ম হল– তারা এমন ঈমান রাখে যে, যার দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায় তাদের পূর্ববর্তী সকল আকীদা। যেমন– ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অথবা, জাহান্নামের আগুন ইহুদীদেরকে শুধুমাত্র গণা কয়েক দিন শাস্তি দিবে। অথবা, জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে মতানৈক্য করা যে, তা কি দুনিয়ার নিয়ামতের ন্যায় হবে নাকি ভিন্ন রকমের হবে। তাছাড়া সেই নিয়ামতরাজি সর্বদা থাকবে নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالى وبالاخرة هم يوقنون

উত্তর ঃ وبالاخرة هم يوقنون -এর **মর্ম ঃ** আহলে কিতাবের মুমিনগণ আখেরাতের প্রতি এমন বিশ্বাস স্থাপন করে, যার দরুন আখেরাত সম্পর্কে তাদের যে আকীদা-বিশ্বাস ছিল এবং পরস্পর

মতবিরোধ ছিল তা এখন খতম হয়ে গেছে। যেমন জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ধারণা ছিল لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى "ইহুদী-খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। তদ্রূপ ইহুদীদের জাহান্নাম সম্পর্কে ধারণা ছিল لن تمسنا النار الا ايما معدودات "জাহান্নামের আগুন তাদেরকে শুধুমাত্র কয়েক দিনই স্পর্শ করবে"। তদ্রূপভাবে জান্নাতের নিয়ামতরাজি সম্পর্কে তাদের কারো ধারণা হল, তা দুনিয়ার নিয়ামতের মতই অর্থাৎ তা হবে শারীরিক উপভোগের বস্তু। আবার কারো কারো ধারণা ছিল, তা হবে রূহানী বা আত্মিক উপভোগের বস্তু।

আর এ ব্যাপারেও তাদের মতানৈক্য ছিল যে, সে সমস্ত নিয়ামতরাজি স্থায়ী হবে নাকি অস্থায়ী হবে। কেউ বলে স্থায়ী হবে। আবার কেউ বলে অস্থায়ী হবে। এ সমস্ত বিশ্বাস ছিল শুধুমাত্র ধারণাপ্রসূত।

☆☆☆

وَتَقْدِيْمُ الصَّلٰوةِ وَبِنَاءُ يُوْقِنُوْنَ عَلٰى هُمْ تَعْرِيْضٌ بِمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَبِاَنَّ اِعْتِقَادَهُمْ فِيْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَلَا صَادِرٌ عَنْ اِيْقَانٍ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: بالاخرة এবং هم মুসনাদ ইলাইহকে মুকাদ্দাম করার কারণ)

আর صلة অর্থাৎ بالاخرة-কে মুকাদ্দাম করা এবং يوقنون ফে'লকে هم যমীরের উপর বুনিয়াদ রাখার মধ্যে অন্যান্য আহলে কিতাবের সাথে تعريض বা ইঙ্গিতার্থক বাক্য ব্যবহার করা। আর এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, পরকাল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্যান্য আহলে কিতাবের বিশ্বাসটা বাস্তবসম্মত নয় এবং তা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وفى تقديم الصلة..........عن ايقان : ইবারতের ব্যাখ্যা ঃ

وبالاخرة هم يوقنون এই আয়াতের মধ্যে দু'টি বিষয়কে মুকাদ্দাম আনা হয়েছে। এ দুই تقديم দ্বারা দু'টি حصر (সীমাবদ্ধতা) লাভ হয়েছে। এবং এ দু' حصر দ্বারা দু'টি تعريض (ইঙ্গিতসূচক কথা) হাসিল হয়েছে। দুই تقديم হল এই– بالاخرة-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে, যা يوقنون-এর متعلق। এই تقديم দ্বারা حصر বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা হাসিল হয়েছে। কেননা, যে বিষয়কে শেষে আনা নিয়ম তাকে প্রথমে উল্লেখ করলে সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়।

এখন প্রশ্ন হল– بالاخرة-কে মুকাদ্দাম করার কারণে যে حصر সৃষ্টি হয়েছে তার অর্থ এই হয় যে, তারা শুধুমাত্র আখেরাতের প্রতিই ঈমান রাখে। আখেরাত ব্যতীত অন্য কিছুর উপর ঈমান আনয়ন করে না। অথচ এ অর্থটি ভুল। কেনান, তারা তো আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং আরো অন্যান্য বিষয়াবলির উপর ঈমান রাখে।

উত্তর হল– এখানে حصر টি حصر حقيقى বা বাস্তবিকপক্ষে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং حصر

اضـــــافـــى বা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আখেরাত ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় বস্তুর বিপরীতে আখেরাতকে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আখেরাত দ্বারা আখেরাতের বাস্তবিক অবস্থা উদ্দেশ্য, আর তার প্রতিপক্ষ হল অখেরাতের অবাস্তব অবস্থা তথা ধারণাপ্রসূত আখেরাত ও তার কাল্পনিক অবস্থাদি। সুতরাং بـالآخـرة -কে আখেরাতের অবাস্তব অবস্থার মুকাবেলায় সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। কাজেই এখন অর্থ হবে, আহলে কিতাবের মুমিনদের বিশ্বাস আখেরাতের বাস্তব অবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ.তারা এর বিপরীত আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যেভাবে আহলে কিতাবের অন্যান্য লোকেরা আখেরাতের অবাস্তব অবস্থায় বিশ্বাসী। সে রকম তারা নয়। সুতরাং এ حـصـر দ্বারা অন্যান্য আহলে কিতাবের প্রতি تـعـريـض (ইঙ্গিত) হয়ে গেছে। কেননা, আহলে কিতাবের অন্যান্য লোকেরা আখেরাতের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে তা আখেরাতের বাস্তব অবস্থার উপর নয়; বরং তাদের এ বিশ্বাস হল আখেরাতের অবাস্তব অবস্থার উপর।

দ্বিতীয় حصر লাভ হয়েছে هم মুসনাদ ইলাইহিকে মুকাদ্দাম করার কারণে। কেননা, فعل -এর পূর্বে مسند اليه -কে উল্লেখ করলে حصر (সীমাবদ্ধতা) -এর ফায়দা দেয়। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, আহলে কিতাবের মুমনিরাই আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে। তারা ব্যতীত অন্যান্য আহলে কিতাবের লোকেরা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। এ حصر দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি আহলে কিতাবের যে আকীদা-বিশ্বাস তা কেবলই ধারণা ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন প্রমাণাদির ভিত্তিতে স্থিরকৃত ছিলনা। এ বিশ্বাসকে يـقين বলা যায় না। কেননা, يـقين তো এমন দৃঢ় আকীদাকে বলে, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়।

মোটকথা, এখানে দু'টি জিনিসকে আগে আনার দ্বারা حـصـر আবশ্যক হয়েছে। আর حـصـر -এর ফায়দা হল, এর দ্বারা দু'টি জিনিসের প্রতি تعريض (ইঙ্গিত) করা হয়েছে। بالآخرة দ্বারা যে تعريض করা হয়েছে তা وبـان اعتقادهم فى امر الاخرة غير مطابق দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। আর هم দ্বারা যে تعريض করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে ولا صـادر عـن ايقان দ্বারা। আর এ দু'বাক্যের পূর্বে যে تـعـريـض بمن عداهم من اهل الكتاب বলেছেন তা কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়েছে।

☆☆☆

وَالْيَـقِيْـنُ: اِتْـقَـانُ الْـعِـلْـمِ بِنَفْيِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُ نَظْرًا وَ اِسْتِدْلَالًا وَلِذَالِكَ لَا يُوْصَفُ بِهِ عِلْمُ الْبَارِئْ وَلَا الْعُلُوْمُ الضَّرُوْرِيَّةُ

অনুবাদ:

(তৃতীয় আলোচনা: يقين শব্দের তাহকীক)

আর يقين বলা হয় সন্দেহকে দূরীভূত করে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইলমকে মজবুত করা। এ কারণেই আল্লাহ তা'লার ইলম এবং علوم ضروريه একিনের সাথে গুণান্বিত হয় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ:

يـوقـنـون শব্দটি ايـقان হতে নির্গত। আর ايـقان শব্দটি নির্গত হয়েছে يـقين থেকে। يـقين বলা হয় চিন্তা-গবেষণা ও দীলল-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহকে দূরীভূত করে ইলমকে মজবুত ও দৃঢ় করা। যেহেতু

দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যে পরিপক্ক জ্ঞান অর্জিত হয় তার উপর يقين শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, কাজেই আল্লাহ তা'লার ইলমের উপর يقين শব্দের ব্যবহার করা যায় না এবং আল্লাহকে موقن বা বিশ্বাসী বলা যায় না। কেননা, আল্লাহ তা'লার ইলম দলীল-প্রমাণ ছাড়াই অর্জিত হয়। তদ্রূপ علم بديهى সতঃস্বিদ্ধ জ্ঞানকেও يقين বলা যাবে না। কেননা, علم بديهى দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

☆☆☆

وَالْاٰخِـرَةُ تَانِيْثُ الْاٰخِرِ صِفَةُ الدَّارِ بِدَلِيْلِ قَوْلِه تَعَالٰى: تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةِ" فَقُلِّبَتْ كَالدُّنْيَا

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: اخرة শব্দের তাহক্বীক্ব)

আর اخرة শব্দটি اخر -এর مؤنث বা স্ত্রীলিঙ্গ। আর موصوف হল الدار যা এখানে উহ্য আছে। যার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'লার বাণী– تلك الدار الاخرة (এখানে الدار টি اخرة -এর موصوف হয়েছে) অতঃপর প্রাধান্যের ভিত্তিতে اخرة শব্দের প্রয়োগ عالم الغيب বা অদৃশ্য জগতের জন্য হতে থাকে। যেমন দুনিয়া (-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে দৃশ্য জগতের জন্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

اخرة শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

اخرة শব্দটি اٰخِر (خاء -এর যের সহকারে) -এর مؤنث । আর اخر টি হল اسم فاعل অর্থ হল বিলম্বে আগমনকারী। অত্র আয়াতে اخرة শব্দটি الدار -এর صفت হয়েছে, যা এখানে উহ্য আছে। যার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'লার বাণী– تلك الدار الاخرة এখানে الدار টি اخرة -এর موصوف হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, بالاخرة -এর মধ্যে الاخرة টি الدار -এর صفت হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পরকালকে اخرة কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ পরকাল হচ্ছে দুনিয়ার তুলনায় বিলম্বে আগমনকারী। তাই পরকালকে আখেরাত বলা হয়। কেননা, আখেরাত অর্থ– বিলম্বে আগমনকারী। শব্দটি মূলতঃ وصف ছিল। এ গুণবাচক অর্থ হিসেবে বিলম্বে আগমনকারী প্রত্যেক বস্তুর উপর اخرة শব্দের প্রয়োগ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু غلبه বা প্রাধান্য স্বরূপ পরকালের জন্য اخرة শব্দটি ব্যবহার হতে লাগল।

☆☆☆

وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّهٗ خَفَّفَهَا بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَاِلْقَاءِ حَرْكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَقُرِئَ يُؤْقِنُوْنَ بِقَلْبِ الْوَاوِ هَمْزَةً بِضَمٍّ مَا قَبْلَهَا اِجْرَاءً لَهَا مَجْرَى الْمَضْمُوْمَةِ فِيْ وُجُوْهٍ وَوُقِّتَتْ وَنَظِيْرُهٗ : لَحُبُّ الْمُؤْقِدَانِ اِلٰى مُؤْسٰى ☆ وَجَعْدَةَ اِذَا اَضَاءَ هُمَا الْوُقُوْدُ

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: اخرة এবং يوقنون -এর কেরাতসমূহ)

হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি اخرة শব্দের মধ্যে এমনভাবে تخفيف করেছেন যে, তার হামযাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন এবং হামযার হরকতকে পরিবর্তন করে লামকে দিয়ে দিয়েছেন। অপর এক কেরাতে يؤقنون আছে। যাতে واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, واو -এর পূর্বের হরফ হল مضموم সুতরাং وجوه ও وقتت -এর স্থলাভিষিক্ত করে ضمه বিশিষ্ট واو -এর স্তরে রাখা হয়েছে। এ তা'লীলে يؤقنون -এর দৃষ্টান্ত হল কবিতায় বর্ণিত দু'টি বাক্য অর্থাৎ المؤقدان و موسى (কবিতার অর্থ: বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله وعن نافع....الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) بالاخرة এবং يوقنون -এর দ্বিতীয় কেরাত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

اخرة ও يوقنون -এর ভিন্ন কেরাত : بالاخرة -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। এক কেরাত হল– تخفيف ছাড়াই অর্থাৎ যা আমরা পড়ে থাকি। আর দ্বিতীয় আরেকটি কেরাত নাফে' থেকে বর্ণিত আছে। তা হল– তিনি بالاخرة -এর মধ্যে تخفيف করেন। অর্থাৎ তিনি اخرة -এর হামযার فتحه -কে পূর্বের لام ساكن -এর মধ্যে দিয়ে হামযাকে হযফ করে بِلَا خِرَةِ পড়েছেন। আবার يوقنون -এর মধ্যেও আমাদের মাঝে বহুল ব্যবহৃত কেরাতের বাইরে আরেকটি কেরাত পাওয়া যায়। আর তা হল– واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করে। কেননা, ছরফ শাস্ত্রের একটি নিয়ম হল– যে واو -এর মধ্যে ضمه اصلى হয় সে واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা বৈধ আছে। যেমন وجوه ও وقتت এ দু'টির প্রথম واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করে ؤجوه ও ؤقتت পড়া জায়েয আছে। তবে কখনো এমন হয় যে, واو নিজে ساكن হয় আর তার পূর্বে مضموم হয় সেখানে واو -এর পার্শ্ববর্তী ضمه -কে واو -এর ضمه اصلى সাব্যস্ত করে ضمه اصلى -এর ক্ষেত্রে যে হুকুম দেয়া হয় সেই হুকুমই বর্তায় অর্থাৎ واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। এখানে يوقنون -এর واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে দ্বিতীয় কায়দানুযায়ী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কবিতা পেশ করা হচ্ছে। কবিতাটি হল–

لحب المؤقدان الى مؤسى ☆ وجعدة اذا اضائهما الوقود

কবিতার অর্থ: দুই অগ্নি প্রজ্বলনকারী অর্থাৎ মুসা ও জু'দা আমার নিকট অতি প্রিয়, যখন ইন্ধন তাদেরকে আলোকিত করে।

কবিতা উপস্থাপনের কারণ: কাযী বায়যাবী (র.) এখানে এ কবিতা এনে يوقنون -এর মধ্যে যে কায়দা পাওয়া গেছে এ কবিতার মধ্যেও সে কায়দানুযায়ী আমল করা হয়েছে এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন।

কেননা, এ কবিতার মধ্যে الموقدان ও موسى দু'টি শব্দ রয়েছে। এ দু'টির মধ্যে মূলতঃ واو সাকিন কিন্তু পূর্বের কায়দানুযায়ী তার পূর্ববর্তী مضموم -এর স্থলাভিষিক্ত করে واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

কবির উদ্দেশ্য: পঙক্তিটি জারীর কবির কবিতা হতে চয়ন করা হয়েছে। কবিতা দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হল– তার দু' সন্তান মুসা ও জু'দার প্রশংসা ও তার আথিত্যের কথা আলোচনা করা। তার দুই ছেলে ছিল খুব দানশীল, মেহমানদের জন্য তারা সবসময় খাবার তৈরী করে রাখত। রাতের মেহমানের আগমনের সুবিধার জন্য তারা আগুন জ্বেলে রাখত। পিতা জারীর তাদের এ ভালো কাজের বর্ণনা দিয়ে এ কবিতাটি রচনা করেছেন।

☆☆☆

﴿أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ﴾

{তারা স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত}

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব। ২য় আলোচনা: على هدى -এর মধ্যকার استعلاء -এর অর্থ। ৩য় আলোচনা: هدى -কে نكره আনার কারণ।

اَلْجُمْلَةُ فِيْ مَحَلِّ الرَّفْعِ اِنْ جُعِلَ اَحَدُ الْمَوْصُوْلَيْنِ مَفْصُوْلًا عَنِ الْمُتَّقِيْنَ خَبَرٌ لَهٗ وَكَاَنَّهٗ لَمَّا قِيْلَ: هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ قِيْلَ مَا بَالُهُمْ خُصُّوْا بِذَالِكَ؟ فَأُجِيْبَ بِقَوْلِه: اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ........اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَاِلَّا فَاِسْتِيْنَافٌ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْاِعْرَابِ وَكَاَنَّهٗ نَتِيْجَةُ الْاَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ اَوْ جُوَابُ سُوَالٍ قَالَ: مَا لِلْمَوْصُوْفِيْنَ بِهٰذِهِ الصِّفَاتِ اُخْتُصُّوْا بِالْهُدٰى؟ وَنَظِيْرُهٗ: اَحْسَنْتَ اِلٰى زَيْدٍ صَدِيْقِكَ الْقَدِيْمِ حَقِيْقٌ بِالْاِحْسَانِ فَاِنَّ اِسْمَ الْاِشَارَةِ هٰهُنَا كَاِعَادَةِ الْمَوْصُوْفِ بِصِفَاتِهِ الْمَذْكُوْرَةِ وَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ اَنْ يَسْتَانِفَ بِاِعَادَةِ الْاِسْمِ وَحْدَهٗ لِمَا فِيْهِ مِنْ بَيَانِ الْمُقْتَضِيْ وَتَلْخِيْصِه فَاِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ اِيْذَانٌ بِاَنَّهُ الْمُوْجِبُ لَهٗ

অনুবাদ:______________________________

(১ম আলোচনা: اولئك.....الخ বাক্যের তারকীব)

এ বাক্যটি رفع -এর স্থলে অভিষিক্ত। যদি দু' موصول -এর একটিকে المتقين হতে পৃথক ধরা হয় এবং সেই موصول -এর خبر হবে। কেমন যেন যখন বলা হল هدى للمتقين তখন প্রশ্ন

করা হল মুত্তাকীদের এমন কি অবস্থা যে, তারা হেদায়েতের সাথে বিশেষিত হল? তার উত্তর দেয়া হচ্ছে الذين يؤمنون بالغيب দ্বারা। অন্যথায় (যদি المتقين হতে পৃথক না ধরা হয়) جملہ مستانفه বা নতুন বাক্য ধরা হবে এবং তাতে اعراب -এর কোন স্থান হবে না। কেমন যেন এ বাক্য পূর্বের কালেমার এবং পরবর্তী সিফাতের ফলাফল অথবা সেই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হবে, যে বলে এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের কী এমন হল যে, তারা হেদায়েতের সাথে বিশেষিত হয়েছে? আর তার দৃষ্টান্ত হল احسنت الى زيد صديقك القديم حقيق بالاحسان কেননা, এখানে اسم اشاره আসাটা পূর্বোল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তির নামান্তর। আর এটা কেবল اسم -কে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে جملہ مستانفه আনার তুলনায় অধিক بليغ ও সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ। কেননা, এ সূরতে مقتضى -এর বর্ণনাও রয়েছে আবার তার সংক্ষেপণও রয়েছে। কেননা, কোন وصف -এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করলে এ কথার ঘোষণা দেয় যে, এ হুকুম সে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم

السوال: (الف) ما هى وجوه الاعراب لهذه الجملة؟

(ب) لم اتى سبحانه وتعالى باسم الاشارة؟

উত্তর ঃ সংক্ষিপ্ত তারাকীব:

ই'রাবের দিক দিয়ে অত্র আয়াতটি محلا مرفوع হয়েছে। তবে তা বিভিন্ন দিক দিয়ে হতে পারে। যথা–

১. خبر হিসেবে مرفوع । অর্থাৎ الذين يؤمنون بما انزل اليك الخ ও الذين يؤمنون بالغيب الخ এ দুই موصول -এর কোন একটিকে المتقين থেকে পৃথক করে তাকে مبتداء গণ্য করা হবে এবং اولئك আয়াতকে بتاويل مفرد খবর গণ্য করা হবে। অতএব যদি প্রথম موصول তথা الذين يؤمنون على الخ আয়াতকে المتقين থেকে পৃথক গণ্য করা হয় তাহলে উভয় موصول পরস্পর معطوف ও بالغيب الخ معطوف عليه মিলে مبتداء হবে এবং اولئك -কে তার خبر গণ্য করা হবে।

আর যদি শুধুমাত্র দ্বিতীয় موصول -কে المتقين থেকে আলাদা করা হয় তাহলে শুধু দ্বিতীয় موصول -ই مبتداء হবে। আর اولئك তার خبر হবে।

২. جمله مستانفه হিসেবে مرفوع । অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় موصول -এর কোনটিকে المتقين থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্য না করে। অত্র আয়াতটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি جملہ হিসেবে পরিগণিত করা হবে। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতটি কোন উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. جمله مستانفه হিসেবে مرفوع । তবে এটাকে উহ্য প্রশ্নের উত্তর পরিগণিত করা হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত মুত্তাকীদের গুণাবলীর আলোচনা শুনে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে, এ সকল গুণ সম্পন্ন মুত্তাকীদের কি অবস্থা? তার উত্তরে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে– اولئك على هدى من ربهم الخ ।

(ب) لم اتى سبحانه وتعالى باسم الاشارة؟

উত্তর ঃ مسند اليه -কে اسم ظاهر উল্লেখ না করে اسم اشاره উল্লেখ করার কারণ ঃ

দুই কারণে মুসনাদ ইলাইহিকে اسم ظاهر উল্লেখ না করে اسم اشاره উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

১. সংক্ষেপে পূর্বোল্লেখিত صفات-এর সাথে مسند اليه-এর দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে اسم اشاره আনা হয়েছে। কেননা, اسم ظاهر অর্থাৎ المتقين উল্লেখ করলে উল্লেখিত গুণাবলী হওয়া বা না হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা থাকত। পক্ষান্তরে যদি اسم ظاهر-এর সাথে صفاتও উল্লেখ করা হত, তাহলে কথা অতি দীর্ঘ হয়ে যেত। অতএব اسم اشاره আনা হয়েছে যা اسم ظاهر-কে তার صفات সহকারে বুঝায়।

২. اسم ظاهر-এর পরিবর্তে اسم اشاره এজন্য আনা হয়েছে, যাতে اقتضاء كلام তথা ভাষার চাহিদার দ্বারা এটা সুপ্রমাণিত হয় যে, বান্দার জন্য هداية من ربهم তথা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং فلاح-এর অধিকারী হওয়ার জন্য উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শর্ত।

☆☆☆

وَمَعْنَى الْاِسْتِعْلَاءِ فِيْ عَلٰى هُدًى تَمْثِيْلُ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْهُدٰى وَاسْتِقْرَارِهِمْ عَلَيْهِ بِحَالِ مَنْ اِعْتَلَى الشَّيْءَ وَرَكِبَهٗ وَقَدْ صَرَّحُوْا بِه فِيْ قَوْلِهِمْ : اِمْتَطَى الْجَهْلَ وَالْغَوٰى وَاقْتَعَدَ غَارِبَ الْهَوٰى وَذَالِكَ اِنَّمَا يَحْصِلُ بَاِسْتِفْرَاغِ الْفِكْرِ وَاِدَامَةِ النَّظْرِ فِيْمَا نُصِبَ مِنَ الْحُجَجِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلٰى مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِى الْعَمَلِ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: على هدى-এর মধ্যকার استعلاء-এর অর্থ)

على هدى-এর মধ্যে استعلاء-এর উদ্দেশ্য হল– মুত্তাকীদের হেদায়েতের স্থানাধিকারী হওয়া ও হেদায়েতের উপর তাদের দৃঢ় থাকাকে সেই ব্যক্তির অবস্থার সাথে تشبيه দেয়া, যে কোন জিনিসের উপর উপবিষ্ট হয় ও আরোহণ করে। আর আরববাসীরা এ ব্যাপারে তাদের উক্তি امتطى الجهل ....الخ -এর মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। আর হেদায়েতে স্থিতি আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাদিতে ধ্যানমগ্নতা, সার্বক্ষণিক চিন্তা এবং আমলের ক্ষেত্রে অন্তরের হিসাব-নিকাশে ধারাবাহিকতা বা ক্রমান্বয়তার মাধ্যমে লাভ হতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اوضح معنى الاستعلاء فى قوله تعالى على هدى من ربهم

قوله ومعنى الاستعلاء......الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) অত্র আয়াতের على-এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মূলতঃ على তো استعلاء-এর জন্য ব্যবহৃত হয় কাজেই আয়াতের অর্থ হবে– তারা হেদায়েতের "উপর" প্রতিষ্ঠিত। অথচ হেদায়েত হল একটি معنوى বা অদৃশ্য বস্তু, তার কোন উপর বা নিচ হতে পারে না। কিন্তু তারপরও এখানে কিভাবে على ব্যবহার হল?

উত্তর ঃ এখানে على هدى من ربهم-এর মধ্যে على-এর ব্যবহার তার حقيقى অর্থ হিসেবে নয়; বরং এটা استعاره تبعيه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে على তার حقيقى অর্থে এ জন্য ব্যবহৃত হয়নি যে, هدى-এর উপর মুত্তাকীরা এভাবে আরোহী নয় যেভাবে যায়েদ ছাদের উপর আরোহী।

কেননা, هدى হল একটি معنوى বস্তু এটা মানব দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা কোন ইন্দ্রিয় বস্তু নয়। অথচ استعلاء حقيقى -এর জন্য مستعلى عليه (যার উপর আরোহিত হবে তা) ইন্দ্রিয় বস্তু হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যখন আয়াতে استعلاء حقيقى উদ্দেশ্য হতে পারে না কাজেই নিশ্চিতরূপে على -এর ব্যবহার استعاره تبعيه হিসেবে ধরতে হবে। আর এখানে استعاره تبعيه -এর সূরত হল– মুত্তাকীদের হেদায়েতে স্থানাধিকারী হওয়া এবং হেদায়েতের উপর তাদের সু-স্থির থাকাকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির অবস্থার সাথে যে কোন জিনিসে আরোহণ করে আছে অর্থাৎ তার استعلاء -এর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। কাজেই مشبه হল হেদায়েতে স্থানাধিকারী হওয়া আর مشبه به হল বাহনের উপর আরোহণ করা। আর যেহেতু استعلاء হল على -এর অর্থের متعلق তথা সংশ্লিষ্ট; কাজেই তার মাধ্যমে على -কে مشبه -এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং على -এর ব্যবহার আয়াতের মধ্যে استعاره تبعيه হিসেবে হয়েছে।

وقد صرحوا به فى قولهم امتطى....الخ : যেহেতু হেদায়েতের মত معنوى জিনিসকে আরোহণের মত ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে তাশবীহ দেয়া একটি দুর্লভ বিষয়, এজন্য বায়যাবী (র.) এ জাতীয় تشبيه -এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেমন– আরববাসীরা বলে থাকে– امتطى الجهل والغوى "সে অজ্ঞতা আর ভ্রষ্টতাকে বাহন বানিয়ে নিয়েছে"। এখানে غوى ও جهل হল معنوى জিনিস আর বাহন হল ইন্দ্রিয় বস্তু। معنوى জিনিসকে ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে আরববাসীদের আরেকটি উক্তি হল– اقتعد غارب الهوى "সে আত্মলালসার পৃষ্ঠে উঠে বসেছে"। এখানে هوى হল معنوى জিনিস আর বাহন হল ইন্দ্রিয় জিনিস। এ معنوى জিনিসকে ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : হেদায়েতে কিভাবে স্থিতি লাভ হয়?

উত্তর : قوله وذالك انما يحصل....الخ : পূর্বে বলা হয়েছে যে, আয়াতে على ব্যবহার করে হেদায়েতে স্থিতি ও স্থায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে। এখন মুসান্নিফ (র.) এই ইবারতের মাধ্যমে হেদায়েতে কিভাবে স্থিতি লাভ হয় তা তুলে ধরেছেন। সুতরাং তিনি বলেন– হেদায়েতে স্থায়িত্ব লাভের দু'টি পন্থা রয়েছে।

১. চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণ করা।

২. আমলের শক্তি পরিপূর্ণ করা।

চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণ বানানোর পদ্ধতি হল– মানুষ সেসব প্রমাণাদিতে চিন্তা করবে যেসব প্রমাণাদি আল্লাহ নিজে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চাই সে প্রমাণাদির সম্পর্ক মানুষের সত্তার সাথে হোক যাকে আত্মিক প্রমাণাদি বলা হয়। অথবা তার সম্পর্ক মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে হোক যাকে ভৌগলিক প্রমাণাদি বলা হয়। অথবা আকাশে অবস্থিত জিনিসের সাথে হোক যাকে আসমানী প্রমানাদি বলা হয়। যখন মানুষ এ তিন প্রকার প্রমাণাদির মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করবে তখন তার বিশ্বাস তথা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ, তাঁর প্রভূত্ব, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'লার কালাম হওয়া এবং রাসূল (সা.) -এর রিসালত ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমলের শক্তি পরিপূর্ণ করার পদ্ধতি হল– মানুষ নিজের আমলের ব্যাপারে আত্মবিচার করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন সে এ ব্যাপারে চিন্ত করবে ও হিসাব করবে যে, আজ আমি কতগুলি ভালো কাজ

করেছি আর কতগুলি মন্দ কাজ করেছি। তারপর ভালো কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তা বহাল রাখার ও পর্যায়ক্রমে আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। আর মন্দ কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

☆☆☆

وَنُكِّرَ هُدًى لِلتَّعْظِيْمِ فَكَأَنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ ضَرْبٌ لَايُبَالِغُ كُنْهُهُ وَلَايُقَادِرُ قُدْرَهُ وَنَظِيْرُهُ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ:

فَلَا وَاَبِيْ الطَّيْرِ الْمُرِبَّةِ بِالضُّحٰى ☆ عَلٰى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتَ عَلٰى لَحْمٍ

وَاَكَّدَ تَعْظِيْمَهُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَانِحُهُ وَالْمُوَفِّقُ لَهُ وَقَدْ اُدْغِمَتِ النُّوْنُ فِى الرَّاءِ بِغُنَّةٍ وَبِغَيْرِ غُنَّةٍ

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: هدى -কে نكره আনার কারণ)

আর هدى -কে বড়ত্ব বুঝাতে نكره ব্যবহার করা হয়েছে। কেমন যেন هدى দ্বারা এমন এক প্রকারের হেদায়েত উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যার গভীরে বা প্রান্তসীমায় পৌঁছা যায় না এবং সেখানে পৌঁছার শক্তিও নেই। এর দৃষ্টান্ত হল কবি হুযালীর কবিতা فلا وابى الطير....الخ ।

হেদায়েতের বড়ত্বকে এ কথা বলে আরো দৃঢ় করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লাই তার দাতা ও তার তাওফীকদাতা। আর কখনো نون -কে راء -এর মধ্যে গুন্নার সাথে ইদগাম করা হয় আর কখনো গুন্না ছাড়াই ইদগাম করা হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন ঃ هدى -কে نكره আনার কারণ কি?

উত্তর: এখানে هدى -কে نكره আনা হয়েছে বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। কেমন যেন এখানে نكره এনে এমন এক প্রকার হেদায়েত উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যার গভীরতায় পৌঁছা যায় না এবং কেউ পৌঁছতে সক্ষমও নয়। মূলতঃ نكره আনা হয় দু'টি কারণে। (ক) বড়ত্ব বুঝাতে। (খ) তুচ্ছ ভাবাপন্নের জন্য। তবে কোথায় বড়ত্ব বুঝাবে আর কোথায় তুচ্ছ বুঝাবে তার ভিত্তি হল ইবারতের ভাব-ভঙ্গি। যদি ইবারতে কোন প্রশংসা গাঁথা তুলে ধরা হয় এবং সেখানে نكره ব্যবহার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, نكره এসেছে বড়ত্ব বুঝাতে। আর যদি ইবারতের মধ্যে কারো নিন্দাজ্ঞাপন উদ্দেশ্য হয় এবং সেখানে نكره ব্যবহার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, نكره এসেছে নিন্দা বুঝাতে। অত্র আয়াতে মুত্তাকীদের প্রশংসা গাঁথা রয়েছে। কবি হুযালীর কবিতার মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতা হল–

فلا وابى الطير المربة بالضحى ☆ على خالد لقد وقعت على لحم

কবিতার অর্থ ঃ তুমি যা বুঝেছো তা নয়; বরং সেই বিহঙ্গয় পিতার শপথ! যা খালেদের (লাশের)

উপর চাশতের সময় নিপতিত হয়।

কবিতা উপস্থাপনের কারণ: এ কবিতা এনে نكره -এর মাধ্যমে যে বড়ত্বের অর্থ প্রকাশ পায় তার দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এ কিবতার মধ্যে محل استشهاد হল لحم শব্দ এটাকে نكره আনা হয়েছে বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা, এ কবিতা খালেদ ইবনে যুবাইরের শোক প্রকাশার্থে কবি হুযালী শোঁকগাথা হিসেবে বলেছেন। আর কবির কাছে খালেদ ইবনে যুবাইর একজন মর্যাদবান ব্যক্তিত্ব। কাজেই বিহঙ্গ যখন তার গোশতে তথা তার শরীরে বসেছিল তখন কবি তার প্রশংসার পাত্রের গোশতকে মর্যাদার আসনে আসীন করার জন্যই لحم -কে نكره হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

﴿وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

{ আর তারাই সফলকাম }

আয়াতের এ অংশে মুসান্নিফ (র.) সাতটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: اولئك -কে তাকরার আনার কারণ। ২য় আলোচনা: اولئك هم ও اولئك على هدى من ربهم -এর মধ্যে واو عاطفه আনার কারণ। ৩য় আলোচনা: هم যমীর সম্পর্কে। ৪র্থ আলোচনা: المفلحون -এর তাহকীক। ৫ম আলোচনা: المفلحون -কে معرفه আনার কারণ। ৬ষ্ঠ আলোচনা: বিশেষ জ্ঞাতব্য। ৭ম আলোচনা: অত্র আয়াত দ্বারা মু'তাযিলাদের দলীল উপস্থাপন ও তার খন্ডন।

كَرَّرَ فِيْهِ اِسْمَ الْاِشَارَةِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ اِتِّصَافَهُمْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ يَقْتَضِىْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْاَثْرَتَيْنِ وَاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِىْ تَمِيْزِهِمْ بِهَا عَنْ غَيْرِهِمْ

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: اولئك -কে তাকরার আনার কারণ)

অত্র আয়াতে اولئك ইসমে ইশারাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে দু'বার উল্লেখ করেছেন যে, মুত্তাকীদের (উক্ত) গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া উভয় বৈশিষ্ট্য (তথা দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর স্থায়িত্ব এবং পরকালে সফলতা) -এর ইল্লত বা কারণ। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করতে দু'বার আনা হয়েছে যে, এ উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটি তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে পার্থক্যকরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم كرر سبحانه وتعالى اولئك ؟

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা দু'বার اولئك শব্দ উল্লেখ করেছেন অথচ দু'টি শব্দ একই ধরনের লোক তথা পূর্বের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই উদ্দেশ্য। তারপরও কেন দু'বার এ শব্দটি উল্লেখ করলেন?

উত্তর ঃ اولئك ইসমে ইশারা تكرار বা পুনঃবার উল্লেখকরণ ফায়দাবিহীন নয়; বরং দু'টি ফায়দার জন্য পুনঃবার উল্লেখ করেছেন। ফায়দা দু'টি হল–

১. এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া তাদের ইহকালে হেদায়েত লাভের এবং পরকালে সফলতা লাভের কারণ। অর্থাৎ এ গুণাবলী ধারণ করলে তারা ইহকালীন

জীবনে হেদায়েত লাভে ধন্য হবে এবং পরকালীন জীবনে সফলতা তাদের পদচুম্বন করবে। কেননা, علت -এর تكرار টি معلول -এর تكرار বুঝায়। পক্ষান্তরে যদি اولئك ইসমে ইশারাকে تكرار না আনা হত তাহলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হত যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনে হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ। পরলৌকিক জীবনে সফলতার জন্য কারণ বা علت নয়।

২. দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য ইসমে ইশারাকে তাকরার আনা হয়েছে যে, মুত্তাকীদের জন্য উল্লেখিত উভয় বৈশিষ্টের প্রতিটি তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যদি اولئك -কে পুনঃরুল্লেখ না করা হত তাহলে এ উভয়ের সমষ্টি তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাত আর পৃথক পৃথকভাবে অন্যদের এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হত।

وُسِّطَ الْعَاطِفُ لِاِخْتِلَافِ مَفْهُوْمِ الْجُمْلَتَيْنِ هٰهُنَا بِخِلَافِ قَوْلِهٖ اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ فَاِنَّ التَّسْجِيْلَ بِالْغَفْلَةِ وَالتَّشْبِيْهَ بِالْبَهَائِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مُقَرِّرَةً لِلْاُوْلٰى فَلَا يُنَاسِبُ الْعَطْفُ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: اولئك هم المفلحون ও اولئك على هدى من ربهم -এর মধ্যে واو عاطفه আনার কারণ)

এখানে দুই বাক্যের বৈপিরিত্যের কারণে উভয়টার মাঝে حرف عطف আনা হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'লার বাণী اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون -এর বিপরীত। কেননা, দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে (কাফেরদের উপর) গাফলতের হুকুম আরোপ করা ও (প্রথম বাক্যের মধ্যে) চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা একই জিনিস। কাজেই দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যকে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করবে। তাই عطف শোভনীয় হবে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন ঃ اولئك هم المفلحون এবং اولئك على هدى من ربهم এ দুই বাক্যের মধ্যখানে حرف عطف আনার কারণ কি?

উত্তরঃ অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে হরফে আতফ আনার কারণ হল– উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) এবং وجود (অস্তিত্ব) -এর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

মর্মের মধ্যে ভিন্নতা এভাবে যে, প্রথম বাক্যের মর্ম হল, মুত্তাকীদের হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হল, তাদের কৃতকার্য হওয়া।

আর وجود (অস্তিত্বের) মধ্যে ভিন্নতা হল– হেদায়েত প্রাপ্ত, ইহলৌকিক জীবনে হওয়া আর কৃতকার্যতা পরলৌকিক জীবনে। আয়াতের মধ্যে উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য। অতএব উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) ও وجود (অস্তিত্ব) -এর মধ্যে বিভিন্নতার কারণে বাক্যদ্বয়ের মাঝে كمال اتصال নেই। তবে خبریت -এর দিক দিয়ে অভিন্ন হওয়ার কারণে এবং خبر -এর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকার কারণে উভয় বাক্যের মধ্যে توسط بين الكمالين হয়েছে। আর توسط بين الكمالين -এর সময় এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর عطف করা হয়। এ কারণে অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে حرف عطف আনা হয়েছে।

উভয় বাক্যের مبتداء -এর মধ্যে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। কেননা, উভয় مبتداء তথা اولئك দ্বারা একই

শ্রেনীর লোক উদ্দেশ্য। আর উভয় خبر তথা علی هدی ও المفلحون-এর মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে علت ও معلول-এর দিক থেকে। কেননা, ইহলৌকিক জীবনে হেদায়েতের উপর থাকা পরলৌকিক জীবনে কৃতকার্য হওয়ার জন্য علت বা কারণ। পক্ষান্তরে اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون আয়াতে উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) অভিন্ন। কেননা, উভয় বাক্যের مخبر عنه অভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে مخبر ও অভিন্ন। কারণ, দ্বিতীয় বাক্যে যাদেরকে গাফিল বলা হয়েছে তাদেরকেই গাফলতির দিক দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মোটকাথা, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত গাফিল। অতএব দ্বিতীয় বাক্যে গাফলতির হুকুম আরোপ করা আর প্রথম বাক্যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা অভিন্ন বিষয়।

সার-সংক্ষেপ– দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের জন্য তাকীদ হয়েছে। আর تاكيد ও موكد-এর মাঝে كمال اتصال থাকে। আর كمال اتصال-এর সময় দু'টি বাক্যের মধ্যে حرف عطف আনা হয় না। অতএব উক্ত আয়াতের উভয় বাক্যের মাঝে كمال اتصال থাকার কারণে حرف عطف উল্লেখ করা হয় নি।

☆☆☆

وَهُمْ فَصْلٌ يَفْصِلُ الْخَبَرَ عَنِ الصِّفَةِ وَيُؤَكِّدُ النِّسْبَةَ وَيُفِيْدُ اِخْتِصَاصَ الْمُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوْ مُبْتَدَأٌ وَ(الْمُفْلِحُوْنَ) خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ (اُولٰئِكَ)

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: هم যমীর সম্পর্কে)

هم হল ضمير فصل তা خبر-কে صفت থেকে পৃথক করে সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং مسند-কে مسند اليه-এর সাথে খাছ করে। অথবা هم হল مبتدا আর مفلحون হল خبر আর সম্পূর্ণ বাক্য اولئك-এর خبر।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم فصلت بضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والخبر فى قوله تعالىٰ اولئك هم المفلحون؟

উত্তর ঃ ضمير فاصل আনার কারণ: واولئك هم المفلحون আয়াতাংশে اولئك ইসমে ইশারা مبتدا ও المفلحون খবরের মাঝে هم ضمير فصل আনার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. مبتدا ও خبر-কে موصوف ও صفت থেকে পার্থক্য করার জন্য। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য যে, اولئك টি مبتدا এটি موصوف নয়। আর المفلحون টি خبر এটি صفت নয়। কেননা, নাহুশাস্ত্রের নিয়ম হল যে, مشار اليه যদি معرف باللام হয় তাহলে সেটি خبر ও صفت উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অতএব এখানে المفلحون-কে معرف باللام দেখে যাতে কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত না হয় যে, এটি خبر হয়েছে নাকি صفت হয়েছে। তাই هم ضمير فصل উল্লেখ করে এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবসান করা হয়েছে। কেননা, ضمير فصل টি موصوف ও صفت-এর মাঝে আনা জায়েয নয়।

২. تاكيد نسبت-এর জন্য مبتدا ও خبر-এর মাঝে ضمير فصل আনা হয়েছে। আর ضمير فصل দ্বারা تاكيد نسبت এভাবে হয়েছে যে, هم ضمير فصل যেহেতু দ্বিতীয় مبتدا হয়েছে কাজেই এর দ্বারা

تكرار نسبت হয়েছে। আর تكرار দ্বারা تاكيد সৃষ্টি হয়।

৩. مسند -কে مسند اليه -এর জন্য খাছ করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ضمير فصل উল্লেখ করলে বালাগাতের নিয়ম অনুসারে اختصاص المسند بالمسند اليه -এর ফায়দা দেয়। অতএব আয়াতের এ অংশের অর্থ হবে– "তারাই সফলকাম"। অর্থাৎ সফলতাকে মুত্তাকীদের সাথে বিশেষিত করার জন্য هم ضمير فصل আনা হয়েছে।

☆☆☆

وَالْـمُـفْلِحُ بِالْحَاءِ وَالْجِيْمِ اَلْفَائِزُ بِالْمَطْلُوْبِ كَأَنَّهُ اَلَّذِىْ اِنْفَتَحَتْ لَهُ وُجُوْهُ الظَّفْرِ وَهٰـذَا التَّـرْكِيْـبُ وَمَـا يُشَارِكُهُ فِى الْفَاءِ وَالْعَيْنِ نَحْوُ فَلَقٌ وَقَلَذٌ وَفَلٰى يَدُلُّ عَلَى الشَّقِّ وَالْفَتْحِ

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: المفلحون শব্দের তাহকীক)

المفلح - حاء ও جيم -এর সাথে অর্থ– উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া। কেমন যেন সেই ব্যক্তির জন্য সফলতার সকল দিক উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এরং এর গঠন (তথা فلح) এবং فاء ও عين কালেমায় যে শব্দ তার শরীক হবে যেমন– فلق وقلذ وفلى তার অর্থ হবে– ফেড়ে ফেলা ও খোলা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

المفلحون -এর তাহকীক : المفلحون শব্দটি المفلح -এর বহুবচন (جمع)। এটা افلاح (বাবে افعال) হতে গঠিত। শব্দটির শেষে حاء ও হতে পারে আবার جيم ও হতে পারে। অর্থাৎ مفلح অথবা مفلج হবে। অর্থ– উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া। তবে তার মূল অর্থ হল– উন্মুক্ত করা, খোলা, ফেড়ে ফেলা। এ থেকেই কৃষককে فلاح বলা হয়। কেননা, কৃষক জমিনকে ফেড়ে ফেলে। যেহেতু فلح -এর মূল অর্থ হল উন্মুক্ত করা, খোলা, ফেড়ে ফেলা তাই সফলতা অর্জনকারী ব্যক্তিকে فلح থেকে مفلح বলা হয়। কেমন যেন সফলতা লাভকারী ব্যক্তির জন্য সফলতার সকল দিক ও পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

কাযী বায়যাবী (র.) এখানে একটি কায়দা তুলে ধরেছেন। আর তা হল– এ জাতীয় শাব্দিক গঠন তথা যার فاء কালেমায় থাকে فاء ও عين কালেমায় থাকে لام আর لام কালেমায় থাকে حاء এ জাতীয় শব্দ ও যে শব্দ فاء ও عين কালেমার মধ্যে এ فلح শব্দের সাথে শরীক হয় তা ফেড়ে ফেলা ও উন্মুক্ত করার অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন فلق অর্থ ফেড়ে ফেলা। এবং فلذ অর্থ পৃথক করা।

☆☆☆

وَتَعْرِيْفُ الْمُفْلِحِيْنَ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّ الْمُتَّقِيْنَ هُمُ النَّاسُ الَّذِيْنَ بَلَغَكَ اَنَّهُمُ الْمُفْلِحُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اَوِ الْاِشَارَةُ اِلٰى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ حَقِيْقَةِ الْمُفْلِحِيْنَ وَخُصُوْصِيَّاتِهِمْ

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: المفلحون -কে معرفه আনার কারণ)

المفلحون -কে একথা বুঝাতে معرف باللام আনা হয়েছে যে, মুত্তাকী সেসব লোক যাদের ব্যাপারে তোমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তারা আখেরাতে সফলকাম। অথবা সফলতা লাভকারীদের যে হাকীকত ও বৈশিষ্ট্যাবলী প্রত্যেকেই জানে তার প্রতি ইঙ্গিত করতেই معرفه আনা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ المفلحون -কে معرفه আনা হল কেন?

উত্তর ঃ المفلحون -কে কেন معرفه আনা হল তা সহজে বুঝার জন্য ছোট একটি ভূমিকা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি। ভূমিকাটি হল– زيد منطلق . زيد المنطلق এ দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ বলেন, প্রথম বাক্যদ্বয় انطلاق -কে যায়েদের জন্য সাব্যস্ত করেছে। তবে প্রথম বাক্যের সম্বোধিত ব্যক্তি সেই হবে যে শুরু থেকে انطلاق সম্পর্কে অজ্ঞাত অর্থাৎ সে জানে না যে, কার থেকে انطلاق সংঘটিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে সম্বোধিত সেই হবে যে কারো হতে انطلاق সংঘটিত হয়েছে তা জানে কিন্তু কার থেকে সংঘটিত হয়েছে তা জানে না। সুতরাং যখন زيد المنطلق বলা হল এখন এ কথা বলে দেয়া হল যে, انطلاق সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তুমি পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলে তা যায়েদ নামক ব্যক্তি হতে সংঘটিত হয়েছে। মোটকথা, منطلق -কে نكره হিসেবে তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন انطلاق -এর সংঘটনের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। আর منطلق -কে معرفه হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যখন انطلاق -এর সংঘটনের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে কিন্তু কার মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে।

এবার মূল বিষয়ের প্রতি যাওয়া যাক। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে الف لام -এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো الف لام দ্বারা عهد خارجى উদ্দেশ্য হবে অথবা جنسى উদ্দেশ্য হবে।

যদি الف لام দ্বারা عهد خارجى উদ্দেশ্য হয় তাহলে اولئك هم المفلحون -এর সম্বোধিত ব্যক্তি সেই হবে যার জানা আছে যে, দুনিয়াতে দু'টি দল আছে। তাদের মধ্যে একদল মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু আর অন্য দল সফলতা প্রাপ্ত। কিন্তু একথা জানা নেই যে, এ দু-দল কি একই লোক নাকি ভিন্ন ভিন্ন দু' ধরনের লোক? বুঝা গেল যে, এখানে সফলতার ব্যাপারে জানা আছে, কিন্তু এ সফলতা কাদের সাথে সম্পর্কিত তা জানা নেই। সুতরাং যখন বলা হল اولئك هم المفلحون এখানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হল যে, যারা দুনিয়াতে মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু তারাই আখেরাতে সফলকাম অর্থাৎ উভয় দল একই লোক। আর এটা زيد المنطلق -এর দৃষ্টান্ত।

আর যদি الف لام দ্বারা جنسى উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর দ্বারা মুত্তাকীদের جنس ও حقيقت -এর দিকে ইঙ্গিত করা হবে অর্থাৎ তখন الف لام দ্বারা কোন জাতীয় লোকেরা সফলতা লাভকারী তা বর্ণনার

দিকে ইঙ্গিত করা হবে। আর مفلحون -এর حقيقت হল সেসব বৈশিষ্ট্যাবলী যা الذين يؤمنون بالغيب হতে وبالاخرة هم يوقنون পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যাবলী যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদেরকে مفلحون বলা হবে।

☆☆☆

تَأَمَّلْ كَيْفَ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلٰى اِخْتِصَاصِ الْمُتَّقِيْنَ بِنَيْلِ مَا لَا يَنَالُ اَحَدٌ مِنْ وُجُوْهٍ شَتّٰى بِنَاءُ الْكَلَامِ عَلٰى اِسْمِ الْاِشَارَةِ لِلتَّعْلِيْلِ مَعَ الْاِيْجَازِ وَتَكْرِيْرُهٗ وَتَعْرِيْفُ الْخَبَرِ وَتَوْسِيْطُ الْفَصْلِ لِاِظْهَارِ قَدْرِهِمْ وَالتَّرْغِيْبُ فِيْ اِقْتِفَاءِ اَثْرِهِمْ

অনুবাদ:

(৬ষ্ঠ আলোচনা: বিশেষ জ্ঞাতব্য)

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'লা মুত্তাকীদের পদমর্যাদা প্রকাশ করতে ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে উৎসাহ দিতে গিয়ে কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথা কালাম (অর্থাৎ هدى ও فلاح -এর মত হুকুমসহ) সংক্ষিপ্তাকারে علت বর্ণনা করার জন্য اسم اشاره -এর উপর কালামের ভিত্তি রচনা করা, اسم اشاره -কে দু'বার উল্লেখ করা, خبر -কে معرفه আনা এবং মধ্যখানে ضمير فصل আনার মাধ্যমে মুত্তাকীদেরকে সকলের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির সাথে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ার ব্যাপারে জানান দিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ

আল্লাহ তা'লা اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون আয়াতের মধ্যে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কথা জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, যে সমস্ত জিনিস মুত্তাকীদের ভাগ্যে জুটেছে, যেমন- দুনিয়াতে পরিপূর্ণ হেদায়েতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সফলতা লাভ করা এ সবকিছুই মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউ এতে শরীক হতে পারবে না। সেই অবলম্বিত পদ্ধতিগুলো এই-

১. প্রথম বাক্যের মধ্যে اولئك আনা। এখানে اولئك -কে এনে পরবর্তী হুকুমের ইল্লতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, اولئك দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত সত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং যখন اولئك -কে উল্লেখ করা হল কেমন যেন সেই গুণাবলীকে পুনরায় উল্লেখ করা হল। আর যখন اولئك -এর পর কোন হুকুমকে বর্ণনা করা হল কেমন যেন সেই হুকুমের ইল্লতকেও সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হল। কেননা, কায়দা আছে- যখন কোন وصف -এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়, তখন সেই وصف টি হুকুমের ইল্লত হয়ে থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ هدى من ربهم এ হুকুমের জন্য اولئك হল ইল্লত। এ ইল্লতকে অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. اولئك -কে তাকরার আনা হয়েছে। আর اولئك -কে তাকরার আনার কারণে কি ফায়দা হয়েছে তার বিবরণ ইতিঃপূর্বে স্ববিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

৩. خبر তথা المفلحون -কে معرفه আনা হয়েছে। আর خبر -কে معرفه আনলে خبر টি مبتداء -এর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৪. দ্বিতীয় বাক্যে مبتداء ও خبر -এর মধ্যখানে ضمير فصل আনা হয়েছে। আর এটা خبر ও صفت -এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'লা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালাম এনে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে অবগত করে দিয়ে তাদের পদমর্যাদাকে প্রকাশ করতে ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে উৎসাহ দিতে চেয়েছেন। আমাদের মানসিকতা ও চিন্ত-চেতনাও যেন সেরকম হয়। আমীন!

وَقَدْ تَشَبَّثَتْ بِهِ الْوَعِيْدِيَّةُ فِيْ خُلُوْدِ الْفُسَّاقِ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ فِي الْعَذَابِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُفْلِحِيْنَ اَلْكَامِلُوْنَ فِي الْفَلَاحِ وَتَلْزِمُهُ عَدَمُ كَمَالِ الْفَلَاحِ لِمَنْ لَيْسَ عَلٰى حَقِيْقَتِهِمْ لَا عَدَمُ الْفَلَاحِ لَهُ رَأْسًا

অনুবাদ:

(৭ম আলোচনা: অত্র আয়াত দ্বারা মু'তাযিলাদের দলীল উপস্থাপন ও তার খন্ডন)

অত্র আয়াত দ্বারা وعيديه (তথা মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়) আহলে কিবলাদের (তথা মুসলমানদের) মধ্য থেকে ফাসিকদের চিরস্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করে। তবে তা এভাবে খন্ডিত হয় যে, مفلحون দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা সফলতায় পরিপূর্ণ। আর যারা মুত্তাকীদের সিফাতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাদের জন্য ''পরিপূর্ণ'' সফল না হওয়াকে আবশ্যক করে, তবে তাদের জন্য একেবারে সফলতা না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ফাসেকরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?

উপরোক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের **একটি মতামত** উল্লেখ করে তার উত্তর দিতে চাচ্ছেন।

মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ফাসিক তারা জাহান্নমের চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

দলীল: উপরোক্ত আয়াত। কেননা, اولئك দ্বারা পূর্ব উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত সত্তা উদ্দেশ্য। আর خبر -কে معرفه ব্যবহার করা ও مبتداء ও خبر -এর মাঝে ضمير فصل ব্যবহার করার কারণে حصر বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা দিয়েছে। কাজেই এখন আয়াতের অর্থ হবে– পূর্বে উল্লেখিত গুণের সাথে যারা গুণান্বিত তারাই সফলকাম। আর তার বিপরীতমুখী অর্থ হবে– যারা সেসব গুণে গুণন্বিত নয় তারা সফলকাম নয়। এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে যে, আমলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী, নামায বর্জনকারী, যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তিরা তথা ফাসিকরা অকৃতকার্য ও দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তিতে থাকবে। কেননা, এগুলো সেই গুণাবলীর বিপরীত। সেই গুণে গুণান্বিত হলে যেভাবে সফলকাম হবে এবং জান্নাতে যাবে অনুরূপ তার বিপরীত করলে জাহান্নামে যেতে যাবে।

দলীলের উত্তর: কাযী বায়যাবী (র.) এই দলীলের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, এখানে فلاح দ্বারা শর্তহীন فلاح উদ্দেশ্য নয়। বরং فلاح كامل বা পরিপূর্ণ সফলতা উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে

যারা পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করবে তারা প্রথম বারেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তার বিপরীতমুখী অর্থ হবে যারা পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারে নি তারা শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা একেবারেই জান্নাতে যাবে না এ কথা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। কাজেই মু'তাযিলা ও খারেজীদের মত ও দলীল সঠিক নয়।

☆☆☆

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾

"নিশ্চয় যারা কাফির"

মুসান্নিফ (র.) আয়াতের এ অংশের মধ্যে ছয়টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে তার যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের উপর عطف না করার কারণ। ৩য় আলোচনা: ان -এর তাহকীক। ৪র্থ আলোচনা: الذين ইসমে মাওসূলটি عهدى না جنسى ? ৫ম আলোচনা: كفر -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ। ৬ষ্ঠ আলোচনা: মু'তাযিলাদের একটি দলীলের উত্তর।

لَمَّا ذَكَرَ خَاصَّةَ عِبَادِهِ وَخَالِصَةَ أَوْلِيَائِهِ بِصِفَاتِهِمُ الَّتِيْ أَهَلَّتْهُمُ الْهُدٰى وَالْفَلَاحَ عَقَّبَهُمْ أَضْدَادَهُمُ الْعُتَاةَ الْمَرَدَّةَ الَّذِيْنَ لَايَنْفَعُ فِيْهِمُ الْهُدٰى وَلَايُغْنِيْ عَنْهُمُ الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র)

যখন আল্লাহ তা'লা স্বীয় বিশেষ বান্দাদের ও তাঁর একান্ত বন্ধুদের আলোচনা করেছেন তাদের সেই সিফাত ও বৈশিষ্ট্য সহ যেগুলো তাদেরকে হেদায়েত ও সফলতা লাভের উপযুক্ত বানিয়েছে। তাই এখন তাদের পরে তাদের বিপরীত গোনাহগার ও দুষ্ঠ লোকদের বিবরণ তুলে ধরেছেন যাদের হকে হেদায়েত কার্যকরী হয়নি এবং কোন কাজে আসেনি আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هو ربط الاية بما قبلها؟

উত্তর ঃ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র:

ان الذين كفروا পূর্বোল্লেখিত আয়াতের সাথে এ অংশের যোগসূত্র হল– পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আলোচনা ও তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ ছিল। এখন ان الذين كفروا এ আয়াতের মধ্যে তাদের বিপরীত তথা আল্লাহর দুশমন কাফির ও তাদের দুষ্টামীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের হকে হেদায়েত, নিদর্শনাবলী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ভীতিও কোন উপকার পৌছাতে পারে নি।

وَلَمْ يُعْطَفْ قِصَّتُهُمْ عَلَى قِصَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا عُطِفَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّ الْاَبْرَارَ نَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ـ لِتَبَايُنِهِمَا فِى الْغَرَضِ فَاِنَّ الْاُوْلٰى سِيْقَتْ لِذِكْرِ الْكِتَابِ وَبَيَانِ شَانِهِ وَالْاُخْرٰى مَسُوْقَةٌ لِشَرْحِ تَمَرُّدِهِمْ وَاِنْهِمَاكِهِمْ فِى الضَّلَالِ

অনুবাদ:______________________________

(২য় আলোচনা: এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের উপর عطف না করার কারণ)

কাফিরদের ঘটনাসম্বলিত এ আয়াতকে মুমিনদের ঘটনাসম্বলিত পূর্ববর্তী আয়াতের উপর عطف করা হয়নি। যেভাবে আল্লাহ তা'লার বাণী ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم -এর মধ্যে حرف عطف আনা হয়েছে। (এভাবে করা হয়নি) কারণ, উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কেননা, পূর্বের আয়াতে কুরআনের আলোচনা ও তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য আর পরবর্তী আয়াতে কাফিরদের দুষ্টামি ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হওয়ার আলোচনা করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:______________________________

السوال: لم لم يعطف (ان الذين كفروا) على الايات السابقة؟

উত্তর ঃ

ان الذين كفروا আয়াতের এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর কেন عطف করা হয়নি তা সহজে বুঝার জন্য প্রথমে كمال انقطاع ও توسط بين الكمالين -এর সংজ্ঞা বুঝে নেয়া দরকার।

كمال انقطاع বলা হয়– দু'টি বাক্য خبريه এবং انشائيه হওয়ার দিক দিয়ে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া। যেমন– نزاولها قال رائدهم ارسوا نزاولها এ উদাহরণে ارسوا হল جمله انشائيه আর نزاولها হল جمله خبريه । অথবা উভয় বাক্যের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকা। যেমন– على كاتب ـ الحمام طائر (আলী লেখক, কবুতর উড্ডীয়মান) এখানে 'আলীর লেখা' আর 'কবুতরের উড়া'র মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এ জাতীয় দু'টি বাক্যের মধ্যে كمال انقطاع (পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) হয়ে থাকে আর كمال انقطاع -এর সময় عطف বর্জন করা জরুরী।

توسط بين الكمالين বলা হয়– দু'টি বাক্য خبريه এবং انشائيه হওয়ার দিক দিয়ে এক হয়ে উভয়টির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা। যেমন– ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم এখানে উভয় বাক্য خبريه হয়েছে এবং উভয়টির পরস্পর সামঞ্জস্যও রয়েছে। কেননা, উভয়টির مسند اليه তথা الابرار এবং الفجار উভয়ের মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্যের সম্পর্ক অনুরূপ তাদের مسند তথা نعيم এবং جحيم -এর মধ্যেও রয়েছে বৈপরিত্যের সম্পর্ক।

এবার মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারতের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি ولم يعطف قصتهم على قصة المومنين كما عطف فى قوله تعالى : ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم الخ দ্বারা এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, ان الذين كفروا -কে هدى للمتقين الخ এর উপর عطف করা হয়নি উভয় বাক্যের মাঝে كمال انقطاع (পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) থাকার কারণে। কেননা, উভয়টির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের مسند اليه এবং مسند -এর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই তা একেবারে সুস্পষ্ট। তদ্রূপ উভয় বাক্য

উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য হল কুরআনের অবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুত্তাকীদের হেদায়েত করা। মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। এখানে তাদের অবস্থার বিবরণ প্রাসঙ্গিক হিসেবে এসেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য তথা ان الذين كفروا বাক্যটি এসেছে কাফিরদের দুষ্টামি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়াকে বর্ণনা করার জন্য। সুতরাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই উভয়টির মধ্যে كمال انقطاع (পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) বিদ্যমান বিধায় উভয়টির মাঝে حرف عطف আনা হয়নি।

পক্ষান্তরে ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم -এর মধ্যে উভয় বাক্য جملہ خبريه হয়েছে এবং উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্যের সম্পর্কও বিদ্যমান তাই উভয় বাক্যের মধ্যে توسط بين الكمالين বিদ্যমান আর توسط بين الكمالين -এর সময় দু'টি বাক্যের মাঝে حرف عطف আনা হয় বিধায় এ উভয়ের মাঝে حرف عطف আনা হয়েছে।

☆☆☆

وَاِنَّ: مِنَ الْحُرُوْفِ الَّتِىْ شَابَهَتِ الْفِعْلَ فِىْ عَدَدِ الْحُرُوْفِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْفَتْحِ وَلُزُوْمِ الْاَسْمَاءِ وَاِعْطَاءِ مَعَانِيْه وَالْمُتَعَدِّىْ فِىْ دُخُوْلِهَا عَلٰى اِسْمَيْنِ وَلِذَالِكَ اُعْمِلَ عَمَلَهُ الْفَرْعِىَّ وَهُوَ نَصْبُ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِىْ اِيْذَانًا بِاَنَّهٗ فَرْعٌ فِى الْعَمَلِ دَخِيْلٌ فِيْه وَقَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ: اَلْخَبَرُ قَبْلَ دُخُوْلِهَا كَانَ مَرْفُوْعًا بِالْخَبَرِيَّةِ وَهِىَ بَعْدَ بَاقِيَةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِلرَّفْعِ قَضِيَةً لِلْاِسْتِصْحَابِ فَلَايَرْفَعُهُ الْحَرْفُ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ اِقْتِضَاءَ الْخَبَرِيَّةِ الرَّفْعَ مَشْرُوْطٌ بِالتَّجَرُّدِ لِتَخَلُّفِه عَنْهَا فِىْ خَبَرِ كَانَ وَقَدْ زَالَ بِدُخُوْلِهَا فَتَعَيَّنَ اِعْمَالُ الْحُرُوْفِ فَائِدَتُهَا تَاكِيْدُ النِّسْبَةِ وَتَحْقِيْقُهَا وَلِذَالِكَ يَتَلَقّٰى بِهَا الْقَسْمَ وَيَصْدُرُ بِهَا الْاَجْوِبَةَ وَتَعْرِضُ فِىْ مَعْرِضِ الشَّكِّ مِثْلُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ۔ وَقَالَ مُوْسٰى: يَافِرْعَوْنُ اِنِّى رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ قَالَ الْمُبَرَّدُ قَوْلُكَ عَبْدُاللّٰهِ قَائِمٌ اِخْبَارٌ عَنْ قِيَامِه وَاَنَّ عَبْدَاللّٰهِ قَائِمٌ جُوَابُ سَائِلٍ عَنْ قِيَامِه وَاَنَّ عَبْدَاللّٰهِ لَقَائِمٌ جُوَابُ مُنْكِرٍ لِقِيَامِه

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: ان -এর তাহকীক)

ان সেইসব হরফের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো فعل -এর সাথে (পাঁচটি বিষয়ে) সামঞ্জস্য রাখে। (১) হরফের সংখ্যার ক্ষেত্রে। (২) فتحه -এর উপর مبنى হওয়ার ক্ষেত্রে। (৩) اسم -এর প্রতি মুখাপেক্ষি হওয়ার দিক দিয়ে (অর্থাৎ فعل -এর জন্য যেভাবে اسم আবশ্যক যা তার فاعل বা مفعول হয়

তদ্রূপ ان -এর জন্যও اسم

আবশ্যক যা তার اسم এবং خبر হয়)। (৪) فعل -এর অর্থ দেয়ার ক্ষেত্রে। (৫) বিশেষ করে فعل متعدى -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে দু'টি اسم -এর উপর প্রবেশ করার দিক দিয়ে। আর এ জন্যই তাকে (ان -কে) فعل متعدى -এর عمل فرعى দেয়া হয়েছে তথা সে প্রথম অংশকে نصب এবং দ্বিতীয় অংশকে رفع প্রদান করে। এ বিষয়ের উপর অবগত করার জন্য যে, এটা আমলের দিক দিয়ে فعل -এর অনুগামী। আর কূফীগণ বলেন– حروف مشبهة بالفعل প্রবেশ করার পূর্বে خبر টি خبر হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع ছিল এবং তা حروف مشبهة بالفعل আসার পরও خبر -এর ভিত্তিতে مرفوع থাকবে এবং পূর্বের চাহিদা অনুযায়ী رفع -এর দাবীদার। সুতরাং حروف مشبهة بالفعل খবরকে رفع দিবে না।

তার জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে যে, خبر টি رفع -এর দাবীদার হওয়ার জন্য শর্ত হল সেটা عوامل لفظيه থেকে খালী হতে হবে। কেননা, كان -এর خبر টি عوامل لفظيه থেকে মুক্ত না থাকার কারণে رفع -এর দাবী করে না। আর عامل لفظى আসার কারণে তো (عامل لفظى থেকে মুক্ত থাকার) শর্তটি নষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং এ হরফগুলোরই আমল নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

ان -এর উপকারিতা হল– (১) نسبت বা সম্পর্ককে মযবুত ও দৃঢ় করা। এ জন্য ان টি جواب قسم -এর শুরুতে আসতে পারে। (২) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের প্রারম্ভে আনা যায়। (২) সন্দেহের স্থানে তাকে উল্লেখ করা যায়। (প্রশ্নের উত্তরে আসার উদাহরণ হল) يسئلونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له فى الارض (এ আয়াতে প্রশ্নের উত্তর তথা انا مكنا له فى الارض -এর মধ্যে ان এসেছে)। আর (সন্দেহের স্থানে আসার উদাহরণ হল) قال موسى: يافرعون انى رسول من رب العالمين (ফেরআউন তো মুসা (আ.) -এর নবুওতের ব্যাপারে সন্দীহান ছিল। তার সন্দেহকে দূর করার জন্য মুসা (আ.) নিজের নবুওত প্রমাণ করতে ان ব্যবহার করেছেন)।

তাছাড়া ইমাম মুবাররাদ (র.) বলেন, তোমার উক্তি عبدالله قائم (এর দ্বারা قيام সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে) আব্দুল্লাহ'র قيام সম্পর্কে সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য এবং ان عبدالله قائم (এটা) আব্দুল্লাহ'র قيام সম্পর্কে প্রশ্নকারীর উত্তরে আসে। আর ان عبدالله لقائم বাক্য আব্দুল্লাহ'র قيام অস্বীকাকারীর উত্তরে আসে।

وَتَعْرِيْفُ الْمَوْصُوْلِ إِمَّا لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بِه نَاسٌ بِأَعْيَانِهِمْ كَأَبِيْ لَهَبٍ وَأَبِي جَهْلٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَأَحْبَارِ الْيَهُوْدِ أَوْلِلْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا مَنْ صَمَّمَ عَلَى الْكُفْرِ وَغَيْرُهُمْ فَخُصَّ عَنْهُمْ غَيْرُ الْمُصِرِّيْنَ بِمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: الذين ইসমে মাওসূলটি عهدى না جنسى ?)

الذين ইসমে মাওসূলটি হয়তো عهدى-এর জন্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি, যেমন– আবু লাহাব, আবু জাহল, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেম-ওলামা। অথবা ইসমে মাওসূলটি جنسى -এর জন্য। যারা কুফরিতে অটল এবং যারা অটল নয় উভয় দল এতে অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর مسند তথা سواء ...الخ দ্বারা তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে যারা কুফরিতে অটল থাকে নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: عين مصداق الذين كفروا؟

উত্তর ঃ الذين كفروا-এর مصداق বা এর দ্বারা উদ্দেশ্য কারা তা নির্ভর করে الذين ইসমে মাওসূলের

উপর। যদি ইসমে মাওসূলটি عهدى-এর জন্য হয়, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে চিহ্নিত কয়েকজন লোক যেমন– আবু লাহাব, আবু জাহল, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেম-ওলামা। আর যদি ইসমে মাওসূলটি جنسى -এর জন্য হয় তাহলে এর দ্বারা সমস্ত কাফির উদ্দেশ্য। অতঃপর যারা পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গেছে তাদেরকে এ হুকুম থেকে খারিজ করা হয়েছে পরের سواء ......الخ শব্দ দ্বারা।

☆☆☆

وَالْكُفْرُ لُغَةً سَتْرُ النِّعْمَةِ وَأَصْلُهُ اَلْكَفْرُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ السَّتْرُ وَمِنْهُ قِيْلَ لِلزَّارِعِ وَاللَّيْلِ كَافِرٌ وَلِكُمَامِ الثَّمَرَةِ كَافُوْرٌ وَفِي الشَّرْعِ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِه وَإِنَّمَا عُدَّ لُبْسُ الْغِيَارِ وَشَدُّ الزِّنَارِ وَنَحْوُهُمَا كُفْرًا لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّكْذِيْبِ فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْتَرِئُ عَلَيْهَا ظَاهِرًا لَا لِأَنَّهَا كُفْرٌ أَنْفُسُهَا

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: كفر -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ)

كفر -এর শাব্দিক অর্থ হল নিয়ামত গুপন করা (এবং তার না-শুকরি করা)। মূলতঃ শব্দটি كَفْرٌ (كاف -এর) فتحه সহ ছিল; যার অর্থ হল ঢেকে ফেলা। আর তার থেকেই কৃষক এবং রাতকে (অভিধানিক অর্থে) كافر বলা হয়। (কেননা, কৃষক বীজকে মাটিতে ঢেকে ফেলে এবং রাত

সকল বস্তুকে তার আঁধারে লুকিয়ে ফেলে)। আর ফলের ছোলাকে كـــافـور বলা হয় (যার অর্থ হল অধিক গুপনকারী। কেননা, ছোলা তার ফলকে তার ভিতরে লুকিয়ে রাখে)। শরীয়তের দৃষ্টিতে كـفـر বলা হয়– রাসূল কর্তৃক যেসব জিনিস নিয়ে আসা সুনিশ্চিত প্রমাণিত তার কোন একটিকে অস্বীকার করা। তবে غيار ও زنار (বিধর্মীদের এক প্রকার টুপি) ইত্যাদি পরিধান করাকে কুফর বলা হয়েছে, তাতে মিথ্যাপ্রতিপন্ন প্রকাশ পাওয়ার কারণে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.) -কে বিশ্বাস করে সে প্রকাশ্যভাবে এসব বস্তু পরিধান করার সাহস করবে না। এগুলো মৌলিক কুফর হওয়ার কারণে কুফর বলা হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

মুসান্নিফ (র.) এখানে কুফর -এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে। তাই এ ব্যাপারে আর আলোচনা করব না। তবে এখানে একটি প্রশ্নোত্তর রয়ে গেছে যা জানা অতি জরুরী। তাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

একটি প্রশ্নোত্তর ঃ

قـولـه وانـمـا عـد لبس الغيار والزنار ....الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল– غيار ও زنـــار হল বিধর্মীদের এক প্রকার টুপি; যে মুসলমান এ টুপি পরিধান করবে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে; যদিও সে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়াদি বিশ্বাস করে থাকুক। অথচ সে كـــفــــر -এর সংজ্ঞার আওতায় আসে না। কেননা, কুফর বলা হয় অস্বীকার করাকে। বিধর্মীদের টুপি পরিধান করাকে কুফর বলা হয় না। তাই كفرٌ -এর সংজ্ঞাটি جامع ও পরিপূরক হল না।

এ প্রশ্নের উত্তর হল– বাস্তবেই কুফর বলা হয় অস্বীকার করাকে; কিন্তু বিধর্মীদের টুপি পরিধান করাকে কুফর বলা হয় তাতে মিথ্যাপ্রতিপন্ন পাওয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) -কে বিশ্বাস করে সে কখনো এধরনের কাজ করতে সাহস পাবে না।

☆☆☆

وَاحْتَـجَّـتِ الْـمُعْتَزِلَةُ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْاٰنِ بِلَفْظِ الْمَاضِيْ عَلٰى حُدُوْثِهٖ لِاِسْتِدْعَائِهٖ سَابِقًا مُخْبَرٌ عَنْهُ وَاُجِيْبَ بِاَنَّهٗ مُقْتَضَى التَّعَلُّقِ وَحُدُوْثُهٗ لَايَسْتَلْزِمُ حُدُوْثَ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْعِلْمِ

অনুবাদ:

(৬ষ্ঠ আলোচনা: মু'তাযিলাদের যুক্তি খণ্ডন)

আর কুরআনে অতীতকালজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা যে সংবাদ এসেছে তা দ্বারা মু'তাযিলারা কুরআন حـــادث তথা নশ্বর হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করে থাকে। কেননা, অতীতকালজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা কোন সংবাদ প্রদানের জন্য শর্ত হল, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা পূর্বে সংঘটিত হওয়া। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, مـخـبر عنه তথা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা অতিবাহিত হওয়াটা সম্পর্কের দাবী। আর এটা حـــادث হওয়ার কারণে কালামুল্লাহ حـــادث হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন ইলম গুণের মধ্যে হয়ে থাকে।

কুরআন কি নশ্বর?

উত্তর: বিষয়টি বিরোধপূর্ণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআন নশ্বর নয়; বরং قديم বা অবিনশ্বর। আর মু'তাযিলাদের মতে, কুরআন নশ্বর। এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শরহে আকাইদে নসফীতে। তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না। শুধু ম'তাযিলাদের পেশকৃত দলীলটির জবাব দেয়া হবে।

মু'তাযিলাদের দলীল: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ماضى -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন অত্র আয়াতে। كفروا শব্দ এসেছে। আর ماضى -এর দাবী হল مخبر عنه তথা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেটা সংবাদের পূর্বে অতিবাহিত হওয়া অত:পর ماضى দ্বারা সেই সংবাদ দেয়া। আর যে বস্তু অন্য বস্তুর অস্তিত্বের পরে অস্তিত্বে আসে সেটা حادث বা নশ্বর হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কুরআন নশ্বর।

মু'তাযিলাদের যুক্তি খন্ডন: তাদের যুক্তি খন্ডনে আমরা বলবো, কালামে নফসী যেটা আল্লাহ তা'লার একটি গুণ সেটা কদীম বা অবিনশ্বর; এই কালামে নফসী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। বরং ماضى যেটা مخبر عنه তার পূর্বে অতিবাহিত হওয়ার দাবী করে সেটা এই কালামে নফসীর অর্থ ও দাবী নয়। বরং এই مخبر عنه -এর সাথে কালামে নফসীর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই সম্পর্কের দাবী ও অর্থ। তাই এর দ্বারা বড়জোর সম্পর্কের নশ্বরতা আবশ্যক হবে; সেই কালামে নফসীর নশ্বরতা আবশ্যক হবে না।

☆☆☆

﴿سواء عليهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم﴾

"আপনি তাদেরকে ভয় দেখান বা না দেখান তাদের জন্য সমান"

এখানে মুসান্নিফ (র.) চারটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: আয়াতের তারকীব। ২য় আলোচনা: আয়াতে همزه ও ام আনার কারণ। ৩য় আলোচনা: انذار -এর তাহকীক এবং بشارة তথা সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ না হওয়ার কারণ। ৪র্থ আলোচনা: أأنذرتهم -এর কেরাতসমূহ।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ خَبَرُ اِنَّ وَ سَوَاءٌ اِسْمٌ بِمَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ نُعِتَ بِهِ كَمَا نُعِتَ بِالْمَصَادِرِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ. رَفْعٌ بِاَنَّهُ خَبَرُ اِنَّ وَمَا بَعْدَهُ مُرْتَفِعٌ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ كَاَنَّهُ قِيْلَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِنْذَارُكَ وَ عَدَمُهُ. اَوْ بِاَنَّهُ خَبَرٌ لِمَا بَعْدَهُ بِمَعْنٰى اِنْذَارُكَ وَ عَدَمُهُ عَلَيْهِمْ وَالْفِعْلُ اِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْاِخْبَارُ عَنْهُ اِذَا اُرِيْدَ بِهِ تَمَامُ مَا وُضِعَ لَهُ اَمَّا لَوْ اُطْلِقَ وَ اُرِيْدَ بِهِ اللَّفْظُ وَ

مَـطْـلَـقُ الْـحُـدُوْثِ الْـمَـدْلُوْلِ عَلَيْهِ ضِمْنًا عَلَى الْاِتِّسَاعِ فَهُوَ كَا الْاِسْمِ فِي الْاِضَافَةِ وَالْاِسْنَادِ اِلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالٰى: اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا. يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ. وَقَوْلُهُمْ: تَسْـمَـعُ بِـالْمُعَيْدِىْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ. وَاِنَّمَا عُدِلَ هٰهُنَا عَنِ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفِعْلِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِيْهَامِ التَّجَدُّدِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: আয়াতের তারকীব)

سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم এ আয়াতটি (পূর্বের) ان -এর خبر হয়েছে আর سواء টি استواء -এর অর্থে ব্যবহৃত। যেভাবে অন্যান্য মাসদার দ্বারা (কোন সত্তার مبالغة হিসেবে) সিফাত আনা যায় তদ্রূপ سواء শব্দ দ্বারাও সিফাত আনা যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم (এ আয়াতে سواء শব্দ দ্বারা كلمة -এর সিফাত আনা হয়েছে)। سواء টি ان -এর خبر হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে আর তার পরবর্তী অংশ (তথা أأنذرتهم ام لم تنذرهم মুফরাদের তাবীলে) فاعل -এর ভিত্তিতে مرفوع হয়েছে। কেমন যেন এরূপ বলা হয়েছে– ان الذين كفروا سواء عليهم انذارك و عدمه । অথবা سواء তার পরবর্তী অংশের خبر হয়েছে আর পরবর্তী অংশ انذارك و عدمه -এর অর্থে مبتدا । আর فعل মুসনাদ ইলাইহি হওয়া তখন নিষিদ্ধ, যখন তার দ্বারা তার পূর্ণ গঠনকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে। কিন্তু যখন তার দ্বারা لفظ فعل এবং শুধু মাসদারী অর্থ উদ্দেশ্য হবে, তখন সেই ফে'লটি اضافت ও مسند اليه হওয়ার দিক থেকে ইসমের ন্যায় হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– اذا قيل لهم امنوا এবং يوم ينفع الصادقين صدقهم এবং আরবের উক্তি– تسمع بالمعيدى خير من ان تراه । তবে এখানে মাসদার না এনে فعل এনেছেন কারণ, ফে'লের মধ্যে تجدد (নতুনত্ব) -এর অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

﴿سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم﴾
السوال: اكتب وجوه الاعراب لهذه الاية

উত্তর ঃ

আয়াতের তারকীব ঃ এ আয়াতের দু'টি তারকীব হতে পারে। যথা–

১. سواء পূর্বের ان -এর خبر আর أأنذرتهم হল سواء -এর فاعل তখন سواء টি مستو অর্থে ব্যবহৃত হবে।

২. سواء টি خبر مقدم আর أأنذرتهم ام لم تنذرهم মুফরাদের তাবীলে مبتدا مؤخر । এই সূরতে আয়াতের মূল রূপ হবে– انذارك وعدم انذارك سيان عليهم ।

কিন্তু উভয় তারকীবের উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আমরা জানি فعل সর্বদা مسند হয়; কিন্তু مسند اليه হয় না। আর এখানে উভয় তারকীবের মধ্যে أأنذرت এবং لم تنذر -কে مسند اليه সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ এটা فعل । সুতরাং উভয় তারকীব কিভাবে সঠিক হল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন– فعل -এর ভিতর তিনটি অংশ থাকে।

نسبت (৩) معنى مصدرى (১) তথা মাসদারী অর্থ (২) اقتران بالزمان তথা কালের সাথে সম্পর্ক রাখা (৩) نسبت তথা فاعل -এর প্রতি সম্বন্ধ হওয়া। যখন فعل দ্বারা এ তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য নেয়া হবে, তখন الى الفاعل টি فعل হতে পারবে না। কিন্তু যদি فعل দ্বারা শুধু معنى مصدرى উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে مسند اليه ইসমের ন্যায় হয়ে مضاف اليه এবং مسند اليه হতে পারবে। فعل টি مضاف اليه হয়েছে তার উদাহরণ যেমন– يوم ينفع الصادقين صدقهم এখানে يوم যা فعل হল ينفع মুযাফের مضاف اليه হয়েছে যা ইসমের বৈশিষ্ট্য। কেননা, ينفع -এর মধ্যে কোন কালের উদ্দেশ্য করা হয়নি তাই ফে'ল হওয়া সত্ত্বেও مضاف اليه হতে পেরেছে।

আর فعل টি مسند اليه হয়েছে তার উদাহরণ যেমন– تسمع بالمعيدى خير من ان تراه (মুআইদিকে দেখার চেয়ে তার সম্পর্কে সংবাদ শোনা তোমার জন্য শ্রেয়) এখানে تسمع টি فعل হওয়া সত্ত্বেও مسند اليه তথা مبتدا হয়েছে। কেননা, তার থেকে زمانه খালি করতঃ তাকে سماعك -এর অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে।

তদ্রূপ فعل দ্বারা শুধু ফে'ল শব্দটি উদ্দেশ্য নিলে তা مسند اليه হওয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– اذا قيل لهم امنوا এখানে امنوا শব্দটি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তাই قيل -এর مفعول হতে পেরেছে।

সারকথা, أنذرت এবং لم تنذر দ্বারা শুধু معنى مصدرى উদ্দেশ্য। তাই এ উভয়টি مسند اليه হতে পেরেছে। অতএব أأنذرتهم ام لم تنذرهم -এর মূল রূপ হবে انذارك و عدم انذارك । فلا اشكال و لا اعتراض

☆☆☆

وَحَسُنَ دُخُوْلُ الْهَمْزَةِ وَ أَمْ عَلَيْهِ لِتَقْرِيْرِ مَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ وَ تَاكِيْدِه لِاَنَّهُمَا جُرِّدَتَا عَنْ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ لِمُجَرَّدِ الْاِسْتِوَاءِ كَمَا جُرِّدَتْ حُرُوْفُ النِّدَاءِ عَنِ الطَّلَبِ لِمُجَرَّدِ التَّخْصِيْصِ فِيْ قَوْلِهِمْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا اَيَّتُهَا الْعِصَابَةَ۔

অনুবাদ:

দ্বিতীয় আলোচনা: همزه এবং ام আনার কারণ

আর استواء -এর অর্থকে মজবুত ও দৃঢ় করার জন্য فعل -এর শুরুতে همزه ও ام আসা উত্তম হয়েছে। কেননা, همزه ও ام -কে استفهام -এর অর্থ থেকে মুক্ত করে নেয়া হয়েছে যেভাবে হরফে নেদাকে طلب -এর অর্থ থেকে খালি করে শুধুমাত্র تخصيص -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আরবের উক্তি– اللهم اغفر لنا ايتها العصابة (হে আল্লাহ! বিশেষ করে আমাদের এই জামাতকে ক্ষমা করুন)।

قوله: وحسن دخول الهمزة و أم عليه لتقرير معنى الاستواء و تاكيده الخ

- السوال: شرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর ঃ

قوله وحسن دخول الهمزة و أم عليه لتقرير معنى الاستواء و تاكيده الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল– همزه ও ام এ দু'টি হরফ استفهام -এর অর্থ প্রদান করে এবং বাক্যের শুরুতে আসে। কিন্তু আয়াতের মধ্যে তো উভয়টি এসেছে বাক্যের মধ্যখানে। সুতরাং همزه ও ام বাক্যের মধ্যখানে আসলো কিভাবে?

এর উত্তর দিতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন– همزه ও ام -এর মধ্যে যেভাবে استفهام -এর অর্থ বিদ্যমান সেভাবে উভয়ের মধ্যে استواء (বরাবরি) -এর অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। আর আয়াতের মধ্যে উভয়টিকে استفهام -এর অর্থ থেকে খালি করে শুধু استواء (বরাবরি) -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল, حرف نداء -কে কখনো طلب -এর অর্থ থেকে খালি করে تخصيص -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা, হরফে নেদার মধ্যে দু'টি অর্থ পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে আহবান করা এবং অপরটি হচ্ছে আহবানকৃত ব্যক্তিকে আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির সাথে বিশেষিত করা। এ দু'টি অর্থ থেকে শুধু تخصيص -এর অর্থ রেখে طلب -এর অর্থ থেকে হরফে নেদাকে খালি করে নেয়া হয়। যেমন আহলে আরবের উক্তি– اللهم اغفر لنا ايتها العصابة (হে আল্লাহ! বিশেষ করে আমাদের এই জামাতকে ক্ষমা করুন)। এখানে ايتها হরফে নেদাকে শুধু تخصيص -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; এর দ্বারা আহবান করা উদ্দেশ্য নয়। তদ্রূপ আয়াতের মধ্যে همزه ও ام প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং تاكيد -এর জন্য ব্যহার হয়েছে। অর্থাৎ এক তো তার ভিতরে استواء -এর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে এবং অপর দিকে سواء -এর অর্থও হল استواء সুতরাং همزه ও ام আসার কারণে استواء -এর অর্থটি আরো মজবুত হল।

☆☆☆

وَالْإِنْذَارُ اَلتَّخْوِيْفُ أُرِيْدَ بِهِ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ دُوْنَ الْبِشَارَةِ لِأَنَّهُ اَوْقَعُ فِي الْقَلْبِ وَ اَشَدُّ تَاثِيْرًا فِي النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ اَهَمُّ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ فَإِذَا لَمْ يَنْفَعْ فِيْهِمْ كَانَتِ الْبِشَارَةُ بِعَدَمِ النَّفْعِ اَوْلٰى۔

অনুবাদ:____

৩য় আলোচনা: انذار শব্দের তাহকীক এবং بشارة তথা সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ না হওয়ার কারণ

আর انذار -এর অর্থ হল– ভীতি প্রদর্শন করা। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার আযাব থেকে ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'লা শুধু انذار (ভয় দেখানো) -এর কথা উল্লেখ করেছেন; بشارة (সুসংবাদ প্রদান) -এর কথা উল্লেখ করেননি কারণ, انذار (ভয় দেখানো) بشارة (সুসংবাদ প্রদান) -এর তুলনায় অন্তরে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী। কেননা, انذار -এর মধ্যে রয়েছে دفع مضرت

তথা ক্ষতিকারককে প্রতিহত করা আর دفع مضرت টা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও যখন انذار তাদের (কাফিরদের) জন্য উপকারে আসলো না তাহলে بشارت বা সুসংবাদ প্রদান তো তাদের হকে উপকারে আসবেই না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى الانذار و ما المراد به؟
(ب) لم اكتفى سبحانه وتعالى بذكر الانذار دون التبشير؟

উত্তর ঃ

(الف) انذار **শব্দের অর্থ ঃ** انذار **শব্দটি বাবে** افعال -এর মাসদার অর্থ– ভয়ভীতি প্রদর্শন করা। এখানে ভীতি প্রদর্শন করা বলতে আল্লাহ তা'লার আযাব ও গযব থেকে ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য।

(ب) এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা শুধুমাত্র انذار ভীতি প্রদর্শন করার কথা বললেন; কিন্তু تبشير সুসংবাদ প্রদানের কথা বলেননি। অথচ রাসূলকে যেভাবে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে তেমিন তিনি প্রেরিত হয়েছেন সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবেও। তাহলে অত্র আয়াতে শুধু انذار -এর কথা উল্লেখ করলেন কেন?

এর উত্তর হল– انذار (ভীতি প্রদর্শন) বান্দার জন্য تبشير (সুসংবাদ প্রদান) -এর তুলনায় অধিক উপকারী। কেননা, انذار -এর অর্থের মধ্যে রয়েছে دفع مضرت (ক্ষতিকারককে প্রতিহত করা) আর تبشير -এর অর্থে আছে جلب منفعت (কল্যাণ অর্জন করা)। আর دفع مضرت টা جلب منفعت -এর তুলনায় অতি উত্তম। অধিকন্তু এ সব কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন ক রে কোন লাভ হয়নি সুতরাং সুসংবাদ প্রদানের দ্বারা যে লাভ হবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আল্লাহ তা'লা শুধুমাত্র انذار -এর কথা উল্লেখ করেছেন।

☆☆☆

أَأَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَ تَخْفِيْفِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ. وَقَلْبِهَا اَلِفًا وَهُوَ لَحْنٌ لِأَنَّ الْمُتَحَرِّكَ لَا تُقَلَّبُ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّيْ اِلَى جَمْعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّهٖ وَ بِتَوْسِيْطِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا مُحَقَّقَيْنِ وَبِتَوْسِيْطِهَا وَالثَّانِيَةُ بَيْنَ بَيْنَ وَبِحَذْفِ الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ وَبِحَذْفِهَا وَإِلْقَاءِ حَرْكَتِهَا عَلَى السَّاكِنِ۔

অনুবাদ:

৪র্থ আলোচনা: أأنذرتهم **-এর কেরাতসমূহ**

أأنذرتهم (-এর মধ্যে সাতটি কেরাত) (১) উভয় হামযাকে বহাল রেখে (২) প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টিকে بين بين তথা দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির হরকত অনুযায়ী হরফে ইল্লত আলিফ এবং হামযার মাখরাজের মাঝামাঝি উচ্চারণ করা (৩) প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ দ্বারা বদল করে; তবে এ কেরাতটি ভুল। কারণ, (আরবী ভাষায়) হরকতবিশিষ্ট হামযা (অলিফ দ্বারা) বদল হয় না। তাছাড়া اجتماع ساكنين على غير حده লাযিম হয়। (৪) উভয় হামযাকে রেখে উভয়ের মাঝখানে আলিফ

অতিরিক্ত করে। (৫) উভয়ের মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে দ্বিতীয় হামযাকে بين بين করে পড়া। (৬) হামযা ইস্তেফহাম তথা প্রথমটিকে হযফ করে। (৭) হামযা ইস্তেফহামকে হযফ করে তার হরকত তার পূর্বাক্ষর তথা عليهم -এর মীমে স্থানান্তরিত করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قرأة فى أأنذرتهم وما هى؟

উত্তর

أأنذرتهم -**এর মধ্যে মোট ৭টি কেরাত:**

১. أَأَنْذَرْتَهُمْ (উভয় হামযাকে রেখে)

২. أَأَنْذَرْتَهُمْ (প্রথম হামযাকে রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে بين بين করে পড়া)

৩. آنْذَرْتَهُمْ (প্রথমটিকে রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ বানিয়ে)

৪. أَاأَنْذَرْتَهُمْ (উভয়টির মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে)

৫. أَاأَنْذَرْتَهُمْ (উভয়টির মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে এবং দ্বিতীয়টিকে بين بين করে)

৬. أَنْذَرْتَهُمْ (হামযা ইস্তেফহামকে হযফ করে)

৭. হামযা ইস্তেফহামকে হযফ করে এবং তার হরকতকে তার পূর্ববর্তী মীমে স্থানান্তরিত করে যেমন- عليهمَ أَنْذَرْتَهُمْ

☆☆☆

﴿لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

"তারা ঈমান আনবে না"

এই বাক্য সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: তারকীব। ২য় আলোচনা: সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব আরোপ কি বৈধ। ৩য় আলোচনা: কাফিরদের জন্য ভীতি প্রদর্শন না হওয়া সত্বেও রাসূলকে ভীতি প্রদর্শনের আদেশ দেয়া হলো কেন?

لَايُؤْمِنُوْنَ: جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ لِإِجْمَالِ مَا قَبْلَهَا فِيْمَا فِيْهِ الْإِسْتِوَاءُ فَلَا مَحَلَّ لَهَا أَوْ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بَدْلٌ عَنْهُ أَوْ خَبَرُ إِنَّ وَالْجُمْلَةُ قَبْلَهَا اِعْتِرَاضٌ بِمَا هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ-

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: তারকীব)

لايؤمنون এটা جملہ مفسرہ তথা পূর্বে যে استواء বরাবরির কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং বাক্যটির اعراب -এর কোন স্থান নেই। অথবা حال مؤكده হয়েছে অথবা بدل হয়েছে অথবা ان -এর خبر হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী জুমলা (তথা سواء عليهم) হুকুমের কারণ বর্ণনার্থে جملہ معترضہ হবে।

قوله تعالى: لايؤمنون

السوال: اكتب وجوه الاعراب

উত্তর ঃ

বাক্যের তারকীব ঃ لايؤمنون এই বাক্যের তিনটি তারকীব। যথা–

১.لايؤمنون বাক্যটি جملہ مفسرہ তথা পূর্ববর্তী سواء عليهم বাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, سواء عليهم-এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য বরাবর; কিন্তু কোন বিষয়ে বরাবর তা এই বাক্যের মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে ভয় দেখানো হোক বা না হোক তাদের জন্য বরাবর তারা ঈমান আনবে না। এমতাবস্থায় এই বাক্যের কোন محل اعراب থাকবে না।

২.لايؤمنون টি عليهم-এর هم যমীর অথবা أأنذرتهم-এর هم ضمير منصوب থেকে حال হয়েছে। مؤكده حال সেই حال-কে বলে, যা তার পূর্ববর্তী জুমলার ভাবার্থকে তাকীদ করার জন্য আসে। এখানে তাকীদ এভাবে হয়েছে যে, পূর্বে বলা হয়েছে কাফিরদেরকে ভয় দেখানো হোক বা না হোক তাদের জন্য বরাবর অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে না। এই অর্থকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্য لايؤمنون বাক্যটি এসেছে।

৩.لايؤمنون টি أأنذرتهم سواء عليهم থেকে بدل হয়েছে।

৪. পূর্বের ان-এর خبر। এমতাবস্থায় سواء عليهم أأنذرتهم বাক্যটি جملہ معترضه হবে এবং لايؤمنون-এর علت হবে। অর্থাৎ তাদের ঈমান না আনার কারণ হল ভীতি প্রদর্শন তাদের কোন উপকারে আসেনি।

☆☆☆

وَالْاٰيَةُ مِمَّا اِحْتَجَّ بِهٖ مَنْ جَوَّزَ تَكْلِيْفَ مَا لَايُطَاقُ فَاِنَّهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَخْبَرَ عَنْهُمْ بِاَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ وَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ فَلَوْ اٰمَنُوْا اِنْقَلَبُوْا خَبَرَهٗ كِذْبًا وَشَمُلَ اِيْمَانُهُمْ الْاِيْمَانَ بِاَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ فَيَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ وَالْحَقُّ اَنَّ التَّكْلِيْفَ بِالْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهٖ وَاِنْ جَازَ عَقْلًا مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْاَحْكَامَ لَايَسْتَدْعِيْ غَرَضًا سِيَّمَا الْاِمْتِثَالُ لٰكِنَّهٗ غَيْرُ وَاقِعٍ لِلْاِسْتِقْرَاءِ وَالْاِخْبَارُ بِوُقُوْعِ الشَّيْئِ اَوْ عَدَمِهٖ لَايَنْفِى الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ كَاِخْبَارِهٖ تَعَالٰى عَمَّا يَفْعَلُهٗ هُوَ اَوِ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِهٖ۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পন কি বৈধ?)

অত্র আয়াতটি সেসব প্রমাণাদির অন্তর্ভুক্ত যেগুলো দ্বারা تكليف ما لايطاق (সাধ্যাতীত কাজের) দায়িত্ব অর্পনের বৈধতার প্রবক্তাগণ প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা (নির্দিষ্ট) কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। আবার তাদেরকে

ঈমান গ্রহণ করার আদেশও দিয়েছেন। এখন যদি তারা ঈমান গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তা'লার সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া যদি তারা ঈমান গ্রহণ করে তাহলে তারা এ কথার উপরও ঈমান আনতে হবে যে, তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং পরস্পর বিরোধ দু'টি বিষয় একত্রিত হয়ে যাবে (যা অসম্ভব)। তবে সত্য কথা হল যে, ممتنع لذاته -এর হুকুম প্রদান যদিও যৌক্তিকভাবে জায়েয। কারণ, (আল্লাহর হুকুম) কোন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় বিশেষ করে আদেশ পালন করা উদ্দেশ্য নয়; তবে অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, তা বাস্তবে ঘটেনি। (তাদের প্রমাণের জবাব হল যে,) কোন বস্তুর সংঘটিত হওয়া এবং না হওয়ার সংবাদ তার থেকে সামর্থ্য দূরীভূত হয় না। যেমন আল্লাহ কর্তৃক সেই বিষয়ের সংবাদ প্রদান যা তিনি স্বয়ং করবেন অথবা বান্দা তার স্ব-ইচ্ছায় করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: هل يجوز تكليف ما لا يطاق وكيف احتج من جوزه بهذه الاية؟

উত্তর ঃ

تكليف ما لا يطاق সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ কি বৈধ?

মাসআলা হল, বান্দাকে ما لا يطاق অর্থাৎ এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার সাধ্য-সামর্থের বাইরে জায়েয কী না? জায়েয হলে বাস্তবেও তা হয়েছে কি না?

মাসআলাটি বিশদ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সার সংক্ষেপ হচ্ছে, ما لا يطاق বা সামর্থের বাইরে কাজ তিন প্রকার।

(১) সত্তাগতভাবে অসম্ভব। যেমন, দু'টি বিপরীতমূখী বস্তুকে একত্র করা।

(২) কাজটি সত্তাগতভাবে সম্ভব বটে কিন্তু সত্তাগতভাবে বান্দার পক্ষে সে কাজ করা অসম্ভব। যেমন, মহাশূণ্যে বা বাতাসে উড়ে বেড়ানো। দেহ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

(৩) বস্তুতঃ বান্দার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর ইলমে উক্ত কাজ বান্দার পক্ষ থেকে না হওয়া কিংবা আল্লাহর ইচ্ছা বান্দা থেকে উক্ত কাজ প্রকাশ না পাওয়া চূড়ান্ত হয়ে আছে। সুতরাং ঐ কাজ বান্দার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেলে আল্লাহর ইলম ভুল হওয়া এবং আল্লাহ তা'লা স্বীয় ইচ্ছায় ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। অথচ তা অসম্ভব। আর যে সম্ভাবনা বা সম্ভাব্য বস্তু কোন অসম্ভাব্যতাকে অবশ্যম্ভাবী করে, তাকে محال بالغير (অন্যের কারণে অসম্ভ) বলে। এ সূত্রে উক্ত কাজটি সত্তাগতভাবে সম্ভব তবে অন্যের কারণে অসম্ভব।

☆ সুতরাং ما لا يطاق -এর প্রথম প্রকার محال بالذات বা সত্তাগতভাবে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা অদৌ জায়েয নয় এবং বাস্তব সম্মতও নয়। জমহুরের অভিমতও তা-ই। কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐক্যমতের দাবীও করেছেন। অবশ্য মতৈক্যের এ দাবী বিশুদ্ধ নয়। কেননা, বহু আশায়েরা যদিও সত্তাগতভাবে অসম্ভব কাজের দায়িত্ব অর্পণ কার্যকরী মনে করেন না, কিন্তু জায়েয বলেন। কেননা, আল্লাহর কাজ নিকৃষ্ট বা খারাপ নয়। পক্ষান্তরে বৈধতা অস্বীকার কারীরা বলেন– সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা করা অসম্ভব। আর যে জিনিসের কল্পনা করা যায় না, তা মজহুলে মুতলাক বা সম্পূর্ণ অজানা। কাজেই সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর এমন অজানা বিষয়ের উপর কোন

জিনিসের হুকুম বর্তানো বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং এর উপর দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো এবং সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ বলাও বিশুদ্ধ নয়।

কিন্তু বৈধতার পক্ষপাতিরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজানা হওয়ার কারণে তার উপর মুকাল্লাফ বানানো বা দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে এর উপর অবৈধতার হুকুম লাগানোও বিশুদ্ধ নয়।

☆ আর ما لا يطاق -এর তৃতীয় প্রকার তথা সত্তাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ এবং বাস্তবও তা-ই। যেমন, আবূ জাহল, আবূ লাহব প্রমুখ কাফিরদের ব্যাপারে যদিও আল্লাহর অনাদি জ্ঞান ছিল– তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। যদ্দরুন তাদের ঈমান গ্রহণ সত্তাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব ছিল। তদুপরি আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ঈমান গ্রহণের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। কেননা, সত্তাগতভাবে ঈমান গ্রহণ করা তাদের সাধ্য-সামর্থের মধ্যে ছিল। আল্লাহ পাকের এর বিপরীত ইলম থাকার কারণে তাদের শক্তি-সামর্থ দূরীভূত হয়নি। অথচ দায়িত্ব অর্পণ নির্ভর করে সামর্থ্য ইচ্ছা বহাল থাকার উপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন কোন গবেষক এ প্রকারকে ما لا يطاق (সামর্থের বাইরে) গণ্য করেন নি।

☆ ما لا يطاق -এর দ্বিতীয় প্রকার তথা যা বস্তুতঃ সম্ভব। কিন্তু বান্দা কর্তৃক তা বাস্তবে সম্পাদিত হওয়া সত্তাগতভাবে অসম্ভব। যেমন, বাতাসে উড়ে বেড়ানো, দেহ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। সুতরাং এ প্রকারের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়া সতঃসিদ্ধ।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলারা এর বৈধতা অস্বীকার করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে– বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব, যৌক্তিকভাবে নিকৃষ্ট এবং খারাপ। তাছাড়া আল্লাহর দিকে খারাপ কাজের সম্বন্ধ করা বৈধ নয়। কাজেই বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা জায়েয নয়, যা স্বভাবতই তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আশায়েরারা ما لا يطاق -এর উল্লেখিত প্রকারকে জায়েয সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তা'লা বান্দার প্রকৃত মালিক। মালিকের জন্য তার অধিনস্থের উপর সব ধরনের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। বান্দার উপর তার কোন অধিকার প্রয়োগ বা হস্তক্ষেপ নিকৃষ্ট নয়। কাজেই বান্দাকে ما لا يطاق -এর দায়িত্ব অর্পণ করাও আল্লাহর জন্য নিকৃষ্ট হবে না।

কেউ কেউ لا يكلف الله نفسا الا وسعها আয়াত কারীমা, যাতে সাধ্যতীত কাজের দায়িত্ব অর্পন বাস্তবে না হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা উক্ত বিষয়ের অবৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, তা যদি জায়েয হত, তার বাস্তবতা মানার কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যক হত না। কারণ, সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মানলে অসম্ভাব্যতা আবশ্যক হয় না। অথচ তার বাস্তবতা মানলে অসম্ভ্যাবতা তথা আল্লাহর কালাম لا يكلف الله نفسا الا وسعها মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয়। এতে বুঝা গেল, সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ জায়েয নয়। এ প্রমাণের ব্যাপারে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এটি একটি ভ্রান্তি যার দ্বারা ঐ সকল অসম্ভব বস্তু প্রমাণ করা হয়, যার বিপরীত জিনিসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা-এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট। যেমন বলা হল– আবূ জাহল, আবূ লাহব প্রমুখ কাফিরের ঈমান গ্রহণ যদি সম্ভব হত, তাহলে তাদের ঈমান আনয়নের কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যক হত না। কেননা, সম্ভাব্য বস্তুকে বাস্তবে মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হয় না। অবশ্য তাদের ঈমান গ্রহণের ফলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হত অর্থাৎ

আল্লাহর জ্ঞান মিথ্যা হওয়া এবং তার ইচ্ছা অকার্যকর হওয়া আবশ্যক হত। কেননা, আল্লাহর জ্ঞান এবং ইচ্ছা -এখতিয়ার سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون -এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং বুঝা গেল, এসব কাফিরের ঈমান গ্রহণ সম্ভব ছিল না; বরং অসম্ভব ছিল।

উক্ত সমস্যার সমাধান ঃ প্রমাণ দাতার উক্তি "সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হয় না" –বিশুদ্ধ নয়। কারণ, হতে পারে একটি বস্তু সত্তাগতভাবে সম্ভব অথচ ভিন্ন কারণে অসম্ভাব্যতা আবশ্যক হবে।

অনুরূপভাবে সাধ্যাতীত কাজ সত্তাগতভাবে সম্ভব। কিন্তু ভিন্ন কারণে তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনস্তিত্বের সংবাদ দেওয়ার কারণে বাস্তবে হওয়া অসম্ভব। এ হিসেবে তার বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হতে পারে।

☆☆☆

وَفَائِدَةُ الْإِنْذَارِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يَنْجَحُ اِلْزَامُ الْحُجَّةِ وَحِيَازَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضْلَ الْإِبْلَاغِ لِذَالِكَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ سَوَاءٌ عَلَيْكَ كَمَا قَالَ لِعَبَدَةِ الْاَصْنَامِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوْهُمْ أَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ فِي الْاٰيَةِ اَلْاِخْبَارُ بِالْغَيْبِ عَلٰى مَا هُوَ بِهِ اِنْ أُرِيْدَ بِالْمَوْصُوْلِ اَشْخَاصٌ بِاَعْيَانِهِمْ فَهِيَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ۔

অনুবাদ:

ভীতি প্রদর্শন সর্বাবস্থায় উপকারী

ভয়-ভীতি কাফিরদের জন্য উপকারী হবে না তা জানা সত্বেও (আল্লাহ তা'লা রাসূলকে ভীতি প্রদর্শন করার আদেশ দিয়েছেন দু'টি উপকারার্থে) (১) এর দ্বারা উপকারিতা হল, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পরিপূর্ণ করার জন্য এবং (২) যাতে রাসূলের তাবলীগের ফজীলত অর্জিত হয়। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা'লা سواء عليهم (তাদের জন্য বরাবর) বলেছেন; سواء عليك (তোমার জন্য বরাবর) বলেননি। যেভাবে মূর্তিপূজারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন– سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ("তোমরা এসব মূর্তিদেরকে ডাক বা না ডাক তোমাদের জন্য বরাবর; এতে তোমাদের কেন উপকার নেই)।

অত্র আয়াতে অদৃশ্যের যে সংবাদ দেয়া হয়েছে তা বাস্তবসম্মত হয়েছে; যদি موصول তথা الذين দ্বারা নির্দিষ্ট কাফির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এটা (কুরআন ও নবীর সত্যতার উপর) একটি মু'জিযা ও দলীল।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هي فائدة الانذار بعد العلم انهم لا يؤمنون قط؟

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, নির্দিষ্ট কাফিরদের ব্যাপারে যখন এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল যে, তারা আর ঈমান আনবে না কাজেই তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেও তাদের কোন উপকার হবে না।

এতদসত্ত্বেও রাসূলকে ভীতি প্রদর্শনের আদেশ দেয়া হল কেন? এতে তো কোন উপকার দেখা যাচ্ছে না?

উত্তর: রাসূলকে ভীতি প্রদর্শনের আদেশ দুই কারণে দেয়া হয়েছে। (১) প্রমাণ পরিপূর্ণ করার জন্য। অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের দিন এ কথা বলে বাঁচতে পারবে না যে, আমাদের কাছে কোন দাওয়াত পৌঁছেনি; তাই আমরা ঈমান গ্রহণ করিনি। (২) এ ভীতি প্রদর্শন যদিও তাদের জন্য কোন উপকারে আসেনি কিন্তু এর দ্বারা রাসূল নিশ্চিত সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'লা অত্র আয়াতে سواء عليهم (ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা তাদের জন্য বরাবর) বলেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে سواء عليك (তোমার জন্য বরাবর) বলেননি।

☆☆☆

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কান সমূহকে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ সমূহের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছেন''

অত্র আয়াত সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) মোট ৯টি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র এবং ختم শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: غشاوة শব্দের তাহকীক। ৩য় আলোচনা: আয়াতে ختم ও غشاوة দ্বারা উদ্দেশ্য কি। ৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন। ৫ম আলোচনা: আল্লাহ তা'লার দিকে ختم -এর যে নিসবত করা হয়েছে তা حقيقى না مجازى ? ৬ষ্ঠ আলোচনা: على سمعهم -এর عطف হয়েছে على قلوبهم -এর উপর; তার প্রমাণ। ৭ম আলোচনা: على -কে তাকরার আনার এবং سمع -কে একবচন ব্যবহার করার কারণ। ৮ম আলোচনা: ابصار শব্দের তাহকীক এবং بصر , قلب , سمعদ্বারা কি উদ্দেশ্য? ৯ম আলোচনা: غشاوة -এর তারকীব ও কেরাতসমূহ।

تَعْلِيْلٌ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ وَبَيَانُ مَا يَقْتَضِيْه . وَالْخَتْمُ : اَلْكَتْمُ سُمِّىَ بِهِ الْاِسْتِيْثَاقُ مِنَ الشَّيْئِ بِضَرْبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ كَتْمٌ لَهٗ وَالْبُلُوْغُ اٰخِرَهٗ نَظْرًا اِلٰى اَنَّهٗ اٰخِرُ فِعْلٍ يَفْعَلُ فِىْ اِحْرَازِه۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং ختم শব্দের তাহকীক)

এ আয়াতটি পূর্ববর্তী হুকুম (তথা তাদের ঈমান না আনা) -এর কারণ এবং সেই হুকুমকে যা আবশ্যক করে তার বিবরণ। ختم অর্থ– গোপন করা। কোন বস্তুর উপর মোহর মেরে তাকে হেফাজত করাকেও ختم বলা হয়। কেননা, এর দ্বারা বস্তুটি অন্য থেকে গোপন হয়ে যায়। আবার কোন বস্তুর শেষ প্রান্তে পৌঁছাকেও ختم বলা হয় এ হিসেবে যে,বস্তুটির সংরক্ষণের জন্য সর্বশেষে মোহরা মারা হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة
السوال: (الف) اكتب ربط الاية بما قبلها
(ب) ما معنى الختم ؟

উত্তর ঃ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ঃ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হোক বা না হোক তারা ঈমান আনবে না। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাদের ঈমান না আনার পিছনে কারণ কি? কাজেই আল্লাহ তা'লা এখন এ আয়াতের মধ্যে সেই কারণটি বলে দিয়েছেন যে, তাদের ঈমান না আনার কারণ হল– তাদের দুষ্ঠোমির কারণে আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর ও কর্ণকে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুতে ঢেলে দিয়েছেন পর্দা।

ختم **শব্দের অর্থ ঃ** الختم শব্দটি বাবে ضرب يضرب -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– গোপন করা। আর الختم -এর প্রচলিত অর্থ হলো– ১. কোন বস্তুর উপর মোহরাঙ্কিত করে তাকে সুদৃঢ় করা। ২. কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাওয়া। আভিধানিক অর্থ এবং প্রচলিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক হলো– ১. মোহরাঙ্কিত করার দ্বারা অভ্যন্তরিন বস্তু প্রাপক ব্যতীত অন্যের কাছে গোপন থাকে। ২. কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌছার দ্বারা উক্ত বস্তু সংরক্ষিত হয়ে যায়।

☆☆☆

وَالْغِشَاوَةُ : فِعَالَةٌ مِنْ غَشَّاهُ اِذَا غَطَّاهُ بُنِيَتْ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الشَّيْءِ كَا الْعِصَابَةِ وَالْعِمَامَةِ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: غشاوة শব্দের তাহকীক)

غشاوة এটা فعالة -এর ওযনে (যার অর্থ হল পর্দা)। এটা غشاء আবৃত করা থেকে গঠিত। فعالة -ওযনকে গঠন করা হয়েছে শামিল করা ও আবৃত করার অর্থ দেয়ার জন্য যেমন– عصابة ـ عمامة ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الغشاوة؟

উত্তর ঃ

غشاوة -**এর অর্থ ঃ** غشاوة শব্দটি فعالة -এর ওযনে আর فعالة -এর ওযনে اسم اله -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা تغشية মাসদার হতে উৎকলিত। এর অর্থ– চতুর্দিক হতে আচ্ছাদিত করা। তার শাব্দিক অর্থ পর্দা, ঢাকনা। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, بنيت لما يشتمل على الشئ كا العصابة والعمامة অর্থাৎ غشاوة শব্দটি গঠন করা হয়েছে এমন বস্তু বুঝাবার জন্য যা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নেয়। যেমন– عمامة অর্থ পাগড়ী, যা মাথাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখে।

وَلَا خَتْمَ وَلَا تَغْشِيَةَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَإِنَّما الْمُرَادُ بِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِيْ نُفُوْسِهِمْ هَيْئَةً تُمَرِّنُهُمْ عَلَى إِسْتِحْبَابِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ وَإِسْتِقْبَاحِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَاتِ بِسَبَبِ غَيِّهِمْ وَإِنْهِمَاكِهِمْ فِي التَّقْلِيْدِ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ النَّظْرِ الصَّحِيْحِ فَتُجْعَلُ قُلُوْبُهُمْ بِحَيْثُ لَا يَنْفَذُ فِيْهَا الْحَقُّ وَأَسْمَاعُهُمْ تُعَافُ إِسْتِمَاعَهُ فَتَصِيْرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْثَقٌ مِنْهَا بِالْخَتْمِ وَأَبْصَارُهُمْ لَاتَجْتَلِي الْآيَاتِ الْمَنْصُوْبَةَ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ كَمَا تَجْتَلِيْهَا أَعْيُنُ الْمُسْتَبْصِرِيْنَ فَتَصِيْرُ كَأَنَّهَا غُطِّيَ عَلَيْهَا وَحِيْلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبْصَارِ وَسَمَّاهُ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ خَتْمًا وَتَغْشِيَةً أَوْ مُثِّلَ قُلُوْبُهُمْ وَمَشَاعِرُهُمُ الْمَاؤُفَةُ بِأَشْيَاءَ ضُرِبَ حِجَابٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِسْتِنْفَاعِ بِهَا خَتْمًا وَتَغْشِيَةً وَقَدْ عُبِّرَ عَنْ إِحْدَاثِ هٰذِهِ الْهَيْئَةِ بِالطَّبْعِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ طُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ . وَبِالْإِغْفَالِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَاتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ـ وَبِالْإِقْسَاءِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً ـ

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: আয়াতে ختم ও غشاوة দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আর এখানে ختم (মোহর মারা) ও تغشيه (আবৃত করা) তার মূল অর্থে নয়; বরং এ উভয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হল– কাফিরদের মন-মনসিকতায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যার ফলে তারা স্বভাবিকভাবে কুফর এবং পাপাচরকে পছন্দ করবে এবং ঘৃণা করবে ঈমান ও নেক কাজকে। কারণ, তারা ছিল পথভ্রষ্ট ও বাপ-দাদার অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং দূরে থাকত সঠিক চিন্তা-ভাবনা করা থেকে। ফলে তাদের অন্তর এবং কান এমন হয়ে গেল যে, অন্তরে সত্য কথা প্রবেশ করে না এবং কান সত্য কথা শুনতে ঘৃণবোধ করে। তাই যেন তাদের অন্তর এবং কান মোহরাঙ্কিত হয়ে গেল। তদ্রূপ তাদের চোখ এমন হয়ে গেল যে, তা দ্বারা নিজের মধ্যে এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিদর্শনাবলী দেখতে পায়নি। যেভাবে দেখতে পায় দৃষ্টিবাণ ব্যক্তিদের চক্ষুসমূহ। কেমন যেন তাদের চোখের উপর পর্দা ঢেলে দেয়া হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সেইসব নিদর্শনাবলী ও তাদের চোখের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক। আর (আল্লাহ তা'লা এই অবস্থার সৃষ্টি করাকে) استعاره হিসেবে ختم ও تغشيه দ্বারা নামকরণ করেছেন। অথবা তাদের বিপদগ্রস্ত অন্তর ও ইন্দ্রিয়শক্তিগুলোকে ঐ সকল বস্তুর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে যেগুলো থেকে উপকারিতা লাভ করার এবং স্বয়ং ঐ বস্তুসমূহের মধ্যখানে মোহর মারা হয়েছে এবং পর্দাও ঢালা হয়েছে।

কখনো এ জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি করণকে طبع (মোহর মারা) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– اولئك الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وابصارهم এবং اغفال (উদাসীন বানিয়ে

দেওয়া) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا তদ্রূপ اقساء (বক্র করে দেওয়া) দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– وجعلنا قلوبهم قاسية (আমি তাদের অন্তরসমূহকে বক্র বানিয়ে দিয়েছি)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: الختم والغشاوة هما على الحقيقة ام فيهما استعارة؟

উত্তর ঃ আয়াতে মোহর মারা ও পর্দা ঢেলে দেয়ার অর্থ কি?

শায়েখ যাদাহ গ্রন্থকার হযরত হাসান বসরী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আয়াতের মধ্যে যে মোহর ও পর্দার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা কাফিরদের অন্তর ও কানসমূহের উপর বাস্তবিকই মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর বাস্তবিকভাবে পর্দা টেনে দিয়েছেন।

তবে সংখ্যাগরিষ্ট মুফাসিসরগণ বলেন– আয়াতের মধ্যে মোহর ও পর্দা দ্বারা হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর এটাই আল্লামা বায়যাবী (র.) -এর অভিমত। সুতরাং তিনি বলেন, এখানে استعاره تبعيه অথবা استعاره تمثيليه হিসেবে معنى مجازى রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

استعاره تبعيه -এর সূরত হল– মহান আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর, কান ও চক্ষুসমূহের মধ্যে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার দরুন তাদের অন্তরে ভালো কথা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না এবং কান ভালো কথা শুনতে ঘৃণাবোধ করে এবং আল্লাহ তা'লা এই পৃথিবীতে কত যে কুদরতের নমুনা সৃষ্টি করেছেন এমনকি স্বয়ং তাদের মধ্যেও তারা সেগুলো চক্ষু দিয়ে দেখতে পায় না। এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণকে তাসবীহ দেয়া হয়েছে ختم (মোহর) এবং غشاوة (পর্দা) -এর সাথে। এই বিশেষ অবস্থাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাদের গোমরাহী এবং পথভ্রষ্ট বাপ-দাদার অনুসরণ করার কারণে।

استعاره تمثيليه -এর সূরত হল– তাদের অন্তর, কান এবং চক্ষু অকেজ হয়ে গেছে। কেননা, তারা সেগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের নিদর্শনাদী থেকে উপকৃত হতে পারেনি। কাজেই তাদের এই অকেজ অন্তর, কান এবং চক্ষুকে এমন মূল্যবান বস্তুর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে যার থেকে উপকার লাভ করতে কোন বস্তু বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে استعاره تمثيليه পাওয়া গেল।

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে ختم ও غشاوة দ্বারা তার মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং مجازى অর্থ উদ্দেশ্য।

☆☆☆

وَهِيَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُمْكِنَاتِ بِاَسْرِهَا مُسْتَنِدَةٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاقِعَةٌ بِقُدْرَتِه اُسْنِدَتْ اِلَيْهِ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُسَبَّبَةٌ مِمَّا اِقْتَرَفُوْهُ بِدَلِيْلِ قَوْلِه تَعَالٰى: بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى: ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ - وَرَدَتِ الْاٰيَةُ نَاعِيَةً عَلَيْهِمْ شَنَاعَةَ صِفَتِهِمْ وَ وَخَامَةَ عَاقِبَتِهِمْ-

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন)

আর যেহেতু (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদানুযায়ী) সবকিছুর সম্বন্ধ আল্লাহ তা'লার দিকে হয়ে থাকে তথা সকল বস্তু তাঁরই ক্ষমতায় অস্তিত্ব লাভ করে কাজেই ختم ও تغشيه তথা কাফিরদের মধ্যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর যেহেতু এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণের মূল কারণ হল তাদের হাতের কামাই। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন– بل طبع الله عليها بكفرهم ("বরং আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরেছেন তাদের কুফরির কারণে")। তদ্রূপ আল্লাহ বলেন– ذالك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ("এটা একারণে যে, তারা ঈমান এনেছে অত:পর কাফির হয়ে গেছে তাই তাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে")। আয়াতটি তাদের দূরাবস্থা ও অশুভ পরিণতির কথা বলে দিচ্ছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: وهى من حيث أن الممكنات باسرها مستندة الى الله تعالى....الخ
السوال: شرح العبارة حق التشريح

উত্তর ঃ

قوله: وهى من حيث أن الممكنات باسرها مستندة الى الله تعالى....الخ : এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল– যখন আল্লাহ তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই পরকালে তাদের শাস্তি হবে কেন?

এ প্রশ্নটির নিরসন করতে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা নিজের দিকে সম্বন্ধ করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। এ আলোচনা দ্বারা তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা যমখশরী (র.) -এর একটি দাবীরও খন্ডন হয়ে গেল। তার দাবী হল– এখানে ختم তথা সীলমোহর এঁটে দেয়ার যে সম্বন্ধ আল্লাহ তা'লার দিকে হয়েছে তা حقيقى বা বাস্তবিক নয়; বরং এ সম্বন্ধটি হয়েছে مجازى বা রূপকার্থে।

☆☆☆

وَاضْطَرَبَ الْمُعْتَزِلَةُ فِيْهِ فَذَكَرُوْا وُجُوْهًا مِنَ التَّاوِيْلِ الْاَوَّلُ: اَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا اَعْرَضُوْا عَنِ الْحَقِّ وَتَمَكَّنَ ذَالِكَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ حَتّٰى صَارَ كَالطَّبِيْعَةِ لَهُمْ شَبَّهَ بِالْوَصْفِ الْخَلْقِيِّ الْمَجْبُوْلِ عَلَيْهِ ـ اَلثَّانِيْ: اَنَّ الْمُرَادَ بِه تَمْثِيْلُ حَالِ قُلُوْبِهِمْ بِقُلُوْبِ الْبَهَائِمِ الَّتِيْ خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى خَالِيَةً عَنِ الْفِطَنِ اَوْ قُلُوْبٌ مُقَدَّرٌ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَيْهَا ـ نَظِيْرُهٗ سَالَ بِهِ الْوَادِيْ اِذَا هَلَكَ وَطَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ اِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهٗ ـ اَلثَّالِثُ: اَنَّ ذَالِكَ فِي الْحَقِيْقَةِ فِعْلُ الشَّيْطَانِ اَوِ الْكَافِرِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ صُدُوْرُهٗ عَنْهُ بِاِقْدَارِه تَعَالٰى اِيَّاهُ اَسْنَدَ اِلَيْهِ اِسْنَادَ الْفِعْلِ اِلَى الْمُسَبِّبِ ـ

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: আল্লাহ তা'লার দিকে ختم -এর যে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা حقيقى না مجازى)

মু'তাযিলারা এই সম্বন্ধকরণের ব্যাপারে অস্থির হয়ে পড়েছে (কারণ, এই নিসবতের কারণে তাদের মাযহাব বাতিল হয়ে যায়) তাই তারা বিভিন্ন ধরনের তাবীল পেশ করেছে। (১) কাফির সম্প্রদায় যখন সত্য পথ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছে এবং এই বিমুখতা তাদের অন্তরে বদ্ধমুল হয়ে তাদের স্বভাবজাত গুণে পরিণত হয়ে গেছে, তখন তাকে সেই জন্মগত গুণের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে গুণের উপর বান্দাকে সৃষ্টি করা হয়। (২) এই সীলমোহর দ্বারা তাদের অন্তরের অবস্থাকে চতুষ্পদ প্রাণির অন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে প্রানীগুলোকে আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন বিবেক শূণ্য করে। অথবা কতেক কল্পিত অন্তরের সাথে যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'লা মোহর এঁটে দিয়েছেন। তার দৃষ্টান্ত হল– سال به الوادى (উপত্যকা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে) এটা তখন বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তি ধংসের স্বীকার হয়। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল– طارت به العنقاء (আনকা পাখি তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে) এটা তখন বলা হয়, যখন কেউ দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। (৩) এটা বাস্তবিক অর্থে শয়তানের কর্ম ছিল অথবা কাফিরের কর্ম ছিল; কিন্তু শয়তান বা কাফির থেকে এই কর্মটি প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহই তাকে এ কাজের ক্ষমতা দানের কারণে, তাই সীলমোহরের সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার দিকে। যেভাবে কর্মের সম্বন্ধ হয়ে থাকে مسبب -এর দিকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قال العلامة البيضاوى واضطرب المعتزلة فيه فذكروا وجوها من التاويل۔
بين وجه الاضطراب اولا ثم اذكر توجيها تهم ثانيا

আল্লাহর দিকে ختم -এর সম্বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে মু'তাযিলাদের অস্থির হওয়ার কারণ:
মু'তাযিলারা বলে থাকে যে, ভাল-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টিকারী– 'বিবেক'। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্য থেকে আশআরীগণ বলে থাকেন যে, ভাল-মন্দ নির্ণয়কারী– 'শরীয়ত'; এক্ষেত্রে বিবেকের কোন দখল নেই। আর মাতুরিদিগণ বলেন– উভয়টি। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিবেক দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা

যায় না যতক্ষন না সে ব্যাপারে শরীয়ত বলে দেয়। আর যে সম্পর্কে শরীয়ত নীরব, তার মধ্যে বিবেক হল নির্ণয়কারী। আর শরীয়ত যেখানে বিবেকের উল্টাটি মন্তব্য করবে, সেখানে বিবেক অকেজ।

মু'তাযিলারা যেহেতু ভাল-মন্দের নির্ণয়কারী সাব্যস্ত করে থাকে বিবেককে, তাই বিবেকের চাহিদা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লার দিকে মন্দ বিষয়কে নিসবত করা সঠিক নয়। এজন্য উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে যে ختم -এর নিসবত আল্লাহর দিকে হয়েছে সে ব্যাপারে তারা অস্তির হয়ে পড়েছে। তাই তারা অত্র আয়াতের সাতটি তাবীল করেছে।

১ম তাবীল: মহান আল্লাহ তা'লা মানুষকে এমন কিছু গুণাবলী দান করে থাকেন যা অন্তরে বদ্ধমুল হওয়ার কারণে কখনো বিলুপ্ত হয় না। আর وصف جبلى বা জন্মগত গুণের সম্বন্ধ হয়ে থাকে আল্লাহ তা'লার দিকে। কখনো কখনো وصف غير جبلى বা যে গুণটি জন্মগত নয়; তা অন্তরে বদ্ধমুল থাকার কারণে তাকে জনমগত গুণের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে আর তখন এই وصف غير جبلى সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায় আল্লাহর দিকে এবং তাকে وصف جبلى বা জন্মগত গুণের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়।

সুতরাং মু'তাযিলারা বলে, এই কাফিরদের সত্য পথ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন যদিও জন্মগত স্বভাব নয়; কিন্তু এই গুণটি তাদের অন্তরের মধ্যে বদ্ধমুল হয়ে গেছে। কেমন যেন তাদের সত্য পথ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন স্বভাবকে জন্মগত স্বভাবের সাথে তুলনা করতঃ তার স্থলাভিষিক্ত ধরে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজেই তাদের এই স্বভাব জন্মগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন ফারসীতে একটি প্রবাদ আছে– جبل گردد جبلت نگردد "পাহাড় টলে কিন্তু স্বভাব টলে না"। সুতরাং এখানে স্বভাবটি বদ্ধমুল হওয়া لازم আর اسناد الى الله হল ملزوم এবং তাদের সত্য পথ থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে জন্মগত স্বভাবের সাথে কাজেই এই اسناد টি হবে اسناد مجازى বা রূপক সম্বন্ধ।

২য় তাবীল: আল্লাহ তা'লা কাফিরদের অন্তরের অবস্থাকে তুলনা করেছেন এমন অন্তরের অবস্থার সাথে যার মধ্যে চিন্তা-ফিকির করার কোন যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীর অন্তরের সাথে এবং استعاره تمثيليه স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ অন্তর তো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে চতুষ্পদ প্রাণীর। সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে আল্লাহর দিকে ختم -এর যে সম্বন্ধ হয়েছে তা রূপকার্থে।

উল্লেখ্য যে, استعاره تمثيليه বলা হয় এক বস্তুর অবস্থাকে অপর বস্তুর অবস্থার সাথে তাশবীহ দেয়া। এখন যদি مشبه به বাস্তবে পাওয়া যায় তাহলে তাকে استعاره تمثيليه تحقيقيه বলা হয়। যেমন– سال به الوادى অর্থাৎ প্লাবন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তথা সে ধংস হয়ে গেছে। আর যদি مشبه به বাস্তবে পাওয়া যায় না বরং কাল্পনিক হয়, তাহলে তাকে বলা হবে استعاره تمثيليه غير حقيقيه যেমন– طارت به العنقاء অর্থাৎ আনকা পাখি তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয় দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতি বুঝানোর জন্য।

৩য় তাবীল: আয়াতের মধ্যে ختم -এর সম্বন্ধ শয়তানের দিকে اسناد حقيقى হয়েছে এবং আল্লাহ তা'লার দিকে হয়েছে اسناد مجازى হিসেবে। অর্থাৎ শয়তান তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দিয়েছে; কিন্তু শয়তানকে এই বন্ধ করার শক্তি আল্লাহ তা'লাই দিয়েছেন কাজেই আল্লাহ তা'লা হলেন مسبب তথা সবব সৃষ্টিকারী। বিধায় যেভাবে سبب -এর দিকে اسناد হয়ে থাকে সেভাবে اسناد হয়ে থাকে مسبب

-এর দিকেও। সুতরাং আল্লাহর দিকে এই اسناد টি হবে اسناد مجازى যেহেতু তিনি হলেন مسبب বা সবব সৃষ্টিকারী।

৪র্থ তাবীল: আয়াতের মধ্যে ختم বা সীলমোহর ব্যবহার হয়েছে استعاره تبعيه হিসেবে। তার সূরত হল– ধরুন একজন মানুষ কোন একটি কাজকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে এবং সে তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে, তাহলে এই ব্যক্তি থেকে ঐ কাজটি বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ আয়াতের মধ্যে চিহ্নিত কাফিররা ঈমানকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, এখন তাদের থেকে ঈমান প্রকাশ পাওয়ার সূরত একটিই আর তা হল, আল্লাহ্ তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করেননি আর এই বাধ্য না করাকে ختم বা সীলমোহর দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখানে ختم শব্দটি ব্যবহরা হয়েছে 'বাধ্য না করা'র অর্থে আর এটা তার مجازى অর্থ। কাজেই প্রমাণিত হল যে, এখানে ختم -এর নিসবত আল্লাহর দিকে হয়েছে রূপকার্থে।

৫ম তাবীল: আয়াতের মধ্যে ختم الله على قلوبهم و على سمعهم وعلى ابصارهم এটা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের উক্তিই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তারা বিদ্রূপ করে বলে থকে যে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছ কেন, আল্লাহ্ তো আমাদের অন্তরকে বন্ধ করে দিয়েছেন। কাফিরদের এজাতীয় উক্তি কুরআনের অন্যত্রও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– তারা বলে থকে قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه وفى اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার এবং আমাদের অন্তরের মধ্যখানে পর্দা টেনে দিয়েছেন। তাই আমরা তোমার দাওয়াতকে গ্রহণ করতে পারছি না। তাদের এই উক্তিকে বিদ্রূপাত্মক ختم الله على قلوبهم الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কাজেই এই ختم -এর নিসবত মূলতঃ কাফিরদের দিকেই হয়েছে।

৬ষ্ঠ তাবীল: আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরকালে বন্ধ করে দিবেন। সুতরাং আয়াতটির সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নয়; বরং তার সম্পর্ক হল পরকালের সাথে। আর পরকালে তো কোন কাজ আর মন্দ থাকে না।

৭ম তাবীল: এখানে মোহর দ্বারা ঈমান গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার অর্থ হল– আল্লাহ্ তাদের অন্তরে لايؤمنون অথবা هذا كافر ازلى -এর মোহর এঁটে দিয়েছেন। যাতে আল্লাহ্ অথবা ফিরিশতারা তাদেরকে চিনতে পারেন।

এ তাবীল সাতটি বর্ণিত হয়েছে মু'তাযিলাদের পক্ষ থেকে, যা তাদের ভ্রষ্টতা ও বুকামীর পরিচয় বহন করে।

তাদের এই তাবীলগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে আল্লামা বায়যাবী (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হল– যেখানেই সীলমোহর এঁটে দেওয়া বা গোমরাহ করা ইত্যাদির সম্বন্ধ হবে আল্লাহ্ তা'লার দিকে, সেখানেই আমাদের এবং মু'তাযিলাদের বক্তব্যের ধরন হবে এই যে, আমরা বলবো যে, সীলমোহর দ্বারা সেই অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য, যা সত্য পথ গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার নিসবত আল্লাহর দিকে একারণেই হয়েছে যে, সবকিছু তো তাঁরই ক্ষমতায় অস্তিত্ব লাভ করেছে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাদের বক্তব্যের ধরন হবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা তাদের ভ্রষ্টতার ফলাফল।

وَعَلَى سَمْعِهِمْ مَعْطُوْفٌ عَلَى قُلُوْبِهِمْ لِقَوْلِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَلِلْوِفَاقِ عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَلِاَنَّهُمَا لَمَّا اِشْتَرَكَا فِي الْاِدْرَاكِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ جَعَلَ مَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ خَوَاصِّ فِعْلِهِمَا اَلْخَتْمَ الَّذِيْ يَمْنَعُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ وَاِدْرَاكُ الْاَبْصَارِ لِمَا اِخْتَصَّ بِجِهَةِ الْمُقَابَلَةِ جَعَلَ الْمَانِعَ لَهَا عَنْ فِعْلِهَا الْغِشَاوَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ بِتِلْكَ الْجِهَةِ۔

অনুবাদ:

(৬ষ্ঠ আলোচনা: على سمعهم -এর عطف হয়েছে على قلوبهم -এর উপর; তার প্রমাণ)

على سمعهم এটার عطف হয়েছে على قلوبهم -এর উপর। কারণ, আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেছেন– وختم على سمعه وقلبه দ্বিতীয়ত: على سمعهم -এর উপর وقف করার ব্যাপারে কারীগণের ঐক্যমত রয়েছে। তৃতীয়ত: চতুর্দিক থেকে অনুধাবন করার ব্যাপারে অন্তর এবং কান এ উভয়টি শরীক। তাই এ দু'টির বিশেষ কর্মে বাধা প্রদানকারী বস্তু ختم (সীলমোহর) -কে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা সবদিক থেকে অনুধবান করতে বাধা প্রদান করে। পক্ষান্তরে চক্ষুর কাজ শুধু সামনের বস্তু দেখা কাজেই তার বিশেষ কার্মে বাধা দানকারী বস্তু غشاوة (পর্দা) -কে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা শুধু সামনের বস্তু দেখতে বাধা প্রদান করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: علام عطف قوله تعالى: وعلى سمعهم؟ اكتب على نهج المفسر العلام

উত্তর ঃ

وعلى سمعهم -এর আতফ কার উপর হয়েছে?

وعلى سمعهم -এর عطف হয়েছে على قلوبهم -এর উপর। মুসান্নিফ (র.) এব্যাপারে তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১ম প্রমাণ: আল্লাহ তা'লা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন– وختم على سمعه وقلبه ("আর আল্লাহ তার কান এবং অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন") দেখুন, এই আয়াতের মধ্যে ختم বা সীলমোহরকে কান এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم এই আয়াতেও ختم -এর সাথে কান সম্পৃক্ত হবে এবং على سمعهم -এর عطف হবে على قلوبهم -এর উপর। কারণ, কুরআনের এক অংশ অপরাংশের ব্যাখ্যা করে থাকে।

২য় প্রমাণ: কারীগণের এব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, على سمعهم -এর উপর وقف করা হবে। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, على سمعهم -এর عطف হবে على قلوبهم -এর উপর। অন্যথায় وقف করা হত على قلوبهم -এর উপর।

৩য় প্রমাণ: কান দ্বারা যেভাবে সবদিক থেকে শোনা যায়, তদ্রূপ অন্তর দ্বারাও সবদিক থেকে উপলব্ধি করা যায়। তাই এ দু'টির বিশেষ কর্মকে বন্ধ করতে হলে এমন বস্তু দ্বারা বন্ধ করা জরুরী, যেটি সবদিক থেকে উপলব্ধি করতে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই এ দু'টির অনুধাবনে বাধা সৃষ্টিকারী ختم -কে

সাধ্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং على سمعهم -এর عطف হবে على قلوبهم -এর উপর এবং উভয়টি متعلق হবে ختم -এর সাথে। পক্ষান্তরে চক্ষু দ্বারা শুধু সামনের বস্তু দেখা যায়, তাই চক্ষুর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হলে এমন বস্তুর প্রয়োজন যেটি শুধু সামন থেকে দেখতে বাধা দেয়। আর এটা হল غشاوة বা পর্দা। তাই على ابصارهم -এর সম্পর্ক হবে غشاوة -এর সাথে; ختم -এর সাথে নয়।

☆☆☆

وَكَرَّرَ الْجَارَ لِيَكُوْنَ اَدَلَّ عَلٰى شِدَّةِ الْخَتْمِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ وَاِسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا بِالْحُكْمِ وَوُحِّدَ السَّمْعُ لِلْاَمْنِ عَنِ اللُّبْسِ وَاِعْتِبَارِ الْاَصْلِ فَاِنَّهُ مَصْدَرٌ فِىْ اَصْلِه وَالْمَصَادِرُ لَاتَجْمَعُ اَوْ عَلٰى تَقْدِيْرِ مُضَافٍ مِثْلُ وَعَلٰى حَوَاسِّ سَمْعِهِمْ-

অনুবাদ:

(৭ম আলোচনা: على -কে পুনরায় উল্লেখ করার এবং سمع -কে একবচন ব্যবহার করার কারণ)

আর جار তথা على -কে তাকরার আনা হয়েছে যাতে একথা ভালো করে বুঝা যায় যে, তাদের অন্তর এবং কানে শক্তভাবে মোহর মারা হয়েছে এবং সাথে সাথে একথাও বুঝা যায় যে, অন্তর এবং কান প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক মোহর মারা হয়েছে। আর سمع তথা কানকে একবচন আনা হয়েছে মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার কারণে এবং মূলের প্রতি লক্ষ্য করে কারণ, سمع মূলত: مصدر ছিল। আর مصدر সমূহের বহুবচন ব্যবহার হয় না। অথবা مضاف উহ্য থাকার কারণে যেমন- وعلى حواس سمعهم- ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما وجه تكرير على فى قوله تعالى: على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم؟
(ب) لم وحد السمع ؟

উত্তর ঃ (الف)

على -কে পুনরায় আনার কারণ:

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, على سمعهم -এর সম্পর্ক যখন ختم -এর সাথে এবং তার عطف হয়েছে على قلوبهم -এর উপর, তাহলে পুনরায় على আনার তো কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং على -কে না এনে ختم الله على قلوبهم وسمعهم এভাবে বললে চলত। কিন্তু এভাবে না বলে على -কে পুনরায় উল্লেখ করে وعلى سمعهم বলা হয়েছে তার কারণ কি?

উত্তর: على -কে দুই কারণে তাকরার আনা হয়েছে।

১. على -কে তাকরার এনে আল্লাহ তা'লা একথা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের অন্তর এবং কানে শক্ত করে মোহর মারা হয়েছে।

২. এবং একথাও বুঝানোর জন্য যে, তাদের অন্তর এবং কান প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক করে

মোহরা মারা হয়েছে। এমন নয় যে, তাদের অন্তর এবং কানে যৌথভাবে একটি মোহর মারা হয়েছে। তাই على -কে তাকরার আনা অনর্থক হয়নি।

উত্তর ঃ (ب)

سمع শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ:

এখানে দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে قـلـوب এবং ابـصـار -কে বহুবচন ব্যবহার করা হল; কিন্তু سمع -কে ব্যবহার করা হয়েছে একবচন। এরকম ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর: سمع -কে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তিন কারণে।

১. এখানে বহুবচন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কারণ, বহুবচন এমন স্থানে ব্যবহার হয় যেখানে একবচন উদ্দেশ্য না বহুবচন উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এখানে এ সমস্যা নেই কারণ, এখানে سمع -কে কাফিরদের এক জামাতের দিকে اضافت করা হয়েছে আর একাধিক লোকের কান তো একটি নয়; বরং কয়েকটি থাকে। তাই এখানে سـمـع শব্দটি বহুবচনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তাই তাকে বহুবচন ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

২. একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তার মূলের প্রতি লক্ষ্য করে কারণ, سمع তো মূলত: مـصـدر -ই ছিল। আর مصدر -এর বহুবচন আসে না। তাই তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. سـمـع শব্দের শুরুতে حـواس মুযাফ উহ্য থাকার কারণে তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর حـــواس শব্দ তো বহুবচন। তাই তাকে বহুবচন আনার প্রয়োজন নেই। তখন বাক্যটি এমন হবে– وعلى حواس سمعهم (অর্থাৎ তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে)।

☆☆☆

وَالْاَبْصَارُ جَمْعُ بَصَرٍ وَهُوَ اِدْرَاكُ الْعَيْنِ وَقَدْيُطْلَقُ مُجَازًا عَلَى الْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ وَعَلَى الْعَضْوِ وَكَذَا السَّمْعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمَا فِى الْاٰيَةِ اَلْعَضْوُ اَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلْخَتْمِ وَالتَّغْطِيَةِ وَبِالْقَلْبِ مَا هُوَ مَحَلُّ الْعِلْمِ وَقَدْيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْعَقْلُ وَالْمَعْرِفَةُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ وَاِنَّمَا جَازَ اِمَالَتُهَا مَعَ الصَّادِ لِاَنَّ الرَّاءَ الْمَكْسُوْرَةَ تَغْلِبُ الْمُسْتَعْلِيَةَ لِمَا فِيْه مِنَ التَّكْرِيْرِ۔

অনুবাদ:

(৮ম আলোচনা: ابصار শব্দের তাহকীক এবং قلب , بصر , سمع দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

ابـصـار এটা بـصـر -এর বহুবচন। যার অর্থ হল– চোখের অনুভূতি। কখনো রূপকার্থে তার ব্যবহার হয় দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষুর উপর। তদ্রূপ سـمـع শব্দটিও (তার মূল অর্থ হল শ্রবণ করা; রূপকার্থে শ্রবণশক্তি এবং কানের উপর ব্যবহার হয়ে থাকে)। সম্ভবত: আয়াতের মধ্যে سـمـع এবং بصر দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ উদ্দেশ্য (অর্থাৎ سمع দ্বারা কান এবং بصر দ্বারা চোখ উদ্দেশ্য)। কেননা, এ

উদ্দেশ্যটি ختم ও تغشيه -এর সাথে বেশী সমঞ্জস্যশীল। আর قلب দ্বারা উদ্দেশ্য হল محل علم তথা অন্তর। আর কখনো قلب উল্লেখ করে তার দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- ان فى ذالك لذكرى لمن كان له قلب আর ابصار (-এর صاد বর্ণে) اماله করে পড়া জায়েয আছে এজন্য যে, راء مكسوره টি حروف مستعليه -এর উপর প্রাধান্যশীল হয়ে থাকে। কারণ, راء -এর উচ্চারণের মধ্যে تكرير বা তাকরার বিদ্যমান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما المراد بالقلب والسمع والبصر فى هذه الاية؟

(ب)اكتب غرض المصنف بقوله: وانما جاز امالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيه من التكرير

উত্তর ঃ (الف)

আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ কাফিরদের অন্তর এবং তাদের কান সমূহের মধ্যে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ সমূহের উপর ঢেলে দিয়েছেন পর্দা। এখন আলোচনা হল- এখানে অন্তর, কান এবং চোখ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এসম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন- হতে পারে এখানে بصر ও سمع দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ উদ্দেশ্য অর্থাৎ بصر দ্বারা চোখ এবং سمع দ্বারা কান উদ্দেশ্য। করণ, ختم -এর মূল অর্থ হল মোহর মারা আর غشاوة -এর মূল অর্থ হল পর্দা। আর চর্মচোখ ও কান ختم ও غشاوة -এর হাকীকী অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্য রাখে। কারণ, প্রকৃত মোহর মারা হয় সেই বস্তুর মধ্যে যেটা প্রকাশ্য ও বাহ্যিক হয়ে থাকে। তাই এখানে বাহ্যিক অঙ্গ তথা চর্মচোখ ও কান উদ্দেশ্য হওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

আর قلب দ্বারা محل علم তথা অন্তর উদ্দেশ্য। তবে কখনো এর দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- ان فى ذالك لذكرى لمن كان له قلب এ আয়াতের মধ্যে قلب দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে قلب ـ سمع ـ بصر এতিনটি বস্তু দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করতে গিয়ে لعل শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা নিশ্চয়তা বুঝায় না। তিনি এই শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে অন্য ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। সুতরাং بصر দ্বারা দৃষ্টিশক্তি এবং قلب দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি এবং سمع দ্বারা শ্রবণশক্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তখন ختم ও غشاوة শব্দদ্বয় তাদের مجازى অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সত্য পথ গ্রহণ করার যোগ্যতা বিনষ্ট করে দেয়া।

উত্তর (ب)

قوله: وانما جاز امالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة الخ : এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল- ابصار - এর صاد বর্ণকে اماله করেও পড়া হয়ে থাকে। আর اماله বলা হয়, যবরকে যেরের দিকে এবং আলিফকে ইয়া এর দিকে مائل করে পড়া। সুতরাং اماله -এর চাহিদা হল, আওয়াজকে নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া। অথচ ابصار শব্দের صاد বর্ণটি হল حرف الاستعلاء যা আওয়াজকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এই صاد বর্ণের উপর তার উল্টো দিক اماله কিভাবে বিশুদ্ধ হল?

উত্তর : صاد বর্ণের উপর اماله জায়েয হওয়ার কারণ হল যে, ابصار শব্দের শেষে রয়েছে

راء مكسوره আর راء مكسوره টি حروف مستعليه -এর উপর প্রাধান্যশীল হয়ে থাকে। কারণ, راء -এর উচ্চারণের মধ্যে تكرير বা তাকরার বিদ্যমান। সুতরাং صاد বর্ণের মধ্যে যে استعلاء রয়েছে তা راء مكسوره -এর কাছে পরাজয় বরণ করবে।

☆☆☆

وَغِشَاوَةٌ رَفْعٌ بِالْاِبْتِدَاءِ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ وَبِالْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ عِنْدَ اَخْفَش وَيُؤَيِّدُهُ الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَةِ وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلٰى تَقْدِيْرِ وَجَعَلَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً اَوْ عَلٰى حَذْفِ الْجَارِ وَاِيْصَالِ الْخَتْمِ بِنَفْسِه اِلَيْهِ وَالْمَعْنٰى: وَخَتَمَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ بِغَشَاوَةٍ وَقُرِئَ بِالضَّمِّ وَبِالرَّفْعِ وَالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ وَهُمَا لُغَتَانِ فِيْهَا وَغِشْوَةٌ بِالْكَسْرِ مَرْفُوْعَةً وَبِالْفَتْحِ مَرْفُوْعَةً وَمَنْصُوْبَةً وَعِشَاوَةٌ بِالْعَيْنِ الْغَيْرِ الْمُعْجَمَةِ۔

অনুবাদ:

(৯ম আলোচনা: غشاوة -এর তারকীব ও তার কেরাতসমূহ)

ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, غشاوة টি مبتدا হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। আর ইমাম আখফশ (র.) -এর মতে, جار مجرور -এর কারণে مرفوع হয়েছে। আখফশের মাযহাবের সমর্থন করে جمله فعليه -এর উপর তার عطف হওয়াটি। আর এক কেরাতের মধ্যে غشاوةً টি نصب সহকারে এসেছে, তখন ইবারতের মূলরূপ হবে– وجعل على ابصارهم غشاوة অথবা منصوب হবে جار (তথা على) -কে হযফ করে ختم -কে غشاوة -এর দিকে بلا واسطه (মাধ্যমবিহীন) متعدى বানিয়ে। **আর তখন অর্থ হবে**– وختم على ابصارهم بغشاوة (অর্থাৎ আল্লাহ তাদের চোখে পর্দা দ্বারা মোহর এঁটে দিয়েছেন)। আর এক কেরাতে غُشاوةٌ তথা غين বর্ণে পেশ এবং শেষে رفع দিয়ে। আর অন্য এক কেরাতে غين বর্ণে যবর এবং শেষে نصب সহকারে। আর এ উভয় কেরাত তার মধ্যে দু'টি লুগাত হিসেবে বিবেচিত। আর غِشوةٌ তথা غين বর্ণে যের এবং শেষে رفع এবং غَشوةٌ গাইন বর্ণে যবর এবং শেষে رفع অথবা نصب দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ عشاوة গাইনের পরিবর্তে আইন দিয়েও পড়া হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) قوله: غشاوة فى أى محل من الاعراب؟
(ب) كم قرأة فى غشاوة وما هى؟

উত্তর (الف) ঃ

غشاوة -এর তারকীবঃ غشاوة শব্দটির তারকীব নিয়ে ইমাম সিবাওয়ায়েহ এবং ইমাম আখফশ (র.) -এর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, غشاوة টি مبتدا হয়েছে আর على ابصارهم জার মাজরূর হয়ে شبه فعل -এর সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم হয়েছে।

আর ইমাম আখফশ (র.) -এর মতে, غشاوة টি على ابصارهم জার মাজরূরের متعلّق -এর فاعل হয়ে مرفوع হবে। তবে এক্ষেত্রে আখফশ (র.) -এর অভিমতটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, على عطف এর- جمله فعليه ختم الله على قلوبهم এর উপর। আর ابصارهم غشاوة এর- عطف হয়েছে -এর ক্ষেত্রে معطوف عليه ও معطوف একই ধরনের জুমলা হওয়া উত্তম। তাই غشاوة -কে فاعل ধরা হলে জুমলাটি হবে جمله فعليه । আর তখন معطوف عليه ও معطوف একই ধরনের হবে যা উত্তম ও পছন্দনীয়।

(ب) كم قرأة فى غشاوة وما هى؟

উত্তর (ب) ঃ

غشاوة -এর কেরাতসমূহ ঃ এর মধ্যে ৮টি কেরাত রয়েছে।

১. غِشَاوَةٌ (غين যের যোগে এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
২. غِشَاوَةً (غين যের যোগে এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৩. غُشَاوَةٌ (غين পেশ যোগে এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৪. غَشَاوَةً (غين যবর যোগে এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৫. غِشْوَةٌ (غين যের যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৬. غَشْوَةٌ (غين যবর যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৭. غَشْوَةً (غين যবর যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৮. عِشَاوَةٌ (غين -এর পরিবর্তে عين যের যোগে এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)

☆☆☆

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

"আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি"

وَعِيْدٌ وَبَيَانٌ لِمَا يَسْتَحِقُّوْنَهُ وَالْعَذَابُ كَالنَّكَالِ بِنَاءً وَمَعْنًى تَقُوْلُ: اَعْذَبُ عَنِ الشَّيْءِ وَنَكَلَ عَنْهُ اِذَا اَمْسَكَ وَمِنْهُ اَلْمَاءُ الْعَذْبُ لِاَنَّهُ يَقْمَعُ الْعَطْشَ وَيَرْدِعُهُ وَلِذَالِكَ سُمِّىَ نُقَاخًا وَفُرَاتًا ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيْهِ فَاُطْلِقَ عَلٰى كُلِّ اَلَمٍ فَادِحٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَالًا اَىْ عِقَابًا يَرْدِعُ الْجَانِىَ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ فَهُوَ اَعَمُّ مِنْهُمَا وَقِيْلَ اِشْتِقَاقُهُ مِنَ التَّعْذِيْبِ اَلَّذِىْ هُوَ اِزَالَةُ الْعَذْبِ كَالتَّقْذِيَةِ وَالتَّمْرِيْضِ۔

অনুবাদ:______________________________

(১ম আলোচনা: যোগসূত্র ও عذاب শব্দের বিশ্লেষণ)

ولهم عذاب عظيم এটা ভীতি প্রদর্শন এবং তারা যে জিনিসের উপযুক্ত তার বিবরণ। আর عذاب শব্দটি গঠনগত ও অর্থগত দিক দিয়ে نكال শব্দের অনুরূপ। যেমন তোমার উক্তি– اعذب عن الشئ ونكل عنه যার অর্থ হল– বাধা দেয়া। আর তা থেকেই الماء العذب (মিষ্ট পানি)

উৎকলিত। কেননা, মিষ্ঠ পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে। আর এজন্যই মিষ্ঠ পানিকে نُـقـاخ এবং فـرات নামে নামকরণ করা হয়েছে। অত:পর তাতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কঠোর শাস্তির উপর তার প্রয়োগ হতে থাকে। যদিও এই শাস্তি এমন হয় যে, অপরাধীকে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে না। সুতরাং عذاب শব্দটি نـكال এবং عـقاب থেকেও ব্যাপক অর্থবোধক। আর কেউ কেউ বলেন, عذاب শব্দটি تعذيب থেকে নির্গত যার অর্থ– মিষ্ঠতা দূরীভূত করা। যেমন تقذية অর্থ আবর্জনা দূর করা এবং تمريض অর্থ রোগ দূর করা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم

السوال: (الف) اكتب ربط الاية بما قبلها

(ب) حقق لفظة عذاب على نهج المبسر العلام

(ج) ما الفرق بين العذاب والنكال والعقاب؟

(الف) উত্তর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে বাক্যটির যোগসূত্র ঃ

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই চিহ্নিত কাফিরদেরকে ভয় দেখানো ও না দেখানো উভয়ই বরাবর তারা ঈমান আনবে না। কারণ, তাদেরই কর্মের ফলে আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর এবং কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। এখন মহান আল্লাহ তা'লা এই বাক্য দ্বারা তাদের কর্মের ফলে যে জিনিসের উপযুক্ত হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে অন্যদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন– ولهـم عـذاب عـظيـم "আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে কঠিন শাস্তি"।

উত্তর ঃ (ب) عـذاب শব্দের বিশ্লেষণ ঃ عـذاب শব্দটি শব্দগত ও অর্থগত দিক থেকে نـكـال শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। শব্দগত সামঞ্জস্যতা তো পরিস্কার। কেননা, উভয়টির ওযন এক। আর অর্থগত সামঞ্জস্যতা হল, عذاب ও نـكـال উভয়টির অর্থ হল– বাধা প্রদান করা। শুধু عذاب ও نـكـال -এর অর্থ বাধা প্রদান করা নয়; বরং এই গঠনে যে শব্দই আসবে তার মধ্যে বাধা প্রদানের অর্থ পাওয়া যাবে। যেমন বলা হয়– اعذب عن الشئ এবং نكل عن الشئ উভয়টির অর্থ– বাধা প্রদান করা। আর তা থেকেই নির্গত হয়েছে الماء العذب (মিঠা পানি)। কেননা, মিঠা পানি পিপাসা দূর করে এবং পিপাসা হতে বাধা প্রদান করে। এজন্য মিঠা পানিকে نُقَاخٌ এবং فُرَات বলা হয় কারণ, উভয়টির মধ্যে বাধা দেয়ার অর্থ বিদ্যমান।

মোটকথা, عـــذاب বলা হয় সেই শাস্তিকে যা কোন অপরাধীকে প্রদান করা হয় তাকে তার অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। অত:পর عـــــــذاب শব্দের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কঠিন শাস্তির উপর ব্যবহার হতে লাগল। কেউ কেউ বলেন, عذاب শব্দটি নির্গত হয়েছে تعذيب থেকে। تعذيب অর্থ– মিষ্ঠতা দূরীভূত করা। কেননা, بـاب تـفعيل -এর একটি বৈশিষ্ট্য হল سـلـب مـاخوذ (শব্দ থেকে ধাতূর অর্থ দূরীভূত করা) যেমন– تـمريض রোগ দূর করা এবং تقذية আবর্জনা দূর করা। সুতরাং عذاب শব্দটি تـعـذيـب থেকে নির্গত হয়ে তার অর্থ ছিল– মিষ্ঠতা দূর করা। অত:পর শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেননা, শাস্তি দ্বারা জীবনের মিষ্ঠতা ও স্বাদ খতম হয়ে যায়।

উত্তর ঃ (ج) ঃ عذاب۔ نكال۔ عقاب -এর পার্থক্য ঃ

عــــــذاب বলা হয় যে কোন কঠিন শাস্তিকে। চাই সেই শাস্তি অপরাধের কারণে দেয়া হোক অথবা এমনিতেই জিদ মিটানোর উদ্দেশ্যে দেয়া হোক। তদ্রূপ এই শাস্তি দ্বারা অপরাধীকে অপরাধ থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক। যেমন আখেরাতের শাস্তি। কারণ, এর দ্বারা অপরাধ থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্য থাকে না। পক্ষান্তরে نــكـــال বলা হয় সেই শাস্তিকে যা অপরাধীকে অপরাধের কারণে দেয়া হয় তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। আর عقاب সেই শাস্তিকে বলা হয় যা অপরাধের পর দেয়া হয়। মোটকাথা, عذاب শব্দটি نكال এবং عقاب -এর তুলনায় ব্যাপক।

☆☆☆

وَالْعَظِيْمُ نَقِيْضُ الْحَقِيْرِ وَالْكَبِيْرُ نَقِيْضُ الصَّغِيْرِ فَكَمَا اَنَّ الْحَقِيْرَ دُوْنَ الصَّغِيْرِ فَالْعَظِيْمُ فَوْقَ الْكَبِيْرِ وَمَعْنَى التَّوْصِيْفِ بِه اَنَّهٗ اِذَا قِيْسَ بِسَائِرِ مَا يُجَانِسُهٗ قَصُرَ عَنْهُ جَمِيْعُهٗ وَحَقُرَ بِالْاِضَافَةِ اِلَيْهِ۔

অনুবাদ:____

(২য় আলোচনা: عظيم শব্দের তাহকীক)

عـظيم শব্দটি حـقير -এর এবং كبيـر শব্দটি صـغير -এর বিপরীত। সুতরাং যেভাবে حـقير শব্দের মান صـغير -এর নিচে তদ্রূপ عـظيم শব্দের মান كبيـر -এর উর্ধে। (কেননা, صـغير অর্থ– বয়স এবং দেহের বিচারে ছোট হওয়া। আর كبير অর্থ– বয়স এবং দেহের বিচারে বড় হওয়া। আর عـظيم অর্থ– মর্যাদার বিচারে বড় হওয়া। حـقير অর্থ– মর্যাদার বিচারে ছোট হওয়া। অনেক সময় দেখা যায় যে, বয়সে যে ছোট সম্মানে সে বড় এবং বয়সে যে বড় সম্মানে সে ছোট। তাই حـقيـر -এর মধ্যে صـغير -এর তুলনায় তুচ্ছ্যতার অর্থ একটু বেশী। তদ্রূপ كبير -এর তুলনায় عـظيم -এর মধ্যে বড়ত্বের অর্থ বেশী।)। আর عـذاب -এর সিফাত عـظيـم আনার অর্থ হল– যখন তাকে তার মত অন্যান্য শাস্তির সাথে তুলনা করা হবে তখন তার বিপরীতে সকল শাস্তি তুচ্ছ্য বলে বিবেচিত হবে। (সুতরাং عــذاب عــظيـم -এর অর্থ দাঁড়াল– এই শাস্তিটি কাঠিন্যতার বিচারে অন্যান্য সকল শাস্তি থেকে বড় ও ভয়ানক।)

☆☆☆

وَمَعْنَى التَّنْكِيْرِ فِى الْاٰيَةِ: اَنَّ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً لَيْسَ مِمَّا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَهُوَ التَّعَامِىْ عَنِ الْاٰيَاتِ وَلَهُمْ مِنَ الْاٰلَامِ الْعِظَامِ نَوْعٌ عَظِيْمٌ لَايَعْلَمُ كُنْهَهٗ اِلَّا اللّٰهُ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে نكره ব্যবহার করার কারণ)

আয়াতের মধ্যে (غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে) نكره ব্যবহরার করার কারণে যে অর্থ সৃষ্টি হয়েছে তা হল– তাদের চোখের মধ্যে এমন এক বিশেষ পর্দা রয়েছে যা মানুষের জ্ঞানের উর্ধে অর্থাৎ মানুষ তা চিনতে পারে না আর এ পর্দাটি হল নিদর্শনাবলী থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়া। এবং তাদের জন্য রয়েছে এমন এক ভয়ানক শাস্তি যার হাকীকত আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (অর্থাৎ غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে نكره ব্যবহার করা হয়েছে نوعيت বুঝানোর জন্য। তাই غشاوة অর্থ হবে এমন এক প্রকার পর্দা যাকে মানুষ চিনতে পারে না আর সেটা হল স্বইচ্ছায় আল্লাহর নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে অন্ধ সাজা। আর عظيم অর্থ হবে এমন শাস্তি যে শাস্তি আল্লাহ তা'লা ব্যতীত কেউ জানে না)।

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ﴾

"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি"

মুসান্নিফ (র.) এই আয়াতের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: الناس শব্দের তাহকীক। ৩য় আলোচনা: الناس শব্দের الف لام কোন প্রকারের। ৪র্থ আলোচনা: ঈমানের আলোচনায় বিশেষভাবে আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা উল্লেখ করার এবং باء হরফে জারকে তাকরার আনার কারণ। ৫ম আলোচনা: قول -এর অর্থ এবং اليوم الاخر পরকাল দ্বারা উদ্দেশ্য।

لَمَّا افْتَتَحَ سُبْحَانَهُ بِشَرْحِ حَالِ الْكِتَابِ الْعَظِيْمِ وَسَاقَ لِبَيَانِهِ ذِكْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ وَ اَطَاَتْ فِيْهِ قُلُوْبُهُمْ اَلْسِنَتَهُمْ وَثَنّٰى بِاَضْدَادِهِمْ اَلَّذِيْنَ مَحَضُوا الْكُفْرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا لَفْتَةً رَأْسًا ثَلَّثَ بِالْقِسْمِ الثَّالِثِ الْمُذَبْذَبِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَهُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ تَكْمِيْلًا لِلتَّقْسِيْمِ وَهُمْ اَخْبَثُ الْكَفَرَةِ وَاَبْغَضُهُمْ اِلَى اللّٰهِ لِاَنَّهُمْ مُوْهُوا الْكُفْرَ وَخَلَّصُوْا بِهِ خِدَاعًا وَاِسْتِهْزَاءً وَلِذَالِكَ طُوِّلَ فِيْ بَيَانِ خُبْثِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَاِسْتَهْزَءَ بِهِمْ وَتَهَكَّمَ بِاَفْعَالِهِمْ وَسَجَّلَ عَلٰى غَيِّهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَضَرَبَ لَهُمُ الْاَمْثَالَ وَاَنْزَلَ فِيْهِمْ: ﴿ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ قِصَّتَهُمْ عَنْ اٰخِرِهَا مَعْطُوْفَةٌ عَلٰى قِصَّةِ الْمُصِرِّيْنَ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র)

যেহেতু আল্লাহ তা'লা তদীয় মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের অবস্থার বিবরণী দিয়ে সূরা বাকারাকে শুরু করেছেন এবং গ্রন্থের অবস্থা বর্ণনার জন্য প্রথমত: সেইসব মুমিনদের আলোচনা এনেছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনকে গ্রহণ করেছে এবং এব্যাপারে তাদের অন্তর তাদের মুখের অনুগত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়ত: তাদের বিপরীত সেইসব লোকদের আলোচনা এনেছেন যারা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সম্পূর্ণভাবে কুফরকে গ্রহণ করে নিয়েছে (ইসলাম ধর্মের প্রতি) একটু তাকিয়েও দেখেনি। তাই মহান আল্লাহ তা'লা এই বন্টনকে পরিপূর্ণ করার জন্য তৃতীয় প্রকার লোকের বর্ণনাও এনেছেন যারা পূর্বের দুই প্রকারের মাঝামাঝি তথা তারা মুখে বিশ্বাস করেছে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেনি। আর এরাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাফির এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অভিসপ্ত। কারণ, তারা কুফরের উপর ঈমানের প্রলেপ দিয়েছে এবং কুফরির সাথে সাথে মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদের সাথে উপহাস করে। এজন্যই এই মুনাফিকদের নিকৃষ্টতা ও তাদের মুর্খতার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাদের সাথে উপহাস করেছেন, ঘোষণা করেছেন তাদের ভ্রষ্টতা, উপস্থাপন করেছেন তাদের উপমা এবং অবতীর্ণ করেছেন তাদের সম্পর্কে– ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار এই আয়াতটি। তাদের পূর্ণ বিবরণী معطوف হয়েছে কুফরির মধ্যে একগুঁয়ামী প্রদর্শনকারীদের বিবরণের উপর।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الاخر
السوال: اكتب ربط الاية بماقبلها

উত্তর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ঃ

সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাঁদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা মুসলমান; কুরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুকায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফিরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদিগকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাঁদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তন্মধ্যে ৬ ও ৭ আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

وَالنَّاسُ اَصْلُهُ أُنَاسٌ لِقَوْلِهِمْ اِنْسَانٌ وَاِنْسٌ وأُنَاسِيْ فَحُذِفَ الْهَمْزَةُ حَذْفَهَا فِيْ لَوْقَةٍ وَعُوِّضَ عَنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيْفِ وَلِذَالِكَ لَايَكَادُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ : اِنَّ الْمَنَايَا يَطَّلِعْنَ ☆ عَلَى الْأُنَاسِ الْاٰ مِنِيْنَا۔ شَاذٌّ وَهُوَ اِسْمُ جَمْعٍ كَرُخَالٍ اِذْ لَمْ يَثْبُتْ فُعَالٌ فِيْ اَبْنِيَةِ الْجَمْعِ مَاخُوْذٌ مِنْ اِنْسٍ لِاَنَّهُمْ مُسْتَاْنِسُوْنَ بِاَمْثَالِهِمْ اَوْ اِنْسٌ لِاَنَّهُمْ ظَاهِرُوْنَ مُبْصَرُوْنَ وَلِذَالِكَ سُمُّوْا بَشَرًا كَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا لِاِجْتِنَانِهِمْ۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: الناس শব্দের তাহকীক)

الناس এটার মূল হল أناس কারণ, আহলে আরবদের উক্তি– انسان۔ انس (যা ناس -এর একবচন) এবং اناسى (যা انسان -এর বহুবচন। সুতরাং এই শব্দগুলোর মধ্যে হামযা আসা একথার প্রমাণ বহন করে যে, الناس -এর মূল اناس ছিল)। অত:পর لوقة শব্দ (যার মূল ছিল الوقة তার) থেকে যেভাবে হামযাকে হযফ করা হয়েছে তদ্রূপ اناس থেকে হামযাকে হযফ করা হয়েছে অত:পর তার পরিবর্তে حرف تعريف তথা الف لام আনা হয়েছে (তাই الناس হয়ে গেল) (যেহেতু الناس -এর আলিফ লামটি হামযার পরিবর্তে এসেছে আর بدل ও مبدل منه একত্র হওয়া দূষণীয়) তাই (الناس -এর মধ্যে) আলিফ লাম এবং হামযা উভয়টি একত্রিত হয় না। তবে কবির উক্তি– ان المنايا يطلعن ☆ على الاناس الا منينا (-এর মধ্যে الاناس শব্দে যে আলিফ লাম এবং হামযার সমাবেশ ঘটেছে তা) বিরল (আর বিরল কথা প্রমাণ হতে পারে না)। আর এটা (তথা ناس) হল اسم جمع যেমন– رخال টি اسم جمع কারণ, বহুবচনের ওযনসমূহের মধ্যে فعال ওযনে কোন শব্দ নেই। ناس শব্দটি নির্গত হয়েছে انس থেকে (যার অর্থ– অন্তরঙ্গ হওয়া, ভালবাসা) কারণ, মানুষ তার স্বজাতীকে ভালবাসে (তাই মানুষকে انسان এবং اناس বলা হয়)। অথবা انس থেকে (যার অর্থ– দেখা) কারণ, মানুষ প্রকাশ্যে থাকে এবং তাকে দেখতে পাওয়া যায়। আর (যেহেতু মানুষ প্রকাশ্যে থাকে এবং দেখা যায়) এজন্য তাদেরকে بشر বলা হয় যেভাবে জ্বিন জাতী চোখের আড়ালে থাকার কারণে তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। (কেননা, بشر এটা নির্গত হয়েছে بشرة থেকে যার অর্থ– চামড়ার উপরাংশ তাই بشر শব্দের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার অর্থ বিদ্যমান বিধায় মানুষ প্রকাশ্যে থাকার কারণে তাদেরকে بشر বলা হয়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: ان المنايا يطلعن ☆ على الاناس الامنينا : এই কবিতাটির কবি অজ্ঞাত। কবিতার

শব্দ-বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হল–

০ المنايا : (ج) منية (و) অর্থ– মৃত্যু।

০ يطلعن : (افتعال) অর্থ– আচমকা আসা।

০ امنين : (ج) امن (و) তার পরের আলিফ বৃদ্ধি করা হয়েছে কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য।

কবিতার অর্থ ঃ নিশ্চয় বিশ্বস্ত লোকদের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ وَمَنْ مَوْصُوْفَةٌ اِذْ لَا عَهْدَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ اَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَنْ مَوْصُوْلَةٌ مُرَادٌ بِهَا اِبْنُ اُبَيٍّ وَاَصْحَابُهُ وَنُظَرَاؤُهُ فَاِنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمْ صَمَّمُوْا عَلَى النِّفَاقِ دَخَلُوْا فِيْ عَدَادِ الْكُفَّارِ الْمَخْتُوْمِ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاِخْتِصَاصُهُمْ بِزِيَادَةٍ زَادُوْهَا عَلَى الْكُفْرِ لَا يَأْبٰى دُخُوْلُهُمْ تَحْتَ هٰذَا الْجِنْسِ فَاِنَّ الْاَجْنَاسَ اِنَّمَا تَتَنَوَّعُ بِزِيَادَاتٍ تَخْتَلِفُ فِيْهَا اَبْعَاضُهَا فَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُ الْاٰيَةُ تَقْسِيْمًا لِلْقِسْمِ الثَّانِيْ۔

অনুবাদ:____

৩য় আলোচনা: الناس শব্দের الف لام টি কোন প্রকারের

الناس -এর আলিফ লামটি جنسى এবং من হল موصوفه কারণ, এখানে নির্দিষ্টতা উদ্দেশ্য নয়। তাই কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন– ومن الناس ناس يقولون ("আর মানুষের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে......)। অথবা الناس -এর আলিফ লাম হল عهدى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল– الذين كفروا আর من হল موصوله এর দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সমসময়িক সাথীরা উদ্দেশ্য। কারণ, তারা নেফাকের উপর অটল থাকার কারণে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেছে, যাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। এবং তারা কুফরি ছাড়া আরো কিছু কাজের সাথে জড়িত থাকায়ও তারা সেসব কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেছে। তাদের কাফিরদের দলে দলভুক্ত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, اجناس বিভিন্ন نوع ধারণ করে থাকে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয়ের দ্বারা যেগুলোতে তাদের অংশের ভিন্নতা হয়। সুতরাং এ সূরতে আয়াতটি দ্বিতীয় দলের বিভক্তিকরণ হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:____

قوله واللام فيه للجنس ومن موصوفة.....الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) الناس -এর মধ্যকার الف لام এর من -এর সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সুতরাং তিনি বলেন, الناس -এর الف لام এবং من يقول -এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. الف لام টি جنسى -এর জন্য। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে جنسى দ্বারা বালাগাত শাস্ত্রবিদদের পরিভাষাগত جنسى উদ্দেশ্য। তাদের মতে, الف لام দু'প্রকার। عهدى এবং جنسى । আর جنسى তিন প্রকার। (ক) যা শুধু হাকীকত বুঝায় (খ) হাকীকতের কোন এক সদস্য বুঝাবে আবার এই সদস্যটি স্মৃতিপটে নির্দিষ্ট থাকবে (গ) হাকীকতের সমস্ত সদস্যকে বুঝাবে। সুতরাং বালাগাত শাস্ত্রবিদদের

পরিভাষায় عهد خارجي ব্যতীত বাকী তিন প্রকার جنسی -এর অন্তর্ভুক্ত; তারা এই তিন প্রকারকে جنسی -এর মধ্যে গণ্য করেন।

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে الف لام টি বালাগাত শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষাগত جنسی তথা استغراقی হবে। সুতরাং তখন الناس -এর অর্থ হবে সমস্ত মানুষ; নির্দিষ্ট কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয়। আর আয়াতের অর্থ হবে– মানুষের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে........। এমতাবস্থায় من হবে موصوفه কেননা, الناس দ্বারা নির্দিষ্ট কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয়, তাই من টি من এর- يقول হবে৷ যা موصوفه نكره -এর ফায়দা দেয়।

২. الف لام টি عهد خارجي -এর জন্য। আর তার معهود হল الذين كفروا এমতাবস্থায় من হবে موصُوله আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল অব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীবর্গ।

قوله فانهم من حيث صمموا على النفاق.....الخ : এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি সৃষ্টি হয়েছিল الناس -এর الف لام -কে عهد خارجي মানার কারণে। কেননা, এমতাবস্থায় الناس -এর معهود হয় পূর্বের الذين كفروا । আর তখন আয়াতের অর্থ হয়– "পূর্বোল্লেখিত কাফিরদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কাফির এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখি; অথচ তারা মুমিন নয়"। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, মুনাফিকরা উল্লেখিত কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ মুনাফিকদের মধ্যে এমন কিছু মন্দ স্বভাব রয়েছে, যা উল্লেখিত কাফিরদের মধ্যে নেই। যেমন– ধোঁকা দেওয়া, উপহাস করা। তাহলে মুনাফিকরা উল্লেখিত কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিভাবে?

এর উত্তর হল– পূর্বোল্লেখিত কাফিরদের অন্তর তো সীলমোহরকৃত। তাদের জন্য ভয়-ভীতি ও সুসংবাদ প্রদান কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। আর মুনাফিকরা তো মূলত: কাফিরই; তারা শুধু মুখে ঈমানের দাবীদার; কিন্তু তাদের অন্তর কুফরি দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সমস্ত মুনাফিকরা যখন তাদের নেফাকের উপর অটল ও অবিচল কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও সেইসব কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অন্তর সীলমোহরকৃত। যদিও এই মুনাফিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী রয়েছে। কারণ, এই গুণাবলীর কারণে তারা কাফির জাতি থেকে খারিজ হয়নি। কেননা, جنس বা জাতের কিছু সদস্যের মধ্যে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই সদস্যরা جنس থেকে খারিজ হয়ে যায় না; বরং এর দ্বারা বড়জোড় সেই جنس -এর অধীনে বিশেষ একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়। যেমন– حيوان হল একটি جنس যার আওতায় রয়েছে মানুষ, গরু-ছাগল ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে বিশেষ একটি গুণ রয়েছে আর সেটা হল বাকশক্তি; কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই গুণটি নেই, তাই বলে মানুষ جنس حيوان থেকে খারিজ হয়নি। তাবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে নতুন একটি نوع বা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। তদ্রূপ মুনাফিকদরে মধ্যে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত গুণ থাকার কারণে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে নতুন একটি শ্রেণী। তাই বলে তারা جنس كافر থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। সুতরাং ان الذين كفروا الخ -এর মধ্যে যে কাফিরদের আলোচনা করা হয়েছে তাদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে ومن الناس من يقول الخ এই আয়াতের মধ্যে। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, অন্তরে সীলমোহরকৃত কাফির দল দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল হল, যাদের মধ্যে ধোঁকা দেয়ার এবং উপহাস করার অভ্যাস নেই এবং আপর দল হল, যারা ঈমানের দাবীদার; অথচ তারা মুমিন নয় এবং তারা ধোঁকা দেয় ও উপহাস করে।

☆☆☆

وَاخْتِصَاصُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ بِالذِّكْرِ تَخْصِيْصٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ الْاَعْظَمُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَادِّعَاءً بِاَنَّهُمْ اِحْتَازُوا الْاِيْمَانَ مِنْ جَانِبَيْهِ وَاَحَاطُوْا بِقُطْرَيْهِ۔

অনুবাদ:

৪র্থ আলোচনা: ঈমানের আলোচনায় বিশেষভাবে আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা উল্লেখ করার এবং باء হরফে জারকে তাকরার আনার কারণ

আল্লাহ এবং পরকালের মধ্যে ঈমানকে সীমাবদ্ধ করার কারণ হল, ঈমানের মহা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে খাছ করার এবং তারা যে ঈমানের দুই প্রান্তকে বেষ্টন করে রেখেছে তা দাবী করার জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ঈমানকে আল্লাহ এবং আখেরাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে দুই কারণে।

১ম কারণ হল– ঈমানের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করা। সুতরাং আল্লাহ এবং পরকাল যেহেতু ঈমানের মুখ্য উদ্দেশ্য আর মুখ্য উদ্দেশ্যের আলোচনা দ্বারা আনুষাঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হয়ে যায়। তাই মুখ্য উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ এবং পরকালের আলোচনাই যথেষ্ট।

২য় কারণ হল– যেসমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয় তন্মধ্যে অস্তিত্বের বিচারে আল্লাহ তা'লা সবার অগ্রবর্তী আর সর্বশেষে হল পরকাল। আর অন্যান্যগুলো যেমন রাসূলগণ, আসমানী কিতাবাদি ফিরিশতাগণ, তাকদীর ইত্যাদি এই সবগুলো অস্তিত্বের বিচারে আল্লাহর পরে এবং আখেরাতের পূর্বে। কাজেই মুনাফিকরা সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষটি উল্লেখ করে একথার দাবী করতে চাচ্ছে যে, তারা ঈমানের দুই প্রান্ত আওয়াল-আখেরকে বেষ্টন করে রেখেছে; এর দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয়, আমরা সবগুলো মানি ও বিশ্বাস করি।

☆☆☆

وَاِيْذَانٌ بِاَنَّهُمْ مُنَافِقُوْنَ فِيْمَا يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُخْلِصُوْنَ فِيْهِ فَكَيْفَ يَقْصِدُوْنَ بِهِ النِّفَاقَ لِاَنَّ الْقَوْمَ كَانُوْا يَهُوْدًا وَكَانُوْا يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ كَلَا اِيْمَانٍ لِاعْتِقَادِهِمُ التَّشْبِيْهَ وَاِتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا غَيْرُهُمْ وَاَنَّ النَّارَ لَنْ تَمَسَّهُمْ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً وَغَيْرُهَا وَيَرَوْنَ الْمُوْمِنُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا مِثْلَ اِيْمَانِهِمْ وَبَيَانُ تَضَاعُفِ خُبْثِهِمْ وَاِفْرَاطِهِمْ فِىْ كُفْرِهِمْ لِاَنَّ مَا قَالُوْهُ لَوْ صَدَرَ عَنْهُمْ لَا عَلٰى وَجْهِ الْخِدَاعِ وَالنِّفَاقِ وَعَقِيْدَتِهِمْ عَقِيْدَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ اِيْمَانًا كَيْفَ وَقَدْ قَالُوْهُ تَمْوِيْهًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَتَهَكُّمًا بِهِمْ وَفِىْ تَكْرِيْرِ الْبَاءِ اِدِّعَاءُ الْاِيْمَانِ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْاِصَالَةِ وَالْاِسْتِحْكَامِ-

অনুবাদ:

(যদি সীমাবদ্ধকারী আল্লাহ তা'লা হন তাহলে সীমাবদ্ধকরণের দুই কারণ)

এবং সেই কথার উপর অবহিত করার জন্য (সীমাবদ্ধ করা হয়েছে) যে, তারা তাদের যেসব কথার ব্যাপারে নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান ধারণা করে, তারা এই ধারণায়ও মুনাফিক আখ্যায়িত হয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয় দ্বারা মুনাফিকী করতে চায় সে বিষয়ে তাদের অবস্থাটা কি হবে (তা একেবারেই পরিস্কার)। কেননা, মুনাফিকদের কওম তো ছিল ইয়াহুদি। এবং ইয়াহুদীরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি এমন বিশ্বাস রাখে যা না রাখারই নামান্তর। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল– আল্লাহ তা'লা মাখলুকেরই ন্যায়, তারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, জান্নাতে শুধু তারাই প্রবেশ করবে, কিছু দিনের জন্য দোযখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি (বিশ্বাস ছিল তাদের)। কিন্তু তারা মুমিনদেরকে দেখাত যে, তারা মুমিনদের মতই ঈমান এনেছে। (সীমাবদ্ধকরণের আরেকটি কারণ হল–) তাদের দ্বিগুণ ভ্রষ্টামী এবং কুফরীতে বাড়াবাড়ির বিবরণ দেয়ার জন্য (সীমাবদ্ধ করা হয়েছে)। কেননা, তারা যা বলে তা যদি প্রতারণা ও নেফাকির উদ্দেশ্যে না হয়ে তাদের আকীদা মোতাবেকও প্রকাশ পেত তবুও তা ঈমান বলে বিবেচিত হত না। আর তা ঈমান বলে বিবেচিত হবেই বা কেমনে; তারা তো তা বলত মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার এবং তাদের সাথে উপহাস করার জন্য।

بـــاء -কে তাকরার আনা হয়েছে তাদের এ দাবী বুঝানোর জন্য যে, আল্লাহ এবং পরকালের উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

যদি সীমাবদ্ধকারী আল্লাহ তা'লা হন তাহলে সীমাবদ্ধকরণের দুই কারণ : ইতিপূর্বে ঈমানকে আল্লাহ এবং আখেরাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যে দুই কারণ বর্ণনা করা হয়েছিল তা ছিল মুনাফিকদেরকে সীমাবদ্ধকারী সাব্যস্ত করে। আর যদি স্বয়ং আল্লাহ তা'লাই সীমাবদ্ধকারী হন তাহলে এই সীমাবদ্ধকরণের কারণ হবে ভিন্ন। নিম্নে এবিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হল–

মুনাফিকরা ছিল ইয়াহুদী : মুরাফিকরা মূলত: ইয়াহুদী সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। আর আল্লাহ এবং

পরকাল সম্পর্কে তাদের আকিদা ছিল অবাস্তব। কেননা, তাদের আকীদা হল– আল্লাহ তা'লা মাখলুকের ন্যায় দেহবিশিষ্ট; তাঁর হাত আছে, পা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং উযায়ের (আ:) আল্লাহর পুত্র। আর জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তাদের আকীদা হল– শুধু তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু দিনের জন্য তারা দোযখে যাবে অত:পর মুক্তি পেয়ে যাবে। তাদের আকীদা তো অবাস্তব কাজেই তাদের ধারণা মতে এগুলো ঈমান হলেও বাস্তবে কিন্তু তা ঈমানই নয়। পক্ষান্তরে মুমিনদের ঈমান ছিল বাস্তবসম্মত। তাই মুনাফিকরা امنا بالله وباليوم الاخر বলে মুমিনদেরকে একথা বুঝাতে চায় যে, আমরা আল্লাহ এবং আখেরাতে তোমদের মতই বিশ্বাসী। অথচ তাদের এই বিশ্বাস ছিল তাদের পূর্বের বিশ্বাস অনুযায়ী এবং অবাস্তব। এই কথাগুলো স্মরণ রেখে এবার বুঝুন যে, আল্লাহ তা'লা বিশেষভাবে بالله وباليوم الاخر এ দুটি বিষয়কে উল্লেখ করলেন কেন? তার দু'টি কারণ রয়েছে।

১. মুনাফিকরা যেসব কথার উপর বিশ্বাসী হওয়ার দাবী করে আল্লাহ তা'লা সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল আল্লাহ ও আখেরাত দিবসকে উল্লেখ করে এ কথার উপর অবহিত করেছেন যে, মুনাফিকদের ধারণা অনুযায়ী তো তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে যে কথাগুলোর উপর তারা বিশ্বাস রাখে সেগুলো মুমিনদের সামনে দাবী করলেও তারা মুনাফিকই হবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস ও দাবী পরস্পর বিরোধ। তাহলে এথেকে বুঝে নাও যে, যেসকল বিষয়কে তারা মূলত: বিশ্বাসই করে না সেগুলোর উপর ঈমান আনার যদি দাবী করে থাকে তাহলে অবস্থা কেমন হবে? অর্থাৎ তখনও তারা আরো উত্তমরূপে মুনাফিক হবে।

২. আল্লাহ তা'লা بالله وباليوم الاخر এই দু'টি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে মুনাফিকদের দ্বিগুণ ভ্রষ্টতা এবং তাদের কুফরির ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কথা বুঝাতে চাচ্ছেন। কেননা, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর তাদের ঈমানের দাবী যদিও মুনাফিকি ও প্রতারণামূলক নাও হয়ে থাকে তবুও তারা মুমিন হতে পারবে না কারণ, এ দু'টি বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ছিল বাস্তবতা বিরোধী। অত:পর যদি মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়ার এবং তাদের সাথে উপহাস করার জন্য امنا بالله وباليوم الاخر বলে থাকে, তাহলে অনুমান করে নিন যে, তা কেমন হবে। এটা তো হবে দ্বিগুণ কুফর। এক তো হল বাস্তবতা বিরোধী বিশ্বাসের কুফর এবং অপরটি হল নেফাক, ধোঁকা এবং প্রতারণার কুফর।

☆☆☆

وَالْقَوْلُ: هُوَ التَّلَفُّظُ بِمَا يُفِيْدُ وَيُقَالُ بِمَعْنَى الْمَقُوْلِ وَلِلْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرِ فِي النَّفْسِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِاللَّفْظِ وَلِلرَّأْيِ وَالْمَذْهَبِ مُجَازًا وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ مِنْ وَقْتِ الْحَشْرِ اِلٰى مَا لَايَنْتَهِيْ اَوْ اِلٰى اَنْ يَدْخُلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ لِاَنَّهٗ اٰخِرُ الْاَوْقَاتِ الْمَحْدُوْدَةِ۔

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: قول -এর অর্থ এবং اليوم الاخر **পরকাল দ্বারা উদ্দেশ্য)**

আর قول বলা হয় উপকারী কথা উচ্চারণ করা। আর বাণীকেও قول বলা হয়। আর রূপকার্থে অন্তরে কল্পিত সেই রচনাকে قول বলা হয় যাকে প্রকাশ করা হয় শব্দের মাধ্যমে। তদ্রূপ অভিমত ও মাযহাবের উপর قول শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর পরকাল দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবস থেকে শুরু করে অসীম দিন পর্যন্ত। অথবা জান্নতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার সময় পর্যন্ত। কেননা, তা নির্দ্ধারিত সময়সমূহের শেষ সময়।

☆☆☆

﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"অথচ তারা মুমিন নয়"

মুসান্নিফ (র.) এই বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: وما أمنوا না বলে وما هم بمؤمنين বলার কারণ। ২য় আলোচনা: মুনাফিকদের দাবীতে ঈমানটি আল্লাহ ও পরকালের সাথে শর্তযুক্ত ছিল; কিন্তু এখানে শর্তহীনভাবে বলার কারণ কি? ৩য় আলোচনা: এই আয়াত ফেরকায়ে কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারবে কি না।

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ: اِنْكَارُ مَا ادَّعَوْهُ وَنَفْيٌ مَا انْتَحَلُّوا اِثْبَاتَهُ وَكَانَ اَصْلُهُ: وَمَا اٰمَنُوْا. لِيُطَابِقَ قَوْلَهُمْ فِي التَّصْرِيْحِ بِشَانِ الْفِعْلِ دُوْنَ الْفَاعِلِ لٰكِنَّهُ عَكَسَ تَاكِيْدًا وَمُبَالَغَةً فِي التَّكْذِيْبِ لِاَنَّ اِخْرَاجَ ذَوَاتِهِمْ مِنْ عِدَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبْلَغُ مِنْ نَفْيِ الْاِيْمَانِ عَنْهُمْ فِيْ مَاضِي الزَّمَانِ وَلِذَالِكَ اَكَّدَ النَّفْيَ بِالْبَاءِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: وما أمنوا **না বলে** وما هم بمؤمنين **বলার কারণ)**

وما هم بمؤمنين মুনাফিকরা যে দাবী করেছিল এবং যে বিষয়কে নিজেদের জন্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল, এই বাক্য দ্বারা তা অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে وما امنوا (جملہ فعليه) হওয়াটাই আসল (তথা উপযোগী) ছিল; তাহলে এই বাক্যটি فاعل -এর অবস্থা প্রকশ ব্যতীত فعل -এর অবস্থা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুনাফিকদের উক্তির মোতাবেক হত। কিন্তু এর বিপরীত করা হয়েছে তাদেরকে জোরালোভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কারণ, (وما هم بمؤمنين -এর মধ্যে তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে وما امنوا -এর সূরতে অতীতকালে শুধু ঈমানের অস্বীকৃতি হয়; তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা হয় না।) তাদের থেকে অতীতকালে শুধু ঈমানকে অস্বীকৃতি করার তুলনায় তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করার

মধ্যে রয়েছে বেশী مبالغه । আর এজন্যই ما نفى কে তাকীদ করা হয়েছে باء -এর মাধ্যমে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم قال وما هم بمؤمنين ولم يقل وما أمنوا ؟

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মুনাফিকরা তো তাদের দাবীতে ফে'ল উল্লেখ করে امنا বলেছিল, আল্লাহ তা'লা তাদের এই দাবী খন্ডনের জন্য বলেছেন وما هم بمؤمنين কিন্তু এখানে যদি وما امنوا বলা হত তাহলে তাদের দাবীর সাথে সামঞ্জস্য থাকত। কারণ, তারা তো فعل উল্লেখ করে দাবী করেছিল। কিন্তু এরকম না করে এর বিপরীত করার কারণ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'লা এভাবে ব্যবহার করে তাদেরকে জোরালোভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। কেননা, وما هم بمؤمنين -এর সূরতে তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা যায়; কিন্তু وما امنوا -এর সূরতে তাদের থেকে অতীতকালে শুধু ঈমানকে নফী করা সম্ভব হয়, তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা সম্ভব হয় না। অথচ তাদের থেকে শুধু অতীতকালে ঈমানকে নফী করার তুলনায় তাদের সত্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করার মধ্যে مبالغه -এর অর্থ বেশী পাওয়া যায়। কেননা, وما امنوا হল جمله فعليه পক্ষান্তরে وما هم بمؤمنين হল جمله اسميه আর جمله اسميه -এর মধ্যে دوام واستمرار পাওয়া যায়। সুতরাং وما هم بمؤمنين বললে তারা কোন কালে যে মুমিন ছিল না; অতীতকালেও নয়, বর্তমানকালেও নয় আবার ভবিষ্যৎকালেও নয়। পক্ষান্তরে وما امنوا বললে শুধু একথা বুঝা যাবে যে, তারা অতীতকালে মুমিন ছিল না।

☆☆☆

২য় আলোচনা: মুনাফিকদের দাবীতে ঈমানটি আল্লাহ ও পরকালের সাথে শর্তযুক্ত ছিল; কিন্তু অত্র আয়াতে এখানে শর্তহীনভাবে বলার কারণ কি?

وَاَطْلَقَ الْاِيْمَانَ عَلٰى مَعْنًى اَنَّهُمْ لَيْسُوْا مِنَ الْاِيْمَانِ فِيْ شَيْءٍ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يُقَيَّدَ بِمَا قَيَّدُوْا بِهِ لِاَنَّهٗ جَوَابُهٗ۔

অনুবাদ:

আর ايمان -কে (এখানে আল্লাহ এবং আখেরাতের সাথে শর্তযুক্ত না করে) শর্তহীনভাবে আনা হয়েছে এ অর্থে যে, কোন বিষয়েই তাদের ঈমান নেই। (অর্থাৎ ঈমানকে শর্তহীন উল্লেখ করে এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান তো দূরে থাক; তাদের তো কোন বিষয়েই ঈমান লাভ হয়নি) আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঈামনকে যে বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছে এখানেও ঈামনটি সেই শর্তের সাথে শর্তযুক্ত হবে (এবং وما هم بمؤمنين দ্বারা وما هم بمؤمنين بالله واليوم الاخر উদ্দেশ্য) । কেননা, এবাক্যটি তো তাদের ঈমানের দাবীর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে। (সুতরাং তাদের ঈামনের দাবীতে بالله وباليوم الاخر উল্লেখ থাকায় সেই দাবীর উত্তরে بالله وباليوم الاخر -এর উল্লেখের প্রয়োজন নেই)।

☆☆☆

وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ مَنِ ادَّعَى الْإِيْمَانَ وَخَالَفَ قَلْبُهُ لِسَانَهُ بِالْإِعْتِقَادِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا لَا أَنَّ مَنْ تَفَوَّهَ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَارِغَ الْقَلْبِ عَمَّا يُوَافِقُهُ اَوْ يُنَافِقُهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَالْخِلَافُ مَعَ الْكَرَّامِيَّةِ فِى الثَّانِىْ فَلَا تَنْتَهِضُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: এই আয়াত ফেরকায়ে কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারে কি না)

আর এই আয়াত দ্বারা সে কথাই বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে; অথচ বিশ্বাসের বেলায় তার মুখ ও অন্তর ভিন্ন, তাহলে সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। কিন্তু যে শাহাদাতাইনকে মুখে স্বীকার করে; তবে তার অন্তর আনুকূল্য ও বিরোধিতা থেকে মুক্ত সে মুমিন নয়– এ কথা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আর কাররামিয়াদের সাথে মতবিরোধ হল দ্বিতীয় সূরত নিয়ে; প্রথম সূরত নিয়ে নয়। কাজেই এ আয়াতটি কাররামিয়াদের বিপরীত দলীল হতে পারে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এই আয়াতটি ফেরকায়ে কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারে কি না?

উল্লেখ্য যে, কাররামিয়ার মতে, ঈমানের জন্য মুখের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট; অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। দলীলের সূরত হল– মুনাফিকরা মুখ দ্বারা ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; কিন্তু অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করে না। তাদের মুখের স্বীকারোক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও অন্তরে সত্যায়ন না থাকার কারণে যখন তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে– وما هم بمؤمنين কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ঈমানের জন্য মুখের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়; রবং সত্যায়ন করাও শর্ত।

☆ মুসান্নিফ (র.) বলেন– এ আয়াতটি কাররামিয়ার বিপরীত দলীল সাব্যস্ত হয় না। কেননা, তাদের অভিমত হল, সেই স্বীকারোক্তি ঈমানের জন্য যথেষ্ট, যে স্বীকারোক্তির সাথে অন্তরে সত্যায়নও নেই এবং অস্বীকৃতিও নেই। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা সত্যায়নও করে না আবার অস্বীকারও করে না। তবে তারা সেই স্বীকারোক্তিকে ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করে না, যে স্বীকারোক্তির সাথে সাথে অন্তরে অস্বীকার করে। কেননা, এ আয়াতটি এই দ্বিতীয় প্রকার লোকদের বেলায় অবতীর্ণ। কিন্তু আয়াত দ্বারা সেই ব্যক্তি মুমিন না হওয়া প্রমাণিত হয় না, যে মুখে স্বীকার করে; কিন্তু অন্তর দ্বারা তা সত্যায়ন করে না এবং অস্বীকারও করে না। কাজেই আয়াত দ্বারা তাদের বিপক্ষে দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

☆☆☆

﴿ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ ﴾

"তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়"

এই বাক্যের অধীনে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: خدع -শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: يخادعون الله -এর ব্যাখ্যা এবং তার উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের নিরসন। ৩য় আলোচনা: মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়?

اَلْـخَدْعُ اَنْ تُوْهِمَ غَيْرَكَ خِلَافَ مَا تُخْفِيْهِ مِنَ الْمَكْرُوْهِ لِتُزِلَّهٗ عَمَّا هُوَ بِصَدِدِهٖ مِنْ قَـوْلِهِـمْ خَدَعَ الضَّبُّ اِذَا تَوَارٰى فِىْ حُجْرِهٖ وَضَبٌّ خَادِعٌ وَخَدِعٌ اِذَا اَوْهَمَ الْحَارِشَ اِقْبَالَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابٍ اٰخَرَ وَاَصْلُهٗ اَلْاِخْفَاءُ وَمِنْهُ اَلْمَخْدَعُ لِلْخَزَانَةِ وَالْاَخْدَعَانِ لِعِرْقَيْنِ خَفِيَّيْنِ فِى الْعُنُقِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: خدع শব্দের তাহকীক)

خدع (ধোঁকা) বলা হয় কাউকে তার লক্ষ্যস্থল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নিজের মন্দ স্বভাব গোপন রেখে তার বিপরীত (তথা ভালটি) 'র ধারণা দেয়া। এটা আরবের উক্তি– خدع الضب থেকে নির্গত। যার অর্থ– গুঁইসাপ তার গর্তে লুকিয়ে যাওয়া। তদ্রূপ এ শব্দটি নির্গত হয়েছে ضب خادع وخدع থেকে। আর এটা তখন বলা হয়, যখন গুঁইসাপ শিকারীকে বুঝায় যে, সে তার দিকে আসছে অত:পর সে অন্য ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। خدع -এর মূল অর্থ হল গোপন করা। আর তা থেকেই مخدع (গোদাম) এবং اخدعان (ঘাড়ের অদৃশ্য শিরাদ্বয়) নির্গত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الخداع؟

উত্তর ঃ

خداع -শব্দের অর্থ ঃ خداع শব্দটি خاء বর্ণে যের অথবা যবর সহকারে পঠিত। এর অর্থ হল– ভিতরে শত্রুতা গোপন রেখে প্রকাশ্যে বন্ধুসুলভ আচরণ করা অর্থাৎ ধোঁকা দেয়া। এই গঠনে যত শব্দ রয়েছে সবগুলোর মধ্যে গোপন করার অর্থ বিদ্যমান। যেমন– خدع الضب অর্থ গুঁইসাপ তার গর্তে লুকযি যাওয়া। তদ্রূপ গোদামকে مخدع বলা হয় কারণ, গোদামের মধ্যে সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়।

☆☆☆

وَالْمُخَادَعَةُ تَكُوْنُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَخِدَاعُهُمْ مَعَ اللّٰهِ لَيْسَ عَلٰى ظَاهِرِهٖ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى لَايَخْفٰى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَلِاَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوْا خَدِيْعَتَهٗ بَلِ الْمُرَادُ اِمَّا مُخَادَعَةُ رَسُوْلِهٖ عَلٰى حَذْفِ الْمُضَافِ اَوْ عَلٰى اَنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسُوْلِ ﷺ مُعَامَلَةُ اللّٰهِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ خَلِيْفَتُهٗ كَمَا قَالَ: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ . اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ وَاِمَّا اَنَّ صُوْرَةَ صَنِيْعِهِمْ مَعَ اللّٰهِ مِنْ اِظْهَارِ الْاِيْمَانِ وَاِسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ وَصَنِيْعِ اللّٰهِ مَعَهُمْ بِاِجْرَاءِ اَحْكَامِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عِنْدَهٗ اَخْبَثُ الْكُفَّارِ وَاَهْلُ الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَاِمْتِثَالُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَمْرَ اللّٰهِ فِيْ اِخْفَاءِ حَالِهِمْ وَاِجْرَاءِ حُكْمِ الْاِسْلَامِ عَلَيْهِمْ مُجَازَاةً لَهُمْ بِمِثْلِ صَنِيْعِهِمْ صُوْرَةُ صَنِيْعِ الْمُتَخَادِعَيْنِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يُّرَادَ بِيُخَادِعُوْنَ يَخْدَعُوْنَ لِاَنَّهٗ بَيَانٌ لِيَقُوْلُ اَوْ اِسْتِيْنَافٌ بِذِكْرِ مَا هُوَالْغَرَضُ مِنْهُ اِلَّا اَنَّهٗ خَرَجَ فِيْ زِنَةِ فَاعَلَةٍ لِلْمُبَالَغَةِ فَاِنَّ الزِّنَةَ لَمَّا كَانَتْ لِلْمُبَالَغَةِ وَالْفِعْلُ مَتٰى غُوْلِبَ فِيْهِ كَانَ اَبْلَغَ مِنْهُ اِذَا جَاءَ بِلَا مُقَابَلَةِ مُعَارِضٍ وَمُبَارٍ اِسْتِصْحَبَتْ ذَالِكَ وَيَعْضُدُهٗ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: يَخْدَعُوْنَ

অনুবাদ:

مخادعه (বা পরস্পর ধোঁকা) দু'জনের মধ্যখানে হয়। আর মুনাফিকদের আল্লাহকে ধোঁক দেয়া তার বাহ্যিক অর্থে নয় কারণ, তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকে না এবং তারাও আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছা রাখে না; বরং তাদের ধোঁকা দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল হয়তো রাসূলকে ধোঁকা দেয়া; যদি এখানে (رسول) مضاف উহ্য ধরা হয়। অথবা রাসূলকে ধোঁকা দেয়া হবে এ অর্থে যে, তিনি তো আল্লাহর প্রতিনিধি তাই রাসূলকে ধোঁকা দেয়া আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন– "যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করলো"। তদ্রূপ আল্লাহ তা'লা বলেন– "নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে বায়আত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহরই নিকট বায়আত হয়েছে"। অথবা আল্লাহ তা'লার সাথে তাদের যে আচরণ তথা ঈমানকে মুখে প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখা এই আচরণের যে অবস্থা এবং তারা সর্বনিকৃষ্টতম কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উপর মুসলমানদের বিধান জারী করে তাদের সাথে আল্লাহ তা'লা যে আচরণ করেছেন, তাছাড়া তাদের আচরণ অনুযায়ী তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের অবস্থা গোপন রাখার এবং তাদের উপর ইসলামের বিধান জারী করতে রাসূল ও মুমনিগণ আল্লাহ তা'লার যে হুকুম পালন করেছেন এই হুকুম পালন এবং সেই আচরণের অবস্থা দুই ধোঁকাবাজের ধোঁকার অনুরূপ।

আর এটাও সম্ভব আছে যে, يخادعون দ্বারা يخدعون উদ্দেশ্য কারণ, এটা তো يقول -এর

বয়ান ও তাফসীর। অথবা يقول -এর উদ্দেশ্য বর্ণনার্থে এটা جملہ مستانفه স্বরূপ। তাবে তাকে باب مفاعله থেকে ব্যবহার করা হয়েছে مبالغه -এর উদ্দেশ্যে। কেননা, مفاعله -এর ওযন যেহেতু مغالبه -এর জন্য গঠিত আর পরস্পর বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে যখন কোন কাজ করা হয় তখন এই কাজের মধ্যে সেই কাজের তুলনায় مبالغه বেশী থাকে যে কাজটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত করা হয়ে থাকে। তাই مفاعله -এর ওযনের মধ্যে مبالغه -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। এছাড়া يخدعون -এর কেরাতও তার সমর্থন করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كيف يخادعون الله والله تعالى يعلم ما في الصدور ؟

মুনাফিকদের ধোঁকা দেয়ার অর্থ ঃ

এ আয়াতের মধ্যে একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে– মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ আল্লাহকে তো ধোঁকা দেয়া অসম্ভব। কারণ, তিনি তো মানুষের অন্তরের গোপন খবর জানেন। আর ধোঁকা তো সেই ব্যাক্তিকেই দেয়া সম্ভব, যার পরিণাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তাছাড়া মুনাফিকরা তো মূলতঃ ইয়াহুদী ছিল আর ইয়াহুদীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কাজেই আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ কি? সাথে সাথে আয়াতের মধ্যে يخادعون ব্যবহার হয়েছে, যা باب مفاعله থেকে এসেছে। আর এই বাবের একটি বৈশিষ্ট হল مشاركت তথা কোন কাজ যৌথভাবে করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে– "মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকা দেন"। আর একথা পরিস্কার যে, মানুষ তখন ধোঁকা দেয় যখন সরাররি বদলা নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর অল্লাহ তো কোন কিছুর উপর অক্ষম নন। সুতরাং আল্লাহর ধোঁকা দেয়া অসম্ভব। এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

১ম ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ধোঁকা দেয় না; বরং তারা ধোঁকা দেয় রাসূলকে। তাই এখানে يخادعون الله -এর অর্থ হবে يخادعون رسول الله ("তারা আল্লাহর রাসূলকে ধোঁকা দেয়") অর্থাৎ এখানে رسول মুযাফ উহ্য আছে। যেহেতু রাসূল হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি কাজেই রাসূলকে ধোঁকা দেয়া আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর বিধায় রাসূলকে উহ্য রাখা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে– ومن يطع الرسول فقد اطاع الله "যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করলো"। আরো ইরশাদ হচ্ছে– ان الذين يباعونك انما يباعون الله "নিশ্চয় যারা তোমার নিকট বায়আত হয়েছে তারা মূলতঃ আল্লাহর কাছেই বায়আত হয়েছে"।

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ হল আল্লাহর রাসূলকে ধোঁকা দেয়া।

২য় ব্যাখ্যা: এখানে مخادعت বা ধোঁকা দেয়া দ্বারা তার মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুনাফিকদের যে আচরণ ছিল তথা মুখে ঈমানের দাবী করে অন্তরে কুফর গোপন রাখা। তদ্রূপ আল্লাহ তা'লার যে আচরণ তাদের সাথে; তারা নিকৃষ্টতম কাফির এবং নিম্নস্তরের দোযখী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন এবং রাসূল ও মুমিনগণও তাদেরকে মুসলমান বলে ধরে নিচ্ছেন। সতরাং মুনাফিকদের আচরণ আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর আচরণ তাদের সাথে এই উভয়পক্ষের পরস্পরের আচরণকে ধোঁকাবাজের আচরণের সাথে তাশবীহ দিয়ে مشبه به -এর শব্দ مخادعة কে উল্লেখ করে তার দ্বারা উভয় পক্ষের আচরণ-বিধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

৩য় ব্যাখ্যা: باب مفاعله -এর বৈশিষ্ট্য যদিও مشاركت তথা যৌথভাবে কোন কাজ করা বুঝায়;

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই مشاركت উদ্দেশ্য থাকে না। তার দৃষ্টান্ত যেমন– عاقبت اللص অর্থ– আমি চোরের পিছু নিলাম। এখানে عاقبت ফে'লটি এসেছে باب مفاعله থেকে; কিন্তু তাতে مشاركت বৈশিষ্ট্যটি উদ্দেশ্য নয় কারণ, তার অর্থ এ নয় যে, আমি চোরের পিছু নিলাম এবং চোরও আমার পিছু নিয়েছে। তদ্রূপ يخادعون-এর অর্থ হল يخدعون তথা এখানে ধোঁকা শুধু একপক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সতরাং আয়াতের অর্থ হবে– "মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়"। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকা দেন।

☆☆☆

وَكَانَ غَرَضُهُمْ فِيْ ذَالِكَ اَنْ يَدْفَعُوْا عَنْ اَنْفُسِهِمْ مَا يَطْرُقُ بِه مَنْ سَوَاهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ وَاَنْ يُفْعَلَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْاِكْرَامِ وَالْاِعْطَاءِ وَاَنْ يَخْتَلِطُوْا بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيَطَّلِعُوْا عَلٰى اَسْرَارِهِمْ وَيُذِيْعُوْا اِلٰى مَنَابِذِيْهِمْ اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়?)

আর তাদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল– (১) তারা ব্যতীত অন্যান্য কাফিরদের উপর যে বিপদ আসে তা থেকে আত্মরক্ষা করা। (২) মুমিনদেরকে যেভাবে সম্মান ও পুরস্কার দেয়া হয়, তারাও সেভাবে সম্মান ও পুরস্কার যেন পায়। (৩) মুসলমানদের সাথে মিশে তাদের গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের নিকট যেন প্রচার করতে পারে। এছাড়াও আরো অনেক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هو مقصود خداعهم؟

উত্তর ঃ

মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়? মুনাফিকরা তিন কারণে ধোঁকা দেয়। (১) লাভের আশায় (২) বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য (৩) ক্ষতি পৌঁছানোর জন্য।

১. লাভের আশায়: অর্থাৎ মুসলমানগণ যেভাবে গণীমতের মাল পায় তারাও তা পাওয়ার আশায় ধোঁকা দিয়ে থাকে। কারণ, তারা এভাবে ধোঁকা না দিলে তারা যে মুসলমান নয়; তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাই তারা ধোঁকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে।

২. বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য: অর্থাৎ অন্যান্য কাফিরদের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয় যেমন তাদেরকে যুদ্ধের মধ্যে হত্যা করা হয় এবং দেশান্তর করা হয়। মুনাফিকরা তা থেকে আত্মরক্ষার্থে ধোঁকা দেয়ার পথ বেছে নিয়েছে।

৩. ক্ষতি পৌঁছানোর লক্ষ্যে: অর্থাৎ তারা মুসলমানদের দলে ভিড়ে তাদের গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তা কাফিরদের নিকট প্রচার করা। এছাড়াও আরো অনেক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

﴿ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ﴾

"অথচ তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না"

মুসান্নিফ (র.) এ বাক্য সম্পর্কে দু'টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: يخدعون -এর কেরাতসমূহ। ২য় আলোচনা: نفس -শব্দের তাহকীক।

وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ: قَرَأَهٗ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيْرٍ وَاَبُوْعَمْرٍو. وَالْمَعْنٰى: اِنَّ دَائِرَةَ الْخِدَاعِ رَاجِعَةٌ اِلَيْهِمْ وَضَرَرُهَا يُحِيْقُ بِهِمْ اَوْ اِنَّهُمْ فِيْ ذَالِكَ خَدَعُوْا اَنْفُسَهُمْ لِمَا غَرُّوْهَا بِذَالِكَ وَخَدَعَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ حَيْثُ حَدَّثَتْهُمْ بِالْاَمَانِى الْفَارِغَةِ وَحَمَلَتْهُمْ عَلٰى مُخَادَعَةِ مَنْ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ . وَقَرَأَ الْبَاقُوْنَ: وَمَا يَخْدَعُوْنَ لِاَنَّ الْمُخَادَعَةَ لَايُتَصَوَّرُ اِلَّا بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَقُرِئَ يُخَدِّعُوْنَ مِنْ خَدَّعَ وَيُخَدَّعُوْنَ بِمَعْنٰى يَخْتَدِعُوْنَ وَيُخْدَعُوْنَ وَيُخَادَعُوْنَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَنَصْبُ اَنْفُسِهِمْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ۔

অনুবাদ:______________________________

১ম আলোচনা: يخدعون -এর কেরাতসমূহ

وما يخدعون) -এর মধ্যে ছয়টি কেরাত: দু'টি হল মুতাওয়াতির এবং চারটি শায। মুতাওয়াতির দু'টি হল يُخَادِعُوْنَ বাবে مفاعله থেকে এবং يَخْدَعُوْنَ বাবে فتح থেকে। يَخْدِعُوْنَ এটা) নাফে', ইবনে কাছীর এবং আবু আমর (র.) -এর। আর তখন অর্থ হবে– ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি তাদের দিকেই ফিরবে এবং তাদেরকে গ্রাস করবে। অথবা এতে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে কারণ, তারা নিজেদেরকে অপুরণ আশা দিয়েছে এবং তাদের অন্তরও তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে কারণ, তাদের অন্তর তাদেরকে অনর্থক আশা দিয়েছে এবং তাদেরকে সেই মহান সত্তার সাথে ধোঁকাবজি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নেই। আর অন্যান্য কারীগণ وما يخدعون পড়েছেন। কেননা, مخادعت তো দুই ব্যাক্তি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। আর خدّع থেকে يخدّعون ও পড়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ يخدعون (প্রতারিত হওয়া) এবং يُخادَعون মাজহুল হিসেবেও পড়া হয়। আর তখন انفسهم টি منصوب على نزع الخافض ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:______________________________

السوال: كم قرأة فى وما يخدعون وما هى؟

উত্তর ঃ وما يخدعون -এর ছয়টি কেরাত–

১. وما يَخْدَعُوْنَ (باب فتح থেকে معروف হিসেবে)।
২. وما يُخَادِعُوْنَ (باب مفاعله থেকে معروف হিসেবে)।
৩. وما يُخَدِّعُوْنَ (باب تفعيل থেকে অর্থ– অনেক ধোঁকা দেয়া)।
৪. وما يَخِدِّعُوْنَ (باب افتعال থেকে অর্থ– প্রতারিত হওয়া)।
৫. وما يُخْدَعُوْنَ (باب فتح থেকে مجهول হিসেবে)।
৬. وما يُخَادَعُوْنَ (باب مفاعله থেকে مجهول হিসেবে)।

তন্মধ্যে প্রথম দু'টি কেরাত মুতাওয়াতির আর বকিগুলো শায।

ফায়দা: قوله والمعنى ان دائرة الخداع ....الخ : এটা দ্বিতীয় কেরাতের উপর আরোপিত দু'টি প্রশ্নের নিরসন। দ্বিতীয় কেরাতটি ছিল وما يُخَادِعُوْن । প্রশ্ন দু'টি নিম্নরূপ–

☆ প্রথম প্রশ্ন হল– এ কেরাত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয়– তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয় না। অথচ পূর্বের বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং মুমনিদেরকে ধোঁকা দেয়।

☆ দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– يخادعون তো باب مفاعله থেকে গঠিত। আর বাব مفاعله-এর বৈশিষ্ট হল দু'জন মিলে কোন কাজ করা। সুতরাং তখন আয়াতের অর্থ হবে– মুনাফিকরা তাদের অন্তরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদের অন্তরও তাদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এটা অসম্ভব কারণ, নিজেকে তো ধোঁকা দেয়া যায় না। সুতরাং একথা কিভাবে সঠিক হবে যে, তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়?

☆ এ প্রশ্ন দু'টির উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন– তারা আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে কারণ, এই ধোঁকার শাস্তি তারা নিজেরাই বহন করতে হবে। সুতরাং এভাবে তারা নিজেদেরকে ধেঁকা দিয়েছে। তদ্রূপ তাদের মনও তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে কারণ, তাদের মন তাদেরকে এই বলে ধোঁকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, তোমরা যদি মুমিনদের সামনে গিয়ে বল "আমরা তোমাদের মত ঈমান এনেছি এবং তোমাদেরই সাথে আছি" তাহলে তোমরা তাদের মত গণীমতের মাল পাবে এবং তাদেরই ন্যায় তোমরা সম্মান পাবে। অথচ তাদের মন তাদেরকে যে আশা দিয়েছে তা পুরণ হওয়ার মত নয়। সুতরাং এভাবে তাদের মন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। فلا اعتراض

☆☆☆

وَالنَّفْسُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَحَقِيْقَتُهُ ثُمَّ قِيْلَ لِلرُّوْحِ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَيِّ بِه وَلِلْقَلْبِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّوْحِ اَوْمُتَعَلَّقُهُ وَلِلدَّمِ لِاَنَّ قِوَامَهَا بِه وَلِلْمَاءِ لِفَرْطِ حَاجَتِهَا اِلَيْهِ وَلِلرَّأْيِ فِيْ قَوْلِهِمْ فُلَانٌ يُؤَامِرُ نَفْسَهُ لِاَنَّهُ يَنْبَعِثُ عَنْهَا اَوْ يُشْبِهُ ذَاتًا يَأْمُرُهُ وَيُشِيْرُ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْاَنْفُسِ هٰهُنَا ذَوَاتُهُمْ وَيَحْتَمِلُ حَمْلُهَا عَلٰى اَرْوَاحِهِمْ وَاٰرَائِهِمْ-

(২য় আলোচনা: نفس শব্দের বিশ্লেষণ)

অনুবাদ:

نفس -এর (মূল অর্থ হল) বস্তুর সত্ত্বা ও তার হাকীকত। অত:পর (রূপকার্থে) রূহকে নফস বলা হয় কারণ, প্রাণীর সত্ত্বা রূহের মাধ্যমে টিকে থাকে। তদ্রূপ কলবকে নফস বলা হয় কারণ, কলব হচ্ছে রূহের স্থান অথবা তার সম্পর্কের স্থান। রক্তকেও নফস বলা হয় কারণ, রক্তের মাধ্যমে নফস টিকে থাকে। পানিকেও নফস বলে কারণ, পানির প্রতি নফস বেশী মুখাপেক্ষী। অভিমতকেও নফস বলা হয় যেমন আরবদের উক্তি– فلان يؤامر نفسه (অমুক তার অভিমতের সাথে পরামর্শ করছে)। কারণ, অভিমত তো নফসের ভিতর থেকেই বের হয় অথবা মানুষের অভিমত এক যাত ও সত্তার ন্যায়, যা তাকে হুকুম ও পরামর্শ দেয়। আয়াতের মধ্যে নফস দ্বারা মুনাফিকদের সত্তা উদ্দেশ্য। আবার নফস দ্বারা তাদের রূহ এবং অভিমতও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে।

﴿وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾

"অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না"

لَايُحِسُّوْنَ بِذَالِكَ لِتَمَادِىْ غَفْلَتِهِمْ جُعِلَ لُحُوْقُ وَبَالِ الْخِدَاعِ وَرُجُوْعُ ضَرِّه اِلَيْهِمْ فِي الظُّهُوْرِ كَالْمَحْسُوْسِ الَّذِىْ لَايَخْفٰى اِلَّا عَلٰى مَؤُفِ الْحَواسِّ

وَالشُّعُوْرُ: اَلْاِحْسَاسُ وَمَشَاعِرُ الْاِنْسَانِ حَوَاسُّهٗ وَاَصْلُهٗ: اَلشَّعْرُ وَمِنْهُ اَلشِّعَارُ۔

অনুবাদ:

তারা সীমাহীন উদাস হওয়ার কারণে তা অনুভবই করতে পরে না। ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে এটাকে প্রকাশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এমন অনুভূত বস্তুর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে যা কারো নিকট গোপন নয়; তবে যার অনুভূতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তার ব্যাপার ভিন্ন। شـعـور অর্থ– উপলব্ধি করা, মানুষের অনুভূতি শক্তি। তার মূল বর্ণ হল شـعـر (চুল) তার থেকেই شعار শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: لم قال "وما يشعرون" ولم يقل "وما يعقلون"؟

وما يشعرون **বলার কারণ:**

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ধোকা দেয়ার ক্ষতি তো দেখার বস্তু নয়; বরং বুঝার বস্তু। তাই এখানে ومـا يشعرون না বলে وما يعقلون বলাই উচিত ছিল। কিন্তু وما يشعرون বলা হল কেন?

এর উত্তর হল– وما يشعرون এ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাদের ধোঁকা দেয়ার কারণে যে তাদেরই ক্ষতি হবে তা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। তাই তাদের এই ক্ষতিকে شـئ محسوس (অনুভূত বস্তু) -এর মধ্যে গণ্য করে যেভাবে অনুভূত বিষয়ের অনুভব না করাকে عـدم شـعـور দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। অনুরূপ ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি না বুঝাকে عـدم شعور দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তখন অর্থ হবে– ধোঁকা দেয়ার কারণে মুনাফিকদের যে ক্ষতি হবে তা অনুভূত বস্তুর ন্যায় পরিস্কার। কিন্তু সীমাহীন উদাসীনতার কারণে তারা যেন এমন হয়ে গেল যে, তাদের অনুভূতি শক্তিই নেই। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লা সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। চতুষ্পদ জন্তুর তো অনুভূতি শক্তি আছে; কিন্তু এইসব মুনাফিকদের অনুভূতি শক্তি হারিয়ে গেছে।

☆☆☆

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا﴾

"তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন"

এ আয়াত সম্বন্ধে মুসান্নিফ (র.) দু'টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: مـــــرض শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা কি উদ্দেশ্য।

اَلْـمَـرَضُ: حَقِيْقَةٌ فِيْمَا يَعْرِضُ الْبَدَنَ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ الْخَاصِّ بِهٖ وَيُوْجِبُ الْـخَـلَلَ فِيْ اَفْعَالِهٖ وَمُجَازٌ فِى الْاَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ الَّتِيْ تُخِلُّ بِكَمَالِهٖ كَالْجَهْلِ وَسُوْءِ الْـعَـقِيْدَةِ وَالْحَسَدِ وَالضَّغِيْنَةِ وَحُبِّ الْمَعَاصِيْ لِاَنَّهَا مَانِعَةٌ عَنْ نَيْلِ الْفَضَائِلِ اَوْ مُؤَدِّيَةٌ اِلٰى زَوَالِ الْحَيٰوةِ الْحَقِيْقَةِ الْاَبَدِيَّةِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: مرض -শব্দের বিশ্লেষণ)

مــرض -এর মূল অর্থ– সেই বস্তু যা দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেহকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বহির্ভূত করে দেয় এবং তার ক্রিয়সমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আর রূপক অর্থে– সেই আত্মিক অবস্থাকে বলে যা আত্মা পূর্ণতা লাভ করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন– মুর্খতা, মন্দ আকীদা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং পাপের মহব্বত। কারণ, এগুলো ফযীলত লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় অথবা হাকীকী ও চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى ما هي حقيقة المرض ومجازه؟

مرض -শব্দের হাকীকী অর্থ ঃ

হাকীকী অর্থে مرض বলা হয় দেহের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যার কারণে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা তথা আরাম-শান্তি এবং শক্তি আর থাকে না এবং ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে যেভাবে কাজ-কর্ম করা যেতো সেভাবে আর করা যায় না।

মুজাযী অর্থে مرض বলা হয় আত্মার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যা আত্মাকে পূর্ণতা লাভ করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন মুর্খতা, খারাপ আকীদা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং গোনাহের প্রতি আকর্ষণ। কারণ, এই অবস্থাগুলো মানুষকে মর্যাদা লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়; যদি সেই অবস্থাটি কুফর না হয়। আর যদি কুফর হয় তাহলে যেভাবে দৈহিক ব্যধি দেহকে পূর্ণতা লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আর কোন কোন সময় ধ্বংসের দিকেও ঠেলে দেয়, সেভাবে আত্মার ব্যধি আত্মাকে ফযীলত এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভে বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি কোন কোন সময় আত্মাকে পরকালের চিরস্থায়ী জীবন তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে ফেলে।

وَالْآيَةُ تَحْتَمِلُهُمَا فَإِنَّ قُلُوْبَهُمْ كَانَتْ مُتَأَلِّمَةً تَحَرُّقًا عَلٰى مَا فَاتَ عَنْهُمْ مِنَ الرِّيَاسَةِ وَحَسَدًا عَلٰى مَا يَرَوْنَ مِنْ ثُبَاتِ أَمْرِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَاسْتِعْلَاءِ شَانِه يَوْمًا فَيَوْمًا وَزَادَ اللّٰهُ غَمَّهُمْ بِمَا زَادَ فِيْ إِعْلَاءِ أَمْرِه وَإِشَادَةِ ذِكْرِه وَنُفُوْسُهُمْ كَانَتْ مُوْفَةً بِالْكُفْرِ وَسُوْءِ الْإِعْتِقَادِ وَمُعَادَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْوِهَا فَزَادَ اللّٰهُ ذَالِكَ بِالطَّبْعِ أَوْ بِازْدِيَادِ التَّكَالِيْفِ وَتَكْرِيْرِ الْوَحْيِ وَتَضَاعِيْفِ النَّصْرِ وَكَأَنَّ إِسْنَادَ الزِّيَادَةِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُسَبِّبٌ مِنْ فِعْلِه وَإِسْنَادُهَا إِلَى السُّوْرَةِ قَوْلُهُ تَعَالٰى: "فَزَادَهُمْ رِجْسًا" لِكَوْنِهَا سَبَبًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَرَضِ : مَا تَدَاخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنَ الْجُبْنِ وَالْخَوْرِ حِيْنَ شَاهَدُوْا شَوْكَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمْدَادَ اللّٰهِ لَهُمْ بِالْمَلٰئِكَةِ وَقَذْفِ الرُّعْبِ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَبِزِيَادَتِه تَضْعِيْفُهُ بِمَا زَادَ لِرَسُوْلِه ﷺ نُصْرَةً عَلَى الْأَعْدَاءِ وَتَبَسُّطًا فِي الْبِلَادِ۔

অনুবাদ:____

(২য় আলোচনা: আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আয়াতের মধ্যে হাকীকী ও মুজাযী উভয় রকম ব্যধি উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যে রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়েছিল এবং রাসূলের মিশণ দিন দিন যে এগুচ্ছে এবং তাঁর সম্মান যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কারণে মুনাফিকদের মন ছিল ব্যথিত। আর আল্লাহ তা'লা রাসূলের মিশণকে আরো এগিয়ে দিয়ে তাদের সেই ব্যথাকে বাড়িয়ে দিলেন। তাছাড়া কুফর, খারাপ আকিদা এবং রাসূলের সাথে হিংসা-বিদ্বেষের কারণেও তাদের মন ছিল হতাশাগ্রস্ত। আল্লাহ তা'লা তাদের এই হতাশাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন অন্তরে মোহর মেরে। কারণ, তিনি তো শরঈ বিধানাবলীকে দিন দিন বৃদ্ধি করছেন, ওহীর পুনরাবৃত্তি এবং সাহায্য বাড়াচ্ছেন। সম্ভবতঃ আয়াতের মধ্যে যে রোগবৃদ্ধির সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার দিকে তা এ হিসেবে যে, এ রোগবৃদ্ধি তো তার সৃষ্টির কারণেই হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লার বাণী– فزادهم رجسا -এর মধ্যে রোগবৃদ্ধির নিসবত করা হয়েছে সূরার দিকে; সূরা তাদের নাপাকী তথা কুফর বৃদ্ধির কারণ হিসেবে। আর এটাও সম্ভব আছে যে, এখানে مرض বা ব্যধি দ্বারা উদ্দেশ্য হল– মুসলমানদের জাঁক-জমক, এবং ফিরিশতাগণের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে মুনাফিকদের মনে যে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন; ফলে তাদের মনে যে ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল এই ভয়-ভীতি ও দুর্বলতাই আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা উদ্দেশ্য। আর রোগবৃদ্ধি দ্বারা রাসূলকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকরণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিজয়ের পতাকা উড্ডয়নকরণ -এর কারণে মুনাফিকদের ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: ما المراد بالمرض فى هذه الاية؟ وما هو سبب المرض فى المنافقين؟

আয়াতের মধ্যে مرض (ব্যধি) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

পূর্বে مرض -এর হাকীকী ও মুজাযী অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা এ উভয় অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

☆ যদি مرض দ্বারা হাকীকী মরয উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার বিশ্লেষণ হবে এভাবে যে, তাদের অন্তর বাস্তবিক অর্থে বেদনাগ্রস্ত ছিল; আল্লাহ তা'লা রাসূল ও মুমিনগণের সম্মান বৃদ্ধি করে মুনাফিকদের সেই দুঃখ-বেদনাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।

☆ আর যদি مرض দ্বারা মুজাযী মরয উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে এভাবে যে, মুনাফিকদের অন্তর কুফর, খারাপ আকিদা, রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি ব্যধিতে আক্রান্ত ছিল। আর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের এই ব্যধি আরো বড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে মোহর মেরে। তদ্রূপ তাদের সেই ব্যধিকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে রাসূলের উপর বারবার ওহী অবতীর্ণ করে। কেননা, কুরআনের যত আয়াত নাযিল হবে তাদের কুফরি আরো ততো বাড়তে থাকবে। এমনিভাবে রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেও তাদের অন্তরের ব্যধিকে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

☆ অথবা এখানে مرض দ্বারা মনের ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তা'লা দিন দিন রাসূলের দাওয়াতী মিশণকে এগিয়ে নিচ্ছেন এবং চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করছেন। এসব পরিস্থিতি দ্বারা মুনাফিকদের মনে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে এতে তাদের মন আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। আয়াতের মধ্যে সেই ভীতি সঞ্চার ও তাদের মনের দুর্বলতাকে ব্যক্ত করা হয়েছে مرض শব্দ দ্বারা।

☆☆☆

﴿ولهم عذاب اليم﴾

"আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি"

أَىْ مُؤْلَمٌ يُقَالُ أَلِمَ فَهُوَ أَلِيْمٌ كَوَجِعَ فَهُوَ وَجِيْعٌ وُصِفَ بِهِ الْعَذَابُ لِلْمُبَالَغَةِ كَقَوْلِهِ: تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيْعٌ عَلَى طَرِيْقِ قَوْلِهِمْ جَدَّ جِدُّهُ۔

অনুবাদ:

اليم অর্থ কষ্টপ্রাপ্ত। যেমন বলা হয়– أَلِم (কষ্ট পাওয়া) তার থেকে সিফাতে মুশাব্বাহ হল اليم (অর্থ কষ্টপ্রাপ্ত) যেভাবে وجع থেকে وجيع। اليم টি عذاب -এর সিফাত হয়েছে مبالغه -এর জন্য। যেমন কবির উক্তি– تحية بينهم ضرب وجيع এটা আরবদের উক্তি جد جده -এর নিয়মানুসারে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اليم অর্থ– কষ্টপ্রাপ্ত। এটা الم বাবে سمع থেকে নির্গত। এখন প্রশ্ন হল– اليم অর্থ তো কষ্টপ্রাপ্ত আর কষ্টপ্রাপ্ত তো শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হয়, কিন্তু আযাব বা শাস্তি তো কষ্টপ্রাপ্ত হয় না; বরং অন্যকে কষ্ট দেয়। তাহলে এখানে عـــذاب -এর সিফাত اليـــم কিভাবে আনা হল? কারণ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাস্তিটি কষ্টপ্রাপ্ত হবে। অথচ বিষয়টি কিন্তু এমন নয়।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে اليم দ্বারা عـذاب -এর সিফাত আনা হয়েছে শাস্তির মধ্যে مبـالـغه -এর অর্থ সৃষ্টি করার জন্য। অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য এমন শাস্তি রয়েছে, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক; এ শাস্তিটি তাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বয়ং শাস্তি এখন কষ্ট পাচ্ছে। বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য দু'টি উদাহরণ পেশ করাছি। যেমন জৈনক কবির উক্তি– تحية بينهـم ضرب وجيع এখানে وجيع শব্দ দ্বারা ضرب কে গুণান্বিত করা হয়েছে। وجيع অর্থ কষ্টপ্রাপ্ত। সুতারং ضرب وجيع অর্থ হবে কষ্টপ্রাপ্ত প্রহার। অথচ প্রহার তো কষ্ট পায় না; বরং কষ্ট তো পায় যাকে প্রহার করা হয়। অতএব বলতে হবে এখানে ضرب -এর সিফাত আনা وجيع শব্দ দ্বারা প্রহারের অর্থে مبـالـغه সৃষ্টির জন্য। অর্থাৎ প্রহারটি এমন কষ্টাদায়ক যে, সে নিজেই এখন কষ্ট পাচ্ছে। তদ্রূপ আরবদের উক্তি– جـد جـده যার অর্থ হল– তার চেষ্টা সফল হয়েছে। সফল হওয়াকে চেষ্টার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ যে চেষ্টা করে সে সফল হয়; চেষ্টা তো সফল হয় না। তদ্রূপ উক্ত আয়াতের মধ্যে اليـم -কে عـذاب -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴾

"তাদের মিথ্যাচারের দরুন"

এ বাক্যের মধ্যে দু'টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: তার কেরাতসমূহ। ২য় আলোচনা: كذب শব্দের অর্থ এবং তার হুকুম।

قَرَأَهَا عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَالْمَعْنٰى بِسَبَبِ كِذْبِهِمْ اَوْ بِبَدْلِهٖ جَزَاءً لَّهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُمْ اٰمَنَّا وَقَرَأَ الْبَاقُوْنَ يُكَذِّبُوْنَ مِنْ كَذَّبَهُ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يُكَذِّبُوْنَ الرَّسُوْلَ بِقُلُوْبِهِمْ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَطَارِ دِيْنِهِمْ اَوْ مِنْ كَذَّبَ الَّذِىْ هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ اَوِ التَّكْثِيْرِ مِثْلُ بَيَّنَ الشَّيْءُ وَمَوَّتَتِ الْبَهَائِمُ اَوْ مِنْ كَذَّبَ الْوَحْشِيُّ اِذَا جَرٰى شَوْطًا وَوَقَفَ لِيَنْظُرَ مَا وَرَائَهٗ فَاِنَّ الْمُنَافِقَ مُتَحَيِّرٌ مُتَرَدِّدٌ۔

অনুবাদ:____

১ম আলোচনা: يكذبون -এর কেরাতসমূহ

يـكـذبـون (ذال -কে তাখফীফ সহকারে পঠিত) কারী আসিম, হামযা এবং কাসাঈ এরকম পড়ে থাকেন। আয়াতের অর্থ হল– তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে তাদের মিথ্যাচারের

কারণে। অথবা তাদের মিথ্যার প্রতিফল হিসেবে। আর সেই মিথ্যা কথাটি হল তাদের উক্তি– امنا (আমরা ঈমান এনেছি)। আর অন্যান্য কারীগণ يكذبون (ذال -কে মুশাদ্দাদ করে) كذب থেকে পড়েছেন। কেননা, এই মুনাফিকরা রাসূলকে তাদের অন্তর দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং যখন তারা তাদের স্বধর্মীয় লোকদের নিকট গমন করে তখনও তারা রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করত। অথবা يكذّبون টি সেই كذب থেকে নির্গত যা مبالغه বা আধিক্যতা বুঝায়। যেমন بين الشئ এবং موتت البهائم (প্রথমটি مبالغه -এর মিছাল যার অর্থ হল– বস্তুটি খুব প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্বিতীয়টি تكثير -এর মিছাল যার অর্থ হল– চতুষ্পদ জন্তু প্রচুরহারে মারা গেছে)। (يكذّبون অর্থ হবে মুনাফিকরা শক্ত মিথ্যা বলেছে; যদি তাতে مبالغه ধরা হয়। অথবা অর্থ হবে– মুনাফিকরা অধিক মিথ্যা বলেছে; যদি তাতে تكثير -এর অর্থ মানা হয়)। অথবা يكذّبون টি كذب الوحشي থেকে নির্গত যার অর্থ হল– হিংস্রপ্রাণী কিছু দৌড়ে থেমে যাওয়া, যাতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে; আর এটা তার সংশয়ের ফলাফল)। তদ্রূপ মুনাফিকরাও বিস্মিত ও হতভম্ব।

☆☆☆

وَالْكِذْبُ هُوَ الْخَبَرُ عَنِ الشَّيْءِ عَلٰى خِلَافِ مَا هُوَ بِه وَهُوَ حَرَامٌ كُلُّهٗ لِاَنَّهٗ عَلَّلَ بِه اِسْتِحْقَاقَ الْعَذَابِ حَيْثُ رَتَّبَ عَلَيْهِ وَمَا رُوِىَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَبَ ثَلَاثًا فَالْمُرَادُ اَلتَّعْرِيْضُ وَلٰكِنْ لَمَّا شَابَهَ الْكِذْبَ فِيْ صُوْرَتِه سُمِّيَ بِه۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: كذب -এর অর্থ এবং তার হুকুম)

কোন বস্তু সম্পর্কে অবাস্তব সংবাদ দেয়াকে كذب বলে। মিথ্যা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ, (আয়াতের মধ্যে) মিথ্যাকে শাস্তির উপযুক্ততার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, শাস্তির উপযুক্ততাকে মিথ্যার উপর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে যে বর্ণিত আছে, তিনি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন; তা প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা মিথ্যা ছিল কাজেই মিথ্যা বলে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الكذب؟ وهو حلال ام حرام ان كان الثاني فكيف كذب ابراهيم عليه السلام ثلاث كذبات؟

উত্তর ঃ معنى الكذب ঃ كذب বা মিথ্যা বলা হয় কোন বস্তু সম্পর্কে অবাস্তব সংবাদ দেওয়া। যেমন কেউ বলল– "আসমান নিচে"। এটা মিথ্যা হবে কারণ, এই সংবাদটি বাস্তবতা বিরোধি আর বাস্তবতা বিরোধি সংবাদকে মিথ্যা বলে।

মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় হারাম ঃ মিথ্যা বলা যে হারাম তা সম্পর্কে কুরআনের একাধিক আয়াত এবং

রাসূলের অসংখ্য হাদীস প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। যেমন উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون এখানে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকদের জন্য যে কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তা তাদের মথ্যিাচারের কারণে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে. মিথ্যা বলা মাহাপাপ।

তদ্রূপ পবিত্র হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন الكذب رأس كل خطيئة। "মিথ্যাই সকল পাপের মূল"।

আরো ইরশাদ হচ্ছে كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب "এটাই বড় খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট এমন কথা বললে যে, সে তোমাকে বিশ্বাস করছে অথচ তুমি তার সাথে মিথ্যা বলছ"।

ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেননি : কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। সেই তিনটি কথা হল– (১) তিনি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও বলেছিলেন– انى سقيم। "আমি অসুস্থ"। (২) একদিন তিনি মুশরিকদের বড় মূর্তি রেখে বাকি সবগুলোকে ভেঙ্গে দিলেন। যখন মুশরিকরদের নিকট এই সংবাদ পৌছল তখন তারা ইবরাহীম (আ.) -কে প্রশ্ন করল– তুমি আমাদের মূর্তিগুলো ভাঙ্গলে কেন? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন– بل فعله كبيرهم "আমি নই; বরং তাদের বড়টি এ কাজ করেছে"। এখানেও তিনি মিথ্যা বললেন। (৩) নিজের স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, মিথ্যা বলা যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে একজন নবীর জন্য মিথ্য বলা কি করে সম্ভব হল?

উত্তর: আসলে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেননি। এগুলো ছিল মূলত: توريه স্বরূপ। توريه বলা হয় এমন কথা বলা, যার দু'টি অর্থ থাকে; একটি প্রকাশ্য অর্থ এবং অপরটি অপ্রকাশ্য। তন্মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে অপ্রকাশ্য অর্থটি। যেমন তিনি انى سقيم। "আমি অসুস্থ" বলে বাহ্যিক অসুস্থতা উদ্দেশ্য নেননি; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের এই কর্মকান্ডের দরুন আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আর একথাটি তো মিথ্যা নয়। তদ্রূপ তিনি যে বলেছিলেন بل فعله كبيرهم "আমি নই; বরং তাদের বড়টি এ কাজ করেছে" এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে একথা বুঝানো যে, তোমরা যে এই মূর্তিগুলোর ইবাদত করছ তা একেবারে অনর্থক। কারণ, এগুলো যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না তাহলে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? আর স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন এটাও মিথ্যা নয়। কেননা, স্ত্রীকে বোন বলা যায়।

মোটকথা, তাঁর একথাগুলো শুনতে কেমন যেন মিথ্যা বলে মনে হয়; তাই বলা হয়েছে যে, তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি মিথ্যা বলেননি।

☆☆☆

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না"

عَطْفٌ عَلٰى يَكْذِبُوْنَ اَوْ يَقُوْلُ وَمَا رُوِىَ عَنْ سَلْمَانَ اَنَّ اَهْلَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ فَلَعَلَّهٗ اَرَادَ بِهٖ اَنَّ اَهْلَهٗ لَيْسَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فَقَطْ بَلْ وَسَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدُ وَمِنْ حَالِهٖ حَالُهُمْ لِاَنَّ الْاٰيَةَ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا بِالضَّمِيْرِ الَّذِىْ فِيْهَا وَالْفَسَادُ: خُرُوْجُ الشَّئِ مِنَ الْاِعْتِدَالِ وَالصَّلَاحِ ضِدُّهٗ وَكِلَاهُمَا يَعُمَّانِ كُلَّ ضَارٍّ وَنَافِعٍ وَكَانَ مِنْ فَسَادِهِمْ فِى الْاَرْضِ هَيْجُ الْحُرُوْبِ وَالْفِتَنِ بِمُخَادَعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمُمَالَاةِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ ـ

অনুবাদ:____

(এ আয়াতটির معطوف عليه কি?)

উক্ত আয়াতটি يكذبون অথবা يقول -এর উপর عطف হয়েছে। (এ আয়াত সম্পর্কে) হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে যা বর্ণিত আছে তথা এ আয়াত দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা এখনও (পৃথিবীতে) আগমন করেনি; তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো এটা হতে পারে যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু রাসূলের যুগের মনাফিকরাই উদ্দেশ্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এ পৃথিবীতে আগমন করবে এবং তাদের অবস্থা সেই মুনাফিকদের অবস্থার অনুরূপ হবে তারাও এই আয়াতের মেসদাক।

(এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে এজন্য যে,) এই আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সেই ضمير -এর মাধ্যমে সম্পৃক্ত, যে ضمير টি তার মধ্যেও রয়েছে (অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে لهم -এর ضمير مجرور পূর্ববর্তী আয়াতের من يقول -এর من -এর দিকে ফিরেছে। কাজেই من يقول -দ্বারা যারা উদ্দেশ্য اذا قيل لهم দ্বারাও তারা উদ্দেশ্য। আর পূর্ববর্তী আয়াতের من দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তারা তো রাসূলের যুগে ছিল; তাই সালমান ফারসী (রা.) -এর উক্তিকে তার বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা সঠিক নয়। কাজেই তার উক্তির এ ব্যাখ্যাই করতে হবে যে, তার উদ্দেশ্য হল, এ আয়াতের উদ্দিষ্ট সকল লোকেরা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি; বরং রাসূলের যুগের মুনাফিকদের অনুরূপ মুনাফিকরাও ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে আগমন করবে)।

(ফাসাদের অর্থ:) ফাসাদ বলা হয় কোন জিনিস স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তথা গন্ডগোল, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস; তার বিপরীত হল صلاح বা শান্তি। আর এ উভয়টি প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু এবং কল্যাণকর বিষয়কে শামিল রাখে (অর্থাৎ فساد শব্দের মধ্যে সকল প্রকার ক্ষতিকারক বস্তু এবং صلاح -এর মধ্যে প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত)

(মুনাফিকরা কিসের দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতো?): পৃথিবীতে মুনাফিকদের ফাসাদ ছিল মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়া, তাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদে সাহায্য করা, কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া। কারণ, এই কর্মগুলো তো পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামার ইত্যাদিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। (কারণ,

যুদ্ধের মাধ্যমে একে অপরকে হত্যা করে অথবা যখমী করে, একজন অপরজনের পশুগুলোকে হত্যা ও জবাই করে ফেলে এবং একে অপরের ক্ষেত-খামরের ক্ষতি করে)।

তাদের ফিৎনা-ফাসাদ থেকে একটি হল প্রকাশ্যে গোনাহ করা এবং দ্বীনের অবমাননা করা। কেননা, শরীয়তের বিধান পালনে উদাসীন হওয়া এবং তা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়।

لا تـفسدوا فى الارض **-এর قائل কে?** এর প্রবক্তা হয়তো আল্লাহ তা'লা অথবা রাসূল কিংবা কতেক মুমিন।

কাসাঈ এবং হেশাম قِيل -এর প্রথম হরফের কাসরাকে পেশের উচ্চারণে পড়ে থাকেন।

☆☆☆

﴿ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

"তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি"

جُـوَابٌ لِإِذَا وَرَدٌّ لِـلـنَّـاصِحِ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُبَالَغَةِ وَالْمَعْنٰى: اِنَّهٗ لَايُصْلِحُ مُخَاطَبَتُنَا بِـذَالِكَ فَـاِنَّ شَـانَـنَـا لَيْسَ اِلَّا الْاِصْلَاحَ وَاِنَّ حَالَنَا مُتَمَحِّضَةٌ مِنْ شَوَائِبِ الْفَسَادِ لِاَنَّ اِنَّـمَـا يُـفِيْـدُ قَصْرَ مَا دَخَلَهٗ عَلٰى مَا بَعْدَهٗ مِثْلُ: اِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَاِنَّمَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ وَاِنَّمَا قَـالُـوْا ذَالِكَ لِاَنَّهُمْ تَصَوَّرُوا الْفَسَادَ بِصُوْرَةِ الصَّلَاحِ لِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْمَرَضِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَفَمَنْ زُيِّنَ سُوْءُ عَمَلِه فَرَاٰهُ حَسَنًا۔

অনুবাদ:

لاتفسدوا فى الارض) এর দ্বারা । جزاء বা جواب -এর اذا এটা قالوا انما نحن مصلحون -এর মাধ্যমে) যারা উপদেশ করেছিলেন তাদের রদ করা হয়েছে কঠোরভাবে। (مبـالـغـه বা কঠোরতা তিন দিক থেকে পাওয়া গেছে। এ বাক্যটি جـلمه اسميه যা دوام و استمرار -এর ফায়দা দেয়, এর উপর আনা হয়েছে انـما হরফটিকে যা تـاكيد এবং حـصر -এর ফায়দা দেয়) আয়াতের অর্থ হল: আমাদেরকে (لاتـفـسـدوا) দ্বারা সম্বোধন করা সঠিক নয় কারণ, আমাদের কাজ তো কেবল শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, আমাদের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদের কোন অভ্যাস নেই। এই অর্থটি সৃষ্টি হয়েছে এ কারণে যে, انما শব্দের শুরুতে এসে শব্দের শেষে حصر সৃষ্টি করে; যদি موصوف -এর শুরুতে আসে তাহলে قـصر موصوف على الصفت -এর ফায়দা দেয়। আর সিফাতের শুরুতে আসলে قـصر صفت على الموصوف -এর উপকারিতা দান করে। যেমন:انـما زيد منطلق (যায়েদ শুধু চলমানই। এখানে انـما টি যায়েদকে صـفـت انطلاق -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে) এবং انـمـا يـنطلق زيد (যায়েদই চলছে। এখানে صـفـت انطلاق -কে যায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। আর انما نحن مصلحون বাক্যটি তো انما زيد منطلق -এর মতই। মনাফিকরা নিজেদেরকে صفت

اصـــــــلاح -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে একথা বলতে চাচ্ছে যে, আমাদের কাজ হল সমাজে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা আমাদের অভ্যাস নয়। তারা এর দ্বারা لاتـفسـدوا فـى الارض -এর জবাব দিচ্ছে যে, আমাদেরকে لاتـفسـدوا فـى الارض দ্বারা সম্বোধন কেন করা হবে; আমাদের মধ্যে তো ফাসাদের কোন অভ্যাস নেই; আমাদের কাজ শুধু একটি আর তা হল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা)।

একটি প্রশ্নের নিরসন:

(এখন প্রশ্ন হল: মুনাফিকদের তো কাজ ছিল সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করা; আর এটা যে ফাসাদের কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবুও তারা انما نحن مصلحون কেন বলে? এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন–) আর তাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা বিশৃঙ্খলাকে শিঙ্খলা বুঝে নিয়েছে। কাজেই তারা انـمـا نحن مصلحون "আমরা শান্তিকামী বৈ কিছু নই" বলে। সুতরাং (ফাসাদকে শান্তি বুঝে নেয়ার কারণে) আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান: أفمن زين سوء عمله فـــرأه حســـنـــا "যার সামনে তার মন্দ আমলকে সজ্জিত করে দেয়া হয়েছে সে কি তা উত্তম মনে করেছে?

☆☆☆

﴿اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّايَشْعُرُوْنَ﴾

"মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না"

رَدٌّ لِـمَـا اِدَّعَـوْهُ اَبْـلَـغَ رَدٍّ لِلْاِسْتِئْنَافِ بِه وَتَصْدِيْرِه بِحَرْفَيِ التَّاكِيْدِ (اَلَا) اَلْمُنَبِّهَةِ عَـلٰـى تَـحْـقِيْـقِ مَـا بَـعْدَهَا فَاِنَّ هَمْزَةَ الْاِسْتِفْهَامِ الَّتِيْ لِلْاِنْكَارِ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّفْيِ اَفَـادَتْ تَـحْـقِيْـقًا وَنَظِيْرُهٗ: اَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ. وَلِذَالِكَ لَاتَكَادُ تَقَعُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهَا اِلَّا بِـمَـا يَتَـلَـقّٰـى بِهَـا الْـقَسْمَ . وَاُخْتُهَا (اَمَا) اَلَّتِيْ هِىَ مِنْ طَلَائِعِ الْقَسْمِ وَ(اِنَّ) اَلْمُقَرِّرَةِ لِـلنِّسْبَةِ وَتَعْرِيْفِ الْخَبَرِ وَتَوْسِيْطِ الْفَصْلِ لِرَدِّ مَا فِيْ قَوْلِهِمْ : اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ" مِنَ التَّعْرِيْضِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْاِسْتِدْرَاكِ بِلَايَشْعُرُوْنَ۔

অনুবাদ:

الا انهـــم هـــم الـــمــفســدون -এর দ্বারা মুনাফিকদের দাবী (আমরা শুধু শান্তিকামী) -এর কঠোরভাবে খন্ডন করা হয়েছে। আর এই কঠোরতা সৃষ্টি হয়েছে পাঁচ কারণে: (১) এ বাক্যটি جمله مستانفه হয়েছে (২) শুরুতে তাকীদের উভয় হরফ আনার কারণে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল الا যা তার পরবর্তী অংশের تحقيق (নিশ্চয়তার) উপর সতর্ক করে। কেননা, همــزه استفهاميه للانكار যখন نفى -এর শুরুতে আসে তখন تـحقيق (নিশ্চয়তা) 'র ফায়দা দেয়। তার দৃষ্টান্ত أليـس ذالك بـقادر

এই আয়াতটি। আর এজন্যই الا -এর পরে যে জুমলা আসে তার শুরুতে কেবল সেইসব হরফ যুক্ত হয় যেগুলো جواب قسم -এর উপর প্রবেশ করে। الا -এর সমার্থবোধক হরফ হল انما যা কসমের শুরুতে প্রবেশ করে। (তাকীদের দুই হরফ থেকে) দ্বিতীয়টি হল ان যা নিসবতকে দৃঢ় করে। (৩) خبر তথা المفسدون -কে معرفه আনার কারণে তাকীদ সৃষ্টি হয়েছে। (৪) মধ্যখানে ضمير فاصل আনার কারণে যা দ্বারা মুনাফিকদের উক্তি: انما نحن مصلحون -এর মধ্যে মুমিনদের প্রতি ইঙ্গিত করাকে রদ করা হয়েছে। এবং (৫) لايشعرون দ্বারা استدراك করার কারণে (তাকীদ সৃষ্টি হয়েছে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

মুনাফিকদের দাবী খন্ডন : উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের দাবী "আমরা কেবল শান্তিকামী" -কে জোরালোভাবে খন্ডন করেছেন। তার প্রমাণ পাঁচটি–

১. الا انهم هم المفسدون বাক্যটি جمله مستانفه হয়েছে। যখন মুনাফিকরা انما نحن مصلحون বলেছিল, তখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছেল যে, তারা কি বাস্তবেই শান্তিকামী? তখন এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে الا انهم هم المفسدون । আর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে কথাটি বলা হয়ে থাকে তা শ্রুতার মনে ভালো করে গেঁথে যায়।

২. এবাক্যের শুরুতে আছে তাকীদের দুই হরফ। একটি হল اَلَا এবং অপরটি হল اِنَّ । আর ان যে তাকীদের ফায়দা দেয় তা পরিস্কার। তবে اَلَا -ও তাকীদের ফায়দা দেয় তবে কিভাবে ফায়দা দেয় তা পরিস্কার করার জন্য মুসান্নিফ (র.) তিনটি প্রমাণ পেশ করেছেন।

(ক) اَلَا টি همزه استفهام للانكار এবং لا نفى দ্বারা গঠিত। আর همزه استفهام للانكار টি نفى -এর শুরুতে আসলে তাকীদের ফায়দা দেয়।

(খ) الا -এর পরে যে জুমলা আসে তার শুরুতে কেবল সেইসকল হরফ যুক্ত হয় যেগুলো جواب قسم -এর উপর প্রবেশ করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الا টিও তাকীদের ফায়দা দেয়। কেননা, جواب قسم -এর শুরুতে যে সকল হরফ আসে যেমন: ان و لام وما ولا এগুলো তাকীদের অর্থ প্রদান করে। কাজেই اَلَا -এর পরবর্তী জুমলার শুরুতে এগুলোর প্রবেশ করা الا টি তাকীদের ফায়দা দেয়ার প্রমাণ।

(গ) اَلَا -এর সমার্থক হরফ হল اَمَا যা কসমের পূর্বে আসে। আর কসম তো তাকীদের অর্থ দেয় কাজেই اَمَا ও তাকীদের ফায়দা দিবে। সুতরাং الا ও তাকীদের অর্থ প্রদান করবে। কেননা, এটি اما -এর সমার্থক হরফ।

৩. الا انهم هم المفسدون এখানে المفسدون খবরকে معرف باللام আনা হয়েছে। এর দ্বারাও তাকীদ সৃষ্টি হয়।

৪. এখানে مبتدا ও خبر -এর মধ্যখানে هم যমীরে فصل আনা হয়েছে, যা তাকীদের অর্থ বহন করে।

৫. ولكن لا يشعرون দ্বারা استدراك করা হয়েছে। استدراك বলা হয় পূর্ববর্তী বাক্য থেকে সৃষ্ট সন্দেহকে দূরীভূত করা। ولكن لا يشعرون দ্বারা এভাবে استدراك হয়েছে যে, পূর্বে যখন মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে الا انهم هم المفسدون তখন এর দ্বারা একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুনাফিকরা নিজেদেরকে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী উপলব্ধি করে কারণ, কারো মধ্যে কোন গুণ থাকলে অবশ্যই সে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই ভুল ধারণাকে ولكن لا يشعرون দ্বারা দূরীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো"

مِنْ تَمَامِ النُّصْحِ وَالْاِرْشَادِ فَاِنَّ كَمَالَ الْاِيْمَانِ بِمَجْمُوْعِ الْاَمْرَيْنِ اَلْاِجْتِنَابُ عَمَّا لَايَنْبَغِيْ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِقَوْلِه: "لَاتُفْسِدُوْا" وَالْاِتْيَانُ بِمَا يَنْبَغِيْ وَهُوَ الْمَطْلُوْبُ بِقَوْلِه: اٰمِنُوْا۔

অনুবাদ:

واذا قيل لهم امنوا এটা উপদেশ ও দিক নির্দেশনার পরিপূরক। কেননা, দুই জিনিসের সমষ্টি দ্বারা ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। (১) অনুচিত কর্ম থেকে বিরত থাকা আর এটাই আল্লাহ্ তা'লার বাণী لا تفسدوا -এর মুখ্য উদ্দেশ্য। (২) করণীয় কাজ করা। আর এটাই আল্লাহ্ তা'লার বাণী امنوا -এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ঈমান যেহেতু দু'টি বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। একটি হল বর্জনীয় বিষয়কে বর্জন করা এবং অপরটি হল করণীয় পালন করা। সুতরাং মুনাফিকদেরকে প্রথমে لاتفسدوا দ্বারা বর্জনীয় কাজ পরিহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে অত:পর তাদেরকে امنوا "তোমরা ঈমান আনো" বলা হয়েছে। এর দ্বারা করণীয় পালন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা উপদেশটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

☆☆☆

﴿كما امن الناس﴾

"অন্যান্য মানুষ যেরকম ঈমান এনেছে"

فِيْ حَيِّزِ النَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ اَوْ كَافَّةٌ مِثْلُهَا فِيْ رُبَمَا وَاللَّامُ فِي النَّاسِ لِلْجِنْسِ وَالْمُرَادُ اَلْكَامِلُوْنَ فِي الْاِنْسَانِيَّةِ الْعَامِلُوْنَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ فَاِنَّ اِسْمَ الْجِنْسِ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِمُسَمَّاهُ مُطْلَقًا يُسْتَعْمَلُ لِمَا يُسْتَجْمَعُ الْمَعَانِي الْمَخْصُوْصَةُ بِه وَالْمَقْصُوْدُ مِنْهُ وَلِذَالِكَ يُسْلَبُ عَنْ غَيْرِه فَيُقَالُ زَيْدٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ وَمِنْ هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالٰى صُمٌّ بُكْمٌ وَنَحْوُهُ وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّاعِرُ فِيْ قَوْلِه اِذِالنَّاسُ نَاسٌ وَالزَّمَانُ زَمَانٌ. اَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّسُوْلُ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ اَوْ مَنْ اٰمَنَ مِنْ اَهْلِ جِلْدَتِهِمْ كَابْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِه وَالْمَعْنٰى اٰمِنُوْا اِيْمَانًا مَقْرُوْنًا بِالْاِخْلَاصِ مُتَمَحِّضًا عَنْ شَوَائِبِ النِّفَاقِ مُمَاثِلًا لِاِيْمَانِهِمْ وَاسْتَدَلَّ بِه عَلٰى قَبُوْلِ تَوْبَةِ الزِّنْدِيْقِ وَاِنَّ الْاِقْرَارَ بِاللِّسَانِ اِيْمَانٌ وَاِلَّا لَمْ يُفِدْهُ التَّقْيِيْدُ۔

অনুবাদ:

كما امن الناس এটা امنوا ফে'লের مفعول مطلق হওয়ায় نصب হয়েছে। আর كما -এর ما হল مصدريه অথবা ربما -এর ما -এর মত ما كافه (আর كاف টি مثل -এর অর্থে)।

আর الناس -এর الف لام হল جنس -এর জন্য। الناس দ্বারা উদ্দেশ্য হল– যারা মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ এবং বিবেকের চাহিদা অনুপাতে আমল করে। কেননা, اسم جنس যেরকম তার مسمى -এর মধ্যে নিঃশর্তভাবে (مطلقا) ব্যবহার হয় তদ্রূপ (কেবল) সে বস্তুর ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হয় যে বস্তুটি جنس -এর জন্য নির্ধারিত এবং তার দ্বারা উদ্দেশ্য গুণাবলীর সমন্বয়কারী। আর এজন্যই তার বিপরীত বস্তু (তথা যে বস্তুটি جنس -এর নির্দিষ্ট গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়কারী হয় না; তার থেকে) جنس -এর নফী করা হয়। যেমন বলা হয়–যায়েদ মানুষ নয়। আর আল্লাহ তা'লার বাণী– صم بكم ও এরই অন্তর্ভুক্ত। এ উভয় ব্যবহার পদ্ধতিকে জৈনক কবি তার কবিতায় একত্রিত করেছেন যেমন– اذالناس ناس والزمان زمان (মানুষ যখন মানুষ হয়ে যাবে এবং যুগ, যুগ হয়ে যাবে) অথবা الناس -এর الف لام টি عهد خارجى -এর জন্য। আর এর দ্বারা রাসূল এবং তাঁর সাথীবর্গ অথবা মুনাফিকদের গোত্রের ঈমানদার লোক উদ্দেশ্য। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গী-সাথীরা। আয়াতটির অর্থ হল– হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের মত ঈমান আনো যাদের ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার নেফাকী নেই।

এ আয়াত দ্বারা যিন্দিকের তাওবা কবুল হওয়ার এবং মুখে স্বীকারোক্তিকে ঈমান বলা হয় তার উপর দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। নতুবা كما امن الناس শর্তটি যুক্ত করা অনর্থক হয়ে যাবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: الالف وللام من اى قسم فى قوله تعالى: ومن الناس؟

উত্তর ঃ মুসান্নিফ (র.) الناس শব্দের الف لام সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) الف لام টি جنس -এর জন্য অর্থাৎ جنس استغراقى -এর জন্য।

(খ) عهد خارجى -এর জন্য। তখন الناس দ্বারা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীবর্গ এবং মুনাফিকদের গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা ঈমান এনেছে তারা উদ্দেশ্য হবেন।

উল্লেখ্য যে, الف لام جنسى দ্বারা কখনো বস্তুর সদস্য (افراد)-এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু হাকীকত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর কখনো جنس -এর সমস্ত افراد (সদস্য) উদ্দেশ্য হয় আবার কখনো কিছুসংখ্যক সদস্যও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

অত:পর الف لام جنسى للاستغراقى দ্বারা কখনো جنس -এর সমস্ত সদস্য (افراد) উদ্দেশ্য হয়। যেমন– لقد خلقنا الانسان من علق (নিশ্চয়ই আমি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি জমাট রক্ত থেকে) এখানে الانسان -এর الف لام টি استغراق جنسى -এর জন্য; এর দ্বারা সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য। আবার কখনো الف لام جنسى استغراقى দ্বারা جنس -এর সমস্ত সদস্যবৃন্দ উদ্দেশ্য হয় না; বরং তার দ্বারা جنس -এর সেই পরিপূর্ণ সদস্য (كامل فرد) উদ্দেশ্য হয় যার মধ্যে جنس -এর বৈশিষ্ট্যাবলী পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। جنس -কে উক্ত পরিপূর্ণ সদস্যের উপর প্রয়োগ করে এ দাবী করা হয় যে, ঐ সদ্যস (فرد) টি جنس -এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়কারী হওয়ায় সে একথার দাবি রাখে যে, جنس -কে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে। কেমন যেন جنس বলতে তাকেই বুঝায় এবং যে (فرد) টি جنس -এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়কারী নয় তাকে ঐ جنس থেকে গণ্যই করা হয় না। কাজেই যার মধ্যে جنس -এর বৈশিষ্ট্যাবলী অবর্তমান থকে তার থেকে ঐ جنس -এর অস্বীকৃতি (نفى) করা হয়। যেমন বলা হয়–

زيد ليس بانسان (যায়েদ মানুষই নয়) এটা তখন বলা হয় যখন যায়েদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী পরিপূর্ণভাবে অবিদ্যমান থাকে।

এখানে الناس -এর- جنسى টি الف لام جنسى -এর তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **অর্থাৎ** الناس দ্বারা যারা মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ এবং বিবেকের চাহিদা অনুপাতে আমল করে থাকে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ফায়দা ঃ قوله: ومن هذا الباب قوله صم بكم ونحوه **:** অর্থাৎ যার মধ্যে جنس -এর বৈশিষ্ট্যাবলী অবর্তমান থাকে, তাকে جنس থেকে গণ্য করা হয় না; صم بكم প্রভৃতি উদাহরণ তারই অন্তর্ভুক্ত। صم بكم অর্থাৎ মুনাফিকরা বধির, বোবা। অথচ তারা তো বাস্তবে এরকম নয়; কিন্তু কান, মুখ এবং চোখকে যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে তারা সে উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহার করেনি। তাই তাদের থেকে শ্রবণ, দর্শন এবং বাকশক্তিকে নফী করে তাদেরকে صم بكم عمى বলা হয়েছে।

قوله او للعهد والمراد به الرسول ﷺ **:** অর্থাৎ الناس -এর الف لام টি عهد خارجى ও হতে পারে। তখন الناس দ্বারা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীবর্গ এবং মুনাফিকদের গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা ঈমান এনেছে তারা উদ্দেশ্য হবেন। যাদের আলোচনা করা হয়েছে الذين يؤمنون بالغيب -এর মধ্যে। এ আয়াত দ্বারা সর্বপ্রথম যারা উদ্দেশ্য তারা তো হলেন রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম। তাই الف لام টি عهد خارجى ذكرى -এর জন্য হবে; معهود -এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হওয়ায় الناس -কে الف لام عهدى দ্বারা معرفه আনা হয়েছে। অথবা لام عهدى আনা হয়েছে এ হিসেবে যে, রাসূল ও সাহাবা অথবা মুনাফিকদেরই গোত্রের যারা ঈমান এনেছে তারা মুনাফিকদের সামনে উপস্থিত ছিল।

السوال: هل يقبل توبة الزنديق؟ اكتب موضحا

যিন্দীকের তাওবা কি কবুল হয়? যিন্দীক বলা হয় যে বা যারা বাহ্যিকভাবে শরীয়তের বিধানাবলীকে মান্য করে; কিন্তু অন্তরে কুফরি আকীদা পোষণ করে। যেমন আমাদের দেশের শাসকগণ বিশেষ করে আওয়ামীলীগের নেতা-খেতারা। এরা স্যাকুলারিজমে বিশ্বাসী এবং ইসলামী আইন-কানুনকে জুলুম ও বে-ইনসাফী মনে করে।

☆ **এই সমস্ত যিন্দিকদের তাওবা কবুল হবে কি না অর্থাৎ** তারা যদি মনে-প্রাণে ইসলামকে মেনে নেয় এবং অন্তরে কুফরি আকীদা না রাখে, তাহলে তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আহনাফের মতে, নিঃশর্তভাবে তাদের তাওবা কবুল হবে। কেউ কেউ বলেন, কবুল নয়; বরং এদেরকে হত্যা করতে হবে। আর কেউ বলেন, সে যে যিন্দীক তা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যদি তাওবা করে নেয় তাহলে কবুল; অন্যথায় কবুল নয়।

☆ আহনাফের দলীল আলোচ্য আয়াতটি। কেননা, যিন্দীকদের অবস্থা মুনাফিকদের কাছাকাছি। আর আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে মনে-প্রাণে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তারা যদি খালিস দিলে তাওবা করে নেয় তাহলে দুনিয়া-আখেরাতে তাদের ঈমান কবুল হবে; কাজেই যিন্দীকরাও যদি খালিস দিলে তাওবা করে তাহলে তাদের তাওবাও কবুল হবে।

السوال: هل الايمان اسم لمجرد الاقرار باللسان؟

উত্তর ঃ ঈমান কি শুধু মুখে স্বীকার করার নাম? কারো কারো ধারণা হল যে, শুধু মুখ দ্বারা স্বীকার করার নামই ঈমান; অন্তর দ্বারা তা সত্যায়ন করুক বা না করুক। তাদের দলীল আলোচ্য আয়াতটি। এখানে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বলেছেন امنوا كما امن الناس "তোমরা ঈমান আনো

যেভাবে অন্যান্যরা ঈমান এনেছে''। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, শুধু মুখ দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করার নাম ঈমান; অন্তরে সত্যায়ন করুক বা না করুক। কেননা, যদি এমনটি না হয় তাহলে শুধু امنوا বলাই যথেষ্ট ছিল; كما امن الناس এই শর্তটি যুক্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। যখন এ শর্তটি যুক্ত করেছেন কাজেই বুঝা গেল, মুনাফিকদের শুধু মুখের স্বীকারোক্তিটিই ঈমান ছিল। কিন্তু এই ঈমানটি অন্যান্য মানুষের ঈমানের অনুরূপ ছিল না তাই তাদেরকে অন্যান্য মানুষের ঈমানের মতো ঈমান আনার হুকুম দেয়া হয়েছে।

যুক্তি খন্ডন: ঈমানের প্রকৃত অর্থ হল تصديق বা সত্যায়ন করা। আর শরীয়তের মধ্যে প্রকৃত অর্থটি ধর্তব্য হয়; তাকে একেবারে পরিত্যাগ করা হয় না। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থের সাথে আরো কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়। কাজেই অন্তরের সত্যায়ন ব্যতীত শুধু মুখ দ্বারা স্বীকার করলে এটাকে ঈমান বলা যাবে না। অতএব امنوا -এর অর্থ হবে, তোমরা শুধু মুখের স্বীকারোক্তি প্রদান করে ক্ষান্ত হয়ো না; বরং এর সাথে অন্তরের সত্যায়নকেও যুক্ত করে নাও। আর كما امن الناس এটা امنوا -এর শর্ত নয়; বরং এর দ্বারা তাকীদ করা হয়েছে অথবা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ﴾

"তখন তারা বলে, আমরা কি বোকাদের মত ঈমান আনবো"

اَلْهَمْزَةُ فِيْهِ لِلْاِنْكَارِ وَاللَّامُ مُشَارٌ بِهَا اِلَى النَّاسِ اَوِ الْجِنْسِ بِاَسْرِهٖ وَهُمْ مُنْدَرِجُوْنَ فِيْهِ عَلٰى زَعْمِهِمْ وَاِنَّمَا سَفَّهُوْهُمْ لِاِعْتِقَادِهِمْ فَسَادَ رَأْيِهِمْ اَوْ لِتَحْقِيْرِ شَانِهِمْ فَاِنَّ اَكْثَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا فُقَرَاءَ وَمِنْهُمْ مَوَالٍ كَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ اَوْ لِلتَّجَلُّدِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اِنْ فُسِّرَ النَّاسُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَشْيَاعِهٖ وَالسَّفَهُ: خِفَّةٌ وَسَخَافَةُ رَأْيٍ يَقْتَضِيْهِمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ۔

অনুবাদ:

(انؤمن -এর) হামযা হল انكار -এর জন্য (আয়াতের অর্থ হল, আমরা বোকাদের মত ঈমান আনবো না)। (السفهاء -এর) الف لام দ্বারা ইশারা করা হয়েছে (كما امن الناس -এর) الناس 'র দিকে। (অর্থাৎ এ الف لام টি عهد خارجى -এর জন্য এবং তার معهود হল উল্লেখিত الناس শব্দটি)। অথবা (الف لام টি استغراق جنسى -এর জন্য; এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে) গোটা جنس -এর প্রতি (অর্থাৎ সমস্ত বোকা লোক উদ্দেশ্য)। এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী الناس বোকাদের অন্তর্ভুক্ত।

মুনাফিকরা الناس তথা মুমিনদেরকে বোকা বলে কারণ, তাদের আকীদা হল, মুমিনদের সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত (তারা যা করছে সব বোকামী করছে)। অথবা মুমিনদের মর্যাদাকে তুচ্ছ ভাবার

কারণে। কেননা, অধিকাংশ মুমিনগণ ছিলেন গরীব এবং কিছু ছিলেন গোলাম যেমন: হযরত সুহাইব ও বেলাল (রা.)। অথবা নিজের বিরত্ব প্রকশের জন্য এবং স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে পরোয়া না করার কারণে। (তবে এ কারণটি তখন হবে) যখন الناس -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথীবর্গ।

سفه অর্থ: ছেলেমী, বোকামী যা আকল হ্রাস পাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

☆☆☆

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّايَعْلَمُوْنَ﴾

"মনে রেখ, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা তা বোঝে না"

رَدٌّ وَمُبَالَغَةٌ فِيْ تَجْهِيْلِهِمْ فَاِنَّ الْجَاهِلَ بِجَهْلِه الْجَازِمَ عَلٰى خِلَافِ مَا هُوَ الْوَاقِعُ اِعْظَمُ دَلَالَةً وَاَتَمُّ جَهَالَةً مِنَ الْمُتَوَقِّفِ الْمُعْتَرِفِ بِجَهْلِه فَاِنَّهٗ رُبَمَا يُعْذَرُ وَيَنْفَعُهُ الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ وَاِنَّمَا فُصِّلَتِ الْاٰيَةُ (يَعْلَمُوْنَ) وَالَّتِيْ قَبْلَهَا (لَايَشْعُرُوْنَ) لِاَنَّهٗ اَكْثَرُ طِبَاقًا بِذِكْرِ السَّفَهِ وَلِاَنَّ الْوُقُوْفَ عَلٰى اَمْرِ الدِّيْنِ وَالتَّمْيِيْزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِمَّا يَفْتَقِرُ اِلٰى نَظْرٍ وَتَفَكُّرٍ وَاَمَّا النِّفَاقُ وَمَا فِيْهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْفَسَادِ فَاِنَّمَا يُدْرَكُ بِاَدْنٰى تَفَطُّنٍ وَتَاَمُّلٍ فِيْمَا يُشَاهَدُ مِنْ اَقْوَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ۔

অনুবাদ:

এটা (তাদের উক্তি– انؤمن كما امن السفهاء -এর) খন্ডন এবং তাদেরকে মুর্খ প্রতিপন্নকরণে **مبالغه জোরালো বক্তব্য। (ألا انهم هم السفهاء -এর মধ্যে তাদের উক্তির খন্ডন করা হয়েছে** এভাবে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামকে বোকা বলেছিল; এই আয়াতটি বোকামীকে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলেছে যে, তারাই একমাত্র বোকা; সাহাবায়ে কেরাম বোকা নন। অত:পর এই খন্ডনকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরো জোরালো করা হয়েছে যেমন: ألا এবং ان দ্বারা, خبر -কে معرفه এনে, مبتدا و خبر -এর মাঝে ضمير فصل এনে, لكن শব্দ ব্যবহার করে استدراك করে এবং لايعلمون দ্বারা তাদেরকে জাহিল সাব্যস্ত করণে مبالغه করা হয়েছে)। কেননা, যে মুর্খ; তার মুর্খতা বোঝে না এবং অবাস্তব বিষয়ের উপর অবিচল থাকে সে ঐ মুর্খ ব্যক্তির চেয়েও আরো বড় মুর্খ, যে তার মুর্খতা বোঝে এবং সে যে মুর্খ তা স্বীকার করে। কেননা, সে তো কোন কোন সময় মা'জুর বলে গণ্য হয় এবং নিদর্শনাবলী ও ভয়ভীতি প্রদর্শন তাকে উপকৃত করে।

এ আয়াতের শেষে لايعلمون আনা হয়েছে এবং পূর্বের আয়াতের শেষে আনা হয়েছে لايشعرون কারণ, سفه (বোকামী) -এর সাথে لايعلمون ব্যবহার করলে صنعت طباق বেশী প্রকাশ পায়। তাছাড়া ধর্মীয় বিষয়াবলী জানা এবং হক-বাতীলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এমন একটি কাজ যা চিন্তা-গবেষণার প্রতি মুখাপেক্ষী। তবে নেফাকের মধ্যে যে ফিৎনা-ফাসাদ বিদ্যমান

তা একটু চিন্তা করলেই বোঝে আসে এবং তাদের কর্মকান্ড ও কথাসমূহ প্রত্যক্ষ করলেই বোধগম্য হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالى الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون

উত্তর ৪ الا انهم هم السفهاء الخ **আয়াতের তাফসীর:**

মহান আল্লাহ্ তা'লার অমীয় বাণী الا انهم هم السفهاء ولكن لايشعرون সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) দু'টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা হল, এই বাক্যের মধ্যে মুনাফিকদের খন্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরকে মুর্খ সাব্যস্তকরণে مبالغه করা হয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনা হলো একটি প্রশ্নের নিরসন।

প্রথম অলোচনার সারাংশ হল– لايعلمون দ্বারা তাদের মুর্খতা প্রমাণিত করা হয়েছে। যার অর্থ হল, তারা যে নিজে মুর্খ ও বোকা তাও তারা জানে না। কাজেই তাদের মধ্যে দ্বিগুণ মুর্খতা পাওয়া গেল। একটি হল, তারা বোকা; যা মুর্খতাকে আবশ্যক করে। এবং দ্বিতীয়টি হল, তারা নিজেকে মুর্খ বলে মনে করে না। সুতরাং তারা جهل مركب -এর মধ্যে লিপ্ত। আর যারা جهل مركب -এ লিপ্ত থাকে তারা جاهل بسيط তথা যে তার মুর্খতাকে স্বীকার করে তার চেয়েও আরো বেশী গোমরাহ ও মুর্খ। কেননা, তার এই মুর্খতা কোন দিন দূর হবে না। পক্ষান্তরে যে বোঝে যে, সে মুর্খ; তার মুর্খতা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায় এবং তাই হেদায়েত তাকে উপকৃত করবে।

মোটকথা, لايعلمون দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা جهل مركب -এ লিপ্ত; তাদের মধ্যে দ্বিগুণ মুর্খতা রয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক ফার্সী কবির কবিতাটি মনে পড়েছে। কবিতা হল–

انکس کہ نداند وبداند کہ بداند☆ در جہل مرکب ابد الدہر بماند

দ্বিতীয় আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন ঃ প্রশ্ন হল, পূর্ববর্তী আয়াতের فاصله আনা হয়েছে لايشعرون দ্বারা। যেমন: বলা হয়েছে– الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون। আর অত্র আয়াতের فاصله আনা হয়েছে لايعلمون দ্বারা। এরকম পার্থক্য করার কারণ কি?

উত্তর: দুই কারণে উভয় আয়াতের فاصله ভিন্ন ভিন্নভাবে আনা হয়েছে। যথা–

১. لايشعرون -এর তুলনায় لايعلمون -এর মাধ্যমে صنعت طباق ভালভাবে প্রকাশ পায়। صنعت طباق বলা হয় বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধি অর্থবোধক দু'টি শব্দ একত্রিত করা। سفاهت বা বোকামীর মধ্যে যেহেতু রয়েছে মুর্খতা কাজেই বোকামীই হল মুর্খতা। আর মুর্খতার বিপরীত হল ইলম। তাই ইলমের উল্লেখের মাধ্যমে বিপরীত দুই জিনিস একত্রিত হয়ে যায়। একটি হল বোকামী এবং অপরটি মুর্খতা। কাজেই لايعلمون -এর মাধ্যমে صنعت طباق পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে شعور অর্থ অনুধাবন করা, উপলব্ধি করা কাজেই شعور -এটা جهل -এর বিপরীত হতে পারে না। তাই لايشعرون -এর মাধ্যমে صنعت طباق টি ভালভাবে প্রকাশ পায় না।

২. شعور বলা হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা তাই شعور -এর সম্পর্ক হবে ইন্দ্রিয়লব্ধ (محسوسات) -এর সাথে। পক্ষান্তরে علم -এর সম্পর্ক কিন্তু محسوسات -এর সাথে নয়; বরং তার সম্পর্ক সেইসব বস্তুর সাথে যেগুলো চিন্ত-ফিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে মুনাফিকদের থেকে তাদের অনুভূতিকে প্রত্যখ্যান করা উদ্দেশ্য। প্রথম আয়াতে তাদেরকে দাঙ্গামা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে "তাদের কোন এহসাস-অনুভূতি নেই। আর দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে "তারা বোকা কিন্তু তাদের কোন জ্ঞান নেই"। যেহেতু প্রথম আয়াতটি তাদের নেফাক এবং

ধোকা সম্পর্কে; আর এ দু'টি বিষয় কথা ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে محسوسات-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের থেকে যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয় তাও محسوسات-এর ন্যায়। তাই উক্ত স্থানে شعور ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতটি হল ঈমান সম্পর্কে; আর ঈমান, কুফর এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি এগুলো তো ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে জানা যায় না; বরং এগুলো জানতে হলে চিন্তা-ফিকির করতে হবে। তাই এ আয়াতের فاصله আনা হয়েছে لايعلمون দ্বারা।

☆☆☆

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا﴾

"আর তারা যখন মুমিনদের সাথে মিশে তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি"

بَيَانٌ لِمُعَامَلَتِهِمْ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكُفَّارِ وَمَا صَدَرَتْ بِهِ الْقِصَّةُ فَمُسَاقَةٌ لِبَيَانِ مَذْهَبِهِمْ وَتَمْهِيْدِ نِفَاقِهِمْ فَلَيْسَ تَكْرِيْرٌ . رُوِىَ أَنَّ اِبْنَ أُبَىٍّ وَاَصْحَابَهُ اِسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ لِقَوْمِه اُنْظُرُوْا كَيْفَ اَرُدُّ هٰؤُلَاءِ السُّفَهَاءَ عَنْكُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ اَبِىْ بَكْرٍ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالصِّدِّيْقِ سَيِّدِ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَشَيْخِ الْاِسْلَامِ وَثَانِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ الْبَاذِلِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِسَيِّدِ بَنِىْ عَدِىٍّ الْفَارُوْقِ الْقَوِىِّ فِىْ دِيْنِه اَلْبَاذِلِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنِه سَيِّدِ بَنِىْ هَاشِمٍ مَا خَلَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ

وَاللِّقَاءُ اَلْمُصَادَفَةُ يُقَالُ لَقِيْتُهُ وَلَاقَيْتُهُ اِذَا صَادَفْتَهُ وَاسْتَقْبَلْتَهُ وَمِنْهُ اَلْقَيْتُهُ اِذَا طَرَحْتَهُ فَاِنَّكَ بِطَرْحِه جَعَلْتَهُ بِحَيْثُ يُلْقٰى۔

অনুবাদ:

(এখানে প্রশ্ন হয় যে, ومن الناس من يقول-এর সাথে قالوا أمنا-এর তাকরার মনে হচ্ছে। কেননা, উভয় বাক্যের অর্থ একই। তাই মুসান্নিফ র. এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। তাই তাকরার আবশ্যক হয়নি কারণ, واذا لقوا الذين امنوا الخ) এই আয়াতটি মুমিন এবং কাফিরদের সাথে মুনাফিকদের যে আচরণ ছিল তার বর্ণনার জন্য। আর من يقول امنا-কে আনা হয়েছে তাদের মাযহাব ও নেফাকির বর্ণনা দেয়ার জন্য

কাজেই তাকরার হয়নি। (এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়–) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের দেখা হল; তো সে তার সাথীদের বলল, তোমরা লক্ষ্য কর! আমি এই বোকাদের থেকে তোমারেকে কিভাবে ফিরিয়ে রাখি। অত:পর সে হযরত আবু বকর (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, 'সিদ্দীক (অধিক সত্যবাদী) -কে ধন্যবাদ! যিনি বনী তামীমের নেতা, ইসলামের মহান ব্যক্তিত্ব, গারে ছূরে রাসূলের সাথী এবং নিজের জান-মাল রাসূলের জন্য উৎসর্গকারী। অত:পর সে হযরত ওমর (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, বনী আদী'র নেতা ধন্যবাদ! যিনি হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, ধর্মে অটল-অবিচল এবং নিজের জান-মাল রাসূলের জন্য বিসর্জনকারী। অত:পর হযরত আলী (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, রাসূলের চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতাকে ধন্যবাদ! যিনি রাসূল ব্যতীত সমস্ত বনী হাশেমের সর্দার।' তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।

لـقـاء -এর অর্থ পাওয়া, সামনে পড়া (তথা সাক্ষাৎ করা) তার থেকেই الـقيـتـه নির্গত যার অর্থ হল ঢালা। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হল, তুমি যখন কোন বস্তু ঢালবে তখন এটা এমন হয়ে যায় যে, তার সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

☆☆☆

﴿واذا خلوا الى شياطينهم﴾

"আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে"

مَنْ "خَلَوْتُ بِفُلَانٍ وَاِلَيْهِ" اِذَا انْفَرَدْتُ مَعَهُ اَوْ مِنْ "خَلَاكَ ذَمٌّ" اَىْ عَدَاكَ وَمَضٰى عَنْكَ وَمِنْهُ الْقُرُوْنُ الْخَالِيَةُ اَوْ مِنْ "خَلَوْتُ بِه" اِذَا سَخِرْتَ مِنْهُ وَعُدِّىَ بِاِلٰى لِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِنْهَاءِ وَالْمُرَادُ بِشَيَاطِيْنَ: اَلَّذِيْنَ مَاثَلُوا الشَّيْطَانَ فِىْ تَمَرُّدِهِمْ وَهُمُ الْمُظْهِرُوْنَ كُفْرَهُمْ ' وَاِضَافَتُهُمْ اِلَيْهِمْ لِلْمُشَارَكَةِ فِى الْكُفْرِ اَوْ كِبَارُ الْمُنَافِقِيْنَ ' وَالْقَائِلُوْنَ صِغَارُهُمْ ' وَجَعَلَ سِيْبَوَيْهِ نُوْنَهُ تَارَةً اَصْلِيَةً عَلٰى اَنَّهُ مِنْ "شَيْطَنَ" اِذَا بَعُدَ فَاِنَّهُ بَعِيْدٌ عَنِ الصَّلَاحِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ "تَشَيْطَنَ" وَاُخْرٰى زَائِدَةً عَلٰى اَنَّهُ مِنْ "شَاطَ" اِذَا بَطَلَ وَمِنْ اَسْمَائِه اَلْبَاطِلُ۔

অনুবাদ:

" اذا خـلـوا الى شياطينهم " -এর মধ্যকার خلوا (তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। হয়ত এটা) "خـلـوت بـفـلان واليـه" থেকে উদগত। যার অর্থ হল, আমি তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলাম। অথবা "خـلاك ذم" থেকে উদগত, অর্থ– অতিক্রম করে যাওয়া। আর তার থেকেই الـقـرون "الـخالية" এসেছে (যার অর্থ, অতীতকালের লোক)। অথবা এটা "خـلـوت به" থেকে নির্গত যার

অর্থ হল, আমি তার সাথে কৌতুক করেছি (এ অর্থে তো خلوا -এর صله -তে الى আসে না; কিন্তু) তাকে الى -এর মাধ্যমে متعدى বানানো হয়েছে কারণ, তার মধ্যে انهاء (পৌঁছানো) -এর অর্থ বিদ্যমান। (তখন আয়াতের মূল রূপ হবে– واذا خلوا بالمؤمنين منهيا الى شياطينهم অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সাথে কৌতুকের সংবাদ তাদের শয়তানদের নিকট পৌঁছিয়ে কৌতুক করে)।

আয়াতের মধ্যে شياطينهم দ্বারা সেই সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা অবাধ্যতায় শয়তানের অনুরূপ বনে গেছে; আর এরাই সেইসব লোক যারা প্রকাশ্যে কুফরি করে।

شياطين -কে মুনাফিকদের দিকে اضافت করা হয়েছে; কুফরির মধ্যে উভয় দল শরীক হওয়ার কারণে।

অথবা شياطين দ্বারা নেতৃস্থানীয় মুনাফিকরা উদ্দেশ্য এবং قالوا انا معكم "আমরা তোমাদের সাথে আছি" -এর প্রবক্তারা হল সাধারণ মুনাফিকরা।

ইমাম সিবাওয়াইহ (র.) তার এক বিশ্লেষণে شيطان শব্দের نون -কে اصلى সাব্যস্ত করেছেন; এর উপর ভিত্তি করে যে, এটা شطن (দূর হওয়া থেকে) নির্গত। শয়তানকে এজন্য শয়তান বলা হয় যে, সে ভাল কাজ থেকে দূরে থাকে। এ বিশ্লেষণের সমর্থন করে আরবদের تشيطن এ উক্তিটি (এর দ্বারা বোঝা গেল যে, شيطان -এর نون টি اصلى কেননা, تشيطن এটা تفيعل -এর ওযনে আর تفيعل -এর ياء টি হল زائده)

ইমাম সিবাওয়াইহ (র.) -এর দ্বিতীয় বিশ্লেষণ মতে, شيطان -এর نون টি زائده কারণ, এটা شاط থেকে নির্গত যার অর্থ হল বাতিল হওয়া। আর শয়তানের এক নামও 'বাতিল'। (এর দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্লেষণের সমর্থন হয়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) حقق ﴿خلوا﴾ ﴿شياطين﴾
(ب) مالمراد بالشياطين فى قوله تعالى واذا خلوا الى شياطينهم؟

উত্তর ঃ (الف) শব্দ বিশ্লেষণ ঃ

০ خلوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বাহাস اثبات فعل ماضى معروف এটা হয়ত خلوت بفلان থেকে উদগত। যার অর্থ হল, আমি তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলাম। অথবা خلاك ذم থেকে উদগত, অর্থ– অতিক্রম করে যাওয়া। আর তা থেকেই القرون الخالية এসেছে। যার অর্থ, অতীতকালের লোক। অথবা এটা خلوت به থেকে নির্গত যার অর্থ হল, আমি তার সাথে কৌতুক করেছি। এ অর্থে তো خلوا -এর صله -তে الى আসে না; কিন্তু তাকে الى -এর মাধ্যমে متعدى বানানো হয়েছে কারণ, তার মধ্যে انهاء (পৌঁছানো) -এর অর্থ বিদ্যমান। তখন আয়াতের মূল রূপ হবে– واذا خلوا بالمؤمنين منهيا الى شياطينهم অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সাথে কৌতুকের সংবাদ তাদের শয়তানদের নিকট পৌঁছিয়ে কৌতুক করে।

০ شياطين : শব্দটি বহুবচন, একবচনে شيطان । ইমাম সিবাওয়াইহ (র.) তার এক বিশ্লেষণে شيطان শব্দের نون -কে اصلى সাব্যস্ত করেছেন; এর উপর ভিত্তি করে যে, এটা شطن (দূর হওয়া থেকে) নির্গত। শয়তানকে এজন্য শয়তান বলা হয় যে, সে ভাল কাজ থেকে দূরে থাকে। এ বিশ্লেষণের সমর্থন

করে আরবদের تشيطن এ উক্তিটি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, شيطان-এর نون টি اصلى কেননা, تشيطن এটা تفيعل -এর ওযনে আর تفيعل -এর ياء টি হল زائده

ইমাম সিবাওয়াইহ (র.) -এর দ্বিতীয় বিশ্লেষণ মতে, شيطان -এর نون টি زائده কারণ, এটা شاط থেকে নির্গত যার অর্থ হল বাতিল হওয়া। আর শয়তানের এক নামও 'বাতিল'। এর দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্লেষণের সমর্থন হয়।

(ب) شياطين **দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. তাফসীরকারক ইবনে জারীর (র.) বলেন, এখানে شياطين দ্বারা মুনাফিক দলপতিদের বুঝানো হয়েছে।

২. প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, شياطين দ্বারা পাঁচটি ইহুদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তারা হলো– (ক) কা'ব ইবনে আশরাফ সম্প্রদায়; (খ) আবু বুরদা সম্প্রদায়; (গ) আব্দুদ্দার সম্প্রদায়; (ঘ) আওফ ইবনে আমের সম্প্রদায়; (ঙ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আসওয়াদ সম্প্রদায়।

৩. কারো কারো মতে, شياطين দ্বারা সব ধরনের কাফের, মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।

৪. কারো কারো মতে, شياطين দ্বারা আল্লাহর পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সকল প্রকার দাম্ভিকতা উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿قالوا انا معكم﴾

"তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি"

أَىْ فِى الدِّيْنِ وَالْاِعْتِقَادِ خَاطَبُوا الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَةِ وَالشَّيَاطِيْنَ بِالْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَةِ الْمُؤَكَّدَةِ بِاَنَّ لِاَنَّهُمْ قَصَدُوْا بِالْاُوْلٰى دَعْوٰى اِحْدَاثِ الْاِيْمَانِ وَبِالثَّانِيَةِ تَحْقِيْقُ ثُبَاتِهِمْ عَلٰى مَا كَانُوْا عَلَيْهِ وَلِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَاعِثٌ مِنْ عَقِيْدَةٍ وَصِدْقِ رُغْبَةٍ فِيْمَا خَاطَبُوْا بِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَاتَوَقُّعَ رَوَاجِ اِدِّعَاءِ الْكَمَالِ فِى الْاِيْمَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ بِخِلَافِ مَا قَالُوْهُ مَعَ الْكُفَّارِ۔

অনুবাদ:

"তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি" অর্থাৎ ধর্ম ও বিশ্বাসে (তোমাদের সাথে আছি)।

(**একটি প্রশ্নের নিরসন:** এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুনাফিকরা যখন মুমিনদেরকে সম্বোধন করেছিল তখন جمله فعليه দ্বারা সম্বোধন করেছিল; কিন্তু শয়তানদের সম্বোধন করার সময় جمله اسميه দ্বারা সম্বোধন করেছে, এরকম সম্বোধন করার মধ্যে তাদের রহস্য কি? মুসান্নিফ র. এ প্রশ্নের

উত্তরে বলেন–) তারা মুমিনদেরকে جملـه فعليه দ্বারা এবং শয়তানদেরকে ان দ্বারা তাকীদকৃত جمله اسميه -এর মাধ্যমে সম্বোধন করেছে কারণ, প্রথম জুমলা (তথা امنا) -এর মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য হল "আমরা কাফির থেকে এখন মুমিন হয়ে গেছি" তা বোঝানো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জুমলা (তথা انا معكم) -এর মধ্যে "তারা যে তাদের পূর্বের মতাদর্শের উপর অবিচল" তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। (তাই প্রথম জুমলাকে فعليه ব্যবহার করেছে যা কোন কাজ এইমাত্র হওয়া বোঝায়। আর দ্বিতীয় জুমলাকে اسميه ব্যবহার করেছে যা সার্বক্ষণিক কোন কাজ হওয়া বোঝায়। এই হল প্রথম জুমলাকে فعليه এবং দ্বিতীয় জুমলাকে اسميه ব্যবহার করার কারণ) আর দ্বিতীয় কারণ হল, (এই কারণটি প্রথম বাক্যকে ان দ্বারা তাকীদ না করার এবং দ্বিতীয়টিকে ان দ্বারা তাকীদ করার কারণ। অতএব তার কারণ হল,) তারা মুমিনদের সাথে যে কথা বলেছে সে ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই; না ছিল তাদের আকীদা আর না ছিল সে ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ। তাছাড়া মুমিনগণ চাই মুহাজির বা আনসার তাঁদের সামনে তাদের পূর্ণ ঈমানের দাবীর রেওয়াজ পাওয়ার কোন আশাও ছিল না। পক্ষান্তরে তারা কাফিরদের সাথে যে কথা বলেছে (সে ব্যাপারে তাদের ছিল অতি আগ্রহ এবং দৃঢ় বিশ্বাস। আর যে কথাটি বিশ্বাসের সাথে মিল থাকে এবং তার প্রতি পূর্ণ আগ্রহও থাকে সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে বের হয়। পক্ষান্তরে যে কথার মধ্যে নেই কোন আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সাথেও তার কোন মিল নেই সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে বের হয় না)।

☆☆☆

﴿انما نحن مستهزئون﴾

"আমরা তো (মুসলমানদের) সাথে উপহাস করি মাত্র"

تَـاكِيْـدٌ لِـمَا قَبْلَهُ لِاَنَّ الْمُسْتَهْزِئَ بِالشَّيْءِ اَلْمُسْتَخِفُّ بِهِ مُصِرٌّ عَلٰى خِلَافِهِ اَوْ بَدْلٌ مِنْهُ لِاَنَّ مَنْ حَقَّرَ الْاِسْلَامَ فَقَدْ عَظَّمَ الْكُفْرَ اَوْ اِسْتِيْنَافٌ فَكَاَنَّ الشَّيَاطِيْنَ قَالُوْا لَهُمْ لِمَا قَـالُـوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنْ صَحَّ ذَالِكَ فَمَا لَكُمْ تُوَافِقُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَدَّعُوْنَ الْاِيْمَانَ فَاَجَابُوْا بِذَالِكَ

وَالْاِسْتِهْزَاءُ: اَلسُّخْرِيَةُ وَالْاِسْتِخْفَافُ وَاَصْلُهُ: اَلْخِفَّةُ مِنَ الْهَزْءِ وَهُوَ الْقَتْلُ السَّرِيْعُ يُقَالُ هَزَءَ فُلَانٌ اِذَا مَاتَ عَلٰى مَكَانِهِ وَنَاقَتُهُ تَهْزَءُ بِهِ اَىْ تَسْرَعُ وَتَخَفَّفُ۔

অনুবাদ:

انـمـا نحن مستهزئون এটা তার পূর্ববর্তী (انا معكم) -এর তাকীদ। কেননা, কোন জিনিসের সাথে উপহাসকারী এবং সেটাকে তুচ্ছজ্ঞানকারী ঐ বস্তুর বিপক্ষে অটল থাকে। অথবা مـاقبل থেকে جـمـلـه بـدل কারণ, যে ইসলামকে তুচ্ছ জ্ঞান করল, সে নিশ্চয় কুফরকে সম্মান করল। অথবা جـمـلـه مستانفه হয়েছে। মুনাফিকরা শয়তানদেরকে যখন انا مـعـكم বলত, তখন কেমন যেন শয়তানরা

তাদেরকে বলত, যদি তোমাদের এই কথাটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেন মুমিনদের অনুসরণ করছো এবং ঈমানের দাবী করছো? তখন তারা (انما نحن مستهزؤن) দ্বারা উত্তর দিল।

استهزاء -এর অর্থ– উপহাস করা, অপমান করা। যেমন বলা হয়– هزئت واستهزئت (উভয়টির অর্থ উপহাস করা) اجبت واستجبت -এর মত। استهزاء -এর মূল অর্থ হল তাড়াহুড়া করা। هزء দ্রুত হত্যা করা থেকে উদগত। যেমন বলা হয়– هزء فلان (অমুক তার স্থানেই মারা গেল অর্থাৎ দ্রুত মারা গেল)। ناقته تهزء به "তার উষ্ট্রী তাকে নিয়ে দ্রুত নিয়ে চলল।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: انما نحن مستهزؤن

السوال: لِمَ لم يعطف هذه الجملة على قوله تعالى " انا معكم "؟

انما نحن مستهزؤن এ বাক্যকে انا معكم -এর উপর عطف না করার কারণ:

এ দু'বাক্যের মধ্যে كمال اتصال বিদ্যমান। কেননা, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাকীদ হয়েছে। অথবা بدل হয়েছে। অথবা উভয়টির মধ্যে شبه كمال اتصال বিদ্যমান কারণ, দ্বিতীয় জুমলা প্রথম জুমলা থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য এসেছে। আর كمال اتصال অথবা شبه كمال اتصال -এর সূরতে এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর عطف করা হয় না। তাই انما نحن مستهزؤن বাক্যকে انا معكم বাক্যের উপর عطف করা হয়নি।

দ্বিতীয় জুমলা প্রথম জুমলার তাকীদ কিভাবে হয়েছে?

এর উত্তর হল– انما نحن مستهزؤن -এর لازمی معنی (আবশ্যকীয় অর্থ) 'র মাধ্যমে প্রথম জুমলা তথা انا معكم -এর مضمون বা ভাবার্থের তাকীদ করা হচ্ছে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন জিনিস নিয়ে উপহাস করে সে ঐ জিনিসের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কেননা, সে যদি তার বিপক্ষে অবস্থান না নিত তাহলে ঐ বস্তুকে নিয়ে উপহাস করত না। কাজেই কোন বস্তুকে নিয়ে উপহাস করা সে বস্তুটির বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার নামান্তর। তাই মুমিনদের সাথে উপহাস করার لازمی معنی হল "আমরা ইয়াহুদী ধর্মের উপর অটল আছি যে ধর্মের উপর তোমরা পরিচালিত হচ্ছ"। আর انا معكم -এর অর্থও তাই। কেননা, انا معكم -এর অর্থ হল, আমরা তোমাদের সেই ধর্মের উপর অটল-অবিচল যে ধর্মের নাম হচ্ছে ইয়াহুদী ধর্ম। মোটকথা, انما نحن مستهزؤن টি انا معكم -এর تاكيد معنوی হয়েছে। আর تاكيد ومؤكد -এর মধ্যে كمال اتصال হয়ে থাকে আর كمال اتصال -এর সূরতে عطف হয় না।

كمال اتصال **-এর দ্বিতীয় সূরত:** انما نحن مستهزؤن এবং انا معكم এই দুই বাক্যের মধ্যে كمال اتصال সৃষ্টি করার দ্বিতীয় আরেকটি সূরত হল, দ্বিতীয় বাক্যকে প্রথম বাক্য থেকে بدل ধরে। আর بدل ومبدل منه -এর মাঝে كمال اتصال হয়ে থাকে।

উভয় বাক্যের মাঝে شبه كمال اتصال হতে পারে: তার সূরত হল দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের সৃষ্ট একটি প্রশ্নের নিরসনের উত্তর দিতে এসেছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন কাফিরদেরকে বলেছিল انا معكم "আমরা তোমাদের সাথে আছি" তখন কাফিররা যেন তাদেরকে প্রশ্ন করেছিল, যদি তোমরা আমাদের সাথে থাক, তাহলে কেন মুমিনদের কাছে ঈমানের দাবী করছ? তখন মুনাফিকরা জবাব দিল, انما نحن مستهزؤن "আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করেছি মাত্র"। মোটকাথা, দ্বিতীয় বাক্যটি مستانفه ; আর مستانفه -এর সূরতে عطف হয়না।

﴿الله يستهزئ بهم﴾

"বস্তুত: আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন"

এ আয়াতের উপর চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম প্রশ্ন হল, আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন। অথচ উপহাস একটি মুর্খতা ও অনর্থক কাজ। যেমন: হযরত মূসা (আ.) -এর উক্তি- اعوذ بالله أن اكون من الجاهلين এখানে তিনি উপহাসকারীদেরকে মুর্খ আখ্যা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, উপহাস করা মুর্খদের কাজ; যা থেকে আল্লাহ তা'লা পবিত্র। সুতরাং এখানে استهزاء বা উপহাস করাকে আল্লাহর দিকে কিভাবে সম্বন্ধ করা হল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে মুনাফিকদেরই কাথা দ্বারা তাদের জবাব শুরু করেছেন। যেমন: তাদের উক্তি- انما نحن مصلحون -এর জবাবে الا انهم هم المفسدون বলা হয়েছে। أنؤمن كما امن السفهاء -এর জবাবে বলা হয়েছে- الا انهم هم السفهاء । সুতরাং এখানেও তাদের দ্বারা জবাবটি শুরু করা যুক্তিযুক্ত ছিল। অর্থাৎ انما نحن مستهزؤن -এর জবাব الا انهم هم الذين يستهزء بهم "মনে রেখ! এরাই উপহাসের পাত্র" এরকম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের দ্বারা শুরু না করে শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নাম দ্বারা।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াত انما نحن مستهزؤن -এর উপর عطف করা হয়নি কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন হল, মুনাফিকরা তো انما نحن مستهزؤن বলেছিল; কাজেই তাদের জবাবে الله مستهزء بهم বলা মুনাসিব ছিল; তাহলে তাদের কথার সাথেও মিল থাকত। কিন্তু এরকম না বলে يستهزئ ফে'লে মুযারে' ব্যবহার করলেন কেন?

يُجَازِيْهِمْ عَلٰى اِسْتِهْزَائِهِمْ سُمِّيَ جَزَاءَ الْاِسْتِهْزَاءِ بِاِسْمِه كَمَا سُمِّيَ جَزَاءَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً اِمَّا لِمُقَابَلَةِ اللَّفْظِ بِاللَّفْظِ اَوْ لِكَوْنِه مُمَاثِلًا لَهٗ فِي الْقَدْرِ اَوْ يَرْجِعُ وَبَالَ الْاِسْتِهْزَاءِ عَلَيْهِمْ فَيَكُوْنُ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِهِمْ اَوْ يَنْزِلُ بِهِمُ الْحِقَارَةُ وَالْهَوَانُ الَّذِيْ هُوَ لَازِمُ الْاِسْتِهْزَاءِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ اَوْ يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْتَهْزِئِ اَمَّا فِي الدُّنْيَا فَبِاِجْرَاءِ اَحْكَامِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِمْ وَاسْتِدْرَاجُهُمْ بِالْاِمْهَالِ وَالزِّيَادَةِ فِي النِّعْمَةِ عَلَى التَّمَادِيْ فِي الطُّغْيَانِ وَاَمَّا فِي الْاٰخِرَةِ فَبِاَنْ يُفْتَحَ لَهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُسْرِعُوْنَ نَحْوَهٗ فَاِذَا سَارُوْا اِلَيْهِ سُدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابُ وَذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى: فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ۔

অনুবাদ:

الله يستهزئ بهم-এর মর্ম হল, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে উপহাসের প্রতিদান দেবেন।

উপহাসের শাস্তিকে উপহাস নাম দেয়া হয়েছে যেভাবে (অন্য আয়াতের মধ্যে) মন্দের শাস্তিকে মন্দ নামে নামকরণ করা হয়েছে শব্দের বিপরীত হুবহু ঐ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অথবা শাস্তি ও তাদের উপহাস পরিমাণে সমান হওয়ার কারণে। (অথবা আয়াতের অর্থ হল,) আল্লাহ তা'লা উপহাসের ক্ষতিকে তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিবেন। সুতরাং কেমন যেন আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে উপহাস করছেন। অথবা (অর্থ হল,) তদের এই উপহাসের পরিণতিতে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। অথবা (আয়াতের অর্থ হল,) আল্লাহ তা'লা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাথে উপহাসকারীর আচরণের ন্যায় আচরণ করবেন। যেমন: তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের উপর মুসলমানগণের বিধানসমূহ জারী করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। (তদ্রূপ আখেরাতেও তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন, যা দেখতে উপহাসই বলে মনে হয়) যেমন: তারা তো পরকালে জাহান্নামী হবে; কিন্তু যখন তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলে দেয়া হবে, তখন তারা জান্নাতের দিকে দৌড় শুরু করবে। যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার বাণী– فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون "সেই দিন মুমিনরা কাফিরদেরকে নিয়ে হাঁসবে" -এর মর্ম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال : كيف نسب الاستهزاء الى الله تعالى وهو مبرئ عنه؟

প্রশ্ন: ঠাট্টা করা তো আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, তাহলে তিনি কিভাবে استهزاء তথা ঠাট্টা করেন?

উত্তর: উপরিউক্ত প্রশ্নের চারটি উত্তর প্রদান করা হয়। যথা–

১. এখানে استهـــــــزاء বা উপহাস দ্বারা তার শাস্তি উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতের মধ্যে মন্দের শাস্তিকে মন্দ বলা হয়েছে অথচ মন্দের শাস্তি দেয়া তো মন্দ নয়। আলোচ্য আয়াতে উপহাসের শাস্তিকে উপহাস বলে নামকরণ করা হয়েছে কারণ হল, এই উপহাসের কারণে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, সেই শাস্তিটি তাদের উপহাস অনুযায়ী হবে। এতে কোন কম-বেশী করা হবে না।

২. মুমিনদের সাথে উপহাসের ক্ষতি তাদের উপরই পতিত হবে, মনে হয় যেন আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করছেন। সুতরাং উপহাসের ক্ষতি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়াকে উপহাসের সাথে تشبيـــه দিয়ে مشبـــه بـه (তথা উপহাস শব্দ) উল্লেখ করে তার দ্বারা مشبـــه (ক্ষতি চাপিয়ে দেয়া) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব এখানে استعاره مصرحه পাওয়া গেল।

৩. এখানে استهزاء দ্বারা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা উদ্দেশ্য।

৪. এখানে استهزاء দ্বারা আল্লাহ তাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যবহার করবেন তা উদ্দেশ্য। দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন, তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করবেন, তাদেরকে মুসলমানের ন্যায় গণ্য করবেন; এতে তারা মনে করবে যে, আমরা তো সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি কারণ, আমরা যদি গোমরাহ হতাম তাহলে অবশ্যই আমাদের এইসব ফায়দা হত না। আর আখেরাতে তাদের জন্য বেহেশতের দরজা খোলে দেয়া হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহর এই আচরণ যেন উপহাসের ন্যায়ই মনে হচ্ছে। তাই يستهزئ ব্যবহার করেছেন।

☆☆☆

وَاِنَّمَا اُسْتُوْنِفَ بِهٖ وَلَمْ يَعْطِفْ لِيَدُلَّ عَلٰى أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَوَلّٰى مُجَازَاتِهِمْ وَلَمْ يُحَوِّجِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يُعَارِضَهُمْ وَاَنَّ اِسْتِهْزَاءَ هُمْ لَايُؤْبَهُ بِهٖ فِيْ مُقَابَلَةِ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِهِمْ-

অনুবাদ:

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের নিরসন

আর এবাক্যকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী আয়াতের উপর عطف করা হয়নি, যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বদলা নিতে স্বয়ং নিজেই তার দায়িত্ব নিয়েছেন; মুমিনদেরকে তার দায়িত্ব দেননি। সাথে সাথে একথাও বুঝা যায় যে, আল্লাহর কর্মের সামনে মুনাফিকদের উপহাস কোন ব্যাপারই নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের নিরসন: দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, অত্র আয়াতকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হল কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর عطف করা হয়নি কেন?

☆ **দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব:** অত্র আয়াতকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হয়েছে সে দিকে ইশারা করার জন্য যে, মুনাফিকদের উপহাসের বদলা নিতে আল্লাহ তা'লা নিজেই যথেষ্ট; তিনি নিজেই এর বদলা নিবেন; মুমিনদের বদলা নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

☆ **তৃতীয় প্রশ্নের জবাব:** এ আয়াতকে তার পূর্বের আয়াত انما نحن مستهزؤن -এর উপর عطف না করে একথা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যবহার করবেন; তার সামনে মুনাফিকদের উপহাস যেন কোন উপহাসই নয়।

☆☆☆

وَلَعَلَّهٗ لَمْ يَقُلِ اللّٰهُ مُسْتَهْزِئٌ بِهِمْ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُمْ اِيْمَاءً بِأَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ يَحْدُثُ حَالًا فَحَالًا وَيَتَجَدَّدُ حِيْنًا فَحِيْنًا وَهٰكَذَا كَانَتْ نِكَايَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِمْ كَمَا قَالَ: أَوَ لَايَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ-

অনুবাদ:

চতুর্থ প্রশ্নের নিরসন

সম্ভবত: মুনাফিকদের কথার সাথে মিল রেখে الله مستهزئ بهم বলেননি; এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, (আল্লাহ তা'লার) উপহাস একের পর এক ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এবং ধারাবাহিকভাবে নতুন রূপ ধারণ করতে থাকবে। আর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এরকমও হয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'লা বলেন, "তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বছর এক-দু'বার ফিৎনায় ফেলা হয়"?।

﴿وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾

''আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে''

মুসান্নিফ (র.) উপরোল্লেখিত বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: يـمـدهـم -এর বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: মু'তাযিলা কর্তৃক আয়াতের অপব্যাখ্যা। ৩য় আলোচনা: طغيان এবং عمه শব্দের বিশ্লেষণ।

مِنْ " مَدَّ الْجَيْشُ " وَ " أَمَدَّهُ " إِذَا زَادَهُ وَقَوَّاهُ وَمِنْهُ " مَدَدْتُ السِّرَاجَ وَالْأَرْضَ " إِذَا أَصْلَحْتَهُمَا بِالزَّيْتِ وَالسَّمَادِ لَا مِنَ الْمَدِّ فِي الْعُمْرِ فَإِنَّهُ يُعَدَّى بِاللَّامِ كَأَمْلَى لَهُمْ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيْرٍ: وَيُمِدُّهُمْ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: يمدهم -এর বিশ্লেষণ

يمدهم এটা مد الجيش و أمده থেকে উৎকলিত। অর্থ হল, সৈন্য বৃদ্ধি করা এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা। (অর্থাৎ ثلاثي এবং افعال উভয় باب থেকে বৃদ্ধি করা এবং শক্তিশালী বানানো তথা সাহায্য করা –এ অর্থে আসে। এ হিসেবে يـمـدهـم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের অবাধ্যতায় আরো অগ্রসর বানিয়ে দেন)। আর এ অর্থ থেকেই والارض مددت السراج নির্গত যার অর্থ হল, বাতিতে তেল দেয়া এবং জমীনে গোবর দেয়া। (এতে বৃদ্ধি করার অর্থও বিদ্যমান কারণ, বাতিতে তেল দিলে তার আলো বৃদ্ধি পায় এবং জমীনে গোবর দিলে তার উর্বরতা আরো বাড়ে)।

এটা (অর্থাৎ يمدهم টি) مد ''বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া'' থেকে নির্গত হয়নি। কেননা, এটা (অর্থাৎ مد ''বয়স বৃদ্ধি করা'') لام -এর মাধ্যমে متعدى হয় املى -এর মত। এর উপর ইবনে কাছীর (রা.) -এর কেরাত "يمدهم" দলীল বহন করে। (আর يمدهم এটা باب افعال থেকে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ يـمـد এটা শক্তিশালী করা ও বৃদ্ধি করা, অবকাশ দেয়া ও বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে يـمـد টি ''বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তার দু'টি প্রমাণ রয়েছে। যথা–

(ক) مد ''বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া'' এটা متعدى باللام হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে যেহেতু متعدى باللام হয়নি তাই বুঝা গেল যে, এটা ''বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং শক্তিশালী করা ও শক্তি বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, এই অর্থে এটা متعدى باللام হয় না।

(খ) ইবনে কাছীর (র.) -এর কেরাতে يُمِدُّهم (باب افعال) থেকে এসেছে। আর باب افعال থেকে ''অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া'' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই ইবনে কাছীর (র.) -এর কেরাতটি এই দলীল বহন করছে যে, এটা অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য অভিধানবেত্তাগণ মুসান্নিফ (র.) -এর এই বিশ্লেষণকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাদের মতে, يمد এটা ثلاثي ও باب افعال হতে "অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া" অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ثلاثي থেকে অধিকাংশ সময় মন্দের ক্ষেত্রে এবং افعال থেকে কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

☆☆☆

وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ اِجْرَاءُ الْكَلَامِ عَلٰى ظَاهِرِه قَالُوْا: لَمَّا مَنَعَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْطَافَهُ الَّتِىْ يَمْنَحُهَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَخَذَلَهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَاِصْرَارِهِمْ وَسَدِّهِمْ طَرِيْقَ التَّوْفِيْقِ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَتَزَايَدَتْ بِسَبَبِه قُلُوْبُهُمْ رَيْنًا وَظُلْمَةً تَزَايُدَ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْشِرَاحًا وَنُوْرًا أَوْ مَكَّنَ الشَّيْطَانَ مِنْ اِغْوَائِهِمْ فَزَادَهُمْ طُغْيَانًا اُسْنِدَ ذَالِكَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِسْنَادَ الْفِعْلِ اِلَى الْمُسَبَّبِ وَاَضَافَ الطُّغْيَانَ اِلَيْهِم لِئَلَّايُتَوَهَّمَ أَنَّ اِسْنَادَ الْفِعْلِ اِلَيْهِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَمِصْدَاقُ ذَالِكَ اَنَّهٗ لَمَّا اَسْنَدَ الْمَدَّ اِلَى الشَّيْطَان اُطْلَقَ الْغَيَّ وَقَالَ: اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ وَقِيْلَ اَصْلُهٗ: يَمُدُّ لَهُمْ بِمَعْنٰى يُمْلِيْ لَهُمْ وَيَمُدُّ فِىْ أَعْمَارِهِمْ كَىْ يَنْتَبِهَ وَيُطِيْعُوْا فَمَا زَادُوْا اِلَّا طُغْيَانًا وَ عَمَهًا فَحُذِفَتِ الَّلامُ وَعُدِّىَ الْفِعْلُ بِنَفْسِه كَمَا فِىْ قَوْلِه تَعَالٰى: وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ أَوِ التَّقْدِيْرُ يَمُدُّهُمْ اِسْتِصْلَاحًا وَهُمْ مَعَ ذَالِكَ يَعْمَهُوْنَ فِىْ طُغْيَانِهِمْ۔

অনুবাদ:

যখন আল্লাহ্ তা'লার বাণী (يمدهم فى طغيانهم) -কে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করা মু'তাযিলার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তখন তারা (উক্ত বাণীর তাবীলে) বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের উপর যে অনুকম্পা করে থাকেন তা মুনাফিকদের উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাদের কুফরির উপর হটকারিতার কারণে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা পরিহার করেছেন এবং বন্ধ করে দিয়েছেন তাওফীকের পথ। যার দরুন তাদের অন্তরে মরিচিকা এবং অন্ধকার বৃদ্ধি পেতে লাগল। যেভাবে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ও ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়।

অথবা যখন শয়তানকে শক্তি দিয়েছেন মুনাফিকদেরকে পথভ্রষ্ট করার, যার দরুন সে তাদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন اسناد الفعل الى المسبب -এর ন্যায় (يمد তথা বাড়িয়ে দেয়াকে) আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিসবত করা হয়েছে।

(অত্র আয়াতে) طغيان শব্দের ইযাফত মুনাফিকদের দিকে করা হয়েছে, যাতে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, فعل (তথা يمد) -এর নিসবত আল্লাহ্ তা'লার দিকে হাকীকী হয়েছে; (কেননা,

যখন طغيان -এর ইযাফত মুনাফিকদের দিকে করা হয়েছে তখন এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, طغيان বা অহংকার স্বয়ং তাদের কর্ম। কাজেই অহংকার বৃদ্ধি পাওয়াও তাদেরই কর্ম হবে। তাই প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার দিকে যে নিসবত হয়েছে সেটা হাকীকী অর্থে নয়; বরং মুজাযী অর্থে)। তার প্রমাণ হলো এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'লা مــــدد তথা বাড়িয়ে দেয়াকে শয়তানদের দিকে নিসবত করেছেন তখন غي শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– اخـوانهـم يـمـدونهـم فى الغى "তাদের ভাইয়েরা তাদেরকে গোমরাহীতে আরো অগ্রসর করে দেয়"।

কেউ কেউ বলেন, يـمـدهـم মূলতঃ يـمـد لهم ছিল, যার অর্থ হলো তাদেরকে অবকাশ দেন। যাতে তারা সতর্ক এবং অনুগত হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের অহংকার ও কুমতলবীতে আরো পেরেশান। এখানে يمد -এর পরে لام ছিল; কিন্তু اختـار مـوسى قومه -এর নিয়মানুসারে لام -কে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ اختـار এটা متـعـدى بـمن (من হরফে জারের মাধ্যমে মুতাআদ্দী) হয়ে থাকে; কিন্তু তার থেকে من -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে; তদ্রূপ يـمـد থেকেও لام -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

মু'তাযিলাদের অপব্যাখ্যা:

মু'তাযিলাদের মতে, মন্দ বিষয়কে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি কোন মন্দ কর্ম করেন না। তাছাড়া তাদের মতে, যে বিষয় বান্দার জন্য উপকারী, তার ব্যবস্থা করে দেয়া আল্লাহর উপর আবশ্যক। এজন্য তাদের মাযহাব অনুযায়ী, বান্দাকে মন্দ কাজে এগিয়ে দেয়া এটা আল্লাহর জন্য শোভনীয় হতে পারে না। অথচ আলোচ্য আয়াতটি তাদের মাযহাবের উল্টা কারণ, আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লা বান্দার গোমরাহীকে বাড়িয়ে দেন। কাজেই তারা আয়াতের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করেছে। মুসান্নিফ (র.) এখানে তাদের চারটি অপব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।

১ম অপব্যাখ্যা: এর সারসংক্ষেপ হল এই– মুনাফিকরা স্বীয় কুফরির উপর অবিচল থাকার কারণে তাদের থেকে আল্লাহ তা'লা সেই অনুগ্রহ ও তাওফীক উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, যা তিনি মুমিনদের উপর করে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের অন্তরে কুফরির অন্ধকার ও মরিচিকা দিন দিন বাড়তে থাকে। আর একেই يمدهم فى طغيانهم يعمهون দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখানে تزايد فى الرين والظلمات -কে আল্লাহর দিকে রূপকার্থে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

২য় অপব্যাখ্যা: মূলত: শয়তানই তাদের গোমরাহী বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আল্লাহ যেহেতু তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন; তাই "গোমরাহী বাড়িয়ে দেয়া"কে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যাকে اسناد الفعل الى المسبب বলা হয়। আর এটা দূষণীয় নয়।

তৃতীয় অপব্যাখ্যা: এখানে يـمـد টি বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত। এ অর্থে يـمـد টি متـعـدى باللام হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এরকম হয়নি, তাই তারা এর জবাবে বলে যে, এখানে يمد -এর পরে لام ছিল; কিন্তু اختـار مـوسى قومه -এর নিয়মানুসারে لام -কে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ اختار এটা متـعـدى بـمن (من হরফে জারের মাধ্যমে মুতাআদ্দী) হয়ে থাকে; কিন্তু তার থেকে من -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে; তদ্রূপ يـمـد থেকেও لام -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে يـمـد -এর অর্থ হল, বয়স বাড়িয়ে দেয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে তারা

সঠিক পথে ফিরে আসে; কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও গোমরাহীতে দিন দিন আরো অগ্রসর হতে থাকল। এই অর্থ অনুযায়ী فى طغيانهم এটা يمد -এর متعلق হবে না; বরং ظرف مستقر হয়ে يمدهم -এর هم থেকে حال হবে।

চতুর্থ অপব্যাখ্যা: فى طغيانهم এটা يمد -এর متعلق নয়; বরং يعمهون -এর ظرف এবং يعمهون টি مبتدا محذوف -এর خبر হয়ে جمله مستانفه হয়েছে। يمدهم তথা আল্লাহ তা'লা তাদের অবকাশ দিয়েছেন একথা বলার পর কেমন যেন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাদের অবকাশ দিয়েছেন, তখন তাদের অবস্থাটি কি ছিল? অত:পর فى طغيانهم দ্বারা জবাব দেয়া হচ্ছে। যার অর্থ হল, আল্লাহ তা'লা তাদের অবকাশ দিয়েছেন যাতে তারা সত্য পথে ফিরে আসে; অথচ তারা অবাধ্যতায় দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে।

☆☆☆

وَالطُّغْيَانُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ كَلُقْيَان وَلِقْيَان تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْعُتُوِّ وَالْغُلُوِّ فِي الْكُفْرِ وَأَصْلُهُ تَجَاوُزُ الشَّيْءِ عَنْ مَكَانِهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ وَالْعَمَهُ فِي الْبَصِيْرَةِ كَالْعَمٰى فِي الْبَصَرِ وَهُوَ التَّحَيُّرُ فِي الْاَمْرِ يُقَالُ: رَجُلٌ عَامِهٌ وَعَمِهٌ وَاَرْضٌ عَمْهَاءُ قَالَ: أَعْمَى الْهُدٰى بِالْجَاهِلِيْنَ الْعُمَّهِ۔

অনুবাদ:____

৩য় আলোচনা: طغيان এবং عمه শব্দের বিশ্লেষণ

طغيان শব্দের طاء-কে পেশ ও যেরের সাথে পড়া যায়। যেমন لقيان ও لقيان । طغيان-এর অর্থ হল, অবাধ্যতা ও কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করা। তার মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তু স্বীয় স্থান অতিক্রম করা। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, انا لما طغي الماء حملناكم (নিশ্চয় পানি যখন সীমা পেরিয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় আরোহন করিয়েছি)।

عمه বা পেরেশানি বিবেক-বুদ্ধিতে হয়ে থাকে যেরকম عمى বা অন্ধত্ব চক্ষুতে হয়। আর এটা (অর্থাৎ عمه বলা হয়) কোন ব্যপারে পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয়– رجل عامه و عمه (পেরেশান ব্যক্তি) এবং ارض عمهاء (বিরান ভূমিকে বলে)। কবি বলেন, أعمى الهدى بالجاهلين العمه (ছন্দের অর্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লষণে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:____

قوله أعمى الهدى بالجاهلين العمه: عمه-এর অর্থ যে পেরেশান হওয়া তার প্রমাণ হিসেবে এ পংক্তিটি উল্লেখ করেছেন। এখানে محل استشهاد হল عُمَّهٌ শব্দটি তার عين বর্ণে পেশ, ميم বর্ণে যবর এবং তাশদীদ হবে। এটা عَمِهٌ অথবা عامه -এর বহুবচন। অর্থ– পেরেশান। পূর্ণ কবিতাটি নিম্নরূপ–

ومهمه اطرافه فى مهمه ☆ أعمى الهدى بالجاهلين العمه

কবিতার অর্থ: অনেক মরুপ্রান্তর রয়েছে, যার সাথে মিশে আছে আরো অনেক মরুপ্রান্তর যার পথ-ঘাট পেরেশান লোকের নিকট জটিল হয়ে পড়েছে।

﴿أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى﴾

"তারা সে সমস্ত লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে"

اِخْتَارُوْهَا عَلَيْهِ وَاسْتَبْدَلُوْهَا بِه وَأَصْلُهُ بَذْلُ الثَّمَنِ لِتَحْصِيْلِ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْأَعْيَانِ فَاِنْ كَانَ اَحَدُ الْعَوْضَيْنِ نَاضًّا تَعَيَّنَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَايُطْلَبُ لِعَيْنِه أَنْ يَكُوْنَ ثَمَنًا وَبَذْلُهُ اِشْتِرَاءٌ وَاِلَّا فَأَيُّ الْعَوْضَيْنِ تَصَوَّرْتَهُ بِصُوْرَةِالثَّمَنِ فَبَاذِلُهُ مُشْتَرٍ وَآخِذُهُ بَائِعٌ وَلِذَالِكَ عُدَّتِ الْكَلِمَتَانِ مِنَ الْأَضْدَادِ ثُمَّ اُسْتُعِيْرَ لِلْاِعْرَاضِ عَمَّا فِيْ يَدِه مُحَصِّلًا بِه غَيْرَهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمَعَانِيْ أَوِ الْاَعْيَانِ وَمِنْهُ۔

أَخَذْتَ بِالْجُمَّةِ رَأْسًا أَزْعَرًا☆وَبِالثَّنَايَا الْوَاضِحَاتِ الدُّرْدُرَا

وَبِالطَّوِيْلِ الْعُمْرِ عُمْرًا جَيْدَرًا☆كَمَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ اِذْ تَنَصَّرَا

ثُمَّ اتَّسَعَ فِيْهِ فَاسْتُعْمِلَ لِلرَّغْبَةِ عَنِ الشَّيْءِ طَمْعًا فِيْ غَيْرِه وَالْمَعْنٰى: أَنَّهُمْ اَخَلُّوْا بِالْهُدٰى الَّذِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ بِالْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا مُحَصِّلِيْنَ الضَّلَالَةَ الَّتِيْ ذَهَبُوْا اِلَيْهَا أَوْ اِخْتَارُوا الضَّلَالَةَ وَاسْتَحَبُّوْهَا عَلَى الْهُدٰى۔

অনুবাদ:

(অর্থাৎ) তারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি খরিদ করে নিয়েছে এবং গোমরাহিকে হেদায়েতের বিনিময়ে পরিবর্তন করে নিয়েছে। (এ দুই অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে اشتـــراء -এর দু'টি অর্থ হিসেবে; এ দু'টির প্রত্যেকটি এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে)। اشتـــراء -এর মূল অর্থ হল, উদ্দিষ্ট পণ্য লাভের জন্য মূল্য খরচ করা। বিনিময় যোগ্য দু'বস্তুর মধ্য থেকে যেটা নগদ টাকা হবে; আর যেহেতু এই নগদ টাকার নোট উদ্দেশ্য হয় না (অর্থাৎ টাকা এমন নয় যে, তাকে খাওয়া যাবে, পরিধান করা যাবে) তাই এই টাকাই মূল্য হিসেবে বিবেচিত এবং তাকে খরচ করা اشتـــراء হবে (এবং ঐ টাকাটি খরচ করে যে ব্যক্তি পণ্য লাভ করবে , তাকে বলা হবে مشترى বা ক্রেতা)। আর যদি বিনিময় যোগ্য দু'বস্তুর কোন একটিই নগদ টাকা না হয়; বরং উভয়টি পণ্য হয়, তাহলে উভয়টির মধ্যে থেকে যেটাকে মূল্য মনে করবে, তার ব্যয়কারী ব্যক্তি ক্রেতা এবং গ্রহিতা বিক্রেতা হবে। আর একারণেই (তথা প্রত্যেকজন ক্রেতা-বিক্রেতা হওয়ায়) بيـــع و شــــراء এ দ'টি শব্দকে পরস্পর বিরোধ শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অত:পর اشتـــراء শব্দটি রূপকার্থে কোন বস্তু অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে যা আছে তা বিসর্জন দেয়া' অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। চাই ঐ বস্তুটি অর্থগত বা পণ্যগত হোক। আর এ অর্থ থেকে জৈনক কবি তার কবিতায় اشتراء শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবিতা হল,

أخذت بالجمة رأسا أزعرا☆وبالثنايا الواضحات الدردرا

وبالطويل العمر عمرا جيدرا☆كما اشترى المسلم اذ تنصرا (ছন্দের অর্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)

অত:পর তার মধ্যে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি হতে লাগল, ফলে কোন বস্তুর লোভে পড়ে অন্য বস্তু থেকে বিমুখ হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, মুনাফিকরা গোমরাহি গ্রহণ করার দরুন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণের যে জন্মগত যোগ্যতা দিয়েছিলেন সেই যোগ্যতাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। অথবা অর্থ হল, তারা গোমরাহিকে হেদায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:(الف) بين معنى الاشتراء والمراد بها فى الاية

(ب) أخذت بالجمة رأسا أزعرا☆وبالثنايا الواضحات الدردرا

وبالطويل العمر عمرا جيدرا☆كما اشترى المسلم اذ تنصرا

ترجم البيتين واذكر الواقعة المتعلقة التى اشار اليها الشاعر

علام استشهد المصنف بهما؟

উত্তর:(الف) اشتــراء শব্দের অর্থ ঃ اشتــراء শব্দের মোট তিনটি অর্থ রয়েছে; তন্মধ্যে একটি হল তার হাকীকী অর্থ এবং বাকি দু'টি হল মুজাযী।

اشتراء -এর হাকীকী অর্থ: استبدال العين بالعين অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু দিয়ে প্রকাশ্য বস্তু কিনা।

১ম মুজাযী অর্থ: استبـدال العين بالعين والمعنى بالمعنى অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু দিয়ে প্রকাশ্য বস্তু অথবা অপ্রকাশ্য বস্তু দিয়ে অপ্রকাশ্য বস্তু গ্রহণ করা।

২য় মুজাযী অর্থ: অগ্রাধিকার দেয়া, গ্রহণ করা।

আয়াতের মধ্যে اشتـــــــــــــــراء দ্বারা শেষের উভয় মুজাযী অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে হেদায়েত গ্রহণের যে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তারা সেই যোগ্যতাকে কাজে না লাগিয়ে তথা হেদায়েত গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে গোমরাহি গ্রহণ করে নিয়েছে।

(ب) :

أخذت بالجمة رأسا أزعرا☆وبالثنايا الواضحات الدردرا

وبالطويل العمر عمرا جيدرا☆كما اشترى المسلم اذ تنصرا

কবিতার অর্থ: তুমি কেশগুচ্ছবিশিষ্ট মাথার পরিবর্তে গ্রহণ করে নিয়েছ টাক পড়া মাথা। উজ্জ্বল দাঁতের পরিবর্তে বেছে নিয়েছ মাড়ি। দীর্ঘ জীবনের পরিবর্তে নিয়েছ সামান্য জীবন। যেমন মুসলমান ইলামের পরিবর্তে খ্রীস্টত্ব গ্রহণ করে।

কবিতা সংশ্লিষ্ট ঘটনা: কবি এই কবিতায় জাবালা ইবনে আয়হাম সম্পর্কে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঘটনাটি হল– জাবালা ইবনে আয়হাম নামীয় এক ব্যক্তি গাসসানের রাজা ছিল; সে ছিল খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী। সে হযরত ওমর (রা.) -এর শাসনামলে মদীনায় আগমন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। একদা সে মক্কায় গিয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করছিল; ঘটনাচক্রে বনী ফাযারা গোত্রের এক গ্রাম্য লোকের পা তার লুঙ্গিতে স্পর্শ করলে সে ঐ গ্রাম্য লোকটির উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে একটি চড় দিল; যার দরুন গ্রাম্য লোকটির নাক যখমী হয়ে গেল এবং তার সামনের দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল। গ্রাম্য লোকটি হযরত ওমর (রা.) -এর দরবারে নালিশ দিলো। তিনি ফয়সালা দিলেন যে, গ্রাম্য লোকটি মাফ

করে দিলে তো ভাল অন্যথায় তার থেকে কেসাস নেয়া হবে। জাবালা বলল, ওমর!-তুমি কি আমার থেকে কেসাস নিতে চাচ্ছ; অথচ আমি তো একজন রাজা আর সে হল আমার প্রজা? ওমর বললেন, কে রাজা আর কে প্রজা ইসলাম তা দেখে না; বরং ইসলামে রাজা-প্রজা সবাই সমান। তাই তুমি আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। এতে জাবলা একদিনের সময় চাইল এবং সে তার চাচাত ভাইকে নিয়ে মুরতাদ হয়ে রাতেই পলায়ন করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। অত:পর রুমে চলে গিয়ে পুনরায় খ্রীস্টান হয়ে গেল।

কথিত আছে যে, জাবালা ইবনে আয়হাম তার কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে পুনরায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে।

محل استشهاد : এ কবিতাটি কবি আবুন নাজমের। সে তার স্ত্রীর উপর আক্ষেপ প্রকাশার্থে এ কবিতাটি রচনা করেছিল। মুসান্নিফ (র.) এখানে এ কবিতাটি উল্লেখ করে একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, اشتراء শব্দটি রূপকার্থে কোন বস্তু অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ হওয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। চাই ঐ বস্তুটি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হোক। এ কবিতার মধ্যে كما محل استشهاد হল اشترى المسلم اذ تنصر অংশটি। কারণ, খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণকারীর কাছে ইসলাম ছিল; কিন্তু সে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

☆☆☆

﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾

"বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারে নি"

এ বাক্য সম্পর্কে দু'টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: استعاره ২য় আলোচনা: تجارة শব্দের বিশ্লেষণ এবং ربحت -এর নিসবত তিজারতের দিকে হাকীকী না মুজাযি?

تَرْشِيْحٌ لِلْمُجَازِ لَمَّا اُسْتُعْمِلَ الْاِشْتِرَاءُ فِيْ مُعَامَلَتِهِمْ اَتْبَعَهُ مَا يُشَاكِلُهُ تَمْثِيْلًا لِخَسَارِهِمْ وَنَحْوُهُ:

وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ اِبْنَ دَايَةٍ ☆ وَعَشْعَشَ فِيْ وَكْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِىْ

অনুবাদ:______________________________

১ম আলোচনা: استعاره

فما ربحت تجارتهم হল استعاره ترشيحيه যখন মুনাফিকদের উক্ত বিষয়ে (তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি গ্রহণ করা) اشتراء শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন পরবর্তীতে (অর্থাৎ এই আয়াতে) তাদের লোকসানের উপমা হিসেবে এমন কথা উল্লেখ করেছেন যা তাদের সেই ব্যাপারটির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তার দৃষ্টান্ত হল, ولما رأيت النسر عز ابن داية ☆ وعشعش فى وكريه جاش له صدرى এ কবিতাটি। (কবিতার তরজমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم

السوال: فسر كما فسر المفسر العلام

উত্তর ঃ আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝার পূর্বে একটি ভূমিকা বুঝে নেয়া দরকার। ভূমিকাটি হল, ترشيح "للمجاز" বলা হয়- مجاز (রূপক অর্থ) টি قرينه -এর মাধ্যমে পরিপুর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে معنى حقيقى (প্রকৃত অর্থ) -এর مناسب উল্লেখ করা। চাই مجاز مرسل ترشيح বা مجاز استعاره ترشيح হোক। مجاز استعاره ترشيح -এর মিছাল যেমন: رَأَيْتُ فِى الْحَمَّامِ اَسَدًا ذَالِبَدِ (আমি গোসলখানায় কেশগুচ্ছবিশিষ্ট একটি সিংহ দেখেতে পেলাম)। এ উদাহরণে اسد -এর মধ্যে استعاره مصرحه اصليه পাওয়া যাচ্ছে; তথা বাহাদুরকে اسد -এর সাথে تشبيه দিয়ে مشبه به উল্লেখ করে তার দ্বারা مشبه উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এখানে اسد শব্দটি তার حقيقى অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; তার قرينه হল, فى الحمام অংশটি কারণ হল, সিংহ তো গোসলখানায় প্রবেশ করবে না। এই قرينه -এর মাধ্যমে استعاره পরিপুর্ণ হওয়ার পর اسد -এর معنى حقيقى তথা প্রকৃত সিংহের مناسب – لبد -কে উল্লেখ করা ترشيح হয়েছে।

আর مجاز مرسل ترشيح -এর মিছাল যেমন: له فى الكرم يد طولى (দান করার মধ্যে তার লম্বা হাত রয়েছে)। এখানে يد (হাত) দ্বারা مجازا পরিপুর্ণ হিম্মত উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে; যার قرينه হল فى الكرم। অত:পর يد -এর হাকীকী অর্থ (হাত) -এর মুনাসিব শব্দ طولى (লম্বা) -কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ মিছালের মধ্যে طولى হল ترشيح للمجاز ।

অত:পর ترشيح বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: (ক) ترشيح টি معنى حقيقى -এর উপর হয়ে তার পূর্বের استعاره -এর অনুগামী হয়ে থাকে; এর দ্বারা শুধু পূর্বের استعاره -কে মজবুত ও শক্তিশালী করে তুলা উদ্দেশ্য হয়। যেমন رَأَيْتُ فِى الْحَمَّامِ اَسَدًا ذَالِبَدِ -এর মধ্যে ذالبد টি তার হাকীকী অর্থের উপর ترشيح হয়েছে। (খ) ترشيح টি তার পূর্বের استعاره -এর ترشيح -এর সাথে সাথে স্বয়ং নিজেই পৃথক একটি استعاره হয়; এই পদ্ধতিটি সর্বোত্তম। (গ) সে পূর্বের استعاره -এর ترشيح হওয়ার সাথে সাথে নিজেই ঐ استعاره -এর অনুগামী এমন একটি استعاره হয়; যদি দ্বিতীয় استعاره টি না থাকতো তাহলে প্রথম استعاره -এর মধ্যে সৌন্দর্যতা সৃষ্টিই হতো না।

এবার বুঝুন আয়াতের ব্যাখ্যাটি। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের ترشيح পাওয়া যাচ্ছে। আর তা এভাবে যে, اشتروا الضلالة بالهدى -এর মধ্যে استعاره হয়েছে তথা মুনাফিকদের হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি গ্রহণ করা'' -এর উপর اشتراء শব্দকে استعاره হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অত:পর مشبه به -এর مناسبات -এর মাঝ থেকে দু'টি مناسب তথা ربح ও تجارة -কে এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং اشتراء -এর পরে ربح ও تجارة উল্লেখ করাটা ترشيح হয়েছে। আর এই ترشيح -এর সাথে সাথে এখানে استعارهও আছে। আর তা এভাবে যে, এ শব্দদ্বয় দ্বারা মুনাফিকদের লোকসানের একটি উপমা পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হেদায়েত গ্রহণের যে উপকারিতা এগুলো তাদের থেকে ফওত হয়ে যাওয়াকে একজন ব্যবসায়ীর লোকসানের সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে। যাতে এবিষয়টি প্রতিয়মান হয় যে, হেদায়েত হল মূলধন সমতুল্য এবং এর দ্বারা যে উপকারিতা লাভ হয়; তা ربح -এর সমতুল্য। অতএব দুনিয়াতে যার হেদায়েত নসিব হল না; সে যেন তার মূলধন ও লাভ উভয়টি হারিয়ে ফেলে

চরম সীমার লোকসানে পড়ে গেল। যেমনিভাবে ব্যবসায়ী চরম সীমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়; যখন তার মূলধন ও লাভ কোনটিই থাকে না।

অত:পর مشبه به -কে যে জুমলা দ্বারা ব্যক্ত করা হয় অর্থাৎ ماربحت تجارتهم এই জুমলাকে مشبه -এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

মোটকথা, অত্র আয়াতে ربحت تجارتهم -এর মধ্যে استعار এবং ترشيح উভয়টি পাওয়া যাচ্ছে।

قول الشاعر: ولما رأيت النسر عز ابن داية ☆ وعشعش في وكريه جاش له صدرى

السوال: ترجم البيت. ثم بين علام استشهد المصنف به

কবিতার অর্থ: যখন আমি শকুনকে কাকের উপর বিজয়ী হতে দেখলাম এবং যখন শকুন কাকের উভয় বাসাতে তার বাসা বানিয়ে নিল, তখন আমার অন্তর তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কবিতার ব্যাখ্যা: কবি বলছে, যখন আমি দেখলাম যে, আমার যৌবনের উপর বার্ধক্য চেপে বসেছে (অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম) এবং চুল-দাড়ি শুভ্র হয়ে গেছে, তখন আমার অন্তর চিন্তিত হয়ে গেল।

محل استشهاد : মুসান্নিফ (র.) এ কবিতাটি এনেছেন فماربحت تجارتهم -এর মধ্যে যে استعاره ও ترشيح উভয়টি পাওয়া যাচ্ছে; তা প্রমাণ করার জন্য। অর্থাৎ একই সাথে استعاره ও ترشيح পাওয়া যায়;তার দৃষ্টান্ত হল উক্ত কবিতাটি। কেননা, এ কবিতার মধ্যে نسر (শকুন) শব্দের মধ্যে এক استعاره এবং ابن دايه (কাক) -এর মধ্যে আরেকটি استعاره হয়েছে। বার্ধক্যকে نسر (শকুন) -এর সাথে تشبيه দিয়ে তার দ্বারা বার্ধক্য উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব نسر -এর মাঝে এক استعاره পাওয়া গেল। তদ্রূপ যৌবনকে ابن دايه (কাক) -এর সাথে تشبيه দিয়ে তার দ্বারা যৌবন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে কাজেই এখানেও আরেকটি استعاره পাওয়া গেল। অত:পর نسر -এর- مناسبات -এর মাঝ থেকে تعشيش (বাসা বানানো) -কে পরবর্তীতে عشش শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এই استعاره -এর ترشيح এবং وكرين উভয়টি ابن دايه (কাক) -এর مناسبات -এর মাঝ থেকে। কেননা, এটা প্রসিদ্ধ যে, কাকের দু'টি বাসা থাকে; একটি হল শীতের মওসুমে এবং অপরটি গরমের মওসুমে। তাই ابن دايه -এর মধ্যে وكرين ترشيح -এর- উল্লেখ করায় যে استعاره হয়েছে; তার ترشيحও হয়েছে। অতএব تعشيش টি প্রথম استعاره -এর ترشيح এবং وكرين হল দ্বিতীয় استعاره -এর ترشيح ; এ উভয় ترشيح -এর মাঝে ترشيح -এর সাথে সাথে استعارهও পাওয়া গেল। تعشيش দ্বারা অবতরণ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অবতরণকে تعشيش -এর সাথে تشبيه দিয়ে مشبه به -এর শব্দ مشبه -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আর চুল-দাড়িকে وكرين (দুই বাসা) -এর সাথে تشبيه দিয়ে এর দ্বারা مشبه তথা চুল-দাড়ি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

☆☆☆

২য় আলোচনা: تجارة শব্দের বিশ্লেষণ এবং ربحت -এর নিসবত দিকে হাকীকী না মুজাযি?

السوال: (الف) ما معنى التجارة؟

(ب) كيف اسند الربح الى التجارة والحقيقة أن التاجر يرحب لا التجارة؟

উত্তর ঃ (الف) تجارة **কাকে বলে?**

আল্লামা বায়যাবী (র.) تجارة -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, طلب الربح بالبيع والشراء অর্থাৎ বেচা-কেনার মাধ্যমে লাভ অর্জন করাকে তিজারত বলে।

(ب) **একটি প্রশ্নের নিরসন:** আয়াতের উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে ربح বা লাভবান হওয়াকে ব্যবসার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে; অথচ ব্যবসা নয়; বরং ব্যবসায়ী লাভবান হয়?

তাই বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের নিরসনকল্পে তিনটি জবাব দিয়েছেন।

☆ ১ম জাবাব: ব্যবসা যেহেতু লাভ অর্জনের سبب বা মাধ্যম; কাজেই ব্যবসার দিকে লাভবান হওয়াকে সম্বন্ধ করে তার দ্বারা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যাকে مجاز مرسل বলা হয়। এখানে سبب উল্লেখ করে مسبب বা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

☆ দ্বিতীয় জবাব: ব্যবসা হচ্ছে লাভবান হওয়ার علت তাই علت তথা ব্যবসার দিকে লাভবান হওয়াকে সম্বন্ধ করে তার দ্বারা معلول তথা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

☆ ৩য় জবাব: এখানে تجارة দ্বারা আহলে তিজারত তথা ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য; তাই আর কোন প্রশ্ন থাকল না।

☆☆☆

﴿وما كانوا مهتدين﴾

"এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি"

لِطَرِيْقِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ وَهٰؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوا الطِّلْبَتَيْنِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِمْ كَانَ الْفِطْرَةُ السَّلِيْمَةُ وَالْعَقْلُ الصَّرْفُ فَلَمَّا اعْتَقَدُوْا هٰذِهِ الضَّلَالَاتِ بَطَلَ اِسْتِعْدَادُهُمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَسَّلُوْنَ بِهِ اِلٰى دَرْكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ فَبَقُوْا خَاسِرِيْنَ ايِسِيْنَ عَنِ الرِّبْحِ فَاقِدِيْنَ لِلْاَصْلِ۔

অনুবাদ:

তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি অর্থাৎ ব্যবসার পথ পায়নি। কেননা, ব্যবসার উদ্দেশ্য থাকে পুঁজি ও লাভ উভয়টি নিরাপদ থাকা; নষ্ট না হওয়া। কিন্তু তারা এ উভয়টিকে হারিয়ে ফেলেছে করাণ, তাদের পুঁজি ছিল সত্য গ্রহণের যোগ্যতা এবং খায়েশাত মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি। অত:পর যখন তারা ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করতে লাগল, তখন তাদের সেই যোগ্যতাটি নষ্ট হয়ে গেল এবং বিবেক বিকৃত হতে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদের এমন কোন পুঁজি আর অবশিষ্ট রইল না; যার দ্বারা তারা সত্য পথ গ্রহণ করে সফলকাম হতে পারে। অতএব তারা পুঁজি ও লাভ উভয়টি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾

"তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার মত, যে আগুন জ্বালালো"

এ বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং উদাহরণের ফায়দা। ২য় আলোচনা: مثل শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: استيقاد এবং نار শব্দের বিশ্লেষণ।

لَمَّا جَاءَ بِحَقِيْقَةِ حَالِهِمْ عَقَّبَهَا بِضَرْبِ الْمَثَلِ فِى التَّوْضِيْحِ وَالتَّقْرِيْرِ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِى الْقَلْبِ وَأَقْمَعُ لِلْخَصَمِ الْأَلَدِّ لِأَنَّهُ يُرِيْكَ الْمُتَخَيَّلَ مُحَقَّقًا وَالْمَعْقُوْلَ مَحْسُوْسًا وَلِأَمْرٍ مَا أَكْثَرَ اللّٰهُ فِىْ كُتُبِهِ الْأَمْثَالَ وَفَشَتْ فِىْ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُكَمَاءِ۔

অনুবাদ:______________________________

১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং উদাহরণের ফায়দা:

যখন আল্লাহ তা'লা (পূর্ববর্তী আয়াতে) মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন, তখন (এই আয়াতের মধ্যে) তাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছেন; যাতে কথাটি আরো স্পষ্ট ও মজবুত হয়। কেননা, উপমা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, ঝগড়াটে লোককে অধিক পরিজাতি করে। কারণ, উপমা দ্বারা কাল্পনিক বিষয় বাস্তব রূপে এবং জ্ঞানলব্ধ বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুতে ভেসে উঠে; যার দরুন কথাটি অন্তরে বেশী আছর করে। আর এ বিরাট উপকারিতার কারণেই আল্লাহ তা'লা তদীয় আসমানী কিতাবসমূহে অধিক উপমা পেশ করেছেন এবং নবী ও দার্শনিকগণের কথাবার্তায় প্রচুরপরিমাণে উপমা পাওয়া যায়।

☆☆☆

وَالْمَثَلُ فِى الْأَصْلِ بِمَعْنَى النَّظِيْرِ يُقَالُ مَثَلٌ وَ مِثْلٌ وَ مَثِيْلٌ كَشَبَهٍ وَ شِبْهٍ وَ شَبِيْهٍ ثُمَّ قِيْلَ لِلْقَوْلِ السَّائِرِ الْمُمَثَّلِ مَضْرِبُهُ بِمَوْرِدِهِ وَلَا يُضْرَبُ إِلَّا مَا فِيْهِ غَرَابَةٌ وَلِذٰلِكَ حُوْفِظَ عَلَيْهِ مِنَ التَّغْيِيْرِ ثُمَّ اُسْتُعِيْرَ لِكُلِّ حَالٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ صِفَةٍ لَهَا شَأْنٌ وَفِيْهَا غَرَابَةٌ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى: وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى وَالْمَعْنٰى: حَالُهُمُ الْعَجِيْبَةُ الشَّانِ كَحَالِ مَنْ اِسْتَوْقَدَ نَارًا۔

অনুবাদ:______________________________

২য় আলোচনা: مثل শব্দের বিশ্লেষণ

مثل শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে– দৃষ্টান্ত। যেমন বলা হয়– مَثَلٌ و مِثْلٌ و مَثِيْلٌ (এ হল তিন লুগাত; তিনোটির অর্থ হল– দৃষ্টান্ত)। যেভাবে شَبَهٌ و شِبْهٌ و شَبِيْهٌ (এ তিনোটির অর্থও "দৃষ্টান্ত")। অত:পর مثـــــــــل শব্দটি এমন প্রবাদ-প্রবচনের উপর প্রয়োগ হতে লাগল; যার ব্যবহারস্থলকে

উৎপত্তিস্থলের সাথে তাশবীহ দেয়া হয় (উৎপত্তিস্থল বলতে উদ্দেশ্য হল, যে ঘটনার পরিপেক্ষিতে সর্বপ্রথম ঐ শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ব্যবহারস্থল বলতে উদ্দেশ্য হল, প্রথম প্রবক্তা বলার পর যে যে স্থানে তাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে- الباحث عن حتفه بظلفه "নিজের ক্ষুর দ্বারা নিজের মৃত্যু অন্বেষণকারী" এ প্রবাদটি সেই ব্যক্তির বেলায় ব্যবহার হয় যে তার নিজ কৃত কর্ম-কান্ড দ্বারা কোন বিপদের সম্মুখীন। এর মূল ঘটনাটি ছিল এই, একদা এক ব্যক্তি তার বকরী জবাই করার ইচ্ছায় তাকে প্রস্তুত করল কিন্তু তার কাছে কোন ছুরি ছিল না। কিন্তু বকরীটি তার পা দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগল হঠাৎ সেখানে মাটির নিচ থেকে একটি ছুরি বের হয়ে আসল এবং সে ছুরি দ্বারা তাকে জবাই করা হল। আর তখন থেকে যে ব্যক্তিই তার কৃত কর্মের দ্বারা বিপদের সম্মুখীন হয় তাকে ঐ বকরীর সাথে তুলনা দিয়ে তার সম্পর্কে ঐ বাক্যটি ব্যবহার হতে লাগল)।

প্রবাদ-প্রবচন কোথায় ব্যবহার হয়?

প্রবাদ-প্রবচন সেই স্থানেই ব্যবহার হয় যে স্থানটি কোন না কোন দিক থেকে আশ্চর্যময় ও অসাধারণ হয়ে থাকে। আর একারণেই প্রবাদ-প্রবচন সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে নিরাপদ থাকে।

অত:পর مثل শব্দটি বিরল অবস্থা অথবা ঘটনা কিংবা গুণের অর্থে استعاره হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- مثل الجنة التى وعد المتقون (সেই জান্নাতের আশ্চর্যময় অবস্থা যার অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে) এবং ولله المثل الاعلى (আর আল্লাহ তা'লারই রয়েছে সুউচ্চ ও আশ্চর্যময় গুণ)। (مثلهم كمثل الذى استوقد نارا এই আয়াতে مثل শব্দটি এই তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) আর আয়াতের অর্থ হল, মুনাফিকদের আশ্চর্যময় অবস্থা অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর আশ্চর্যময় অবস্থার ন্যায়।

☆☆☆

وَالْاِسْتِيْقَادُ: طَلَبُ الْوُقُوْدِ وَالسَّعْىُ فِيْ تَحْصِيْلِه وَهُوَ سُطُوْعُ النَّارِ وَارْتِفَاعُ لَهْبِهَا وَاشْتِقَاقُ النَّارِ مِنْ "نَارَ يَنُوْرُ نَوْرًا" اِذَا نَفَرَ لِاَنَّ فِيْهَا حَرْكَةً وَاضْطِرَابًا۔

অনুবাদ:____

৩য় আলোচনা: استيقاد এবং نار শব্দের বিশ্লেষণ

استيقاد-এর অর্থ হল, অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার কামনা করা এবং তা পেতে চেষ্টা করা। আর وقود-এর অর্থ হল, আগুন ধাও ধাও করে জ্বলা এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উপরের দিকে উঠা। نار শব্দটি نار ينور نورا থেকে এসেছে যার অর্থ হল পলায়ন করা। আর আগুনের মধ্যে যেহেতু রয়েছে গতি ও চাঞ্চল্য (আর পলায়ন করার সময় পলায়নকারীর মধ্যে নড়াচড়া ও চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই আগুনকে نار বলা হয়)।

☆☆☆

﴿فَلَمَّا أَضَاءَ تْ مَاحَوْلَهُ﴾

"আর তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো"

أَيْ اَلنَّارُ مَا حَوْلَ الْمُسْتَوْقِدِ اِنْ جَعَلْتَهَا مُتَعَدِّيَةً وَاِلَّا اَمْكَنَ اَنْ تَكُوْنَ مُسْنَدَةً اِلَى (مَا) وَالتَّانِيْثُ لِاَنَّ مَا حَوْلَهُ أَشْيَاءُ وَأَمَاكِنُ أَوْ اِلَى ضَمِيْرِ النَّارِ وَ(مَا) مَوْصُوْلَةٌ فِيْ مَعْنَى الْاَمْكِنَةِ نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِيَةِ أَوْ مَزِيْدَةٌ وَحَوْلَهُ ظَرْفٌ وَتَالِيْفُ الْحَوْلِ لِلدَّوْرَانِ وَقِيْلَ لِلْعَامِ حَوْلٌ لِاَنَّهُ يَدُوْرُ۔

অনুবাদ:

فلما أضاء ت ماحوله -এর মধ্যে أضاء ت ফে'লকে যদি متعدى ধরা হয় তাহলে هى ضمير مستتر (যা النار -এর দিকে ফিরেছে) فاعل হয়ে ما موصوله টি তার مفعول به হবে আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, "যখন আগুন অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর চারদিককার স্পষ্ট করে তুললো"। আর যদি اضاء ت -কে متعدى না ধরা হয় তাহলে সম্ভব আছে যে, ما টি তার فاعل হবে; তবে ما শব্দটি مذكر হওয়া সত্ত্বেও اضاء ت ফে'লকে مونث আনা হয়েছে তার কারণ হল, ماحوله দ্বারা তো উদ্দেশ্য হল أشياء و اماكين (তথা অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর আশপাশের বিভিন্ন জিনিস ও স্থান) আর اشياء و اماكن এ দু'টি শব্দ অর্থগত দিক থেকে مونث কেননা, এ উভয় শব্দ جمع مكسر আর جمع مكسر টি حكما مونث হয়ে থাকে। তাই ما -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে أضاء ت -কে مونث ব্যবহার করা হয়েছে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, "যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল"। অথবা أضاء ت -এর فاعل হবে النار -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী هى ضمير مستتر টি আর ما টি أمكنه (স্থান) -এর অর্থে مفعول فيه হিসেবে محلا منصوب হবে অথবা ما টি অতিরিক্ত এবং حوله টি مفعول فيه (আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, "যখন তার চতুর্দিকে আগুন জ্বলে উঠল")।

আর حول শব্দের গঠনের মধ্যে 'ঘোরা, চক্কর দেওয়া' অর্থ পাওয়া যায় (অর্থাৎ যে শব্দই এই গঠনে আসবে সেটা এই অর্থ প্রদান করবে)। আর এহিসেবে বছরকেও حول বলা হয় কারণ, বছর চক্কর দিয়ে আবার ফিরে আসে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: بين وجوه الاعراب لقوله تعالى: فلما أضاء ت ماحوله

উত্তর ঃ فلما أضاء ت ماحوله **-এর তারকীব:**

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ আয়াতের চারটি তারকীব উল্লেখ করেছেন। প্রথম তারকীব أضـــــاء ت ফে'লকে متعدى ধরে আর বাকী তিন তারকীব أضاء ت -কে لازم ধরে।

(ক) যদি أضاء ت ফে'লকে متعدى ধরা হয়, তাহলে তার মধ্যকার هى ضمير টি فاعل হবে যা النار -এর দিকে ফিরেছে এবং ما حوله হবে তার مفعول به ।

(খ)আর যদি لازم ধরা হয় তাহলে ما حوله তার فاعل হবে।

(গ) هى ضمير مستتر হবে তার فاعل এবং ما حوله হবে তার مفعول فيه ।

(ঘ) هى ضمير مستتر হল فاعل আর ما টি অতিরিক্ত এবং حوله হল مفعول فيه । যাই হোক এবাক্যটি হবে شرط ।

﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ﴾

''তখন আল্লাহ তাদের আলোকে উঠিয়ে নিলেন''

এ বাক্য সম্পর্কে দু'টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব। ২য় আলোচনা: আল্লাহর দিকে اذهاب (নিয়ে যাওয়া) -এর সম্বন্ধ করার কারণ।

جُوَابُ لَمَّا وَالضَّمِيْرُ لِلَّذِىْ وَجَمَعَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنٰى وَعَلٰى هٰذَا اِنَّمَا قَالَ بِنُوْرِهِمْ وَلَمْ يَقُلْ بِنَارِهِمْ لِاَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ اِيْقَادِهَا أَوْ اِسْتِيْنَافٌ أُجِيْبَ بِه اِعْتِرَاضُ سَائِلٍ يَقُوْلُ مَا بَالُهُمْ شُبِّهَتْ حَالُهُمْ بِحَالِ مُسْتَوْقِدٍ اِنْطَفَتْ نَارُهُ أَوْ بَدْلٌ مِنْ جُمْلَةِ التَّمْثِيْلِ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَيَانِ وَالضَّمِيْرُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلْمُنَافِقِيْنَ وَالْجُوَابُ مَحْذُوْفٌ كَمَا فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى: فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِه ' لِلْاِيْجَازِ وَأَمْنِ الْاِلْتِبَاسِ ـ

অনুবাদ:______________________________

১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব

ذهب الله بنورهم এ বাক্যটি لما -এর جواب আর بنورهم -এর هم ضمير টি (كمثل الذى -এর) استوقد -এর الذى -এর দিকে ফিরেছে। তবে هم -কে جمع আনা হয়েছে الذى -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে (কারণ, الذى অর্থগতভাবে جمع)। তদ্রূপ الذى -এর অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রেখে بنورهم বলেছেন; بنارهم বলেননি। কেননা, আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য তো হল নূর বা আলো। অথবা এ বাক্যটি مستانفه হবে। এর দ্বারা এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে; যে বলে যে, মুনাফিকদের অবস্থাকে অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর অবস্থার সাথে তুলনা করা হল কেন; যার আগুন নিভে গেছে? অথবা এ বাক্যটি উল্লেখিত তাশবীহের সমষ্টি থেকে বয়ান হিসেবে بـــــدل হবে। এই দুই তারকীবের সূরতে بنورهم -এর هم ضمير ফিরবে মুনাফিকদের প্রতি। আর فلما أضاءت ماحوله -এর جواب বা جزاء উহ্য থাকবে। একে হযফ করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকার কারণে। যেভাবে আল্লাহ তা'লার বাণী فلما ذهبوا به -এর মধ্যে جزاء -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:______________________________

قوله تعالى: ذهب الله بنورهم
السوال: اكتب وجوه الاعراب

উত্তর ঃ ذهب الله بنورهم -এর তিন তারকীব:

১. ذهب ফে'ল, الله ফায়েল এবং بنورهم হল متعلق অত:পর ذهب ফে'লটি তার সকল معمول -কে নিয়ে পূর্বের لما -এর جزاء । এই তারকীবের সূরতে بنورهم -এর هم ضمير টি كمثل الذى استوقد الخ -এর মধ্যকার الذى -এর দিকে ফিরবে। যেহেতু الذى টি অর্থের দিক থেকে বহুবচন তাই هم ضمير -কে বহুবচন আনা হয়েছে।

২. এ বাক্যটি مستـــانـفـــه হয়েছে; যার দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া উদ্দেশ্য। যে বলে যে, মুনাফিকদের অবস্থাকে অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর অবস্থার সাথে তুলনা করা হল কেন; যার আগুন নিভে গেছে? তখন এই আয়াত দ্বারা জবাব দেয়া হয়েছে।

৩. অথবা এ বাক্যটি بدل আর পূর্বের مثلهم كمثل الذى থেকে নিয়ে فلما أضاءت ما حوله পর্যন্ত مبدل منه । শেষের দুই তারকীবের সূরতে لما -এর جزاء টি বিলুপ্ত থাকবে। মূল ইবারত হবে, فلما أضاءت ما حوله انطفأت ناره ।

☆☆☆

وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى إِمَّا لِأَنَّ الْكُلَّ بِفِعْلِهِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْإِطْفَاءَ حَصَلَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ أَوْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ كَرِيْحٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ وَلِذَالِكَ عُدِّىَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ دُوْنَ الْهَمْزَةِ لِمَا فِيْهَا مِنْ مَعْنَى الْإِسْتِصْحَابِ وَالْإِسْتِمْسَاكِ يُقَالُ: ذَهَبَ السُّلْطَانُ بِمَالِهِ إِذَا أَخَذَهُ وَمَا أَخَذَهُ اللّٰهُ وَأَمْسَكَهُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَلِذَالِكَ عُدِلَ عَنِ الضَّوْءِ الَّذِىْ هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إِلَى النُّوْرِ فَإِنَّهُ لَوْ قِيْلَ ذَهَبَ اللّٰهُ بِضُوْءِ هِمْ إِحْتَمَلَ ذِهَابُهُ بِمَا فِى الضُّوْءِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَبَقَاءُ مَا يُسَمّٰى نُوْرًا وَالْغَرَضُ إِزَالَةُ النُّوْرِ عَنْهُمْ رَأْسًا أَلَاتَرٰى كَيْفَ قَرَّرَ ذَالِكَ وَأَكَّدَ بِقَوْلِهِ:وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لَّايُبْصِرُوْنَ۔

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: আল্লাহর দিকে اذهاب (নিয়ে যাওয়া) -এর সম্বন্ধ করার কারণ

আর আলো নিয়ে যাওয়াকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে গেছেন এরকম বলা হয়েছে) কারণ হল, সবকিছু আল্লাহ তা'লার সৃষ্টি করার দ্বারাই অস্তিত্বে আসে। তাই আলো নিয়ে যাওয়াও আল্লাহ তা'লার একটি সৃষ্টি। এই সূরতে আল্লাহর দিকে اذهاب -এর সম্বন্ধ হবে হাকীকী। অথবা তাঁর দিকে এ কারণে সম্বন্ধ করা হয়েছে যে, তাদের এই আলো নির্বাপিত হয়েছে অদৃশ্য কোন কারণে। (আর কোন বিষয় অজানা থাকলে লোক সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে থাকে, তাই আল্লাহর দিকে মুজাযীভাবে আলো নিয়ে যাওয়াকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)। অথবা তাদের আলোটি নিভেছে আসমানী কোন কারণে যেমন, ঝড়-তুফান ইত্যাদি। (আর এতে যেহেতু বান্দার কোন হস্তক্ষেপ নেই তাই আল্লাহর দিকেই বিষয়টিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)। অথবা সম্বন্ধ করা হয়েছে مبالغه -এর উদ্দেশ্যে। (কেননা, শক্তিশালী কর্তার দিকে কোন কাজের সম্বন্ধ করা হলে কাজটি যে তার থেকে দৃঢ়তা ও মজবুতির সাথে সম্পাদিত হয়েছে, তা বুঝা যায়। কাজেই যখন اذهاب বা নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'লার দিকে; যিনি সর্বশক্তিমান, তখন কি পরিমাণ কাজের মজবুতি বুঝাবে এখান থেকে অনুমান করে নিন)। আর এই مبالغه -এর উদ্দেশ্যেই (যেভাবে ذهب فعل -কে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেভাবে) فعل -কে باء দ্বারা متعدى করা হয়েছে (সুতরাং বলা হয়েছে– ذهب الله بنورهم) তাকে همزه দ্বারা متعدى করা হয়নি (অর্থাৎ أذهب বলা হয়নি) তার কারণ হল, باء -এর মধ্যে 'ধরা' -এর অর্থ বিদ্যমান (যা

همزه -এর মধ্যে নেই। যেমন বলা হয়–) ذهب السلطان بماله (বাদশা তার সম্পদ ধরে নিয়ে গেছেন) (তদ্রূপ ذهب الله بنورهم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তাদের আলোকে ধরে নিয়ে গেছেন)। আর এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'লা যে বস্তুকে পাকড়াও করবেন তাকে মুক্ত করার কেউ নেই। (তাই اذهب -এর তুলনায় باء দ্বারা متعدى করার মধ্যে مبالغه বেশী পাওয়া যায় কাজেই باء দ্বারা متعدى বানিয়ে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে)। আর এ উদ্দেশ্যেই ضوء শব্দ না এনে نور শব্দ এনেছেন অথচ (প্রথমে اضاءت ماحوله -এর মধ্যে ضوء শব্দ উল্লেখ করার কারণে) শব্দের চাহিদা ছিল ضوء উল্লেখ করার। نور শব্দ উল্লেখের মধ্যে مبالغه হওয়ার কারণ হল, (ضوء বলা হয় শুধু তেজ আলোকে আর দুর্বল, সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা হয়। তাই সূর্যের দিকে ضوء -এর এবং চন্দ্রের দিকে নূরের সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে– جعل الشمس ضياء والقمر نورا এখন) যদি ذهب الله بضوئهم বলা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের আলোর তেজ নষ্ট হয়েছে; তবে নূর নষ্ট হয়নি। অথচ এখানে উদ্দেশ্য হল, সম্পূর্ণরূপে তাদের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়া। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা'লা এ বিষয়টিকে (অর্থাৎ জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া এ কথাকে) কঠোর ভাষায় বলেছেন– وتركهم فى ظلمات لايبصرون- বাক্য দ্বারা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ذهب الله بنورهم

السوال: (الف) لم قال " ذهب " ولم يقل " أذهب "؟

(ب) لم قال " بنورهم " والمقام يقتضى " بضوئهم "؟

এখানে প্রশ্ন হল যে, ذهب ফে'লকে باء -এর মাধ্যমে متعدى বানিয়ে আনা হয়েছে; অথচ এভাবে না এনে সরাসরি أذهب ব্যবহার করা যেত। তাই باء দ্বারা متعدى বানানোর কি প্রয়োজন?

উত্তর: (الف) فعل -কে باء দ্বারা متعدى করে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে; তাকে همزه দ্বারা متعدى করা হয়নি। অর্থাৎ أذهب বলা হয়নি তার কারণ হল, باء -এর মধ্যে 'ধরা' -এর অর্থ বিদ্যমান যা همزه -এর মধ্যে নেই। যেমন বলা হয়– ذهب السلطان بماله বাদশা তার সম্পদ ধরে নিয়ে গেছেন। তদ্রূপ ذهب الله بنورهم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তাদের আলোকে ধরে নিয়ে গেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'লা যে বস্তুকে পাকড়াও করবেন, তাকে মুক্ত করার কেউ নেই। তাই اذهب -এর তুলনায় باء দ্বারা متعدى করার মধ্যে مبالغه বেশী পাওয়া যায় কাজেই باء দ্বারা متعدى বানিয়ে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হল যে, পূর্বের আয়াতে فلما أضاءت ما حوله বলা হয়েছে, এর মধ্যে ضوء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও ذهب الله بضوءهم এরকম বলা উচিত ছিল কারণ, পূর্বের আয়াতের চাহিদা হল, এখানে ضوء শব্দই উল্লেখ হবে। কিন্তু এরকম না বলে بنورهم বলার কারণ কি?

- **উত্তর: (ب)** এখানে بنورهم বলা হয়েছে مبالغه -এর উদ্দেশ্যে। কারণ, ضوء বলা হয় শুধু তেজ আলোকে আর দুর্বল, সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা হয়। তাই সূর্যের দিকে ضوء -এর এবং চন্দ্রের দিকে নূরের সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে– جعل الشمس ضياء والقمر نورا । এখন যদি ذهب الله بضوءهم বলা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের আলোর তেজ নষ্ট হয়েছে; তবে নূর নষ্ট হয়নি।

অথচ এখানে উদ্দেশ্য হল, সম্পূর্ণরূপে তাদের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়া। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা'লা এবিষয়টিকে (অর্থাৎ জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া এ কথাকে) কঠোর ভাষায় বলেছেন– وترکهم فی ظلمات لایبصرون۔

☆☆☆

﴿وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمَاتٍ لَّايُبْصِرُوْنَ﴾

"এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন; ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায়না"

فَذَكَرَ الظُّلْمَةَ الَّتِيْ هِيَ عَدَمُ النُّوْرِ وَانْطِمَاسُهٗ بِالْكُلِّيَةِ وَجَمَعَهَا وَنَكَّرَهَا وَوَصَفَهَا بِاَنَّهَا ظُلْمَةٌ خَالِصَةٌ لَايَتَرَاىٰ فِيْهَا شَبَحَا۔

অনুবাদ:

(উদ্দেশ্য হল তাদের জ্যোতিকে সম্পূর্ণরূপে নফী করা, তাই وترکهم فی ظلمات لایبصرون এনে বিভিন্ন পন্থায় বিষয়টিকে তাকীদ করেছেন) সুতরাং ظلمات -কে উল্লেখ করেছেন; যার অর্থ আলোহীন হওয়া, আলো সম্পূর্ণরূপে নিভে যাওয়া। তাছাড়া ظلمات শব্দকে বহুবচন ও نکره এনেছেন, সাথে সাথে لایبصرون -কে তার সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ অন্ধকারটি এত বেশী যে, একে অপরকে দেখতে পাচ্ছেনা।

☆☆☆

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾

"তারা বধির, বোবা ও অন্ধ"

لَمَّا سَدُّوْا مَسَامِعَهُمْ عَنِ الْاِصَاخَةِ اِلَى الْحَقِّ وَاَبَوْا اَنْ يَنْطِقُوْا بِهٖ اَلْسِنَتَهُمْ وَيُبْصِرُوا الْاٰيَاتِ بِاَبْصَارِهِمْ جُعِلُوْا كَاَنَّمَا اُيِفَتْ مَشَاعِرُهُمْ وَانْتَفَتْ قُوَاهُمْ كَقَوْلِهٖ: صُمٌّ اِذَا سَمِعُوْا خَيْرًا ذُكِرْتُ بِهٖ وَاِنْ ذُكِرْتُ بِسُوْءٍ عِنْدَهُمْ اَذِنُوْا وَقَوْلُهٗ: اَصَمُّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ لَااُرِيْدُ وَاَسْمَعُ خَلْقِ اللّٰهِ حِيْنَ اُرِيْدُ۔

অনুবাদ:

তারা যখন তাদের কর্ণসমূহকে সত্য কথা শুনতে বাধা দিয়েছে, মুখকে সত্য বলতে এবং চক্ষুসমূহ দ্বারা নিদর্শনাবলী দেখতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তখন তাদেরকে ধরে নেয়া হয়েছে যে, তাদের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো অকেজ হয়ে গেছে। তার দৃষ্টান্ত হল কবির এই কবিতাটি– صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا তদ্রূপ আরেক কবির কবিতা– أصم عن الشئ الذى لاأريد واسمع خلق الله حين أريد (কবিতাদ্বয়ের অর্থ বিশ্লেষণে দেখুন)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السوال: كيف نفى الله عنهم عن السمع والبصر والتكلم مع أنهم موصوفون بها؟

মুনাফিকদের মুখ, চোখ এবং কান সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়েছে তার কারণ কি?

উত্তর ঃ মুনাফিকরা তো বাস্তবে বধির, বোবা ও অন্ধ ছিল না; তথাপি তাদেরকে কেন বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হল? এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, যেভাবে কারো বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টি না থাকলে তাকে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়; সেভাবে সেই ব্যক্তিকেও রূপকার্থে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা যাবে, যার এ শক্তিগুলো থাকা সত্ত্বেও সে সত্য কথা শুনতে, বলতে এবং চক্ষু দ্বারা আল্লাহর কুদরতের নমুনা দেখতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

তদ্রূপ মুনাফিকদের এই শক্তিগুলো থাকা সত্ত্বেও তারা সত্য কথা বলতে, শুনতে এবং কুদরতের নমুনা দেখতে অসন্তুষ্ট, তাই তাদেরকে রূপকার্থে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'লা মুখ দিয়েছেন সত্য কথা বলার, কান দিয়েছেন সত্য কথা শুনার এবং চক্ষু দিয়েছেন কুদরতের নমুনা দেখার জন্য। কিন্তু তারা তাদের এই অঙ্গগুলোকে সেই কাজে ব্যবহার করেনি। তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ।

☆☆☆

وَاِطْلَاقُهَا عَلَيْهِمْ عَلٰى طَرِيْقَةِ التَّمْثِيْلِ لَا الْاِسْتِعَارَةِ اِذْ مِنْ شَرْطِهَا اَنْ يُطْوٰى ذِكْرُ الْمُسْتَعَارِلَهٗ بِحَيْثُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْمُسْتَعَارِمِنْهُ لَوْ لَاالْقَرِيْنَةُ كَقَوْلِ زُهَيْرٍ: لَدٰى اَسَدٍ شَاكِي السِّلَاحِ ☆ مُقَذَّفٌ لَهٗ لِبَدٌ اَظْفَارُهٗ لَمْ تُقَلَّمْ. وَمِنْ ثَمَّ تَرَى الْمُفْلِقِيْنَ السَّحَرَةَ يَضْرِبُوْنَ عَنْ تَوَهُّمِ التَّشْبِيْهِ صَفْحًا كَمَا قَالَ اَبُوْتَمَامٍ: وَيَصْعِدُ حَتّٰى يَظُنَّ الْجَهُوْلُ ☆ بِاَنَّ لَهٗ حَاجَةً فِي السَّمَاءِ . وَهٰهُنَا وَاِنْ طُوِىَ ذِكْرُهٗ بِحَذْفِ الْمُبْتَدَاءِ لٰكِنَّهٗ فِيْ حُكْمِ الْمَنْطُوْقِ بِهٖ وَنَظِيْرُهٗ: اَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوْبِ نَعَامَةٌ ☆ فَتْخَاءُ تَنْفِرُ مِنْ صَفِيْرِ الصَّافِرِ. وَهٰذَا اِذَا جَعَلْتَ الضَّمِيْرَ لِلْمُنَافِقِيْنَ عَلٰى اَنَّ الْاٰيَةَ فَذْلَكَةُ التَّمْثِيْلِ وَنَتِيْجَتُهٗ وَاِنْ جَعَلْتَ لِلْمُسْتَوْقِدِيْنَ فَهِيَ عَلٰى حَقِيْقَتِهَا وَالْمَعْنٰى: اِنَّهُمْ لَمَّا اَوْقَدُوْا نَارًا فَذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمَاتٍ هَائِلَةٍ اَدْهَشَتْهُمْ بِحَيْثُ اِخْتَلَّتْ حَوَاسُّهُمْ وَانْتَقَصَتْ قُوَاهُمْ وَثَلَثَتُهَا قُرِأَتْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ مَفْعُوْلِ تَرَكَهُمْ۔

অনুবাদ:

মুনাফিকদের সম্পর্কে صم بكم عمى এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাশবীহ হিসেবে; استعاره হিসেবে নয়। কেননা, استعاره -এর জন্য শর্ত হল, مستعارله (তথা مشبه) -কে এমনভাবে উহ্য রাখা; যদি (استعاره) -এর উপর কোন قرينه না থাকে তাহলে বাক্য থেকে مستعارمنه উদ্দেশ্য

নেয়া সম্ভব হয়। যেমন কবি যুহায়েরের কবিতা– لدى اسد شاكى السلاح ☆ مقذف له لبد أظفاره لم تقلم (শ্লোকের অনুবাদ: এক মোটা দেহের অধিকারি, অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত এক সিংহের কাছে, যার এক গুচ্ছ চুল আছে এবং তার নোখগুলো কর্তন করা হয়নি)। আর এজন্যই তুমি কবিদেরকে দেখবে যে, তারা তাশবীহ থেকে সম্পূর্ণরূপে এঁড়িয়ে থাকে। যেমন কবি আবু তামাম বলেন, ويصعد حتى يظن الجهول ☆ بأن له حاجة فى السماء (শ্লোকের অনুবাদ: সে আরোহণ করতে থাকে অবশেষ মুর্খরা ধারণা করে বসে যে, আকাশে তার কিছু প্রয়োজন রয়েছে)।

আর এ আয়াতে যদিও مبتدا -কে উহ্য রেখে مستعار له -এর উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু তা উল্লেখেরই পর্যায়ে। মূলতঃ ছিল– هم صم بكم عمى কাজেই এটা استعاره নয়; বরং تشبيه بليغ হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হল– أسد على وفى الحروب نعامة ☆ فتخاء تنفر من صفير الصافر (শ্লোকের অনুবাদ: তুমি তো আমার বেলায় সিংহ! কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একেবারে উটপাখি যার ডানা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং বাঁশিওয়ালার বাঁশির আওয়াজ শুনে পলায়ন করে)।

এই সূরতটি (তথা تشبيه بليغ টি) হবে যখন صم بكم عمى -এর هم مبتدا محذوف তথা ضمير -এর مرجع হবে মুনাফিকরা। আর এটা এ হিসেবে হবে যে, আয়াতটি পূর্ববর্তী উদাহরণের সারাংশ ও ফলাফল। আর যদি ضمير -কে مستوقدين তথা অগ্নিপ্রজ্বলনকারীদের দিকে ফিরানো হয়, তাহলে আয়াতটি তার হাকীকী অর্থে প্রয়োগ হবে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে– তারা যখন আগুন জ্বালালো অতঃপর আল্লাহ তাদের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন তখন এই অন্ধকার তাদেরকে এমন ভয়-ভীতিতে ফেলে দিল যে, তাদের অনুভূতি শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল এবং শক্তি লোপ পেল।

صم بكم عمى এই তিন শব্দের আরেকটি কেরাত রয়েছে تركهم -এর هم ضمير থেকে حال হিসেবে نصب সহকারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: اطلاق هذه الكلمات الثلاث على التمثيل أم على الاستعاره؟

صم بكم عمى এই তিনটি শব্দ মুনাফিকদের বেলায় তাশবীহ হিসেবে না استعاره مصرحه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তরঃ এ তিনটি শব্দ মুরাফিকদের বেলায় تشبيه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; استعاره مصرحه হিসেবে নয়। কেননা, استعاره مصرحه -এর মধ্যে مشبه টি শব্দগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে এমন পর্যায়ে উহ্য থাকা শর্ত যে, যদি مشبه -এর উপর কোন قرينه না থাকত তাহলে مشبه به -এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া সম্ভব হত। এখন প্রশ্ন হল, استعاره مصرحه বলা হয় مشبه -কে হযফ করে مشبه به উল্লেখ করা। আর এখানে তো তাই পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, মুনাফিকদেরকে বধির, বোবা ও অন্ধদের সাথে তাশবীহ দিয়ে مشبه তথা মুনাফিকদেরকে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং এখানে استعاره مصرحه -এর সংজ্ঞা তো পাওয়া যাচ্ছে বিধায় صم بكم عمى -এর মধ্যে استعاره مصرحه হয়নি তা বলা ভুল।

এর উত্তর হল, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, استعاره مصرحه -এর মধ্যে مشبه টি শব্দগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে محذوف থাকা শর্ত। আর এখানে مشبه তথা মুনাফিকরা যদিও শব্দগত উহ্য আছে; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্যগতভাবে উহ্য হয়নি। কারণ, صم بكم عمى মূলতঃ ছিল هم صم بكم عمى অতএব

আয়াতের মধ্যে هم তথা مشبه টি নিয়তে থাকায় محذوف ধরা যাবে না কাজেই استعاره مصرحه -এর শর্ত তথা مشبه টি শব্দ ও উদ্দেশ্য থেকে বিলুপ্ত হওয়া এ শর্তটি পাওয়া যায়নি। বিধায় এখানে استعاره مصرحه না হয়ে تشبيه হবে। তবে تشبيه -এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো حرف تشبيه -কে হযফ করে দেয়া হয়; যাকে تشبيه بليغ বলা হয়। এখানেও এরকম হয়েছে তথা حرف تشبيه كاف -কে হযফ করা হয়েছে।

☆☆☆

وَالصُّمُّ اَصْلُهُ صَلَابَةٌ مِنْ اِكْتِنَازِ الْاَجْزَاءِ وَمِنْهُ قِيْلَ حَجَرٌ أَصَمُّ وَقَنَاةٌ صَمَّاءُ وَصِمَامُ الْقَارُوْرَةِ سُمِّيَ بِه فُقْدَانُ حَاسَّةِ السَّمْعِ لِاَنَّ سَبَبَهٗ أَنْ يَكُوْنَ بَاطِنُ الصِّمَاخِ مُكْتَنِزًا لَاتَجْوِيْفَ فِيْه يَشْتَمِلُ عَلٰى هَوَاءٍ يُسْمَعُ الصَّوْتُ بِتَمَوُّجِه وِالْبُكْمُ: اَلْخَرْسُ وَالْعَمٰى عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَانِه أَنْ يُبْصَرَ وَقَدْ يُقَالُ لِعَدَمِ الْبَصِيْرَةِ۔

অনুবাদ:

صم -এর মূল অর্থ হচ্ছে (কোন বস্তুর) অংশগুলো জমাট ও শক্ত হওয়া। আর তা থেকেই حجر أصم (শক্ত পাথর), قناة صماء (মজবুত বল্লম), এবং صمام قارورة (বোতলের ছিপি) বলা হয়। অতঃপর صم শব্দটি শ্রবণ শক্তি লুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল। কারণ, শ্রবণ শক্তি লোপ পাওয়ার কারণ হলো, কানের ছিদ্রের ভিতরাংশ এমনভাবে জমাট হওয়া যে, তাতে কোন শূণ্যস্থান থাকেনি; যার দরুন আওয়াজ সম্বলিত বাতাস কানের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

بكم অর্থ– বোবা, عمى অর্থ– যে বস্তুকে দেখার ছিল তাকে না দেখা। আর কখনো কখনো বিবেক-বুদ্ধি না থাকাকে عمى বলা হয়।

☆☆☆

﴿فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ﴾

"সুতরাং তারা ফিরে আসবে না"

لَايَعُوْدُوْنَ اِلَى الْهُدٰى الَّذِيْ بَاعُوْهُ وَضَيَّعُوْهُ أَوْ عَنِ الضَّلَالَةِ الَّتِيْ اِشْتَرَوْهَا أَوْ هُمْ مُتَحَيِّرُوْنَ لَايَدْرُوْنَ أَيَتَقَدَّمُوْنَ أَمْ يَتَأَخَّرُوْنَ وَاِلٰى حَيْثُ اِبْتَدَؤُا مِنْهُ كَيْفَ يَرْجِعُوْنَ وَالْفَاءُ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى أَنَّ اِتِّصَافَهُمْ بِالْاَحْكَامِ السَّابِقَةِ سَبَبٌ لِتَحَيُّرِهِمْ وَاِحْتِبَاسِهِمْ۔

অনুবাদ:

তারা যে হেদায়েতকে বিক্রয় করে হারিয়ে বসেছিল; সেই হেদায়েতের দিকে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। অথবা তারা যে গোমরাহী খরীদ করেছে তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। অথবা তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়; সামনে অগ্রসর হবে না পিছু হটবে এবং যেখান থেকে

এসেছিল সেখানে আবার কিভাবে ফিরে যাবে; তারা তা জানে না।

আয়াতের শুরুর فاء টি একথা বুঝানোর জন্য এসেছে যে, তাদের পূর্বের কৃত-কর্মের কারণেই তারা পেরেশান ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: فهم لايرجعون

السوال: فسر الاية كما فسر المفسر العلام

উত্তর ঃ فهم لايرجعون **আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ** আল্লামা বায়যাবী (র.) এ আয়াতের তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম দুই ব্যাখ্যা হল صم بكم -এর- هم مبتدا محذوف -এর مرجع মুনাফিকদেরকে গণ্য করে। অর্থাৎ هم مبتدا محذوف দ্বারা যদি মুনাফিকরা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হবে। যথা–

১. তারা যে হেদায়েতকে বিক্রয় করে হারিয়ে বসেছিল; সেই হেদায়েতের দিকে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না।

২. তারা যে গোমরাহী খরীদ করেছে তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, رجع ফে'লটি الى -এর মাধ্যমেও متعدى হয় আবার عن -এর মাধ্যমেও متعدى হয়, প্রথম ব্যাখ্যাটি হল رجع -কে متعدى بالى এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হল متعدى بعن গণ্য করে।

আর যদি هم مبتدا محذوف -এর مرجع ধরা হয় مستوقدين نار তথা অগ্নিপ্রজ্বলনকারীদেরকে, তাহলে তার ব্যাখ্যা হল– অগ্নিপ্রজ্বলনকারীরা তাদের আলো চলে যাওয়ার কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে যার দরুন তারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে না পিছু হটবে এবং যেখান থেকে এসেছিল সেখানে কিভাবে ফিরে যাবে? অর্থাৎ ন্যায়ের পথে কিভাবে ফিরে আসবে? তারা জানে না।

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾

''অথবা তাদের দৃষ্টান্ত সেই সব লোকের মত, যাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে''

এই আয়াত প্রসঙ্গে দু'টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: আয়াতটি কার উপর معطوف হয়েছে এবং أو -এর অর্থ কি? ২য় আলোচনা: سماء ও صيب দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْ اِسْتَوْقَدَ أَيْ كَمَثَلِ ذَوِيْ صَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ ﴿أَوْ﴾ فِي الْأَصْلِ لِلتَّسَاوِيْ فِي الشَّكِّ ثُمَّ اُتُّسِعَ فِيْهَا فَأُطْلِقَتْ لِلتَّسَاوِيْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ مِثْلُ جَالِسِ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيْرِيْنَ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ أٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا. فَإِنَّهَا تُفِيْدُ التَّسَاوِيَ فِيْ حُسْنِ الْمُجَالَسَةِ وَوُجُوْبِ الْعِصْيَانِ وَمِنْ ذَالِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كَصَيِّبٍ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ قِصَّةَ الْمُنَافِقِيْنَ مُشَبَّهَةٌ بِهَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِيْ صِحَّةِ التَّشْبِيْهِ بِهِمَا وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِي التَّمْثِيْلِ بِهِمَا أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ۔

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: আয়াতটি কার উপর معطوف হয়েছে

আয়াতটি الذى استوقد -এর উপর معطوف হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতটি মূলতঃ كمثل ذوى صيب ছিল। যেমন আল্লাহর বাণী– يجعلون أصابعهم । أو এটা মূলতঃ সন্দেহের মধ্যে সমকক্ষতা বুঝানোর জন্য গঠিত। অতঃপর তাতে ব্যপাকতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা সন্দেহ ব্যতীত শুধু সমকক্ষতা এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جالس الحسن أو ابن سرين (তুমি হাসান বসরী অথবা ইবনে সীরিনের সংশ্রব গ্রহণ কর) এবং আল্লাহ তা'লার বাণী– ولاتطع منهم أثما أو كفورا (তুমি পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের অনুসরণ কর না)। উভয় উদাহরণে أو টি উত্তম সংশ্রব ও গোনাহ আবশ্যক হওয়ার মধ্যে সমকক্ষতার ফায়দা দিয়েছে। আল্লাহ তা'লার বাণী– أو كصيب-ও তারই অন্তর্ভুক্ত। অর্থ হল, মুনাফিকদের ঘটনা উক্ত ঘটনা দু'টির ন্যায় বরাবর, তুমি চাইলে এ ঘটনাটিকে উক্ত ঘটনা দু'টির অথবা একটির সাথে তুলনা করতে পারবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: علام عطف قوله تعالى: أو كصيب من السماء؟ و أو ههنا لاى معنى؟

উত্তরঃ أو كصيب من السماء এই আয়াতটি পূর্বের الذى استوقد -এর উপর معطوف হয়েছে। বাক্যটি এরকম ছিল– كمثل ذوى صيب অর্থাৎ صيب -এর পূর্বে ذوى মুযাফ উহ্য রয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হল আল্লাহ তা'লার বাণী– يجعلون أصابعهم এখানে أصابعهم -এর هم ضمير টি صيب -এর দিকে ফিরেছে। অথচ صيب হল একবচন আর তার দিকে যে ضمير ফিরেছে তা হল বহুবচনের। তাই এখানে صيب -এর পূর্বে ذوى মুযাফ উহ্য ধরতে হবে, তাহলে صيب -এর দিকে هم ضمير টি প্রত্যাবর্তন করা শুদ্ধ হবে।

أو -এর অর্থ ঃ মুসান্নিফ (র.) أو -এর দু'টি অর্থ উল্লেখ করেছেন। একটি হল তার حقيقى অর্থ এবং অপরটি مجازى অর্থ।

☆ او শব্দের হাকীকী অর্থ: التساوى فى الشك অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্দেহযুক্ত। এ অর্থ হিসেবে أو টি শুধুমাত্র جمله خبريه -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়; جمله انشائيه -তে ব্যবহার হয় না।

☆ أو শব্দের মুজাযী অর্থ: التساوى مطلقا অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের যে কোন একটিকে অথবা উভয়টিকে গ্রহণ করা। এ অর্থ হিসেবে أو টি جمله انشائيه -তে ব্যবহার হয়। امر -এর মধ্যে যেমন- جالس الحسن أو ابن سرين (তুমি হাসান বসরী অথবা ইবনে সীরিনের সংশ্রব গ্রহণ কর) অর্থাৎ উভয়ের সংশ্রব অথবা যে কোন একজনের সংশ্রব গ্রহণ কর। نهى -এর মধ্যে যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- ولاتطع منهم أثما أو كفورا (তুমি পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের অনুসরণ কর না) অর্থাৎ পাপী অথবা অকৃতজ্ঞ কিংবা উভয়ের অনুসরণ কর না।

أو كصيب من السماء -এর মধ্যে أو টি مجازى অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- মুনাফিকদের অবস্থা অগ্নিপ্রজ্বলনকারী এবং বৃষ্টিওয়ালাদের অবস্থার ন্যায়। তাই তুমি মুনাফিকদের অবস্থাকে উভয় দলের সাথে অথবা যে কোন এক দলের সাথে তুলনা করতে পারবে।

☆☆☆

وَالصَّيِّبُ فَيْعِلٌ مِنَ الصَّوْبِ وَهُوَ النُّزُوْلُ وَيُقَالُ لِلْمَطَرِ وَالسَّحَابِ قَالَ الشَّمَّاخُ:۔ وَأَسْحَمُ دَانٍ صَادِقِ الْوَعْدِ صَيِّبٌ" وَفِي الْاٰيَةِ يَحْتَمِلُهَا وَتَنْكِيْرُهُ لِاَنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَطَرِ الشَّدِيْدِ وَتَعْرِيْفُ السَّمَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى أَنَّ الْغَمَامَ مُطْبِقٌ اٰخِذٌ بِاٰفَاقِ السَّمَاءِ كُلِّهَا فَاِنَّ كُلَّ أُفُقٍ مِنْهَا يُسَمّٰى سَمَاءً كَمَا أَنَّ كُلَّ طَبْقَةٍ مِنْهَا سَمَاءً قَالَ: ۔وَمِنْ بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءُ

اَمَدَّ بِه مَا فِيْ صَيِّبٍ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مِنْ جِهَةِ الْاَصْلِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّنْكِيْرِ وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ اَلسَّحَابُ فَاللَّامُ لِتَعْرِيْفِ الْمَاهِيَةِ۔

অনুবাদ:______________________________

২য় আলোচনা: سماء ও صيب -এর ব্যাখ্যা

صيب টি فيعل -এর ওযনে এটা صوب থেকে উদগত, যার অর্থ হল- অবতীর্ণ হওয়া। এর ব্যবহার বৃষ্টি ও মেঘমালার উপরও হয়ে থাকে। যেমন কবি শাম্মাখ বলেন- وأسحم دان صادق الوعد صيب' (ছন্দের অনুবাদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। আয়াতের মধ্যে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। صيب -কে نكره অনা হয়েছে কারণ হল, এর দ্বারা এক প্রকার ভারী বৃষ্টি উদ্দেশ্য। আর سماء -কে معرفه ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মেঘমালা আকাশের সকল প্রান্তে ছেঁয়ে গেছে। কেননা, আকাশের প্রত্যেক প্রান্তকেও سماء বলা হয় যেরকম তার প্রত্যেক স্তরকে سماء বলা হয়। যেমন কবি বলেন- ومن بعد أرض بيننا وسماء

سماء -কে معرفه এনে সেই تاكيد -কে আরো তাকীদ করা হয়েছে যে তাকীদ সৃষ্টি হয়েছিল صيب -এর গঠন, ওযন এবং তাকে نكره ব্যবহারের কারণে। আর কেউ কেউ বলেন, سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় لام تعريف টি جنس -এর জন্য হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:(الف) ما معنى الصيب وما المراد به فى الاية؟

(ب) ما هى الفائدة فى تنكير الصيب وتعريف السماء؟

(ج) علام استشهد المفسر بقول الشاعر: ف وأسحم دان صادق الوعد صيب

وبقوله ومن بعد أرض بيننا وسماء؟

উত্তরঃ(الف) صيب -এর অর্থ: صيب শব্দটি فَيْعِلٌ -এর ওযনে মূলতঃ صَيْوِبٌ ছিল; صوب থেকে নির্গত। তার অর্থ হল উপর থেকে নীচে নামা। বৃষ্টি ও মেঘমালাকেও صيب বলা হয়। আয়াতের মধ্যে صيب দ্বারা বৃষ্টি ও মেঘমালা উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(ب) صيب শব্দকে نكره ব্যবহার করার কারণ ঃ আয়াতের মধ্যে صيب -কে نكره ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে বৃষ্টি বলতে এক প্রকার ভারী ও ভয়ানক বৃষ্টি উদ্দেশ্য। কেননা, نكره টি تنويع و تعظيم বুঝায়।

سماء শব্দকে معرفه আনার কারণ ঃ سماء -কে معرفه ব্যবহার করে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে যে, আকাশের মেঘমালা আকাশের প্রতিটি প্রান্তকে ঘিরে রেখেছে। কেননা, যেরকম আকাশের প্রতিটি তবকাকে سماء বলা হয়, সেরকম আকাশের প্রতিটি প্রান্ত ও কিনারাকেও سماء বলা হয়। সাথে সাথে سماء -কে معرفه এনে সেই تاكيد -কে আরো তাকীদ করা হয়েছে যে তাকীদ সৃষ্টি হয়েছিল صيب -এর গঠন, ওযন এবং তাকে نكره ব্যবহারের কারণে। কেননা, صيب -এর মধ্যে حرف صاد টি حرف مستعليه এবং ياء হল مشدده এবং ياء হল شديده এ সব মিলে صيب -এর অর্থের মধ্যে ভয়ানকতা সৃষ্টি হয়েছে তথা صيب অর্থ একপ্রকার ভয়ানক বৃষ্টি। صيب টি صفة مشبه -এর সীগা যা دوام و استمرار বুঝায় আর এর দ্বারা অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। আবার তাকে نكره এনে বৃষ্টির ভয়ানকতা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং صيب -এর মধ্যে তিনটি তাকীদ পাওয়া গেল; অতঃপর السماء -কে معرفه এনে সেই তিন তাকীদকে আরো তাকীদ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই অবিরাম ও ভয়ানক বৃষ্টি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আসেনি; বরং এই বৃষ্টি এসেছে আকাশের সমস্ত প্রান্ত থেকে। অর্থাৎ পূর্ণ আকাশকেই যেন বৃষ্টি ঘিরে রেখেছে।

وأسحم دان صادق الوعد صيب : মুসান্নিফ (র.) এ কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন এবিষয়কে প্রমাণ করার জন্য যে, صيب শব্দের ব্যবহার মেঘমালার উপরও হয়ে থাকে। পূর্ণ কবিতাটি নিম্নরূপ–

عفى أية ريح الجنوب مع الصبا ☆ وأسحم دان صادق الوعد صيب

কবিতার অর্থ ঃ (কবি বলেন) দক্ষিণা ও পূবালী হাওয়া এবং কালো মেঘ আমার প্রিয়তমের ঘর-বাড়ির চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

ومن بعد أرض بيننا وسماء : আকাশের কিনারাকেও سماء বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) এ কবিতা দ্বারা তাই প্রমাণ করেছেন। এখানে سماء শব্দ দ্বারা আকাশের এক প্রান্ত উদ্দেশ্য। পূর্ণ কবিতা নিম্নরূপ–

فاناؤه لذكراها اذا ما ذكرتها ☆ ومن بعد أرض بيننا وسماء

কবিতার অর্থ ঃ প্রিয়তমার স্মরণে এবং আমাদের উভয়ের মধ্যখানে এক জমিন ও এক আকাশের দূরত্বের কারণে আমার কষ্ট হয়।

﴿فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ﴾

"যাতে রয়েছে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক"

اِنْ أُرِيْدَ بِالصَّيِّبِ اَلْمَطَرُ فَظُلُمَاتُهٗ ظُلْمَةُ تَكَاثُفِه بِتَتَابُعِ الْقَطْرِ وَظُلْمَةُ غَمَامِه مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلَهٗ مَكَانًا لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ لِاَنَّهُمَا فِيْ أَعْلَاهُ وَمَنْحَدِرُهٗ مُلْتَبِسَيْنِ بِه وَاِنْ أُرِيْدَ بِه اَلسَّحَابُ فَظُلُمَاتُهٗ سَحْمَتُهٗ وَتَطْبِيْقُهٗ مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَاِرْتِفَاعُهَا بِالظَّرْفِ وِفَاقًا لِاَنَّهٗ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْمَوْصُوْفِ وَالرَّعْدُ صَوْتٌ يُسْمَعُ مِنَ السَّحَابِ وَالْمَشْهُوْرُ: أَنَّ سَبَبَهٗ اِضْطِرَابُ أَجْرَامِ السَّحَابِ وَاِصْطِكَاكُهَا اِذَا حَدَّتْهَا الرِّيْحُ مِنَ الْاِرْتِعَادِ وَالْبَرْقُ: مَا يَلْمَعُ مِنَ السَّحَابِ مِنْ بَرِقَ الشَّيْئُ بَرِيْقًا وَكِلَاهُمَا مَصْدَرٌ فِى الْأَصْلِ وَلِذَالِكَ لَمْ يَجْمَعَا ـ

অনুবাদ:

যদি صيب দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা অনবরত বৃষ্টির ফোঁটার অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। বৃষ্টিকে গর্জন এবং বিদ্যুৎচমকের স্থান বলা হয়েছে করণ হল, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক বৃষ্টির উপরে এবং যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয় সেই স্থানের সাথে মিলিত থাকে। আর যদি صيب দ্বারা বাদল উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা বাদল ও রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য।

ظلمات و رعد وبرق এ তিন শব্দ সর্বসম্মতিক্রমে ظرف -এর কারণে مرفوع হয়েছে। কেননা, তার اعتماد রয়েছে موصوف -এর উপর। رعد সেই আওয়াজকে বলে, যা বাদল থেকে শুনা যায়। আর প্রসিদ্ধ আছে– বাদলকে বাতাসের উড়ানোর কারণে বাদলের এক অংশ অপর অংশের সাথে সংঘর্ষের কারণে গর্জনের সৃষ্টি হয়। رعد এটা ارتعاد থেকে নির্গত।

برق : বাদল থেকে যে বিদ্যুৎচমক দেখা যায় তাকে برق বলা হয়। এটা برق الشئ بريقا থেকে নির্গত। رعد এবং برق উভয়টি যেহেতু মূলতঃ মাসদার তাই এ দু'টিকে বহুবচন আনা হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالىٰ فيه ظلمات ورعد وبرق

উত্তরঃ আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল তারা সেইসব লোকদের মত যারা আলোর জন্য আগুন জ্বালিয়েছে; কিন্তু আগুন যখন তার চারদিককে আলোকিত করে দিল তখন আল্লাহ তা'লা তাদের সেই আলোকে উঠিয়ে নিলেন; ফলে তারা পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারা কোন দিকে পালাবে তার রাস্তা খুঁজে পায়নি। তদ্রূপ মুনাফিকরাও তাদের জন্মগত জ্যোতিকে হারিয়ে ফেলেছে; যার দরুন তারা পেরেশান হয়ে পড়েছে।

তাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল, তারা সেইসব লোকের মত যাদের উপর আকাশ থেকে ভারী বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে এবং সেই বৃষ্টির সাথে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমকও রয়েছে। এখন আলোচনা হল, এখানে ظلمات শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল অন্ধকার। এই অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

ظلمات দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যদি صيب দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা অনবরত বৃষ্টির ফোঁটার অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা ভয়ানক অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর যদি صيب দ্বারা বাদল উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা বাদল ও রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য।

قوله وجعله مكانا للرعد والبرق : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল, আয়াতের মধ্যে বৃষ্টিকে গর্জন ও বিদ্যুৎচমকের স্থান বলা হয়েছে। অথচ বৃষ্টি তো গর্জন ও বিদ্যুৎচমকের স্থান নয়; গর্জন ও বিদ্যুৎচমক তো বৃষ্টি থেকে নয়; বরং বাদল থেকেই সৃষ্টি হয়।

এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বৃষ্টি যদিও গর্জন ও বিজলির জায়গা নয়; বরং এ দু'টির জায়গা হল বৃষ্টির কেন্দ্র ও উৎপত্তিস্থল তথা মেঘমালা; কিন্তু যেহেতু বৃষ্টি যেরকম মেঘমালার পাত্রস্থ সেরকম গর্জন ও বিজলিও মেঘমালার পাত্রস্থ। যেরকম এগুলোর পাত্র মেঘমালা সেরকম বৃষ্টিরও পাত্র মেঘমালা। কাজেই এ দু'টি বৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত ও তার প্রতিবেশী। সুতরাং বৃষ্টির সাথে এ দু'টির সম্পৃক্ততাকে পাত্রের সাথে পাত্রস্থ বস্তুর সম্পৃক্ততার সাথে তুলনা করে রূপকার্থে বৃষ্টিকে এ দু'টির পাত্র বলা হয়েছে।

رعد বলা হয় বাদল থেকে সৃষ্ট আওয়াজ বা গর্জনকে।

আকাশে গর্জন হয় কেন?

মেঘের মওসুমে কখনো কখনো আকাশে গর্জন শুনা যায়। দার্শনিকগণের মতে, আকাশে গর্জনের কারণ হল, বাদলকে বাতাসের উড়ানোর কারণে বাদলের এক অংশ অপর অংশের সাথে ধাক্কা খায় আর তা থেকেই গর্জনের সৃষ্টি হয়।

কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রা'দ নামী একজন ফিরিশতা আছেন তিনি লাঠি দ্বারা বাদলকে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যান আর তখন তার লাঠির আঘাতে গর্জনের সৃষ্টি হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রা'দ একজন ফিরিশতার নাম যিনি তাসবীহ পাঠ করে বাদলকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান আর গর্জন হল তার তাসবীহের আওয়াজ।

☆☆☆

﴿يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ أٰذَانِهِمْ﴾

"তারা তাদের কানে আঙ্গুল চেপে রাখে"

اَلضَّمِيْرُ لِأَصْحَابِ الصَّيِّبِ وَهُوَ اِنْ حُذِفَ لَفْظُهُ وَأُقِيْمَ الصَّيِّبُ مَقَامَهُ لٰكِنْ مَعْنَاهُ بَاقٍ فَيَجُوْزُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا عَوَّلَ حَسَّانُ فِىْ قَوْلِهِ۔

وَيَسْقَوْنَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيْصَ عَلَيْهِمْ☆بُرْدٰى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ.

حَيْثُ ذُكِرَ الضَّمِيْرُ لِأَنَّ الْمَعْنٰى مَاءُ بُرْدٰى وَالْجُمْلَةُ اِسْتِيْنَافٌ فَكَأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا يُؤْذِنُ بِالشِّدَّةِ وَالْهَوْلِ قِيْلَ فَكَيْفَ حَالُهُمْ مَعَ مِثْلِ ذَالِكَ فَأُجِيْبَ بِهَا وَاِنَّمَا أُطْلِقَ الْاَصَابِعَ مَكَانَ الْاَنَامِلِ لِلْمُبَالَغَةِ۔

অনুবাদ:

يجعلون -এর ضمير টি اصحاب صيب -এর দিকে ফিরেছে; যদিও اصحاب صيب -কে হযফ করে صيب -কে তার স্থলে নেয়া হয়েছে; কিন্তু যেহেতু তার অর্থ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাই তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ضمير ফিরানো জায়েয হবে। যেমন হাসসান বিন ছাবিত (রা.) স্বীয় কবিতায় محذوف (উহ্য শব্দের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তার দিকে ضمير ফিরিয়েছেন। কবিতা হল– ويسقون من ورد البريص عليهم☆بردى يصفق بالرحيق السلسل (কবিতার অর্থ: তারা সুস্বাদু শরবতের সাথে মিশ্রিত বুরদা নহরের পানি সেইসব লোকদের পান করায় যারা তাদের সাথে সিরিয়ার বারিস নামক উপসাগরে অবতরণ করে।) এখানে হাসসান বিন ছাবিত (রা.) مذكر -এর ضمير এনেছেন। তার একমাত্র কারণ হল, بردى -এর অর্থ ماء بردى তথা বুরদা নহরের পানি।

আর يجعلون أصابعهم এ বাক্যটি جملہ مستانفه হয়েছে। যখন সেই ভয়ানক বস্তুসমূহের সংবাদ দেয়া হয়েছিল তখন কেমন যেন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই ভয়ানক অবস্থার সময় তাদের অবস্থা কেমন ছিল?। সুতরাং এ বাক্য দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে। আর مبالغه -এর উদ্দেশ্যে انامل -এর স্থলে أصابع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى يجعلون أصابعهم فى أذانهم

السوال: اذكر خلاصة ما قاله المفسر العلام فى هذه الاية

উত্তর ঃ কাযী বায়যাবী (র.) এই আয়াত সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারাংশ নিম্নরূপ। তিনি এই আয়াতের মধ্যে দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ يجعلون -এর ضمير টি কোন দিকে ফিরেছে? এবং দ্বিতীয়তঃ এখানে أناملهم (আঙ্গুলির অগ্রভাগ) -এর কথা উল্লেখ না করে اصابعهم (সম্পূর্ণ আঙ্গুলি) -এর কথা উল্লেখ করা হল কেন? কারণ, সম্পূর্ণ আঙ্গুল তো কানে প্রবিষ্ট করানো অসম্ভব।

প্রথম আলোচনার সারাংশ হলো– يجعلون -এর ضمير ফিরেছে أصحاب صيب বা বৃষ্টিওয়ালাদের দিকে। এখন প্রশ্ন হল, এখানে তো أصحاب صيب বলতে কোন শব্দই দেখা যাচ্ছে না তাহলে اصحاب

صيب -এর দিকে ضمير কিভাবে ফিরানো সহীহ হল?

এর উত্তর হল– এখানে যদিও اصحاب صيب নেই; কিন্তু তা উহ্য আছে; أصحاب শব্দকে বিলুপ্ত করে صيب -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে يجعلون -এর ضمير ফিরানো হয়েছে اصحاب -এর দিকে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ضمير ফিরানো যায় তার একটি দৃষ্টান্ত হল হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রা.) -এর এই কবিতা–

ويسقون من ورد البريص عليهم ☆ بردى يصفق بالرحيق السلسل

কবিতার অর্থ: তারা সুস্বাদু শরবতের সাথে মিশ্রিত বুরদা নহরের পানি সেইসব লোকদের পান করায় যারা তাদের সাথে সিরিয়ার বারিস নামক উপসাগরে অবতরণ করে।

محل استشهاد ঃ এখানে محل استشهاد হল يصفق ফে'লটি; এর ضمير ফিরেছে ماء -এর দিকে যা এখানে উহ্য আছে। কেননা, ضمير টি যদি بردى -এর দিকে ফিরতো তাহলে তিনি مونث -এর ضمير ব্যবহার করে تصفق ফে'ল ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি مذكر -এর ضمير ব্যবহার করেছেন তার একমাত্র করাণ হল, তিনি এখানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আর এজন্যই ضمير টি এনেছেন مذكر -এর।

أصابعهم বলার কারণঃ এখানে প্রশ্ন হল, আল্লাহ তা'লা আলোচ্য আয়াতাংশে اصابع শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল পূর্ণ আঙ্গুল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, তারা তাদের কানে পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করায়। অথচ কানে তো পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করানো অসম্ভব। হ্যাঁ, আঙ্গুলের মাথা প্রবিষ্ট করা যায়। সুতরাং এখানে أنامل (অঙ্গুলির অগ্রভাগ) ব্যবহার না করে اصابع ব্যবহার করলেন কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের অস্বাভাবিক ভীতিজনক অবস্থার তীব্রতা বুঝানোর জন্য সম্পূর্ণ অঙ্গুলি বলে তার অগ্রভাগের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মনে হয় যেন তারা পুরো আঙ্গুলই প্রবেশ করিয়ে দেবে, যাতে বজ্রধ্বনি মোটেও শুনতে না পায়।

﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾
"বজ্রপাতের কারণে"

مُتَعَلِّقٌ بِيَجْعَلُوْنَ أَيْ مِنْ أَجْلِهَا يَجْعَلُوْنَ كَقَوْلِهِمْ سَقَاهُ مِنَ الْعَيْمَةِ وَالصَّاعِقَةُ قَصْفَةٌ لِرَعْدٍ هَائِلٍ مَعَهَا نَارٌ لَاتَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا اَتَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّعْقِ وَهُوَ شِدَّةُ الصَّوْتِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلٰى كُلِّ هَائِلٍ مَسْمُوْعٍ أَوْ مُشَاهَدٍ وَيُقَالُ: صَعَقَتْهُ الصَّاعِقَةُ إِذَا أَهْلَكَتْهُ بِالْإِحْرَاقِ أَوْ شِدَّةُ الصَّوْتِ وَقُرِئَ مِنَ الصَّوَاقِعِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَلْبٍ مِنَ الصَّوَاعِقِ لِإِسْتِوَاءِ كِلَا الْبِنَائَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَيُقَالُ صَقَعَ الدِّيْكُ وَخَطِيْبٌ مُصَقَّعٌ وَصَقَعَتْهُ الصَّاقِعَةُ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ إِمَّا صِفَةٌ لِقَصْفَةِ الرَّعْدِ أَوِ الرَّعْدُ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ أَوْ مَصْدَرٌ كَالْعَافِيَةِ وَالْكَاذِبَةِ۔

অনুবাদ:

من الصواعق জার-মাজরুর মিলে يجعلون -এর সাথে متعلق হয়েছে। অর্থাৎ তারা বজ্রপাতের কারণে তাদের কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে। যেমন আরবের লোকেরা বলে থাকে– سقاه من العيمة (দুধের বেশী খায়েশ থাকায় সে তাকে দুধ পান করিয়েছে)।

صاعقة বলা হয় বিজলীর আওয়াজকে যে আওয়াজটি ভয়ানক হয় এবং তার সাথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গও থাকে; এটা যে বস্তুর উপরই পতিত হয় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে। صاعقة এটা صعق থেকে নির্গত যার অর্থ হল বিকট আওয়াজ। কখনো صاعقة শব্দটি সকল প্রকার শ্রুত ও প্রত্যক্ষ ভয়ানক বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন বলা হয়– صعقته الصاعقة এটা তখন বলা হয়, যখন বজ্রপাত কাউকে জ্বালিয়ে অথবা তার বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়।

من الصواقع ও পড়া হয়। তবে এটা صواعق -এর উল্টোরূপ নয়। কেননা, উভয়টি রূপান্তর হওয়ার দিক দিয়ে সমান। সুতরাং বলা হয়– صقع الديك (মোরগ ডাক দিয়েছে) এবং خطيب مصقع (সুস্পষ্টভাষী বক্তা) এবং صقعته الصاقعة (বজ্রপাত তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে)। صاعقة টি মূলতঃ قصفة الرعد -এর সিফাত ছিল অথবা رعد -এর সিফাত ছিল। এমতাবস্থায় تاء টি مبالغه -এর জন্য হবে। যেমন رواية -এর تاء টি مبالغه -এর জন্য। অথবা এটা মাসদার যেমন عافية ও كاذبة ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:(الف) اعرب قوله تعالى من الصواعق
(ب) ما معنى الصاعقة؟
(ج) شرح قول المفسر "وقرئ من الصواقع وهو ليس بقلب من الصواعق
(د) ما ذا أراد المصنف بقوله "وهي في الأصل اما صفة لقصعة الرعد الخ؟

উত্তরঃ الف : من الصواعق -এর **তারকীব ঃ** من الصواعق জার-মাজরুর মিলে يجعلون -এর

সাথে متعلق হয়েছে। এখানে من টি تعليليه তথা পূর্বের কথার কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে– তারা তাদের কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করায় বজ্রপাতের কারণে। আহলে আরবরাও من -কে تعليليه হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন– سقاه من العيمة (দুধের বেশী খায়েশ থাকায় সে তাকে দুধ পান করিয়েছে) এখানে من টি تعليل তথা দুধ পান করানোর কারণ বর্ণনা করছে।

ب : صاعقة শব্দের অর্থ ঃ صاعقة বলা হয় বিজলীর আওয়াজকে যে আওয়াজটি ভয়ানক হয় এবং তার সাথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গও থাকে; এটা যে বস্তুর উপরই পতিত হয় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে। صاعقة এটা صعق থেকে নির্গত যার অর্থ হল বিকট আওয়াজ। কখনো صاعقة শব্দটি সকল প্রকার শ্রুত ও প্রত্যক্ষ ভয়ানক বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন বলা হয়– صعقته الصاعقة এটা তখন বলা হয়, যখন বজ্রপাত কাউকে জ্বালিয়ে অথবা তার বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়।

ج: قوله وقرئ من الصواقع وهو ليس بقلب من الصواعق : এখানে صواعق -এর দ্বিতীয় আরেকটি কেরাতের আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় কেরাতটি হল من الصواقع । এর দ্বারা কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, صواقع শব্দটি মূলতঃ صواعق ছিল; আর তার থেকেই صواقع পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মুসান্নিফ (র.) সাথে সাথে এ সন্দেহও দূর করে দিয়েছেন যে, صواقع টি صواعق থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি; বরং উভয়টি পৃথক পৃথক দু'টি শব্দ। কেননা, যেরকম صعق থেকে বিভিন্ন শব্দাবলী নির্গত হয় সেরকম صقع থেকেও বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়। যেমন– صقع الديك (মোরগ ডাক দিয়েছে) এবং خطيب مصقع (সুস্পষ্টভাষী বক্তা) এবং صقعته الصاقعة (বজ্রপাত তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে)। তাই صواقع -কে صواعق থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে– মানার কোন যৌক্তিকতা নেই।

د : قوله وهى فى الأصل اما صفة لقصعة الرعد الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে যা বলতে চাচ্ছেন তা বুঝার পূর্বে ছোট্ট একটি ভূমিকা জেনে নাও। ভূমিকাটি হল– আরবী ভাষায় تاء হরফটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(১) التاء للتانيث যেমন– قَائِمَةٌ

(২) التاء للتذكير যেমন– ثَلٰثَةٌ এটা معدود مذكر -এর উপরই প্রবেশ করে।

(৩) التاء للعوض যেমন– عِدَةٌ

(৪) التاء للحكاية অর্থাৎ معنى وصفى থেকে معنى اسمى -এর দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। যেমন– كَافِيَةٌ তার معنى وصفى হল যথেষ্ট বস্তু। অতঃপর এটা নাহুর একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নামে পরিণত হয়ে গেছে।

(৫) التاء للمصدر যেমন– كَاذِبَةٌ অর্থ كِذْبٌ

(৬) التاء للمبالغة যেমন– عَلَّامَةٌ

এবার মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারতটি বুঝুন। তিনি এ ইবারত দ্বারা একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, বর্তমানে বিজলীর নাম তো صاعقة ; কিন্তু মূলতঃ তার মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমতঃ صاعقة টি قصفة الرعد -এর সিফাত ছিল। এমতাবস্থায় صاعقة -এর تاء টি التاء للتانيث হবে। কেননা, موصوف و صفت -এর মাঝে মিল থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ এটা رعد -এর সিফাত ছিল। এমতাবস্থায় التاء টি لتانيث হবে না কেননা, رعد টি مذكر ; বরং التاء للمبالغة হবে। তখন صاعقة -এর অর্থ হবে, বিকট আওয়াজের বিজলী। তৃতীয়তঃ এটা মাসদার। আর এমতাবস্থায় تاء টি হবে التاء للمصدر

﴾حَذَرَ الْمَوْتِ﴿

"মৃত্যুর ভয়ে"

نَصْبٌ عَلَى الْعِلَّةِ كَقَوْلِهٖ وَاَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيْمِ اِدِّخَارَهٗ. وَالْمَوْتُ: زَوَالُ الْحَيٰوةِ وَقِيْلَ عَرَضٌ يُضَادُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ" وَرُدَّ بِاَنَّ الْخَلْقَ بِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ-

অনুবাদ:

حذرالموت এটা يجعلون -এর- مفعول له হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। যেমন কবির উক্তি- واغفر عوراء الكريم ادخاره -এর মধ্যে ادخاره টি مفعول له হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। موت বলা হয় জীবন ফুরিয়ে যাওয়াকে। আর কেউ কেউ বলেন, মওত হল হায়াতের বিপরীত একটি عرض -এর নাম। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- خلق الموت والحيواة তবে এর জবাব হল, এখানে خلق শব্দটি قدر অর্থে ব্যবহৃত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: أذكر خلاصة ما قاله المفسر في حذر الموت

উত্তরঃ حذر الموت সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: حذر الموت -এর তারকীব এবং দ্বিতীয় আলোচনা: মওতের সংজ্ঞা।

১ম আলোচনা: حذر الموت -এর তারকীব ঃ حذر الموت এটা مضاف و مضاف اليه মিলে يجعلون -এর- مفعول له হয়েছে। যেহেতু مفعول له টি مضاف الى المعرفه হওয়াটা বিরল কাজেই মুসান্নিফ (র.) জনৈক কবির কবিতা এনে প্রমাণ করেছেন যে, مفعول له ও কখনো مضاف الى المعرفه হয়ে থাকে। কবিতাটি হল- واغفر عوراء الكريم ادخاره ☆ واعرض عن شتم اللئيم تكرما এখানে ادخاره টি مضاف الى المعرفه হওয়া সত্ত্বেও مفعول له হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হল যে, কোন শব্দ مضاف الى المعرفه হয়েও مفعول له হতে পারে।

কবিতার অর্থঃ আমি ভদ্র লোকের অপছন্দনীয় কথা ক্ষমা করে দেই উত্তম কথাকে পুঁজি বানানোর জন্য। (কেননা, ভদ্র লোক যদি কাউকে অশ্লীল কথা বলে এবং ঐ ব্যক্তি তা শুনে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে ভদ্র লোক তাতে লজ্জা পায় এবং যাকে অশ্লীল কথা বলেছিল তাকে সে আদর করে। তাই (কবি বলছেন) আমিও তাকে ক্ষমা করি যাতে আমি তার প্রিয়পাত্র হয়ে যাই এবং প্রয়োজনে সে আমার কাজে আসবে)। আর সম্মানার্থে অসভ্য লোকের গালমন্দ থেকে দূরে থাকি। (কেননা, অসভ্য লোকের গালমন্দের জবাব দেয়াও একরকমের অসম্মানী)।

দ্বিতীয় আলোচনা: মওতের সংজ্ঞাঃ মুসান্নিফ (র.) মওতের দু'টি তা'রীফ করেছেন। প্রথমটি হল- الموت زوال الحيواة অর্থাৎ হায়াত ফুরিয়ে যাওয়াকে মওত বলে। এ তা'রীফ অনুযায়ী মওত হল একটি عدمى (ন্যাস্তি) বিষয়; এটা وجودى (অস্তিত্ববান) বিষয় নয়। মওতের দ্বিতীয় তা'রীফ হল- الموت عرض يضادها অর্থাৎ মওত হল হায়াতের বিপরীত একটি عارضى অকস্মিক বস্তুর নাম। এ তা'রীফ অনুযায়ী মওত وجودى (অস্তিত্ববান) বস্তু। উল্লেখ্য যে, মওত وجودى না عدمى এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শরহে আকাঈদে নাসাফীতে। فليطالع ههنا

﴿وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ﴾

"অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত"

لَايَفُوْتُوْنَهُ كَمَا لَايَفُوْتُ الْمُحَاطُ بِهِ الْمُحِيْطُ لَايَخْلُصُهُمْ الْخِدَاعُ وَالْحِيَلُ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضِيَةٌ لَامَحَلَّ لَهَا۔

অনুবাদ:

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'লার পাকড়াও থেকে পলায়ন করতে পারবে না; যেরকম পরিবেষ্ঠিত ব্যক্তি পরিবেষ্ঠনকারী থেকে পলায়ন করতে পারে না। ধোকা-প্রতারণা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর এ বাক্যটি جمله معترضه ; তার কোন محل اعراب (এরাবের স্থান নেই)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالى ' والله محيط بالكافرين"

উত্তরঃ মুসন্নিফ (র.) والله محيط بالكافرين -এর ব্যাখ্যা করেছেন "لا يفوتونه كما لايفوت المحاط به المحيط" দ্বারা। এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে محيط শব্দটি হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং মুজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতায় রয়েছে; তাঁর কুদরতের আওতা থেকে বের হতে পারবে না। কাফেরদের উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে– এটাকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে পরিবেষ্ঠনকারীর কাউকে পরিবেষ্ঠন করার সাথে। যেরকম কাউকে পরিবেষ্ঠন করলে সে পরিবেষ্ঠন থেকে বের হতে পারে না সেরকম কাফেররাও আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

☆☆☆

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾

"বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে লয়"

এই আয়াতের আলোকে চারটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: আয়াতের তারকীব। ২য় আলোচনা: كاد -এর বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: خطف শব্দের অর্থ। ৪র্থ আলোচনা: يخطف -এর কেরাতসমূহ।

اِسْتِيْنَافٌ ثَانٍ كَأَنَّهُ جُوَابٌ لِمَنْ يَقُوْلُ مَا حَالُهُمْ مَعَ تِلْكَ الصَّوَاعِقِ؟ وَكَادَ: مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وُضِعَتْ لِمُقَارَبَةِ الْخَبَرِ مِنَ الْوُجُوْدِ لِعُرُوْضِ سَبَبِهِ لٰكِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ اِمَّا لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِعُرُوْضِ مَانِعٍ وَعَسٰى: مَوْضُوْعَةٌ لِرَجَائِهِ فَهِيَ خَبَرٌ مَحَضٌ وَلِذَالِكَ جَاءَتْ مُتَصَرِّفَةً بِخِلَافِ عَسٰى وَخَبَرُهَا مَشْرُوْطٌ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلًا مُضَارِعًا تَنْبِيْهًا

عَلٰى أَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ بِالْقُرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ لِيُؤَكِّدَ الْقُرْبَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْحَالِ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ حَمْلًا لَهَا عَلٰى عَسٰى كَمَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا بِالْحَذْفِ عَنْ خَبَرِهَا لِمُشَارَكَتِهَا فِيْ أَصْلِ مَعْنَى الْمُقَارَبَةِ وَالْخَطْفُ: اَلْأَخْذُ بِسُرْعَةٍ وَقُرِئَ يَخْطِفُ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَيَخَطِّفُ عَلٰى أَنَّهُ يَخْتَطِفُ فَنُقِلَتْ فَتْحَةُ التَّاءِ إِلَى الْخَاءِ ثُمَّ أُدْغِمَتْ فِى الطَّاءِ وَيَخِطِّفُ بِكَسْرِ الْخَاءِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَاتِّبَاعِ الْيَاءِ لَهَا وَيَتَخَطَّفُ۔

অনুবাদ:

يكاد البرق يخطف أبصارهم এটা দ্বিতীয় جملہ مستانفه এর দ্বারা যেন সেই ব্যক্তির উত্তর দেয়া হচ্ছে যে বলে যে, এই গর্জনের সময় তাদের অবস্থা কেমন হয়?

كاد এটা افعال مقاربه -এর একটি। خبر -এর অস্তিত্বের সূত্র সম্মুখে আসার কারণে خبر -এর অস্তিত্ব নিকটবর্তী হয়ে গেছে; কিন্তু কোন শর্ত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার অথবা কোন প্রতিবন্ধক সামনে আসার কারণে خبر টি অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি – একথা বুঝানোর জন্য كاد টি গঠিত। আর خبر -এর আশা প্রকাশের জন্য عسى টি গঠিত। সুতরাং كاد টি নিসক খবর কাজেই এটা متصرف (রূপান্তরশীল)। عسى টি তার বিপরীত। كاد -এর خبر টি أَنْ বিহীন فعل مضارع হওয়া শর্ত– এ কথার উপর সতর্ক করার জন্য যে, তার দ্বারা নৈকট্যতা বুঝানোই উদ্দেশ্য; যাতে বর্তমান কালের উপর দালালত করতঃ নৈকট্যতাকে আরো তাকীদ করে। আবার কখনো كاد -এর উপর عسى -এর হুকুম প্রয়োগ করে তার (كاد) -এর خبر টি أن যুক্ত فعل مضارع হয়। যেরকম عسى -এর উপর كاد -এর হুকুম প্রয়োগ করে عسى -এর خبر থেকে أن -কে বিলুপ্ত করা হয়। কেননা, উভয়টি মূখ্য উদ্দেশ্য তথা معنى مقاربه -এর মধ্যে শরীক।

خطف -এর অর্থ– ছিনিয়ে নেওয়া। يخطِف (طاء -এর কাছরা সহ) পড়া হয়। باب افتعال থেকে يخطف পড়া যায়। আবার يخطف ও পড়া হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: كم قراءة فى "يخطف" وما هى؟

উত্তরঃ يخطف -এর মধ্যে মুতাওয়াতির কেরাত সহ মোট পাঁচটি কেরাত। যথা–

(১) يَخْطَفُ (طاء -এর যবর সহ)

(২) يَخْطِفُ (طاء -এর কাছরা সহ)

(৩) يَخَطَّفُ (خاء ও ياء -তে যবর এবং طاء -তে কাছরা)। এটা باب افتعال থেকে মূলতঃ يختطف ছিল। تاء -এর যবরকে خاء -এর মধ্যে স্থানান্তরিত করে تاء -কে طاء বানিয়ে طاء -কে طاء -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

(৪) يِخِطِّفُ (خاء , ياء এবং طاء কাছরা সহ)

(৫) يَتَخَطَّفُ (باب تفعل থেকে)।

☆☆☆

﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا﴾

''যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয়, তখনই চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায়''

اِسْتِيْنَافٌ ثَالِثٌ كَأَنَّهُ قِيْلَ مَا يَفْعَلُوْنَ فِيْ تَارَتَيْ خُفُوْقِ الْبَرْقِ وَخُفْيَتِهِ فَأُجِيْبَ بِذَالِكَ وَأَضَاءَ: إِمَّا مُتَعَدٍّ وَالْمَفْعُوْلُ مَحْذُوْفٌ بِمَعْنٰى: كُلَّمَا نَوَّرَ لَهُمْ مَمْشًى اَخَذُوْهُ أَوْ لَازِمٌ بِمَعْنٰى كُلَّمَا لَمَعَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْ مَطْرَحِ نُوْرِهِ وَكَذَالِكَ اَظْلَمَ فَإِنَّهُ جَاءَ مُتَعَدِّيًا مَنْقُوْلًا مِنْ ظَلَمَ اللَّيْلُ وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَأَةُ: أُظْلِمَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَقَوْلُ اَبِيْ تَمَامٍ: هُمَا اَظْلَمَا حَالَيَّ ثَمَّةَ اَجْلَيَا ☆ ظُلَامَيْهِمَا عَنْ وَجْهٍ اَمْرَدٍ اَشْيَبَ۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لٰكِنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُبْعَدُ أَنْ يُجْعَلَ مَا يَقُوْلُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَرْوِيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاءَةِ (كُلَّمَا) وَمَعَ الْإِظْلَامِ (إِذَا) لِأَنَّهُمْ حَرَّاصٌ عَلَى الْمَشْيِ فَلَمَّا صَادَفُوْا مِنْهُ فُرْصَةً اِنْتَهَزُوْهَا وَلَا كَذَالِكَ التَّوَقُّفُ وَمَعْنٰى قَامُوْا: وَقَفُوْا. وَمِنْهُ: قَامَتِ السُّوْقُ إِذَا رَكَدَتْ وَقَامَ الْمَاءُ إِذَا جَمَدَ۔

অনুবাদ:

এটা তৃতীয় جملہ مستانفه। কেমন যেন এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যে প্রশ্ন করেছিল যে, যখন বিদ্যুৎ চমকে এবং নিভে তখন তাদের অবস্থাটি কেমন ছিল? তাই এ আয়াত দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে। أضاء -এর ضمير ফিরেছে برق -এর দিকে। أضاء হয়তো متعدى আর তার مفعول উহ্য। অর্থ হল– যখন বিদ্যুৎচমক তাদের চলার রাস্তাকে আলোকিত করে তুলে তখন তারা এটাকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা সামনের দিকে চলতে থাকে। অথবা أضاء টি لازم আর তখন অর্থ হবে– যখন তাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকে তখন তারা চলতে থাকে। তদ্রূপ أظلم টিও কেননা, এটা ظلم الليل থেকে নির্গত হয়ে متعدى হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার দলীল হল أظلم -এর এক কেরাত أُظْلِمَ (ماضى مجهول হিসেবে)। তদ্রূপ আবু তামামের কবিতাও তার দলীল। কবিতাটি হল– هما أظلما حالى ثمة أجليا ☆ ظلاميهما عن وجه أمرد اشيب (কবিতার তরজমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। আবু তামাম যদিও মুহাদ্দিসীনের স্তরে; কিন্তু তিনি একজন আরবী বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি যা বলবেন সেগুলো তার বর্ণিত কথামালার অন্তর্ভূক্ত হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়।

আল্লাহ তা'লা এখানে أضاء -এর সাথে كلما ব্যবহার করেছেন এবং أظلم -এর সাথে اذا ব্যবহার করেছেন তার কারণ হল, বৃষ্টিওয়ালারা তো চলার উপর অত্যান্ত লোভী ছিল; তাই যখনই চলার সুযোগ পেত তখনই এই সুযোগকে গনীমত মনে করাতো (এবং চলতে থাকতো)। কিন্তু তারা দাঁড়ানোর প্রতি আগ্রহী ছিল না। قاموا -টি وقفوا -এর অর্থে ব্যবহৃত। তা থেকেই قامت السوق

(বাজার থেমে গেছে) এবং قام الماء (পানি আটকে গেছে) নির্গত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا﴾

السوال: كم بحثا في هذه الاية وما هي ؟ بين كله بالايجاز

উত্তরঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে মোট চারটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: তারকীব, ২য় আলোচনা: أضاء -এর ضمير কোন দিকে ফিরেছে? ৩য় আলোচনা: أضاء এবং أظلم টি لازم না متعدى ৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন।

১ম আলোচনা: তারকীবঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি পূর্বের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছে কাজেই এটা جملة مستانفه হবে। আর جملة مستانفه -এর কোন محل اعراب থাকে না। কেমন যেন এটা ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্ন করেছিল যে, যখন বিদ্যুৎ চমকে এবং নিভে যায়, তখন যারা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তাদের অবস্থাটি কেমন ছিল? তাই এ আয়াত দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে– "যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয় তখনই চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায়"। তেমনি মুনাফিকদের অবস্থাও; যখনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন সৌন্দর্য ও বিজয় দেখতো তখন অন্তর ইসলামের দিকে ধাবিত হতো। পরে যখন স্বার্থের বিরোধিতার প্রকটতা কিংবা কষ্ট ও বিপদসমূহের সম্মখীন হতো, তখন ঐ অগ্রসরতা অস্বীকারের রূপ নিতো।

২য় আলোচনা: أضاء -এর ضمير কোন দিকে ফিরেছে? أضاء -এর ضمير ফিরেছে برق -এর দিকে।

৩য় আলোচনা: أضاء এবং أظلم টি لازم না متعدى ? أضاء ফে'লটি متعدىও হতে পারে আবার لازمও হতে পারে। متعدى হলে তার مفعول (ممشى চলার পথ) উহ্য থাকবে। তখন অর্থ হবে– যখন বিদ্যুৎচমক তাদের চলার রাস্তাকে আলোকিত করে তুলে, তখন তারা এটাকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা সামনের দিকে চলতে থাকে। আর لازم হলে তার অর্থ হবে– 'যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের রাস্তা উদ্ভাসিত হয়, তখনই চলতে থাকে। أضاء -কে متعدى ধরা হলে فيه -এর 'ه' যমীরটি উহ্য মাফউল তথা ممشى -এর দিকে ফিরবে। আর لازم ধরলে مضاف উহ্য থেকে برق -এর দিকে ফিরবে। তখন ইবারতটি এরকম হবে– في مطرح نور البرق ।

أظلم ফে'লটিও لازم و متعدى হতে পারে। أظلم টি যে متعدى হয় তার কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল হল, أظلم এটা ظلم الليل (রাত অন্ধকার হওয়া) থেকে নির্গত। সুতরাং أظلم টি অন্ধকার করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে متعدى হবে। দ্বিতীয় দলীল হল, أظلم -এর অন্য কেরাত আছে أُظْلِمَ (ماضى مجهول) আর শুধু فعل متعدى -ই مجهول হয়; فعل لازم টি مجهول হয় না। কাজেই أظلم টি متعدى হবে। তৃতীয় দলীল হল, আবু তামামের এই কবিতাটি–

هما أظلما حالى ثمة أجليا ☆ ظلاميهما عن وجه أمرد اشيب

কবিতার অর্থঃ তারা উভয়ে আমার দু'টি অবস্থাকে অন্ধকার করে দিয়েছে অতঃপর যুবক বৃদ্ধের চেহারা থেকে ঐ অবস্থা দু'টির অন্ধকারকে আলোকিত করেছে।

এ কবিতার মধ্যে أظلما শব্দটি محل استشهاد এটা متعدى হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। أظلما -এর

ضمير টি পূর্বের শ্লোকের عقل و دهر -এর দিকে ফিরেছে। কবি এখানে حالى দু'টি অবস্থা দ্বারা ভাল-মন্দের অবস্থা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। أمرد أشيب দ্বারা স্বয়ং কবি উদ্দেশ্য। কবি নিজেকে বয়সের দিক দিয়ে যুবক এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে বৃদ্ধ বলেছেন।

৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসনঃ প্রশ্নটি হল, আল্লাহ তা'লা أضاء -এর সাথে كلما এবং أظلم -এর সাথে اذا ব্যবহার করেছেন। এরকম ব্যবহার করার পিছনে রহস্যটা কি?

উত্তর হল– যারা ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে তারা তো চলার উপর অত্যান্ত লোভী থাকে; থামতে রাজী হয়না। তাই যখনই চলার সুযোগ পায় তখনই এই সুযোগকে গনীমত মনে করে এবং চলতে থাকে। তাই আল্লাহ তা'লা أضاء -এর সাথে كلما শব্দ এনেছেন যা استمرار -এর উপর دلالت করে এবং أظلم -এর সাথে اذا এনেছেন যা استمرار বুঝায় না।

☆☆☆

﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾

"আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করে নিতেন"

أَىْ لَوْشَاءَ أَنْ يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِقَصِيْبِ الرَّعْدِ وَأَبْصَارِهِمْ بِوَمِيْضِ الْبَرْقِ لَذَهَبَ بِهِمَا فَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ لِدَلَالَةِ عَلَيْهِ وَلَقَدْ تَكَاثَرَ حَذْفُهُ فِيْ شَاءَ وَأَرَادَ حَتّٰى لَايَكَادُ يُذْكَرُ اِلَّا فِى الشَّيْءِ الْمُسْتَغْرَبِ كَقَوْلِهِ فَلَوْشِئْتُ أَنْ أَبْكِىَ دَمًا لَبَكَيْتُهٗ۔

অনুবাদ:

(شاء -এর مفعول উহ্য আছে) অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে বিজলীর আওয়াজ দ্বারা তাদের কান এবং বিদ্যুৎচমক দ্বারা তাদের চোখ হরণ করে নিতেন। যেহেতু جزاء তথা لذهب بسمعهم وأبصارهم টি এখানে مفعول -এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে; তাই شاء -এর مفعول -কে হযফ করা হয়েছে। তাছাড়া شاء ও أراد এ উভয়টির مفعول -কে অধিকাংশ সময় হযফ করা হয়। এমনকি আশ্চর্যজনক কোন কথা ব্যতীত এগুলোর مفعول -কে উল্লেখই করা হয় না। (যখন مفعول টি কোন আশ্চর্যজনক কথা বুঝায় তখন مفعول -কে উল্লেখ করা হয় যেমন–) কবির উক্তি– فلوشئت أن أبكى دما لبكيته (তরজমা: যদি আমি রক্তের কান্না কাঁদতে পারতাম তাহলে অবশ্যাই রক্তের কান্না কাঁদতাম। এখানে أن أبكى دما হল محل استشهاد রক্তের কান্না কাঁদা এক অদ্ভুত বিষয় তাই مفعول টি شئ مستغرب অদ্ভুত বিষয় হওয়ার কারণে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে)।

☆☆☆

وَلَوْ: مِنْ حُرُوْفِ الشَّرْطِ وَظَاهِرًا الدَّلَالَةِ عَلَى اِنْتِفَاءِ الْاَوَّلِ لِاِنْتِفَاءِ الثَّانِيْ ضَرُوْرَةَ اِنْتِفَاءِ الْمَلْزُوْمِ عِنْدَ اِنْتِفَاءِ اللَّازِمِ وَقُرِئَ : لَأَذْهَبَ بِأَسْمَاعِهِمْ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ كَقَوْلِهِ: لَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَفَائِدَةُ هٰذِهِ الشَّرْطِيَةِ: اِبْدَاءُ الْمَانِعِ لِذِهَابِ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ مَعَ قِيَامِ مَا يَقْتَضِيهِ وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ تَاثِيْرَ الْاَسْبَابِ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا مَشْرُوْطٌ بِمَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَأَنَّ وُجُوْدَهَا مُرْتَبِطًا بِأَسْبَابِهَا وَاقِعٌ بِقُدْرَتِهِ۔

অনুবাদ:

لو এটা حروف شرطيه -এর একটি হরফ। প্রসিদ্ধ ও প্রাধান্যশীল অভিমত হল, এটা انتفاء ثانى بسبب انتفاء اول তথা جزاء -এর نفى হওয়ার কারণে شرط -এরও نفى হওয়া বুঝায়; যেরকম لازم -এর نفى হলে ملزوم -এর نفى হওয়া আবশ্যক। এক কেরাতে لأذهب بأسماعهم এসেছে, তখন باء টি زائده হবে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী – لاتلقوا بأيديكم الى التهلكة -এর মধ্যে باء টি زائده । এখানে শর্ত আনার উপকারিতা হল– (১) তাদের কান ও চোখ চলে যাওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চলে যেতে কোন্ বস্তুটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য (অর্থাৎ এ কথা প্রকাশ করার জন্য যে, তাদের কান ও চোখ চলে যায়নি তার একমাত্র কারণ হল, আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করেননি)। (২) এ কথার উপর সতর্ক করার জন্য যে, اسباب তার مسببات -এর মধ্যে প্রভাব ফেলা আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এবং (৩) আল্লাহর কুদরতের দ্বারাই مسببات তার أسباب -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما الاختلاف فى معنى لو

(ب) اكتب ما استفدت من قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

উত্তর الف : لو হরফটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে, এটা شرط -এর نفى হওয়ার কারণে جزاء -এর نفى হওয়া বুঝায়। আর আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) -এর মতে, جزاء -এর نفى হওয়ার কারণে شرط -এর نفى হওয়া বুঝায়। আর এটা মুসান্নিফ (র.) -এর মতেও।

উত্তর ب : ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم এই আয়াত থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারলাম। যথা–

১. سبب টি مسبب -এর মধ্যে اثر করতে হলে তাতে আল্লাহর ইচ্ছ থাকা শর্ত।

২. তাদের কান ও চোখ চলে যায়নি তার একমাত্র কারণ হল আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না।

৩. سبب -এর কারণে مسبب -এর অস্তিত্ব লাভ করা আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতাধীন।

☆☆☆

﴿إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"

"إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" كَالتَّصْرِيْحِ بِهِ وَالتَّقْرِيْرِ لَهُ وَالشَّيْءُ يُخْتَصُّ بِالْمَوْجُوْدِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ (شَاءَ) أُطْلِقَ بِمَعْنٰى شَاءَ تَارَةً وَحِيْنَئِذٍ يَتَنَاوَلُ الْبَارِئَ تَعَالٰى كَمَا قَالَ تَعَالٰى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ. وَبِمَعْنٰى مَشِيْءٍ أُخْرٰى أَيْ مَشِيْءٌ وُجُوْدُه فَهُوَ مَوْجُوْدٌ فِي الْجُمْلَةِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى: إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "وَاللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" فَهُمَا عَلٰى عُمُوْمِهِمَا بِلَامَثْنُوِيَّةٍ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا قَالُوْا اَلشَّيْءُ مَا يَصِحُّ أَنْ يُوْجَدَ وَهُوَ يَعُمُّ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ أَوْ مَا يَصِحُّ أَنْ يُعْلَمَ وَيُخْبَرَ عَنْهُ فَيَعُمُّ الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا لَزِمَهُمُ التَّخْصِيْصُ بِالْمُمْكِنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِدَلِيْلِ الْعَقْلِ۔

অনুবাদ:

ان الله على كل شيء قدير আয়াতাংশটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবার্থের জন্য تصريح (ব্যাখ্যাকরণ) ও তাকীদ স্বরূপ। شيئ টি বিদ্যমান বস্তুর সাথে খাছ। কেননা, এটা মূলতঃ شاء -এর মাসদার। কখনো এটা شَاءٍ (اسم فاعل) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখন এটা আল্লাহ তা'লাকেও শামিল রাখে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– قل أى شيء أكبر شهادة قل الله (আপনি বলুন, কোন বস্তু সবচেয়ে বড় সাক্ষীদাতা? আপনি বলে দিন- আল্লাহ তা'লা)। আবার কখানো شيئ শব্দটি مشيئ (اسم مفعول) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যার অস্তিত্বের কামনা করা হয়েছে। সুতরাং এটাও মোটামোটি বিদ্যমান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'লার বাণী– ان الله على كل شيء قدير এবং والله خالق كل شيء -এর মধ্যে شيء টি এ অর্থেই ব্যবহৃত। সুতরাং এ আয়াত দু'টি استثناء ব্যতীত স্বীয় ব্যাপকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর মু'তাযিলারা যেহেতু বলে থাকে যে, شيئ বলা হয় যার অস্তিত্ব বিশুদ্ধ; এতে واجب (অপরিহার্য) এবং ممكن (সম্ভাব্য) বস্তু শামিল হয়ে যায়। অথবা شيء বলা হয় যাকে জানা যায় এবং যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া যায়। এতে ممتنع (অসম্ভব)ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বিধায় তাদের উপর আয়াতের মধ্যে دلالت عقليه -এর মাধ্যমে شيء -কে ممكن -এর সাথে খাছ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:(الف) لِمَ لم يعطف قوله تعالى: ان الله على كل شيء قدير" على قوله: لو شاء الله لذهب الخ؟

(ب) ما معنى الشيء وما الاختلاف في تعريفه بين الاشاعرة والمعتزلة؟

উত্তরঃ الف : ان الله على كل شيء قدير আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর معطوف না করার কারণ হল– উভয় আয়াতের মাঝে كمال اتصال বিদ্যমান। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াত তথা لو شاء الله

لذهب بسمعهم الخ -এর মধ্যে একথার উপর সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা না হলে مسببات -এর মধ্যে اسباب -এর প্রতিক্রিয়া চলে না। আর এই ভাবার্থকে ان الله على كل شئ قدير আয়াতটি আরো তাকীদ ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। কারণ, এই আয়াতটি আম ও ব্যাপক যা কুদরতের আওতাধীন সকল বিষয়কে শামিল রেখেছে। সুতরাং কান ও চোখ নিয়ে যাওয়ার কুদরত-শক্তিও এ আয়াতের ভাবার্থের মধ্যে শামিল। অতএব পূর্ববর্তী আয়াতটি হল موكد আর এ আয়াত হল تاكيد আর تاكيد ও موكد -এর মাঝে كمال اتصال বিদ্যমান। আর كمال اتصال -এর সময় عطف চলে না। তাই এ আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর معطوف করা হয়নি।

ب : شئ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদঃ

অভিধানে شئ এমন বস্তুকে বলা হয়, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব। অতএব অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু সবকিছুকেই এই শব্দটি শামিল করে নেয়। মওজুদকে شئ বলা তো স্পষ্ট। আর অস্তিত্বহীন সম্ভাব্য বস্তুর উদাহরণ যেমন, ছেলে-সন্তান থেকে বঞ্চিত এক ব্যক্তি উক্তি করলো যে, ইনশাআল্লাহ আমার ছেলে আলেম হবে। এই উদাহরণে ছেলে যদিও সম্ভাব্য অস্তিত্বহীন বস্তু তা সত্ত্বেও এর সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে। অতএব তার ছেলেও شئ বা বস্তু। আর অসম্ভবের উদাহরণ যেমন, আমাদের উক্তি شريك البارى ممتنع । এতে আল্লাহ তা'লার অংশীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এটা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে। অতএব এটাও شئ বা বস্তু। বুঝা গেল, আভিধানিকভাবে অসম্ভব বস্তু شئ হয়। তবে شئ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে আশায়েরা ও মু'তাযিলাদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

আশায়েরার মতে شئ ঃ তাদের মতে, শুধু মওজুদ জিনিসকে شئ বলে। এতে অস্তিত্বহীন এবং অসম্ভাব্য বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে না

মু'তাযিলার মতে شئ ঃ তাদের মতে, شئ বলা হয় মওজুদ জিনিসকে অথবা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব হয়। এতে অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু সবকিছুই شئ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

আশায়েরা'র দলীলঃ তারা স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন যে, شئ শব্দটি মূলতঃ شاء (ইচ্ছা করা) -এর মাসদার। অতঃপর এটা কখনো شَاءٍ (اسم فاعل ইচ্ছা পোষণকারী) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর কখনো مشئ (যা ইচ্ছা করা হয় (اسم مفعول -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন شئ শব্দটি اسم فاعل তথা ইচ্ছা পোষণকারী অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন যে বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করা হবে সেটা অস্তিত্ববান হওয়া জরুরী। কারণ, অস্তিত্বহীন বস্তুর ইচ্ছা করা যায় না। তদ্রূপ اسم مفعول তথা مشئ (যার ইচ্ছা করা হয়) অর্থে ব্যবহৃত হবে তখনও তার مدلول টি অস্তিত্ববান হওয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ তা'লার কোন বস্তুর ইচ্ছা করার অর্থই হল ঐ বস্তুকে অস্তিত্ব দান করা। মোটকথা, شئ শব্দটি اسم فاعل অথবা اسم مفعول যে অর্থেই ব্যবহার হোক না কেন তার مدلول টি মওজুদ থাকা অপরিহার্য। কাজেই প্রমাণিত হল যে, শুধু মওজুদ জিনিসকে شئ বলে। অবশ্য شئ শব্দটি যখন شَاءٍ (اسم فاعل) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাতে আল্লাহ তা'লাও শামিল থাকেন। কারণ, তিনিও তো ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তা'লার বাণী– قل أى شئ أكبر شهادة قل الله (আপনি বলুন, কোন বস্তু সবচেয়ে বড় সাক্ষীদাতা? আপনি বলে দিন- আল্লাহ তা'লা)। এখানে আল্লাহ তা'লাকে এ অর্থেই شئ বলা হয়েছে। কিন্তু شئ শব্দটি যখন مشئ

(اسم مفعول) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ তা'লা شيء -এর মধ্যে শামিল থাকেন না; বরং তখন অন্যান্য বিদ্যমান বস্তু شيء -এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব অন্যের ইচ্ছার অধীন নয়। অর্থাৎ অন্য কারো চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'লা অস্তিত্ব লাভ করেননি; বরং তিনি হলেন ওয়াজিবুল ওজুদ।

ان الله على كل شيء قدير এবং والله خالق كل شيء এই দুই আয়াতের মধ্যে شيء শব্দটি مشيء -এর অর্থে ব্যবহৃত।

যেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, শুধু মওজুদ জিনিসকে شيء বলে। তাই অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু কোনটিই شيء -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং شيء শব্দটি আম ও ব্যাপক থেকেও এটা সঠিক অর্থ বুঝাবে; তার অর্থের মধ্যে تخصيص বা বিশেষত্ব সৃষ্টি করার দরকার নেই।

কিন্তু মু'তাযিলার মতে, شيء বলা হয় যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব। এতে আল্লাহ তা'লা এবং অসম্ভব বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের মাযহাব অনুসারে ان الله على كل شيء قدير -এর মধ্যে شيء শব্দকে আম ও ব্যাপক ধরা হলে এ বিষয় লাযেম আসে যে, আল্লাহ তা'লা অসম্ভব বস্তু এবং স্বয়ং নিজের উপরও ক্ষমতাবান অথচ এটা যে বাতিল তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এজন্য তাদের মাযহাবে এ জাতীয় স্থানে شيء শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়; বরং এটা থেকে دلالت عقليه হিসেবে অসম্ভব বস্তু এবং আল্লাহ তা'লাকে استثناء করতে হয়।

☆☆☆

وَالْقُدْرَةُ هِيَ التَّمَكُّنُ مِنْ اِيْجَادِ الشَّيْءِ وَقِيْلَ: صِفَةٌ تَقْتَضِي التَّمَكُّنَ وَقِيْلَ قُدْرَةُ الْاِنْسَانِ هَيْئَةٌ بِهَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِعْلِ وَقُدْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عِبَارَةٌ عَنْ نَفْيِ الْعِجْزِ عَنْهُ وَالْقَادِرُ هُوَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ فَعَلَ وَاِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ وَالْقَدِيْرُ اَلْفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ عَلٰى مَا يَشَاءُ وَلِذَالِكَ قَلَّمَا يُوْصَفُ بِهٖ غَيْرُ الْبَارِيْ تَعَالٰى وَاشْتِقَاقُ الْقُدْرَةِ مِنَ الْقَدْرِ لِاَنَّ الْقَادِرَ يُوْقِعُ الْفِعْلَ عَلٰى مِقْدَارِ قُوَّتِهٖ اَوْ عَلٰى مِقْدَارِ مَا يَقْتَضِيْهِ مَشِيَّتُهٗ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْحَادِثَ حَالَ حُدُوْثِهٖ وَالْمُمْكِنَ حَالَ بَقَائِهٖ مَقْدُوْرَانِ وَاَنَّ مَقْدُوْرَ الْعَبْدِ مَقْدُوْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهٗ شَيْءٌ وَكُلُّ شَيْءٍ مَقْدُوْرُ اللّٰهِ ـ

অনুবাদ:

قدرة বলা হয় কোন বস্তু সংঘটনের উপর সুযোগ লাভ করা। আর কেউ কেউ বলেন, কুদরত সেই গুণকে বলে যা কার্য সম্পাদনে শক্তি অপরিহার্য করে। আর কেউ কেউ বলেন, মানুষের কুদরত এমন একটি অবস্থা যদ্দারা মানুষ কর্মের শক্তি পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'লার কুদরত হল তাঁর সত্তা অক্ষমতা শূণ্য হওয়া, আর قادر সেই সত্তাকে বলে যিনি চাইলে কোন কাজ করতে পারেন আর না

চাইলে না করেন। পক্ষান্তরে قدير হলেন সেই সত্তা যিনি যেরকম চান সেরকমই করতে পারেন। আর এক্কারণেই গায়রুল্লাহের বেলায় قدير শব্দটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। قدرة এটা قدر থেকে নির্গত। কেননা, সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য আন্দাযা অথবা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে থাকে। ان الله على كل شيء قدير এ বাক্যটি এ কথারই প্রমাণ বহন করছে যে, নশ্বর বস্তু নশ্বর থাকাকালীন অবস্থায় এবং সম্ভাব্য বস্তু তার বাকী থাকা অবস্থায় কুতরদের আওতাধীন। এবং এ কথারও প্রমাণ বহন করছে যে, বান্দার সামর্থ্যের আওতাধীন সকল বস্তু আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতাভুক্ত। কেননা, এটা হল شيء আর সকল شيء আল্লাহর কুদরতের অধীন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى القدرة ؟ وما الفرق بين القادر والقدير؟

উত্তর ঃ قدرة -এর অর্থ: قدرة -এর অর্থ التمكن من ايجاد الشيء **অর্থাৎ কোন বস্তু বা কাজ** সংঘটনের উপর সুযোগ লাভ করা। কেউ কেউ বলেন, জীবন সত্তার এমন গুণকে قدرة বলে, যা কার্য সম্পাদনে সুযোগ অপরিহার্য করে। আর কেউ কেউ বলেন, قدرة الانسان হল মানব দেহের এমন অবস্থা, যা দ্বারা সে কাজ সম্পাদনের শক্তি লাভ করে। আর قدرة الله হল আল্লাহর সত্ত্বা অক্ষমতা শূণ্য হওয়া।

قادر ও قدير -এর পার্থক্য ঃ এ উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য হলো– قادر এমন সত্তাকে বলে, যে চাইবে তো তার শক্তি কাজে লাগাবে আবার না চাইবে তো কাজে লাগাবে না। আর قدير এমন সত্তাকে বলে, যে সর্বক্ষণ যার ক্ষেত্রে চাইবে, তাই করবে। এ قدير শব্দটি মহান আল্লাহর বিশেষণ ছাড়া আর কারো বিশেষণে খুবই কম ব্যবহার হয়।

☆☆☆

وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّمْثِيْلَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ التَّمْثِيْلَاتِ الْمُؤَلَّفَةِ وَهُوَ أَنْ تُشَبَّهَ كَيْفِيَّةٌ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ مَجْمُوْعٍ تَضَامَّتْ أَجْزَائُهُ وَتَلَاصَقَتْ حَتّٰى صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا بِأُخْرٰى مِثْلِهَا كَقَوْلِه تَعَالٰى: مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ اَلْآيَةَ. فَاِنَّهٗ تَشْبِيْهُ حَالِ الْيَهُوْدِ فِيْ جَهْلِهِمْ بِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاةِ بِحَالِ الْحِمَارِ فِيْ جَهْلِه بِمَا يَحْمِلُ مِنْ اَسْفَارِ الْحِكْمَةِ وَالْغَرْضُ مِنْهُمَا تَمْثِيْلُ حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالشِّدَّةِ بِمَا يُكَابِدُهٗ مَنْ طَفِئَتْ نَارُهٗ بَعْدَ اِيْقَادِه فِيْ ظُلْمَةٍ أَوْ بِحَالِ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّمَاءُ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَعَ رَعْدٍ قَاصِفٍ وَبَرْقٍ خَاطِفٍ وَخَوْفٍ مِنَ الصَّوَاعِقِ۔

অনুবাদ:

(আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের আলোচনায় দু'টি মিছাল পেশ করেছেন। **প্রথম মিছাল হল** مثلهم كمثل الذى استوقد نارا এবং দ্বিতীয় মিছাল হল أو كصيب من السماء الخ **প্রথম মিছালের মধ্যে**

মুনাফিকদেরকে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীদের সাথে এবং দ্বিতীয় মিছালের মধ্যে ঝড়-তুফানে কবলিত ব্যক্তিদের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। এখানে مشبه হল مثلهم আর مشبه به হল كمثل الذى الخ এবং كصيب من السماء الخ এখন আলোচনা হল এই তাশবীহ কি تشبيه المركب بالمركب না تشبيه المفرد بالمفرد ? এসম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন–)

প্রথম সম্ভাবনা

পরিস্কার কথা হল যে, উল্লেখিত তাশবীহ দু'টি تشبيه المركب بالمركب -এর মধ্য থেকে। تشبيه المركب বলা হয়, যে কতেক বস্তু একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার কারণে একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে সেগুলোর সমষ্টি অবস্থা থেকে বাছাইকৃত অবস্থাকে অনুরূপ আরো কতেক সমষ্টি বস্তুর বাছাইকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করা। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الاية এ আয়াতে ইহুদীদের তাওরাত সম্বন্ধে অজ্ঞতার অবস্থাকে গাধার পিঠে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে গাধার অজ্ঞতার অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (তাই এখানে مشبه -এর মধ্যেও রয়েছে কতেক বস্তুর বাছাইকৃত অবস্থা তথা ইহুদীরা তাওরাতের ধারক-বাহক ও তার পাঠক হওয়া এবং তাওরাতটি পথপ্রদর্শনকারী ও নূর হওয়া এবং তারা নিজের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাওরাতের উপর আমল না করা এই তিনটি কথার সমষ্টি থেকে যে অবস্থাটি অর্জিত হয়েছে সেটা হল, তাওরাত মহাগ্রন্থ, হেদায়েত এবং নূর হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীরা তা পাঠ করে নিজের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন তাওরাত থেকে উপকৃত না হওয়া এবং তার উপর আমল না করা। আর مشبه به -এর মধ্যেও রয়েছে কতেক বস্তুর বাছাইকৃত অবস্থা তথা গাধার তাওরাতের বাহন হওয়া, তাওরাত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়কারী হওয়া এবং গাধা তাওরাতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া এই তিনটি কথার সমষ্টি থেকে যে অবস্থা অর্জিত হয়েছে সেটা হল, গাধা তার পিঠে কিতাবাদি বহন করা সত্ত্বেও তার নির্বুদ্ধিতার কারণে সেগুলো থেকে উপকৃত না হওয়া। প্রথম অবস্থাকে দ্বিতীয় অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে কাজেই এখানে تشبيه المركب بالمركب পাওয়া গেল। তদ্রূপ مثلهم كمثل الذى الخ এবং أو كصيب من السماء الخ এই দুই আয়াতে যে দু'টি তাশবীহ রয়েছে তাও تشبيه المركب بالمركب -এর অন্তর্ভুক্ত)। আর এ দুই তাশবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুনাফিকদের পেরেশানী ও বিভ্রান্তিকর অবস্থাকে সেই বিপদ ও পেরেশানীর অবস্থার সাথে তুলনা করা যে অবস্থা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সেই ব্যক্তি যে অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়েছিল কিন্তু আগুনটি নিভে গেল। অথবা তাদের অবস্থাকে সেই ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য যে অন্ধকার রাতে ঝড়-তুফান ও বজ্রপাতের কবলে পড়ে গেল এবং গর্জন ও বিজলীর কারণে তার কান ও চোখ চলে যাওয়ার উপক্রম হল। (অর্থাৎ উভয় তাশবীহতে কতেক বিষয়ের সমষ্টি থেকে যে অবস্থাটি অর্জিত হয়েছে সেটা হচ্ছে مشبه و مشبه به । مشبه -এর মধ্যে কতেক বিষয় যেমন: নিজের জান-মাল রক্ষার্থে ঈমানের দাবী করা, উপরন্তু তাদেরকে বিপদে ফেলা অতঃপর তাদের মুখোশ উম্মুচন করে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দেয়ার কারণে তাদের ঈমানের উপকারিতা নিমিশেই শেষ হয়ে যাওয়া– মুনাফিকদের এই তিনটি কথার সমষ্টি অবস্থা হল مشبه, আবার مشبه به -এর মধ্যেও কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেমন: অন্ধকারে কারো আগুন জ্বালানো, অতঃপর অতি তাড়াতাড়ি আগুন নিভে যাওয়া এবং আগুন নিভে যাওয়ার

দরুন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়া। প্রথম তাশবীহের মধ্যে আগুন প্রজ্বলনকারীর এই তিনটি কথার সমষ্টি অবস্থার সাথে মুনাফিকদের উল্লেখিত তিনটি কথার সমষ্টি অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে; وجه شبه হল বাহ্যিক অবস্থা ভাল থাকা যার পরিণতি অশুভ। আর দ্বিতীয় তাশবীহের মধ্যে مشبه به -তে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেমন: কঠিন ঝড়-তুফানে পতিত হওয়া যাতে রয়েছে বিজলী ও গর্জন এবং এই বিজলী ও গর্জনে কান ফেটে যাওয়ার ভয়ে কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করা। আর مشبه -এর মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি বিষয় যেমন: মুনাফিকদের পেরেশানীর মুসিবত এবং তাদের কুফরকে গোপন রেখে এর উপর ঈমানের লেবাস পরানো এবং এর দ্বারা মুমিনদেরকে ধোঁকা দেওয়া– মুনাফিকদের এই বিষয়াদির সমষ্টি অবস্থাকে ঝড়-তুফানে কবলিত ব্যক্তির উল্লেখিত অবস্থাবলীর সমষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

☆☆☆

وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا مِنْ قَبِيْلِ التَّمْثِيْلِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ أَشْيَاءَ فُرَادٰى فَتُشَبِّهُ بِأَمْثَالِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى: وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ" وَقَوْلُ اِمْرُءِ الْقَيْسِ:ـ

كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا ☆ لَدٰى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشْفُ الْبَالِىْ

بِأَنْ يُشَبَّهَ فِى الْاَوَّلِ ذَوَاتُ الْمُنَافِقِيْنَ بِالْمُسْتَوْقِدِيْنَ وَاِظْهَارُهُمُ الْاِيْمَانَ بِاسْتِيْقَادِ النَّارِ وَمَا اِنْتَفَعُوْا بِهِ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ وَسَلَامَةِ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَالِكَ بِاِضَاءَةِ النَّارِ مَا حَوْلَ الْمُسْتَوْقِدِيْنَ وَزَوَالِ ذَالِكَ عَنْهُمْ عَلَى الْقُرْبِ بِاِهْلَاكِهِمْ وَاِفْشَاءِ حَالِهِمْ وَاِبْقَاءِ هِمْ فِى الْخَسَارِ الدَّائِمِ وَالْعَذَابِ السَّرْمَدِ بِاِطْفَاءِ نَارِهِمْ وَالذِّهَابُ بِنُوْرِهِمْ وَفِى الثَّانِىْ أَنْفُسُهُمْ بِاَصْحَابِ الصَّيْبِ وَاِيْمَانُهُمُ الْمُخَالَطُ بِالْكُفْرِ وَالْخِدَاعُ بِصَيِّبٍ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَايَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئًا وَلَايُخْلِصُ مِمَّا يُرِيْدُ بِهِمْ مِنَ الْمَضَارِّ وَتَحَيُّرُهُمْ لِشِدَّةِ الْاَمْرِ وَجَهْلُهُمْ بِمَا يَأْتُوْنَ وَيَذَرُوْنَ بِأَنَّهُمْ كُلَّمَا صَادَفُوْا مِنَ الْبَرْقِ خَفْقَةً اِنْتَهَزُوْهَا فُرْصَةً مَعَ خَوْفِ أَنْ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ فَخَطُّوْا خِطَطًا يَسِيْرَةً ثُمَّ اِذَا خَفِىَ وَفَتَرَ لُمْعَانُهُ بَقُوْا مُتَقَيِّدِيْنَ لَاحَرَاكَ لَهُمْ۔

দ্বিতীয় সম্ভাবনা

অনুবাদ:

আর এ উপমা দু'টিকে تشبيه المفرد ধরারও অবকাশ আছে। تشبيه المفرد বলা হয় পৃথক পৃথক কয়েকটি বিষয়কে বাছাই করে এগুলোকে তাদেরই অনুরূপ আরো কয়েকটি বিষয়ের সাথে তুলনা করা যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور (এ আয়াতের মধ্যে কাফিরকে অন্ধের সাথে, মুমিনকে দৃষ্টিমানের সাথে, বাতিলকে অন্ধকারের সাথে, সত্যকে আলোর সাথে, ছওয়াবকে ছায়ার সাথে এবং শাস্তিকে উষ্ণতার সাথে তুলনা করা হয়েছে)। ইমরাউল কায়েসের কবিতা যেমন- كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ☆ لدى وكرها العناب والحشف البالى (কবিতার তরজমা: পাখির সতেজ ও শুকনো অন্তরসমূহ, শিকারী পাখির বাসার পাশে তরতাজা আঙ্গুর এবং পুরনো খেজুরের ন্যায়। কবি এখানে পাখির সতেজ অন্তরকে তরতাজা আঙ্গুরের সঙ্গে এবং শুকনো অন্তরকে নষ্ট ও পুরনো খেজুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন)।

উপমা দু'টিকে تشبيه المفرد এ হিসাবে বলা যাবে যে, প্রথম উপমার মধ্যে মুনাফিকদেরকে আগুন প্রজ্বলনকারীদের সাথে, তাদের ঈমান প্রকাশ করাকে আগুন প্রজ্জ্বলন করার সাথে, ঈমান প্রকাশের উপকারিতা তথা জান-মাল, ছেলে-সন্তান রক্ষা পাওয়াকে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীর চারদিককার আলোকিত হওয়ার সাথে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া, তাদের মুখোশ উম্মোচন করা, তাদেরকে চিরস্থায়ী ক্ষতি ও শাস্তিতে ফেলে দেওয়ার কারণে তাদের ঐ উপকারিতা নিমিশেই শেষ হয়ে যাওয়াকে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীর আগুন নিভে যাওয়ার এবং আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা যাবে। আর দ্বিতীয় উপমাতে মুনাফিকদেরকে তুলনা করা যাবে ঝড়-তুফানে পতিত ব্যক্তিদের সাথে, তাদের কুফর ও ধোঁকায় মিশ্রিত ঈমানকে তুলনা করা হবে সেই বৃষ্টির সাথে যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, গর্জন এবং বিদ্যুৎচমক। আর মুমিনগণের পক্ষ থেকে শাস্তি এবং মুমিনগণ অন্যান্য কাফিরদেরকে যে ক্ষতি করে থাকেন সেই শাস্তি ও ক্ষতি থেকে বাচার উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের নেফাক ও ধোঁকাকে গর্জনের কারণে মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার সঙ্গে তুলনা করা যাবে। কেননা, তাদের এই অবস্থা আল্লাহ তা'লার কুদরতকে সামান্য টলাতে পারবে না, আল্লাহ তাদের যে ক্ষতি করতে চাইবেন তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর ব্যাপারটি কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিস্ময়তা, মুমিনদেরকে ধোঁকায় ফেলতে কি করবে না করবে সে ব্যাপারে জ্ঞান না থাকায় তাদের যে পেরেশানী ভাব হত এটাকে সেই কথার সঙ্গে তুলনা করা যাবে যে, বৃষ্টির কবলে পতিত লোকেরা যখন বিজলীর সামান্য ঝলক দেখতে পায়; ঝলক তাদের চোখকে নিয়ে যাবে এই ভয়ে তারা সামনের দিকে হাটতে থাকে অতঃপর বিজলী যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন নড়াচড়া না করে একেবারে দাড়িয়ে থাকে।

☆☆☆

وَقِيلَ شُبِّهَ الْإِيمَانُ وَالْقُرْآنُ وَسَائِرُ مَا أُوْتِيَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَعَاوِنِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحَيٰوةِ الْأَبَدِيَّةِ بِالصَّيِّبِ الَّذِيْ بِهٖ حَيٰوةُ الْأَرْضِ وَمَا ارْتَكَبَتْ بِهَا مِنَ الشُّبَهِ الْمُبْطِلَةِ وَاُعْتُرِضَتْ دُوْنَهَا مِنَ الْإِعْتِرَاضَاتِ الْمُشْكِلَةِ بِالظُّلُمَاتِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ بِالرَّعْدِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ بِالْبَرْقِ وَتَصَامُّهِمْ عَمَّا يَسْمَعُوْنَ مِنَ الْوَعِيْدِ بِحَالِ مَنْ يَهُوْلُهُ الرَّعْدُ فَيُخَافُ صَوَاعِقَهُ فَيَسُدُّ أُذُنَهُ عَنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَا خَلَاصَ لَهُمْ مِنْهَا وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى: وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ وَاهْتِزَازُهُمْ لِمَا يَلْمَعُ لَهُمْ مِنْ رُشْدٍ يُدْرِكُوْنَهُ أَوْ رَفْدٍ يُطْمَعُ إِلَيْهِ أَبْصَارُهُمْ بِمَشْيِهِمْ فِيْ مَطْرَحِ ضُوْءِ الْبَرْقِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ وَتَحَيُّرُهُمْ وَتَوَقُّفُهُمْ فِي الْأَمْرِ حِيْنَ تَعْرِضُ لَهُمْ شُبْهَةٌ أَوْ تَعِنُ لَهُمْ مُصِيْبَةٌ بِتَوَقُّفِهِمْ إِذْ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى: وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ" عَلٰى أَنَّهُ تَعَالٰى جَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ لِيَتَوَسَّلُوْا بِهَا إِلَى الْهُدٰى وَالْفَلَاحِ ثُمَّ إِنَّهُمْ صَرَفُوْهَا إِلَى الْحُظُوْظِ الْعَاجِلَةِ وَسَدُّوْهَا عَنِ الْفَوَائِدِ الْآجِلَةِ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ بِالْحَالِ الَّتِيْ يَجْعَلُوْنَهَا فَإِنَّهُ عَلٰى مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ۔

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন, ঈমান, কুরআন এবং এছাড়া মানুষকে চিরস্থায়ী জীবনের মাধ্যম হিসেবে যে সকল উপকারী বস্তু দেয়া হয়েছে এগুলোকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যদ্বারা জমিন সতেজ হয়। আর এগুলোর সাথে যে অহেতুক সন্দেহ সম্পৃক্ত হয় এবং যেসকল জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় এগুলোকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুরআনে যে ওয়াদা ও ভীতিপ্রদর্শনের কথা এসেছে এগুলোকে গর্জনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর কুরআনে যেসব উজ্জ্বল প্রমাণাদি রয়েছে এগুলোকে বিজলীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং ভীতিপ্রদর্শনের কথা শুনেও না শুনার ভান ধরাকে সেই ব্যক্তির অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে গর্জনের ভয়ে নিজের কান বন্ধ করে দেয়। অথচ এইসব (পন্থা অবলম্বনের কারণে) বিজলী ও গর্জন থেকে তাদের মুক্তি মিলবে না। আর এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার এই বাণীর মধ্যে– والله محيط بالكافرين ।

তাদের সামনে রুশদ-হেদায়েতের যে ঝলক দেখা দেয়; যার দিকে তাদের চোখের দৃষ্টি পড়ে সেই রুশদ-হেদায়েতকে– বিজলী যখন তাদের জন্য কিছু আলো ছড়িয়ে দেয় তখন আলোর স্থানে তাদের চলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ দেখা দিলে অথবা তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তখন কোন বিষয় নিয়ে তাদের মনে যে পেরেশানীর সৃষ্টি হয় এটাকে অন্ধকার ছেঁয়ে যাওয়ার পর তাদের থেমে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم মহান আল্লাহ তা'লা এই আয়াত দ্বারা এ বিষয়ের উপর সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য তিনি কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা এগুলোর মাধ্যমে হেদায়েত ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তারা এগুলোকে পার্থিব উপকারের কাজে ব্যবহার করতে লাগল এবং পরকালীন উপকার থেকে এগুলোকে ফিরিয়ে রাখল। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদেরকে সেই অবস্থা দ্বারা (পরিবর্তন) করে দিতেন যে অবস্থার উপর তারা তাদের কান ও চোখকে ব্যবহার করে। (অর্থাৎ তাদেরকে কান ও চোখ দেয়া হয়েছে সত্য কথা শুনার এবং দেখার জন্য কিন্তু তারা তা করেনি; বরং বধির ও অন্ধ সেজেছে। তাই আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা যেরকম বধির ও অন্ধ সেজেছে তাদেরকে তিনি বাস্তবেই বধির ও অন্ধ বানিয়ে দিতেন)। কেননা, আল্লাহ তা'লা যা চান তা করতে পারেন।

☆☆☆

﴿يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ﴾

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো"

لَمَّا عَدَّدَ فِرَقَ الْمُكَلَّفِيْنَ وَذَكَرَ خَوَاصَّهُمْ وَمَصَارِفَ أُمُوْرِهِمْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِالْخِطَابِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِلْتِفَاتِ هَزًّا لِلسَّامِعِ وَتَنْشِيْطًا لَهٗ وَاهْتِمَامًا بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ وَتَفْخِيْمًا لِشَانِهَا وَجَبْرًا لِكُلْفَةِ الْعِبَادَةِ بِلَذَّةِ الْمُخَاطَبَةِ ـ

অনুবাদ:________________________

যোগসূত্র

যখন আল্লাহ তা'লা মুকাল্লাফীন (তথা শরীয়তের সম্বোধনের আওতাভুক্ত লোকদের) (তিন) দল (মুমিন, কাফির এবং মুনাফিকদের অবস্থা) -কে পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী ও তাদের কৃতকর্মের শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করে দিলেন তাই এখন التفات -এর পদ্ধতিতে তাদেরকে সম্বোধন করতে মনোযোগী হলেন। শ্রুতাকে সচেতন করার, তার মনে আনন্দ দেয়ার, ইবাদতের বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর এবং সম্বোধনের স্বাদ দ্বারা ইবাদতের কষ্ট দূরীভূত করার জন্য (التفات -এর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:________________________

﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾

السوال:(الف) اكتب ربط الاية بما قبلها

(ب) كيف صح خطاب الله تعالى بعد ذكره على وجه الغيبة وما هى الفائدة فيه؟

উত্তর ঃ الف:

ربط الاية بما قبلها (পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র): প্রথমে মুমিন, কাফির ও মুনাফিকদের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার পর এখন ঐ সবগুলোকে সম্মিলিতভাবে সম্বোধনের সাথে ইসলামের দু'টি মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ ইবাদত ও রিসালতের দিকে আহবান করা হচ্ছে।

ب : اِلْتِفَاتْ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخِطَابْ -এর উপকারিতাঃ

يا أيها الناس الخ -এর আগ পর্যন্ত আলোচনা ছিল صيغه غيب -এর মাধ্যমে, আর এখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে خطاب (সম্বোধনের) মাধ্যমে। সুতরাং এখানে التفات من الغيبة الى الخطاب পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হল, আলোচনার ধরন পরিবর্তেনের মধ্যে উপকারিতা কি? কেন-ইবা আলোচনার ধরন পরিবর্তন করা হল?

এর উত্তর হল– يا أيها الناس এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে পাঁচটি উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যথা–

১. এর দ্বারা শ্রুতা সতর্ক হয়। কেননা, কাউকে غيبت বা গোপন রেখে বর্ণনা করার পর আলোচনার ধরন পরিবর্তন করে হঠাৎ তাকে সম্বোধন করলে সে থমকে উঠে এবং সতর্ক হয়।

২. আলোচনার ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রুতার মনে অনন্দ জন্মে। কেননা, একই কথা বারবার শুনলে মনে বিরক্ত এসে যায়। তাই আলোচনার ধরন পরিবর্তন করলে তার মনে ফূর্তি জাগে এবং কথা শুনতে আগ্রহী হয়।

৩. ইবাদতের বিষয়টি অতিশয় গুরুত্ব তাই আলোচনার ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, কোন দূতের মাধ্যমে غيبت (গায়েবসূচক সীগা) -এর সূরতে কোন বিষয়ের হুকুম করার চেয়ে خطاب বা সম্বোধনের মাধ্যমে হুকুম প্রদান করলে ঐ বিষয়টির গুরুত্ব বেশী প্রকাশ পায়।

৪. ইবাদত যে একটি মহান বিষয় তা প্রকাশ করার জন্য يا أيها الناس দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কেননা, সম্বোধনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ পায় সাথে সাথে বিষয়টি যে মহান তাও প্রমাণিত হয়।

৫. يا أيها الناس দ্বারা সম্বোধন করেছেন যাতে এই সম্বোধনের স্বাদ উপভুগ করে ইবাদতের কষ্ট-ক্লেশ দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা, যখন عارف (আল্লাহ অভিমুখী) -কে সম্বোধন করা হবে তখন সে তার محبوب حقيقى -এর সম্বোধন শুনে ইবাদতের সকল কষ্ট ভুলে যাবে। والله أعلم وعلمه أتم

☆☆☆

وَ(يَا) حَرْفٌ وُضِعَ لِنِدَاءِ الْبَعِيْدِ وَقَدْ يُنَادٰى بِهِ الْقَرِيْبُ تَنْزِيْلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْبَعِيْدِ اِمَّا لِعَظْمَتِهِ كَقَوْلِ الدَّاعِيْ: يَارَبِّ وَيَا اَللّٰهُ! وَهُوَ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ أَوْ لِغَفْلَتِهِ وَسُوْءِ فَهْمِهِ أَوْ لِلْاِعْتِنَاءِ بِالْمَدْعُوِّ لَهُ وَزِيَادَةِ الْحِثِّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَ الْمُنَادٰى جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ لِاَنَّهُ نَائِبٌ مُنَابَ الْفِعْلِ۔

অনুবাদ:____

ياء حرف نداء -এর তাহকীকঃ

ياء এটা এমন হরফ যাকে بعيد তথা দূরবর্তী আহবানের জন্য গঠন করা হয়েছে। কখনো নিকটকে দূরের স্থানে রেখে ياء দ্বারা নিকটকে আহবান করা হয় (তিন কারণে–) (১) منادى উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে যেমন: !يارب ويا الله (হে প্রভূ! হে আল্লাহ!) অথচ আল্লাহ তা'লা তো আহবানকারী ব্যক্তির কণ্ঠনালীর চেয়েও অতি নিকটে। (২) منادى -এর উদাসীনতা ও তার জ্ঞান-বুদ্ধি খারাপ থাকার কারণে (সে নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাকে দূরবর্তী গণ্য করে ياء দ্বারা আহবান করা হয় কারণ, সে এত উদাস যে, তাকে حرف نداء قريب দ্বারা আহবান করলে সে শুনবে না)। অথবা (৩) যে কথা বলার জন্য আহবান করা হচ্ছে সে কথার গুরুত্ব প্রকাশ করার এবং

আহবানকৃত ব্যক্তিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। (কেননা, নিকটকে দূরের হরফ দ্বারা আহবান করলে যে কথার জন্য আহবান করা হয় এটার গুরুত্ব বুঝা যায় এবং এতে আহবানকৃত ব্যক্তি ঐ কথাটি শুনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে)।

ياء টি তার منادى সহ পরিপূর্ণ একটি বাক্য। কারণ, এটা তো একটি فعل -এর স্থলাভিষিক্ত।

وَأَيْ جُعِلَ وُصْلَةً اِلَى نِدَاءِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ فَاِنَّ اِدْخَالَ (يَا) عَلَيْهِ مُتَعَذَّرٌ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ حَرْفَيِ التَّعْرِيْفِ فَاِنَّهُمَا كَمِثْلَيْنِ وَاُعْطِيَ حُكْمَ الْمُنَادى وَاُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّدَاءِ وَصْفًا مُوَضِّحًا لَهُ وَالْتُزِمَ رَفْعُهُ اِشْعَارًا بِاَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَاُقْحِمَتْ بَيْنَهُمَا هَاءُ التَّنْبِيْهِ تَاكِيْدًا وَتَعْوِيْضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ اَيْ مِنَ الْمُضَافِ اِلَيْهِ۔

অনুবাদ:______________________________

أَيُّ -এর তাহকীকঃ

اى -কে معرف باللام (আলিফ-লাম দ্বারা মা'রেফা)-কে আহবান করার মাধ্যম বানানো হয়েছে। কেননা, معرف باللام -এর উপর ياء টি প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার কারণ, দুই حرف تعريف একত্রিত হওয়া অসম্ভব। (কেননা, لام تعريف তো সর্বদা معرفه -এর জন্য ব্যবহার হয় আর ياء টি যদিও نكره -এর জন্যও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অধিকাংশ সময় এটা معرفه -এর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে) তাই ياء এবং لام تعريف টি একই পর্যায়ভুক্ত (আর একই শব্দের শুরুতে দুই حرف تعريف একত্রিত হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই ياء টি معرف باللام -এর শুরুতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না বিধায় أى -কে মাধ্যম বানিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে দুটি حرف تعريف একত্রিত না হয়)। আর أى -কে منادى -এর হুকুম প্রদান করে (তার উপর اعراب منادى مفرد معرفه -এর প্রয়োগ করা হয়েছে আর) তার উপর مقصود بالنداء -কে صفت موضحه হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং (مقصود بالنداء টি منادى مفرد معرفه -এর تابع হওয়ায় তাতে رفع ও نصب উভয়টি জায়েয হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এ কায়দা থেকে পৃথক করে) তার উপর رفع আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য যে, এটাই হল مقصود بالنداء । আর উভয়টির মধ্যেখানে هاء تنبيه যুক্ত করা হয়েছে তাকীদের জন্য এবং أى -এর জন্য যে مضاف اليه -এর প্রয়োজন ছিল তার পরিবর্তে (কেননা, أى টি مضاف اليه চায়; কিন্তু এখানে তো তার مضاف اليه নেই বিধায় তার পরিবর্তে هاء تنبيه যুক্ত করা হয়েছে)।

وَإِنَّمَا كَثُرَ النِّدَاءُ عَلٰى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ فِي الْقُرْاٰنِ لِاسْتِقْلَالِهٖ بِأَوْجُهٍ مِنَ التَّاكِيْدِ وَكُلُّ مَا نَادَى اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَهٗ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أُمُوْرٌ عِظَامٌ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يَتَفَطَّنُوْا لَهَا وَيَقْبَلُوْا بِقُلُوْبِهِمْ عَلَيْهَا وَأَكْثَرُهُمْ عَنْهَا غَافِلُوْنَ حَقِيْقٌ بِأَنْ يُنَادِيْ لَهٗ بِالْاٰكَدِ الْأَبْلَغِ۔

অনুবাদ:

কুরআনে কারীমে প্রায়শ أيها দ্বারা সম্বোধনের রহস্য কি?

পবিত্র কুরআনে প্রায়শ এ পদ্ধতিতে نداء (আহবান) করা হয়েছে তার কারণ হল, এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন রকমের তাকীদের সাথে বিশেষিত। আর যেসব বিষয়ের জন্য আল্লাহ তা'লা বান্দাদেরকে আহবান করেছেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এগুলো একথারই দাবী রাখে যে, বান্দা এগুলোকে ভাল করে উপলব্ধি করবে এবং এগুলোর প্রতি মনোযোগী হবে। অথচ অধিকাংশ লোকেরা তা থেকে উদাস থাকে। তাই উচিত হল যে, এসব বিষয়াদির জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকীদের সাথে তাদেরকে আহবান করা হবে (বিধায় أيها দ্বারা কুরআনে প্রায়শ আহবান করা হয়)।

☆☆☆

وَالْجُمُوْعُ وَاَسْمَاءُهَا الْمُحَلَّاتُ بِاللَّامِ لِلْعُمُوْمِ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْهَا وَالتَّوْكِيْدُ بِمَا يُفِيْدُ الْعُمُوْمَ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ" وَاِسْتِدْلَالُ الصَّحَابَةِ بِعُمُوْمِهَا شَائِعًا ذَائِعًا فَالنَّاسُ يَعُمُّ الْمَوْجُوْدِيْنَ وَقْتَ النُّزُوْلِ لَفْظًا وَمَنْ سَيُوْجَدُ مَعْنًى لِمَا تَوَاتَرَ مِنْ دِيْنِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ مُقْتَضٰى خِطَابِهٖ وَأَحْكَامِهٖ شَامِلٌ لِقَبِيْلَتَيْنِ ثَابِتٌ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيْلُ۔

অনুবাদ:

الناس দ্বারা মুমিন-কাফির সবাই উদ্দেশ্যঃ

যেসকল جمع এবং اسم جمع লামযুক্ত মা'রেফা (معرف باللام) হয়ে থাকে; যদি সেখানে عهد خارجى-এর সম্ভাবনা না থাকে তাহলে عموم ও ব্যাপকতার ফায়দা দিবে। এর প্রমাণ করে তিনটি বিষয়– (১) এ জাতীয় جمع ও اسم جمع থেকে استثناء করা বিশুদ্ধ আছে (যদি ব্যাপকতা না বুঝাত তাহলে استثناء করা বিশুদ্ধ হত না)। (২) ব্যাপক অর্থবহ শব্দাবলী দ্বারা তাকীদ আনা যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– فسجد الملائكة كلهم اجمعون (যদি এ জাতীয় جمع ব্যাপকতা না বুঝাত তাহলে ব্যাপক অর্থবহ শব্দাবলীর দ্বারা এগুলোর তাকীদ আনা সঠিক হত না)। (৩) এজাতীয় جمع -এর ব্যাপকতার দ্বারা দলীল পেশ করা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বহুল প্রচলিত একটি বিষয়। অতএব الناس (اسم جمع معرف باللام হওয়ার কারণে) এ আয়াত অবতীর্ণের সময় যারা ছিলেন তাদেরকে শব্দগতভাবে শামিল করে নিবে এবং যারা পরবর্তীতে

(কিয়ামত পর্যন্ত) আসতে থাকবে তাদেরকে এই শব্দটি অর্থগতভাবে শামিল রাখবে। কেননা, রাসূলের শরীয়ত থেকে মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, শরীয়তের সম্বোধন ও বিধানাবলীর দাবী উভয় দলকে শামিলকারী এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণিত। অবশ্য দলীল যেগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেয় (যেমন: নাবালেগ, পাগল; দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, এরা মুকাল্লাফ বা শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله والجموع و اسماء ها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد الخ

اكتب غرض المصنف بهذه العبارة

উত্তরঃ قوله والجموع و اسماء ها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে, جمع বা اسم جمع -এর শুরুতে যদি الف لام যুক্ত হয় তাহলে এই الف لام টি عموم و استغراق -এর ফায়দা দিবে; যদি সেখানে عهد خارجى -এর সম্ভাবনা না থাকে। এর স্বপক্ষে তিনি ৩টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।

১. جمع معرف باللام থেকে استثناء করা বিশুদ্ধ। আর এটা সবারই জানা যে, عام বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ থেকেই استثناء করা হয়। অতএব جمع معرف باللام থেকে যখন استثناء করা বিশুদ্ধ হয় তখন বুঝা গেল যে, جمع معرف باللام টি عموم -এর ফায়দা দেয়।

২. যেসকল শব্দ عموم -এর ফায়দা দেয় এগুলো দ্বারা جمع معرف باللام -এর তাকীদ আনা বৈধ আছে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– فسجد الملائكة كلهم اجمعون এখানে كل শব্দ দ্বারা ملائكة -এর তাকীদ আনা হয়েছে আর كل শব্দটি عموم -এর ফায়দা দে[illegible]। কাজেই বুঝা গেল যে, الملائكة শব্দের মধ্যে عموميت আছে।

৩. সাহাবায়ে কেরামও جمع معرف باللام দ্বারা عموم বুঝেছেন এবং এটা দ্বারা তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন খেলাফতের বিষয় নিয়ে যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল, তখন আনাসারী সাহাবীগণ বললেন, منا امير ومنكم امير "আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তোমাদের তথা মুহাজিরগণের মধ্য থেকে একজন আমীর নিযুক্ত হবেন"। তখন তাদের এ কথা প্রত্যাখ্যান করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এই হাদীসটি পাঠ করেছিলেন– الائمة من قريش "কুরায়েশ থেকেই সকল ইমাম নিযুক্ত হবেন" এখানে الائمة শব্দটি جمع معرف باللام এবং এর দ্বারা সকল খলীফা তথা عموم উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুসান্নিফ (র.) الناس শব্দ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটাও যেহেতু جمع معرف باللام তাই এটা عموم -এর ফায়দা দিবে। সুতরাং الناس দ্বারা কুরআন অবতীর্ণের সময় উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সবাই উদ্দেশ্য হবে। চাই কাফির হোক বা মুমিন হোক। الناس দ্বারা উপস্থিত লোকেরা উদ্দেশ্য হওয়া তো পরিস্কার। আর অনুপস্থিত লোকেরাও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন– حكمى على الواحد حكمى على الجماعة "একজনকে আমার আদেশ দেওয়া সকলকে আদেশ দেওয়ার নামান্তর"। বুঝা গেল, দ্বীনের সম্বোধন এবং বিধানসমূহের চাহিদা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে শামিল করে নেওয়া। তবে হ্যাঁ, শরীয়তের অন্য কোন দলীল কাউকে استثناء করলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। যেমন পাগল, নাবালক এরা শরীয়তের মুকাল্লাফ নয় কারণ, শরীয়ত তাদেরকে সম্বোধনের আওতাভুক্ত ধরেনি।

وَمَا رُوِىَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْحَسَنِ اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَزَلَ فِيْهِ "يَا اَيُّهَا النَّاسُ" فَمَكِّىٌّ وَ "يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" فَمَدَنِىٌّ اِنْ صَحَّ رَفْعُهُ فَلَايُوْجِبُ تَخْصِيْصَهُ بِالْكُفَّارِ وَلَا اَمْرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ فَاِنَّ الْمَامُوْرَ بِهِ هُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ بَدْوِ الْعِبَادَةِ وَالزِّيَادَةِ فِيْهَا وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا الْمَطْلُوْبُ مِنَ الْكُفَّارِ هُوَ الشُّرُوْعُ فِيْهَا بَعْدَ الْاِتْيَانِ بِمَا يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْاِقْرَارِ بِالصَّانِعِ فَاِنَّ مِنْ لَوَازِمِ وُجُوْبِ الشَّيْءِ وُجُوْبُ مَا لَا يَتِمُّ اِلَّا بِهِ وَكَمَا اَنَّ الْحَدَثَ لَا يَمْنَعُ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ فَالْكُفْرُ لَا يَمْنَعُ وُجُوْبَ الْعِبَادَةِ بَلْ يَجِبُ رَفْعُهُ وَالْاِشْتِغَالُ بِهَا عَقِيْبَهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِزْدِيَادُهُمْ وَثُبَاتُهُمْ عَلَيْهَا وَاِنَّمَا قَالَ رَبَّكُمْ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمُوْجِبَ لِلْعِبَادَةِ هُوَ التَّرْبِيَةُ۔

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরঃ

হযরত আলকামা ও হাসান বসরী (র.) থেকে যা বর্ণিত আছে– "যে আয়াতে يـا ايها النـاس এসেছে এটা মাক্কী আর যে আয়াতে يـا أيهـا الـذيـن أمنوا এসেছে এটা মাদানী" এ রেওয়ায়েতটির مـرفـوع হওয়ার বিশুদ্ধতা মেনে নিলেও এটা ইবাদতের হুকুমকে কাফিরদের সাথে বিশেষিত করে না। কেননা, এখানে مـامور به (আদিষ্ট বিষয়) ইবাদত আরম্ভ করা, বৃদ্ধি করা এবং এর উপর অটল থাকা এই তিনটি বিষয়ে মুশতারাক। তাই (أعبـدوا) এ আদেশ দ্বারা কাফিরদের থেকে চাওয়া হবে যে বিষয়ের উপর ইবাদত নির্ভরশীল তা প্রথমে পালন করার পর ইবাদত আরম্ভ করা। ইবাদত যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হল, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁকে স্বীকার করা। কেননা, বস্তুর প্রমাণিত হওয়ার জন্য সে যে বস্তু ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সেটাও প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। আর বে-উযু থাকা যেরকম নামাজের জন্য প্রতিবন্ধক নয় তদ্রূপ কুফরও ইবাদতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না; বরং (অন্তর থেকে) কুফর দূর করে ইবাদতে মুশগুল হওয়া আবাশ্যক হবে। আর মুমিনদেরকে ইবাদতের আদেশ দেয়ার অর্থ হল, ইবাদত আরো বেশী বেশী করা এবং তার উপর অটল ও অবিচল থাকা।

এখানে ربـكـم বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত হল تـربيت বা প্রতিপালন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله وما روى عن علقمة والحسن.........وثباتهم عليها
بين غرض القاضىّ بهذه العبارة

উত্তরঃ قوله وما روى عن علقمة والحسن.........وثباتهم عليها **: ইবারতের ব্যাখ্যা ঃ**

মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারতের দ্বারা দু'টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রথম প্রশ্নটি হল– পূর্বে বলা হয়েছে যে, يـا أيهـا النـاس اعبدوا এর দ্বারা সমস্ত মানুষ তথা কুরআন অবতীর্ণের সময় যারা উপস্থিত ছিল

এবং যারা উপস্থিত ছিল না; বরং ভবিষ্যতে আসবে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে; চাই কাফির বা মুমিন হোক। অথচ হযরত আলকামা ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যেসব আয়াতে يا أيها الناس দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো হল মাক্কী আর যেসব আয়াতে يا أيها الذين أمنوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো হল মাদানী"। এর দ্বারা বুঝা গেল, يا أيها الناس দ্বারা শুধু মক্কার কাফিরদেকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং মুসান্নিফ (র.) -এর দাবী এবং বর্ণিত রেওয়ায়েতের মাঝে পরস্পর বিরোধ দেখা দিল।

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ان صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار অর্থাৎ প্রথমতঃ আলকামা ও হাসন বসরীর (র.) রেওয়ায়েতটি যে مرفوع তা আমরা মেনে নিতে রাজি নই ; বরং এটা موقوف রেওয়ায়েত। দ্বিতীয়তঃ তাদের রেওয়ায়েতটিকে যদি مرفوع বলে মেনেও নেই তাহলে উত্তর হল, মাক্কী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এর দ্বারা শুধু কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; বরং তার অর্থ হল, মক্কার সমস্ত লোক এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; চাই কাফির বা মুমিন হোক।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল– কাফির ও মুমিন কাউকেই يا أيها الناس اعبدوا -এর مخاطب সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, ইবাদতের জন্য ঈমান শর্ত আর কুফর হল ইবাদতের প্রতিবন্ধক। আর কাফিদের মধ্যে ঈমান নেই; কুফর আছে। অতএব কুফর থাকাবস্থায় এবং ঈমান না থাকাবস্থায় কাফিররা ইবাদতের مامور (আদিষ্ট) হবে কিভাবে? আর মুমিনগণ তো এমনিতেই ইবাদত করছে কাজেই তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা تحصيل حاصل (অর্জিত বিষয়কে পুনরায় অর্জন করার আদেশ দেয়া) -এর সমতুল্য যা অসম্ভব ব্যাপার।

এর উত্তরে তিনি বলেন– ولا أمرهم بالعبادة فان المامور به هو المشترك الخ অর্থাৎ এখানে ইবাদত বিষয়টি যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাফিরদেরকে যখন ইবাদতের আদেশ করা হবে তখন তার অর্থ হবে– "তোমরা প্রথমে তোমাদের অন্তর থেকে কুফর মুছে ফেল অতঃপর ইবাদতে মাশগুল হয়ে যাও"। আর মুমিনদেরকে ইবাদতের আদেশ করার অর্থ হল– "তোমরা তোমাদের ইবাদতকে আরো বাড়াও এবং তার উপর অটল ও অবিচল থাকো"। সুতরাং يا أيها الناس اعبدوا এর مخاطب কাফির ও মুমিন উভয়কে সাব্যস্ত করা সম্ভব।

☆☆☆

﴿الَّذِىْ خَلَقَكُمْ﴾

"যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন"

صِفَةٌ جَرَتْ عَلَيْهِ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّعْلِيْلِ وَيَحْتَمِلُ التَّقْيِيْدَ وَالتَّوْضِيْحَ اِنْ خُصَّ الْخِطَابُ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَاُرِيْدَ بِالرَّبِّ اَعَمُّ مِنَ الرَّبِّ الْحَقِيْقِيِّ وَالْاٰلِهَةِ الَّتِىْ يُسَمُّوْنَهَا اَرْبَابًا وَالْخَلْقُ: اِيْجَادُ الشَّيْءِ عَلٰى تَقْدِيْرٍ وَاسْتِوَاءٍ وَاَصْلُهُ اَلتَّقْدِيْرُ يُقَالُ خَلَقَ النَّعْلَ اِذَا قَدَّرَهَا بِالْمِقْيَاسِ-

অনুবাদ:

علت الذى خلقكم এটা ربكم -এর সিফাত; এটাকে আনা হয়েছে রবের মর্যাদা প্রকাশের এবং বর্ণনা করার জন্য। এটা صفت مقيده و موضحه হওয়াও সম্ভব আছে; যদি শুধুমাত্র মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং রব দ্বারা প্রকৃত প্রভূ ও সেইসকল মা'বূদ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যাদেরকে তারা প্রভূ

বলে নামকরণ করতো। خـلـق (সৃষ্টি করা) -এর অর্থ হল, কোন জিনিসকে তার পরিমাণ মতো ঠিক ঠিকভাবে সৃষ্টি করা। আর তার মূল অর্থ হল, পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়– خـلـق الـنـعل "সে পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে জুতার মাপ নির্ধারণ করেছে"।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) اكتب وجوه الاعراب لقوله الذى خلقكم
(ب) ما معنى الخلق؟ اكتب على نهج القاضىؒ

উত্তরঃ

(الـذى خلقكم (صـلـه و موصوله মিলে) ربكم -এর صفت হয়েছে। এখন আলোচনা হল, صفت তো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে যেমন صـفـت مـادحـه۔ صفت مقيده এখানে কোন প্রকারের صـفـت উদ্দেশ্য?

এর উত্তর হল, যদি يـا أيهـا الـنـاس দ্বারা মুমিন ও মুশরিক উভয় দলকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে যেহেতু মুমিন ও মুশরিক উভয় দলের কাছে প্রকৃত প্রভূ বলতে একমাত্র আল্লাহ তা'লা তাই এ صفت টি صفت مادحه হবে। এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে প্রভূর প্রশংসা করার এবং তিনি কেন প্রভূ তার কারণ বর্ণনা করার জন্য। কেননা, নিয়ম আছে, কোন হুকুমকে وصف -এর সাথে যুক্ত করলে সেই وصف টি ঐ হুকুমের কারণ হয়। এখানেও আল্লাহ তা'লা ربـكم -এর সাথে الـذى خـلقكم এই وصف -কে জোড়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, এই وصفটি আল্লাহ তা'লার প্রভূত্বের কারণ।

আর যদি يـا أيها الناس দ্বারা শুধু মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে যেহেতু মুশরিকরা প্রকৃত প্রভূ তথা আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যান্য বাতিল মা'বূদকেও প্রভূ বলে স্বীকার করে তাই رب শব্দের মধ্যে তাদের বাতিল মা'বূদও শামিল হয়ে গেছে বিধায় এখন এই صـفـت টি رب -এর صـفـت مـقيده হবে।

☆☆☆

﴿وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে"

مُتَنَاوِلٌ كُلَّ مَا يَتَقَدَّمُ الْاِنْسَانَ بِالذَّاتِ أَوِ الزَّمَانِ مَنْصُوْبٌ مَعْطُوْفٌ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَنْصُوْبِ فِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجُمْلَةُ أُخْرِجَتْ مَخْرَجَ الْمُقَرِّرِ عِنْدَهُمْ اِمَّا لِاِعْتِرَافِهِمْ بِه كَمَا قَالَ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾ أَوْ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ بِه بِأَدْنٰى نَظْرٍ وَقُرِئَ "مَنْ قَبْلَكُمْ" عَلٰى اِقْحَامِ الْمَوْصُوْلِ الثَّانِىْ بَيْنَ الْاَوَّلِ وَصِلَتِه تَاكِيْدًا كَمَا اَقْحَمَ جَرِيْرٌ فِىْ قَوْلِه: "يَا تَيْمُ تَيْمُ عَدِيٍّ لَا اَبَا لَكُمَا' تَيْمَا الثَّانِىْ بَيْنَ الْاَوَّلِ وَمَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ۔

অনুবাদ:

ذاتا و زمانا এটা সেই সকল বস্তুকে শামিল করে নিয়েছে যেসব বস্তু উভয় والذين من قبلكم ক্ষেত্রে মানব জাতির উপর অগ্রগামী। এবং এটা خلقكم -এর (كم ضمير) -এর উপর معطوف হয়ে منصوب হয়েছে। এ বাক্য (তথা خلقكم والذين من قبلكم) -কে সম্বোধনকৃত লোকদের নিকট প্রমাণিত ও জ্ঞাত বিষয়ের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে; হয়তো তারা আল্লাহর صفت خلق -এর বিশ্বাসী হওয়ার কারণে যেমন আল্লাহ তা'লা (তাদের স্বীকারোক্তির বিবরণ দিতে গিয়ে) বলেন– ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله অথবা তারা সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা তা জেনে নেওয়া তাদের ক্ষমতার ভিতরে থাকার কারণে। আর (مِنْ -এর পরিবর্তে) مَنْ قَبْلَكُمْ পড়া হয়। এমতাবস্থায় من টি موصوله হবে যা صله و موصوله -এর মাঝে অতিরিক্ত আনা হয়েছে تاكيد সৃষ্টি করার জন্য। যেমন কবি জরীর তার উক্তি– يا تيم تيم عدى لا ابا لكما -এর মধ্যে تيم ثانى -কে تيم اول এবং তার مضاف اليه 'عدى' -এর মধ্যখানে অতিরিক্তি এনেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله متناول كل ما يتقدم الانسان بالذات أو الزمان الخ
شرح العبارة حق التشريح

উত্তরঃ ইবারতটির ব্যাখ্যার পূর্বে দু'টি ভূমিকা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি। ভূমিকা দু'টি নিম্নরূপ–

১ম ভূমিকাঃ تقدم (অগ্রতা) দু'প্রকার। (ক) تقدم ذاتى (সত্ত্বাগত অগ্রে হওয়া) (খ) تقدم زمانى (কাল হিসেবে অগ্রে হওয়া)।

تقدم ذاتى বলা হয় موخر টা مقدم -এর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া যদিও উভয়ের কাল এক হয়। যেমন: পিতা ও পুত্রের কাল এক হলেও পুত্র কিন্তু পিতার প্রতি মুখাপেক্ষী। কেননা, পিতা ছাড়া পুত্র হতে পারে না। তাই পিতা সত্ত্বাগতভাবে পুত্রের অগ্রে।

تقدم زمانى বলা হয় مقدم ও موخر উভয়টি একত্র হওয়া অসম্ভব। যেমন: আমাদের সলফে সালেহীনের অগ্রবর্তীতা আমাদের উপর।

২য় ভূমিকাঃ কোন শব্দ বা বাক্যকে কেবল সেই সময় صفت বানানো বিশুদ্ধ হবে যখন পূর্ব থেকে ঐ সিফাত সম্পর্কে জানা থাকবে। আর পূর্ব থেকে জানা না থাকলে সেই শব্দ বা বাক্যকে خبر বানাবে। যেমন زيد العالم (জ্ঞানী যায়েদ) এটা তখনই বলা যাবে যখন পূর্ব থেকে যায়েদের জ্ঞানী হওয়ার ইলম থাকবে। আর পূর্ব থেকে জানা না থাকলে خبر বানিয়ে زيد عالم (যায়েদ জ্ঞানী) বলবে।

এবার মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারতের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি এ ইবারতে তিনটি আলোচনা করেছেন। الذين من قبلكم -এর মেসদাক, তারকীব, الذى خلقكم অংশটি صفت হওয়ার উপর একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর এবং من قبلكم -এর কেরাত।

☆ প্রথম আলোচনার সারাংশ হল– الذين من قبلكم -এর মেসদাক মক্কার কাফিরদের কেবল বাপ-দাদারা অথবা শুধু মানবজাতিই নয়; বরং যেসকল বস্তু সত্তাগত ও কালগত তাদের থেকে অগ্রে; চাই মানুষ, জন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত এমনকি লওহ্-কলম, আরশ-কুরসি যাই হোক, সবই الذين من

قَـبـــلـــكـــم -এর মেসদাক। এখন প্রশ্ন হল, এর মেসদাক যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন এবং জীব ও জড়পদার্থও হয়ে থাকে তাহলে এখানে الـذيـن ব্যবহার করা হল কেন? এটা তো শুধু ذوى الـعـقـول (জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীর) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এর উত্তর হল, এখানে ذوى العقول -কে غير ذوى العقول -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে ذوى العقول -এর জন্য নির্ধারিত শব্দ তথা الذين -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

☆ দ্বিতীয় আলোচনার সারাংশ হল– পূর্বে বলা হয়েছে যে, الـذى خـلـقكـم এ অংশটি ربـكـم -এর সিফাত হয়েছে। অথচ এটাকে ربـكـم -এর সিফাত সাব্যস্ত করা সঠিক হচ্ছে না কেননা, কেবল সেই শব্দ বা বাক্য সিফাত হতে পারে যার সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানা থাকে। আর الـذى خـلـقـكـم। সম্পর্কে তো মোখাতবদের পূর্ব থেকে কোন জ্ঞানই নেই। কেননা, কাফিররাও এর মোখাতব আর তারা আল্লাহর صفت خلق সম্পর্কে অজ্ঞ।

কাযী বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আপনি যে বলেছেন, কাফিররা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না এটা ভুল কথা। কেননা, তারাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জানতো ও মানতো। যেমন পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– ولـئـن سـألتهـم مـن خـلـقهـم ليقولن الـلـه "আপনি যদি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ"। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সিফাত হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆ তৃতীয় আলোচনা : مـن قبلكم -এর কেরাত। এর সারাংশ হল, প্রসিদ্ধ কেরাত হচ্ছে مِنْ قبلكم (مـن حـرف جار -এর সাথে) আর দ্বিতীয় আরেকটি কেরাত হল, مَنْ قبـلكم (مَنْ اسـم موصول -এর সাথে)। এখন প্রশ্ন হল, যদি قبلكم -কে مِنْ -এর صله ধরা হয় তাহলে তার পূর্বের الذين -এর তো কোন صله থাকবে না আর যদি قبلكم -কে الذين -এর صله ধরা হয় তাহলে من -এর صله কৈ?

কাযী বায়যাবী (র.) এ সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, قبلكم এটা الذين -এর صله আর من টি হল অতিরিক্ত এটাকে আনা হয়েছে শুধু তাকীদ সৃষ্টি করার জন্যে। অতএব مـــن যখন অতিরিক্ত হল তখন তার صـــلــــه -এর কোন প্রয়োজন নেই। যেমন প্রসিদ্ধ কবি জরীর তার কবিতায় এরকম অতিরিক্ত ব্যবহার করেছে। পূর্ণ কবিতা হল, يـا تيم تيم عدى لا ابالكم ☆ لا يلقينكم فى سوءة عمر কবিতার অর্থ : হে আদীর বংশধর তাইমগণ! তোমরা কোন ভদ্র লোকের সন্তান নও। তোমাদেরকে যেন ওমর দূর্দশায় না ফেলে।

কবি জরীর এ কবিতাটি তখন বলেছিল, যখন ওমর তাইমী তার দুর্ণাম করতে চেয়েছিল। তখন জরীর ওমর তাইমীর লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, হে তাইমীগণ! তোমরা ওমরকে আমার দুর্ণাম করতে নিষেধ করো, সে যেন আমার দুর্ণাম না করে আমার মুখ খুলতে আমাকে বাধ্য না করে অন্যথায় যদি আমার মুখ খুলে যায় তাহলে তোমরা সবাই বিপদে পড়ে যাবে। এ কবিতার মধ্যে কবি দ্বিতীয় تـيـم শব্দকে অতিরিক্তি এনেছে।

☆☆☆

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার"

حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْ اُعْبُدُوْا كَاَنَّهُ قَالَ: اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ رَاجِيْنَ اَنْ تَنْخَرِطُوْا فِيْ سِلْكِ الْمُتَّقِيْنَ الْفَائِزِيْنَ بِالْهُدٰى وَالْفَلَاحِ الْمُسْتَوْجَبِيْنَ لِجِوَارِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَبَّهَ بِهِ عَلٰى اَنَّ التَّقْوٰى مُنْتَهٰى دَرَجَاتِ السَّالِكِيْنَ وَهُوَ التَّبَرُّوُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنَّ الْعَابِدَ يَنْبَغِيْ اَنْ لَايَغْتَرَّ بِعِبَادَتِه وَيَكُوْنُ ذَاخَوْفٍ وَرَجَاءٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ﴾ اَوْ مِنْ مَفْعُوْلِ خَلَقَكُمْ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ عَلٰى مَعْنٰى اَنَّهٗ خَلَقَكُمْ وَمَنْ قَبْلَكُمْ فِيْ صُوْرَةِ مَنْ يُرْجٰى مِنْهُ التَّقْوٰى لِتَرَجُّحِ اَمْرِه بِاِجْتِمَاعِ اَسْبَابِه وَكَثْرَةِ الدَّوَاعِيْ اِلَيْهِ وَغُلِّبَ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلَى الْغَائِبِيْنَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى عَلٰى اِرَادَتِهِمْ جَمِيْعًا وَقِيْلَ تَعْلِيْلٌ لِلْخَلْقِ اَيْ خَلَقَكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوْا كَمَا قَالَ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَانَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾ وَهُوَ ضَعِيْفٌ اِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِي اللُّغَةِ مِثْلُهٗ۔

অনুবাদ:

لعلكم تتقون (-এর মধ্যে তারকীবের দিক থেকে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে) (১) হয়তো এটা اعبدوا -এর ضمير থেকে حال হয়েছে। (আর لعل যেহেতু ترجى আশাব্যঞ্জক শব্দ তাই) যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন– "তোমরা এই আশায় স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো যাতে সেইসব মুত্তাকীদের দলে দলভুক্ত হতে পারো যারা হেদায়েত ও সফলতায় সফলকাম হয়েছে এবং আল্লাহর নৈকট্যতা লাভ করেছে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লা সেই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সালিকীনদের শেষ স্তর হল তাকওয়া-পরহেযগারী। আর তাকওয়া হল, আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তু থেকে বিমুখ হওয়া। সাথে সাথে এরও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইবাদতকারীর উচিত হল, সে যেন তার ইবাদতের কারণে প্রতারিত না হয়; বরং তার উচিত হল, সে যেন ভীত ও আশাবদী থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা বলেন– يدعون ربهم خوفا وطمعا ويرجون رحمته ويخافون عذابه "তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে, আশা রাখে তাঁর রহমতের এবং ভয় পায় তাঁর শাস্তিকে"। অথবা (২) لعلكم تتقون এটা خلقكم -এর مفعول এবং তার معطوف عله তথা والذين من قبلكم উভয় থেকে حال । এমতাবস্থায় অর্থ হবে, "আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সেই ব্যক্তির আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যার থেকে তাকওয়ার আশা করা যায়। (এ তারকীবের সূরতে ذوالحال -এর মধ্যে مخاطب ও غائب উভয় শামিল; কিন্তু حال বর্ণনার সময়) مخاطبين -কে غائبين -এর উপর শাব্দিকভাবে প্রাধান্য দিয়ে لعلكم تتقون

বলেছেন; তবে অর্থের ক্ষেত্রে مخاطبين এবং غائبين সবাই উদ্দেশ্য। (৩) কেউ কেউ বলেন, لعلكم تتقون এটা خلق -এর علت ও উদ্দেশ্য বর্ণনার্থে এসেছে। অর্থ হল, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও''। যেমন অন্য আয়াতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ''আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য''। এ তৃতীয় অভিমতটি দুর্বল। কেননা, অভিধানে لعل টি كى (কারণ বর্ণনা করার) কোন দৃষ্টান্ত নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فى أى محل وقع قوله تعالى لعلكم تتقون ؟

উত্তর : لعلكم تتقون এ অংশটি তারকীবের মধ্যে حال হয়েছে। তার ذوالحال কি এবিষয়ে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত اعبدوا -এর ضمير হবে তার ذوالحال অথবা خلقكم -এর كم ضمير مفعول হবে তার ذوالحال

প্রথম সূরতে অর্থ হবে– ''তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত করো এই আশায় যে, যাতে তোমরা মুত্তাকী বনতে পারো।'' তখন لعلكم تتقون দ্বারা দু'টি কথার দিকে ইঙ্গিত করা হবে। প্রথমতঃ সালিকীন বা আধ্যাত্মিকগণের শেষ স্তর হল তাকওয়া তথা দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ হওয়া। কেননা, এ স্তরের উপরে যদি আরো কোন স্তর থাকতো তাহলে অবশ্যই সে স্তরটিও বলে দিতেন। দ্বিতীয়তঃ ইবাদতকারীদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ইবাদতের কারণে প্রতারিত হবে না অর্থাৎ এ কথা মনে করবে না যে, আমরা তো ইবাদত করে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি; বরং সর্বদা ভয় ও আশার মাঝামাঝি স্তরে অবস্থান করবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করবে এবং তাঁর রহমতেরও আশা রাখবে।

আর দ্বিতীয় সূরতে অর্থ হবে– ''তিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায় যে, তখন তোমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে তাকওয়ার আশা করা হবে। এ তারকীবের সূরতে ذوالحال -এর মধ্যে مخاطب ও غائب উভয় শামিল; কিন্তু حال বর্ণনার সময় مخاطبين -কে غائبين -এর উপর শাব্দিকভাবে প্রাধান্য দিয়ে لعلكم تتقون বলেছেন; তবে অর্থের ক্ষেত্রে مخاطبين এবং غائبين সবাই উদ্দেশ্য।

☆☆☆

وَالْاٰيَةُ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الطَّرِيْقَ اِلٰى مَعْرِفَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعِلْمَ بِوَحْدَانِيَّةٍ وَاسْتِحْقَاقَهٗ لِلْعِبَادَةِ وَالنَّظَرَ فِيْ صَنْعَةٍ وَالْاِسْتِدْلَالَ بِاَفْعَالِهٖ وَاَنَّ الْعَبْدَ لَايَسْتَحِقُّ بِعِبَادَةٍ عَلَيْهِ ثَوَابًا فَاِنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ شُكْرًا لِمَا عَدَّدَهٗ مِنَ النِّعَمِ السَّابِقَةِ فَهُوَ كَاَجِيْرٍ اَخَذَ الْاَجْرَ قَبْلَ الْعَمَلِ۔

অনুবাদ:

আয়াত থেকে অর্জিত বিষয়

(يا أيها الناس اعبدوا.......لعلكم تتقون) এ আয়াতটি সে কথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, মহান আল্লাহ তা'লার পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর ইবাদতের যোগ্য হওয়ার জ্ঞান অর্জনের পন্থা হল তাঁর আশ্চর্যময় সৃজনের উপর গবেষণা এবং তাঁর কর্মসমূহ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা। এবং একথার প্রতিও ইঙ্গিত করছে যে, বান্দা তার ইবাদতের কারণে ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয় না। কেননা, বান্দার উপর তো ইবাদত ওয়াজিব হয়েছে তাঁর সেই পূর্ববর্তী নিয়ামত ও অনুকম্পার শুকরিয়া হিসাবে যেগুলোকে তিনি এই আয়াতসমূহে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বান্দা সেই শ্রমিকের ন্যায় হয়ে গেল যে তার শ্রমের পূর্বে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নেয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله والاية تدل على ان الطريق الخ : এটা يا أيها الناس اعبدوا.......لعلكم تتقون আয়াত থেকে অর্জিত বিষয়ের আলোচনা। অর্থাৎ এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় অর্জিত হয়েছে। প্রথমটি হল, মহান আল্লাহ তা'লার পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর ইবাদতের যোগ্য হওয়ার জ্ঞান অর্জনের পন্থা হল তাঁর আশ্চর্যময় সৃজনের উপর গবেষণা এবং তাঁর কর্মসমূহ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা। কেননা, এখানে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ করা হয়েছে। আর কেউই আল্লাহর পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ ও তিনি যে ইবাদতের উপযুক্ত সে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তাঁর ইবাদত করতে পারবে না। দ্বিতীয়টি হল, বান্দা তার ইবাদতের কারণে ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয় না। কেননা, বান্দাকে ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তাকে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে– يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم............الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء مـــاء এই আয়াতগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'লা বান্দাকে ইবাদতের আদেশ দেয়ার পূর্বে তাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং সে তো ইবাদতের পূর্বে ইবাদতের প্রতিদান পেয়ে গেছে তাই এখন যে ইবাদত করবে তার সেই ইবাদতের প্রতিদান পাওয়ার আর যোগ্য রইল না। হ্যাঁ প্রতিদান পাইলে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ হবে; তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে নয়। যেরকম একজন শ্রমিক তার শ্রমের পূর্বে পারিশ্রমিক নিয়ে নিলে পরে সে তার শ্রমের পারিশ্রমিক চাইতে পারবে না এবং তার উপযুক্ত হবে না। তবে মালিকের পক্ষ থেকে দেয়া হলে সেটা হবে মালিকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ মাত্র। তদ্রূপ বান্দাকে তার শ্রম তথা ইবাদতের পূর্বেই ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই সে আর ইবাদতের কারণে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য নয়; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান দেয়া হলে সেটা হবে অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র।

﴿الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا﴾

"যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা স্বরূপ"

صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَدْحٌ مَنْصُوْبٌ أَوْ مَرْفُوْعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا﴾ وَ 'جَعَلَ' مِنَ الْاَفْعَالِ الْعَامَّةِ يَجِئُ عَلٰى ثَلٰثَةِ أَوْجُهٍ : بِمَعْنٰى صَارَ وَ طَفِقَ. فَلَا يَتَعَدّٰى كَقَوْلِه شِعْرٌ۔ فَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوْصُ بَنِىْ سُهَيْلٍ☆ مِنَ الْاَكْوَارِ مُرْتَعُهَا قَرِيْبٌ

وَبِمَعْنٰى أَوْجَدَ فَيَتَعَدّٰى اِلٰى مَفْعُوْلٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِه تَعَالٰى : ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ﴾ وَبِمَعْنٰى صَيَّرَ فَيَتَعَدّٰى اِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ كَقَوْلِه ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا﴾ وَالتَّصْيِيْرُ يَكُوْنُ بِالْفِعْلِ تَارَةً وَالْعَقْدِ أُخْرٰى وَمَعْنٰى جَعَلَهَا فِرَاشًا اَنْ جَعَلَ بَعْضَ جَوَانِبِهَا بَارِزًا عَنِ الْمَاءِ مَعَ مَا فِىْ طَبْعِه مِنَ الْاِحَاطَةِ بِهَا وَصَيَّرَهَا تَوَسُّطَةً بَيْنَ الصَّلَابَةِ وَاللَّطَافَةِ حَتّٰى صَارَتْ مُهَيَّاةً لِاَنْ يَقْعُدُوْا وَيَنَامُوْا عَلَيْهَا كَالْفِرَاشِ الْمَبْسُوْطِ وَذَالِكَ لَايَسْتَدْعِىْ كَوْنَهَا مُسَطَّحَةً لِاَنَّ كُرِّيَّةَ شَكْلِهَا مَعَ عَظْمِ حَجْمِهَا وَاتِّسَاعِ جِرْمِهَا لَايَأْبَى الْاِفْتِرَاشُ عَلَيْهَا كَالْجَبَلِ۔

অনুবাদ:____

তারকীব

الذى جعل لكم الارض فراشا এ অংশটুকু ربكم-এর দ্বিতীয় صفت অথবা مدح منصوب অথবা مرفوع অথবা এটা مبتدا আর فلا تجعلوا لله اندادا হল خبر।

جعل-এর তাহকীক ঃ جعل এটা افعال عامه-এর মধ্য থেকে। এটা তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. صار و طفق-এর অর্থে আর তখন এটা متعدى হবে না। যেমন কবির উক্তি— فقد جعلت قلوص بنى سهيل☆ من الاكوار مرتعها قريب (কবিতার অর্থ : নিশ্চয় বনি সুহায়েল গোত্রের শক্তিশালী উষ্ট্রির চারনভূমি পালানের নিকটবর্তী হয়ে গেল)। ২. أوجد-এর অর্থে। আর তখন এটা এক مفعول-এর দিকে متعدى হয় যেমন: وجعل الظلمات والنور ৩. صير-এর অর্থে। তখন এটা দুই مفعول-এর দিকে متعدى হয় যেমন: وجعل لكم الارض فراشا। আর تصيير কখনো فعل কর্ম দ্বারা হয় আবার কখানো قول اعتقاد কথা ও বিশ্বাসের দ্বারা হয়।

ভূমিকে বিছানা বানানোর অর্থ হল, পানির স্বভাবের মধ্যে ভুমিকে পরিবেষ্টন করার বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ভুমির কিছু অংশকে পানি থেকে আলাদা করে এরূপ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তার অংশটি একেবারেই শক্তও নয় আবার একেবারেই নরমও নয়। অবশেষে ভূমিটি মানুষের চলার এবং শোয়ার উপযুগী হয়ে গেল। যেরকম বিছানো বিছানা শোয়ার উপযুগী হয়।

এ আয়াতটি ভূমির সমতল হওয়া নির্দেশ করেনি। কেননা, ভূমির গুলাকৃতি হওয়া তার

উপরিভাগ ব্যপ্তি হওয়া সত্ত্বেও তার উপর বসার পরিপন্থী নয়। যেরকম পাহাড় সমতল না হওয়া সত্ত্বেও সেটা প্রশস্ত হওয়ার কারণে তার উপর শোয়া এবং বসা সম্ভব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

الذى جعل لكم الارض এ অংশের চারটি তারকীব করা হয়েছে।

(ক) الذى جعل لكم الارض অংশটি صله و موصوله মিলে ربكم -এর صفت ثانى ।

(খ) امدح فعل محذوف -এর مفعول به হয়ে منصوب ।

(গ) مبتدا محذوف -এর خبر হয়ে مرفوع ।

(ঘ) فلا تجعلوا لله اندادا আর مبتدا তার خبر ।

قوله وجعل من الافعال العامة الخ : এখান থেকে جعل ফে'লের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। جعل এটা كون ـ ثبوت প্রভৃতির ন্যায় فعل عام । এটা তিনটি অর্থে আসে। যথা–

(১) صار অথবা طفق -এর অর্থে। তখন এটা متعدى হবে না। যেমন কবির কবিতা :

فقد جعلت قلوص بنى سهيل ☆ من الاكوار مرتعها قريب

কবিতার অর্থ : নিশ্চয় বনি সুহায়েল গোত্রের শক্তিশালী উষ্ট্রির চারনভূমি পালানের নিকটবর্তী হয়ে গেল।

محل استشهاد : এখানে جعلت ফে'লটি صار অথবা طفق -এর অর্থে ব্যবহৃত।

(২) أوجد (সৃষ্টি করা) -এর অর্থে। আর তখন এটা এক مفعول -এর দিকে متعدى হয়। যেমন: وجعل الظلمات والنور

(৩) صير (বানানো) -এর অর্থে। তখন এটা দুই مفعول -এর দিকে متعدى হয় যেমন: وجعل لكم الارض فراشا "তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন।" আর এ تصيير (বানানো) কখনো কর্ম দ্বারা হয়। যেমন এই উদাহরণে কর্মের মাধ্যমে বানানো পাওয়া গেছে। আর কখনো কথা ও বিশ্বাসের দ্বারা যেমন : جعلوا الملئكة اناثا "তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) ফেরেশতাগণকে মহিলা বানিয়েছে"। অর্থাৎ তারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করে। এখানে ফেরেশেতাগনকে মহিলা সাব্যস্ত করা হয়েছে বিশ্বাস ও কথার মাধ্যমে; কর্মের মাধ্যমে নয়।

জমিন গোল না চেপ্টা : এ আয়াতে فراش শব্দ দ্বারা জমিনের গোল হওয়া কিংবা সমতল হওয়া জরুরী হয় না। আর এ فراش হওয়াটা ঐগুলো থেকে কোনটির বিপরীত নয়। জমিন فراش -এর রূপে হওয়া আর এর উপর উঠা, বসা, শোয়া উক্ত দু'টি রূপে সাধন হতে পারে। যে পৃষ্ঠের পুরত্ব অনেক ছোট হয়, ওটার فراش মুশকিলের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন বিরাট আকারের পৃষ্ঠ হয় তখন এর উপর অগণিত সৃষ্টি সুবিধা মতো থাকতে পারে। এ জমিন মূলতঃ গোল বানানো হয়েছিল, কিন্তু বোঝা-চাপা ও জলোচ্ছাসের আকস্মিক ঘটনাবলীর কারণে জমিনের মধ্যে উঁচুতা ও নীচুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং প্রকৃত গোল আকৃতি স্ব অবস্থায় রয়নি।

পৃথিবীর বিস্তৃতি : পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুমান নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা করা যেতে পারে। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস হলো ১২৭৫২ কিঃ মিঃ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৭০৯ কিঃ মিঃ। এর আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ২০লক্ষ বর্গমাইল বা ৪৯৭২৬০৮০০ বর্গ কিঃ। এর পরিধি হলো ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস এত বিশাল হওয়ায় দর্শকের নজরে তা সমতল অনুভব হয়। একারণেই পৃথিবীকে গোল এবং সমতল উভয় বলা যেতে পারে।

﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾

"আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদরূপে"

قُبَّةٌ مَضْرُوْبَةٌ عَلَيْكُمْ وَالسَّمَاءَ اِسْمُ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ كَالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقِيْلَ جَمْعُ سَمَاءَةٍ وَالْبِنَاءُ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَبْنِى بَيْتًا كَانَ أَوْ قُبَّةَ خِبَاءٍ وَمِنْهُ بَنٰى عَلٰى اِمْرَأَتِه لِأَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا تَزَوَّجُوْا ضَرَبُوْا عَلَيْهَا خِبَاءً جَدِيْدًا-

অনুবাদ:

এবং আকাশকে তোমাদের উপর স্থীরকৃত গম্বুজ স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। السماء এটা اسم جنس এক ও একাধিকের উপর তার প্রয়োগ হয়। যেমন دينار و درهم (এ উভয়টিও اسم جنس এবং এক ও একাধিকের উপর প্রয়োগ হয়)। কেউ কেউ বলেন, سماء এটা سماءة -এর বহুবচন।

بناء এটা মূলত মাসদার। নির্মিত বস্তুকে بناء বলা হয়; চাই সেটা বাড়ি অথবা গম্বুজ কিংবা তাবু হোক। আর তা থেকেই بنى على امرأته (সে প্রথম রাতে তার স্ত্রীর নিকট গেল) নির্গত হয়েছে। কেননা, আরবের লোকেরা বিবাহ-শাদি করলে স্ত্রীর জন্য নতুন তাবু তৈরী করে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

بناء : এটা فعال -এর ওযনে اسم مفعول -এর অর্থে। যেমন مهاد বমা'না ممهود এবং بساط বমা'না مبسوط। অতএব بناء টি مبنى তথা নির্মিত -এ অর্থে ব্যবহৃত। চাই সেটা বাড়ি, গম্বুজ কিংবা তাবু হোক। এখানে بناء দ্বারা গম্বুজ উদ্দেশ্য। কেননা, আকাশও গম্বুজের ন্যায় গোল। আর এজন্যই কাযী বায়যাবী (র.) গম্বুজ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করেছেন।

سماء : এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত বর্ণনা করেছেন। (১) এটা اسم جنس তথা قليل و كثير উভয়টির জন্য ব্যবহার হয়। (২) এটা سماءة -এর বহুবচন। আয়াতের মধ্যে سماء দ্বারা একাধিক আকাশ উদ্দেশ্য।

আকাশ আল্লাহ তা'লার বড় একটি নেয়ামত : যদি আকাশ না থাকতো তাহলে চন্দ্র-সূর্য, সিতারা কোথায় উদিত হতো এবং কোথায় অস্তমিত হতো; ফল-ফসলাদিতে পোক্ততা কেমন করে আসতো এবং মিষ্টতা কিভাবে সৃষ্টি হতো? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মন্তব্য হল, যদি কয়েক দিনের জন্য সূর্য উদয় হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থমকে যাবে; তরল বস্তু বরফে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সূর্য অস্ত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

☆☆☆

﴿وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾

''এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অনন্তর তা দ্বারা তেমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদন করেন''

عَطْفٌ عَلٰى جَعَلَ وَخُرُوْجُ الثِّمَارِ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ وَمَشْيَتِهٖ وَلٰكِنْ جَعَلَ الْمَاءَ الْمَمْزُوْجَ بِالتُّرَابِ سَبَبًا فِيْ اِخْرَاجِهَا وَمَادَّةً لَهَا كَالنُّطْفَةِ لِلْحَيَوَانِ بِأَنْ أَجْرٰى عَادَتَهٗ بِاِفَاضَةِ صُوَرِهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ الْمُمْتَزَجَةِ مِنْهَا أَوْ اَبْدَعَ فِي الْمَاءِ قُوَّةً فَاعِلَةً وَفِي الْاَرْضِ قُوَّةً قَابِلَةً يَتَوَلَّدُ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا اَنْوَاعُ الثِّمَارِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُوْجِدَ الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا بِلَا اَسْبَابٍ وَمَوَادٍّ كَمَا اَبْدَعَ نُفُوْسَ الْاَسْبَابِ وَالْمَوَادِّ وَلٰكِنْ لَهٗ فِيْ اِنْشَاءِهَا مُدْرِجًا مِنْ حَالٍ اِلٰى حَالٍ صَنَائِعَ وَحِكَمًا يُجَدِّدُ فِيْهَا لِاُوْلِي الْاَبْصَارِ عِبَرًا وَسُكُوْنًا اِلٰى عَظِيْمِ قُدْرَتِهٖ لَيْسَ ذَالِكَ فِيْ اِيْجَادِهَا دَفْعَةً ـ

অনুবাদ:

وانزل من السماء ماء الخ এবাক্যটি جعل -এর উপর معطوف । আল্লাহ তা'লার কুদরত ও তাঁর ইচ্ছায় ফল-মূল উৎপাদিত হয়। কিন্তু তিনি মাটির সাথে মিশ্রিত পানিকে ফসল উৎপাদনের সবব ও উপাদান বানিয়েছেন। যেরকম বীর্জকে প্রাণীর সবব ও উপাদান বানিয়েছেন। সবব ও উপাদান এভাবে বানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'লা পানি এবং মাটি মিশ্রিত উপাদানের উপর ফল-মূলের আকৃতি ও গঠন সৃষ্টি করার আদত জারি করে দিয়েছেন। অথবা পানির মধ্যে قوت فاعله (প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা) এবং জমিনের মধ্যে قوت قابله (আছর গ্রহণ করার ক্ষমতা) সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উভয় শক্তির সমাবেশ ঘটলে পরে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদিত হয়। মহান আল্লাহ তা'লা তো সকল বস্তুকে সূত্র ও উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন যেরকম মূল উপাদানকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উপাদান ও সূত্রের মাধ্যমে সৃজনের মধ্যে বস্তুসমূহ ধীরে ধীরে অস্তিত্ব লাভ করে। তাছাড়া এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বস্তুসমূহকে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহ তা'লার বিভিন্ন রকমের কারুকার্যতা ও রহস্যাবলী প্রকাশ পায়; যাতে বিবেকবানদের জন্য উপদেশবলী এবং তাঁর মহান কুদরতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেন। একবারে সৃষ্টি করার মধ্যে এ উপকারিতা নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

আল্লাহ চাইলে সর্বকিছুকে উপাদান ও মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করতে পারেন

এখানে প্রশ্ন হল আল্লাহ তা'লা তো সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। তাই তিনি চাইলে পানি এবং মাটি ছাড়া ফল-মূল উৎপাদন করতে পারতেন; কিন্তু এরকম না করে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তারপর ঐ বৃষ্টির পানি মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে জমিন থেকে ফল উৎপাদন করেন। এর রহস্য কি?

উত্তর : অবশ্যই উপাদান ব্যতীত তিনি ফল-মূল উৎপাদন করতে পারতেন এটা তাঁর ক্ষমতার ভিতরে। কিন্তু তাঁর আদত কিন্তু এরকম নয়। বরং তাঁর আদত হল পানি এবং মাটি মিশ্রিত হয়ে যে উপাদান সৃষ্টি হয় এর মধ্যে ফল-মূলের আকার-আকৃতি সৃষ্টি করে দেন অর্থাৎ ফল-মূলের আকৃতি

সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তা'লা। তবে তাঁর আদত হল এটাকে উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করেন না; বরং পানি ও মাটি মিশ্রিত হয়ে যে উপাদান তৈরী হয় সেই উপাদানের মধ্যে আল্লাহ তা'লা ফল-মূলের আকৃতি সৃষ্টি করে দেন। এর দ্বারা তাঁর কারুকার্যতা ও রহস্যাবলী প্রকাশ পায় সাথে সাথে তাতে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। একবারে সৃষ্টি করার মধ্যে এ উপকারীতা নেই।

☆☆☆

وَمِنِ الْاُوْلٰى لِلْاِبْتِدَاءِ سَوَاءٌ اُرِيْدَ بِالسَّمَاءِ اَلسَّحَابُ فَاِنَّ مَا عَلَاكَ سَمَاءٌ اَوِ الْفَلَكُ فَاِنَّ الْمَطَرَ يَبْتَدِئُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى السَّحَابِ وَمِنْهُ اِلَى الْاَرْضِ عَلٰى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الظَّوَاهِرُ اَوْ مِنْ اَسْبَابٍ سَمَاوِيَّةٍ تُثِيْرُ الْاَجْزَاءَ الرُّطَبِيَّةَ مِنْ أَعْمَاقِ الْاَرْضِ اِلٰى جَوِّ الْهَوَاءِ فَيَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا وَمِنِ الثَّانِيَةُ لِلتَّبْعِيْضِ بِدَلِيْلِ قَوْلِه تَعَالٰى ﴿فَأَخْرَجْنَا بِه ثَمَرَاتٍ﴾ وَاكْتِنَافُ النَّكِرَتَيْنِ لَهُ أَعْنِيْ مَاءً وَرِزْقًا كَأَنَّهُ قَالَ : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بَعْضَ الْمَاءِ أَخْرَجْنَا بِه بَعْضَ الثَّمَرَاتِ لِيَكُوْنَ بَعْضُ رِزْقِكُمْ وَهٰكَذَا الْوَاقِعُ اِذْ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءُ كُلُّهُ وَلَا اَخْرَجَ بِالْمَطَرِ كُلَّ الثِّمَارِ وَلَا جَعَلَ كُلَّ الْمَرْزُوْقِ ثِمَارًا أَوْ لِلتَّبْيِيْنِ وَرِزْقًا مَفْعُوْلٌ بِه بِمَعْنَى الْمَرْزُوْقِ كَقَوْلِكَ : أَنْفَقْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَلْفًا۔

অনুবাদ:______________________

من السماء -এর মধ্যে من টি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

প্রথম من (অর্থাৎ من السماء -এর من) টি হল ابتدائيه চাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেওয়া হোক। কেননা, তোমার উপরে যা কিছু আছে সবই হল سماء অথবা আকাশ উদ্দেশ্য নেওয়া হোক। কেননা, বৃষ্টি প্রথমে আকাশ থেকে মেঘমালায় অবতরণ করে আর সেখান থেকে জমিনে। যেরকম ظاهرى نصوص দ্বারা তাই বুঝে আসে। অথবা আসমানী সেইসকল সূত্র থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যে সূত্রগুলো ভূগর্ভ থেকে তরল পদার্থসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে একেবারে বাতাসের ভিতরে নিয়ে যায় অতঃপর সেই তরল পদার্থগুলো মেঘমালায় রুপান্তরিত হয়ে তা থেকে বারি বর্ষণ হয়।

আর দ্বিতীয় من (অর্থাৎ من الثمرات -এর من) টি হল تبعيضيه -এর জন্য। আল্লাহ তা'লার বাণী তার সমর্থন করে। যেমন: فأخرجنا به ثمرات এবং তার দুই পার্শ্বে আছে দু'টি نكره তথা ماء এবং رزقا । আল্লাহ তা'লা যেন এরকম বলেছেন– "আমি আকাশ থেকে কিছু পানি অবতরণ করিয়েছি অতঃপর তা থেকে কিছু ফল উৎপাদন করেছি যাতে এটা তোমাদের সামান্য জীবিকা হয়। আর বাস্তবও তাই। কেননা, আল্লাহ তা'লা সম্পূর্ণ পানি বর্ষণ করেননি এবং বৃষ্টি থেকে পূর্ণ ফল-মূলও সৃষ্টি করেননি এবং ফলকে গোটা রিযিকও বানান নি। অথবা দ্বিতীয় من টি بيانيه এবং رزقا হল اخرجنا -এর مفعول । যেমন তোমার উক্তি: أنفقت من الدراهم ألفا

السوال: قوله تعالى: وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
"من" الاولى والثانية لاى معنى؟ اكتب على نهج القاضىؒ

উত্তর : من السماء -এর من হল من ابتدائيه চাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেয়া হোক। কেননা, سماء -এর আভিধানিক অর্থ হল كل ما علاك তথা উর্ধ্বলোক। আর মেঘমালাও যেহেতু উপরেই অবস্থিত তাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেয়া যাবে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে–"আমি মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।" অথবা سماء দ্বারা আকাশ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে– "আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।" অথচ এটা যাহিরের খেলাফ। কেননা, বাহ্যত বৃষ্টি মেঘমালা থেকেই অবতরণ করে। তাই মুসান্নিফ (র.) এর দু'টি তাবীল করেছেন। যথা–

১. আসলে বৃষ্টি প্রথমে আকাশ থেকে মেঘমালায় আসে আর সেখান থেকে জমিনে। সুতরাং বৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আকাশ। তাই আল্লাহ তা'লা বলেছেন– "আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।"

২. আসমানী সেইসকল সূত্র থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যে সূত্রগুলো ভূগর্ভ থেকে তরল পদার্থসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে একেবারে বাতাসের ভিতরে নিয়ে যায় অতঃপর সেই তরল পদার্থগুলো মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়ে তা থেকে বারি বর্ষণ হয়। সুতরাং বৃষ্টি যদিও মেঘমালা থেকে বর্ষণ হয়; কিন্তু যেহেতু তার সূত্রপাত ঘটে আকাশ থেকে কাজেই আল্লাহ বলেছেন– "আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।"

আর من الثمرات -এর من হল تبعيضيه (কিছু অংশ বুঝানোর জন্য)। এর দু'টি প্রমাণ রয়েছে

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন– فأخرجنا به ثمرات এখানে ثمرات শব্দটি نكره এসেছে। আর نكره টি تبعيض বুঝায় কাজেই من الثمرات -এর من হবে تبعيضيه কেননা, কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা করে।

(২) من -এর দুই দিকে আছে দু'টি نكره তথা ماء و رزق সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল من টি تبعيض -এর জন্য কেননা, তার পার্শ্বে দুই نكره আসায় বুঝা গেল এখানে تبعيض উদ্দেশ্য।

☆☆☆

وَاِنَّمَا سَاغَ الثَّمَرَاتِ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْكَثْرَةِ لِاَنَّهُ اَرَادَ بِه جَمَاعَةَ الثَّمَرِ الَّتِىْ فِىْ قَوْلِكَ: اَدْرَكَتْ ثَمَرَةُ بُسْتَانِه وَيُؤَيِّدُهُ قِرَأَةُ مِنَ الثَّمَرَةِ عَلَى التَّوْحِيْدِ اَوْ لِاَنَّ الْجُمُوْعَ يَتَعَاوَرُ بَعْضُهَا مَوْقِعَ بَعْضٍ كَقَوْلِه تَعَالى ﴿كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ﴾ اَوْ لِاَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُحَلَّاةً بِاللَّامِ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ وَ 'لَكُمْ' صِفَةُ 'رِزْقًا' اِنْ اُرِيْدَ بِهِ الْمَرْزُوْقُ وَمَفْعُوْلُهُ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ الْمَصْدَرُ كَاَنَّهُ قَالَ: "رِزْقًا اِيَّاكُمْ"

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

جمع كثرت -এর স্থান হওয়া সত্ত্বেও الثمرات -কে جمع قلت ব্যবহার করা বৈধ তার কারণ হল ثمرات শব্দ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ফল উদ্দেশ্য যেরকম তোমার উক্তি– ادركت ثمرة بستانه (তার বাগনের ফল পেকে গেছে)। আর তার সমর্থন করে من الثمرة একবচনের কেরাতটি। অথবা جمع قلت و كثرت একে অপরের স্থানে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– كم تركوا من جنت এবং ثلاثة قروء । অথবা جمع قلت -এর শুরুতে لام تعريف যুক্ত হলে তা আর جمع قلت থাকে না।

لكم -এর তারকীব

لكم (شبه فعل مقدر -এর متعلق হয়ে) رزقا -এর صفت ; যদি رزق দ্বারা مرزوق উদ্দেশ্য হয়। আর মাসদারী অর্থ হলে لكم টি رزق -এর مفعول হবে। যেন আল্লাহ তা'লা رزقا اياكم এরকম বলেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: شرح قول المفسر : وانما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة لانه اراد به جماعة الثمر الخ

উত্তর : এ ইবারতে একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল جمع سالم টি جمع قلت ; এখানে ثمرات হল جمع سالم সুতরাং এটা جمع قلت ও হবে। আর جمع قلت তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। অথচ এখানে جمع كثرت তথা ثمار আনা উচিত ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'লা যে ফল-মূল উৎপাদন করেছেন তাতো দশের উর্ধ্বে; বরং প্রচুর। সুতরাং এখানে جمع قلت আনা হল কেন?

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের তিনটি জবাব দিয়েছেন। যথা- (১) এখানে ثمرات দ্বারা বিভিন্ন রকমের ফল-মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা আর جمع قلت থাকল না। (২) جمع قلت و كثرت একে অপরের স্থানে ব্যবহার হয়। সুতরাাং এটা جمع قلت হলেও অর্থ দিবে جمع كثرت -এর। (৩) جمع قلت -এর শুরুতে لام تعريف যুক্ত হলে সেটা جمع قلت থেকে খারিজ হয়ে جمع كثرت হয়ে যায়।

☆☆☆

﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾
"সুতরাং কাউকেও তার সমকক্ষ দাঁড় করো না"

مُتَعَلِّقٌ بِاُعْبُدُوْا عَلٰى اَنَّهٗ نَهْيٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ اَوْ نَفْيٌ مَنْصُوْبٌ بِاِضْمَارِ اَنْ جُوَابٌ لَهٗ اَوْ بِلَعَلَّ عَلٰى اَنْ نُصِبَ تَجْعَلُوْا نَصْبَ فَاَطَّلِعَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: ﴿لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ﴾ اِلْحَاقًا لَهَا بِالْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ لِاِشْتِرَاكِهَا فِيْ اَنَّهَا غَيْرُ مُوْجِبَةٍ وَالْمَعْنٰى اِنْ تَتَّقُوْا لَاتَجْعَلُوْا لَهٗ اَنْدَادًا اَوْ بِالَّذِيْ جَعَلَ اِنِ اسْتَأْنَفْتَ بِهٖ عَلٰى اَنَّهٗ نَهْيٌ وَقَعَ خَبَرًا عَلٰى تَاوِيْلٍ مَقُوْلٍ فِيْهِ لَاتَجْعَلُوْا وَالْفَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ اُدْخِلَتْ عَلَيْهِ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَاَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْمَعْنٰى مَنْ خَلَقَكُمْ بِهٰذِهِ النِّعَمِ الْجِسَامِ وَالْاٰيَاتِ الْعِظَامِ يَنْبَغِيْ اَنْ لَايُشْرَكَ بِهٖ۔

অনুবাদ:

فلا تجعلوا -এর তারকীব

لاتجعلوا -এর সম্পর্ক হল اعبدوا -এর সাথে। কেননা, এটা হল نهى এবং তার عطف হয়েছে اعبدوا -এর উপর। অথবা এটা نفى যা أن مقدر দ্বারা منصوب এবং فعل امر তথা اعبدوا -এর جواب । অথবা এর সম্পর্ক لعل -এর সাথে আর তা এভাবে যে, لاتجعلوا টি আল্লাহ তা'লার বাণী لعلى ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع -এর মধ্যে فاطلع -এর মতো منصوب হয়েছে। لعل -কে اشياء سته -এর অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, لعل টি غير موجب হওয়ার মধ্যে اشياء سته -এর সাথে শরীক। আর অর্থ হল "তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" অথবা لاتجعلوا -এর সম্পর্ক হবে الذى جعل -এর সাথে; যদি তুমি الذى جعل -কে استيناف ধরে থাকো। আর সম্পর্ক এভাবে হবে যে, لاتجعلوا বাক্যটি مقول فيه -এর তাবীলে الذى -এর خبر হবে। আর مبتدا শর্তের অর্থ ধারণ করার কারণে خبر لاتجعلوا -এর সাথে فاء سببيه যুক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে "যে মহান সত্তা তোমাদেরকে এত বিশাল নেয়ামত এবং বড় বড় নিদর্শনাবলী দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন, উচিত হল তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করা।"

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: بم يتعلق قوله تعالى: فلا تجعلوا؟

উত্তর : فلاتجعلوا -এর সম্পর্ক কোনটির সাথে এব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) اعبدوا -এর সাথে (২) الذى جعل لكم الارض فراشا -এর সাথে অথবা (৩) لعلكم تتقون -এর সাথে। প্রথম সূরতে فلاتجعلوا বাক্যটি نهى এবং اعبدوا -এর উপর معطوف হবে। অথবা نفى হবে এবং جواب امر হওয়ার কারণে منصوب হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে অর্থাৎ لعلكم تتقون -এর সাথে তার সম্পর্কে হলে فلاتجعلوا টি جواب لعل হওয়ার কারণে منصوب হবে।

প্রশ্ন : لعل তো ترجى বুঝায় আর ترجى -এর جواب -এর মধ্যে ان উহ্য থাকে না। সুতরাং فلاتجعلوا কিভাবে منصوب হবে?

উত্তর : সাত জায়াগায় ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। তন্মধ্যে একটি জায়গা হল সেই فاء যেটা ছয়টি বিষয়ের যে কোন একটির جواب -এ আসে। ছয়টি বিষয় যেমন:

(১) امر (২) نهى (৩) نفى (٤) استفهام (٥) تمنى (٦) عرض

তবে لعل টি যদিও এছয়টি বিষয় থেকে কোন একটির ভিতরে পড়েনি কিন্তু এটাকে حكما এ ছয়টি বিষয় থেকে ধরে নেওয়া হবে। কেননা, এ ছয়টি বিষয়ের দ্বারা যে কথা বলা হয় তার وقوع হওয়া لازم নয়; তদ্রূপ لعل -এর মাধ্যমে যা বলা হয় তারও وقوع হওয়া لازم নয়। সুতরাং غير موجب হওয়ার ক্ষেত্রে لعل টি এ ছয়টি বিষয়ের ন্যায় কাজেই এ ছয়টি বিষয়ের جواب -এ যে فاء আসে তারপরে যেরকম ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে; সেরকম لعل -এর পরে যে فاء আসবে তারপরেও ان উহ্য থেকে فعل مضارع টি منصوب হবে। তার দৃষ্টান্ত হল কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি– لعلى ابلغ الاسباب اسباب السموت فاطلع এখানে فاطلع টি منصوب হয়েছে তার একমাত্র কারণ হল لعل -কে উক্ত ছয়টি বিষয় থেকে গণ্য করে নেওয়া হয়েছে।

আর তৃতীয় সূরত তথা فلاتجعلوا -কে الذى جعل لكم الارض فراشا -এর সাথে সম্পৃক্ত করলে الذى টি তার صله -কে নিয়ে مبتدا হবে এবং فلاتجعلوا তার خبر হবে। আর তখন الذى جعل لكم الارض فراشا টি جمله مستانفه (নতুন বাক্য) হবে। فلاتجعلوا খবরের শুরুতে فاء টি হল سببيه এটা خبر -এর সাথে যুক্ত হয়েছে কেননা, তার مبتدا তথা الذى টি شرط -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, فلاتجعلوا -কে الذى جعل الخ -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরলে فلاتجعلوا টি خبر হবে। অথচ فلاتجعلوا তো نهى হওয়ার কারণে انشاء হয়েছে। আর আমরা জানি انشاء টি কখনো خبر হয়না। সুতরাং فلاتجعلوا -কে خبر সাব্যস্ত করা সঠিক হয়নি।

উত্তর : فلاتجعلوا টি مفرد -এর তাবীলে خبر হয়েছে। মূল ইবারতটি এরকম হবে الذى جعل لكم الارض فراشا مقول فيه فلاتجعلوا "যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা স্বরূপ বনিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, অন্য আর কাউকেও তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"

☆☆☆

اَلنِّدُّ: اَلْمَثَلُ الْمُنَادِى قَالَ جَرِيْرٌ اَتَيْمًا تَجْعَلُوْنَ اِلَىَّ نِدًّا ☆ وَمَا تَيْمٌ نِدِىٌّ حَسْبَ نَدِيْدٍ. مِنْ نَدَّ نُدُوْدًا اِذَا نَفَرَ وَنَادَدْتُ الرَّجُلَ اِذَا خَلَفْتَهُ خُصَّ بِالْمُخَالِفِ الْمُمَاثِلِ فِى الذَّاتِ كَمَا خُصَّ الْمُسَاوِىْ فِى الْقَدْرِ۔

অনুবাদ:________

ند প্রতিদ্বন্দ্বিকে বলে। কবি জরীর বলেন, اتيما تجعلون الى ندا ☆ وما تيم ندى حسب نديد. (কবিতরা অর্থ : তোমরা কি তাইম গোত্রকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছো। অথচ তাইমরা কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।) نِدٌّ টি نَدَّ نُدُوْدًا থেকে নির্গত যার অর্থ হল ঘৃণাবোধ

করা। ناددت الرجل (আমি তার বিরোধিতা করেছি)। সত্তাগত অংশিদারিত্বকে ند বলা হয় যেরকম পরিমাণে সমান হওয়াকে مساوى বলা হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما معنى الند وما الفرق بين الند والمثل؟

উত্তর : ند অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন কবি জারীর বলেন– اتيما تجعلون الى ندا ☆ وما تيم ندى حسب نديد. (কবিতরা অর্থ : তোমরা কি তাইম গোত্রকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছো। অথচ তাইমরা কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।) এখানে ند শব্দ হল محل استشهاد ।

الفرق بين الند والمثل : যাত বা সত্তাগত অংশিদারিত্বকে ند বলা হয়। আর সবধরনের ও সাধারণ অংশিদারিত্বকে مثل বলা হয়।

☆☆☆

وَتَسْمِيَةُ مَا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا وَمَا زَعَمُوْا اَنَّهَا تُسَاوِيْهِ فِيْ ذَاتِه وَصِفَاتِه وَلَاَنَّهَا تُخَالِفُهُ فِيْ اَفْعَالِه لِاَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوْا عِبَادَتَهٗ اِلٰى عِبَادِتِهَا وَسَمُّوْهَا اٰلِهَةً شَابَهَتْ حَالُهُمْ حَالَ مَنْ يَعْتَقِدُ اَنَّهَا ذَوَاتٌ وَاجِبَةٌ بِالذَّاتِ قَادِرَةٌ عَلٰى اَنْ تَدْفَعَ عَنْهُمْ بَاْسَ اللّٰهِ وَتَمْنَحُهُمْ مَا لَمْ يَرِدِ اللّٰهُ بِهِمْ مِنْ خَيْرٍ فَتَهَكَّمَ بِهِمْ وَشَنَعَ عَلَيْهِمْ بِاَنْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِمَنْ يَمْتَنِعُ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ نِدٌّ وَلِهٰذَا قَالَ مُوَحِّدُ الْجَاهِلِيَّةِ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ۔ اَرَبًّا وَاحِدًا اَمْ اَلْفُ رَبٍّ ☆ اَدِيْنُ اِذْ تَقَسَّمَتِ الْاُمُوْرُ

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا ☆ كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তাদের সম্পর্কে মুশরিকদের এ আক্বীদা ছিল না যে, এরা যাত ও সিফাতের দিক থেকে আল্লাহর সমকক্ষ এবং তাদের এ আক্বীদাও ছিলনা যে, এরা আল্লাহ তা'লার কাজের বিরুধিতা করতে পারে। এতদসত্ত্বেও এদেরকে انداد। সমকক্ষ বলে নামকরণ করা হয়েছে। তার কারণ হল, মুশরিকরা যখনা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদতে মনোযুগী হল এবং গায়রুল্লাহকে মা'বূদ নামে নামকরণ করল তখন তাদের অবস্থাটা সেই ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হয়ে গেল যার বিশ্বাস হল যে, এইসব মা'বূদগণ واجب بالذات এরা নিজের থেকে আল্লাহর আযাব-গযবকে প্রতিহত করতে পারে এবং আল্লাহ তা'লা বান্দদেরকে যেসব জিনিস দিতে চান না তারা স্বয়ং তা দিতে ক্ষমতা রাখে। তাই আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস ও তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন যে, তারা এমন সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে যে কোনক্রমেই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। এজন্যই জাহেলী যুগের একত্ববাদে বিশ্বাসী কবি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে

নুফায়েল বলেছেন-

اربا واحدا ام الف رب ☆ ادين اذ تقسمت الامور
تركت اللات والعزى جميعا ☆ كذالك يفعال الرجل البصير

কবিতরা অর্থ : যখন বিষয়াদি বিভক্ত হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার আক্বীদার মধ্যে স্বাধীন) তাহলে আমি এক প্রভূর ইবাদত করবো না-কি হাজার প্রভূর? আমি লাত ও উযযা সমস্ত দেবতাকে ত্যাগ করেছি। আর জ্ঞানী লোকেরা এরকমই করে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قوله وتسمية ما يعبده المشركون الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে থাকে তাদেরকে তো মুশরিকরা যাত ও সিফাতের মধ্যে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করেনি এবং আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিশ্বাসও করেনি। তাহলে মুশরিকদেরকে আবার সম্বোধন করে لاتجعلوا لله اندادا বললেন কেন? এর জবাবটি অনুবাদের মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হল না।

☆☆☆

﴿وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"অথচ তোমরা জান"

حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ فَلَاتَجْعَلُوْا أَوْ مَفْعُوْلُ تَعْلَمُوْنَ مَطْرُوْحٌ أَىْ وَحَالُكُمْ أَنَّكُمْ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالنَّظْرِ وَاِصَابَةِ الرَّأْيِ فَلَوْ تَأَمَّلْتُمْ اَدْنٰى تَأَمُّلٍ اِضْطِرَّ عَقْلُكُمْ اِلٰى اِثْبَاتِ مُوْجِدٍ لِلْمُمْكِنَاتِ مُتَفَرِّدٌ بِوُجُوْبِ الذَّاتِ مُتَعَالٍ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمُخْلَقَاتِ اَوْ مَنْوِيٌّ وَهُوَ اَنَّهَا لَاتُمَاثِلُهٗ وَلَاتَقْدِرُ عَلٰى مِثْلِ مَا يَفْعَلُهٗ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَعَلٰى هٰذَا فَالْمَقْصُوْدُ مِنْهُ اَلتَّوْبِيْخُ وَالتَّثْرِيْبُ لَاتَقْيِيْدَ الْحُكْمِ وَقَصْرَهٗ عَلَيْهِ فَاِنَّ الْعَالِمَ وَالْجَاهِلَ الْمُتَمَكِّنَ مِنَ الْعِلْمِ سَوَاءٌ فِى التَّكْلِيْفِ ـ

অনুবাদ:

وانتم تعلمون বাক্যটি لاتجعلوا -এর ضمير থেকে حال । تعلمون -এর مفعول পরিত্যাজ্য। এমতাবস্থায় অর্থ হবে "তোমরা তো জ্ঞানী-গুণী, বিবেকবান সুতরাং তুমরা যদি একটু চিন্তা করতে তাহলে তোমাদের বিবেক অবশ্যই বলে দিত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি একাই واجب بالذات গুণে গুণান্বিত এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্যতার অনেক উর্ধ্বে। অথবা تعلمون -এর مفعول টি উদ্দেশ্যগত। আর এটা হল انها لاتماثله ولاتقدر على مثل ما يفعله (এমতাবস্থায় অর্থ

হবে "তোমরা আল্লাহর জন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না। কেননা, তোমরা তো জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং কেউই তাঁর ন্যায় কর্ম করার ক্ষমতা রাখে না"।) যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান- "তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তারা কি সেই কাজগুলোর কিছু করতে পারে?"। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে সতর্ক করা এবং লজ্জা দেওয়া। তবে হুকুমকে শর্তযুক্ত করা এবং শর্তের উপর সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মুকাল্লাফ হওয়ার মধ্যে আলেম এবং সেই জাহেল যে ইলমের যোগ্যতা রাখে উভয়ে সমান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله تعالى: وانتم تعلمون" فى أى محل؟ فصل

উত্তর :

وانتم تعلمون এ অংশটি فلاتجعلوا -এর ضمير থেকে حال হয়েছে। আর تعلمون -এর مفعول -এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো তার مفعول টি একেবারেই পরিত্যাজ্য। এমতাবস্থায় تعلمون টি بمنزله فعل لازم হবে। তখন অর্থ হবে "তোমরা তো জ্ঞানী-গুণী, বিবেকবান সুতরাং তুমরা যদি একটু চিন্তা করতে তাহলে তোমাদের বিবেক অবশ্যই বলে দিত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি একাই واجب بالذات গুণে গুণান্বিত এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্যতার অনেক উর্ধ্বে।" অথবা تعلمون -এর مفعول এখানে উহ্য আছে। তখন ইবাতর হবে- وانتم تعلمون انها لاتماثله ولاتقدر على مثل ما يفعله এখানে ان টি তার اسم و خبر -কে নিয়ে تعلمون -এর مفعول হবে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে "তোমরা আল্লাহর জন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না। কেননা, তোমরা তো জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং কেউই তাঁর ন্যায় কর্ম করার ক্ষমতা রাখে না"।

☆☆☆

وَاعْلَمْ أَنَّ مَضْمُوْنَ الْآيَتَيْنِ هُوَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ بِه وَالْإِشَارَةُ إِلٰى مَا هُوَ الْعِلَّةُ وَالْمُقْتَضِيْ بَيَانُهُ أَنَّهُ رَتَّبَ الْأَمْرَ بِالْعِبَادَةِ عَلٰى صِفَةِ الرُّبُوْبِيَّةِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهَا الْعِلَّةُ لِوُجُوْبِهَا ثُمَّ بَيَّنَ رُبُوْبِيَّتَهُ بِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ أُصُوْلِهِمْ وَمَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ فِيْ مَعَاشِهِمْ مِنَ الْمُقْلَةِ وَالْمَظْلَمَةِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمَطْعُوْمِ وَالْمَلْبُوْسِ وَالرِّزْقَ أَعَمُّ مِنَ الْمَأْكُوْلِ وَالْمَشْرُوْبِ ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ هٰذِهِ الْأُمُوْرُ الَّتِيْ لَايَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ شَاهِدَةٌ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِه رَتَّبَ عَلَيْهَا النَّهْيَ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِه-

অনুবাদ:

পূর্ববর্তী দুই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু

তুমি জেনে রাখ যে, (يـا ايهـا الناس اعبدوا থেকে وانتـم تعلمون পর্যন্ত এ) দুই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হল আল্লাহ তা'লার ইবাদতের নির্দেশ, তাঁর সাথে শিরিক করা থেকে নিষেধ প্রদান এবং ইবাদত ওয়াজিব হওয়া এবং শিরিক থেকে বেঁচে থাকার عـلــت (কারণ) -এর দিকে ইঙ্গিতকরণ। তার বিবরণ হল এই– মহান আল্লাহ তা'লা ইবাদতকে صـفـت ربوبيت (খুদায়িত্ব গুণ) -এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন একথার উপর অবহিত করার জন্য যে, ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল صــفــت ربـوبيــت টি। অতঃপর তাঁর খুদায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, এইসব কাফির ও তাদের বাপ-দাদার এবং তারা দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় যেমন জমিন, আকাশ, খাদ্য ও বস্ত্র এগুলোরও স্রষ্টা তিনি। কেননা, আয়াতে ثــمــــرة বা ফল শব্দটি খাদ্য ও বস্ত্র উভয়টিকে শামিল করে। আর رزق শব্দটি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যকে শমিল করেছে। অতঃপর যখন এইসব বিষয়াদি যেগুলোর উপর আল্লাহ তা'লা ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না; আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন এগুলোর সাথে শিরকের নিষিদ্ধতাকে জোড়ে দিয়ে বলেছেন– فلاتجعلوا لله اندادا ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله : واعلم أن مضمون الايتين هو الامر بعبادة الله تعالى والنهى عن الشرك به الخ
اكتب غرض المفسر بهذه العبارة

উত্তর :

এ قوله : واعـلـم أن مـضمون الايتين هو الامر بعبادة الله تعالى والنهى عن الشرك به الخ ইবারত দ্বারা পূববর্তী দুই আয়াতের মূল বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, يـا ايهـا الناس اعبدوا থেকে وانتــم تــعــلــمــون পর্যন্ত এই দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করেছেন, নিষেধ করেছেন শিরিক থেকে। অতঃপর তাঁর ইবাদত করবো কেন এবং তাঁর সাথে শিরিক করা অবৈধ কেন তার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'লা বলেছেন اعبــدوا ربــكــم

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো।" এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে তিনি যে রব তাও বলে দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আমরা তাঁর ইবাদত একারণে করবো যে, তিনি হলেন আমাদের প্রভূ। অতঃপর তাঁর প্রভূত্বের বিষয়টিকে الــــــذى خـلـقـكـم والـذيـن مـن قـبـلـكـم الخ এ আয়াত দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আসমান-জমিন বৃক্ষ্য-লতা-পাতা খাদ্য, বস্ত্র মোটকথা মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়াদির স্রষ্টা তিনিই। সুতরাং যে মহান সত্তাই এ জমিন-আকাশ প্রভৃতির স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত আর কেউ এগুলো সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত, তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই। অতঃপর যখন এইসব বিষয়াদি যেগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না; আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন এগুলোর সাথে শিরকের নিষিদ্ধতাকে জোড়ে দিয়ে বলেছেন– فـلا تـجـعـلـوا لـلـه اندادا "সুতরাং তোমরা কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করো না।"

☆☆☆

وَلَعَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَرَادَ مِنَ الْاٰيَةِ الْاَخِيْرَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ وَسَبَقَ فِيْهِ الْكَلَامُ الْاِشَارَةَ اِلٰى تَفْصِيْلِ خَلْقِ الْاِنْسَان وَمَا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِىْ وَالصِّفَاتِ عَلٰى طَرِيْقَةِ التَّمْثِيْلِ فَمَثَلُ الْبَدَن بِالْاَرْضِ وَالنَّفْس بِالسَّمَاءِ وَالْعَقْلِ بِالْمَاءِ وَمَا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَضَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ وَالنَّظْرِيَّةِ الْمُحَصَّلَةِ بِوَسَاطَةِ اِسْتِعْمَالِ الْعَقْلِ لِلْحَوَاسِّ وَاِزْدِوَاجِ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ بِالثَّمَرَاتِ الْمُتَوَلَّدَةِ مِنْ اِزْدِوَاجِ الْقُوَى السَّمَاوِيَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْاَرْضِيَّةِ الْمُنْفَعِلَةِ بِقُدْرَةِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ فَاِنَّ لِكُلِّ اٰيَةٍ ظَهْرًا وَ بَطْنًا وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعًا ـ

অনুবাদ:

সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় আয়াত (তথা (الذى جعل لكم الارض) দ্বারা আয়াতের বহ্যিক অর্থ এবং যে উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য ও অর্থ প্রকাশ করা সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও তাকে যে ইলম ও গুণাবলী দান করেছেন সেই ইলম ও গুণাবলীর বিশ্লেষণের দিকে استـعـاره স্বরূপ ইঙ্গিত করার ইচ্ছা করেছেন। অতএব মানব দেহকে জমিনের সঙ্গে, নফসকে আকাশের সঙ্গে, বিবেককে পানির সঙ্গে, حـــــواس -এর জন্য আকলকে ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয়ে অর্জিত যে আমলী ও ইলমী যোগ্যতা মানুষকে দান করেছেন সে যোগ্যতাকে তুলনা করেছেন সেই ফল-মূলের সঙ্গে যেগুলো আসমানী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ও জমিনি প্রতিক্রিয় গ্রহণের শক্তির সমন্বয়ে فـــاعــل مـــختـــار (আল্লাহ তা'লার) কুদরতের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। কেননা, প্রত্যেক আয়াতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন এবং প্রতিটি সীমার অবগতস্থল রয়েছে।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ﴾

"যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে"

لَمَّا قَرَّرَ وَحْدَانِيَّتَهُ وَبَيَّنَ الطَّرِيْقَ الْمُوْصِلَ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا ذَكَرَ عَقِيْبَهُ مَا هُوَ الْحُجَّةُ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُعْجِزُ بِفَصَاحَتِهِ الَّتِيْ بَذَتْ فَصَاحَةَ كُلِّ مَنْطِقٍ وَإِفْحَامُهُ مَنْ طُوْلِبَ بِمُعَارَضَتِهِ مِنْ مَصَاقِعِ الْخُطَبَاءِ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَإِفْرَاطِهِمْ فِي الْمُضَادَّةِ وَالْمُضَارَّةِ وَتَهَالُكِهِمْ عَلَى الْمَعَارَةِ وَالْمَعَارَةِ وَعَرَّفَ مَا يَتَعَرَّفُ بِهِ إِعْجَازُهُ وَيَتَيَقَّنُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا يَدَّعِيْهِ۔

অনুবাদ:

যোগসূত্র

যখন আল্লাহ তা'লা স্বীয় তাওহীদ প্রমাণিত করেছেন এবং সে সম্পর্কে ইলম অর্জনের পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন, তখন তারপরে সেই বিষয়কে উল্লেখ করেছেন যা মুহাম্মদ (সা.) -এর নবুওয়াতের উপর প্রমাণ বহন করে। আর এটা হল সেই কুরআন যে কুরআন সকল ভাষার ফাসাহতের শীর্ষস্থানীয় ও খাঁটি আরবের যেসব বিশুদ্ধভাষী বক্তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদেরকে নিশ্চুপকারী ফাসাহত দ্বারা মানুষকে অক্ষম বানিয়ে দেয়। অথচ তারা সংখ্যায় ছিল প্রচুর, শত্রুতা পোষন এবং ক্ষতিসাধনে কঠুর এবং ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে ছিল আগ্রহী। আর আল্লাহ তা'লা সেইসকল বিষয়েরে পরিচয় দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা কুরআনের অলৌকিকতা জানা যায় এবং এ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব যেমনটি নবী কারীম (সা.) দাবী করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ﴿وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة﴾
السوال: اكتب ربط الاية بما قبلها

উত্তর : ربط الاية (যোগসূত্র) :

পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তথা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ ও তার প্রমাণ। الذى خلقكم থেকে فلاتجعلوا পর্যন্ত একত্ববাদের দলীলের আলোচনা এবং স্বয়ং فلاتجعلوا لله اندادا হল একত্ববাদের দাবীর আলোচনা। একত্ববাদের পরের স্তরটি হল নবুওয়তের স্তর কাজেই এখন থেকে নবুওয়ত ও তার প্রমাণাদির আলোচনা শুরু করেছেন।

কুরআন নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ : নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণ হল মু'জিযা। অন্যান্য আম্বিয়া (আ.) -কে নিজ নিজ কালের উপযোগী যেমনিভাবে হাজার হাজার মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। যেগুলো তাদের জন্য নবুওয়তের দলীল হয়েছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা.) -কে অসংখ্য মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইলমী মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা তাঁর নবুওয়তের সবচেয়ে

বড় প্রমাণ। কেননা, এ পবিত্র কুরআন তার সাহিত্যের সামানে আরবের সকল সাহিত্যিকদেরকে অক্ষম করে দিয়েছে। আরবরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদেরকে কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে; কিন্তু কেউই এই চ্যালেঞ্জের সামনে টিকে থাকতে পারেনি এবং কুরআনের অনুরূপ কুরআন পেশ করতে পারেনি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এটা কোন মানব রচিত কালাম নয়; বরং আল্লাহর কালাম। আর যখন কুরআন আল্লাহর কালাম বলে প্রমাণিত হল তখন এ কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তথা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নবুওয়তের সত্যতাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

☆☆☆

وَاِنَّمَا قَالَ مِمَّا نَزَّلْنَا لِاَنَّ نُزُوْلَهٗ نَجْمًا فَنَجْمًا بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ عَلٰى مَا تَرٰى عَلَيْهِ اَهْلَ الشِّعْرِ وَالْخِطَابَةِ مِمَّا يُرِيْبُهُمْ كَمَا حَكَى اللّٰهُ عَنْهُمْ ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً﴾ وَكَانَ الْوَاجِبُ تَحْدِيْدَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ اِزَاحَةً لِلشُّبْهَةِ وَاِلْزَامًا لِلْحُجَّةِ وَاُضَافَ الْعَبْدَ اِلٰى نَفْسِه تَنْوِيْهًا بِذِكْرِه وَتَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهٗ مُخْتَصٌّ بِه مُنْقَادٌ لِحُكْمِه وَقُرِئَ عِبَادُنَا يُرِيْدُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاُمَّتَهٗ۔

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লা আয়াতে نـزلنا বলেছেন (انـزلنا বলেননি তার) কারণ হল, কবি ও বক্তাদেরকে তুমি দেখবে যে, তারা অল্প অল্প করে কথা বলে তদ্রূপ কুরআনও অল্প অল্প করে প্রয়োজন মোতাবেক অবতীর্ণ হয়েছে আর একারণেই কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'লা তাদের সন্দেহের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- وقـال الـذين كفروا لولا نزل عليه القرأن جـملة واحـدة "কাফিররা বলে, কুরআন কেন মুহাম্মদের উপর একবারে অবতীর্ণ হয়নি?"। আর তাদের সন্দেহ নিরসন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীল পূর্ণাঙ্গ করতে এভঙ্গিতেই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করারও প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তা'লা عبـد (তথা মুহাম্মদ (সা.) -কে) নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন রাসূলের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য। তাছাড়া এই বলে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা'লার সাথে রাসূলের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি আল্লাহর হুকুম পালনকারী। এক কেরাতে عبـــادنـــا এসেছে। তার দ্বারা রাসূল ও তার উম্মতগণ উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال (الف) لم قال مما نزلنا ولم يقل أنزلنا؟
(ب) كم قرأة في قوله عبدنا ومن المراد به؟

الف : উত্তর : আয়াতে انزلنا -এর পরিবর্তে نزلنا বলার কারণ:

আয়াতে انزلنا -এর পরিবর্তে نزلنا বলার কারণ হল এই, কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ সৃষ্টির মূল কারণ ছিল কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হল কেন? এবং একবারে নাযিল হলনা কেন? কেননা, ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ায় এসন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) চিন্তা-ফিকির করে কিছু উত্তম বাক্য নিজের পক্ষ থেকে বলছেন। কেননা, এটা কবি ও বক্তাদের চিরাচরিত নিয়ম। তারা শ্রুতাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ধীরে ধীরে খুতবা ও কবিতা তৈরী করে উপস্থাপন করে থাকে। এতে তাদের সাহিত্যিকতা ফুটে উঠে। তাই কাফিরদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, একুরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হতো তাহলে কেন একবারে তা অবতীর্ণ হয়না? এপ্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে- وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرأن جملة واحدة "কাফিররা বলে, কুরআন কেন মুহাম্মদের উপর একবারে অবতীর্ণ হয়নি?"।

সুতরাং কাফিরদের এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আয়াতে انزلنا না বলে نزلنا বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, انزال বলা হয় একবারে অবতীর্ণ করা। আর تنزيل বলা হয় ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করা।

তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে হে কাফিরের দল! কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ায় তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তোমরাও কুরআনের ছোট একটি সূরার মত একটি সূরা ধীরে ধীরে বানিয়ে নিয়ে আসো। কিন্তু তোমরা তো তা পারোনি কাজেই তোমাদের এসন্দেহটি অহেতুক সন্দেহ।

ب : عبدنا -এর দুই কেরাত :

عبدنا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

(১) عبدنا (একবচনে) তখন عبد দ্বারা হুযুর (সা.) উদ্দেশ্য হবেন। আর হুযুর (সা.) -এর সম্মান-মর্যাদার খাতিরে আল্লাহ তা'লা হুযুর (সা.) -কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে عبدنا বলেছেন। কেননা, ইযাফতের কারণে কখনো مضاف তথা সম্বন্ধকৃত ব্যক্তির সম্মান প্রকাশ পায় যেমন: عبد السلطان ركب (বাদশার গোলাম আরোহন করেছে) এখানে عبد -কে سلطان (বাদশার) দিকে সম্বন্ধ করার কারণে গোলামের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। তদ্রূপ عبدنا -এর মধ্যেও।

(২) عبادنا (বহুবচনে) তখন عبادنا দ্বারা রাসূল ও তার উম্মতগণ উদ্দেশ্য হবে।

وَالسُّوْرَةُ اَلطَّائِفَةُ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُتَرْجَمَةِ الَّتِيْ اَقَلُّهَا ثَلٰثُ اٰيَاتٍ وَهِيَ اِنْ جُعِلَتْ وَاوُهَا اَصْلِيَةً مَنْقُوْلَةً مِنْ سُوْرِ الْمَدِيْنَةِ لِاَنَّهَا مُحِيْطَةٌ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ مُفْرَزَةً مُحَوَّزَةً عَلٰى حِيَالِهَا اَوْ مُحْتَوِيَةً عَلٰى اَنْوَاعٍ مِنَ الْعِلْمِ اِحْتِوَاءَ سُوَرِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى مَا فِيْهَا اَوْ مِنَ السُّوْرَةِ الَّتِيْ هِيَ الْمُرْتَبَةُ قَالَ۔

لَرَهْطُ حِرَابٍ قَدْ سُوْرَةٌ ☆ فِي الْمَجْدِ لَيْسَ غُرَابُهَا بِمَطَارٍ

لِاَنَّ السُّوَرَ كَالْمَنَازِلِ وَالْمَرَاتِبِ يَرْتَقِيْ فِيْهَا الْقَارِئُ اَوْ لَهَا مَرَاتِبُ غَيُّ الطَّوْلِ وَالْقَصْرِ وَالْفَضْلِ وَالشَّرْفِ وَثَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَاِنْ جُعِلَتْ مُبْدَلَةً مِنَ الْهَمْزَةِ فَمِنَ السُّوْرَةِ الَّتِيْ هِيَ الْبَقِيَّةُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ۔

অনুবাদ:

সূরা কাকে বলে?

পবিত্র কুরআনের ঐ পরিপূর্ণ মর্মবাহক ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ যা কমপক্ষে তিন আয়াত সম্পন্ন হয় তাকে সূরা বলা হয়। سورة -এর- واو -কে যদি اصلی ধরা হয় তাহলে এটা سور المدينة (শহরের প্রাচীর) থেকে নির্গত হবে। কেননা, সূরাও পরিবেষ্টন করে রেখেছে কুরআনের নির্ধারিত অংশকে। অথবা সূরা কুরআনের বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বেষ্টন করে আছে যেরকম শহরের প্রাচীর তার ভিতরস্থ জিনিসকে বেষ্টন করে রাখে। অথবা এটা سورة (স্তর) থেকে নির্গত। যেমন কবি বলেন- لرهط حراب قد سورة ☆ فی المجد ليس غرابها بمطار কেননা, কুরআনের সূরাগুলোও সিঁড়ির ন্যায়। কেমন যেন তার উপর দিয়ে পাঠক চড়তে থাকে। অথবা লম্বা-বাড়ি, ফযীলত এবং সওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে সূরার অনেক স্তর রয়েছে। আর যদি سورة -এর- واو -কে همزه থেকে পরিবর্তিত হিসেবে ধরা হয় তাহলে سؤرة থেকে নির্গত হবে যার অর্থ হল 'অবিষ্টাংশ, বস্তুর একাংশ'।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى السورة لغة واصطلاحا ؟ اكتب مع وجه تسميتها
(ب) قول الشاعر: لرهط حراب قد سورة ☆ فى المجلد ليس غرابها بمطار
ترجم البيت ثم بين علام استشهد المصنف به

উত্তর :

معنى السورة لغة : সূরা শব্দের অভিধানিক অর্থ হল, স্তর, নিদর্শন, উচ্চতা।

معناها اصطلاحا : الطائفة من القرأن المترجمة التى أقلها ثلث أيات অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ঐ পরিপূর্ণ মর্মবাহক ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ যা কমপক্ষে তিন আয়াত সম্পন্ন হয় তাকে সূরা বলা হয়।

وجه التسمية : সূরাকে সূরা কেন বলা হয় এসম্পর্কে বায়যাবী (র.) বলেন, سورة শব্দের واو -কে

যদি اصلی ধরা হয় তাহলে তার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত এটা سور المدينه থেকে নির্গত। নগর প্রাচীরকে سورالمدينه বলা হয়। যেহেতু সূরাসমূহ কুরআনের বিভিন্ন বিষয়াবলী ও জ্ঞানকে নগর প্রাচীরের মত বেষ্টন করে রেখেছে, তাই একে সূরা করে নামকরণ করা হয়েছে। অথবা سـورة (যার অর্থ হল, স্তর) থেকে নির্গত। যেহেতু কুরআনের প্রতিটি সূরা পাঠকের জন্য সিঁড়ি সমতুল্য একটি স্তর; পাঠক যখন এক সূরা পাঠ করল তাখন সে যেন একটি সিঁড়ি অতিক্রম করল। তাই সূরাকে সূরা বলা হয়।

আর যদি سـورة শব্দের واو টি همزه থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসে তাহলে তার অর্থ হবে, অবশিষ্টাংশ, বস্তুর একাংশ। আর সুরাও কুরআনের একাংশ হয়ে থাকে তাই সূরাকে সূরা বলা হয়।

لرهط حراب قد سورة ☆ فى المجلد ليس غرابها بمطار

কবিতার অর্থ : হিরাব ও কদের সম্প্রদায়ের বংশীয় কৌলিন্যে এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যেখানে কাকের উড্ডয়ন ক্ষমতা নেই।

কবিতার শব্দ-বিশ্লেষণ : حراب و قد দুই ব্যক্তির নাম। ليس غرابها بمطار এবাক্যটি আহলে আরবের উক্তি– هذه الارض لايطير غرابها থেকে উদগত। এর দ্বারা আহলে আরব ফল-ফ্রুটে ভরপুর বাগান উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। কবি এখানে তার প্রশংসিত ব্যক্তিদের মর্যাদাকে ফল-ফ্রুটে ভরপুর জমিনের সঙ্গে তুলনা করে বলছে যে, যেরকম ফল-ফ্রুটে ভরপুর ও সবুজ শ্যামল মাঠ থেকে কাক যেতেই চায় না; বরং এ বাগান থেকে উপকৃত হতে চয়। তদ্রুপ কবির প্রশংসিত লোকেদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য অভাবী লোকদের ভিড় জমেই থাকে।

মুসান্নিফ (র.) একবিতাটি উপস্থাপন করে প্রমাণ কেরেছেন যে, سـورة শব্দের এক অর্থ হল মর্যাদা একবিতার মধ্যে سورة শব্দটি محل استشهاد ।

☆☆☆

وَالْحِكْمَةُ فِيْ تَقْطِيْعِ الْقُرْاٰنِ سُوَرًا: اِفْرَادُ الْاَنْوَاعِ وَتَلَاحُقُ الْاِشْكَالِ وَتَجَاوُبُ النَّظْمِ وَتَنْشِيْطُ الْقَارِئِ وَتَسْهِيْلُ الْحِفْظِ وَالتَّرْغِيْبُ فِيْهِ فَاِنَّهٗ اِذَا خَتَمَ سُوْرَةً نَفَسَ ذَالِكَ مِنْهُ كَالْمُسَافِرِ اِذَا عَلِمَ اَنَّهٗ قَطَعَ مِيْلًا اَوْ طَوٰى بَرِيْدًا وَالْحَافِظُ مَتٰى حَذَقَهَا اِعْتَقَدَ اَنَّهٗ اَخَذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ حَظًّا تَامًّا وَفَازَ بِطَائِفَةٍ مَحْدُوْدَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِنَفْسِهَا فَعَظَمَ ذَالِكَ عِنْدَهٗ اِبْتَهَجَ بِهٖ اِلٰى غَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ۔

অনুবাদ:________________________________

কুরআনকে বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত করার রহস্যাবলী

কুরআনকে বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত করার রহস্য হল– (১) কুরআনের বিভিন্ন রকমের জ্ঞিন-বিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা। (২) পরস্পর সাদৃশ্যসীল অর্থসমূহকে একত্র করা। (৩) বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যবহৃত শব্দালীকে একত্র করা। (৪) পাঠকের মনে আনন্দ দেওয়া। (৫) করআন

মুখস্থ করাকে সহজ করে দেওয়া এবং (৬) মুখস্থ করতে উৎসাহ দেওয়া। কেননা মুসাফির যেরকম একমাইল জায়গা অতিক্রম করলে সে আনন্দিত হয় এবং সফরের ক্লান্তি দূর হয় সেরকম কুরআনের পাঠক যখন এক সূরা শেষ করে ফেলবে তখন তার মন থেকে ক্লান্তি দূর হবে; কুরআনের হাফিজ যখন এক সূরা শেষ করবে তখন তার বিশ্বাস জন্মিবে যে, সে কুরআনের বিরাট এক অংশ অর্জন করে ফেলেছে এবং সে এটাকে বড় সৌভাগ্য মনে করবে যার দরুন সে আনন্দিত হবে। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: ما هي الحكمة في تقطيع القرأن سورا؟

উত্তর : কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কারণ ঃ

পবিত্র কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমন–

১. افراد للانواع অর্থাৎ একই বিষয়ের অনেকগুলো ইলমকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা।

২. تلاحق الاشكال অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান-ভান্ডারকে একত্রকরণ।

৩. تجاوب النظم অর্থাৎ ইবারতের ছন্দ ও উচ্চারণ ভঙ্গিতে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

৪. تنشيط للقارى পাঠককে উৎসাহিত করণ।

৫. تسهيل للحفظ والترغيب فيه মুখস্থ করতে সুবিধা ও সাবলিলতা আনয়ন করা এবং এতে উৎসাহ প্রদান।

☆☆☆

مِنْ مِّثْلِه: صِفَةُ سُوْرَةٍ أَىْ بِسُوْرَةٍ كَائِنَةٍ مِنْ مِثْلِه وَالضَّمِيْرُ لِمَا نَزَّلْنَا وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ أَوْ لِلتَّبْيِيْنِ وَزَائِدَةٌ عِنْدَ الْاَخْفَشِ أَىْ بِسُوْرَةٍ مُمَاثَلَةٍ لِلْقُرْاٰنِ فِى الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ أَوْ لِعَبْدِنَا وَمِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ أَىْ بِسُوْرَةٍ كَائِنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلٰى حَالِه مِنْ كَوْنِه بَشَرًا أُمِّيًّا لَمْ يَقْرَأِ الْكُتُبَ وَيَتَعَلَّمِ الْعُلُوْمَ أَوْ صِلَةُ فَأْتُوْا وَالضَّمِيْرُ لِلْعَبْدِ وَالرَّدُّ إِلَى الْمُنَزَّلِ أَوْجَهُ لِاَنَّهُ الْمُطَابِقُ بِقَوْلِه: ﴿فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِثْلِه﴾ وَبِسَائِرِ اٰيَاتِ التَّحَدِّىْ وَلِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْهِ لَا فِى الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فَحَقُّهُ أَنْ لَا يَنْفَكَّ عَنْهُ لِيَتَّسِقَ التَّرْتِيْبُ وَالنَّظْمُ وَلِاَنَّ مُخَاطَبَةَ الْجَمِّ الْغَفِيْرِ بِأَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ مَا اَتٰى بِه وَاحِدٌ مِنْ اَبْنَاءِ جِلْدَتِهِمْ أَبْلَغُ فِى التَّحَدِّىْ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ لِيَأْتِ بِنَحْوِ مَا اَتٰى بِه هٰذَا اٰخَرُ مِثْلُهُ وَلِاَنَّهُ مُعْجِزٌ فِىْ نَفْسِه لَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْه لِقَوْلِه تَعَالٰى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِه﴾ وَلِاَنَّ رَدَّهُ اِلٰى عَبْدِنَا يُوْهِم اِمْكَانَ صُدُوْرِه مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلٰى صِفَتِه وَلَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى: ﴿وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ فَاِنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ يَسْتَعِيْنُوْا بِكُلِّ يَنْصُرُهُمْ وَيَعْضُدُهُمْ۔

অনুবাদ:____

من مثله -এর তারকীব ও ব্যাখ্যা

من مثله এটা سورة -এর صفت হয়েছে অর্থাৎ بسورة كائنة من مثله "কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস।" আর مثله -এর ضمير টি ما نزلنا -এর দিকে ফিরবে এবং من টি হবে تبغيضيه অথবা بيانيه । ইমাম আখফশ (র.) -এর মতে, من টি زائده (অতিরিক্ত)। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- "তোমরা এমন একটি সূরা নিয়ে আস যা ফাসাহত বালাগত এবং উত্তম বিন্যাসের ক্ষেত্রে কুরআনের সমকক্ষ হয়। অথবা مثله -এর ضمير ফিরবে عبدنا -এর দিকে আর তখন من টি হবে ابتدائيه এবং আয়াতের অর্থ হবে- "তোমরা এমন ব্যক্তি থেকে একটি সূরা নিয়ে আস যার অবস্থা হবে আমার বান্দা মুহাম্মদ (সা.) -এর অবস্থার ন্যায় অর্থাৎ নিরক্ষর; যে লেখা-পড়া জানে না।" অথবা من مثله এটা فأتوا -এর صله হবে এবং مثله -এর ضمير টি ফিরবে عبد -এর দিকে । তবে ما نزلنا -এর দিকে ফিরানো অধিক উত্তম। কেননা, এসূরতটিই আল্লাহ তা'লার বাণী– فأتوا بسورة مثله এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের আয়াতসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। এবং এজন্যও যে, মূল আলোচনা হল منزل (তথা কুরআন) সম্পর্কে; منزل عليه (তথা মুহাম্মদ সা.) সম্পর্কে নয়। তাই আলোচনার দাবি হল আলোচনাটি منزل তথা কুরআন থেকে ভিন্ন না হওয়া তাহলে বিন্যাস ও শব্দমালা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এবং ضمير -কে مانزلنا -এর দিকে ফিরানো

অধিক উত্তম এজন্যও যে, বিরাট এক দলকে এই বলে সম্বোধন করা যে, "তোমরা এমন বাক্য নিয়ে আস যেরকম তোমাদের বংশের একজন নিয়ে এসেছে" কঠোরভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এরকম সম্বোধন করার চেয়ে যে, "তিনি যে বাক্য নিয়ে এসেছেন সেই বাক্যের ন্যায় তার অনুরূপ কোন ব্যক্তি নিয়ে আসুক"। এবং এজন্যও উত্তম যে, কুরআনে কারীম রাসূলের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং এটা একটা সত্ত্বাগত মু'জিযা। কেননা, আল্লাহর বাণী– قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرأن لايأتون بمثله "হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, তোমরা মানব ও জিন জাতি সবাই মিলে যদি এই কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন বানাতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবেনা" (এ আয়াতের দাবি হল ضمير টি ما نزلنا -এর দিকে ফিরবে)। এবং এজন্যও অধিক উত্তম যে, ضمير টি عدنا -এর দিকে ফিরালে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন আনা সেই ব্যক্তির জন্য সম্ভব যে রাসূলের মত নয়। এবং এজন্যও যে, আল্লাহ তা'লার বাণী– وادعوا شهداء كم من دون الله আয়াতটির সাথে মিল থাকে না কারণ হল, এ আয়াতটি একথারই নির্দেশ দিচ্ছে যে, কাফিরগণ সেইসকল লোকের সাহায্য গ্রহণ করোক যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: عين مرجع الضمير فى قوله من مثله

উত্তর:

من مثله -এর মধ্যে ه যমীরে মাজরুরটি কোন দিকে ফিরেছে? তা নির্ণয় করা যাবে তার তারকীবের মাধ্যমে। من مثله -এর দু'টি তারকীব হতে পারে।

১. من مثله জার-মাজরুর মিলে كائنة شبه فعل مقدر -এর সাথে متعلق হয়ে سورة -এর صفت হবে। ইবারতটি এরকম হবে– بسورة كائنة من مثله । এমতাবস্থায় مثله -এর ضمير -এর مرجع সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা থাকতে পারে।

(ক) হয়ত ما نزل তথা কুরআনের দিকে ফিরবে আর তখন من টি হবে تبعيضيه অথবা بيانيه কিংবা আখফশের মতে, زائده হবে। ইমাম আখফশের মতে, كلام مثبت (হ্যাঁ বাচক বাক্যেও) من অতিরিক্ত হয়।

(খ) হয়ত مثله -এর ضمير টি ফিরবে عبد (মুহাম্মদ সা.) -এর দিকে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- তোমরা এমন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি সূরা নিয়ে আস যে আমার বান্দা মুহাম্মদ (সা.) -এর ন্যায় নিরক্ষর হবে। এই সূরতে من টি হবে ابتدائيه ।

মোটকথা, من مثله টি যখন سورة -এর صفت হবে তখন مثله -এর ضمير ফিরবে হয়ত ما نزل অথবা عبد -এর দিকে।

২. দ্বিতীয় তারকীব হল من مثله টি فأتوا -এর সাথে متعلق হবে এবং مثله -এর ضمير টি ফিরবে عبد -এর দিকে।

কাযী বায়যাবী (র.) -এর অভিমত

কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, من مثله -এর যে দুই তারকীব করা হল তন্মধ্যে প্রথমটি তথা من مثله টি سورة -এর صفت হওয়া এবং مثله -এর ضمير টি ما نزلنا -এর দিকে ফিরা আমার নিকট অধিক

পছন্দনীয়। এর উপর পাঁচটি দলীল পেশ করেছেন।

☆ ১ম দলীল: এ আয়াতের ন্যায় আরো যত চ্যালেঞ্জের আয়াত রয়েছে সবক'টির মধ্যেই منزل তথা কুরআনকে ضمير -এর مرجع সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– لايأتون بمثله এখানে مثله -এর ضمير টি ফিরেছে منزل তথা কুরআনের দিকে। তাই আলোচ্য আয়াতেও مثله -এর- ضمير ফিরবে ما نزلنا (কুরআন) -এর দিকে।

☆ ২য় দলীল: এখানে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে কুরআন সম্পর্কে; মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়নাই কাজেই مثله -এর ضمير ফিরবে কুরআনের দিকে; মুহাম্মদ (সা.) -এর দিকে নয়।

☆ ৩য় দলীল: مثله -এর- ضمير টি عبد -এর দিকে ফিরালে চ্যালেঞ্জ হবে শুধু একজনের সাথে। পক্ষান্তরে ما نزلنا -এর দিকে ফিরালে চ্যালেঞ্জ হবে বিরাট এক জামাতের সাথে। আর তখন চ্যালেঞ্জটিও জোরালোভাবে হবে। তাই مثله -এর ضمير টি ما نزلنا -এর দিকে ফিরানো অধিক পছন্দনীয়।

☆ ৪র্থ দলীল: مثله -এর ضمير -এর مرجع বান্দা তথা মুহাম্মদ (সা.) -কে সাব্যস্ত করা হলে অর্থ হবে, কুরআন মু'জিযা হওয়ার কারণ হল যেহেতু এটা মুহাম্মদ (সা.) -এর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ একথাটি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কেননা, কুরআন হল স্বতন্ত্র একটি মু'জিযা; কারো মাধ্যমে এটা মু'জিযা হয়নাই। তাই مثله -এর ضمير -এর مرجع 'ما نزلنا' হওয়াই অধিক পছন্দনীয়।

☆ ৫ম দলীল: عبد -কে مثله -এর- ضمير -এর مرجع ধরা হলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) -এর ন্যায় নিরক্ষর সে যদিও কুরআনের মুকাবেলা করতে অক্ষম; কিন্তু যে মুহাম্মদ (সা.) থেকেও আরো বেশী সাহিত্যিক সে হয়ত কুরআনের মুকাবেলা করতে সক্ষম। অথচ অন্য আয়াতে আছে- قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرأن لايأتون بمثله "হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, তোমরা মানব ও জিন জাতি সবাই মিলে যদি এই কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন বানাতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবে না"। এ আয়াতের মধ্যে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য কুরআনের মুকাবিলা করা অসম্ভব বলা হয়েছে কাজেই مثله -এর- ضمير -এর مرجع কুরআন হওয়াই অধিক পছন্দনীয়।

﴿وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾

وَالشُّهَدَاءُ : جَمْعُ شَهِيْدٍ بِمَعْنَى الْحَاضِرِ اَوِ الْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ وَالنَّاصِرِ أَوِ الْاِمَامِ كَـأَنَّهُ سُمِّىَ بِهِ لِاَنَّهُ يَحْضُرُ النَّوَادِىَ وَيَبْرِمُ بِمَحْضَرِهِ الْاُمُوْرُ اِذِ التَّرْكِيْبُ لِلْحُضُوْرِ اِمَّا بِالذَّاتِ اَوْ بِالتَّصَوُّرِ وَمِنْهُ قِيْلَ لِلْمَقْتُوْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ لِاَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوْهُ أَوِ الْمَلَائِكَةُ حَضَرُوْهُ۔

অনুবাদ:____________________

شهداء শব্দের তাহকীক

شهداء শব্দটি شهيد -এর বহুবচন। তার অর্থ হল উপস্থিত, সাক্ষিদাতা, সাহায্যকারী, ইমাম। সম্ভবতঃ ইমামকে شاهد বলা হয় এজন্য যে, ইমাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং তার সামনে মামলা-মুকাদ্দামা ধার্য্য করা হয়। কেননা, شهد -এর মূলগঠনে রয়েছে حضور বা উপস্থিতির অর্থ। হয়ত সত্তাগত উপস্থিতি (যেমন شهدت আমি উপস্থিত হলাম) অথবা কাল্পনিক উপস্থিতি (যেমন لم تكفرون بأيات الله وانتم تشهدون أى تعلمون এখানে شهادت টি ইলমের অর্থে ব্যবহৃত। আর ইলমের মধ্যে জ্ঞাত বিষয়টি স্মৃতিপটে উপস্থিত হয়)। আর তা থেকেই আল্লাহর রাহে প্রাণ বিসর্জনকারীদেরকে শহীদ বলা হয়। কেননা, শহীদ যে বিষয়ের আশাবাদী থাকে তথা জান্নাতের সে তো সেখানে উপস্থিত হয়ে যায় অথবা ফেরেশতাগণ তার নিকট উপস্থিত হোন।

☆☆☆

وَمَعْنَى دُوْنَ : اَدْنٰى مَكَانٍ مِنَ الشَّيْءِ وَمِنْهُ تَدْوِيْنُ الْكُتُبِ لِاَنَّهُ اِدْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْبَعْضِ . دُوْنَكَ هٰذَا أَىْ خُذْهُ مِنْ اَدْنٰى مَكَانٍ مِنْكَ ثُمَّ اُسْتُعِيْرَ لِلتَّرْتِيْبِ فَقِيْلَ زَيْدٌ دُوْنَ عَمْرٍو أَىْ فِى الشَّرْفِ وَمِنْهُ الشَّيْءُ الدُّوْنَ ثُمَّ اُتُّسِعَ فِيْهِ فَأُسْتُعْمِلَ فِىْ كُلِّ تَجَاوُزِ حَدٍّ اِلٰى حَدٍّ وَتَخْتَطِىْ اَمْرٌ اِلٰى اٰخَرَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿لَايَتَّخِذِ الْمُوْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ﴾ اَىْ لَايَتَجَاوَزُ وَلَايَةَ الْمُوْمِنِيْنَ اِلٰى وَلَايَةِ الْكَافِرِيْنَ. وَقَالَ اُمَيَّةُ۔ يَا نَفْسُ مَالَكِ دُوْنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ أَىْ اِذَا تَجَاوَزْتِ وَقَايَةَ اللّٰهِ فَلَايَقِيْكِ غَيْرٌ

অনুবাদ:____________________

دون -এর তাহকীক

دون অর্থ বস্তুর নিকটবর্তী স্থান। আর তা থেকে تدوين الكتب (কিতাবাদি সংকলন করা) উদগত। কেননা, কিতাব সংকলনের মধ্যে এক অংশকে অন্য অংশের নিকটবর্তী করে দেয়া হয়। دون থেকে دونك هذا ও উদগত। তার অর্থ হল এটাকে তোমার নিকটবর্তী স্থান থেকে নাও।

অতঃপর دون শব্দকে রূপকার্থে মর্যাদায় নিচু হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় زيد دون عمرو অর্থাৎ যায়েদ সম্মানের দিক দিয়ে আমরের নিচে। আর তা থেকে الشيء الدون (স্বল্প মূল্য/ নিকৃষ্ট জিনিস) উদগত। অতঃপর তার অর্থে আরো ব্যাপকতা এসেছে এবং এটা এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা এবং এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অতিক্রম করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– لايتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين অর্থাৎ মুমিনের বন্ধুত্ব যেন আরেক মুমিনকে ছেড়ে কাফিরদের দিকে অতিক্রম না করে। এবং (এ অর্থেই) কবি উমাইয়্যা বলেছেন– يا نفس مالك دون الله من واق أى اذا تجاوزت وقاية الله فلايقيك غير (হে অন্তর! আল্লাহ ছাড়া তোমাকে রক্ষাকারী আর কেউ নেই। অর্থাৎ তুমি যখন আল্লাহর হেফাজত থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন অন্য কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

☆☆☆

وَمِنْ مُتَعَلِّقٌ بِاُدْعُوْا وَالْمَعْنٰى وَادْعُوْا لِمُعَارَضَتِه مَنْ حَضَرَكُمْ أَوْ رَجَوْتُمْ مَعُوْنَتَهٗ مِنْ اَنْفُسِكُمْ وَجِنِّكُمْ وَالِهَتِكُمْ غَيرَ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ لَايَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِه اِلَّا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُوْنَ لَكُمْ بِأَنَّ مَا اَتَيْتُمْ بِه مِثْلُهٗ وَلَاتَسْتَشْهِدُوْا بِاللّٰهِ فَاِنَّهٗ مِنْ دِيْدَنِ الْمَبْهُوْتِ الْعَاجِزِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ بِشُهَدَاءِكُمْ أَىْ اَلَّذِيْنَ اِتَّخَذْتُمُوْهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ أَوِ الْحَقَّ زَعَمْتُمْ اَنَّهَا تَشْهَدُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوِ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ عَلٰى زَعْمِكُمْ مِنْ قَوْلِ الْاَعْشٰى تَرِيْكُ الْقَذٰى مِنْ دُوْنِهَا وَهِيَ دُوْنَهٗ لِيَعْنُوْنَكُمْ فِيْ اَمْرِهِمْ اِنْ يَسْتَظْهِرُوْا بِالْجَمَادِ فِيْ مُعَارَضَةِ الْقُرْاٰنِ غَايَةَ التَّبْكِيْتِ بِهِمْ وَقِيْلَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَىْ مِنْ دُوْنِ أَوْلِيَاءِ يَعْنِيْ فُصَحَاءَ الْعَرَبِ وَوُجُوْهَ الْمُشَاهَدِ يَشْهَدُوْا لَكُمْ أَنَّ مَا اَتَيْتُمْ بِه مِثْلُهٗ فَاِنَّ الْعَاقِلَ لَايَرْضٰى لِنَفْسِه أَنْ يَشْهَدَ بِصِحَّةِ مَا اتَّضَحَ فَسَادُهٗ وَبَانَ اِخْتِلَالُهٗ۔

অনুবাদ:

وادعوا شهداء كم من دون الله-এর ব্যাখ্যা

من (এটা দু'টি সম্ভাবনা রাখে। হয়ত এটা) ادعوا-এর সাথে متعلق। এমতাবস্থায় অর্থ হবে– তোমরা কুরআনের মুকাবেলার জন্য তাদেরকে আহবান করো যারা তোমাদের সামনে উপস্থিত অথবা যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার তোমরা আশবাদী। এরা চাই মানুষ অথবা জিন্নাত কিংবা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের মা'বূদগণই হোক। (অর্থাৎ যে সকল জিন্নাত, মানুষ এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সামনে উপস্থিত সবাইকে আহবান করো অথবা তোমরা মানুষ, জিন্নাত এবং আল্লাহ ছাড়া যে সকল মা'বূদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা রাখো এদের সবাইকে

কুরআনের মুকাবেলার জন্য আহবান করো এবং তাদের সকলের সাহায্য নিয়েও কুরআনের মুকাবেলা করো তবুও কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে পারবে না)। কেননা, কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই। অথবা (شهـــــــــــداء অর্থ সাক্ষী দাতাগণ। আর তখন) অর্থ হবে– তোমরা আল্লাহ ছাড়া ঐসকল সাক্ষীদাতাগণকে আহবান করো যারা তোমাদের পক্ষে এই সাক্ষী দিবে যে, তোমরা (কুরআনের মুকাবেলায়) যা রচনা করে নিয়ে এসেছো তা কুরআনের অনুরূপ। তবে আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে না। কেননা, সেই ব্যক্তিই আল্লাহকে সাক্ষী বানায় যে হতভম্ব হয়ে যায় এবং দলীল উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথবা من টি شهداء كم -এর সাথে متعلق আর তখন অর্থ হবে– তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে বন্ধু অথবা মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছো এবং যাদের সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণা আছে যে, তারা কিয়ামতের দিন তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা যারা তোমাদের ধারণানুযায়ী তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তাদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য আহবান করো। (এখানে প্রথম তাফসীরটি دون -কে 'ছাড়া' এবং দ্বিতীয় তাফসীর করা হয়েছে دون -কে 'সামনে' -এর অর্থে ব্যবহার করে। যেহেতু دون টি সামনে হওয়া অর্থে অস্পষ্ট কাজেই এর উপর আ'য়াশ্‌শী -এর উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, دون -এর অর্থ 'সামনে' এটা গ্রহণ করা হয়েছে) আ'য়াশ্‌শী -এর এই উক্তি থেকে– تريك القذى من دونها وهى دونه (আ'য়াশ্‌শী সেই কাঁচের অধিক পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করে বলছে, যে কাঁচ এতো বেশী পরিচ্ছন্ন যে, তার পিছনে যদি খড় কুটো পতিত হয় তাহলে তুমি ধারণা করবে যে, এটা কাঁচের সামনে পড়ে আছে। এ পংক্তির মধ্যে دون টি সম্মুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখিত ব্যাখ্যায় তাদের মা'বূদদেরকে কুরআনের মুকাবেলায় সাহায্যের জন্য আহবান করার আদেশ দেয়া হয়েছে অথচ এই সকল মা'বূদ তো জড়পদার্থ বস্তু। সুতরাং জড়পদার্থ বস্তু থেকে সাহায্য গ্রহণের জন্য আহবান করার নির্দেশ কিভাবে করা হল? এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন,) কুরআনের মুকাবেলায় তাদেরকে এই সকল জড়পদার্থ বস্তু থেকে সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা তাদেরকে একেবারে নিশ্চুপ ও তাদের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেন, (دون -এর পরে اوليـــــاء শব্দ উহ্য আছে। মূল ইবারত হবে) من دون اولياء আর شهداء দ্বারা উদ্দেশ্য, আরবের সাহিত্যিক এবং সেই সকল ভদ্রলোক যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। (আর বাক্যটির অর্থ হল, তোমরা তাদেরকে আহবান করো) যাতে তারা তোমাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তোমরা যা রচনা করেছো তা কুরআনের অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমাদের সাহিত্যিকরা তোমাদের রচনাকে কুরআনের অনুরূপ বলে সাক্ষী দিবে না। তোমরা তাদেরকে আহবান করে দেখো) কেননা, জ্ঞানী লোক যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে ভুল সেটার বিশুদ্ধতার সাক্ষী প্রদান করে না।

☆☆☆

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾
''যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক''

اِنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ جَوَابُهُ مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ وَالصِّدْقُ: اَلْاِخْبَارُ الْمُطَابِقُ وَقِيْلَ مَعَ اِعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ اَنَّهُ كَذَالِكَ عَنْ دَلَالَةٍ اَوْ اَمَارَةٍ لِاَنَّهُ تَعَالٰى كَذَّبَ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ قَوْلِهِمْ ﴿اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ﴾ عَالِمٌ يَعْتَقِدُ مُطَابَقَتَهُ وَرُدَّ بِصَرْفِ التَّكْذِيْبِ اِلٰى قَوْلِهِمْ نَشْهَدُ لِاَنَّهُ شَهَادَةُ اِخْبَارٍ عَمَّا عَلِمَهُ وَهُمْ مَا كَانُوْا عَالِمِيْنَ بِهِ ـ

অনুবাদ:

ان كنتم صادقين ''যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'' অর্থাৎ কুরআন যে মানব রচিত কিতাব এ ব্যাপারে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ان كنتم صادقين -এর جزاء এখানে উহ্য রয়েছে তার পূর্বের বাক্যটি তার উপর دلالت করছে। বাস্তবসম্মত সংবাদ দেওয়াকে صدق (সত্য) বলা হয়। আর কেউ কেউ বলেন, সংবাদ দাতারও এ বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক। এ বিশ্বাস হয়ত (অকাট্য) দলীল অথবা (সন্দেহ পূর্ণ) দলীল দ্বারা অর্জিত হবে। কেননা, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের উক্তি انك لرسول الله -এর মধ্যে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। তার কারণ হল তারা এ সংবাদটিকে বাস্তব সংবাদ বলে বিশ্বাস করত না। তবে এ উক্তিকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের উক্তি نشهد -এর মধ্যে। কেননা, شهادت বা সাক্ষ্য দান বলা হয় এমন কথার সংবাদ দেওয়া যা সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাস করে। আর মুনাফিকরা তো এ সংবাদকে বিশ্বাস করতো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

قوله جوابه محذوف الخ : ان كنتم صادفين এটা হল شرط আর তার جزاء এখানে فأتوا بمثله ان كنتم صادقين فأتوا بمثله وادعوا من يعينكم فى ذالك উহ্য আছে। মূল ইবারত হবে- وادعوا من يعينكم فى ذالك অর্থাৎ তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসো এবং তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে রাখো।

والصدق: الاخبار المطابق الخ : صدق -এর সংজ্ঞায় দু'টি অভিমত রয়েছে। জমহুরের এবং জাহিযের।

জমহুরের মতে, صدق বলা হয় বাস্তব সম্মত সংবাদ দেওয়া চাই সংবাদ দাতার বিশ্বাস থাকোক বা না থাকোক।

জাহিযের মতে, বাস্তবের মোতাবেক সংবাদ দেওয়া এবং সংবাদ দাতারও বিশ্বাস থাকা যে, এ সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক।

জাহিয তাঁর স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আয়াতটি হল اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون জাহিয বলেন, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের বক্তব্য انك لرسول الله

(আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল) -এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তাদের বক্তব্য বাস্তবতার নিরিখে সঠিক। কেননা, আল্লাহ তা'লাই বলেছেন والله يعلم انك لرسوله (আপনি যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল একথা আল্লাহ জানেন)'' এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তবে কেন আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললেন? এর উত্তর হল, তারা মুহাম্মদ (সা.) -কে আল্লাহর রাসূল বিশ্বাস করতো না। এ কারণে তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। আর এ মোতাবেক না হওয়ার কারণেই তাদের বক্তব্য বা সংবাদ মিথ্যা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ দাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়াই গ্রহণযোগ্য।

যুক্তি খন্ডন : আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের বক্তব্য انك لرسول الله -এর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তাদেরকে شهادت -এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কেননা, شهادت বলা হয় এমন কথার সংবাদ দেওয়া যা সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাস করে। আর মুনাফিকরা তো এ সংবাদকে বিশ্বাস করতো না। মোটকথা, তাদেরকে তাদের সাক্ষ্যের কারণে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে; সংবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি।

☆☆☆

﴿فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

''আর যদি তা না পার– অবশ্যই তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর''

لَمَّا بَيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَعَرَّفُوْنَ بِه اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا جَاءَ بِه وَمَيَّزَ لَهُمُ الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِلِ رَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَالْفَذْلَكَةِ لَهٗ وَهُوَ اِنَّكُمْ اِذَا اجْتَهَدْتُمْ فِيْ مُعَارَضَتِه وَعَجَزْتُمْ جَمِيْعًا عَنِ الْاِتْيَانِ بِمَا يُسَاوِيْهِ اَوْ يُدَانِيْهِ ظَهَرَ اَنَّهٗ مُعْجِزٌ وَالتَّصْدِيْقُ بِه وَاجِبٌ فَاٰمِنُوْا بِه وَاتَّقُوا الْعَذَابَ الْمُعَدَّ لِمَنْ كَذَّبَ فَعَبَّرَ عَنِ الْاِتْيَانِ الْمُكَيَّفِ بِالْفِعْلِ الَّذِيْ يَعُمُّ الْاِتْيَانَ بِه وَغَيْرَهٗ اِيْجَازٌ وَنَزَّلَ لَازِمَ الْجَزَاءِ مَنْزِلَةَ عَلٰى سَبِيْلِ الْكِنَايَةِ تَقْرِيْرًا لِلْمُكَنّٰى عَنْهُ وَتَهْوِيْلًا لِشَانِ الْعِنَادِ وَتَصْرِيْحًا بِالْوَعِيْدِ مَعَ الْاِيْجَازِ۔

অনুবাদ:________________

যোগসূত্র ও আয়াতের অর্থ

যখন আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য (স্বীয় উক্তি وان كنتم في ريب الخ -এর মাধ্যমে) সেই পথ বর্ণনা করে দিলেন যার দ্বারা তারা রাসূলের আনীত কুরআনের ব্যাপার (তথা সত্যতা) বুঝতে পারে এবং তাদের জন্য পৃথক করে দিলেন হক ও বাতিলকে। তখন তার সাথে তার সারগর্ভ কথা স্বরূপ

একটি কথা সংযুক্ত করে দিলেন। আর তা হল যখন সকলে মিলে কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অক্ষম হয়ে গেছ, তখন এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কুরআন মু'জিয এবং তার সত্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান এনে সেই আযাব থেকে রেহাই পাও যে আযাব প্রস্তুত করা হয়েছে সেই সকল লোকের জন্য যারা কুরআনকে অস্বীকার করে। আর اتيـان مـكيف -কে فـعـل দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যা اتيـــان و غيـر اتيـان উভয়টাকে শামিল রাখে সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে। আর كـنـايـه স্বরূপ جزاء (امنوا) -এর لازم (اتقوا) -কে جزاء -এর স্তরে রাখা হয়েছে مكنى عنه -এর দৃঢ়তার জন্য এবং হিংসার বৈশিষ্টের ভয়ানকতা প্রকাশ করার জন্য এবং সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তাকারে শাস্তির বিবরণ দেওয়ার জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

لـمـا بيـن لهـم ما يتعرفون به الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে তার যোগসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। যোগসূত্রটি হল এই– পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে রাসূলের রেসালত, তার নিয়ে আসা ইসলাম ধর্ম এবং কুরআনের সত্যতার প্রমাণাদির আলোচনা ছিল। আর এ আয়াতে উক্ত প্রমাণাদির ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। যরা সারাংশ হল এই– আল্লাহ তা'লা আরবকে সম্বোধন করে বলেন, হে আরবের লোকসকল! তোমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করেও কুরআনের অনুরূপ পেশ করতে পারোনি তাই এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কুরআনে কারীম মু'জিয এবং তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। সুতরাং তোমরা এখন কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং নিজেকে সেই আযাব থেকে বাঁচাও যে আযাব প্রস্তুত করা হয়েছে কুরআন অমান্যকারীদের জন্য।

قـولـه فعبر عن الاتيان المكيف الخ : এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল, فـان لم تفعلوا الخ এ আয়াত তো কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্য যে, কাফিরদের থেকে যা চাওয়া হয়েছিল তা পূর্ণ করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। আর তাদের কাছে তো اتيـان مـخـصـوص তথা কুরআনের অনুরূপ পেশ করতে চাওয়া হয়েছে। অতএব তাদের অক্ষমতা প্রকাশের সময় اتيـــــان مخصوص -কে উল্লেখ করলেন না কেন এবং এরকম বললেন না কেন?– فان لم تأتوا بالقرأن ولن تأتوا কিন্তু এরকম না বলে فـان لـم تـفعلوا বলা হয়েছে যা চাওয়া হয়েছে এবং যা চাওয়া হয়নাই সবই এর بـه অন্তর্ভুক্ত।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরকম করা হয়েছে সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে। কেননা, فـان لـم تـأتوا এরকম বললে بـالـقـرأن এবং بـــه এ দু'টি অংশকে অতিরিক্ত আনতে হবে। আর এ সংক্ষিপ্ততার দ্বারা উদ্দেশ্যের উপর কোন প্রভাবও পড়বে না। কেননা, পূর্বের বাক্য তথা فـــأتـوا بـسـورة -এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য এমনিতেই পরিস্কার হয়ে যায়।

প্রশ্ন: فان لم تفعلوا -এর جزاء তো হল فأمنوا সুতরাং এটাকে উল্লেখ না করে فاتقوا বলা হল কেন?

উত্তর: ايـمان بالقرأن -এর জন্য اتقاء نار হল لازم সুতরাং এখানে اتقوا বলে امنوا উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আর এরকম উদ্দেশ্য নেওয়ার মধ্যে তিনটি ফায়দা নিহিত রয়েছে।

১. ايـمان بالقرأن -কে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত করা। কেননা, নিয়ম আছে, الـكناية ابلغ تথা ملزوم من الصريح

২. যে বস্তু ঈমানের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে তথা অহংকার সেটাকে ভয়ানক রূপে প্রকাশ করা।

আল্লাহ তা'লা যেন এরকম বলেছেন যে, অহংকার এত মারাত্মক যে, যদি এ অহংকারবশতঃ তোমরা কুরআনের উপর ঈমান না আন তাহলে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি।

৩. ঈমান না আনার শাস্তি পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া।

☆☆☆

وَصَدَرَ الشَّرْطِيَّةَ بِاِنْ الَّذِىْ لِلشَّكِّ وَالْحَالُ تَقْتَضِىْ اِذَا الَّذِىْ لِلْجَوَابِ فَاِنَّ الْقَائِلَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى لَمْ يَكُنْ شَاكًّا فِىْ عِجْزِهِمْ وَلِذَالِكَ نَفٰى اِتْيَانَهُمْ مُعْتَرِضًا بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَتَهَكُّمًا بِهِمْ اَوْ خِطَابًا مَعَهُمْ عَلٰى حَسْبِ ظَنِّهِمْ فَاِنْ عَجزَ قَبْلَ التَّأَمُّلِ لَمْ يَكُنْ مُحَقَّقًا عِنْدَهُمْ۔

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তর

جملہ شرطیہ -এর শুরুতে সন্দেহ অর্থবহ ان ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এখানে وجوب و تیقن -এর অর্থবহ اذا ব্যবহার করা স্থানের অধিক উপযুগী। কেননা, جمله شرطيه -এর বক্তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা কাফিরদের অক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান নন। এজন্যেই তো شرط و جزاء -এর মধ্যখানে جمله معترضه হিসেবে সূরা রচনা করে নিয়ে আসার নফী করা হয়েছে। (এতদসত্তে ان ব্যবহার করা হয়েছে) তাদের সাথে উপহাস করার জন্যে অথবা তাদের সাথে তাদের ধারণা অনুযায়ী খেতাব করার জন্যে। কেননা, চিন্তা-গবেষণা করার পূর্বে তাদের অক্ষমতা তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وصدر الشرطية بان الذى للشك الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল فان لم تفعلوا الخ এই আয়াতে ان ব্যবহার না করে اذا ব্যবহার করা অধিক উপযুগী ছিল। কেননা, مضمون شرط তথা কাফিররা কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না এটা নিশ্চিত এবং এব্যাপারে আল্লাহ তা'লাও সন্দীহান নন। আর এজন্যেই তো شرط و جزاء -এর মধ্যখানে ولن تفعلوا -এর দ্বারা তাদের অক্ষমতাকে আরো দৃঢ় করা হয়েছে। অতএব مضمون شرط যখন يقينى আর يقينى বিষয়ে اذا ব্যবহার হয়; ان ব্যবহার হয় না। সুতরাং এখানে اذا -এর পরিবর্তে ان ব্যবহার করা হল কেন?

বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন। (১) اذا ব্যবহার না করে ان ব্যবহার করা হয়েছে কাফিরদের সাথে উপহাস করার জন্যে। অর্থাৎ তারা এত জাহিল যে, যে বিষয়টি সুপ্রমাণিত সে বিষয়েও তারা সন্দিহান। (২) তাদের অবস্থানুযায়ী এখানে ان ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কাফিরদের ধারণানুযায়ী তাদের অক্ষমতার বিষয়টি এখনও প্রমাণিত নয়। কেননা, তারা এখনও এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করেনি। গভীর চিন্তা-ফিকির করার পর স্বয়ং তাদের কাছে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

وَتَفْعَلُوْا جَزْمٌ بِلَمْ لِاَنَّهَا وَاجِبَةُ الْاَعْمَالِ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُضَارِعِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَعْمُوْلِ لِاَنَّهَا لَمَّا صَيَّرَتْهُ مَاضِيًا صَارَتْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَحَرْفُ الشَّرْطِ كَالدَّاخِلِ عَلَى الْمَجْمُوْعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَاِنْ تَرَكْتُمُ الْفِعْلَ وَلِذَالِكَ سَاغَ اِجْتِمَاعُهُمَا ـ

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তর

تفعلوا এটা لم -এর কারণে جزم হয়েছে। কেননা, لم -এর عمل করা অত্যাবশ্যক। এটা مضارع -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং معمول -এর সাথে সংযুক্ত। কেননা, তুমি যেহেতু مضارع -কে ماضى -এর অর্থে রূপান্তরিত করে ফেলেছ, তখন এটা যেন فعل -এর অংশবিশেষ হয়ে গেল এবং حرف شرط টি যেন সমষ্টির উপর প্রবেশ করল। যেন এরকম বলা হয়েছে– فان تركتم الفعل আর এজন্যেই ان এবং لم উভয়টি আসা জায়েয হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وتفعلوا جزم بلم الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল فان لم تفعلوا এখানে تفعلوا -এর শুরুতে দু'টি جازم عامل এসেছে। একটি হল ان এবং অপরটি হল لم । অথচ এক معمول -এর উপর দুই عامل আসতে পারে না। অতএব এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل কিভাবে আসল?

উত্তর : এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل আসেনি। কেননা, এখানে ان কোন عمل করেনি অর্থাৎ تفعلوا -কে ان جزم দেয়নি; বরং তাকে جزم দিয়েছে لم হরফটি। কেননা–

১. لم -এর জন্য আমল করা ওয়াজিব। অর্থাৎ لم টি যেখানেই আসবে সেখানেই আমল করবে।

২. لم টি শুধুমাত্র مضارع -এর শুরুতে আসে; ماضى -এর শুরুতে আসে না।

৩. لم টি تفعلوا -এর সাথে মিলিত; উভয়টির মধ্যখানে কোন فاصله প্রভেদকারী নেই।

৪. لم আসায় تفعلوا মুযারে'টি ماضى -এর অর্থে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সুতরাং لم এটা فعل -এর অংশে পরিণত হয়ে গেল। এ চার যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এখানে تفعلوا -এর عامل হচ্ছে لم হরফটি; ان নয়। কেননা, ان -এর জন্য আমল করা ওয়াজিব নয়, শুধু مضارع -এর শুরুতে আসে না; বরং ماضى -এর শুরুতেও আসে। আর তখন এটা শব্দের মধ্যে কোন আমল করতে পারে না। তাছাড়া এখানে تفعلوا এবং ان -এর মধ্যখানে لم টি প্রভেদকারী হিসেবে বিদ্যমান। এবং ان টি تفعلوا -এর অংশও নয়। সুতরাং এখানে ان টি تفعلوا -এর عامل হবে কিভাবে। কাজেই এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل আসেনি।

এখন প্রশ্ন হল মেনে নিলাম ان টি تفعلوا -এর عامل নয়। কিন্তু এখানে ان এবং لم উভয়টি কিভাবে আসল? কেননা, لم চায় مضارع -কে ماضى বানাতে আর ان চায় مستقبل -এর অর্থে রূপান্তরিত করতে। আর ماضى و مستقبل উভয়টি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এহিসেবে ان এবং لم একত্রিত হওয়া তো জায়েয নয়। কিন্তু এখানে কিভাবে একত্রিত হল?

উত্তর: এখানে ان এবং لم -এর মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে যে, لم টি مضارع -কে ماضى -এর অর্থে নিয়ে যায়। সুতরাং لم টি যেন تفعلوا ফে'লের অংশে পরিণত হয়ে গেল।

তখন تفعلوا । لم تفعلوا -এর অর্থ হবে تركتم الفعل । এমতাবস্থায় যেন ان হরফে শর্তটি لم এবং تفعلوا উভয়ের উপর প্রবেশ করল। অতএব এখন فان لم تفعلوا -এর অর্থ হবে فان تركتم الفعل

☆☆☆

وَلَـنْ كَلَامٍ فِـيْ نَـفْـيِ الْـمُسْتَـقْبِلِ غَيْرَ اَنَّهٗ اَبْلَغُ وَهُوَ حَرْفٌ مُقْتَضَبٌ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ وَالْـخَـلِيْـلِ فِـيْ اِحْدٰى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى اَصْلُهٗ لَا اَنْ وَعِنْدَ الْفَرَّاءِ لَا فَاُبْدِلَتْ اَلِفُهَا نُوْنًا۔

অনুবাদ:

লন -এর বিশ্লেষণ

لن টি نفى مستقبل -এর ক্ষেত্রে لام -এর ন্যায়। তবে لن টি নফীকে বেশী তাকীদ করে। ইমাম সীবাওয়ায়েহ্ এবং খলীল (র.) -এর এক বর্ণনা মতে, لـــــن এটা স্বতন্ত্র একটি হরফ (কোন কিছু থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি)। ইমাম খলীলের দ্বিতীয় বর্ণনা মতে, لـــن টি মূলত لا ان ছিল। আর ইমাম ফাররা (র.) -এর মতে, لا ছিল। الف -কে نـــون দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। (لـــن হয়ে গেল)।

☆☆☆

وَالْـوُقُـوْدُ بِالْفَتْحِ مَا تَوَقَّدَ بِهِ النَّارُ بِالضَّمِّ اَلْمَصْدَرُ وَقَدْ جَاءَ الْمَصْدَرُ بِالْفَتْحِ وَقَالَ سِيْبَـوَيْـهِ سَـمِـعْـنَـا مَـنْ يَـقُوْلُ وَقَدَتِ النَّارُ وُقُوْدًا عَالِيًا وَالْاِسْمُ بِالضَّمِّ وَلَعَلَّهٗ مَصْدَرٌ مُسَمًّى كَمَا قِيْلَ فُلَانٌ فَخْرُ قَوْمِهٖ وَزَيْنُ بَلَدِهٖ وَقَدْ قُرِئَ بِهٖ وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْاِسْمُ وَاِنْ اُرِيْدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَعَلٰى حَذْفِ مُضَافٍ اَىْ وُقُوْدُهَا اِحْتِرَاقُ النَّاسِ۔

অনুবাদ:

وقود শব্দের বিশ্লেষণ

وقـــــود (واو -কে ফাতহা দিয়ে) অর্থ যা দ্বারা আগুন জ্বালানো হয় (অর্থাৎ ইন্ধন)। আর واو -এর ضـــمـــه সহ হলে এটা হবে মাসদার (তথা আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়া)। আর কখনো واو -এর ফাতাহ্ সহ মাসদার হিসেবেও আসে। (যেমন) ইমাম সিবাওয়ায়েহ্ বলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনলাম সে বলছে– وقـدت الـنـار وقودا عاليا (وقودا -এর واو -কে ফাতহা দিয়ে। অর্থ- আগুন অনেক উপরে উঠেছে। এখানে واو -এর ফাতহা সহ وقود শব্দটি مـفـعـول مـطلق হয়েছে। আর مفعول مطلق মাসদার হয়ে থাকে কাজেই কখনো واو -এর ফাতহা সহ وقود টি মাসদার হয়ে

আসে)। এবং (ضـمـه -এর সাথে তো মাসদার হয় কিন্তু কখনো) ضـمـه -এর সাথে اسم টি وقود হয়ে থাকে। (এমতাবস্থায় তার অর্থ হবে- ইন্ধন)। সম্ভবতঃ (وقود টি واو -এর ضـمـه সহ মূলত) মাসদার ছিল (যার অর্থ হল, প্রজ্জ্বলিত হওয়া) তাকে اســـم বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়– فـلان فـخـر قومه وزين بلده (অমুক ব্যক্তি জাতির গর্ব এবং শহরের সৌন্দর্য)। (এখানে فخر এবং زين উভয়টি মূলে মাসদার। যার অর্থ হল, গর্ব করা এবং সুন্দর হওয়া। পরবর্তীতে فخر টি গর্ব এবং زيـــن টি সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল)। আর সুস্পষ্ট কথা হল, (আয়াতের মধ্যে) তার দ্বারা اســم উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে وقـــود দ্বারা ইন্ধন উদ্দেশ্য)। আর যদি তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে (الـنـاس -এর পূর্বে) একটি مـضـاف উহ্য মানতে হবে। (ইবারতের মূলরূপ হবে- وقودها احتراق الناس "দোযখের জ্বলা মানুষের জ্বলার নামান্তর।"

☆☆☆

اَلْحِجَارَةُ وَهِيَ جَمْعُ حَجَرٍ كَجِمَالَةٍ جَمْعُ جَمَلٍ وَهُوَ قَلِيْلٌ غَيْرُ قِيَاسٍ وَالْمُرَادُ بِهَا: اَلْاَصْنَامُ الَّتِيْ نَحَتُوْهَا وَقَرَنُوْا بِهَا اَنْفُسَهُمْ وَعَبَدُوْهَا طَمْعًا فِيْ شَفَاعَتِهِمْ وَالْاِنْتِفَاعِ بِهَا وَالْاِسْتِدْفَاعِ الْمُضَارِّ بِمَكَانَتِهِمْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى: ﴿اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ عُذِّبُوْا بِمَا هُوَ مَنْشَاءُ جُرْمِهِمْ كَمَا عُذِّبَ الْكَانِزُوْنَ بِمَا كَنَزُوْهُ اَوْ بِتَقَيُّضِ مَا كَانُوْا يَتَوَقَّوْنَ زِيَادَةً فِيْ تَحَسُّرِهِمْ وَقِيْلَ: اَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِيْ كَانُوْا يَكْنِزُوْنَهُمَا وَيَغْتَرُّوْنَ بِهِمَا وَعَلٰى هٰذَا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيْصِ اِعْدَادِ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْعَذَابِ بِالْكُفَّارِ وَجْهٌ وَقِيْلَ: حِجَارَةُ الْكِبْرِيْتِ وَهُوَ تَخْصِيْصٌ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ وَاِبْطَالٌ لِلْمَقْصُوْدِ اِذِ الْغَرَضُ تَهْوِيْلُ شَانِهَا تَفَاقُهُمْ لُهْبِهَا بِحَيْثُ يَقِدُ بِمَا لَايَتَّقِدُ بِهٖ غَيْرُهَا وَالْكِبْرِيْتُ تَتَّقِدُ بِهَا كُلُّ نَارٍ وَاِنْ ضَعُفَتْ فَاِنْ صَحَّ هٰذَا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض فَلَعَلَّهُ عَنٰى بِهٖ اَنَّ الْحِجَارَةَ كُلَّهَا تِلْكَ النَّارُ كَحِجَارَةِ الْكِبْرِيْتِ لِسَائِرِ النِّيْرَانِ۔

অনুবাদ:

حـجـارة শব্দের তাহকীক ও তাশরীহ

حـجـارة এটা حجر -এর বহুবচন। যেরকম جمالة টি جمل -এর বহুবচন। তবে (فعل -এর বহুবচন فعالة -এর ওযনে আসা) দুর্লভ ও নিয়মবহির্ভূত। (আয়াতের মধ্যে) حـجـارة বা পাথর দ্বারা সেই সকল মূর্তি উদ্দেশ্য, যে সকল মূর্তিকে কাফিররা পাথর কেটে নির্মান করে এবং এগুলোর সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে এবং এগুলোর ইবাদত করে এ আশায় যে, এই সমস্ত মুর্তিরা সুপারিশ করবে এবং তারা উপকৃত হবে এবং এ সকল মুর্তির সুউচ্চ মর্যাদার কারণে তাদের থেকে বিপদাপদ দূর হওয়ার কামনা করবে। এখানে মুর্তি উদ্দেশ্য হওয়ার উপর দলীল আল্লাহ তা'লার বাণী– انـكم وما

تعبدون من دون الله حصب جهنم (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর সবই জাহান্নামের ইন্ধন)।

কাফিরদেরকে সেই সকল পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে যে পাথরগুলো তাদের অপরাধের মূল কারণ ছিল। যেমনিভাবে সম্পদ সঞ্চয়কারীদেরকে সেই বস্তু দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে যে বস্তু তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল। অথবা কাফিরদের আক্ষেপ বাড়ানোর জন্য তারা যে বস্তুর আশা করেছিল সেটার বিপরিত বস্তু দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

কেউ কেউ বলেন, حـجـــارة দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য যেগুলো তারা জমা করে রাখত এবং এই স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তারা ধোঁকায় পড়ত। এ ব্যাখ্যানুযায়ী এ শাস্তিটি কাফিরদের সাথে বিশেষিত করার কোন অর্থ নেই।

কেউ কেউ বলেন, حـجـارة দ্বারা গন্ধক পাথর (হলুদ রঙের খনিজ পদার্থ বিশেষ) উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা দলীল বিহীন বিশেষত্ব এবং আয়াতের মূল উদ্দেশ্যকে বাতিল করার নামান্তর। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য হল দোযখের আগুনের ভয়ানকতা তুলে ধরা এবং অগ্নিস্ফূলিঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ দোযখের আগুন এত ভয়ানক যে, এ আগুন এমন বস্তু দ্বারা জ্বালানো হবে যা দ্বারা অন্যান্য আগুন জ্বালানো হয় না। আর গন্ধক পাথর দ্বারা তো সকল আগুন জ্বালানো যায়; যদিও সেই আগুন একেবারে হালকা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, حـجـارة দ্বারা গন্ধক পাথর উদ্দেশ্য এ বর্ণনাটি যদি সহীহ হয় তাহলে তিনি এর দ্বারা হয়ত এটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, এই আগুনের জন্য প্রতিটি পাথর এমন; অন্যান্য আগুনের জন্য গন্ধক যেমন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'লার বাণী وقودها الناس والحجارة-এর মধ্যে حجارة বা পাথর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এখানে পাথর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. পাথর দ্বারা সেই সকল মুর্তি উদ্দেশ্য যে সকল মুর্তি কাফিররা পাথর দিয়ে আবিষ্কার করত এবং এগুলোর ইবাদত করত। যেন এই মুর্তিগুলো তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করে এবং তাদেরকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করে। এখন প্রশ্ন হল, তাদেরকে এই পাথর নির্মিত মুর্তি দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে কেন? আল্লাহ চাইলে তো অন্য কোন বস্তু দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে পারেন?

বায়যাবী (র.) এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। (ক) এ পাথরই কাফিরদের কুফর ও শিরকের মূল কারণ ছিল। তাই তাদেরকে এ সকল পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। যেরকম যারা যাকাত আদায় করেনা এবং মাল-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে তাদের সেই সঞ্চয়কৃত মালগুলোকে আগুনের হার বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে। কেননা, তাদের অপরাধের মূল কারণ ছিল এই মাল-সম্পত্তিগুলো কাজেই তাদেরকে তাদের মাল দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপ কাফিরদের কুফর ও শিরকের মূল কারণ ছিল এই পাথরগুলো কাজেই এই পাথর দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হেবে। (খ) পাথর দ্বারা কাফরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তাদের দুঃখ-বেদনা বাড়ানোর জন্য। কেননা, এই পাথর নির্মিত মুর্তি থেকে তাদের আশা ছিল যে, এ মূর্তিগুলো তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেবে। যখন উল্টো ঐ মূর্তিগুলোই তাদেরকে

শাস্তি দেবে তখন তাদের আফসোসের আর শেষ থাকবে না।

২. পাথর দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য যেগুলো কাফিররা সঞ্চয় করে রাখত। কিন্তু এব্যাখ্যাটি দুর্বল। কেননা, যদি স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে এ জাতিয় শাস্তিকে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করার কোন অর্থ থাকে না। এ শাস্তি তো যাকাত অনাদায়কারী কিছুসংখ্যক মুমনিদেরকেও দেয়া হবে। অথচ কুরআনের ঘোষণা– اعدت للكافرين "এ শাস্তিটি বিশেষ করে কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।"

৩. পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর উদ্দেশ্য। কিন্তু এ অভিমতটিও দুর্বল। কেননা, এ অভিমতটি গ্রহণ করলে আয়াতের মূল মাকসাদ ফওত হয়ে যায়। কেননা, আয়াতের মূল মাকসাদ হল দোযখের আগুনের ভয়ানকতা এবং তার অগ্নিস্ফূলিঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য; এ আগুন দুনিয়ার নয়; বরং এ আগুন দোযখের আগুন। দোযখের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অনেক বেশী হবে। এমনকি দোযখের আগুনের ইন্ধনও দুনিয়ার আগুনের ইন্ধন থেকে ভিন্ন হবে। দুনিয়ার আগুনের উপর পাথর নিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু দোযখের আগুনের উপর পাথর নিক্ষেপ করলে সে আগুন আরো ধাউ ধাউ করে জ্বলে উঠবে। সুতরাং পাথর দ্বারা যদি গন্ধক উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে দোযখের আগুনের ভয়ানকতা কিভাবে প্রকাশ পাবে? কেননা, দুনিয়ার আগুনও অধিকাংশ গন্ধক দ্বারাই জ্বালানো হয়।

☆☆☆

وَلَمَّا كَانَتِ الْاٰيَةُ مَدَنِيَّةً نَزَلَتْ بَعْدَ مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فِيْ سُوْرَةِ التَّحْرِيْمِ ﴿وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ وَسَمِعُوْا صَحَّ تَعْرِيْفُ النَّارِ وُقُوْعَ الْجُمْلَةِ صِلَةً فَإِنَّهَا يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ قِصَّةً مَعْلُوْمَةً ـ

অনুবাদ:

النار -কে معرفه ব্যবহার করার কারণ

যেহেতু এই আয়াতটি মদীনাবতীর্ণ এবং সূরা তাহরীমের মধ্যে আল্লাহর বাণী نارا وقودها الناس والحجارة মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। এবং এটাকে আরবের লোকেরা শ্রবণও করে রেখেছিল। তাই এ আয়াতের মধ্যে نار -কে معرفه ব্যবহার করা সঠিক এবং পরবর্তী বাক্যটি صله হওয়াও সঠিক। কেননা, صله টি জানা বিষয় হওয়া জরুরী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

সন্দেহের অবসান:

এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর তা হল, সূরা তাহরীমের মধ্যে বলা হয়েছে– يا أيها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة অর্থাৎ نار -কে نكره এবং وقودها الناس والحجارة -কে صفت বানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة -এর মধ্যে النار -কে معرفه এবং وقودها الناس والحجارة -কে صله বানানো হয়েছে। এরকম ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার

করার কারণ কি?

বায়যাবী (র.) উপরোক্ত ইবারতের মাধ্যমে এরই জবাব দিয়েছেন। জবাবটির সারাংশ হল, কোন اسم -কে معرفه এবং কোন বাক্যকে صله বানানোর নিয়ম হল, এ দু'টি সম্পর্কে শ্রোতার প্রথমে জানা থাকতে হবে। এখন যেহেতু সূরা তাহরীমের আয়াত দ্বারা শ্রোতারা نار এবং وقودها الناس والحجارة সম্পর্কে জেনে নিয়েছে কাজেই তার পরে অবতীর্ণ আয়াতের মধ্যে النار -কে معرفه এবং وقودها الناس والحجارة -কে صله হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾

"এ শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য"

هُيِّأَتْ لَهُمْ وَجُعِلَتْ عِدَّةً لِعَذَابِهِمْ وَقُرِئَ أُعْتِدَتْ مِنَ الْعَتَادِ بِمَعْنَى الْعِدَّةِ وَالْجُمْلَةُ اِسْتِئْنَافٌ أَوْ حَالٌ بِإِضْمَارِ قَدْ مِنَ النَّارِ لَا مِنَ الضَّمِيْرِ الَّتِيْ فِيْ وُقُوْدِهَا وَإِنْ جَعَلْتَهُ مَصْدَرًا لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالْخَبَرِ۔

অনুবাদ:

অর্থাৎ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবং اعتدت ও পড়া হয়। (اعتدت) عتاد থেকে নির্গত যরা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা। এটা جمله مستانفه হয়েছে অথবা قد উহ্য ধরে النار থেকে حال তবে وقودها -এর ها যমীর থেকে حال হয়নি; তুমি وقود -কে مصدر ধরলেও না। কেননা, এমতাবস্থায় حال এবং ذوالحال -এর মধ্যখানে خبر দ্বারা প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

اعدت للكافرين এ বাক্যটি হয়ত استيناف অথবা حال হবে। তবে حال টি ماضى হলে তার শুরুতে قد যুক্ত করতে হয়। তাই এ বাক্যকে حال ধরলে قد -কে উহ্য মানতে হবে। এমতাবস্থায় তার ذوالحال কি হবে এপ্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) বলেন, তার ذوالحال হল النار শব্দটি। তবে এক্ষেত্রে وقودها -এর ها যমীরটি ذوالحال হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, ذوالحال و حال -এর মধ্যখানে فاصله থাকা জায়েয নয়। আর এখানে الناس والحجارة যা তারকীবে خبر হয়েছে এটা ذوالحال و حال -এর মধ্যখানে فاصله হয়ে যাবে। তাই وقودها -এর ها যমীরকে ذوالحال বলা যাবে না; বরং النار টি ذوالحال হবে।

وَفِى الْاٰيَتَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى النُّبُوَّةِ مِنْ وُجُوْهٍ: اَلْاَوَّلُ مَا فِيْهِمَا مِنَ التَّحَدِّىْ وَتَحْرِيْضٌ عَلَى الْجَدِّ وَبَذْلِ الْوَسْعِ فِى الْمُعَارَضَةِ بِالتَّقْرِيْعِ وَالتَّهْدِيْدِ وَتَعْلِيْقِ الْوَعِيْدِ عَلٰى عَدَمِ الْاِتْيَانِ بِمَا يُعَارِضُ اَقْصَرَ سُوْرَةٍ مِنْ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَاِشْتِهَارِهِمْ بِالْفَصَاحَةِ وَتَهَالُكِهِمْ عَلَى الْمَضَادَّةِ لَمْ يَتَصَدَّدُوْا لِلْمُعَارَضَةِ وَالْتَجَوُّا عَلٰى جَلَاءِ الْوَطَنِ وَبَذْلِ الْمَهْجِ وَالثَّانِىْ: اِنَّهُمَا تَتَضَمَّنَانِ الْاَخْبَارَ عَنِ الْغَيْبِ عَلٰى مَا هُوَ بِهٖ لَوْ عَارَضُوْهُ بِشَيْءٍ لَامْتَنَعَ خَفَاؤُهٗ عَادَةً وَالطَّاعِنُوْنَ فِيْهِ اَكْثَرُ مِنَ الذَّابِّيْنَ عَنْهُ فِىْ كُلِّ عَصْرٍ وَالثَّالِثُ: اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَوْ شَكَّ فِىْ اَمْرِهٖ لَمَا دَعَاهُمْ اِلَى الْمُعَارَضَةِ مُخَافَةَ اَنْ يُعَارِضَ فَتَدَحَّضَ حُجَّتُهٗ وَقَوْلُهٗ ﴿اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾ دَلَّ عَلٰى اَنَّ النَّارَ مَخْلُوْقَةٌ مُعَدَّةٌ لَهُمُ الْاٰنَ۔

অনুবাদ:

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় (তথা ان كنتم فى ريب থেকে اعدت للكافرين পর্যন্ত এই দুই আয়াতের) মধ্যে কয়েকভাবে নবুওয়াতের দলীল পাওয়া যায়। যথা (১) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ধমকির মাধ্যমে, কুরআনের ছোট সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে না পারার উপর ধমকিকে দোদুল্যমান রাখার সাথে, অতঃপর তারা সংখ্যায় প্রচুর হওয়া, ফাসাহত ও বলাগতে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং কুরআন ও রাসূলের বিরোধিতার উপর প্রাণ দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা সত্ত্বে কুরআনের মোকাবেলা করতে অগ্রসর না হয়ে দেশান্তরের আশ্রয় নিয়েছে। (২) এ দই আয়াতের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ।

অতঃপর যেভাবে সংবাদ দেয়া হয়েছে ঠিক অনুরূপ বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, তারা যদি কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা গোপন থাকত না। বিশেষ করে সেই সময় যখন প্রত্যেক যুগে কুরআনের দুর্নাম রটানোকারীদের সংখ্যা তার থেকে প্রতিহতকারীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক। (৩) যদি রাসূলের এব্যাপারে সন্দেহ থাকত তাহলে কখনও আরবের কাফিরদেরকে এই কঠোর ভাষায় দাওয়াত দিতেন না এ সেন্দেহে যে, তিনি মোকাবেলায় হেরে যাবেন।

اعدت للكافرين এ আয়াতটি দোযখ প্রথম থেকেই সৃষ্টি এবং প্রস্তুতকৃত হওয়ার উপর দলীল বহন করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, উল্লেখিত আয়াত তথা وان كنتم فى ريب থেকে اعدت للكافرين পর্যন্ত এ দুই আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সা.) -এর নবুওয়তকে তিন পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন। যথা–

১ম পদ্ধতি : فأتوا بسورة -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা বিরাট সংখ্যক লোক, আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক এবং শত্রুতায় কঠোরপন্থী লোকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আর وادعوا شهداء كم -এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যায় করার উপর অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং فـان لـم تـفـعـلـوا ولـن تـفـعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة -এর মাধ্যমে ধমক দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অপারগ হওয়া সত্ত্বে যদি ঈমান না আন তাহলে তোমাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু কেউই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসতে পারেনি। এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম তারই উপর অবতীর্ণ হয় যিনি নবুওয়তের ধারক-বাহক হন। অতএব রাসূলের নবুওয়ত প্রমাণিত হয়ে গেল।

২য় পদ্ধতি: পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে রাসূলের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে "ولـن تـفـعلوا" অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরের দল! তোমরা কখনও কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না। আর এ আয়াতটি যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এ পর্যন্ত চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে সেভাবেই কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। এটা এমন ভবিষ্যৎবাণী যেটাকে পক্ষের ও বিপক্ষের সবাই স্বীকার করে।

৩য় পদ্ধতি: রাসূল অবশ্যই জানতেন যে, আমার নবুওয়তের দাবী করার পর এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করার পর এর বিরোধিতা করা হবে। তা সত্ত্বে তিনি জোরালোভাবে দাবী করেছেন। এর অর্থ হল, তিনি স্বীয় নবুওয়ত ও কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে মোটেই সন্দিহান ছিলেন না। আর এজন্যেই তাঁর মনে কখনও এ সন্দেহ জাগেনি যে, আমি কাফিরদের সাথে মোকাবেলায় হেরে যাব এই ভয়ে তিনি দাবী করতে পিছপা হননি। সুতরাং হুযুর (সা.) -এর এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকাও নবুওয়তের একটি দলীল।

আল্লাহ তা'লা দোযখ পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছেন:

আল্লাহ তা'লার বাণী اعدت للكافرين এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, দোযখ পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এরকম নয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পরে দোযখ সৃষ্টি করা হবে। কেননা, এখানে اعـــدت (ماضى مجهول) বলা হয়েছে যা কোন কাজ পূর্বে সংঘটিত হওয়া বুঝায়।

☆☆☆

﴿وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ﴾

عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ وَالْمَقْصُوْدُ عَطْفُ حَالِ مَنْ اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ وَصْفُ ثَوَابِه عَلَى حَالِ مَنْ كَفَرَ بِه وَكَيْفِيَّةِ عِقَابِه عَلٰى مَا جَرَتْ بِه الْعَادَةُ الْاِلٰهِيَّةُ مِنْ أَنْ يُشْفَعَ التَّرْغِيْبَ بِالتَّرْهِيْبِ لِاِكْتِسَابِ مَا يُنْجِي وَتَشْبِيْطًا عَنْ اِقْتِرَافِ مَا يُرْدِّى لَا عَطْفُ الْفِعْلِ نَفْسِه حَتّٰى يَجِبَ أَنْ يُطْلَبَ لَهُ مَا يُشَاكِلُهٗ مِنْ اَمْرٍ اَوْ نَهْيٍ فَيُعْطَفَ عَلَيْهِ اَوْ عَلٰى فَاتَّقُوْا لِاَنَّهُمْ اِذَا لَمْ يَاْتُوْا بِمَا يُعَارِضُهٗ بَعْدَ التَّحَدِّىْ ظَهَرَ اِعْجَازُهٗ وَاِذَا ظَهَرَ

ذَالِكَ فَمَنْ كَفَرَ بِهِ اِسْتَوْجَبَ الْعِقَابَ وَمَنْ اٰمَنَ بِهِ اِسْتَحَقَّ الثَّوَابَ وَذَالِكَ يَسْتَدْعِىْ اَنْ يُخَوَّفَ هٰؤُلَاءِ وَيُبَشَّرَ هٰؤُلَاءِ وَاِنَّمَا اَمَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ عَالِمَ كُلِّ عَصْرٍ اَوْ كُلَّ اَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْبِشَارَةِ بِاَنْ يُبَشِّرَهُمْ وَلَمْ يُخَاطِبْهُمْ بِالْبِشَارَةِ كَمَا خَاطَبَ الْكَفَرَةَ تَفْخِيْمًا لِشَانِهِمْ وَاِيْذَانًا اَنَّهُمْ اَحِقَّاءُ بِاَنْ يُبَشَّرُوْا يُهْنَوْا بِمَا اَعَدَّ لَهُمْ وَقُرِئَ وَبُشِّرَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ عَطْفًا عَلٰى اُعِدَّتْ فَيَكُوْنُ اِسْتِيْنَافًا

অনুবাদ:____

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ও তার معطوف عليه

এ আয়াতের عـطـف হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যসমষ্টির উপর। উদ্দেশ্য হল কুরআনের উপর বিশ্বস স্থাপনকারীদের অবস্থা এবং তাদের সওয়াবের বর্ণনাকে কুরআনের অবিশ্বাসীদের অবস্থা এবং তাদের শাস্তির বর্ণনার উপর عـــــطف করা। কেননা, আল্লাহর চিরন্তন নীতি হল ভীতি প্রদর্শনেরে সাথে সাথে উৎসাহ প্রদান করা যাতে প্রিত্রাণ লাভকারী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধ্বংসাত্মক আমল পরিহার করে। শুধুমাত্র بشــــــر -কে عــــطف করা হয়নি। কেননা, তাহলে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল امر ও نهى জাতীয় ক্রিয়া অন্বেষণ করে তার উপর عطف করা আবশ্যক হবে। অথবা এ আয়াতের عطف হয়েছে فـاتقوا -এর উপর। কেননা, যখন অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বে কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারেনি, তখন কুরআন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল। আর কুরআন যখন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন যে কুরআনকে অবিশ্বাস করবে সে শাস্তির যোগ্য হবে এবং যে বিশ্বাস করবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এ উপযুক্ততার দাবী হল তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং সুসংবাদ দেওয়া।

আর (এ আয়াতে সুসংবাদ প্রদানের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হয়ত নবী কারীম (সা.) অথবা প্রত্যেক যুগের আলেম-উলামাকে। অথবা তাকে যে সুসংবাদ প্রদানের সামর্থ্য রাখে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে মুমিনগণকে সুসংবাদ প্রদান করবে। সরারসরি মুমিনগণকে সুসংবাদের সম্বোধন করা হয়নি যেরকম কাফিরদেরকে সরাসরি (ভীতি প্রদর্শনের সম্বোধন) করা হয়েছে। এরকম করা হয়েছে মুমনিগণের সম্মান প্রকাশের জন্য এবং এ বিষয়ে অবগত করার জন্য যে, মুমিনগণের জন্য যে অফুরন্ত নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখা হয়েছে তারা সেসকল নেয়ামতের সুসংবাদ পাওয়ার এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত।

আর بشر (صيـغـه مـجـهـول -এর সাথেও) পড়া হয়। এ অবস্থায় এটা اعـدت -এর উপর معطوف হবে এবং جمله مستانفه হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:____

السوال: قوله تعالى: وبشر الذين امنوا الخ

اكتب ربط الاية بما قبلها ثم بين علام عطفت هذه الاية وما المقصود منه؟

উত্তর : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র :

পূর্বের আয়াতগুলোতে অবিশ্বাসীদের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে মুমিন বা বিশ্বাসীদের শুভ পরিণতি ও তাদের পরলৌকিক অনাবিল সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি কিসের উপর معطوف ?

আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এ আয়াতের معطوف عليه সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) وَبَشِّرْ থেকে هم فيها خالدون পর্যন্ত বাক্য সমিষ্টির معطوف عليه হল পূর্বেকার ان كنتم فى ريب থেকে اعدت للكافرين পর্যন্ত বাক্যগুলো। عطف করার উদ্দেশ্য হল মুমিনগণের জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ-বিলাস, আনন্দ-ফূর্তি ও চরম তৃপ্তির আলোচনাকে কাফিরদের চরম দুঃখ-দুর্দশা এবং শাস্তির বর্ণনার সাথে عطف বা সম্পর্ক করা। কেননা, আল্লাহর চিরন্তন নীতি হল ভীতি প্রদর্শেনরে সাথে সাথে উৎসাহ প্রদান করা যাতে প্ররিত্রাণ লাভকারী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধ্বংসাত্মক আমল পরিহার করে। শুধুমাত্র بَشِّرْ -কে عطف করা হয়নি। কেননা, তাহলে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল امر ও نهى জাতীয় ক্রিয়া অন্বেষণ করে তার উপর عطف করা আবশ্যক হবে। কেননা, عطف বা সংযোগের ক্ষেত্রে এরূপ সামঞ্জস্যতা আবশ্যক হয়।

(২) অথবা وبشر থেকে هم فيها خالدون পর্যন্ত বাক্য সমিষ্টির معطوف عليه হল فاتقوا । তাহলে معطوف عليه ও معطوف উভয়টি امر হওয়ায় সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাবে। যখন অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বে কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারেনি, তখন কুরআন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল। আর কুরআন যখন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন [illegible]আনকে যে অবিশ্বাস করবে সে শাস্তির যোগ্য হবে এবং যে বিশ্বাস করবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এ উপযুক্ততার দাবী হল তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং সুসংবাদ দেওয়া।

قوله وانما امر الرسول الخ : এটা একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল بشروا -কে যখন পূর্বের فاتقوا -এর বিপরীতে আনা হয়েছে, তখন উচিত ছিল فاتقوا -এর মাধ্যমে যেভাবে সারাসরি কুরআনের অবিশ্বাসীদেরকে দোযখের আগুন থেকে রেহাই পাওয়ার হুকুম করা হয়েছে, সেভাবে সরাসরি মুমিনদেরকে সুসংবাদ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া এবং এরকম বলা فاستبشروا। "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।" কিন্তু এরকম না বলে بشر "সুসংবাদ প্রদান কর" কেন বললেন?

উত্তর: দুই কারণে এরকম বলা হয়েছে। যথা-

১. মুমিনগণের সম্মানার্থে। অর্থাৎ মুমিনগণ এত সম্মানী যে, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সরাসরি সুসংবাদ গ্রহণের নির্দেশ না দিয়ে অন্যের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

২. এ বিষয়ে অবগত করার জন্য যে, মুমিনগণের জন্য যে অফুরন্ত নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখা হয়েছে তারা সেসকল নেয়ামতের সুসংবাদ পাওয়ার এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত।

☆☆☆

وَالْبَشَارَةُ: اَلْخَبَرُ السَّارُّ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ اَثَرُ السُّرُوْرِ فِي الْبَشْرَةِ وَلِذَالِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ اَلْبِشَارَةُ هُوَ الْخَبَرُ الْاَوَّلُ حَتّٰى لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِعَبِيْدِه مَنْ بَشَّرَنِىْ بِقُدُوْمِ وَلَدِىْ فَهُوَ حُرٌّ فَاَخْبَرُوْهُ فُرَادٰى عَتِقَ اَوَّلُهُمْ وَلَوْ قَالَ مَنْ اَخْبَرَنِىْ عَتِقُوْا جَمِيْعًا وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ فَعَلَى التَّهَكُّمِ اَوْ عَلٰى طَرِيْقَةِ قَوْلِه:= تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيْعٌ-

অনুবাদ:

بشارة শব্দের বিশ্লেষণ

بشارة অর্থ- খুশীর সংবাদ। কেননা, আনন্দ ও খুশির চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়া চামড়ার উপরিভাগে বিকশিত হয়। এজন্যেই ফকীহগণ বলেন, আনন্দদায়ক বিষয়ের সর্ব প্রথম সংবাদকে بشارة বলা হয়। সুতরাং (এর উপর ভিত্তি করে তারা বলেন) যদি কেউ তার একাধিক গোলামকে বলে, যে গোলাম আমাকে আমার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। এখন আলাদা আলাদাভাবে কয়েকজন গোলাম যদি তার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনায় তাহলে কেবল মাত্র সর্বপ্রথম সংবাদবাহকই স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে যদি এ ঘোষণা করে, যে আমাকে পুত্রের আগমনের সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। তাহলে আগমনবার্তাবাহক সকল গোলামই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'লার বাণী– فبشرهم بعذاب اليم এটা বিদ্রূপাত্মক স্বরূপ বলা হয়েছে। অথবা কবির উক্তি– تحية بينهم ضرب وجيع -এর ন্যায় বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

بشارة শব্দের বিশ্লেষণ

بشارة শব্দটি بشرة থেকে বের হয়েছে। بشرة অর্থ চামড়ার উপরিভাগ। আনন্দ ও খুশীর চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়া যেহেতু চামড়ার উপরিভাগে বিকশিত হয় এজন্য আনন্দদায়ক সংবাদকে بشارة বলা হয়।

ফকীহগণ বলেন, আনন্দদায়ক বিষয়ের সর্ব প্রথম সংবাদকে بشارة বলে। কেননা, সর্বপ্রথম সংবাদ দ্বারাই আনন্দ ও খুশী লাভ হয়। আনন্দায়ক বিষয়ের প্রথম সংবাদের পরবর্তী সংবাদ দ্বারা কোন নতুন আনন্দ লাভ হয় না। এর উপর ভিত্তি করে তারা বলেন– যদি কোন মনিব ঘোষণা করে, যে গোলাম আমাকে আমার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। এখন আলাদা আলাদাভাবে কয়েকজন গোলাম যদি তার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনায় তাহলে কেবল মাত্র সর্বপ্রথম সংবাদবাহকই স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে যদি এ ঘোষণা করে, যে আমাকে পুত্রের আগমনের সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। তাহলে আগমনবার্তাবাহক সকল গোলামই স্বাধীন হয়ে যাবে।

وَالصَّالِحَاتُ جَمْعُ صَالِحَةٍ وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ الَّتِيْ تَجْرِيْ مَجْرٰى الْاَسْمَاءِ كَالْحَسَنَةِ قَالَ الْحُطَيْئَةُ ـ كَيْفَ الْهِجَاءُ وَمَا تَنْفَكُّ صَالِحَةٌ ☆ مِنْ اٰلِ لَامَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ تَأْتِيْنِيْ. وَهِيَ مِنَ الْاَعْمَالِ مَا سَوَّغَهُ الشَّرْعُ وَحَسَّنَهُ وَتَانِيْثُهَا عَلٰى تَاوِيْلِ الْخَصْلَةِ أَوِ الْخَلَّةِ وَاللَّامُ فِيْهَا لِلْجِنْسِ۔

অনুবাদ:____

صالحات শব্দের বিশ্লেষণ

صالحات শব্দটি صالحة -এর বহুবচন। صالحة শব্দটি সেই সকল সিফাতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো اسم -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন حسنة । কবি হুতাইয়্যা বলেন كيف الهجاء الخ । اعمال صالحه দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল আমল যেগুলোকে শরীয়ত বৈধ ও উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছে। صالحات -কে مونث ব্যবহার করা হয়েছে خصلة অথবা خلة -এর তাবীলে। তার لام তা'রীফ হল جنس -এর জন্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

صالحات শব্দের বিশ্লেষণ : صالحات শব্দটি صالحة -এর বহুবচন। الصلح মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ সংশোধিত হওয়া, সততা অবলম্বন করা, সৎ হওয়া। صالحة শব্দটি সিফাতের সীগা হওয়া সত্ত্বে তার মধ্যে اسميت প্রবল হওয়ার কারণে موصوف ছাড়াই ব্যবহার হয়। যেমন حسنة শব্দটির মধ্যে اسميت প্রবল হওয়ায় موصوف ছাড়াই ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কবি হুতাইয়্যার কবিতা। কবিতাটি হল كيف الهجاء وما تنفك صالحة ☆ من ال لام بظهر الغيب تأتيني কবিতার অর্থ হল- (কবি বলেন) আমি কিভাবে লাম গোত্রের তিরস্কার করব? অথচ তাদের পক্ষ থেকে আমার অনুপস্থিতিতেও সর্বদা আমার কাছে অনুদান আসতে থাকে। এখানে محل استشهاد হল صالحة শব্দটি যা اسم -এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে موصوف ছাড়াই ব্যবহার হয়েছে। اعمال صالحه দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল আমল যেগুলোকে শরীয়ত বৈধ ও উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছে।

প্রশ্ন: صالحات দ্বারা তো আমল উদ্দেশ্য। আর আমল হল مذكر সুতরাং صالحات -কে مونث কিভাবে ব্যবহার করা হল?

উত্তর: صالحات -কে مونث ব্যবহার করা হয়েছে আমলকে خصلة অথবা خلة -এর তাবীলে। কেননা, প্রত্যেক আমল এক একটি খাসলত বা স্বভাব।

☆☆☆

وَعَطَفَ الْعَمَلَ عَلَى الْإِيْمَانِ مُرَتِّبًا لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمَا إِشْعَارًا بِأَنَّ السَّبَبَ فِيْ إِسْتِحْقَاقِ هٰذِهِ الْبِشَارَةِ مَجْمُوْعُ الْأَمْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَإِنَّ الْإِيْمَانَ الَّذِيْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحْقِيْقِ وَالتَّصْدِيْقِ أُسٌّ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَلَاغِنَاءَ لَا بِنَاءَ عَلَيْهِ وَلِذَا قَلَّمَا ذُكِرَ مُفْرَدَيْنِ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ مُسَمَّى الْإِيْمَانِ إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيْهِ۔

অনুবাদ:____

আমলকে ঈমানের উপর عطف করা হল কেন?

আল্লাহ তা'লা ঈমান ও আমল উভয়ের সাথে (সুসংবাদের) হুকুমকে সংযুক্ত করে আমলকে ঈমানের উপর عطف করেছেন এ কথা অবহিত করার জন্য যে, ঈমান ও আমল উভয়টি একত্রে পাওয়া গেলে সুসংবাদের উপযুক্ত হবে। কেননা, ঈমান তথা সত্যায়ন করা ভিত্তি সমতুল্য আর নেক আমল তার উপর প্রাসাদ স্বরূপ। আর যে ভিত্তির উপর কোন প্রাসাদ নেই সেটা নিস্প্রয়োজন। এজন্যেই খুব কম ঈমান ও আমলকে পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে এ বিষয়ের উপর দলীল পাওয়া যায় যে, আমল ঈমানের মর্ম থেকে বহির্ভূত। কেননা, নিয়ম হল বস্তুর عطف স্বয়ং তার উপর এবং তার ভিতরের অংশের উপর না হওয়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জান্নাতী হওয়ার জন্য ঈমান ও আমল উভয়টি থাকা শর্ত :

জান্নাতী এবং মুক্তি পেতে হলে ঈমানের সাথে সাথে আমলও থাকতে হবে। কেননা, অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা প্রথমত ঈমানের উপর আমলকে عطف করে বলেন الذين امنوا وعملوا الصالحات অতঃপর উভয়টির উপর জান্নাতের সুসংবাদকে সন্নিবেশিত করেন। এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, জান্নাতের সুসংবাদ পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে। ঈমান হল মূল ভিত্তি এবং আমল হল তার উপর ইমারত। যেভাবে কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য শুধু ভিত্তিটি যথেষ্ট নয় বরং ইমারতেরও প্রয়োজন, সেভাবে নাজাতের জন্য শুধু ঈমান যথেষ্ট নয় বরং সাথে সাথে আমলও করতে হবে।

☆☆☆

أَنَّ لَهُمْ: مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ أَوْ مَجْرُوْرٌ بِإِضْمَارِهِ مِثْلُ "اَللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ"

অনুবাদ:____

ان لهم -এর ই'রাব

ان لهم এটা হরফে জারকে হযফ করার এবং بشر ফে'লকে তার দিকে সরাসরি متعدى করার মাধ্যমে منصوب অথবা উহ্য হরফে জারের মাধ্যমে منصوب । যেমন الله لافعلن

ان لهم -এর মধ্যে ই'রাবের দিক থেকে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত এটা محلا منصوب হবে অথবা محلا مجرور হবে। محلا منصوب হলে মূল ইবারত এভাবে হবে وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بأن لهم তার শুরু থেকে باء -কে نسيا منسيا হযফ করে بشر ফে'লকে তার দিকে সরাসরি متعدى করে নেয়া হয়েছে। নাহভীদের পরিভাষায় এ ধরনের منصوب হওয়াকে منصوب بنزع الخافض বলা হয়। আর যদি باء -কে نسيا منسيا হযফ করা না হয় বরং তাকে উল্লেখের পর্যায়ে ধরা হয় তাহলে ان لهم টি محلا مجرور হবে। যেমন الله لافعلن -এর শুরুতে উহ্য واو قسميه -কে উল্লেখের পর্যায়ে ধরে الله শব্দকে জর দিয়ে পড়া হয়।

☆☆☆

وَالْجَنَّةُ اَلْمَرَّةُ مِنَ الْجِنِّ وَهُوَ مَصْدَرُ جَنَّهٗ إِذَا سَتَرَهٗ وَمُدَارُ التَّرْكِيْبِ عَلَى السُّتْرَةِ سُمِّيَ بِهَا الشَّجَرَ الْمُظَلِّلَ لِإِلْتِفَاتِ اَغْصَانِهٖ لِلْمُبَالَغَةِ كَأَنَّهٗ يَسْتُرُ مَا تَحْتَهٗ سَتْرَةً وَاحِدَةً قَالَ ـ كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِيْ غَرْبِيْ مُقْتَلَةٌ + مِنَ الْبَوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقًا. أَيْ نَخْلًا طَوِيْلًا ثُمَّ الْبُسْتَانُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاَشْجَارِ الْمُتَكَاثِفَةِ الْمُظَلِّلَةِ ثُمَّ دَارُ الثَّوَابِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْجِنَانِ وَقِيْلَ سُمِّيَتْ بِذَالِكَ لِاَنَّهٗ سُتِرَ فِي الدُّنْيَا مَا أُعِدَّ فِيْهَا لِلْبَشَرِ مِنْ اَفْنَانِ النِّعَمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ وَجَمْعَهَا وَتَنْكِيْرُهَا لِاَنَّ الْجِنَانَ عَلٰى مَا ذَكَرَهٗ اِبْنُ عَبَّاسٍ رضـ سَبْعٌ: جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَجَنَّةُ عَدْنٍ وَجَنَّةُ النَّعِيْمِ وَدَارُ الْخُلْدِ وَجَنَّةُ الْمَأْوٰى وَدَارُ السَّلَامِ وَعِلِّيُّوْنَ وَ فِيْ كُلٍّ مِنْهَا مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ عَلٰى حَسْبِ تَفَاوُتِ الْاَعْمَالِ وَالْعُمَّالِ ـ

অনুবাদ:

জান্নাতের তাফসীর

جنة শব্দটি (فعلة -এর ওযনে) اسم مره অর্থ একবারে ঢেকে ফেলা। এটা جن থেকে নির্গত এবং جنَّ টি جنَّ -এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা। جنة এমন বৃক্ষ সমষ্টিকে বলে যেগুলোর ডালপালা পরস্পর নিবিড়ভাবে মিলে থাকার কারণে নিরংকুশ ছায়া প্রদান করে। যেন বৃক্ষগুলো তার নিম্নাংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবি বলেন, كأن عيني في غربي مقتلة + من البواضح تسقي جنه سحقا (কবিতার অর্থ: সঞ্চনকারীনী এক অনুগামীনী উষ্ট্রীর দুই বালতির দিকে যেন আমার দৃষ্টিপাত, যে উষ্ট্রি লম্বা খেজুর বৃক্ষগুলোতে পানি সেঞ্চন করে)। পরবর্তীতে জান্নাত শব্দটি বাগান ও উদ্যানের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, বাগানে ছায়া

দানকারী বৃক্ষ সমষ্টি থাকে। অতপর জান্নাত শব্দটি دار الثواب -এর জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, প্রতিদানের স্থানে বাগ-বাগিচা থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, دار الثـواب -কে জান্নাত এ কারণে বলা হয় যে, دار الثـواب তথা প্রতিদানের স্থানে মানুষের জন্য যেসব নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রয়েছে তা মানব চক্ষুর অন্তরালে। সুতরাং এমর্মে ইরশাদ হচ্ছে- فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين। جنات শব্দকে বহুবচন এবং نكره ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হল, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে, জান্নাত সাতটি: ১. জান্নাতুল ফিরদাউস ২. জান্নাতুল আদন ৩. জান্নাতুন নাঈম ৪. দারুল খুলদ ৫. জান্নাতুল মা'ওয়া ৬. দারুস সালাম ৭. ইল্লিয়্যুন। আবার প্রত্যেক জান্নাতে আমল ও আমলকারীদের স্তর ভেদে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জান্নাতের তাফসীর

الجنة শব্দটি فعلة -এর ওযনে اسم مره । অর্থ একবারে ঢেকে ফেলা। জান্নাত শব্দটি جن থেকে নিষ্পন্ন। জ্বিন জাতি যেরকম মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকে তদ্রূপ জান্নাতও মানুষের চক্ষুর আড়ালে। جـنـة এমন বৃক্ষ সমষ্টিকে বলে যেগুলোর ডালপালা পরস্পর নিবিড়ভাবে মিলে থাকার কারণে নিরংকুশ ছায়া প্রদান করে। যেন বৃক্ষগুলো তার নিম্নাংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবি বলেন, كـأن عينى فى غربى مقتلة + من البواضح تسقى جنه سحقا (কবিতার অর্থ: সেঞ্চনকারীনী এক অনুগামীনী উষ্ট্রীর দুই বালতির দিকে যেন আমার দৃষ্টিপাত, যে উষ্ট্রি লম্বা খেজুর বৃক্ষগুলোতে পানি সেঞ্চন করে)। এ কবিতার মধ্যে جنة শব্দটি محل استشهاد যা বৃক্ষ সমষ্টির জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জান্নাত শব্দটি বাগান ও উদ্যানের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, বাগানে ছায়া দানকারী বৃক্ষ সমষ্টি থাকে। অতঃপর জান্নাত শব্দটি دار الثـــواب -এর জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, প্রতিদানের স্থানে বাগ-বাগিচা থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, دار الثواب -কে জান্নাত এ কারণে বলা হয় যে, دار الثواب তথা প্রতিদানের স্থানে মানুষের জন্য যেসব নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রয়েছে তা মানব চক্ষুর অন্তরালে।

جنات শব্দকে বহুবচন এবং نكره ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হল, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে, জান্নাত সাতটি: ১. জান্নাতুল ফিরদাউস ২. জান্নাতুল আদন ৩. জান্নাতুন নাঈম ৪. দারুল খুলদ ৫. জান্নাতুল মা'ওয়া ৬, দারুস সালাম ৭. ইল্লিয়্যুন। আবার প্রত্যেক জান্নাতে আমল ও আমলকারীদের স্তর ভেদে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

وَالّـلامُ تَـدُلُّ عَـلٰـى اِسْتِـحْقَاقِهِمْ اِيَّاهَا لِاَجْلِ مَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِيْمَان وَالْعَمَلِ الـصَّـالِحِ لَا لِذَاتِه فَاِنَّهٗ لَا يُكَافِي النِّعَمَ السَّابِقَةَ فَضْلًا مِنْ اَنْ يَقْتَضِيَ ثَوَابًا وَجَزَاءً فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ بَلْ بِجَعْلِ الشَّارِعِ وَمُقْتَضٰى وَعْدِه وَلَا عَلَى الْاِطْلَاقِ بَلْ بِشَرْطِ اَنْ يَّسْتَمِرَّ عَـلَيْهِ حَتّٰى يَمُوْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِقَوْلِه تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَـافِـرٌ فَـاُولٰئِكَ حَبِـطَـتْ اَعْمَالُهُمْ﴾ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى لِنَبِيِّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وَاَشْبَاهُ ذَالِكَ وَلَعَلَّهٗ سُبْحَانَهٗ لَمْ يُقَيِّدْ هٰهُنَا اِسْتِغْنَاءً بِهَا۔

অনুবাদ:

لهم -এর লাম কোন অর্থে ব্যবহৃত?

لهم -এর লাম টি اسـتحـقـاق (অধিকার বুঝানোর) অর্থে। অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্য যে, জান্নাতের অধিকারী হবে সেই ঈমান ও আমলের কারণে যার উপর সুসংবাদকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে এ অধিকার সত্ত্বাগত অধিকার নয়। কেননা, ঈমান ও আমলের কারণে ভবিষ্যতে (তথা আখেরাতে) সওয়াবের অধিকারী হবে তো দূরের কথা; পূর্বের নিয়ামতরাজিরও বদলা নয়। বরং মুমিনগণ জান্নাতের অধিকারী হন আল্লাহ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে এবং তাঁর অঙ্গিকারের ভিত্তিতে। আবার শর্তহীনভাবে জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে না; বরং ঈমানের উপর অটল-অবিচল থেকে ঈমান নিয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান- "তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হয় এবং কুফুর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার অমল বিফলে যাবে।" তাছাড়া আল্লাহ তা'লা তাঁর নবী (আ.) -কে সম্বোধন করে বলেছেন- "তুমি যদি শিরকে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে।" অনুরূপ আরো আয়াত রয়েছে। সম্ভবত এইসকল আয়াতের উপর নির্ভর করে অত্র আয়াতে (استقامت) -এর শর্ত লাগান নি।

☆☆☆

﴿تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ﴾

اَىْ مِنْ تَحْتِ اَشْجَارِهَا كَمَا تَرَاهَا جَارِيَةً تَحْتَ الْاَشْجَارِ النَّابِتَةِ عَلٰى شَوَاطِئِهَا وَعَنْ مَسْرُوْقٍ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَجْرِىْ فِىْ غَيْرِ اُخْدُوْدٍ وَاللَّامُ فِى الْاَنْهَارِ لِلْجِنْسِ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ لِفُلَانٍ بُسْتَانٌ فِيْهِ الْمَاءُ الْجَارِىْ أَوْ لِلْعَهْدِ هِىَ الْاَنْهَارُ الْمَذْكُوْرَةُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: ﴿فِيْهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ اَلْاٰيَةَ﴾ وَالنَّهْرُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُوْنِ اَلْمَجْرٰى الْوَاسِعُ فَوْقَ الْجَدْوَلِ دُوْنَ الْبَحْرِ كَالنِّيْلِ وَالْفُرَاتِ وَالتَّرْكِيْبُ لِلسَّعَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَاءُهَا عَلَى الْاِضْمَارِ أَوِ الْمُجَازُ أَوِ الْمَجَارِىْ أَنْفُسُهَا وَاِسْنَادُ الْجَرْىِ اِلَيْهَا مُجَازٌ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: ﴿وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا﴾ .

অনুবাদ:

অর্থাৎ বৃক্ষরাজির তল দেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাতিহ হবে। যেমন তুমি দেখতে পাও যে, (পৃথিবীর মধ্যে) নদী সমূহ সেই সকল বৃক্ষের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় যেগুলো নদীর কিনারায় উত্থিত হয়। আর মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাতের নহর সমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

الانهار -এর لام تعريف টি جنسى (এর দ্বারা عهد ذهنى উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেন এর দ্বারা استغراقى উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সমস্ত নহর)। যেমন তোমার উক্তি– لفلان بستان فيه الماء الجارى -এর মধ্যে الماء -এর لام تعريف টি جنسى -এর জন্য। অথবা الانهار -এর لام تعريف টি عهد خارجى তার معهود টি সেই সকল নহর যা আল্লাহ তা'লার বাণী– فيها أنهار من ماء غير اسن -এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

النهر : নূনে ফাতহা এবং হা সুকূনের সাথে পঠিত। প্রশস্ত নালাকে নহর বলা হয়, যা খাঁদ থেকে বড় এবং নদী থেকে ছোট। যেমন নীল এবং ফুরাত। নহরের মূল অক্ষরের মধ্যে পশস্ততার অর্থ বিদ্যমান।

انهار দ্বারা নহরের পানি উদ্দেশ্য। তখন انهار -এর পূর্বে مضاف উহ্য থাকবে। অথবা مجازا পানি উদ্দেশ্য। অথবা স্বয়ং নালাসমূহ উদ্দেশ্য। আর প্রবাহিত হওয়ার সম্বন্ধ তার দিকে করা হয়েছে মুজাযিভাবে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী– واخرجت الارض أثقالها

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

تجرى من تحتها الانهار আয়াতের তাফসীর

জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়ার ব্যাখ্যা হল, জান্নাতে যেসকল বৃক্ষরাজি থাকবে সেগুলোর পার্শ্ব দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ বৃক্ষরাজি এই নহরসমূহের কিনারায় উত্থিত হবে। যেমন পৃথিবীর মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় নদীর পার্শ্বে গাছ-গাছালি লাগানো থাকে।

জান্নাতের নহরসমূহ কিভাবে প্রবাহিত হবে

হযরত মাসরূক (র.) বলেন, জান্নাতের নহরসমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার নহরসমূহ প্রবাহিত হতে হলে পরিখা করতে হয়; কিন্তু জান্নাতের নহরসমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

নহর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

অত্র আয়াতে নহর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে নহর দ্বারা নহরের পানি উদ্দেশ্য। তখন انهار-এর পূর্বে مضاف উহ্য থাকবে। অথবা مجازا পানি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নালা যেহেতু পানির ظرف (পাত্র) আর পানি হল তার مظروف (পাত্রস্থ) সুতরাং এখানে ظرف উল্লেখ করে مظروف (তথা পানি) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে مجاز مرسل পাওয়া গেল। অথবা স্বয়ং নালাসমূহ উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হল, নহর দ্বারা নহরই উদ্দেশ্য হয় তাহলে تجرى তথা প্রবাহিত হওয়াকে নহরের দিকে কিভাবে সম্বন্ধ করা হল। কেননা, নহর তো প্রবাহিত হয়না; বরং পানি প্রবাহিত হয়। এর উত্তর হল এখানে প্রবাহিত হওয়াকে নহরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে مجازا (রূপকার্থে)। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- واخرجت الارض أثقالها-এর মধ্যে اخرج তথা বের করার সম্বন্ধ করা হয়েছে জমিনের দিকে অথচ জমিন নয়; আল্লাহ তা'লা বের করবেন। কিন্তু জমিনের দিকে مجازا সম্বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ অত্র আয়াতের মধ্যেও রূপকার্থে নহরের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়েছে রূপকার্থে।

﴿كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾

صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِجَنَّاتٍ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ أَوْ جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ كَأَنَّهُ لَمَّا قِيْلَ اِنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ وَقَعَ فِىْ خَلَدِ السَّامِعِ اَثْمَارُهَا مِثْلُ ثِمَارِ الدُّنْيَا اَمْ اَجْنَاسٌ اُخَرُ فَاُزِيْحَ بِذَالِكَ وَكُلَّمَا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ وَرِزْقًا مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَمِنَ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ لِلْاِبْتِدَاءِ وَاقِعَتَان مَوْقِعَ الْحَالِ وَاَصْلُ الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ كُلَّ حِيْنٍ وَمَرَّةٍ رُزِقُوْا مَرْزُوْقًا مُبْتَدَأً مِنَ الْجَنَّاتِ مُبْتَدَأً مِنْ ثَمَرِهٖ قِيْلَ: اَلرِّزْقُ بِكَوْنِهٖ مُبْتَدَأً مِنَ الْجَنَّاتِ وَاِبْتِدَاءُهٗ مِنْهَا بِاِبْتِدَائِيَّةٍ مِنْ ثَمَرَةٍ فَصَاحَبَ الْحَالُ الْاُوْلٰى رِزْقًا وَصَاحَبَ الْحَالُ الثَّانِيَةُ ضَمِيْرَهٗ الْمُسْتَكِنُّ فِى الْحَالِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ ثَمَرَةٍ بَيَانًا تَقَدَّمَ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَدًا وَهٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنْوَاعِ مَا رُزِقُوْا كَقَوْلِكَ مُشِيْرًا اِلٰى نَهْرٍ جَارٍ هٰذَا الْمَاءُ لَايَنْفَكُّ فَاِنَّكَ لَاتَعْنِىْ بِهِ الْعَيْنَ الْمُشَاهَدَ مِنْهُ بَلِ النَّوْعَ الْمَعْلُوْمُ الْمُسْتَمِرُّ بِتَعَاقُبِ جِرْيَانِهٖ وَاِنْ كَانَتِ الْاِشَارَةُ اِلٰى عَيْنِهٖ فَالْمَعْنٰى هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ وَلٰكِنْ لَمَّا اِسْتَحْكَمَ الشِّبْهُ بَيْنَهُمَا جُعِلَ ذَاتُهٗ ذَاتَهٗ كَذَالِكَ اَبُوْ يُوْسُفَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ۔

অনুবাদ:

كلما رزقوا الخ আয়াতের তারকীব

এ বাক্যটি جنات- এর দ্বিতীয় সিফাত অথবা مبتدا محذوف- এর خبر অথবা جمله مستانفه। যখন বলা হল, তাদের জন্য বাগিচা র'য়েছে তখন যেন শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগল যে, জান্নাতের ফল কি দুনিয়ার ফলের মত না ভিন্ন? সুতরাং এ বাক্য দ্বারা উক্ত সন্দেহের অবসান ঘটানো হয়েছে। كلما টি مفعول فيه হিসেবে محلا منصوب হয়েছে, رزقا এটা رزقوا- এর مفعول به। প্রথম من এবং দ্বিতীয় من - ابتداء -এর জন্য যা حال -এর স্থানে পতিত হয়েছে। মূল বাক্য এবং তার অর্থ হল যখন তাদেরকে জান্নাতের ফল থেকে কিছু খাবার দেয়া হবে। রিযিককে শর্তযুক্ত করা হয়েছে যে, এ রিযিক জান্নাতের রিযিক। আর জান্নাতের রিযিক হওয়ার অর্থ হল এ রিযিক জান্নাতের ফল-মূল থেকে হবে। সুতরাং প্রথম حال -এর ذوالحال হল رزقا এবং দ্বিতীয় حال -এর ذوالحال হল رزقا -এর সেই ضمير যা প্রথম حال -এর ভিতরে লুকায়িত আছে। আর সম্ভব আছে من ثمرة টি رزقا -এর بيان مقدم হয়েছে। যেমন তোমার উক্তি رأيت منك أسدا -এর মধ্যে (منك টি اسدا -এর بيان مقدم)। এবং هذا দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদেরকে যে ফল-মূল দেয়া হবে তার বিভিন্ন প্রকারের দিকে। যেমন তুমি প্রবাহমান নদীর দিকে ইশারা করে বল "এ পানি শেষ হবে না।" এর দ্বারা তুমি অবশ্য প্রত্যক্ষ পনি উদ্দেশ্য কর না; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাক এমন

এক প্রকার পনি যা অবিরাম প্রবাহিত হতে থাকে। যদিও ইশারা করা হয়েছে নির্দিষ্ট পানির দিকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে "এটা তার অনুরূপ যা আমাদেরকে প্রথমে দেয়া হয়েছে।" কিন্তু সাদৃশ্যতা যখন দৃঢ় হয়ে গেল তখন জান্নাতের রিযিককে দুনিয়ার রিযিকের মতই বলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل
السوال: (الف) اكتب وجوه اعرابها على نهج المفسر العلام
(ب) الام اشار بقوله 'هذا' و كيف؟

الف : উত্তর : كلما رزقوا الخ এ আয়াতের তিনটি তারকীব। যথা–

১. এ গোটা বাক্য পূর্বের আয়াতের جنات শব্দের দ্বিতীয় সিফাত; আর প্রথম সিফাত হল تجرى من تحتها الانهار বাক্যটি।

২. هم مبتدا محذوف -এর خبر।

৩. جمله مستانفه । উহ্য প্রশ্নের জবাবে যে বাক্য আসে তাকে جمله مستانفه বলা হয়। অত্র বাক্য দ্বারাও একটি সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে। কেননা, যখন বলা হল, তাদের জন্য বাগিচা রয়েছে তখন কেমন যেন শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগল যে, জান্নাতের ফল কি দুনিয়ার ফলের মত না ভিন্ন? সুতরাং এ বাক্য দ্বারা উক্ত সন্দেহের অবসান ঘটানো হয়েছে। তাই এটা جمله مستانفه হবে। আর جمله مستانفه -এর কোন محل اعراب থাকে না।

এই হল তার সংক্ষিপ্ত তারকীব। এবার বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের তারকীবের প্রতি লক্ষ্য কর। সুতরাং বাক্যের প্রথম শব্দ তথা كلما এটা ظرفيه আর رزقوا হল فعل তার মধ্যে ضمير হল فاعل এবং منها জার-মাজরূরটি شبه فاعل -এর সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে তার ذوالحال হল رزقا শব্দটি شبه فعل জার-মাজরূর অতঃপর شبه فعل مقدر -এর متعلق হয়ে حال তার ذوالحال হল উহ্য من ثمرة । مفعول به -এর رزقوا -এর ضمير টি যা رزقا -এর দিকে ফিরছে। অতঃপর حال ও ذوالحال মিলে رزقوا -এর অতঃপর رزقوا ফে'ল, ফায়িল এবং মাফউলে বিহি মিলে জুমলা হয়ে مفعول فيه مقدم হয়েছে قالوا -এর رزقنا من ফে'ল, ফায়িল অতঃপর قول এবং هذا হল اسم اشاره এবং الذى হল اسم موصول আর قالوا مشار বাক্যটি হল صله তারপর صله এবং اسم موصول মিলে مشار اليه তারপর اسم اشاره এবং قبل اليه মিলে مقوله । এবার قول এবং مقوله মিলে جمله قوليه ।

ب : هذا -এর مشار اليه কি?

এখানে প্রশ্ন হল অত্র আয়াত দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতের নিয়ামত সমূহ এক ও অভিন্ন হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কেননা, هذا দ্বারা জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে এবং الذى رزقنا من قبل দ্বারা দুনিয়ার নেয়ামত উদ্দেশ্য। সুতরাং অর্থ হবে জান্নাতের এই ফল-মূল হুবহু দুনিয়ার ফল-মূলের অনুরূপ। এর দ্বারা বুঝা গেল দুনিয়া এবং জান্নাতের ফল এক ও অভিন্ন। অথচ দুনিয়ার নেয়ামত এবং জান্নাতের নেয়ামত সমূহে রয়েছে আকাশ-পাতালের ব্যবধান।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন আর সাথে সাথে هذا -এর مشار اليه ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অনুবাদ:

(مـن قبـل -এর তাফসীর) ঃ (مـن قبـل -এর দুই তাফসীর করা হয়েছে। যথা– ১.) অর্থাৎ ইতিপূর্বে দুনিয়াতে দেয়া হয়েছে। (এ তাফসীর দ্বারা জান্নাতের ফল দুনিয়ার ফলের جـنـس -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়)। জান্নাতের ফলকে দুনিয়ার ফলের جـنـس থেকে সাব্যস্ত করার দু'টি হেকমত রয়েছে। (ক) অন্তর দেখার সাথে সাথে সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, স্বভাব পরিচিত বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে থাকে এবং অপরিচিত থেকে দূরে থাকে। (খ) এর দ্বারা জান্নাতের ফলের বৈশিষ্ট্য এবং ফলের ভিতরের নেয়ামতের হাকীকত প্রকাশ হয়ে যাবে। কেননা, (একই جـنـس -এর হওয়ার কারণে দুনিয়াতে তার এক স্বাদ এবং আখেরাতে এই একই ফলের স্বাদ তার থেকে হাজার গুণ অধিক মজাদার। আর) যদি ফল এরকম হয় যে, তা পরিচয় করা যায়না তাহলে এ সন্দেহ হবে যে, এ ফল এরকমই হয়ে থাকে। (এর দ্বারা জান্নাতের ফলের বৈশিষ্ট্য এবং তার হাকীকত পুরোপুরীভাবে প্রকাশ পাবে না)। দ্বিতীয় তাফসীর হল, ইতিপূর্বে জান্নাতে দেয়া হয়েছে। কেননা, জান্নাতের খাবারগুলো একটি অপরটির সাথে বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য রাখে। যেমন হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, কোন কোন জান্নাতীদের নিকট খাবারের পাত্র রাখা হবে। সে তা থেকে আহার করবে। অতঃপর দ্বিতীয় আরেকটি পাত্র রাখা হবে, সে এ খাবারকে প্রথম খাবারের মত মনে করবে। তখন সে বলবে, هـذا الـذى رزقـنـا مـن قبل "এটা তো সেই খাবার যা ইতিপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।" তখন ফেরেশতা বলবেন, ভক্ষণ কর কারণ, প্রকার অভিন্ন কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। অথবা مـن قبـل -এর তাফসীর এভাবে করা হবে যা নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! কোন কোন জান্নাতী লোক একটি ফল হাতে নিবে ভক্ষণের জন্য। সে এটাকে মুখে মুখে দিতে না দিতে আল্লাহ তা'লা তার পরিবর্তে তার অনুরূপ আরেকটি ফল সৃষ্টি করে দিবেন।" সম্ভবত এটাকে যখন প্রথম ফলের আকৃতিতে দেখবে তখন বলে উঠবে– هـذا الذى رزقنا من قبل "এটা তো সেই ফল যা ইতিপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।" প্রথম তাফসীরটি অধিক প্রাধান্যশীল। কেননা, এ তাফসীর করলে كـلـمـا শব্দের عـمـوم ব্যাপকতার রক্ষা হয়। কেননা, كـلـمـا শব্দটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, জান্নাতে যখনই তাদেরকে খাবাব দেয়া হবে তখনই তারা এ উক্তিটি করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالى: من قبل ' على نهج المفسر العلام

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) من قبل -এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

১. من قبـل هـذا فى الدنيا "ইতিপূর্বে দুনিয়াতে (দেয়া হয়েছিল)।" অর্থাৎ এ ফল তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে দুনিয়াতে দেয়া হয়েছিল।

২. من قبـل هـذا فى الجنة "ইতিপূর্বে জান্নাতে (দেয়া হয়েছিল)।" অর্থাৎ এ ফল তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে জান্নাতে দেয়া হয়েছিল। প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী দুনিয়ার ফল এবং জান্নাতের ফল বাহ্যত একই জিনসের হওয়া প্রতিয়মান হয়। এর রহস্য হল জান্নাতীরা যখন এ ফলগুলো দেখবে তখন চিনে ফেলবে এবং তা খাওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। কেননা, মানুষ পরিচিত বিষয়ের প্রতি অকৃষ্ট থাকে এবং অপরিচিত বস্তু থেকে দূরে থাকে। তাছাড়া এর দ্বারা জান্নাতী ফলের মূল হাকীকতও প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেননা,

প্রথম জবাব: هذا দ্বারা হুবহু জান্নাতে প্রাপ্ত রিযিকের দিকে ইশারা করা হয়নি; বরং جنس ما رزقوا তথা জান্নাতে যে রিযিক দেয়া হবে তার জিনস বা বিভিন্ন প্রকৃতির রিযিকের দিকে ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত সমূহ একই জিনসের হবে। তবে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে, স্বাদে ও গন্ধে হবে ভিন্ন।

দ্বিতীয় জবাব: هذا দ্বারা عين ما رزقوا তথা হুবহু জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহ অভিন্ন হওয়া আবশ্যক হবে না। কেননা, এখানে هذا -এর পরে مثل শব্দ উহ্য আছে। তখন মূল ইবারত হবে– هذا مثل الذى رزقنا من قبل "এ তো সেই রিযিকের অনুরূপ যা আমরা দুনিয়াতে প্রাপ্তি হয়েছি।" এর দ্বারা বড়জোর مماثلت صورى (বাহ্যিক সাদৃশ্যতা) সাব্যস্ত হতে পারে। আর বাহ্যিক সাদৃশ্যতা দ্বারা অভিন্নতা আবশ্যক হয় না। এখন প্রশ্ন হল তাহলে مثل শব্দকে হযফ করা হল কেন?

উত্তর: দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যতা এত প্রকট যে, উভয় জগতের নেয়ামতসমূহ যেন হুবহু সমান। এ কথা বুঝানোর জন্য مثل শব্দকে হযফ করা হয়েছে। যেমন বলা হয় ابو يوسف ابو حنيفة মূলত ছিল ابو يوسف مثل ابى حنيفة "আবু ইউসুফ আবু হানীফা (র.) -এর অনুরূপ।" এখানে প্রকট সাদৃশ্য থাকায় مثل শব্দকে হযফ করে দেয়া হয়েছে।

☆☆☆

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اَىْ مِنْ قَبْلُ هٰذَا فِى الدُّنْيَا جُعِلَ ثَمَرَةُ الْجَنَّةِ مِنْ جِنْسِ ثَمَرَةِ الدُّنْيَا لِيَمِيْلَ النَّفْسُ اِلَيْهِ اَوَّلَ مَاتَرٰى فَاِنَّ الطَّبَائِعَ مَائِلَةٌ اِلَى الْمَأْلُوْفِ مُتَنَفِّرٌ عَنْ غَيْرِهٖ وَيَتَبَيَّنَ لَهَا مَزِيَّتُهٗ وَكُنْهُ النِّعْمَةِ فِيْهَا اِذْ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَمْ يُعْهَدْ ظُنَّ اَنَّهٗ لَايَكُوْنُ اِلَّا كَذَالِكَ اَوْ فِى الْجَنَّةِ فَاِنَّ طَعَامَهَا مُتَشَابِهُ الصُّوْرَةِ كَمَا حُكِىَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اَحَدَهُمْ يُؤْتٰى بِالصَّحْفَةِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ يُؤْتٰى بِاُخْرٰى فَيَرَاهَا مِثْلَ الْاُوْلٰى فَيَقُوْلُ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ كُلْ فَاللَّوْنُ وَاحِدٌ وَالطَّعْمُ مُخْتَلِفٌ اَوْ كَمَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اَنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَاوَلُ الثَّمَرَةَ لِيَأْكُلَهَا فَمَا هِىَ وَاصِلَةٌ اِلٰى فِيْهِ حَتّٰى يُبَدِّلَ اللّٰهُ مَكَانَهَا مِثْلَهَا فَلَعَلَّهُمْ اِذَا رَأَوْهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى قَالُوْا ذَالِكَ وَالْاَوَّلُ اَظْهَرُ لِمُحَافَظَتِهٖ عَلٰى عُمُوْمِ كُلَّمَا فَاِنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى تَرْدِيْدِهِمْ هٰذَا الْقَوْلَ كُلَّ مَرَّةٍ رُزِقُوْا وَالدَّاعِىْ لَهُمْ اِلٰى ذَالِكَ فَرْطُ اِسْتِغْرَابِهِمْ وَتَبَجُّحِهِمْ بِمَا وَجَدُوْا مِنَ التَّفَاوُتِ الْعَظِيْمِ فِى اللَّذَّةِ وَالتَّشَابُهِ الْبَلِيْغِ فِى الصُّوْرَةِ۔

একই জাতীয় ফল হওয়া সত্ত্বে যখন স্বাদে ভিন্ন হবে তখন জান্নাতী ফলের হাকীকত ও শ্রেষ্ঠত্ব উন্মুচিত হবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, জান্নাতের সকল ফল-মূল একই রকম হবে। এর দু'টি সূরত হতে পারে। হয়ত আকৃতি অভিন্ন হয়ে স্বাদ ভিন্ন হবে। অথবা আকৃতি ও স্বাদ এক ও অভিন্ন হবে। প্রথম সূরতের সমর্থন হয় হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা দ্বারা। আর দ্বিতীয় সূরতের সমর্থন হয় রাসূলের হাদীস দ্বারা।

مـــن قبـــل -এর দুই ব্যাখ্যা থেকে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক প্রাধান্যশীল। কেননা, এ তাফসীর করলে كـلـمـا শব্দের عـمـوم ব্যাপকতার রক্ষা হয়। কেননা, كـلـمـا শব্দটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, জান্নাতে যখনই তাদেরকে খাবাব দেয়া হবে তখনই তারা এ উক্তিটি করবে।

☆☆☆

﴿وَاُتُـوْا بِه مُتَشَابِهًا﴾ رَاضٍ يُـقَـرِّرُ ذَالِكَ وَالضَّمِيْرُ عَلَى الْاَوَّلِ رَاجِعٌ اِلٰى مَا رُزِقُـوْا فِى الدَّارَيْنِ فَاِنَّهُ مَدْلُوْلٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِه تَعَالٰى ﴿هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ وَنَظِيْرُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى ﴿اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا﴾ اَىْ بِجِنْسِ الْغِنٰى وَالْفَقِيْرِ وَعَلَى الثَّـانِـىْ اِلَـى الـرِّزْقِ فَـاِنْ قِيْـلَ اَلتَّشَابُهُ هُوَ التَّمَاثُلُ فِى الصِّفَةِ وَهُو مَفْقُوْدٌ بَيْنَ ثَمَرَاتِ الـدُّنْيَـا وَالْاٰخِـرَـةِ كَـمَا قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رضـ 'لَيْـسَ فِـى الْـجَـنَّةِ مِنْ اَطْعِمَةِ الدُّنْيَا اِلَّا الْاَسْـمَـاءَ' قُلْتُ اَلتَّشَابُهُ بَيْنَهُمَا حَاصِلٌ فِى الصُّوْرَةِ دُوْنَ الْمِقْدَارِ وَالطُّعْمِ وَهُوَ كَافٍ فِىْ اِطْلَاقِ التَّشَـابُـهِ هٰـذَا وَاِنَّ لِلْاٰيَةِ مَـحْـمَلًا اٰخَرَ وَهُوَ اَنَّ مُسْتَلَذَّاتِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِىْ مُقَابَلَةِ مَا رُزِقُوْا فِى الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَارِفِ وَالطَّاعَاتِ مُتَفَاوِتَةٌ فِى اللَّذَّةِ بِحَسْبِ تَفَاوُتِهَا فَيَـحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ مِنْ هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا اِنَّهٗ ثَوَابٌ وَمِنْ تَشَابُهِهِمَا تَمَاثُلُهُمَا فِى الشَّرْفِ وَالْمَزِيَّةِ وَعُلُوِّ الطَّبْقَةِ فَيَكُوْنُ هٰذَا فِى الْوَعْدِ نَظِيْرُ قَوْلِه تَعٰلٰى ﴿ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ فِى الْوَعِيْدِ۔

অনুবাদ:

واتـوا به متشابها এবাক্যটি معترضه যা প্রথম বাক্যের মর্মের তাকীদ করছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী به- এর ضمير ফিরবে ما رزقوا فى الدارين -এর দিকে। কেননা, আল্লাহ তা'লার বাণী هذا الذى رزقنا من قبل দ্বারা তাই বুঝা যাচ্ছে। আর তার দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما অর্থাৎ (اولى بهما -এর অর্থ হল) بجنسى الغنى والفقير যদি প্রশ্ন করা হয়

যে, গুণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হওয়াকে تشـــابـــه বলা হয়। আর এ সাদৃশ্য তো দুনিয়ার ফল এবং আখেরাতের ফলের মধ্যে অবিদ্যমান। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতে দুনিয়ার কোন খাবার নেই; শুধু নাম আছে।" তাহলে আমি (গ্রন্থকার) উত্তরে বলব, দুনিয়ার ফল এবং আখেরাতের ফলের মাঝে আকৃতিগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর এ সামঞ্জস্যতাই যথেষ্ট। এছাড়া আয়াতের দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা আছে আর তা হল, জান্নাতীগণের স্বাদ-উপভূগ পর্থিব পুরস্কার অর্থাৎ দুনিয়ার বিবেক ও আনুগত্যের বিপরীতে স্বাদের দিক থেকে এগুলো এত ভিন্নি হবে যেরকম দুনিয়ার বিবেক এবং জান্নাতের বিবেকের মধ্যে তারতম্য থাকে। সুতরাং এটা সম্ভব আছে যে, هـذا الـذى رزقنا -এর মধ্যে هذا দ্বারা الـذى رزقنا -এর সওয়াব উদ্দেশ্য এবং সওয়াব ও الـذى رزقنا -এর মাঝে সামঞ্জস্য দ্বারা মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য এবং স্তরে উঁচু হওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আয়াতটি সুসংবাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহর এই বাণীর– ذوقوا ما كنتم تعلمون

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: فسر قوله تعالى: واتوا به متشابها' على نهج المفسر العلامّ

উত্তর: واتوا به متشابها -এর ব্যাখ্যা

আল্লামা বায়যাবী (র.) প্রথমত এ আয়াতের শুরুর واو সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং তার বক্তব্যের সারমর্ম হল, واتوا -এর واو টি عاطفه নয়; বরং اعتراضيه আর এ বাক্যটি جمله معطوفه নয়; বরং جـمـلـه معترضه । এ আয়াতটি পূর্বের বাক্যের তাকীদ করেছে। পূর্ববর্তী বাক্য তথা هـذا الذى رزقنا مـن قبل দ্বারা দুনিয়া ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ এক হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর واتـوا بـه متشـابها এবাক্যটি দ্বারা এবিষয়কে আরো তাগীদ করা হয়েছে।

তারপর به -এর ضمير -এর مرجع নির্ণয় করেছেন। এর مرجع নির্ণয় করতে হলে প্রথমে من قبل দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা নির্ণয় করতে হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, مـن قبـل-এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) مـن قبل هذا فى الجنة (২) مـن قبل هذا فى الدنيا । যদি প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে به -এর ضمير -এর موجع হবে رزقنا من قبل থেকে যে মর্ম উদঘাটিত হয়েছে তথা ما رزقوا فى الدارين এ মর্মটি مرجع হবে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুযায়ী به -এর ضمير -এর مرجع হবে رزقا শব্দটি।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) আয়াতের উপর একটি প্রশ্নের অবতারণা করে তার জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল, به -এর ضـمير -এর مـرجع যদি مـارزقـوا فى الدارين তথা দুনিয়া ও জান্নাতের নেয়মতকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, দুনিয়া এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ গুণগত দিক দিয়ে এক ও আভিন্ন। কেননা, تشـابـه বলা হয় দু'টি বস্তু গুণগত দিক থেকে সমান হওয়া। অথচ দুনিয়া এবং জান্নাতের নিয়ামতরাজি গুণগত দিক থেকে এক নয় বরং ভিন্ন। যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন জান্নাতে দুনিয়ার কোন খাবার নেই; শুধু নাম আছে।" এর দ্বারা বুঝা গেল দুনিয়া এবং জান্নাতের নেয়ামতরাজি গুণগত দিক থেকে এক নয়।

এর উত্তর হল দুনিয়া এবং আখেরাতের নেয়ামতসমূহ গুণগত দিক থেকে ভিন্ন হলেও আকৃতির দিক থেকে অভিন্ন। আর সামঞ্জস্যের জন্য এপরিমাণই যথেষ্ট।

وَالزَّوْجُ يُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَهُوَ فِى الْأَصْلِ لِمَا لَهُ قَرِيْنٌ مِنْ جِنْسِهٖ كَزَوْجِ الْخُفِّ فَاِنْ قِيْلَ فَائِدَةُ الْمَطْعُوْمِ هُوَ التَّغَذِّىْ وَدَفْعُ ضَرَرِ الْجُوْعِ وَفَائِدَةُ الْمَنْكُوْحِ اَلتَّوَالُدُ وَحِفْظُ النَّوْعِ وَهِىَ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا فِى الْجَنَّةِ قُلْتُ مَطَاعِمُ الْجَنَّةِ وَمَنَاكِحُهَا وَسَائِرُ اَحْوَالِهَا اِنَّمَا تُشَارِكُ نَظَائِرَهَا الدُّنْيَوِيَّةَ فِىْ بَعْضِ الصِّفَاتِ وَالْاِعْتِبَارَاتِ وَتُسَمّٰى بِأَسْمَاءِهَا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيْلِ وَلَاتُشَارِكُهَا فِىْ تَمَامِ حَقِيْقَتِهَا حَتّٰى تَسْتَلْزِمُ جَمِيْعَ مَا يَلْزِمُهَا وَتُفِيْدُ عَيْنَ فَائِدَتِهَا۔

অনুবাদ:

زوج শব্দের বিশ্লেষণ ও প্রশ্নোত্তর

زوج শব্দের প্রয়োগ পুঃ লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টির উপর হয়। মূলত এ শব্দটি জোড় -এ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন زوج الخف মোজার জোড়া। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা হল তার থেকে আহার সংগ্রহ করা, বিবাহিত দ্বারা উদ্দেশ্য তার থেকে জন্ম বিস্তার হওয়া এবং মানব জাতির সংরক্ষণ করা। অথচ জান্নাতে এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা, জান্নাত তো চিরস্থায়ী ঘর। দুনিয়ার মত ক্ষণস্থায়ী নয়)। (মুসান্নিফ বলেন) তাহলে আমি উত্তরে বলব, জান্নাতের খাদ্যদ্রব্য, স্ত্রী ও রমণীগণ কতেক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে পার্থিব খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীদের সাথে কিছু মিল আছে। এগুলোকে উপমাস্বরূপ ঐ নাম দেয়া হয়েছে। তবে সকল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মিল নয়। যার কারণে (এটা আবশ্যক হয় না যে,) দুনিয়ার বিষয়াদির জন্য যা অপরিহার্য। তা জান্নাতী বিষয়াদির জন্যও অপরিহার্য হয় এবং দুনিয়ার বিষয়াদি দ্বারা যে উপকারিতা লাভ হয়। তা জান্নাতী বিষয়াদির দ্বারাও উপকারিতা লাভ হবে।

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾

مِمَّا يُسْتَقْذَرُ مِنَ النِّسَاءِ وَيُذَمُّ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ كَالْحَيْضِ وَالدَّرَنِ وَدَنَسِ الطَّبْعِ وَسُوْءِ الْخَلْقِ فَإِنَّ التَّطْهِيرَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ قُرِئَ: مُطَهَّرَاتٌ وَهُمَا لُغَتَانِ فَصِيْحَتَانِ يُقَالُ النِّسَاءُ فَعَلَتْ وَ فَعَلْنَ وَهُنَّ فَاعِلَةٌ وَفَاعِلَاتٌ وَفَوَاعِلُ. قَالَ وَإِذَا الْعَذَارِىْ بِالدُّخَانِ تَقَنَّعَتْ+وَاسْتَعْجَلَتْ نَصْبَ الْقُدُوْرِ فَمَلَّتْ. فَالْجَمْعُ عَلَى اللَّفْظِ وَالْإِفْرَادُ عَلَى تَغْيِيْرِ الْجَمَاعَةِ وَمُطَّهِرَةٌ (بِتَشْدِيْدِ الطَّاءِ وَكَسْرِ الطَّاءِ) بِمَعْنَى مُتَطَهِّرَةٍ وَمُطَهَّرَةٌ أَبْلَغُ مِنْ طَاهِرَةٍ وَمُتَطَهِّرَةٍ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ مُطَهِّرًا طَهَّرَهُنَّ وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى۔

অনুবাদ:

"আর তাদের জন্য সেখানে (জান্নাতে) পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রমণী থাকবে" অর্থাৎ তারা যেসব বিষয়ের কারণে মহিলাদেরকে ঘৃণা করা হয় তারা সেগুলো থেকে পূত-পবিত্র থাকবে এবং যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন হায়েয, অপরিচ্ছন্নতা, চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। কেননা, تطهير শব্দটি দেহ, চরিত্র এবং কর্মের উপর প্রায়োগ হয়। এক কেরাতে جمع) مطهرات مونث) এসেছে। আর এ কেরাতদ্বয় বিশুদ্ধ পঠন পদ্ধতি। বলা হয়- واذا العذارى بالدخان الخ সুতরাং বহুবচনটি শব্দ হিসেবে এবং একবচন জামাতের তাবীলে। তৃতীয় কেরাত مطهرة (طاء তাশদীদ এবং هاء যের সহ পঠিত) متطهرة -এর অর্থে। مُطَهَّرَةٌ টি طاهرة এবং متطهرة -এর তুলনায় বেশী مبالغه বুঝায়। কেননা, এটা এ কথা বুঝায় যে, কোন পবিত্রকারী সত্তা তাদেরকে পবিত্র করেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, তাদেরকে পবিত্রকারী সত্তা কেবল আল্লাহ তা'লাই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

জান্নাতে পূত-পবিত্র স্ত্রী লাভের অর্থ: তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রক্তস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

مطهرة -এর তিন কেরাত:

১. مُطَهَّرَةٌ(একবচনে) একেরাতটি আমাদের মাঝে বহুল প্রচলিত। এটা ازواج -এর সিফাত হয়েছে। নিয়ম আছে, موصوف যদি جمع مكسر হয়, তাহলে তার সিফাতটি واحد مونث অথবা جمع مونث আনা জায়েয। এখানে واحد مونث এসেছে।

২. مُطَهَّرَاتٌ (বহুবচনে)।

৩. مُطَّهِرَةٌ (সীগা ইসমে ফায়িল, طاء তাশদীদ এবং هاء যের সহ পঠিত)। কাযী বায়যাবী (র.) اسم مفعول -এর কেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, مُطَهَّرَةٌ টি طاهرة এবং متطهرة -এর তুলনায় বেশী مبالغه বুঝায়। কেননা, এটা এ কথা বুঝায় যে, কোন পবিত্রকারী সত্তা তাদেরকে পবিত্র করেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, তাদেরকে পবিত্রকারী সত্তা কেবল আল্লাহ তা'লাই।

﴿وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾

"আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে"

دَائِمُوْنَ وَالْخَلْدُ وَالْخُلُوْدُ فِي الْأَصْلِ الثَّبَاتُ الْمَدِيْدُ دَامَ اَوْ لَمْ يَدُمْ وَلِذَالِكَ قِيْلَ لِلْاَثَافِيْ وَالْاَحْجَارِ خَوَالِدَ وَلِلْجُزْءِ الَّذِيْ يَبْقَى مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى حَالِه مَا دَامَ حَيًّا خَلَدٌ وَلَوْ كَانَ وَضْعُهُ لِلدَّوَامِ كَانَ التَّقْيِيْدُ بِالتَّابِيْدِ فِيْ قَوْلِه ﴿خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا﴾ لَغْوًا وَاِسْتِعْمَالُهُ حَيْثُ لَا دَوَامَ كَقَوْلِهِمْ وَقْفٌ مُخَلَّدٌ يُوْجِبُ اِشْتِرَاكًا اَوْ مُجَازًا وَالْاَصْلُ يَنْفِيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وُضِعَ لِلْاَعَمِّ مِنْهُ فَاسْتُعْمِلَ فِيْهِ بِذَالِكَ الْإِعْتِبَارِ كَاِطْلَاقِ الْجِسْمِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ لٰكِنَّ الْمُرَادَ بِه اَلدَّوَامُ هٰهُنَا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لِمَا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالسُّنَنِ۔

অনুবাদ:

خالدون অর্থ دائمون (তথা তারা চিরস্থায়ী)। خلد এবং خلود মূলত দীর্ঘ বিরতীকে বলা হয়। চাই তা চিরস্থায়ী বা অস্থায়ী হোক। আর এজন্যেই চুলার পাথর ও অন্যান্য পাথরকে خوالد বলা হয়। মানুষের সেই অঙ্গ যা হায়াত থাকালীন পর্যন্ত নিরাপদ থাকে সেই অঙ্গকে خلد বলে। যদি خلود শব্দের গঠন চিরস্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য হত তাহলে আল্লাহর বাণী خالدين فيها ابدا -এর মধ্যে ابدا -এর শর্ত যুক্ত করার কোন অর্থ থাকবে না। তাছাড়া যেখানে কোন প্রকার স্থায়ীত্ব নেই সেখানে خلود -এর ব্যবহার হয়ত অংশিদারীত্ব অথবা মুজাযকে আবশ্যক করবে। অথচ মূল অর্থ এ উভয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে خلود শব্দের গঠন যদি ব্যাপকত্বের জন্য হয়ে থাকে অতঃপর এই ব্যাপকতা হিসেবে বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয় যেভাবে জিসিমের ব্যবহার মানুষের জন্য যেমন আল্লাহর বাণী وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد। কিন্তু এখানে خلود দ্বারা চিরস্থায়ীত্ব উদ্দেশ্য। কেননা, অনেক আয়াত ও হাদীস এর সমর্থন করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

خلود শব্দের বিশ্লেষণ: জমহুর উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে خلود শব্দটি دوام অর্থাৎ স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। কেননা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস তা সমর্থন করে। এক ভ্রান্ত দল জাহমিয়াদের মতে, এখানে خلود দ্বারা চিরস্থায়ীত্ব বুঝানো হয়নি। এর ভিত্তি হল, তাদের মতে, প্রতিদানের পর জান্নত ও জাহান্নাম ধ্বংশ হয়ে যাবে।

তবে خلود শব্দের মূল অর্থ নিয়ে রয়েছে মতভেদ। মু'তাযিলার মতে, তার মূল অর্থ হল চিরস্থায়ীত্ব আর রুপক অর্থে দীর্ঘ বিরতী। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, তার মূল অর্থ দীর্ঘ বিরতী। চাই তা চিরস্থায়ী হোক বা ক্ষণস্থায়ী হোক। মুসান্নিফ (র.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বপক্ষে দু'টি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল হল, চুলার পায়া, পাথর এবং মানুষের অন্তরকে خلود বলা হয়। অথচ চুলার পায়া, পাথর এবং মানুষের অন্তর চিরস্থায়ী নয়। বরং তা ক্ষণস্থয়ী। কিন্তু দীর্ঘ দিন অবস্থানের কারণে

এগুলোকে خوالد এবং خلد নামে নামকরণ করা হয়। সুতরাং এগুলোকে এ নামে নামকরণের দ্বারা বুঝা গেল, خلود -এর মূল অর্থ دوام বা চিরস্থায়ীত্ব নয়। দ্বিতীয় দলীল হল, خلود শব্দের মূল অর্থ যদি دوام হয় তাহলে خالدين فيها ابدا -এর মধ্যে ابدا -এর শর্ত যুক্ত করা অনর্থক হবে। কেননা, خلود -এর অর্থ যখন دوام তখন আবার ابدا শব্দের দ্বারা চিরস্থায়ীত্বের শর্ত লাগানোর কোন অর্থ নেই। যদি বলা হয় যে, এখানে ابدا -এর শর্ত লাগানো অনর্থক নয় বরং তাকীদের জন্য এসেছে। তাহলে আমরা বলব যে, تاكيد তো خلاف اصل কেননা, اصل হল تاسيس । উপরন্তু যেখানে স্থায়ীত্বের কোন আবাস নেই যেমন আরবের উক্তি وقف مخلد "দীর্ঘ বিরতী" এখানে وقف শব্দের সাথে مخلد শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ وقف বা বিরতীর মধ্যে কোন স্থায়ীত্ব নেই। সুতরাং এ জাতিয় স্থানে خلود শব্দ ব্যবহার করলে হয়ত اشتراك অথবা مجاز আবশ্যক হবে। اشتراك বলা হয় শব্দের কয়েকটি অর্থ হওয়া এই প্রতিটি অর্থের জন্য শব্দকে পৃথক পৃথক করে গঠন করা। এখন যদি অস্থায়ীর ক্ষেত্রে خلود শব্দের ব্যবহার হয় তাহলে বলতে হবে যে, خلود শব্দটি مشترك (যৌথ)। শব্দটিকে একবার গঠন করা হয়েছে স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য এবং দ্বিতীয়বার গঠন করা হয়েছে দীর্ঘ বিরতী বুঝানোর জন্য। অথবা বলতে হবে যে, শব্দটি মূলত গঠিত হয়েছে স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য আর রূপকভাবে ক্ষণত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ اشتراك এবং مجاز উভয়টি خلاف اصل । অতএব خلود -এর অর্থ চিরস্থায়ী হওয়া বলা ভুল প্রমাণিত হল। পক্ষান্তরে যদি خلود -এর অর্থ দীর্ঘ বিরতী ধরা হয় তাহলে اشتراك বা مجاز কোনটিই আবশ্যক হবে না।

☆☆☆

فَإِنْ قِيْلَ اَلْاَبْدَانُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ اَجْزَاءٍ مُتَضَادَّةِ الْكَيْفِيَّةِ مُعْرِضَةٌ لِلْاِسْتِحَالَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْاِنْفِكَاكِ وَالْاِنْحِلَالِ فَكَيْفَ يُعْقَلُ خُلُوْدُهَا فِي الْجِنَانِ؟ قُلْتُ أَنَّهُ تَعَالٰى يُعِيْدُهَا بِحَيْثُ لَايَعْتَوِرُهَا الْاِسْتِحَالَةُ بِأَنْ يَجْعَلَ اَجْزَاءَهَا مَثَلًا مُتَقَاوِمَةً فِي الْكَيْفِيَّةِ مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ لَايَقْوِىْ شَيْئًا مِنْهَا عَلٰى اِحَالَةِ الْاٰخَرِ مُتَعَانِقَةً مُتَلَازِمَةً لَايَنْفَكُّ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ كَمَا نُشَاهِدُ فِيْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ هٰذَا فَاِنَّ قِيَاسَ ذَالِكَ الْعَالَمِ وَاَحْوَالَهُ عَلٰى مَا نَجِدُهُ وَنُشَاهِدُهُ مِنْ نَقْصِ الْعَقْلِ وَضُعْفِ الْبَصِيْرَةِ۔

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন হয় যে, দেহসমূহ তো সেই সকল অঙ্গ দ্বারা গঠিত যেগুলোর আকৃতি পরস্পর বিপরীত এবং পরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার কারণ। (অর্থাৎ শরীরের যে অঙ্গের মধ্যে পরিবর্তন আসল সেই অঙ্গ তো আর থাকল না। বরং সেই অঙ্গ শেষ হয়ে আরেকটি অঙ্গ ধারণ করল) সুতরাং জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ীর কল্পনা করা যায় কিভাবে? তাহলে আমি (গ্রন্থকার) উত্তরে বলব, মহান আল্লাহ তা'লা পুনরায় এ দেহগুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যে, এগুলোর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তথা দেহের অঙ্গগুলো হবে ভিন্ন ভিন্ন তবে সব অঙ্গগুলোর

মধ্যে শক্তি থাকবে সমান তালে। এক অঙ্গ অপর অঙ্গের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। বরং এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে জড়িয়ে থাকবে। কোন অঙ্গই অপর অঙ্গ থেকে পৃথক হবে না। যেমন আমরা কোন কোন খনিজ দ্রব্যের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকি।

আর আখেরাত জগত ও তার অবস্থাদিকে এই দৃশ্যমান জগতের উপর কিয়াস করা নির্বোদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

☆☆☆

وَاعْلَمْ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعْظَمُ اللَّذَّاتِ الْحِسِّيَّةِ مَقْصُوْرًا مَنَ الْمَسَاكِنِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَنَاكِحِ عَلٰى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْاِسْتِقْرَاءُ وَكَانَ مَلَاكُ ذَالِكَ كُلِّه الثَّبَاتُ وَالدَّوَامُ فَاِنَّ كُلَّ نِعَمٍ جَلِيْلَةٍ اِذَا قَارَنَهَا خَوْفُ الزَّوَالِ كَانَتْ مُنْغَضَّةً غَيْرَ صَافِيَةٍ مِنْ شَوَائِبِ الْاَلَمِ بَشَّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِهَا وَمَثَّلَ مَا اَعَدَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بِاَبْهٰى مَا يَسْتَلِذُّ بِه مِنْهَا وَاَزَالَ عَنْهُمْ خَوْفَ الْفَوَاتِ بِوَعْدِ الْخُلُوْدِ لِيَدُلَّ عَلٰى كَمَالِهِمْ فِي النِّعَمِ وَالسُّرُوْرِ۔

অনুবাদ:

খাদ্যদ্রব্য ও স্ত্রী-রমণীর সুসংবাদ প্রদানের রহস্য

তুমি জেনে রাখ! তত্ত্ব-তালাশের পর যা জানা গেছে তা হল, অধিকাংশ ইন্দ্রিয়লব্দ সুস্বাদু বস্তু বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এগুলোর পূর্ণতা হল স্থায়ী থাকা। কেননা, বড় বড় নিয়ামত লুপ্ত পাওয়ার যখন আশঙ্কা থাকে তখন এগুলোকে বিস্বাদ বলে মনে হয় এবং কষ্ট অনুভব হতে থাকে। তাই আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে সেগুলোর সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এবং আখেরাতে তাদের জন্য যে সকল অফুরন্ত নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন সেগুলোর উপমা বর্ণনা করতে সবচেয়ে বাড়িয়া স্বাদের বস্তুর উপমা পেশ করেছেন এবং চিরস্থায়ীত্বের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সেই নিয়ামতরাজি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা মুক্ত করেছেন। যাতে তাদের পরিপূর্ণ আনন্দ ফূর্তির প্রতি ইঙ্গিত করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

খাদ্যদ্রব্য ও স্ত্রী-রমণীর সুসংবাদ প্রদানের রহস্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে কয়েকটি বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হল তাদের জন্য জান্নাতে থাকবে বড় বড় অট্টালিকা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল। দ্বিতীয়টি হল তাদের জন্য জান্নাতী পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রমণীও থাকবে। মোটকথা, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে জান্নাতের অট্টালিকা, খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীর সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এ জাতিয় বিষয়গুলোর সুসংবাদ প্রদানে কি কোন রহস্য আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, এ জাতিয় বস্তুসমূহের সুসংবাদ প্রদানে রহস্য নিহিত আছে। এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেল। মানুষ যেসমস্ত বস্তুকে সুস্বাদু ও উপভূগ্য মনে করে সেগুলোর সিংহভাগ বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্য ও রমণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এগুলোকে আরো সুস্বাদু মনে করা হয়, যখন তা স্থায়ী থাকে।

কেননা, এ নিয়ামতসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে স্বাদ কমে যাবে। তাই আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে এগুলোর সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং সুসংবাদ শুনানোর সময় তারা যেসকল বস্তুকে অতি প্রিয় মনে করে সেগুলোকে উপমাস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যদিও আখেরাতের নিয়ামতরাজি দুনিয়ার নিয়ামতরাজির তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া। এবং এ নিয়ামতসমূহ তাদের থেকে শেষ হবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে করেছেন শঙ্কা মুক্ত। অর্থাৎ তারা অনন্তকাল পর্যন্ত এই নিয়ামতসমূহ উপভূগ করবে। তাদেরকে আর কোন দিন মরতে হবে না।

فنسئل الله ان يعطينا هذه النعم الابدية بفضله و كرمه ومنه امين!

☆☆☆

﴿اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًامَّابَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾

"আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না"

لَمَّا كَانَتِ الْاٰيَةُ السَّابِقَةُ مُتَضَمِّنَةً لِاَنْوَاعٍ مِّنَ التَّمْثِيْلِ عَقَّبَ ذَالِكَ بِبَيَانِ حُسْنِه وَمَا هُوَ الْحَقُّ لَهٗ وَالشَّرْطُ فِيْه وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى وَفَقِ الْمُمَثَّلِ لَهٗ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِيْ تَعَلَّقَ بِهَا التَّمْثِيْلُ فِي الْعَظْمِ وَالْخِسَّةِ وَالشَّرْفِ دُوْنَ الْمُمَثِّلِ فَاِنَّ التَّمْثِيْلَ اِنَّمَا يُصَارُ اِلَيْهِ لِكَشْفِ الْمَعْنٰى الْمُمَثَّلِ لَهٗ وَرَفْعِ الْحِجَابِ وَاِبْرَازُهٗ فِيْ صُوْرَةِ الْمُشَاهَدِ الْمَحْسُوْسِ لِيُسَاعِدَ فِيْهِ الْوَهْمُ الْعَقْلَ وَيُصَالِحُهٗ عَلَيْهِ فَاِنَّ الْمَعْنٰى الصَّرْفَ اِنَّمَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ مَعَ مُنَازَعَةٍ مِنَ الْوَهْمِ لِاَنَّ مِنْ طَبْعِهِ الْمَيْلُ اِلَى الْحِسِّ وَحُبُّ الْمُحَاكَاةِ وَلِذَالِكَ شَاعَتِ الْاَمْثَالُ فِي الْكُتُبِ الْاِلٰهِيَّةِ وَفَشَتْ فِيْ عِبَارَاتِ الْبُلَغَاءِ وَاِشَارَاتِ الْحُكَمَاءِ فَيُمَثَّلُ الْحَقِيْرُ بِالْحَقِيْرِ كَمَا يُمَثَّلُ الْعَظِيْمُ بِالْعَظِيْمِ وَاِنْ كَانَ الْمُمَثَّلُ اَعْظَمَ عَنْ كُلِّ عَظِيْمٍ كَمَا مُثِّلَ فِي الْاِنْجِيْلِ غِلُّ الصَّدْرِ بِالنُّخَالَةِ وَالْقُلُوْبُ الْقَاسِيَةُ بِالْحَصَاةِ وَمُخَاطَبَةُ السُّفَهَاءِ بِاِثَارَةِ الزَّنَابِيْرِ وَجَاءَ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ اَسْمَعُ مِنْ قِرَادٍ وَاَطْيَشُ مِنْ فِرَاشَةٍ وَاَعَزُّ مِنْ مُخِّ الْبَعُوْضِ لَا مَا قَالَتِ الْجَهَلَةُ مِنَ الْكُفَّارِ لِمَا مَثَّلَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَالَ الْمُنَافِقِيْنَ بِحَالِ الْمُسْتَوْقِدِيْنَ وَاَصْحَابَ الصَّيِّبِ وَعِبَادَةَ الْاَصْنَامِ فِي الْوَهْنِ وَالضُّعْفِ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوْتِ وَجَعَلَهَا اَقَلَّ مِنَ الذُّبَابِ وَاَخَسَّ قَدْرًا مِنْهُ اَللّٰهُ اَعْلٰى

وَاَجَلُّ مِنْ اَنْ يَضْرِبَ الْاَمْثَالَ وَيَذْكُرَ الذُّبَابَ وَالْعَنْكَبُوْتَ وَاَيْضًا لَمَّا اَرْشَدَهُمْ اِلٰى مَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُتَحَدّٰى بِه وَحْىٌ مُنَزَّلٌ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَعِيْدُ مَنْ كَفَرَ بِه وَ وَعْدُ مَنْ اٰمَنَ بِه بَعْدَ ظُهُوْرِ اَمْرِه شَرَعَ فِيْ جُوَابِ مَا طَعِنُوْا بِه فَقَالَ: "اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِ اَىْ لَايَتْرُكُ ضَرْبَ الْمَثَلِ بِالْبَعُوْضَةِ تَرْكَ مَنْ يَسْتَحْيِ اَنْ يُمَثِّلَ بِهَا لِحِقَارِتِهَا-

অনুবাদ:____

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

যখন পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপমা ও দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তখন অত্র আয়াতে দৃষ্টান্তের সৌন্দর্যতা, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তার জন্য কি কি শর্ত তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর তা হল উপমাটি আলোচ্য বিষয় বস্তুর সাথে সেই ব্যাপারে মিল থাকা যার সাথে উপমাটি সম্পৃক্ত। চাই তা বড়ত্ব অথবা ছোটত্ব অথবা উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকুক। উপমাটি উপমা পেশকারীর উপযুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কেননা, আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্থকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা এবং তার অর্থের উপর পর্দাকে দূর করে দিয়ে তাকে অনুভূত বস্তুর আকৃতিতে প্রকাশ করার জন্য উপমা পেশ করা হয়। তাহলে এক্ষেত্রে ধারণা আকলের অনুগামী হবে এবং উভয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, কেবল আকলই নিছক অর্থকে অনুধাবন করতে পারে। আকলের সাথে ধারণার সংঘর্ষ বাধে। কেননা, স্বভাবত: ধারণা অনুভূত বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় এবং বোধগম্য বিষয়কে অনুভূত বিষয়ের সাথে তুলনা করাকে পছন্দ করে। এজন্যেই ঐশীগ্রন্থসমূহে উপমা খুব বেশী পাওয়া যায় এবং সাহিত্যিকদের ভাষার মধ্যেও প্রচুর উপমা পাওয়া যায়। সুতরাং তুচ্ছ বিষয়কে তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেভাবে বৃহৎ বস্তুকে বৃহৎ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। তুলনাকারী যতই বড় হোক না কেন। যেমন ইঞ্জিল কিতাবের মধ্যে অন্তরের হিংসাকে শস্যের খোশার সঙ্গে এবং মূর্খদের সাথে কথা বলাকে ভিমুলকে উছকানোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অধিকন্তু আরবের উক্তির মধ্যে এসেছে: اسمع من قراد واطيش الخ (অমুক কীটের চেয়েও বেশী শোনে, সে পতঙ্গ থেকেও আরো বেশী হালকা এবং মশার মগজের চেয়েও অনেক দুষ্প্রাপ্য)। যখন আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের অবস্থাকে مستوقدين نار এবং اصحاب صيب -এর সঙ্গে, মূর্তির ইবাদত করাকে দুর্বলতার ক্ষেত্রে মাকড়শার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তখন মূর্খ কাফিরদের দল বলেছিল, আল্লাহ তা'লা তো মশা-মাছির আলোচনা করেন না; তিনি তা থেকে পবিত্র। উপমার বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। অধিকন্তু আল্লাহ তা'লা যখন কাফিরদেরকে অবহিত করে দিলেন যে, যার দ্বারা তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) সেটা হল নাযিলকৃত ওহী। অতঃপর কুরআনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বে যে কুরআনকে অবিশ্বাস করে সে ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন এবং যে বিশ্বাস করে তাদেরকে অঙ্গীকারের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমেই কাফিরদের প্রশ্নের জবাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, আল্লাহ তা'লা নিঃসন্দেহে মশা দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মশা দ্বারা উপমা পেশ করাকে বর্জন করেন না। যেভাবে লজ্জাশীল ব্যক্তি মশা তুচ্ছ হওয়ার কারণে মশা দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله تعالى: ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فما فوقها

السوال: (الف) اذكر ارتباط الاية بما قبلها مع ذكر شان نزولها

(ب) ما هو حسن التمثيل وما هو الحق له وما الشرط فيه؟

الف : উত্তর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

কাযী বায়যাবী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র সাধনে দু'টি দিক উল্লেখ করেছেন।

১. পূর্ববর্তী আয়াত مثلهم كمثل الذى استوقد نارا الخ এবং او كصيب من السماء الخ প্রভৃতি আয়াতে মুনাফিকদের আচার-আচরণের কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াতে দৃষ্টান্ত ও উপমার শর্ত, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উপমার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি তা বর্ণনা করে বুঝিয়েছেন যে, উপমা দ্বারা আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে বুঝানো উদ্দেশ্য থাকে। আর উপমিত বস্তু বৃহৎও হতে পারে আবার ক্ষুদ্রতমও হতে পারে। বাস্তবানুগ উপমিত বস্তু ক্ষুদ্র হলেও তাতে সংকোচনের কিছু নেই। এ সূত্রেই অত্র আয়াতটির সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক বিদ্যমান।

২. وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য অপরিণামদর্শী কাফির-মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন। চ্যালেঞ্জ হল এই যে, যদি তোমরা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কালাম বিশ্বাস না কর বরং মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা কর (নাউযুবিল্লাহ) তবে পবিত্র কুরআনের মাত্র তিনটি আয়াত বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রতম সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে পেশ কর। আর এ কাজে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সাহায্যকারী রয়েছে সকলের সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে পার।

কিন্তু কুরআনের এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের এ ব্যর্থতা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে। অতঃপর মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল, পবিত্র কুরআনের বিশ্বাসী। দ্বিতীয় দল, কুরআনের অবিশ্বাসী দল। আল্লাহ পাক এদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার পর পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন অত্র আয়াতে। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল, কুরআন আল্লাহর কালাম হলে তাতে মশা-মাছি ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীবের উল্লেখ হত না। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে অত্র আয়াতে।

আয়াতের শানে নুযুল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'লা যখন দু'টি উপমার মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেনে। তখন কাফিররা প্রশ্ন করতে লাগল যে, আল্লাহ তা'লা এ ধরনের উপমা পেশ করার থেকে অনেক উর্ধ্বে ও পবিত্র। অতএব এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। তখন তাদের হটকারিতামূলক অবান্তর কথার জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ب : حسن التمثيل (উপমার উৎকৃষ্টতা) ঃ

উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কোন বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বহু উপমা উপস্থাপন করেছেন। আর আল্লাহ পাকের যাবতীয় কার্যবলী উত্তম ও উৎকৃষ্ট। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা একটি উৎকৃষ্ট কাজ।

حق التمثيل وشرطه (উপমার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ও তার শর্ত) ঃ

উপমা ও দৃষ্টান্তের জন্য শর্ত ও আবশ্যকীয় হল مثال ও ممثل له (উপমা ও উপমীয়) উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা। বক্তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে উপমার সামঞ্জস্য থাকা জরুরী নয়। প্রতিপাদ্য বিষয়কে শ্রোতাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ করা ক্রটি ও অপরাধ নয়। কিংবা বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

☆☆☆

وَالْحَيَاءُ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبِيْحِ مُخَافَةَ الذَّمِّ وَهُوَ الْوَسَطُ بَيْنَ الْوَقَاحَةِ الَّتِيْ هِيَ الْجَرَاءَةُ عَلَى الْقَبَائِحِ وَعَدَمُ الْمُبَالَاةِ وَالْخَجَلِ الَّذِيْ هُوَ انْحِصَارُ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَاِشْتِقَاقُهُ مِنَ الْحَيَاةِ لِاَنَّهُ اِنْكِسَارٌ يَعْتَرِى الْقُوَّةَ الْحَيْوَانِيَّةَ فَيَرُدُّهَا عَنْ اَفْعَالِهَا حَيِيَ الرَّجُلُ كَمَا قِيْلَ نَسِىَ وَحَشِىَ اِذَا اِعْتَلَّتْ نَسَاهُ وَحَشَاهُ وَاِذَا وُصِفَ بِهِ الْبَارِىْ تَعَالٰى كَمَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ "اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِ مِنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ اَنْ يُعَذِّبَهُ " اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ اِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا حَتّٰى يَضَعَ فِيْهِمَا خَيْرًا" فَالْمُرَادُ بِهِ اَلتَّرْكُ اللَّازِمِ لِلْاِنْقِبَاضِ كَمَا اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَغَضَبِهِ اِصَابَةُ الْمَعْرُوْفِ وَالْمَكْرُوْهِ اللَّازِمَيْنِ لِمَعْنَيْهِمَا وَنَظِيْرُهُ: قَوْلُ مَنْ يَصِفُ اِبِلًا اِذَا مَا اسْتَحْيَنَ الْمَاءَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ كَرِعْنَ بِسَبْتٍ فِيْ اِنَاءٍ مِنْ وَرْدٍ وَاِنَّمَا عُدِلَ بِهِ عَنِ التَّرْكِ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّمْثِيْلِ وَالْمُبَالَغَةِ وَيَحْتَمِلُ الْاٰيَةُ خَاصَّةً اَنْ يَكُوْنَ مَجِيْئُهُ عَلَى الْمُقَابَلَةِ لِمَا وَقَعَ فِيْ كَلَامِ الْكَفَرَةِ۔

অনুবাদ:

حياء শব্দের বিশ্লেষণ

লোক নিন্দার গ্লানিতে গর্হিত কাজ করা থেকে অন্তরে সংকোচতা সৃষ্টি হওয়াকে حياء বলে। এটা وقاحة ও خجل -এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। وقاحة বলা হয় ঘৃণিত কাজে দুঃসাহসিকতা ও স্পর্ধা। আর خجل বলা হয় কোন কাজ করে গ্লানিবোধ করা। حياء শব্দটি حياة থেকে নির্গত। কেননা, হায়ার মূল অর্থ হল এমন সংকোচতা যা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাকে কর্ম থেকে বিরত রাখে। সুতরাং বলা হয় حيى الرجل (লোকটি লজ্জাবোধ করল) যেমন বলা হয় نسى و حشى । نسى বলা হয় ধমনীতে রোগ সৃষ্টি হওয়া এবং حشى বলা হয় অন্তরের অভ্যন্তরে

রোগ সৃষ্টি হওয়া।

আর যখন আল্লাহ তা'লাকে লজ্জার সাথে গুণান্বিত করা হবে যেমন হাদীসে আছে ان اللــــه يستــحى من ذى الشيبة الخ তদ্রূপ আরেকটি হাদীসে আছে ان اللــه حى كريم يستحى اذا رفع العبد। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বর্জন করা যা মনের সংকোচতার জন্য لازم। যেভাবে رحمة ও غــضـــب দ্বারা পুরস্কার দেয়া এবং শাস্তি প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তার দৃষ্টান্ত হল সেই ব্যক্তির উক্তি যে উটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলে اذا مـا استحين الماء يعرض نفسه الخ (কবিতার অর্থ : যখন এই উটগুলো তাদের সামনে রাখা পানি পান করতে লজ্জাবোধ করে। তখন যেন মনে হয় দেবাগতকৃত চামড়ার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ঠোঁট দ্বারা গোলাপের ন্যায় পাত্র থেকে পনি পান করে। حيــــاء শব্দের রূপক অর্থ বর্জন করা। এর প্রমাণস্বরূপ উক্ত কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন। এখানে محل استشهاد হল استحيين শব্দ)।

ترك শব্দকে উল্লেখ না করে اسـحياء শব্দকে উল্লেখ করার কারণ হল, এর মধ্যে উপমা এবং مبالغه বিদ্যমান। আর এটাও সম্ভব আছে যে, আয়াতের মধ্যে استـحياء শব্দের ব্যবহার কাফিরদের উক্তির মধ্যে ব্যবহৃত استـحياء শব্দের বিপরীতস্বরূ হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى الحياء وما هو المشتق منه؟

(ب) مـا مـعـنـى الاستحياء لغة واصطلاحا وكيف يصح اسناد الاستحياء الى الله تعالى مع انه من قبيل الانفعال الذى لايليق بشانه تعالى؟

উত্তরঃ الف : معنى الحياء لغة (حياء -এর আভিধানিক অর্থ) ঃ حياء শব্দের প্রচলিত অর্থ লজ্জা, শরম। তবে আভিধানিক অর্থ বর্জন করা, বিরত থাকা।

معنى الحياء اصطلاحا (حياء -এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ

الحياء هو تواضع وانكسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب ويذم

অর্থাৎ গর্হিত কাজ করার সময় শাস্তির ভয় বা লোক নিন্দার গ্লানিতে আন্তরিক সংকোচবোধকে حيـاء বলা হয়।

অথবা পরিণাম চিন্তা করে কোন মন্দ কাজ বর্জন করাকে حيـــاء বলে। আর কোন গর্হিত কাজ করে গ্লানিবোধ করাকে خـجـل বলে। حيـاء হল লজ্জাশীলতা। এর বিপরীত শব্দ وقـاحة অর্থাৎ লজ্জাশূণ্যতা, ঘৃণিত কাজে দুঃসাহিকতা ও স্পর্ধা।

المشتق منه للحياء (حياء শব্দের উৎসমূল) ঃ

الـحياء শব্দটি حى থেকে নির্গত যার অর্থ জীবন ও প্রাণ। حياء তথা লজ্জাশীলতা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিধায় একে حياء বলা হয়।

معنى الاستحياء لغة : ب (استحياء -এর আভিধানিক অর্থ) ঃ استحياء শব্দটি حياء থেকে باب استـفـعـال -এর মাসদার। এর অর্থ লজ্জাবোধ করা, সংকোচবোধ করা, সংকোচবোধ করে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা।

معـنـى الاستحياء اصطلاحا (استـحياء -এর পারিভাষিক অর্থ) ঃ استـحياء ও حياء পারিভাষিক

দৃষ্টিতে সমর্থবোধক অর্থাৎ লোক নিন্দার ভয়ে গর্হিত কাজ বর্জন করা।

نسبة الاستحياء الى الله تعالى (আল্লাহর সাথে استحياء -এর সম্বন্ধ) : حياء ও استحياء শব্দে انقباض النفس অন্তরের সংকোচবোধের অর্থ রয়েছে। যা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু স্রষ্টা তথা আল্লাহ তা'লা অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পূত-পবিত্র। অতএব তিনি আন্তরিক সংকোচবোধ হতে মুক্ত। ফলে আল্লাহ তা'লার সাথে استحياء -এর সম্বন্ধ হতে পারে না। তদুপরি অত্র আয়াতে এমনিভাবে ان الله يستحيي من ذى الشيبة المسلم الخ

ان الله حي كريم الخ ইত্যাদি হাদীসে আল্লাহ পাকের সাথে حياء -এর সম্বন্ধ করা হল কিভাবে?

কাযী বায়যাবী (র.) এর জবাবে বলেছেন, এখানে ملزوم বলে لازم উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লজ্জাবোধের জন্য لازم হল মন্দ বা গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করা। অতএব ان الله لا يستحيي الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা দৃষ্টান্ত বর্ণনা পরিত্যাগ করেন না।

যেমন رحمة অর্থ নম্র হৃদয় হওয়া অথচ আল্লাহ তা'লা হৃদয় মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে رحيم বলা হয়। এবং غضب অর্থ স্পৃহায় রক্ত উদ্বেলিত হওয়া। এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টা এসব কিছু থেকে পূত-পবিত্র। কেননা, এগুলো انفعالات (অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত) -এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'লা منفعل (প্রতিক্রিয়াশীল) নন। তদুপরি এ শব্দগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা হয় এগুলোর لازمى অর্থের উপর ভিত্তি করে।

মোটকথা, استعاره تمثيليه অথবা صنعت مشاكلت -এর ভিত্তিতে কাফিরদের কথার জবাবে আল্লাহর সাথে استحياء -কে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরদের উক্তি الا يستحيي الرب أن يمثل بالذباب والبعوضة -এর জবাবে ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا الخ অবতীর্ণ হয়েছে।

☆☆☆

وَضَرْبُ الْمَثَلِ اِعْتِمَالُهُ مِنْ ضَرْبِ الْخَاتَمِ وَاَصْلُهُ وَقْعُ شَيْءٍ عَلٰى اٰخَرَ وَاَنْ بِصِلَتِهَا مَخْفُوْضُ الْمَحَلِّ عِنْدَ الْخَلِيْلِ بِاِضْمَارِ مِنْ مَنْصُوْبٌ بِاِفْضَاءِ الْفِعْلِ اِلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِهَا عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ وَمَا اِبْهَامِيَّةٌ تَزِيْدُ لِلنَّكِرَةِ اِبْهَامًا وَشَيَاعًا وَتَسُدُّ عَنْهَا طُرُقَ التَّقْيِيْدِ كَقَوْلِكَ أَعْطِنِيْ كِتَابًا مَّا اَىْ اَىَّ كِتَابٍ كَانَ اَوْ مَزِيْدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ كَالَّتِيْ فِيْ قَوْلِهِ: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ " وَلَانَعْنِيْ بِالْمَزِيْدَةِ اَللَّغْوُ الضَّائِعُ فَاِنَّ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ بَيَانٌ وَهُدًى بَلْ مَا لَمْ يُوْضَعْ لِمَعْنًى يُرَادُ مِنْهُ وَاِنَّمَا وُضِعَتْ لِاَنْ يُذْكَرَ مَعَ غَيْرِهِ فَيُفِيْدُ لَهُ وَثَاقَةً وَقُوَّةً وَهُوَ زِيَادَةٌ فِى الْهُدٰى غَيْرُ قَادِحٍ فِيْهِ۔

অনুবাদ:____

ضرب المثل -এর বিশ্লেষণ, أن -এর محل اعراب ও ما শব্দের বিশ্লেষণ

ضرب المثل অর্থ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা। ضرب الخاتم থেকে নির্গত। (যার অর্থ মোহর মারা)। ضرب -এর মূল অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা ধাক্কা দেয়া। খলীল (র.) এর মতে, ان তার

পরবর্তী অংশকে নিয়ে উহ্য من -এর দ্বারা محلا مجرور আর সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, من -কে হযফ করার মাধ্যমে তার দিকে فعل -কে متعدى করার কারণে محلا منصوب। আর ما শব্দটি ابهاميه (ব্যাপকতা প্রকাশক) এটা نكره -এর মধ্যে অনির্দিষ্টতাকে বৃদ্ধি করে এবং نكره থেকে কয়েদ বা শর্তের সকল পন্থাকে বাধা দেয়। যেমন তোমার উক্তি أعطنى كتابا ما (অর্থাৎ তুমি আমাকে যে কোন একটি কিতাব দাও)। অথবা ما টি তাকীদের জন্যে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন فبما رحمة من الله -এর মধ্যে ما শব্দটি (অতিরিক্ত এসেছে তাকীদের জন্য)। زائده দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অনর্থক নয়। কেননা, কুরআনের সকল আয়াত হেদায়েত ও নসীহত। বরং زائده দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল সেই শব্দ যাকে এমন কোন অর্থের জন্য গঠন করা হয়নি যে অর্থটি তার থেকে উদ্দেশ্য করা যেতে পারে; বরং এটাকে গঠন করা হয়েছে অন্য আরেকটি শব্দের সাথে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে। যাতে ঐ শব্দের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করতে পারে। আর তাকীদ তো হেদায়েরতের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى ضرب المثل؟
(ب) فى أى محل وقع قوله تعالى ان يضرب؟
(ج) 'ما' فى قوله مثلا ما لاى معنى؟

উত্তর ঃ الف : (ضرب المثل) معنى ضرب المثل -এর অর্থ) ঃ

ضرب المثل-এর অর্থ মিছাল বর্ণনা করা, দৃষ্টান্ত দেয়া। ضرب الخاتم থেকে নির্গত। যার অর্থ মোহর মারা। ضرب শব্দের মূল অর্থ وقوع شيئ على شيئ এক বস্তু অপর বস্তুর উপর পতিত হওয়া। দৃষ্টান্ত দেয়াকে ضرب المثل বলা হয় কারণ হল, দৃষ্টান্ত শ্রোতার শ্রবণশক্তির উপর পতিত হয় এবং অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে।

ب : محل الاعرب لقوله أن يضرب (محل اعراب -এর ان يضرب) ঃ

ان يضرب এ অংশটি اعراب -এর দিক থেকে কি হয়েছে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ইমাম খলীল (র.) -এর মতে, এটা محلا مجرور তার পূর্বে من হরফে জার উহ্য আছে। মূল ইবারতটি ছিল من أن يضرب। আর ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, ان يضرب টি لايستحيى -এর مفعول به হওয়ার কারণে محلا منصوب।

ج : مثلا ما -এর ما শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত ?

ما শব্দটি ابهاميه বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কেননা, نكره -এর পরে ما ব্যবহৃত হলে সেটা نكره -এর অর্থের মধ্যে আরো অনির্দিষ্টতা বৃদ্ধি করে। যেমন তোমার উক্তি اعطنى كتابا ما তুমি আমাকে যে কোন একটি কিতাব দাও। এখানে كتابا শব্দটি نكره তার পরে ما এসেছে। তদ্রূপ অত্র আয়াতে مثلا শব্দটি نكره তার পরে আছে ما তাই এখানে ما টি হবে ابهاميه। ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কেউ কেউ বলেন, এখানে ما হল زائده যা مثلا শব্দের অনির্দিষ্টতার মধ্যে তাকীদ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত হয়ে এসেছে।

وَبَعُوْضَةً عَطْفُ بَيَانٍ لِمَثَلًا أَوْ مَفْعُوْلُ لِيَضْرِبَ وَمَثَلًا حَالٌ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ أَوْ هُمَا مَفْعُوْلَاهُ لِتَضَمُّنِه مَعْنَى الْجَعْلِ وَقُرِئَتْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ وَعَلَى هٰذَا يَحْتَمِلُ مَا وُجُوْهًا أُخْرٰى أَنْ يَكُوْنَ مَوْصُوْلَةً حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَمَا حُذِفَ فِىْ قَوْلِه تَعَالٰى تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ أَحْسَنَ وَمَوْصُوْفَةً بِصِفَةٍ كَذَالِكَ وَمَحَلُّهَا اَلنَّصْبُ بِالْبَدَلِيَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَاِسْتِفْهَامِيَّةٌ هِىَ الْمُبْتَدَأُ كَأَنَّهُ لَمَّا رَدَّ اِسْتِبْعَادَهُمْ ضَرْبَ اللّٰهِ الْاَمْثَالَ قَالَ بَعْدَهُ مَا الْبَعُوْضَةُ فَمَا فَوْقَهَا حَتّٰى لَايُضْرَبَ بِه بَلْ لَهُ أَنْ يُمَثِّلَ بِمَا هُوَ أَحْقَرُ مِنْ ذَالِكَ وَنَظِيْرُهُ فُلَانٌ لَايُبَالِىْ بِمَا يَهِبُ مَا دِيْنَارٌ وَدِيْنَارَانِ وَالْبَعُوْضُ فَعُوْلٌ مِنَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ كَالْبُغْضِ وَالْغَضَبِ غُلِّبَ عَلٰى هٰذَا النَّوْعِ كَالْخُمُوْشِ۔

অনুবাদ:

حال - مثلا -এর بعوضة - يضرب -এর مفعول অথবা عطف بيان এবং مثلا টি তার থেকে حال ও مثلا তাকে ذوالحال -এর উপর مقدم করা হয়েছে نكره টি ذوالحال হওয়ার কারণে। অথবা بعوضة يضرب উভয়টি يضرب -এর مفعول হয়েছে يضرب -এর মধ্যে جعل -এর অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে। আর بعوضة শব্দকে مبتدا محذوف -এর خبر ধরে رفع সহও পড়া যায়। এমতাবস্থায় ما -এর মধ্যে কয়েকটি সম্ভাবনা থাকবে। (১) ما টি موصوله যার صدر صله উহ্য। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী تماما على الذى أحسن -এর মধ্যে (الذى -এর صدر صله উহ্য আছে। মূলত ছিল الذى هو أحسن) (২) ما টি موصوفه হবে যার সিফাতের প্রথমাংশ (অর্থাৎ مبتدا উহ্য)। ما টি এই সূরতে (مثلا থেকে) بدل হওয়ার ভিত্তিতে محلا منصوب হবে। (৩) অথবা ما টি استفهاميه হয়ে مبتدا (এবং بعوضة তার خبر)। কেমন যেন আল্লাহ তা'লা কাফিরদের আল্লাহ কর্তৃক উপমা পেশ করাকে অসম্ভব মনে করাকে খন্ডন করার পর বলেছেন, মশা অথবা তার চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা কেন পেশ করা যাবে না; বরঞ্চ এর চেয়ে নগন্য বস্তুর উপমা দেয়ারও তার অধিকার আছে। তার দৃষ্টান্ত যেমন فلان لايبالى بما يهب ما دينار ودينارن (অমুক যা দান করে তার পরোয়া করে না, কি এক দিনার আর কি দুই দিনার)। بعوض - فعول -এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। بعض (কর্তন করা) থেকে নির্গত। যেভাবে بضع ও عضب -এর অর্থ কর্তন করা। (بعض ,بضع , এবং عضب তিনোটির মূল অক্ষর এক অর্থাৎ باء عين ضاد অবশ্য তারতীবের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদিও হরফের তারতীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কিন্তু তিনোটির অর্থ এক অর্থাৎ কাটা, কর্তন করা। যেহেতু بعوض টি بعض থেকে সিফাতের সীগাহ, এ হিসেবে প্রত্যেক কর্তনকারীকে بعوض বলা উচিত ছিল; কিন্তু) خموش শব্দের ন্যায় তার মধ্যে اسميت প্রবল হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মশাকে بعوض বলা হবে। (خموش শব্দটি মূলত خمش থেকে নির্গত যার অর্থ আঘাত দেয়া। সুতরাং خموش অর্থ আঘাত দানকারী। এ হিসেবে প্রত্যেক আঘাত দানকরীকে خموش বলা উচিত ছিল। কিন্তু তার মধ্যে اسميت প্রবল হওয়ায় এখন শুধু মশাকে বলা হয়)।

السوال: بعوضة فی أی محل من الاعرب؟

উত্তর: بعوضة -এর محل اعراب ঃ

তারকীবের দিক দিয়ে بعوضة -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. بعوضة শব্দটি مثلا -এর عطف بيان

২. بعوضة টি ذوالحال আর مثلا টি তার حال । بعوضة - ذوالحال নাকেরাহ্ হওয়ার কারণে حال - مثلا -কে مقدم করা হয়েছে।

৩. بعوضة - يضرب -এর দ্বিতীয় مفعول এবং مثلا প্রথম مفعول । তখন يضرب - يجعل -এর অর্থে হবে।

☆☆☆

فَمَا فَوْقَهَا عَطْفٌ عَلٰى بَعُوْضَةٍ أَوْ مَا اِنْ جُعِلَ اِسْمًا وَمَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَيْهَا فِى الْجُثَّةِ كَالذُّبَابِ وَالْعَنْكَبُوْتِ كَأَنَّهٗ قَصَدَ بِه رَدَّ مَا اسْتَنْكَرُوْهُ وَالْمَعْنٰى اَنَّهٗ لَايَسْتَحْيِىْ ضَرْبَ الْمَثَلِ بِالْبَعُوْضِ فَضْلًا عَمَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ أَوْ فِى الْمَعْنَى الَّذِىْ جُعِلَتْ فِيْه مَثَلًا وَهُوَ الصِّغْرُ وَالْحِقَارَةُ كَجَنَاحِهَا فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ضَرَبَهٗ مَثَلًا لِلدُّنْيَا وَنَظِيْرُهٗ فِى الْاِحْتِمَالَيْنِ مَا رُوِىَ اَنَّ رَجُلًا بِمِنٰى خَرَّ عَلٰى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رض- سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا كُتِبَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِنَّهٗ يَحْتَمِلُ مَا يُجَاوِزُ الشَّوْكَةَ فِى الْاَلَمِ كَالْخُرُوْرِ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهَا فِى الْقِلَّةِ كَنُخْبَةِ النَّمْلَةِ لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَكْرُوْهٍ فَهُوَ كَفَارَةٌ لِخَطَايَاهُ حَتّٰى نُخْبَةَ النَّمْلَةِ-

অনুবাদ:

فما فوقها -এর তাফসীর

فما فوقها - بعوصة -এর উপর معطوف হয়েছে। অথবা ما -এর উপর। যদি ما -কে اسم ধরা হয়। আর অর্থ হবে- যা দেহবায়ব বা শারীরিক গঠন মশার চেয়ে বৃহৎ যেমন মাছি, মাকড়শা ইত্যাদি। এর দ্বারা যেন আল্লাহ পাক সেই বিষয়কে খন্ডন করার ইচ্ছা করেছেন যাকে কাফিররা মন্দ মনে করে। এক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক মশার উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। অতএব অতি উত্তমরূপে এর চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা পেশ করেন। অথবা তুচ্ছতায় ও নগণ্যতায় যা মশার চেয়ে হীন। যেমন মশার ডানা। যেমন রাসূলে পাক (সা.) মশার ডানাকে দুনিয়ার উপমা সাব্যস্ত করেছেন। আর এই উভয় সূরতে ما فوقها -এর নযীর হল সেই বর্ণিত রেওয়ায়েতটি- এক

ব্যক্তি মিনায় বসবাস করত একদা সে তাঁবুর রশিতে আটকে গিয়ে পড়ে গেল। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সা.) -এর নিকট থেকে শোনেছি তিনি বলেছেন, যে মসলমান কাঁটা অথবা তার চেয়ে বৃহৎ কোন বস্তু দ্বারা আঘাত পায়। সেই কাঁটর আঘাতের বদলা তাকে একটি নেকী দেয়া হয়, একটি গোনাহ্ মাফ হয়। এ হাদীসে فـمـا فوقهـا -এর এ অর্থ এমন বৃহৎ বস্তু যা কাঁটার চেয়ে অধিক কষ্টকর যেমন হোঁচট খাওয়া। অথবা فـمـا فوقهـا -এর অর্থ হল এমন ক্ষুদ্রতম বস্তু যা কাঁটার চেয়েও অধিক কষ্টকর যেমন পিঁপড়ার কামড়। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুমিন যখনই কোন কষ্ট পায় তখনই এটা তার গোনাহের পায়েশ্চিত্ব হয়ে যায় এমনকি পিঁপড়ার কামড়ও।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: قوله فما فوقها علام عطف وما معناه؟

উত্তর: فما فوقها -এর معطوف عليه ঃ

فما فوقها -এর معطوف عليه সম্বন্ধে দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. فما فوقها -এর معطوف عليه হল بعوضة ।

২. ما بعوضة -এর প্রারম্ভের ما অব্যয়টি যদি اسم হয় অর্থাৎ ما টি موصوفه বা موصوله বা استفهاميه হয় তাহলে ما অব্যয়টিই فما فوقها -এর معطوف عليه হবে।

فما فوقها -এর অর্থ ঃ

فما فوقها -এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. যা দেহাবয়ব বা শারীরিক গঠন মশার চেয়ে বৃহৎ যেমন মাছি, মাকড়শা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক মশার উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। অতএব অতি উত্তমরূপে এর চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা পেশ করেন।

২. অথবা তুচ্ছতা ও নগণ্যতায় যা মশার চেয়ে হীন। যেমন, মশার ডানা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبَةَ مَاءٍ

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে,আল্লাহ তা'লা মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।

☆☆☆

﴿فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾

أَمَّا حَرْفٌ يُفَصِّلُ مَا أُجْمِلَ وَيُؤَكِّدُ مَا بِهِ صَدَرَ وَيَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ وَلِذَالِكَ يُجَابُ بِالْفَاءِ قَالَ سِيْبَوَيْهِ أَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ مَعْنَاهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ أَيْ هُوَ ذَاهِبٌ لَامُحَالَةَ وَإِنَّهُ مِنْهُ عَزِيْمَةٌ وَكَانَ الْاَصْلُ دُخُوْلَ الْفَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا الْجَزَاءُ لٰكِنْ كَرِهُوْا اِيْلَاءَهَا حَرْفَ الشَّرْطِ فَأَدْخَلُوْهَا عَلَى الْخَبَرِ وَعَوَّضُوا الْمُبْتَدَأَ عَنِ الشَّرْطِ لَفْظًا ـ

أما শব্দের বিশ্লেষণ

অনুবাদ:

اما টি এমন হরফ, যা সংক্ষিপ্ত কথার বিশ্লেষণের জন্য আসে এবং তার মাধ্যমে যে বাক্যটি আরম্ভ হয় (সেই বাক্যের ভাবার্থের) দৃঢ়তা বুঝায়। এটা শর্তের অর্থকে ধারণ করে। আর এ জন্যই তার جواب (جزاء) আসে فاء -এর সাথে। ইমাম সিবাওয়ায়েহ্ (রা.) বলেন, أما زيد فذاهب বাক্যের অর্থ হলো, যাই হোক না কেন যায়েদ যাবে। অর্থাৎ অবশ্যই সে যাবে এবং যাওয়াটা তার দৃঢ় সংকল্প। (সিবাওয়ায়েহ্ রা. -এর এই উক্তি থেকে দু'টি কথা বুঝে আসে। ১. أما টি তাকীদের ফায়দা দেয় এবং ২. শর্তের অর্থকে শামিল রাখে)। বাক্যের শুরুতে فاء আসাটা মৌলিক ছিল। কেননা, বাক্যটি হল جزاء । কিন্তু (বাক্যের শুরুতে আসলে فاء টি أما -এর সাথে মিলে যায়। যেমন أما فزيد ذاهب আর) আরবের লোকেরা হরফে শর্তের সাথে فاء মিলিয়ে আনাকে অপছন্দনীয় মনে করেন। বিধায় فاء -কে خبر -এর শুরুতে আনা হয়। (তাই أما فزيد ذاهب না হয়ে أما زيد فذاهب হবে)। আর مبتدا -কে শর্তের পরিবর্তে নেয়া হয়েছে।

☆☆☆

وَفِيْ تَصْدِيْرِ الْجُمْلَتَيْنِ بِهِ اِحْمَادٌ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِعْتِدَادٌ بِعِلْمِهِمْ وَذَمٌّ بَلِيْغٌ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى قَوْلِهِمْ وَالضَّمِيْرُ فِيْ أَنَّهُ لِلْمَثَلِ أَوْ لِأَنْ يَّضْرِبَ ـ

অনুবাদ:

উভয় বাক্য (অর্থাৎ وأما الذين كفروا এবং فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم এবং فيقولون الخ এ দুই বাক্যের) শুরুতে اما আনার উদ্দেশ্য হলো, প্রথম বাক্যে মুমিনদের অতি প্রশংসা করা এবং তাদের জ্ঞানের মূল্যায়ন দেয়া। আর (দ্বিতীয় বাক্যে) কঠোর ভাষায় কাফিরদের তিরস্কার করা তাদের উক্তি– ما ذا أراد الله بهذا مثلا -এর উপর। أنه -এর মধ্যে ه যমীরটি مثل -এর দিকে ফিরেছে অথবা أن تضرب -এর দিকে।

☆☆☆

الحق শব্দের বিশ্লেষণ

اَلْحَقُّ اَلثَّابِتُ الَّذِىْ لَايَسُوْغُ اِنْكَارُهٗ يَعُمُّ الْاَعْيَانَ الثَّابِتَةَ وَالْاَفْعَالَ الصَّائِبَةَ وَ الْاَقْوَالَ الصَّادِقَةَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَقَّ الْاَمْرُ اِذَا ثَبَتَ وَمِنْهُ ثَوْبٌ مُحَقَّقٌ مُحْكَمُ النَّسْخِ

অনুবাদ:

হক বলা হয় সেই প্রমাণিত কথাকে যাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এটা বস্তু, সঠিক কর্ম এবং সত্য কথাকে শামিল রাখে। যেমন আরবের লোকেরা বলে, حق الامر অর্থাৎ প্রমাণিত হওয়া। তা থেকেই ثوب محقق (মজবুত করে তৈরীকৃত কাপড়) উৎকলিত। (সামঞ্জস্য হলো, যে কাপড়টি মজবুত করে বানানো হয় সেটাকে দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যায়)।

☆☆☆

﴿وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ﴾

كَانَ حَقُّهٗ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَايَعْلَمُوْنَ لِيُطَابِقَ قَرِيْنَهٗ وَيُقَابِلَ قَسِيْمَهٗ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ هٰذَا دَلِيْلًا وَاضِحًا عَلٰى كَمَالِ جَهْلِهِمْ عُدِلَ اِلَيْهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْكِنَايَةِ لِيَكُوْنَ كَالْبُرْهَانِ عَلَيْهِ

অনুবাদ:

উচিত ছিল এভাবে বলা– وأما الذين كفروا فلايعلمون তাহলে এটা তার সমজাতীর (তথা الذين كفروا) -এর অনুরূপ হয়ে যেতো। (কেননা, মুর্খতা কুফরির সাথে সামঞ্জস্য রাখে)। এবং তার বিপরীত প্রকার (তথা الذين أمنوا فيعلمون) -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যেতো। কিন্তু যেহেতু তাদের এই উক্তি তাদের চরম মুর্খতার জ্বলন্ত প্রমাণ বিধায় لايعلمون না বলে ইঙ্গিতার্থে فيقولون ما ذا أراد الله بهذا مثلا বলেছেন। তাহলে এটা তাদের মুর্খতার প্রমাণ স্বরূপ হয়ে যায়। (فيقولون ما ذا أراد الله بهذا مثلا এ উক্তিটি কাফিরদের চরম বোকামীর জ্বলন্ত প্রমাণ হয় এজন্য যে, তাদের উক্তি– ما ذا الخ -এর মধ্যে ما হলো استفهاميه (প্রশ্নবোধক শব্দ) আর না জানার কারণে প্রশ্ন করা হয় অথবা অস্বীকারের কারণে। আর এগুলোর প্রত্যেকটিই বোকামী ও মুর্খতার প্রমাণ)।

☆☆☆

﴿مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا﴾

يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُوْنَ (مَا) اِسْتِفْهَامِيَّةٌ وَ (ذَا) بِمَعْنٰى اَلَّذِيْ وَ (مَا) بَعْدَهُ صِلَتُهُ وَالْمَجْمُوْعُ خَبَرُ (مَا) وَأَنْ يَكُوْنَ (مَا) مَعَ (ذَا) اِسْمًا وَاحِدًا بِمَعْنٰى أَيُّ شَيْءٍ مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ عَلَى الْمَفْعُوْلِيَّةِ مِثْلُ مَا أَرَادَ اللّٰهُ وَالْأَحْسَنُ فِيْ جُوَابِهِ الرَّفْعُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالنَّصْبُ عَلَى الثَّانِيْ لِيُطَابِقَ الْجُوَابُ السُّوَالَ

অনুবাদ:

ماذا টি দু'টি সম্ভাবনা রাখে। (এক) এটা ما استفهاميه এবং ذا টি الذى -এর অর্থে এবং তার পরবর্তী অংশ হল صله অতঃপর صله ও موصول মিলে পূর্ণ অংশ ما -এর خبر। (দুই) ما টি ذا সহ একই ইসম أى شئ -এর অর্থে। এটা (أراد -এর) مفعول به হওয়ার কারণে محلا منصوب হয়েছে। যেমন– ما أراد الله -এর মধ্যে (ما) টি محلا منصوب। প্রথম বিশ্লেষণ অনুসারে ماذا -এর জবাব -এর মধ্যে رفع হওয়া উত্তম। এবং দ্বিতীয় বিশ্লেষণ অনুসারে نصب হওয়া উত্তম। যাতে জবাবটি প্রশ্নের অনুযায়ী হয়ে যায়। (অর্থাৎ প্রথম তারকীব অনুযায়ী ما টি استفهاميه আর এটা محلا مرفوع তাই তার জবাব তথা يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا বাক্যটিও مرفوع হবে; তবে منصوب হওয়াও জায়েয। আর দ্বিতীয় তারকীব অনুযায়ী ما টি محلا منصوب তাই তার জবাবটিও محلا منصوب হবে; যদিও مرفوع হওয়া জায়েয আছে। مرفوع হওয়ার সূরতে يضل به كثيرا الخ জবাবটি مبتدا محذوف -এর খবর হবে এবং نصب -এর সূরতে فعل محذوف -এর মাফউল বিহী হবে)।

☆☆☆

وَالْإِرَادَةُ نُزُوْعُ النَّفْسِ وَمَيْلُهَا اِلَى الْفِعْلِ بِحَيْثُ يَحْمِلُهَا عَلَيْهِ وَيُقَالُ لِلْقُوَّةِ الَّتِيْ هِيَ مَبْدَأُ النُّزُوْعِ وَالْأَوَّلُ مَعَ الْفِعْلِ وَالثَّانِيْ قَبْلَهُ وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِيْ اِتِّصَافِ الْبَارِيْ تَعَالٰى بِهِ وَلِذَالِكَ اُخْتُلِفَ فِيْ مَعْنٰى اِرَادَتِهِ فَقِيْلَ اِرَادَتُهُ لِأَفْعَالِهِ أَنَّهُ غَيْرُ سَاهٍ وَلَا مُكْرَهٍ وَلَا فَعَالِ غَيْرِهِ اَمْرُهُ بِهَا فَعَلٰى هٰذَا لَمْ تَكُنِ الْمَعَاصِيْ بِاِرَادَتِهِ تَعَالٰى وَقِيْلَ عِلْمُهُ بِاِشْتِمَالِ الْأَمْرِ عَلَى النِّظَامِ الْأَكْمَلِ وَالْوَجْهِ الْأَصْلَحِ فَاِنَّهُ يَدْعُو الْقَادِرَ اِلٰى تَحْصِيْلِهِ وَالْحَقُّ اَنَّهُ تَرْجِيْحُ أَحَدِ مَقْدُوْرَيْهِ عَلَى الْأٰخَرِ وَتَخْصِيْصُهُ بِوَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ أَوْ مَعْنًى يُوْجِبُ هٰذَا التَّرْجِيْحَ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْإِخْتِيَارِ فَاِنَّهُ مَيْلٌ مَعَ تَفْضِيْلٍ وَفِيْ هٰذَا اِسْتِحْقَارٌ وَاِسْتِرْزَالٌ وَمَثَلًا نَصْبٌ عَلَى التَّمْيِيْزِ أَوِ الْحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى: هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ.اٰيَةً

অনুবাদ:

ارادة -এর অর্থ কোন কর্মের দিকে মনের এমন আকর্ষণ যা ঐ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আকর্ষণের সূচনা তথা সামর্থ্য -এর উপরও ارادة -এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। ارادة -এর প্রথম অর্থটি কর্মের সাথে এবং দ্বিতীয় অর্থটি কর্মের পূর্বে হয়ে থাকে। আর এ দু'টি অর্থের কোন একটির সাথেই আল্লাহ্ তা'লা গুণান্বিত হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। (কেননা, এ দু'টি অর্থ দেহের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ তা'লা দেহ থেকে পবিত্র)। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, (আল্লাহর ইচ্ছা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজের কর্মসমূহের ইচ্ছা করেন অথবা অন্যের কর্মের ইচ্ছা করেন। যদি) আল্লাহর নিজের কর্মের ইচ্ছা হয়, (তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে) তিনি স্বীয় কর্মকে ভুলেন নি এবং তার উপর বাধ্য নন। আর (যদি) অন্যের কর্মের ইচ্ছ করা হয়, (তাহলে তার অর্থ হবে) অন্যকে ঐ কর্মের আদেশ দেয়া। আল্লাহর ইচ্ছা করার এই ব্যাখ্যা মতে পাপাচার আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হবে না। (কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তো পাপাচারের আদেশ দেন নি)। আর কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অর্থ হলো, বস্তু সম্পর্কে তিনি এই জ্ঞান রাখেন যে, ঐ বস্তুটি পরিপূর্ণ শৃংখলাবদ্ধ এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থাকে শামিল রাখে। কেননা, এ জ্ঞানই সামর্থ্যবানকে অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে। সত্য কথা হলো, আল্লাহর ইচ্ছার অর্থ হলো, তাঁর ক্ষমতার আয়ত্বাধীন (তথা কাজ করা ও না করা) -এর মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাকে কোন একটি অবস্থার সাথে বিশেষিত করা। অথবা ইরাদা সেই গুণকে বলে, যা উপরোক্ত প্রাধান্যতাকে প্রমাণ করে।

(ইরাদা ও এখতিয়ারের মধ্যকার পার্থক্য ঃ) ইরাদাটি এখতিয়ারের তুলনায় অধিক ব্যাপক (عـــام)। কেননা, এখতিয়ার বলা হয়, অগ্রাধিকার প্রদানের সাথে (ক্ষমতার আয়ত্বাধীন দুই বস্তুর যে কোন একটির দিকে) মনযোগী হওয়া। (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব দানের সাথে যে কোন একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়াকে এখতিয়ার বলা হয়। আর مطلق ترجيح সাধারণ প্রাধান্য দানকে ইরাদা বলা হয়। চাই শ্রেষ্ঠত্ব পদান করা হোক বা না হোক)।

(هذا -এর তাফসীর এবং مثلا -এর তারকীব ঃ) আর (هذا مثلا -এর মধ্যে) هذا ইসমে ইশারা দ্বারা মুশারুন ইলাইহি -এর তুচ্ছতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। (কেননা, নিকটবর্তী ইসমে ইশারা কখনো মুশারুন ইলাইহি -এর তুচ্ছতা প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়)। مثـــلا শব্দটি (هـــذا ইসমে ইশারা থেকে) তমীয অথবা حال হয়ে منصوب হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী – هـذه ناقة الله لكم اية (এর মধ্যে اية শব্দটি هذه ইসমে ইশারা থেকে حال অথবা তমীয হয়েছে)।

☆☆☆

﴿ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ﴾

جُوَابُ مَاذَا أَيْ اِضْلَالُ كَثِيْرٍ وَاِهْدَاءُ كَثِيْرٍ وُضِعَ الْفِعْلُ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ لِلْاِشْعَارِ بِالْحُدُوْثِ وَالتَّجَدُّدِ أَوْ بَيَانٌ لِلْجُمْلَتَيْنِ الْمُصَدَّرَتَيْنِ بِأَمَّا وَتَسْجِيْلٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِهٖ حَقًّا هُدًى وَبَيَانٌ وَاَنَّ الْجَهْلَ بِوَجْهِ اِيْرَادِهٖ وَالْاِنْكَارَ لِحُسْنِ مَوْرِدِهٖ ضَلَالٌ وَفُسُوْقٌ

অনুবাদ:

(يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا) আয়াতের এ অংশটি দু'টি সম্ভাবনা রাখে। হয়তো এটা) ماذا -এর জবাব। (অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, এই উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে বলা হয়েছে– يضل به كثيرا الخ) অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো) অনেককে গোমরাহ্ করা এবং অনেককে হেদায়েত দান করা। ফে'লকে মাসদারের স্থলে রাখা হয়েছে حدوث ও تجدد বুঝানোর জন্য। (حدوث বলা হয় অস্তিত্বহীনের পর অস্তিত্ব লাভ করা। আর تجدد বলা হয় ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ বিরামহীনভাবে চলতে থাকা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, উক্ত উপমাগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, অনেক লোককে ধারাবাহিকভাবে পথভ্রষ্ট করা এবং অনেক লোককে এর দ্বারা হেদায়েত দান করা। মাসদার উল্লেখ করার দ্বারা এ অর্থটি বুঝা যেতো না)। অথবা যে দুই বাক্যের শুরুতে أما এসেছে (অর্থাৎ وأما الذين এবং فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا এ বাক্যটি উক্ত দুই বাক্যের বিবরণী। এর দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, উপমাকে সত্য বলে জানা হেদায়েত এবং উপমা উপস্থাপনের রহস্য না জানা ও উপস্থাপনার উত্তম পদ্ধতিকে অস্বীকার করা গোমরাহী এবং অবাধ্যতা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله جواب ماذا الخ : এটা يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে যেগাসূত্রের বিবরণ। এর সারাংশ হলো– يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا এ বাক্যটির পূর্ববর্তী বাক্য তথা فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم এবং وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا এ দুই বাক্যের সাথে তার কি সম্পর্ক, তাতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা– ১. يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا এটা ماذا -এর জবাব। কাফিরদের প্রশ্ন ছিল, কুরআনে উপমা পেশ করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার কি উদ্দেশ্য? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, উপমা পেশ করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, অনেক লোককে গোমরাহ করা এবং অনেককে হেদায়েত দান করা তাঁর উদ্দেশ্য। ২. يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا এ বাক্যটি পূর্বের দুই বাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। পূর্বের দুই বাক্যের মধ্যে দু'টি কথার উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) উভয় দলের মধ্যে লোকের সংখ্যা প্রচুর। (খ) উপমাকে সত্য বলে স্বীকার করা হেদায়েতের অন্তর্ভুক্ত। মুমিনদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। আর উপমার সত্যতার জ্ঞান না রাখা মুর্খতা, এর দ্বারা মুর্খতা আরো বৃদ্ধি পায়। يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا এই বাক্যটি পূর্ববর্তী দুই বাক্যের ভাবার্থকে (যা অস্পষ্ট ছিল) স্পষ্ট করে দিল। তাই এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিবরণী।

☆☆☆

وَكَثِيْرَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَبِيْلَتَيْنِ بِالنَّظْرِ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا بِالْقِيَاسِ اِلٰى مُقَابِلِيْهِمْ فَاِنَّ الْمَهْدِيِّيْنَ قَلِيْلُوْنَ بِالْاِضَافَةِ اِلٰى اَهْلِ الضَّلَالِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْر. وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ كَثْرَةُ الضَّالِّيْنَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ وَكَثْرَةُ الْمَهْدِيِّيْنَ بِاعْتِبَارِ الْفَضْلِ وَالشَّرْفِ كَمَا قَالَ ـ قَلِيْلٌ اِذَا عُدُّوْا+وَكَثِيْرٌ اِذَا شُدُّوْا. وَقَالَ ـ اِنَّ الْكِرَامَ كَثِيْرٌ فِي الْبِلَادِ وَاِنْ + قَلُّوْا كَمَا غَيْرُهُمْ قَلَّ وَاِنْ كَثُرُوْا

অনুবাদ:

আর উভয় পক্ষ (তথা পথভ্রষ্ট ও হেদায়েত প্রাপ্ত) -এর আধিক্যতা নিজ নিজ অনুযায়ী; নিজের প্রতিপক্ষের অনুযায়ী নয়। কেননা, হেদায়েতপ্রাপ্তরা পথভ্রষ্টদের তুলনায় অল্প। যেমন আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন– وقليل من عبادى الشكور "আমার শোকরাগোযার বান্দাদের সংখ্যা কম"। আর এটাও সম্ভব আছে যে, পথভ্রষ্টদের আধিক্যতা সংখ্যার বিচারে। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের আধিক্যতা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে। যেমন কবি বলেন, তাদেরকে যখন গণনা করা হয়, তখন কম মনে হয়। আর যখন আক্রমন করে, তখন প্রচুর মনে হয়। পৃথিবীতে সম্মানী লোক অনেক যদিও সংখ্যায় কম থাকে। যেরকম অভদ্র লোক সংখ্যায় বেশি হলেও কম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله و كثرة كل واحد من القبيلتين الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, কুরআনে কারীমের অন্যত্র বলা হয়েছে– وقليل من عبادى الشكور "আমার শোকরগোযার বান্দাদের সংখ্যা কম"। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শোকরগোযারদের সংখ্যা কম হবে। অথচ আলোচ্য আয়াত তথা ويهدى به كثيرا দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শোকরগোযারদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। সুতরাং এ উভয় আয়াতের মধ্যে অমিল দেখা দিল।

উত্তর: মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম উত্তরের সারাংশ হলো, উভয় দল প্রকৃত পক্ষে বেশি হবে। বিধায় উভয় দলকে বেশি বলা হয়েছে। তবে হেদায়েতপ্রাপ্তরা পথভ্রষ্টদের তুলনায় কম হবে। বিধায় হেদায়েত প্রাপ্তদের সংখ্যা কম বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উত্তরের সারাংশ হলো, পথভ্রষ্টদের আধিক্য সংখ্যার বিচারে হবে। অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে পথভ্রষ্টরা হেদায়েতপ্রাপ্তদের তুলনায় বেশি হবে। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের আধিক্যতা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হবে। অর্থাৎ হেদায়েতপ্রাপ্তদের মর্যাদা পথভ্রষ্টদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি হবে। তাই আর কোন প্রশ্ন থাকলো না।

☆☆☆

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾

أَيْ خَارِجِيْنَ عَنْ حَدِّ الْإِيْمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُوَ الْفَاسِقُوْنَ . مِنْ قَوْلِهِمْ فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قِشْرِهَا اِذَا خَرَجَتْ وَأُصْلُ الْفِسْقِ اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْقَصْدِ قَالَ رُوْبَةُ: فَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرُ

আয়াতের ব্যাখ্যা

অনুবাদ:

(অর্থাৎ তিনি উপমার দ্বারা সেই লোকদেরকেই গোমরাহ করেন) যারা ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'লার বাণী– ان المنافقين هم الفاسقون (এর মধ্যে فاسقون দ্বারা যারা ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে গেছে তারা উদ্দেশ্য)। এটা আহলে আরবের উক্তি – فسقت الرطبة عن قشرها থেকে নির্গত। (যার অর্থ হলো, তরতাজা খেজুর খোসা থেকে বেরিয়ে গেছে)। এটা তখন বলা হয়, যখন খেজুর তার খোসা থেকে বেরিয়ে যায়। فسق শব্দের মূল অর্থ হলো, সরল পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যেমন কবি রুবা বলেন, فواسقا عن قصدها جوائر (এই পঙক্তির প্রথম পঙক্তি হলো, يذهبن فى نجد وغورا غائر । نجد -এর অর্থ হলো, উঁচু জমিন। غور -এর অর্থ নিচু জমিন, গর্ত। جوائر অর্থ সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কবিতার অর্থ– উট কখনো উঁচু জমিতে বিচরণ করে। আর কখনো নিচু জমিতে সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচরণ করে। মুসান্নিফ (র.) এ কবিতাটি উপস্থাপন করে একথার প্রমাণ দিতে চাচ্ছেন যে, فسق শব্দের মূল অর্থ হলো, সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ কবিতার মধ্যে استشهاد محل হচ্ছে فواسقا শব্দটি, যা فاسقة -এর বহুবচন। অর্থ, সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্নবাদী)।

☆☆☆

ফাসিকের পরিচয়, তার স্তর এবং ফাসিক ঈমানের সীমনা থেকে বেরিয়ে যায় কি না

وَالْفَاسِقُ فِي الشَّرْعِ: اَلْخَارِجُ عَنْ أَمْرِ اللّٰهِ بِارْتِكَابِ الْكَبِيْرَةِ وَلَهٗ دَرَجَاتٌ ثَلَاثٌ اَلْأُوْلٰى: اَلتَّغَابِيْ وَهُوَ أَنْ يَرْتَكِبَهَا أَحْيَانًا مُسْتَقْبِحًا إِيَّاهَا وَالثَّانِيَةُ اَلْإِنْهِمَاكُ وَهُوَ أَنْ يَعْتَادَ اِرْتِكَابَهَا غَيْرَ مُبَالٍ بِهَا وَالثَّالِثَةُ اَلْجُحُوْدُ وَهُوَ أَنْ يَرْتَكِبَهَا مُسْتَصْوِبًا إِيَّاهَا فَإِذَا شَارَفَ هٰذَا الْمُقَامَ وَتَخَطَّطَ خُطَطًا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيْمَانِ عَنْ عُنُقِهِ وَلَابِسَ الْكُفْرِ وَمَا دَامَ فِيْ دَرَجَةِ التَّغَابِيْ وَالْإِنْهِمَاكِ فَلَايَسْلُبُ عَنْهُ اِسْمُ الْمُؤْمِنِ لِاتِّصَافِهِ بِالتَّصْدِيْقِ الَّذِيْ هُوَ مُسَمَّى الْإِيْمَانِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا. وَالْمُعْتَزِلَةُ

لَمَّا قَالُوْا اَلْإِيْمَانُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوْعِ التَّصْدِيْقِ وَالْإِقْرَارِ وَالْعَمَلِ. وَالْكُفْرُ: تَكْذِيْبُ الْحَقِّ وَجُحُوْدُهُ جَعَلُوْهُ قِسْمًا ثَالِثًا نَازِلًا بَيْنَ مَنْزِلَتَيِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لِمُشَارَكَتِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيْ بَعْضِ الْأَحْكَامِ

অনুবাদ:

শরীয়তের পরিভাষায় ফাসিক বলা হয়, যে কবীরা গোনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে। তার তিনটি স্তর রয়েছে। (১) تغابى অর্থাৎ কবীরা গোনাহকে মন্দ ভেবেও কখনো কবীরা গোনায় লিপ্ত হওয়া। (২) انهماك অর্থাৎ বেপরওয়া হয়ে কবীরা গোনাহের অভ্যস্ত হওয়া। (৩) جحود অর্থাৎ কবীরা গোনাহকে বৈধ মনে করে তা করা। মানুষ যখন এই স্তরে পৌঁছে যায় তখন সে নিজের ঘাড় থেকে ঈমানের বাঁধন খোলে ফেলে এবং কুফুরে পৌঁছে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত انهماك ও تغابى -এর স্তরে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, তার অন্তরে তাসদীক বা সত্যায়ন আছে, যাকে ঈমান বলা হয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা বলেন– وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا "যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়"। (দেখুন! এই আয়াতের মধ্যে ঝগড়া কবীরা গোনাহ্ হওয়া সত্ত্বে উভয় দলকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবীরা গোনাহের কারণে মুমিন কাফির হয়ে যায় না)। যেহেতু মু'তাযিলা বলে থাকে, সত্যায়ন করা, স্বীকার করা এবং আমল করা এই তিনটি বস্তুর সমষ্টিকে ঈমান বলা হয়। আর অস্বীকার করাকে কুফুর বলা হয়, সেহেতু তারা ফাসিককে তৃতীয় আরেকটি স্তরে উপনীত করেছে, যা মুমিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী একটি স্তর। কেননা, ফাসিক কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফিরের সমপর্যায়ের। (অর্থাৎ ফাসিকের মধ্যে ঈমানের কিছু বিধান তথা বিশ্বাস আছে। তবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াতে তার মধ্যে কুফরের কিছু বিধানও পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, কবীরা গোনাহ্ও কুফরির অন্তর্ভুক্ত)।

☆☆☆

﴿اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ﴾

মুসান্নিফ (র.) এই আয়াতের তারকীব করার পর তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: نقض শব্দের বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: عهد শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: عهد -এর ব্যাখ্যা।

তারকীব ও نقض শব্দের বিশ্লেষণ

صِفَةُ الْفَاسِقِيْنَ لِلذَّمِّ وَتَقْرِيْرُ الْفِسْقِ وَالنَّقْضُ فَسْخُ التَّرْكِيْبِ وَأَصْلُهُ فِيْ طَاقَاتِ الْحَبْلِ وَاسْتِعْمَالُهُ فِيْ إِبْطَالِ الْعَهْدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْعَهْدَ يُسْتَعَارُ لَهُ الْحَبْلُ لِمَا فِيْهِ مِنْ رَبْطِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ فَإِنْ أُطْلِقَ مَعَ لَفْظِ الْحَبْلِ كَانَ تَرْشِيْحًا لِلْمَجَازِ وَإِنْ

ذُكِرَ مَعَ الْعَهْدِ كَانَ رَمْزًا إِلَى مَا هُوَ مِنْ رَوَادِفِه وَهُوَ أَنَّ الْعَهْدَ مِثْلُ الْحَبْلِ فِيْ ثُبَاتِ الْوَصْلَةِ بَيْنَ الْمُتَعَاهِدَيْنِ كَقَوْلِكَ: شُجَاعٌ يَفْتَرِسُ اَقْرَانَهُ وَعَالِمٌ يَغْتَرِفُ مِنْهُ النَّاسُ فَإِنَّ فِيْه تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّهُ أَسَدٌ فِيْ شُجَاعَتِه بَحْرٌ بِالنَّظْرِ إِلَى إِفَادَتِه.

অনুবাদ:

الذين ينقضون عهد الله এ অংশটি পূর্বের الفاسقين শব্দের সিফাত হয়েছে। এটা তাদের তিরস্কারার্থে এবং ফিসককে প্রমাণ করার জন্য এসেছে। (অর্থাৎ الذين ينقضون الخ এই সিফাত দ্বারা তাদের অবাধ্যতাকে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। তাই তারা ফাসিক)। نقض শব্দের মূল অর্থ হলো, বন্ধন খোলে ফেলা। (চাই রসির বন্ধন কিংবা ঘর প্রভৃতির বন্ধক হোক)। এটা মূলতঃ রসির বন্ধন খোলা– এ অর্থে ব্যবহৃত হতো। অতঃপর চুক্তি ভঙ্গ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় استعاره স্বরূপ। কেননা, চুক্তির মধ্যে উভয় চুক্তিকারীর মাঝে বিশেষ এক প্রকারের বন্ধন হয়ে থাকে। نقض শব্দকে যদি حبل -এর সাথে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা হবে ترشيح للمجاز। আর যদি عهد শব্দের সাথে তার ব্যবহার হয় তাহলে তার দ্বারা সেই বস্তুর দিকে ইঙ্গিত হবে যার অনুগামী হল نقض শব্দটি। অর্থাৎ চুক্তিটি চুক্তি সম্পাদনকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য রসির ন্যায়। যেমন তোমার উক্তি شجاع تفترس أقرانه (সে এমন বাহাদুর যে, সে তার সজাতীদেরকে শিকার করে)। এবং وعالم يغترف منه الناس (আরো একজন জ্ঞানী লোক, যার কাছ থেকে মানুষ অঞ্জলী ভরে নেয়)। এ দু'টি উক্তির (প্রথমটির) মধ্যে সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি বাহাদুরীতে সিংহের মতো। এবং (দ্বিতীয়টির মধ্যে) কল্যাণের ক্ষেত্রে সমুদ্রের ন্যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله والنقض فسخ التركيب الخ : এখানে نقض শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। نقض -এর মূল অর্থ হলো, বন্ধন খোলা। এখন প্রশ্ন হলো, نقض -এর অর্থ যেহেতু বন্ধন খোলা, তাই চুক্তি ভঙ্গ করার উপর نقض -এর ব্যবহার কিভাবে বিশুদ্ধ হলো? কেননা, চুক্তির মধ্যে তো দু'টি বস্তুর মাঝে বন্ধন থাকে না।

উত্তর : نقض শব্দের মূল অর্থ ছিল রসির বন্ধন খোলা। অতঃপর চুক্তি ভঙ্গ করার উপর তার ব্যবহার হয় استعاره হিসেবে। অর্থাৎ রসির মাধ্যমে যেভাবে দু'টি বস্তুকে বাঁধা হয়, সেভাবে চুক্তির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মধ্যে এক প্রকারের বন্ধন ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাই চুক্তিকে রসির সাথে তুলনা করে حبل (রসি) -কে চুক্তির উপর استعاره হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই استعاره -এর মধ্যে দু'টি সূরত হতে পারে। استعاره مصرحه এবং استعاره بالكناية । استعاره مصرحه হবে যদি عهد (চুক্তি) শব্দকে হযফ করে مشبه به তথা حبل উল্লেখ করে এর দ্বারা مشبه (চুক্তি) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। যেমন حبل الله অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিজ্ঞা। এই সূরতে যদি نقض শব্দের উল্লেখ হয় তাহলে حبل শব্দের সাথে উল্লেখ হবে। যেমন ينقضون حبل الله এমতাবস্থায় نقض শব্দের উল্লেখ করাটা হবে ترشيح للمجاز। কেননা, ترشيح বলা হয় قرينه -এর মাধ্যমে استعاره টি পূর্ণ হওয়ার পর مشبه به -এর مناسب -এর উল্লেখ করা। এখানে আল্লাহর দিকে حبل -এর اضافت হওয়াটা চুক্তিকে حبل (রসি) -এর সাথে তুলনা করার

। مناسب -এর- حبل টি نقض কেননা, ترشيح -এর উল্লেখ نقض আর । قرينه

আর استعاره بالكناية হবে যদি عهد (চুক্তি) -কে حبل (রসি) -এর সাথে তুলনা করে مشبه به -কে হযফ করে দেয়া হয়। আর তার لوازم -এর মধ্য থেকে একটি لازم তথা نقض উল্লেখ করা হবে। এই সূরতে نقض শব্দটি عهد -এর সাথে উল্লেখ হবে। এমতাবস্থায় نقض দ্বারা সেই তাশবীহের দিকে ইঙ্গিত হবে যার تابع হল نقض । আর এই তাশবীহটি হলো, عهد তথা চুক্তিটি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মধ্যখানে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রসির ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে রসির মাধ্যমে দু'টি বস্তুর সম্পর্ক টিকিয়ে থাকে, সেভাবে দুই ব্যক্তির কিংবা দুই পক্ষের মধ্যখানে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই عهد (চুক্তি) টি حبل (রসি) -এর সমতুল্য। আর نقض টি ঐ তাশবীহের অনুগামীর মধ্য থেকে। আবার نقض টি مشبه به -এর لوازم -এর মধ্য থেকে। এটা استعاره بالكناية হওয়ার قرينه । অতঃপর نقض শব্দের মধ্যে استعاره تصريحيه ও পাওয়া যাচ্ছে। আর তা এভাবে যে, চুক্তি ভঙ্গনকে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এই استعاره টি পূর্বের استعاره -এর অনুগামী হলো।

মোদ্দাকথা, ينقضون عهد الله -এর মধ্যে استعاره بالكناية হওয়ার সাথে সাথে استعاره تصريحيه ও পাওয়া গেল। نقض শব্দকে استعاره تصريحيه হিসেবে চুক্তি ভঙ্গনের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

☆☆☆

عهد শব্দের বিশ্লেষণ

وَالْعَهْدُ الْمُوْثَقُ وَضَعَهُ لِمَا مِنْ شَانِه أَنْ يُرَاعِيَ وَيَتَعَاهَدَ كَالْوَصِيَّةِ وَالْيَمِيْنِ وَيُقَالُ لِلدَّارِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُرَاعٰى بِالرُّجُوْعِ اِلَيْهَا وَالتَّارِيْخِ لِاَنَّهٗ يُحْفَظُ

অনুবাদ:

عهد -এর অর্থ: অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা। সংরক্ষণ করা যায় এমন বস্তু বুঝানোর জন্য عهد শব্দকে গঠন করা হয়েছে। যেমন ওসিয়ত ও কসম। (এ দু'টি তো সংরক্ষণ ও হেফাজত করার যোগ্য)। ঘরকেও عهد বলা হয়। কেননা, ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ঘরকে হেফাজত করা হয়। ইতিহাসকেও عهد বলা হয়। কেননা, তা সংরক্ষণ করা হয়।

☆☆☆

আয়াতের মধ্যে عهد (প্রতিজ্ঞা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

وَهٰذَا الْعَهْدُ اِمَّا الْعَهْدُ الْمَاخُوْذُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْحُجَّةُ الْقَائِمَةُ عَلٰى عِبَادِه الدَّالَّةِ عَلٰى تَوْحِيْدِه وَ وُجُوْبِ وُجُوْدِه وَصِدْقِ رَسُوْلِه وَعَلَيْهِ نَزَلَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَأَشْهَدَهُمْ

عَلٰى أَنْفُسِهِمْ. أَوِ الْمَاخُوْذُ بِالرُّسُلِ عَلَى الْأُمَمِ بِأَنَّهُمْ إِذَا بُعِثَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلٌ مُصَدَّقٌ بِالْمُعْجِزَاتِ صَدَّقُوْهُ وَتَبِعُوْهُ وَلَمْ يَكْتُمُوْا أَمْرَهُ وَلَمْ يُخَالِفُوْا حُكْمَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِه تَعَالٰى: وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ. وَنَظَائِرُهُ وَقِيْلَ عُهُوْدُ اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ: عَهْدٌ اَخَذَ عَلٰى جَمِيْعِ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ بِأَنْ يُقِرُّوْا بِرُبُوْبِيَّتِه وَعَهْدٌ اَخَذَهُ عَلَى النَّبِيِّيْنَ بِأَنْ يُقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَايَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ وَعَهْدٌ اَخَذَهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِأَنْ يُبَيِّنُوا الْحَقَّ وَلَايَكْتُمُوْهُ.

অনুবাদ:

(অত্র আয়াতে عهد বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ মর্মে দু'টি উক্তি পাওয়া যায়)। (১) হয়তো এর দ্বারা বিবেকের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে তা উদ্দেশ্য। আর বিবেকই হলো সেই প্রমাণ যা আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা অল্লাহ তা'লার একত্ববাদ, তার অস্তিত্বের জ্ঞান এবং রাসূলের সত্যতার প্রমাণ করে। (অর্থাৎ এখানে প্রতিজ্ঞা বলতে বিবেক-বুদ্ধি দানের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে সেটা উদ্দেশ্য। কেননা, বিবেকই হলো এমন প্রমাণ যা বান্দাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ, তার অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং রাসূলের সত্যতার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মোটকথা, বিবেক হলো এগুলো অর্জনের মাধ্যম। তাই আল্লাহ তা'লা বান্দাকে বিবেক দান করেছেন। তাই যেন বান্দাদের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে যে, তারা একত্ববাদ, অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং রাসূলের সত্যতার প্রমাণাদির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবে)। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার বাণী– وأشهدهم على انفسهم ("আর তাদেরকে তাদের সত্তার উপর সাক্ষী রেখেছেন")। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন এবং তাদের জন্য রুবুবিয়াতের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেছেন)। (২) অথবা প্রতিজ্ঞা দ্বারা রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে উম্মতের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে সেটা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের নিকট যখন কোন রাসূল আগমন করবেন যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে মু'জিযার মাধ্যমে। তখন তারা তাকে সত্য বলে স্বীকার করবে, তার অনুসরণ করবে, তার আদেশকে গোপন রাখবে না এবং তার বিরোধিতা করবে না। এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে– واذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকার তিন প্রকার: (১) সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ তা'লা আদম সন্তানের কাছ থেকে (রুহ জগতে) নিয়েছেন। তথা তারা তাকে প্রভূ বলে স্বীকার করবে। (২) সেই অঙ্গীকার যা রাসূলগণের নিকট থেকে এই মর্মে নেয়া হয়েছে যে, তারা দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকবে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। (৩) সেই অঙ্গীকার যা আলেম-ওলামার নিকট থেকে এ মর্মে নেয়া হয়েছে যে, তারা সত্য বর্ণনা করবে এবং সত্যকে গোপন রাখবে না।

☆☆☆

﴿مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ﴾

وَالضَّمِيْرُ لِلْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقُ اِسْمٌ لِمَا يَقَعُ بِهِ الْوَثَاقَةُ وَهِيَ الْإِسْتِحْكَامُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا وَثَّقَ اللّٰهُ بِهِ عَهْدَهُ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْكُتُبِ أَوْ مَا وَثَّقُوْهُ بِهِ مِنَ الْاِلْتِزَامِ وَالْقَبُوْلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَمِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ فَاِنَّ اِبْتِدَاءَ النَّقْضِ بَعْدَ الْمِيْثَاقِ .

অনুবাদ:

ميثاقه -এর যমীরটি عهد -এর দিকে ফিরেছে। ميثاق (শব্দটি اسم اله তার অর্থ) যার দ্বারা দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। আয়াতের মধ্যে ميثاق দ্বারা সেই সকল আয়াত ও আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য যেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ তা'লা স্বীয় অঙ্গীকারকে মজবুত করেছেন। অথবা তার উদ্দেশ্য হলো, পাপাচার ব্যক্তিরা যে বিষয়কে নিজের উপর আবশ্যক করে এবং তা গ্রহণ করে অঙ্গীকারকে মজবুত করেছিল। ميثاق শব্দটি মাসদার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে (যদিও মাসদার নয়। অর্থ দৃঢ় করা, মজবুত করা)। আর من টি হলো ابتدائيه কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গনের সূচনা হয় অঙ্গীকার করার পর।

☆☆☆

﴿وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ﴾

وَيَحْتَمِلُ كُلَّ قَطِيْعَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِقَطْعِ الرَّحْمِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْكُتُبِ فِي التَّصْدِيْقِ وَتَرْكِ الْجَمَاعَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ وَسَائِرِ مَا فِيْهِ رَفْضُ خَيْرًا أَوْ تَعَاطِيْ شَرْطٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوَصْلَةَ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْمَقْصُوْدَةِ بِالذَّاتِ مِنْ كُلِّ وَصْلٍ وَفَصْلٍ

অনুবাদ:

সম্ভব আছে যে, এখানে (يقطعون ما أمر الله به দ্বারা) সকল প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা উদ্দেশ্য, যেগুলোর উপর আল্লাহ তা'লা অসন্তুষ্ট থাকেন। যেমন: আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করা এবং সত্যায়নের ক্ষেত্রে আসমানী কিতাব ও আম্বিয়া কোরমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। (অর্থাৎ কিছুকে বিশ্বাস করা আর কিছুকে অস্বীকার করা)। তদ্রূপ ফরজ জামা'তকে বর্জন করা এবং ঐ সকল বস্তুকে বর্জন করা যার কারণে কোন কল্যাণকর বিষয় পরিত্যাগ করতে হয় অথবা কোন গোনাহে লিপ্ত হতে হয়। কেননা, এই সকল বস্তু আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। আর প্রত্যেক ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ বর্জন করার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো এসকল বস্তু।

☆☆☆

وَالْاَمْرُ : هُوَ الْقَوْلُ الطَّالِبُ لِلْفِعْلِ وَقِيْلَ مَعَ الْعُلُوِّ وَقِيْلَ مَعَ الْاِسْتِعْلَاءِ وَبِهِ سُمِّىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ هُوَ وَاحِدُ الْاُمُوْرِ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُوْلِ بِهِ بِالْمَصْدَرِ فَاِنَّهُ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ كَمَا قِيْلَ: لَهُ شَانٌ وَهُوَ الطَّلَبُ الْقَصْدُ يُقَالُ شَأَنْتُ شَانَهُ اِذَا قَصَدْتَ قَصْدَهُ

অনুবাদ:

امـــر। বলা হয় ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথাকে। (চাই বক্তা আদিষ্ট ব্যক্তি থেকে উঁচুমানের হোক কিংবা তার চেয়ে নিচুমানের হোক। নিজেকে বড় ধারণা করুক বা না করুক)। কেউ কেউ বলেন, আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির চেয়ে উচুঁমানের ব্যক্তি কর্তৃক ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথা বলা। (চাই সে নিজেকে উঁচু মনে করুক বা না করুক)। আর কেউ কেউ বলেন, امــــر। বলা হয় নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় ভেবে ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথা বলা। (চাই সে বাস্তবে বড় হোক বা না হোক)। আর তা থেকেই মাসদার দ্বারা মাফউল বিহিকে নামকরণের নিয়মানুসারে আদেশকৃত কাজকে امـر। বলা হয়। কেননা, এটা আদেশকৃত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয় لــه شـــان (তার রয়েছে অসাধারণ প্রভাব)। شان শব্দের মূল অর্থ হলো ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। বলা হয় شـأنـت شـانه অর্থাৎ আমি তার ইচ্ছা করেছি।

﴿أَنْ يُوْصَلَ﴾ يَحْتَمِلُ النَّصْبَ وَالْخَفْضَ عَلٰى أَنَّهُ بَدْلٌ مِنْ (مَا) أَوْ ضَمِيْرِهِ وَالثَّانِىْ أَحْسَنُ لَفْظًا وَمَعْنًى

অনুবাদ:

أن يـوصل এ অংশটি مـا مـوصـولـه থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে مـنـصـوب হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (কেননা, مـا موصوله টি يقطعون -এর মাফউলে বিহি)। অথবা به -এর যমীর থেকে بدل হয়ে মাজরুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই দ্বিতীয় তারকীবটি শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে অধিক উত্তম।

☆☆☆

﴿وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ﴾

بِالْمَنْعِ عَنِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ بِالْحَقِّ وَقَطْعِ الْوَصْلِ الَّتِىْ بِهَا نِظَامُ الْعَالَمِ وَصَلَاحُهُ

অনুবাদ:

"আর তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে"। অর্থাৎ ঈমান থেকে বারণ করে, সত্যকে নিয়ে উপহাস করে এবং সেই সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে যার মধ্যে নিহিত রয়েছে পৃথিবীর নেজাম-শৃংখলা ও তার কল্যাণ।

☆☆☆

কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য। কেননা, কুফরের বিকাশ কোন حال মুক্ত নয়। সুতরাং যখন তাদের এমন حال -কে অস্বীকার করলেন যার মধ্যে كفر বিদ্যমান রয়েছে। তখন এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে وجود كفر -এর অস্বীকৃতি হয়ে গেল। অতএব এই পদ্ধতির মাধ্যমে কুফরকে অস্বীকার করা اتكفرون -এর দ্বারা কুফরের অস্বীকৃতি জানানোর তুলনায় জোরালোভাবে কুফরের অস্বীকৃতি হয়। আর তার পরবর্তী حال -এর সাথেও বেশী সামঞ্জস্যশীল। এর দ্বারা কাফরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যখন তাদেরকে কুফর, অশ্লীল কথা-বার্তা এবং নিকৃষ্ট কর্ম এই দোষে দূষিত করেছেন। তখন তাদেরকে التفات -এর পদ্ধতিতে সম্বোধন করলেন এবং তাদেরকে তাদের কুফরীর উপর ধিক্কার জানালেন। অধিকন্তু সেই অবস্থার জ্ঞান তাদের রয়েছে যে অবস্থা কুফরীকে অস্বীকার করে। আয়াতের অর্থ হল, তোমরা বল, তোমরা কোন অবস্থার উপর কুফরী অবলম্বন করছ?

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (كيف تكفرون بالله) استخبار فيه انكار وتعجيب لكفرهم بانكار الخ
(الف) أوضح العبارة المذكورة
(ب)من المخاطبون لقوله كيف تكفرون؟

উত্তরঃ ইবারতের বিশ্লেষণ ঃ

বায়যাবী (র.) -এর উল্লেখিত ইবারত বুঝতে হলে কতিপয় বিষয় পূর্বে জেনে নেয়া আবশ্যক। আর তা হল,

১. كيف হরফটি সাধারণভাবে কোন বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়ার পূর্বে প্রবিষ্ট হলে উক্ত ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অর্থ প্রদনা করে।

২. استفهام দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হয়। যথা– (ক) جمله استفهاميه -এর বিষয়বস্তুর অস্বীকৃতি। (খ) বিস্ময় জ্ঞাপন। (গ) শ্রোতাকে বিস্ময়াভূত করা। -(হাশিয়াতুশ শিহাব)

৩. لازم -এর অস্বীকৃতি ملزوم -এর অস্বীকৃতিকে আবশ্যক করে। কেননা, لازم -এর অস্বীকৃতি ملزوم -এর অস্বীকৃতি -এর প্রমাণ।

এই কতিপয় বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করে ইবারতের বিশ্লেষণ বুঝার চেষ্টা করুন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, كيف تكفرون بالله -এর মধ্যে যে استفهام রয়েছে তাদ্বারা তাদের কুফরীর অস্বীকৃতি জানানো, কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য।

কুফরীকে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ হল, তোমাদের থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, বিবেক-বুদ্ধি কুফরীকে সমর্থন করে না।

আর কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করার অর্থ হল, সকল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাফিরদের অবস্থার জন্য বিস্ময় জ্ঞাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা। যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন, কাফির না হওয়ার উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফির হওয়া বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বড় বিস্ময়ের কান্ড। তোমরা জান যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদের মৃত্যু তথা অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবার মৃত্যু দিবেন, পুনরায় আবার জীবিত করবেন। আল্লাহর এ কারিগরী তাঁকে অস্বীকার না করার প্রতি আহবান করে। এতদসত্ত্বেও তোমাদের তাকে অস্বীকার করাটা প্রত্যেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিস্মিত করে।

﴿أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا بِاِهْمَالِ الْعَقْلِ عَنِ النَّظْرِ وَاقْتِنَاصِ مَا يُفِيْدُهُمُ الْحَيٰوةَ الْاَبَدِيَّةَ وَاسْتِبْدَالِ الْاِنْكَارِ وَالطُّعْنِ فِى الْاٰيَاتِ بِالْاِيْمَانِ بِهَا وَالنَّظْرِ فِىْ حَقَائِقِهَا وَالْاِقْتِبَاسِ بِاَنْوَارِهَا وَاشْتِرَاءِ النَّقْضِ بِالْوَفَاءِ وَالْفَسَادِ بِالصَّلَاحِ وَالْعِقَابِ بِالثَّوَابِ

অনুবাদ:

"এরা ক্ষতিগ্রস্ত"। অর্থাৎ তারা সেই সকল লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিকে-বুদ্ধিকে চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত রেখে অকেজ করার কারণে। এবং বিবেককে সেই সকল বস্তু অর্জন করা থেকে বিরত রেখে অকেজ করার কারণে (ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) যেগুলোর মাধ্যমে তারা চিরস্থায়ী জীবন (জান্নাত) লাভ করতে পারতো। নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনয়ন এবং সেগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পরিবর্তে সেগুলোকে অস্বীকার করে, অঙ্গীকার পূরণ করার পরিবর্তে তা ভঙ্গ করে, কল্যানের পরিবর্তে অকল্যানকে এবং পূণ্যের পরিবর্তে শাস্তিকে গ্রহণ করে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে)।

﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

"কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।"

(**كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ**) اِسْتِخْبَارٌ فِيْهِ اِنْكَارٌ وَتَعْجِيْبٌ لِكُفْرِهِمْ بِاِنْكَارِ الْحَالِ الَّتِىْ يَقَعُ الْكُفْرُ عَلَيْهَا عَلَى الطَّرِيْقِ الْبُرْهَانِيِّ لِاَنَّ صُدُوْرَهٗ لَايَنْفَكُّ عَنْ حَالٍ وَصِفَتِه فَاِذَا اُنْكِرَ اَنْ يَكُوْنَ لِكُفْرِهِمْ حَالٌ يُوْجَدُ عَلَيْهَا اِسْتَلْزَمَ ذَالِكَ اِنْكَارَ وُجُوْدِه فَهُوَ اَبْلَغُ وَاَقْوٰى فِىْ اِنْكَارِ الْكُفْرِ مِنْ اَتَكْفُرُوْنَ وَوَافَقَ لِمَا بَعْدَهٗ مِنَ الْحَالِ وَالْخِطَابِ مَعَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِمَا وَصَفَهُمْ بِالْكُفْرِ وَسُوْءِ الْمَقَالِ وَخُبْثِ الْفِعَالِ خَاطَبَهُمْ عَلٰى طَرِيْقَةِ الْاِلْتِفَاتِ وَوَبَّخَهُمْ عَلٰى كُفْرِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِحَالِهِمُ الْمُقْتَضِيَةِ خِلَافَ ذَالِكَ وَالْمَعْنٰى اَخْبِرُوْنِىْ عَلٰى اَىِّ حَالٍ تَكْفُرُوْنَ۔

অনুবাদ:

كيف تكفرون হল এমন استفهام যার মধ্যে استدلالى তরীকায় এমন حال كفر -কে অস্বীকার করার মাধ্যমে যাতে কুফর বিদ্যমান রয়েছে– তাদের কুফরীর অস্বীকৃতি জানানো এবং

كيف যদিও حال كفر -এর অস্বীকার বুঝায় কিন্তু استدلالى তরীকায় এর দ্বারা মূল কুফুরকে অস্বীকার বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুফুরের বিকাশ কোন حال মুক্ত নয়। যেহেতু কুফুর হল ملزوم আর حال হল لازم , সেহেতু كيف تكفرون -এর দ্বারা যখন তাদের এমন حال كفر -এর অস্বীকার করা হয়েছে যাতে কুফুর বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা وجود كفر -এর অস্বীকার আবশ্যক হয়েছে।

كيف تكفرون : ب -এর মুখাতব কারা? :

كيف تكفرون দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. كيف تكفرون দ্বারা কাফিরদেকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে কুফর, অশ্লীল কথা-বার্তা এবং নিকৃষ্ট কর্ম এই দোষে দূষী সাব্যস্ত করেছেন। অত্র আয়াতে التفات من الغيبة الى الخطاب -এর ভঙ্গিতে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। এবং তাদের কাছে কুফরী না করার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা কুফরী করার কারেণ আল্লাহ তাদেরকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

২. تكفرون দ্বারা কাফির এবং মুমিন প্রত্যেককে সম্বোধন করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক তাওহীদ ও নবুওয়তের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন, ঈমান গ্রহণের উপর জান্নাতের অঙ্গিকার এবং কুফরীর উপর জাহান্নামের ভীতিসঞ্চারক বাণী শোনিয়েছেন। এখন আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'লার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লার অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে ! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও আবশ্যক কর্তব্য।

☆☆☆

﴿وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا﴾ اَىْ اَجْسَامًا لَا حَيٰوةَ لَهَا عَنَاصِرَ وَاَغْذِيَةً وَاَخْلَاطًا وَنُطَفًا وَمُضَغًا مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ ﴿فَاَحْيَاكُمْ﴾ بِخَلْقِ الْاَرْوَاحِ وَنَفْخِهَا فِيْكُمْ وَاِنَّمَا عُطِفَ بِالْفَاءِ لِاَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَا عُطِفَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَرَاخٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْبَوَاقِىْ ﴿ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ﴾ عِنْدَ تَقَضِّىْ اٰجَالِكُمْ ﴿ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ﴾ بِالنُّشُوْرِ يَوْمَ نَفْخِ الصُّوْرِ اَوْ لِلسُّوَالِ فِى الْقُبُوْرِ ﴿ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ بَعْدَ الْحَشْرِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ اَوْ تُنْشَرُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ قُبُوْرِكُمْ لِلْحِسَابِ فَمَا اَعْجَبَ كُفْرَكُمْ مَعَ عِلْمِكُمْ بِحَالِكُمْ هٰذَا ـ

অনুবাদ:

আর তোমরা মৃত ছিলে অর্থাৎ প্রাণহীন দেহ ছিলে। যেমন পদার্থ চতুষ্টয়, খাদ্য, মিশ্রণপদার্থ চতুষ্ট, বীর্জ, মাংস পিন্ড পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ দেহ ছিলে। অতঃপর তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন

অর্থাৎ রুহ সৃষ্টি করে তোমাদের ভিতরে তা ফুঁকে দিয়েছেন। احياكم -কে فاء দ্বারা عطف করেছেন তার কারণ হল, যে অংশের উপর احياء -কে معطوف করা হয়েছে সেটার সাথেই মিলিত হয়ে এসেছে; পৃথক হয়ে আসে নি। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন যখন তোমাদের নির্ধারিত হায়াত শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন অর্থাৎ সিঙ্গায় ফুৎকারের দিন তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। অথবা কবরে প্রশ্ন করার জন্য জীবিত করবেন। তারপর তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ হাশরের পরে তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। অথবা তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে উঠানো হবে হিসাব-নিকাশের জন্য। সুতরাং তোমাদের এই অবস্থার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কুফরী কতইনা আশ্চর্যজনক।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) فسر قوله تعالى وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم اليه ترجعون۔ مع ايضاح الامانة والاحياء (ب) ما الحكمة فى عطف فأحياكم بالفاء والبواقى بـ ثم ؟

الف : উত্তর: আয়াতের তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা মানবজাতীকে তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন– হে মানবজাতী ! ইতিপূর্বে তুমি প্রাণহীন বস্তু ছিলে। নিস্প্রাণ বস্তু ছিলে। সর্বপ্রথম পদার্থ চতুষ্টয় তথা জল, বায়ূ, অগ্নি ও মৃত্তিকার আকৃতি ছিলে। অতঃপর এর থেকে নক-জননীর খাদ্যের রূপ ধারণ করেছিলে। অতঃপর তা থেকে পিতা-মিতার দেহে মিশ্রণ পদার্থ চতুষ্টয় তথা রক্ত, কফ, পিত্ত ও سوداء রূপান্তরিত হয়। আর এ থেকে সৃষ্টি হয় বীর্জ। বীর্জ মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট করে পর্যায়ক্রমে তা মাংসপিন্ড ও পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ দেহের রূপ লাভ করে। তাহলে বুঝা গেল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা এ সকল নিস্প্রাণ পদার্থ থেকে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। বিক্ষিপ্ত অনুকণা পদার্থকে একত্রিত করে তাতে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। আবার আল্লাহ তা'লা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার পুনরুজ্জীবিত করবেনও তিনিই। অর্থাৎ যিনি নিস্প্রাণ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অনুকণা ও পদার্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রান্ত করার পর তাতে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। তিনিই আবার তোমাদের আয়ূর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবন শিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিস্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের যাবতীয় কৃতকার্যের প্রতিদান প্রদান করবেন।

জীবন ও মৃত্যু দানের মর্ম ঃ প্রথম মৃত্যু হল মানুষের সৃষ্টি ধরার সূচনা পর্বের নিস্প্রাণ ও জড় অবস্থা। তা থেকে আল্লাহ তা'লার প্রাণ সঞ্চারণ করা হল প্রথম জীবিত করা। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মানুষের আয়ূ শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। আর কিয়ামত দিবসে জীবন লাভ হল তৃতীয় জীবিতকরণ। এর মাঝে কবরের জীবনে কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবন হল দ্বিতীয় জীবিতকরণ।

د : الحكمة فى عطف فاحياكم بالفاء والبواقى بـ ثم ঃ

احياكم -কে فاء অব্যয় দ্বারা এজন্য عطف করা হয়েছে যে, احياء যার উপর عطف করা হয়েছে তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ احياكم -এর عطف হয়েছে كنتم امواتا -এর উপর। যার অর্থ হল, তোমরা এমন মারহালাসমূহে অবস্থান করছিলে যেখানে তোমরা নিস্প্রাণ ছিলে। এই ধাপসমূহ অতিক্রম করার পর তোমরা পূর্ণাঙ্গ দেহরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছ। আর এই পূর্ণাঙ্গ দেহের ধাপ অতিবাহিত হওয়ার

وَالْحَيٰوةُ حَقِيْقَةٌ فِى الْقُوَّةِ الْحَسَّاسَةِ أَوْ مَا يَقْتَضِيْهَا وَبِهَا سُمِّىَ الْحَيَوَانُ حَيَوَانًا مُجَازًا فِى الْقُوَّةِ النَّامِيَةِ لِاَنَّهَا مِنْ طَلَائِعِهَا وَمُقَدَّمَاتِهَا وَفِيْمَا يَخْتَصُّ الْاِنْسَانُ مِنَ الْفَضَائِلِ كَالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْاِيْمَانِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ كَمَالُهَا۔

অনুবাদ:______________________________

حيوة শব্দের বিশ্লেষণ

حيــــوة শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুভূতি শক্তি অথবা অনুভূতি শক্তির উপযোগী বস্তু। আর এই অনুভূতি শক্তির কারণেই প্রাণীকে হয়াওয়ান বলা হয়। حيـــوة শব্দের রূপক অর্থ বর্দ্ধনশীল শক্তি। কেননা, এটা অনুভূতি শক্তির প্রথম ধাপ। (যেমন মানুষ প্রথমে প্রাণহীন বস্তু ছিল। অর্থাৎ আগুন, পানি, বায়ূ, মাটি। অতঃপর তা থেকে খাদ্যরূপে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর মিশ্রণ পদার্থ চতুষ্ট তারপর বীর্জ হয়। এই ধাপসমূহে তো মানুষ বর্দ্ধনশীল ছিল না। তারপর যখন মাংসপিন্ড হয় তখন তার মধ্যে বর্দ্ধনশীল শক্তি আসে। অতঃপর বর্দ্ধিত হতে হতে তার মধ্যে অনভূতি শক্তি আসে)। আর রূপক অর্থে মানুষের বৈশিষ্ট্য তথা জ্ঞান, বিবেক এবং ঈমানকেও জীবন বলা হয়। কেননা, এগুলো দ্বারা মানুষ পূর্ণতা লাভ করে।

☆☆☆

وَالْمَوْتُ بِاِزَائِهَا يُقَالُ عَلٰى مَا يُقَابِلُهَا فِىْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ﴾ وَقَالَ ﴿اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وَقَالَ ﴿اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ﴾ وَاِذَا وُصِفَ بِهَا الْبَارِىْ تَعَالٰى اُرِيْدَ بِهَا صِحَّةَ اِتِّصَافِهٖ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ اللَّازِمَةِ لِهٰذِهِ الْقُوَّةِ فِيْنَا اَوْ مَعْنٰى قَائِمٍ بِذَاتِهٖ يَقْتَضِىْ ذَالِكَ عَلَى الْاِسْتِعَارَةِ وَقَرَأَ يَعْقُوْبُ تَرْجِعُوْنَ بِفَتْحِ التَّاءِ فِىْ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ۔

অনুবাদ:______________________________

موت শব্দের বিশ্লেষণ

موت শব্দটি حيوة -এর বিপরীতে আসে। সর্বদা তার ব্যবহার حيوة -এর বিপরীত বস্তুর উপর হয়ে থাকে। (حيـــوة -এর অর্থ হল অনুভূতি শক্তি কাজেই তার বিপরীতে مــوت -এর অর্থ হবে অনুভূতি শক্তিহীন)। আল্লাহ তা'লা বলেন, قـل الله يحييكم ثم يميتكم (এখানে موت টি يميتكم থেকে নির্গত যার প্রকৃত অর্থ অনুভূতি শক্তি না থাকা। يـميتكـم অর্থ হবে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন)। (حيـوة -এর এক রূপক অর্থ ছিল উর্বরতা। এর বিপরীতটি হবে অনূর্বরতা। موت শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়)। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী اعـلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها (এখানে حيوة শব্দটি উর্বরতা এবং موت শব্দটি অনূর্বরতা অর্থে ব্যবহৃত)। (حيوة -এর অরেকটি রূপক অর্থ

পরই احياء -এর ধাপ। এজন্য فاء দ্বারা عطف হয়েছে। কেননা, فاء অব্যয়টি تعقيب بلاتراخى অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অপরাপর অর্থাৎ ثم يميتكم ثم يحييكم এগুলোর মাঝে ثم অব্যয় ব্যবহার হয়েছে। কেননা, বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলোর পরস্পরের মাঝে দীর্ঘ কালের ব্যবধান রয়েছে। আর ثم অব্যয় تعقيب مع التراخى বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

☆☆☆

فَاِنْ قِيْلَ اِنْ عَلِمُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا اَمْوَاتًا فَاَحْيَاهُمْ ثُمَّ يُمِيْتُهُمْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَيُحْيِيْهِمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ قُلْتُ تَمَكُّنُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِهِمَا لِمَا نُصِبَ لَهُمْ مِنَ الدَّلَائِلِ مَنْزِلٌ مَنْوَلَةٌ عِلْمَهُمْ فِىْ اِزَاحَةِ الْعُذْرِ سِيَّمَا وَفِى الْاٰيَةِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى مَا يَدُلُّ صِحَّتُهُمَا وَهُوَ اِنَّهٗ تَعَالٰى لَمَّا قَدِرَ اَنْ اَحْيَاهُمْ اَوَّلًا قَدِرَ اَنْ يُحْيِيَهُمْ ثَانِيًا فَاِنَّ بَدْأَ الْخَلْقِ لَيْسَ بِاَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ اِعَادَتِهٖ۔

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফিরদের তো কোন জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল না। তাদের শুধু এ বিশ্বাসটুকু ছিল যে, তারা নিষ্প্রাণ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তাদেরকে মৃত্যু দিবেন। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস ছিল না যে, তারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অথচ আয়াতে এইসব বিষয়কে তাদের পরিজ্ঞাত বিষয়াদির লিষ্টে এনে বলা হয়েছে, وكنتم امواتا ثم احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون তাহলে এ প্রশ্নের জবাবে আমি (গ্রন্থকার) বলব, শেষের দুই অবস্থার জ্ঞান যদিও তাদের ছিল না। কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য এসব বিষয়ের উপর অনেক নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। তাই এখন তারা এ আপত্তি পেশ করতে পারবে না যে, আমাদের তো এইসব বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। বিশেষতঃ এই আয়াতে তো উক্ত দু'টি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা যখন প্রথমেই তাদেরকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। তখন অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কেননা, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার তুলনায় প্রথমবার সৃষ্টি করা কঠিন ব্যাপার।

☆☆☆

ছিল, সেইসকল গুণ যা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং এর বিপরীত مـــوت -এর অর্থ হবে এসকল গুণ না থাকা)। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী او مـن كـان ميتـا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الـنـاس (এখানে مـوت দ্বারা ইলম ও ঈমান না থাকা এবং احيـاء দ্বারা ইলম ও ঈমান দান করা উদ্দেশ্য)। حيـــوة শব্দকে যখন আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয় তখন তার মর্ম হয়, আল্লাহ তা'লা ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়া যা আমাদের মধ্যে এই শক্তির জন্য অপরিহার্য। অথবা এমন একটি গুণ যা আল্লাহ তা'লার যাতের সাথে প্রতিষ্ঠিত যার দ্বারা ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়া বিশুদ্ধ হয়। এই অর্থ হিসেবে আল্লাহর জন্য حيوة শব্দের ব্যবহার استعاره স্বরূপ হয়ে থাকে। (ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়াকে অনুভূতি শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। مشبـــه بـه দ্বারা مشبه উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে)। কারী ইয়াকুব (র.) কুআনের সকল আয়াতে ترجعونَ (تاء -এর যবর দিয়ে) পড়েন।

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا﴾

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের উপকারে পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন"

بَيَـانُ نِـعْمَةٍ اُخْرٰى مُرَتَّبَةً عَلَى الْاُوْلٰى فَاِنَّهَا خَلَقَهُمْ اِحْيَاءً قَادِرِيْنَ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى وَهٰـذِهٖ خَـلْـقُ مَـا يُتَـوَقَّفُ عَـلَيْـهِ بَـقَـاءُ هُـمْ وَيَتِـمُّ بِـه مَعَاشُهُمْ وَمَعْنٰى لَكُمْ لِاَجْلِكُمْ وَاِنْتِـفَـاعِـكُـمْ فِيْ دُنْيَاكُمْ بِاِسْتِنْفَاعِكُمْ بِهَا فِيْ مَصَالِحِ اَبْدَانِكُمْ بِوَسَطٍ اَوْ غَيْرِ وَسَطٍ وَدِيْـنِـكُـمْ بِالْاِسْتِدْلَالِ وَالْاِعْتِبَارِ وَالتَّعْرِيْفِ لِمَا يُلَائِمُهَا مِنْ لَذَّاتِ الْاٰخِرَةِ وَاٰلَامِهَا لَا عَـلٰـى وَجْهِ الْغَرَضِ فَاِنَّ الْفَاعِلَ لِغَرَضٍ مُسْتَكْمِلٍ بِه بَلْ عَلٰى اَنَّهٗ كَالْغَرَضِ مِنْ حَيْثُ اَنَّـهٗ عَاقِبَةُ الْفِعْلِ مُؤَدَّاهُ وَهُوَ يَقْتَضِيْ اِبَاحَةَ الْاَشْيَاءَ النَّافِعَةَ وَلَا يَمْنَعُ اِخْتِصَاصَ بَعْضِهَا بِبَعْـضِ الْاَسْبَـابِ عَارِضَةً فَاِنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْكُلَّ لِلْكُلِّ لَا اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَمَـا يَعُمُّ كُلَّ مَا فِي الْاَرْضِ لَا لَارْضَ اِلَّا اِذَا اُرِيْدَ بِهَا جِهَةَ السُّفْلِ كَمَا يُرَادُ بِالسَّمَاءِ جِهَةَ الْعُلُوِّ وَ'جَمِيْعًا' حَالٌ عَنِ الْمَوْصُوْلِ الثَّانِيْ۔

অনুবাদ:

জগতের কোন বস্তুই অহেতুক নয় ঃ

এই আয়াতে দ্বিতীয় আরেকটি নিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এই নিয়ামতটি প্রথম নিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম নিয়ামত ছিল, মানুষকে জীবিত এবং শক্তিমান অবস্থায় পুনঃবার সৃষ্টি করা। (এর বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার বাণী وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم এই আয়াতে)। আর দ্বিতীয় নিয়ামত হল, মানুষের টিকে থাকা যেসকল বস্তুর উপর নির্ভরশীল এবং যাদ্বারা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে সেগুলোকে সৃষ্টি করা।

لـكـم -এর লাম লাম অব্যয়টি تـعـليـل এবং انـتـفـاع -এর অর্থ বুঝানোর জন্য। অর্থ হল, তোমাদের

কারণে এবং তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা পৃথিবীতে নিজের শরীরিক উপকারার্থে সরাসরি অথবা মাধ্যম ধরে এসকল বস্তুসামগ্রী দ্বারা উপকৃত হবে এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে এই সকল নিয়াতরাজি দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ পেশ করবে। এবং এগুলো দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং এসকল বস্তুসামগ্রী দেখে এগুলোর সমজাতীয় পরকালের নিয়ামতরাজি এবং কষ্টের কথা স্মরণ করবে। لـكـم -এর অর্থ لاجـلـكـم উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়। কেননা, কর্তা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সেই উদ্দেশ্য দ্বারা পূর্ণতায় পৌঁছে। (আর আল্লাহ তা'লা তো পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। কাজেই لـكـم -এর লাম অব্যয়টি উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য আসে নি)। বরং এটা উদ্দেশ্যের পর্যায়ে বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ এসকল বস্তুসামাগ্রী দ্বারা উপকার লাভ হবে এগুলোকে সৃষ্টি করার পর। আর আয়াতটি উপকারী বস্তুসামগ্রীর ابـاحـت হওয়া বুঝায়। ভিন্ন কোন সূত্রে কোন কোন বস্তুসামগ্রী কারো জন্য একক মালিকানা হওয়াটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, আয়াতের মর্ম হল, জগতের যাবতীয় বস্তুসমষ্টি সমষ্টিগতভাবে তোমাদের সকলের জন্যে। আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য।

ما فی الارض -এর ما শব্দটি ব্যাপকভাবে জমীনের উপরের সকল বস্তুসমষ্টিকে বুঝাচ্ছে। তবে এতে জমীন অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, ارض দ্বারা যদি জমীনের নীচভাগ উদ্দেশ্য করা হয়। যেভাবে سـمـاء দ্বারা উপরের অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তখন জমীনও ما -এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হবে। جـمـيـعـا টি দ্বিতীয় مـوصـول অর্থাৎ ما থেকে حال

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) اللام فی قوله تعالی "لـكـم" للانتفاع فكيف يكون بعض الاشياء مضرا لنا وقوله "جميعا" ينبئ أنا مشتركون فی جميع ما فی الارض فكيف يختص بعض الاشياء ببعضنا؟

(ب) ما المراد بقوله "ما فی الارض"؟ (ج) قوله "جميعا" فی أی محل من الاعراب؟

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

الف : উত্তর ঃ هـو الـذی خلق لكم -এর লাম অব্যয়টি تـعـليـل অথবা انـتـفـاع -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি انـتـفـاع -এর অর্থে ধরা হয় তাহলে আয়াতটির অর্থ হবে, তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকরার্থে পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অনেক বস্তু এমনও রয়েছে যা মানুষের জন্য উপকারী নয়। তাহলে আয়াতে পৃথিবীর সকল বস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দাবীটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

কাযী বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন– وانـتـفـاعـكـم فی دنياكم باستنفاعكم بها فی مصالح أبـدانـكـم بـوسـط أو غـيـر وسـط الخ অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না– তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু

প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

সারকথা, পৃথিবীর এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না।

اباحيه সম্প্রদায়ের যুক্তি খন্ডন ঃ

اباحيه নামক এক ভ্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে। যাদের মতে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হালাল ও বৈধ। কোন বস্তুর উপরই কারো একক মালিকানা নেই। তাদের যুক্তি হল, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী হালাল। এর দ্বারা বুঝা গেল, কোন বস্তুতেই কারো একক অধিকার নেই। বরং প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে সমান তালে।

মুসান্নিফ (র.) لا يمنع الخ দ্বারা তাদের এই যুক্তির খন্ডন করেছেন। যার সারকথা হল, উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের এই দাবী তখনই প্রমাণিত হত, যখন আয়াতটির মর্ম এরকম হত যে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু তোমাদের প্রত্যেকের উপকার সাধনের জন্যে। অথচ আয়াতের মর্ম এটা নয়। বরং আয়াতের দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমষ্টি সমষ্টিগতভাবে তোমাদের সকলের জন্যে। এখন কোন বস্তুতে যদি ক্রয়-বিক্রয়, দান, বিবাহ ইত্যাদি সূত্রে কারো জন্য সুনির্দিষ্ট মালিকানা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা আয়াতের মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। কেননা, কোন কোন নির্দিষ্ট বস্তু যদি কারো কারো মালিকানায় থাকে, তাহলে পরিভাষায় সামষ্টিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, ان هذه الاشياء لهم অর্থাৎ এ সকল বস্তু তাদের জন্য।

ب : المراد بـ ما فى الارض ঃ আয়াতে ما فى الارض দ্বারা জমীনের উপরীভাগের সকল বস্তুসামগ্রী উদ্দেশ্য। তবে এতে জমীন অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, ارض দ্বারা যদি জমীনের নীচভাগ উদ্দেশ্য করা হয়। যেভাবে سماء দ্বারা উপরের অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তখন জমীনও ما -এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ج : جميعا -এর তারকীব ঃ جميعا টি দ্বিতীয় موصول অর্থাৎ ما থেকে حال হয়েছে।

☆☆☆

﴿ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ﴾

قَصَدَ اِلَيْهَا بِاِرَادَتِه مِنْ قَوْلِهِمْ اِسْتَوٰى اِلَيْهِ كَالسَّهْمِ الْمُرْسَلِ اِذَا قَصَدَهُ قَصْدًا مُسْتَوِيًا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَلْوِىَ عَلٰى شَيْءٍ وَاَصْلُ الْاِسْتِوَاءِ طَلَبُ السَّوَاءِ وَاِطْلَاقُهُ عَلَى الْاِعْتِدَالِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَسْوِيَةِ وَضْعِ الْاَجْزَاءِ وَلَايُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ الْاَجْسَامِ وَقِيْلَ اِسْتَوٰى اِسْتَوْلٰى وَمَلَكَ قَالَ

قَدِ اسْتَوٰى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ☆ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقٍ

وَالْاَوَّلُ أَوْفَقُ لِلْاَصْلِ وَالصِّلَةُ الْمُعَدّٰى بِهَا وَالتَّسْوِيَةُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ وَالْمُرَادُ اَلسَّمَاءُ هٰذِهِ الْاَجْرَامُ الْعُلْوِيَّةِ أَوْ جِهَاتُ الْعُلُوِّ۔

استواء -এর মর্ম

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লা ঐচ্ছিকভাবে আসমানের দিকে মনোযোগী হলেন। এ তাফসীরটি আরবের উক্তি استوى اليه كالسهم المرسل সে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় মনোযোগী হল" থেকে চয়ন করা হয়েছে। সকল কিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেউ যখন কোন কিছুর দিকে নিবিষ্ট হয় তখন আরবভাষীরা এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকে। استواء শব্দের মূল অর্থ সমকক্ষ চাওয়া। অতঃপর এটা اعتدال অর্থে ব্যবহৃত হয়। اعتدال অর্থ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, সোজা হওয়া। এর যোগসূত্র হল, اعتدال -এর মধ্যে اجزاء (جسم) -এর প্রণয়নে সোজা ও সঠিক করা হয়। এখানে استواء -কে সোজা হওয়া অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কেননা, সোজা হওয়া جسم -এর বৈশিষ্ট্য। আর কেউ কেউ বলেন, এখানে استوى টি استولى ও ملك অর্থে ব্যবহৃত। যার অর্থ কোন কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করা। যেমন কবি বলেন, قد استوى بشر على العراق الخ

তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক উপযোগী। কেননা, এটা মূল অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল, যে صله দ্বারা متعدى হয়েছে তার সাথেও সামঞ্জস্য রাখে, استواء -এর উপর فاء تعقيبيه দ্বারা যে تسويه -কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেটার সাথেও প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক সামঞ্জস্য রাখে। অত্র আয়াতে سماء দ্বারা ঊর্ধ্বলোক অথবা উচ্চতা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال:ما معنى الاستواء وما المراد ههنا؟

উত্তর: معنى الاستواء (استواء শব্দের অর্থ) ঃ استواء শব্দের মূল অর্থ طلب السواء অর্থাৎ সমকক্ষ তালাশ করা অর্থাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। যদি কোন ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে مستوى সোজা বলা হয়। তাই استواء -এর অর্থ সোজা হওয়া। এখন প্রশ্ন হল, সোজা হওয়া তো দেহের বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহ তা'লা দেহ থেকে পূত-পবিত্র। সুতরাং অত্র আয়াতে استواء -কে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা কিভাবে বিশুদ্ধ হল?

এজন্য আল্লামা বায়যাবী (র.) এর তাফসীর করেছেন– قصد اليه بارادته অর্থাৎ এখানে استواء শব্দের অর্থ হল, ঐচ্ছিকভাবে কারো দিকে মনোযোগী হওয়া। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তিনি ঐচ্ছিকভাবে আকাশের দিকে মনোযোগী হলেন। যেমন আরবভাষীরা বলে থাকে– استوى اليه كالسهم المرسل সে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় মনোযোগী হল"। সকল কিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেউ যখন কোন কিছুর দিকে নিবিষ্ট হয় তখন আরবভাষীরা এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকে।

কারো কারো মতে, অত্র আয়াতে استوى - استولى বা ملك অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ কোন কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করা। استوى শব্দটি استولى অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আল্লামা বায়যাবী (র.) জনৈক্য কবির কবিতাকে উপস্থাপন করেছেন। কবির পংক্তি–

قد استوى بشر على العراق ☆ من غير سيف ودم مهراق

"একজন মানব (বিশর ইবনে মারওয়ান) তরবারী ও রক্ত প্রবাহ ছাড়াই ইরাকের উপর আধিপত্য

বিস্তার করেছে।"

অত্র আয়াতে استواء দ্বারা কোন্ অর্থটি উদ্দেশ্য ? আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে استواء টি প্রথম অর্থ অর্থাৎ قصد অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অধিক উপযোগী। ইমাম বায়যাবী (র.) এর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. قصد এ অর্থটি استواء -এর মূল অর্থের সাথে বেশী সাদৃশ্য রাখে।

২. এখানে استوى -এর যে صله ব্যবহার করা হয়েছে এটা প্রথম অর্থ তথা قصد -এর সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আর দ্বিতীয় অর্থ তথা استولى আধিপত্য বিস্তার করা -এর বিপরীত। কেননা, استولى -এর صله -এর মধ্যে على আসে। আর এখানে আয়াতের মধ্যে الى এসেছে যা قصد অর্থের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে।

৩. এখানে استوى -এর উপর فاء تعقيبيه দ্বারা تسويه তথা فسواهن -কে عطف করা হয়েছে। আর استواء -এর প্রথম অর্থ তথা قصد টিই تسويه -এর সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। কেননা, تسويه سماء -এর سبب হল قصد بارى تعالى আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা করা।

وَ "ثُمَّ" لَعَلَّهُ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْخَلْقَيْنِ وَفَضْلِ خَلْقِ السَّمَاءِ عَلٰى خَلْقِ الْاَرْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا . لَا لِلتَّرَاخِيْ فِي الْوَقْتِ فَاِنَّهُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالٰى: وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحٰهَا. فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى تَأَخُّرِ دُحُوِّ الْاَرْضِ الْمُتَقَدِّمِ عَلٰى خَلْقِ مَا فِيْهَا عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَتَسْوِيَتِهَا اِلَّا اِنْ تُسْتَأْنَفَ بِدَحَاهَا مِقْدَارًا لِنُصُبِ الْاَرْضِ فِعْلًا اٰخَرَ دَلَّ عَلَيْهِ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا. مِثْلُ يَخْلُقُ الْاَرْضَ وَيُدَبِّرُ اَمْرَهَا بَعْدَ ذَالِكَ لٰكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ۔

একটি প্রশ্নের সমাধান

অনুবাদ:

ثم অব্যয়টি সম্ভবতঃ উভয় সৃষ্টির মাঝে তারতম্য ও জমীন সৃষ্টির উপর আসমান সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী ثم كان من الذين أمنوا -এর মধ্যে ثم অব্যয়টি تفاوت رتبى অর্থাৎ তারতম্যতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। تراخى فى الوقت -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, তা আল্লাহ তা'লার বাণী والارض بعد ذالك دحها -এর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। কেননা, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসমান সৃষ্টির পরে জমীনকে বিছানো হয়েছে। অবশ্য যদি دحها -কে বাক্যের সূচনা সাব্যস্ত করা হয় এবং الارض -এর نصب -এর জন্য انتم اشد خلقا ام السماء بنها ورفع سمكها -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি فعل উহ্য গণ্য করা হয়। যেমন يخلق الارض ويدبر امرها بعد ذالك তাহলে উক্ত আয়াত দ্বারা আসমান সৃষ্টির পর জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তবতার পরিপন্থী।

السوال: قوله تعالى: ثم استوى الى السماء
هذه الاية تنبئ ان خلق الارض مقدم وقوله تعالى والارض بعد ذالك دحها يدل على أنه مؤخر فكيف التوفيق؟

উত্তর: আসমান ও জমিনের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে?

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জমীন ও তন্মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা النازعات-এর আয়াত والارض بعد ذالك دحها দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরে জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে ثم অব্যয়টি تراخى فى الوقف -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং تراخى فى الرتبة -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ثم অব্যয়টি এখানে জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি এবং আসমানের সৃষ্টি -এর মাঝে তারতম্য বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়েছে। সারকথা হল, ثم অব্যয়টি ব্যবহার করে আসমান সৃষ্টিকে জগতের সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ثم كان من الذين امنوا আয়াতের মধ্যে ثم অব্যয়টি تراخى فى الرفعة বা মর্যাদাগত ব্যবধান বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব ثم যেহেতু تراخى فى الوقف তথা সময়ের ব্যবধান বা আগে পিছে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়নি। তাই এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য যদি دحها -কে বাক্যের সূচনা সাব্যস্ত করা হয় এবং الارض -এর نصب -এর জন্য انتم اشد خلقا ام السماء بنها ورفع سمكها يخلق الارض ويدبر امرها بعد ذالك -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি فعل উহ্য গণ্য করা হয়। যেমন তাহলে উক্ত আয়াত দ্বারা আসমান সৃষ্টির পর জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তবতার পরিপন্থী।

☆☆☆

﴿فَسَوّٰهُنَّ﴾ عَدَّلَهُنَّ وَخَلَقَهُنَّ مَصُوْنَةً مِنَ الْعَوْجِ وَالْفُطُوْرِ وَ 'هُنَّ' ضَمِيْرُ 'السَّمَاءِ' اِنْ فُسِّرَتْ بِالْاَجْرَامِ لِاَنَّهٗ جَمْعٌ اَوْ فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ وَاِلَّا فَمُبْهَمٌ يُفَسِّرُهٗ مَا بَعْدَهٗ كَقَوْلِهِمْ رُبَّهٗ رَجُلًا۔

অনুবাদ:

আসমানকে ছিদ্রহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। যদি سماء -এর ব্যাখ্যা আসমান হয় তাহলে هن -এর مرجع হবে سماء । কেননা, سماء শব্দটি হয়ত جمع অথবা جمع -এর অর্থে। অন্যথায় هن ضمير مبهم টি ضمير مبهم হবে। যেরকম আরবভাষীদের উক্তি_ ربه رجلا -এর মধ্যে 'ه' ضمير টি ضمير مبهم ।

☆☆☆

﴿سَبْعَ سَمٰوَاتٍ﴾ بَدَلٌ أَوْ تَفْسِيْرٌ فَإِنْ قِيْلَ أَلَيْسَ أَنَّ أَصْحَابَ الْإِرْصَادِ أَثْبَتُوْا تِسْعَةَ أَفْلَاكٍ قُلْتُ فِيْمَا ذَكَرُوْهُ شُكُوْكٌ وَإِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نَفْيُ الزَّائِدِ مَعَ أَنَّهُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهَا الْعَرْشُ وَ الْكُرْسِيُّ لَمْ يَبْقَ إِخْتِلَافٌ۔

অনুবাদ:

سبع سموات টি سماء থেকে بدل (যদি هن -এর- مرجع - سماء -কে সাব্যস্ত করা হয়) অথবা তার তাফসীর (যদি هن -কে ضمير مبهم সাব্যস্ত করা হয়)। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জ্যোতিষিবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, আসমানের সংখ্যা নয়টি। তবে আমি (গ্রন্থকার) বলব যে, জ্যোতিষিবিদদের বক্তব্য সন্দেহ নির্ভর ও সংশয়যুক্ত। আর যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে তো সাতটির অধিক নয় এ কথা কুরআনের মধ্যে বলা হয় নি। তাছাড়া যদি এই সাত আসমানের সাথে আরশ-কুরসীকে যুক্ত করা হয় তাহলে তো আর কোন বিরোধ থাকে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: أثبت اصحاب الارصاد تسعة أفلاك وفي الاية سبعة فما الجواب؟

উত্তর: আসমান কয়টি? জ্যোতিষিবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, আসমানের সংখ্যা নয়টি অথচ কুরআনে সাত আসমান বলা হয়েছে। তাহলে কুরআন ও জ্যোতিষিবিদগণের বক্তব্য পরস্পর বিরোধ হয়ে গেল? এর উত্তরে বায়যাবী (র.) বলেন, জ্যোতিষিবিদদের বক্তব্য সন্দেহ নির্ভর ও সংশয়যুক্ত। পক্ষান্তরে কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য। অতএব জ্যোতিষিবিদদের বক্তব্যকে কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড় করানো যায় না। আর বাস্তবেও যদি আসমানের সংখ্যা নয়টি হয় তাহলেও কুরআনের তথ্য ভুল হবে না। কেননা, সাতটির বেশী আসমান নেই একথা কুরআনের কোথাও বলা হয় নি। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত আসমানের সাথে যদি আরশ ও কুরসী যোগ করা হয়, তাহলে আসমানের সংখ্যা নয়টি হয়ে যায়। অতএব কোন বিরোধ নেই।

☆☆☆

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

فِيْهِ تَعْلِيْلٌ كَأَنَّهُ قَالَ وَلِكَوْنِه عَالِمًا بِكُنْهِ الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا خَلَقَ عَلٰى هٰذَا النَّمَطِ الْاَكْمَلِ وَالْوَجْهِ الْاَنْفَعِ وَاسْتِدْلَالٌ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ عَلٰى هٰذَا النَّسَقِ الْعَجِيْبِ وَالتَّرْتِيْبِ الْاَنِيْقِ كَانَ عَلِيْمًا فَإِنَّ إِتْقَانَ الْاَفْعَالِ وَاَحْكَامَهَا وَتَخْصِيْصَهَا بِالْوَجْهِ الْاَحْسَنِ الْاَنْفَعِ لَايُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ حَكِيْمٍ رَحِيْمٍ وَإِزَاحَةٌ لِمَا يَخْتَلِجُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ

مِنْ أَنَّ الْأَبْدَانَ بَعْدَ مَا تَفَتَّتَتْ وَتَبَدَّدَتْ أَجْزَاءُ هَا وَاتَّصَلَتْ بِمَا يُشَاكِلُهَا كَيْفَ يَجْمَعُ أَجْزَاءَ كُلِّ بَدَنٍ مَرَّةً ثَانِيَةً بِحَيْثُ لَايُشَذُّ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَايَنْضَمُّ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَيُعَادُ مِنْهَا كَمَا كَانَ وَنَظِيْرُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ۔

অনুবাদ:

وهو بكل شئ عليم বাক্যের উপকারিতা

এ বাক্যের মধ্যে তিনটি উপকারিতা পাওয়া যায়। (ক) আসমান ও জমীন এবং জমীনের মধ্যে যাবতীয় বস্তুকে উত্তম তরীকায় ও সবচেয়ে বেশী উপকারী করে সৃষ্টি করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সূক্ষাতিসূক্ষ জ্ঞান রাখার কারণে আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে উত্তম তরীকায় ও সবচেয়ে বেশী উকারী করে সৃষ্টি করেছেন। (খ) এ বাক্যের মধ্যে এবিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, যিনি আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে এই বিস্ময়কর ও অসাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই মহাজ্ঞানী হবেন। কেননা, এই উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা এবং সবচেয়ে বেশী উপকারী বানিয়ে সৃজন করা একজন বিজ্ঞ ও দয়ালূ জ্ঞানী ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে কল্পনা করা যায় না। বস্তসামগ্রীকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করা তিনি যে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তার প্রমাণ করে। এবং এগুলোর মধ্যে উপকারিতা নিহিত রাখা তিনি যে দয়ালু তার প্রমাণ করে। (খ) তাছাড়া এ বাক্যে কাফিরদের অন্তরের সন্দেহকেও বিদূরীত করা হয়েছে। তাদের সন্দেহ ছিল, দেহসমূহ বিভক্ত ও দেহের অংশসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সমজাতীয় عناصر পদার্থসমূহ (যেমন পানির অংশ পানির সঙ্গে, মাটির অংশ মাটির সঙ্গে, বায়ূর অংশ বায়ূর সঙ্গে এবং আগুনের অংশ আগুনের) সঙ্গে মিশে যাবার পর আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক দেহের অংশসমূহকে দ্বিতীয়বার কিভাবে একত্রিত করে পূর্বের মত সৃষ্টি করবেন? অর্থাৎ এই অংশসমূহের মধ্য থেকে কোন অংশই যেন পৃথক না থাকে এবং দেহের বহির্ভূত বস্তু যেন দেহের সঙ্গে না মিশে। (সন্দেহ নিরসন এভাবে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত কাজেই দেহের অংশসমূহের ব্যাপারেও তিনি জ্ঞাত এবং কোন কোন অংশ দেহের বহির্ভূত তাও জানেন এবং এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করতে হয় সে ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞান রয়েছে)। এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'লার বাণী وهو بكل خلق عليم (এ আয়াত দ্বারাও সন্দেহের নিরসন করা উদ্দেশ্য)।

☆☆☆

﴿وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾

মুসান্নিফ (র.) আয়াতের এ অংশের অধীনে ছয়টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: আয়াতের যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: اذ শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: ملائكة শব্দের বিশ্লেষণ। ৪র্থ আলোচনা: جاعل শব্দের বিশ্লেষণ। ৫ম আলোচনা: خليفة শব্দের বিশ্লেষণ ও তার মেসদাক। ৬ষ্ঠ আলোচনা: ফিরিশতাগণের সামনে আদম সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করার উপকারিতা।

تَعْدَادٌ لِنِعْمَةٍ ثَالِثَةٍ تَعُمُّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَاِنَّ خَلْقَ اٰدَمَ وَاِكْرَامَهٗ وَتَفْضِيْلَهٗ عَلٰى سُكَّانِ مَلَكُوْتِهٖ بِاَنْ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُوْدِ لَهٗ اِنْعَامٌ يَعُمُّ ذُرِّيَّتَهٗ۔

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: আয়াতের যোগসূত্র

এটা তৃতীয় একটি নিয়ামতের গণনা যে নিয়ামতটি সমস্ত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেননা, আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করে তাকে সম্মানী বানানো এবং তাকে আল্লাহর রাজত্বের বাসিন্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, তাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া এমন একটি নিয়ামত যাতে সমস্ত আদম সন্তান অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة

السوال: اكتب ربط الاية بما قبلها

উত্তর: ربط الاية بما قبلها (পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) :

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা দু'টি নিয়ামতের আলোচনা করেছিলেন। প্রথম নিয়ামত ছিল আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে জীবন দান করেছেন। فأحياكم দ্বারা এ নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্বিতীয় নিয়ামত ছিল আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা। এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا এ আয়াত দ্বারা। আর অত্র আয়াতে তৃতীয় আরেকটি নিয়ামতের আলোচনা করেছেন। সেই নিয়ামতটি হল, আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করে তাকে সম্মানী বানানো এবং তাকে আল্লাহর রাজত্বের বাসিন্দা অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, তাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া এমন একটি নিয়ামত যাতে সমস্ত আদম সন্তান অন্তর্ভুক্ত।

☆☆☆

وَ 'اِذْ' ظَرْفٌ وُضِعَ لِزَمَانِ نِسْبَةٍ مَاضِيَةٍ وَقَعَ فِيْهِ اُخْرٰى كَمَا وُضِعَ 'اِذَا' لِزَمَانِ نِسْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ يَقَعُ فِيْهِ اُخْرٰى وَلِذٰلِكَ يَجِبُ اِضَافَتُهُمَا اِلَى الْجُمَلِ كَحَيْثُ فِيْ

اَلْمَكَانِ بُنِيَتْ تَشْبِيْهًا لَهُمَا بِالْمَوْصُوْلَاتِ وَاسْتُعْمِلَتَا لِلتَّعْلِيْلِ وَالْمُجَازَاةِ وَمَحَلُّهُمَا اَلنَّصْبُ أَبَدًا بِالظَّرْفِيَةِ فَإِنَّهُمَا مِنَ الظُّرُوْفِ الْغَيْرِ الْمُنْصَرِفَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَمَّا قَوْلُهُ: وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ إِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ. وَنَحْوُهُ فَعَلٰى تَأْوِيْلِ اُذْكُرِ الْحَادِثَ إِذْ كَانَ كَذَا فَحُذِفَ الْحَادِثُ وَأُقِيْمَ الظَّرْفُ مَقَامَهُ وَعَامِلُهُ فِي الْآيَةِ 'قَالُوْا' أَوْ 'اُذْكُرْ' عَلَى التَّأْوِيْلِ الْمَذْكُوْرِ لِأَنَّهُ جَاءَ مَعْمُوْلًا صَرِيْحًا فِي الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا أَوْ مُضْمَرٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَضْمُوْنُ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِثْلُ "وَبَدَأَ خَلْقَكُمْ إِذْ قَالَ" وَعَلٰى هٰذَا فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوْفَةٌ عَلٰى "خَلَقَ لَكُمْ" دَاخِلَةٌ فِيْ حُكْمِ الصِّلَةِ وَعَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ مَزِيْدٌ۔

২য় আলোচনা: اذ শব্দের বিশ্লেষণ

অনুবাদ:

اذ এমন ظـرف যাকে অতীতকালসূচক সম্বন্ধের সেই কাল বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে যে কালের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি অতীতকালসূচক সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। যেভাবে اذا গঠিত হয়েছে ভবিষ্যৎকালসূচক সম্বন্ধের সেই কাল বুঝানোর জন্য যে কালে আরেকটি ভবিষ্যৎকালসূচক সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। আর এজন্যেই اذ ও اذا উভয়টি جـمله -এর দিকে মুযাফ হয়ে থাকে। যেভাবে حيث টি স্থানের সম্বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। اذ ও اذا এ দু'টিকে اسـم مـوصـول -এর সাথে সাদৃস্য করে مبنى সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ দু'টিকে علت ও ترتب جزاء -এর জন্যেও ব্যবহার করা হয়। اذ ও اذا এ দু'টি সর্বদা ظرف হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হয়। কেননা, এ দু'টি ظـروف غيـر متصرفه -এর মধ্য থেকে যা আমরা বর্ণনা করেছি। (আর ظـروف غيـر متصرفه সর্বদা ظرفية -এর ভিত্তিতে منصوب হয়। ظـروف غيـر متـصرفه বলা হয় যা সর্বদাই ظـرفيت -এর ভিত্তিতে منصوب হয়)। (এখন প্রশ্ন হল, আপনি তো বলেছেন যে, اذ সর্বদা ظـرفيـت -এর ভিত্তিতে مـنـصـوب হয়। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, এটা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে مفعول به -এর ভিত্তিতে منصوب হয়েছে) যেমন আল্লাহ্ তা'লার বাণী واذكـر اخا عاد اذ انذر قومه এ আয়াতে اخا عاد : اذكر -এর مفعول به এবং তার থেকে اذ انذر قومه অংশটি بدل হয়েছে। কাজেই اذও مفعول به -এর পর্যায়ে। সুতরাং আপনি যে বললেন اذ টি সর্বদা ظـرفيت -এর ভিত্তিতে مـنصوب হয় একথাটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন) আর আল্লাহর বাণী واذكـر اخـا عـاد اذ انـذر قـومـه এ আয়াতের মধ্যে اذ টি মূলতঃ مـفعول به ছিল না বরং مـفعول فيه ছিল। ইবারত اذكـر الحادث اذ انـذر قومه এরকম ছিল। مـفـعول به তথা الـحادث -কে হযফ করে اذ -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (এখন প্রশ্ন হল اذ -এর عـامل কি? তো এসম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে) (ক) আয়াতের মধ্যে قـالـوا اتـجعلوا فيها -এর মধ্যে যে قـالوا রয়েছে সেটা হল اذ -এর عـامل । (খ) অথবা তার عـامـل হল اذكـر যা এখানে উহ্য আছে। কেননা, কুরআনের অনেক জায়গায় اذ টি اذكـر -এর فعل যে مضمون হয়ে আসে। (গ) তার পূর্ববর্তী আয়াত তথা الذى خلقكم الخ আয়াতের معمول

خلق - اذ قلنا الخ বুঝাচ্ছে সেটাই হল اذ -এর عامل । যেমন بدأ خلقكم اذ قال এ । এ অবস্থায় لكم -এর উপর معطوف ظرف হবে। মা'মর থেকে বর্ণিত আছে, اذ টি কোন عامل -এর ظرف নয় বরং এটা زائده

☆☆☆

وَالْمَلٰئِكَةُ جَمْعُ مَلْأَكٍ عَلَى الْاَصْلِ كَالشَّمَائِلِ جَمْعُ شَمْأَلٍ وَالتَّاءُ لِتَانِيْثِ الْجَمْعِ وَهُوَ مَقْلُوْبُ مَأْلَكٍ مِنَ الْاَلُوْكَةِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ لِاَنَّهُمْ وَسَائِطُ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَيْنَ النَّاسِ فَهُمْ رُسُلُ اللّٰهِ اَوْ كَالرُّسُلِ اِلَيْهِمْ۔

অনুবাদ:

ملائكة শব্দটি মূলতঃ ملأك -এর বহুবচন। যেভাবে شمائل শব্দটি মূলতঃ شمأل -এর বহুবচন। تاء تانيث টি جمع বুঝানোর জন্য। আর ملأك এটা مألك -এর উল্টরূপ। (অর্থাৎ ملأك মূলতঃ مألك ছিল। হামযাকে লামের স্থানে এবং লামকে হামযার স্থানে এনে ملأك বনানো হয়েছে)। الوكة দূত হওয়া থেকে নির্গত। কেননা, ফিরিশতাগণ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে বার্তাবাহক অথবা তাদের জন্য রাসূল সমতুল্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) ما معنى الملائكة؟ ثم بين اختلاف العقلاء فى حقيقتها بعد حل لغاتها

(ب) كم قسما للملائكة؟ بين مفصلا (ج) اوضح معنى الخليفة وما هو المراد بها ههنا؟

উত্তর: الف : معنى الملائكة (ملائكة -এর অর্থ) ঃ

ملائكة শব্দটি ملأك -এর বহুবচন। যেভাবে شمائل শব্দটি شمأل -এর বহুবচন। ملائكة -এর تاء টি جمع এবং تاكيد বুঝানোর জন্য। ملأك মূলতঃ مألك ছিল। হামযাকে লামের স্থানে এবং লামকে হামযার স্থানে এনে ملأك বনানো হয়েছে। আর مألك টি الوكة থেকে নির্গত। যার অর্থ হল বার্তাবাহক হওয়া। আর ফিরিশতাগণ যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বার্তাবাহক অথবা তারা বান্দাদের জন্য রাসূলের ন্যায় বিধায় তাদেরকে ملائكة বলা হয়।

اختلاف العقلاء فى حقيقة الملائكة (ফিরিশতাগণের স্বরূপ সম্পর্কে মনীষীদের মত পার্থক্য)ঃ মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও দার্শনিকগণ এব্যাপারে একমত যে, ملائكه নামে একটি জাতি রয়েছে। যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। তবে তাদের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা গেল।

১. অধিকাংশ মুসলিম মনীষীদের মতে, ان الملائكة اجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতি ধারণে সামর্থবান অতি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট প্রাণীই ملائكه বা ফিরিশতা জাতি।

তাদের যুক্তি হল, বিভিন্ন সময়ে নবীগণ ফিরিশতাদেরকে দেখেছেন। যেমন আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.) -কে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, احيانا تأتينى فى صورة دحية الكلبى অর্থাৎ অনেক সময় তিনি (অর্থাৎ জিব্রাঈল) দাহইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে আসতেন।

২. খ্রীস্টানদের এক সম্প্রদায়ের মতে, পরলোকগত মনীষীদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দেহান্তরীত স্বর্গীয় অস্তিত্বই হল ফিরিশতাদের স্বরূপ। তাদের এ দাবী যুক্তিযুক্ত নয়। বরং অসত্য, অবাস্তব। কেননা, মানব জাতির সৃষ্টি ফিরিশতাদের পরে হয়েছে। মানব জাতি সৃষ্টি ফিরিশতাদের পরে হয়েছে বলেই আল্লাহ তা'লা আদম (আ.) -কে সৃষ্টির পূর্বে ফিরিশতাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। যেমন আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة .

৩. দার্শনিকদের মতে, মূলতঃ ফিরিশতা হল মানবীয় আত্মার বিপরীত একটি স্বতন্ত্র বস্তু।

ب : اقسام الملائكة (ফিরিশতাগণের শ্রেণীভেদ) ঃ ফিরিশতাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) যারা আল্লাহর মা'রিফতে ব্যস্ত এবং অন্যান্য কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন, يسبحون الليل والنهار ولا يفترون তারা দিবারাত্রি আল্লাহর গুণাগুন বর্ণনায় রত থাকে, তারা একটুও ক্লান্তি হয় না।" এরা মর্যাদার উচ্চ শিখরে আসিন এবং এরাই আল্লার নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতাগণ। (খ) যারা আল্লাহর নির্দেশ মোয়াফিক আসমান ও জমীনের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা তার অবাধ্যতা করে না। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আসমানের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেন এবং কেউ কেউ জমীনের কাজ আঞ্জাম দেন।

ج : معنى الخليفة (خليفة শব্দের অর্থ) ঃ خليفة অর্থ প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত। خليفة শব্দের শেষের تاء টি مبالغه -এর জন্য।

المراد بالخليفة (খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য) ঃ অত্র আয়াতে খলীফা দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য। কেননা, তাকে আল্লাহ তা'লা জমীনের খলীফা বানিয়েছেন। তদ্রূপ প্রত্যেক নবী তার পূর্ববর্তী নবীর খলীফা। কেননা, প্রত্যেকের দায়িত্ব হল, পৃথিবীকে আবাদ করা, মানুষের নেতৃত্ব দেয়া, তাদের আত্মশুদ্ধি করা এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শাসন কায়েম করা ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রাসূল (সা.)ও খলীফা। আর তার পরে যেহেতু কোন নবী আসবেন না, সেহেতু হক্কানী উলামায়ে কেরামও খলীফা। কেননা, উলামায়ে কেরামই রাসূলের এই দাওয়াতী মিশনকে এগিয়ে নিবেন। তাছাড়া খলীফা দ্বারা আদম ও তার সন্তানগণও উদ্দেশ্য।

ফায়দা: আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফিরিশতাদের সমাবেশে আল্লাহ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ , না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা ? না ফিরিশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করানো ?

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো

সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে !

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ পাকই সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। ফিরিশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হল না ?

সারকথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের এ উদ্দেশ্যে যে– (ক) মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কুরআন পাকে রাসূলে কারীম (সা.)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

(খ) আদমের সম্মান বৃদ্ধি। (গ) ইবাদতের উপর ইলমের প্রাধান্য প্রদান। (ঘ) খেলাফতের জন্য পাপমুক্ত হওয়া শর্ত নয় বরং ইলম ও জ্ঞান থাকা শর্ত।

☆☆☆

﴿قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

এ আয়াত সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: استفهام (প্রশ্ন দ্বারা) উদ্দেশ্য কি? ২য় আলোচনা: ফিরিশতাগণ কিভাবে জানলেন যে, আদম (আ.) দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন এবং রক্তপাত ঘটাবেন? ৩য় আলোচনা: سفك শব্দের বিশ্লেষণ এবং يسفك -এর কেরাত।

تَعَجُّبٌ مِنْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعِمَارَةِ الْاَرْضِ وَإِصْلَاحِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ مَكَانَ أَهْلِ الطَّاعَاتِ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ وَإِسْتِكْشَافٌ عَمَّا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِيْ بَهَرَتْ تِلْكَ الْمَفَاسِدَ وَأَلْغَتْهَا وَإِسْتِخْبَارٌ عَمَّا يُرْشِدُهُمْ وَيُزِيْحُ شُبْهَتَهُمْ كَسُوَالِ الْمُتَعَلِّمِ مُعَلِّمَهُ عَمَّا يَخْتَلِجَ فِيْ صَدْرِهِ وَلَيْسَ بِاِعْتِرَاضٍ عَلَى اللّٰهِ وَلَا طَعْنَ فِيْ بَنِيْ أٰدَمَ عَلٰى وَجْهِ الْغِيْبَةِ فَإِنَّهُمْ أَعْلٰى مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ ذٰلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ:

(ফেরেশতাদের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো) এ কথার উপর আশ্চর্য প্রকাশ করা যে, পৃথিবী আবাদের জন্য এমন জাতিকে খলীফা নিযুক্ত করা হচ্ছে যারা এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। অথবা এ কথার উপর আশ্চর্য প্রকাশার্থে (ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেছেন) যে, অনুগত লোকদের স্থলে অবাধ্য এক জাতিকে খলীফা বানানো হচ্ছে। তাছাড়া সেই রহস্য উন্মুচিত হওয়ার আবেদন করা উদ্দেশ্য যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (তাদের প্রশ্ন করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো) যে বিষয়টি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে এবং তাদের অন্তর থেকে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করার (জন্য তারা প্রশ্ন করেছিল)। তাদের এই প্রশ্ন যেন এমন হয়ে গেল, ছাত্র যেভাবে তার অন্তরে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে উস্তাদকে প্রশ্ন করে থাকে। এটা আল্লাহ তা'লার উপর অভিযোগ নয় এবং আদম সন্তানের গীবত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ফেরেশতাগণ থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়ার ধারণাও করা যায় না। কারণ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, "বরং তারা সম্মানীত তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে না এবং যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে"।

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ কি না: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, সকল ফেরেশতা নিষ্পাপ। তাদের থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। কেননা, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, لا يعصون الله ما امرهم وهم يفعلون ما يؤمرون "তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।"

حشويه সম্প্রদায়ের মতে, ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ নন। তাদের থেকে গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। তাদের দলীল হলো, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দু'টি বিষয় বেরিয়ে আসে। একটি হল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'লার উপর অভিযোগ আরোপ করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হল তারা আদমের গীবত করেছেন। আর এ দু'টি বিষয়-ই গোনাহের কাজ। তাই প্রমাণিত হল যে, ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ নন।

حشويه সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন ঃ ফেরেশতাগণের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর অভিযোগ করা কিংবা আদমের গীবত করা কোনটি-ই উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ প্রশ্নের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আশ্চর্য প্রকাশ করা যে, আল্লাহ তা'লা এমন এক জাতিকে পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে প্রেরণ করছেন যারা পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে, রক্তপাত ঘটাবে। অথচ খলীফার কাজ হলো, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বনী আদম কিভাবে খলীফা হওয়ার যোগ্যতা রাখে? তাছাড়া তাদের এ-ও উদ্দেশ্য ছিল যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী জাতিকে খলীফা বানানোর পিছনে রহস্যটা কি? তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সুতরাং حشويه সম্প্রদায়ের দলীল উপস্থাপন এবং তাদের অভিমত সঠিক নয়।

☆☆☆

وَإِنَّمَا عَرَفُوْا ذَالِكَ بِإِخْبَارٍ مِنَ اللّٰهِ أَوْ تَلَقٍّ مِنَ اللَّوْحِ أَوْ اِسْتِنْبَاطٍ عَمَّا رَكَزَ فِيْ عُقُوْلِهِمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ خَوَاصِّهِمْ أَوْ قِيَاسٍ لِأَحَدِ الثَّقَلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ

ফিরিশতাগণ কিভাবে জানলেন যে, আদম (আ.) দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন এবং রক্তপাত ঘটাবেন?

অনুবাদ:

ফেরেশতাগণ এ বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদের মাধ্যমে। অথবা আদম সন্তান সম্পর্কে লাওহে মাহফূজে লিখিত ছিল যে, তারা পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। আর ফেরেশতাগণ তা দেখে অবহিত হয়েছেন। কিংবা ফেরেশতাদের অন্তরে এ বিষয়টি বদ্ধমুল ছিল যে, নিষ্পাপতা একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য, তারা ব্যতীত আর কেউ নিষ্পাপ নয়। তা থেকে তারা বুঝে নিয়েছেন (যে, আমাদের বিপরীত যাদেরকে সৃষ্টি করা হচ্ছে তারা নিষ্পাপ নয়। তারা পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে। তাই বনী আদমও এরূপ হবে)। অথবা জ্বিন জাতির উপর অনুমান করে (তারা জানতে পেরেছেন যে, আদম সন্তান সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে। কেননা, ইতঃপূর্বে এ পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বসবাস করেছিল। তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তাই তাদের স্থলবর্তী যে জাতিকে সৃষ্টি করা হচ্ছে তারাও সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে)।

سفك শব্দের বিশ্লেষণ এবং يسفك-এর দ্বিতীয় কেরাত

وَالسَّفَكُ وَالسَّبَكُ وَالسَّفْحُ وَالشَّنُّ أَنْوَاعٌ مِنَ الصَّبِّ فَالسَّفَكُ يُقَالُ فِي الدَّمْعِ وَالدَّمِ وَالسَّبَكُ فِي الْجَوَاهِرِ الْمُذَابَةِ وَالسَّفْحُ فِي الصَّبِّ مِنَ الْأَعْلٰى وَالشَّنُّ فِي الصَّبِّ عَنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَالِكَ السَّنُّ وَقُرِئَ يُسْفَكُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ فَيَكُوْنُ الرَّاجِعُ إِلٰى (مَنْ) سَوَاءٌ جُعِلَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُوْلًا مَحْذُوْفًا أَيْ يُسْفَكُ الدِّمَاءُ فِيْهِمْ

অনুবাদ:

سفك ـ سبك ـ سفح ـ شن এগুলো হলো সমার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ প্রবাহিত করা। তবে سفك শব্দটি অশ্রু বা রক্ত প্রবাহিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। سبك টি গলিত ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। سفح টি ব্যবহৃত হয় উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা অর্থে। এবং شن টি ব্যবহৃত হয় মশকের মুখ থেকে ঢালা অর্থে। তদ্রূপ سن শব্দটিও।

এক কেরাতের মধ্যে يُسْفَكُ (صيغه مجهول সহ) এসেছে। এমতাবস্থায় من يفسد -من-এর -কে موصوله গণ্য করো কিংবা موصوفه তার দিকে একটি উহ্য যমীর প্রত্যাবর্তন করবে। মূল ইবারত এভাবে يسفك الدماء فيهم (অর্থাৎ فيهم টি উহ্য আছে। আর তার যমীর প্রত্যাবর্তন করছে من -এর দিকে)।

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

حَالٌ مُقَرِّرَةٌ لِجِهَةِ الْإِشْكَالِ كَقَوْلِكَ: أَتُحْسِنُ إِلَى أَعْدَائِكَ وَأَنَا الصَّدِيْقُ الْمُحْتَاجُ وَالْمَعْنَى: أَتَسْتَخْلِفُ عُصَاةً وَنَحْنُ مَعْصُوْمُوْنَ أَحِقَّاءُ بِذَالِكَ وَالْمَقْصُوْدُ مِنْهُ الْإِسْتِفْسَارُ عَمَّا رَجَّحَهُمْ مَعَ مَا هُوَ مُتَوَقَّعٌ مِنْهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمَعْصُوْمِيْنَ فِي الْإِسْتِخْلَافِ لَا الْعَجَبِ وَالتَّفَاخُرِ كَأَنَّهُمْ عَلِمُوْا أَنَّ الْمَجْعُوْلَ خَلِيْفَةٌ ذُوْ ثَلَاثِ قُوًى عَلَيْهَا مُدَارُ أُمُوْرٍ شَهْوِيَّةٌ وَغَضَبِيَّةٌ تُؤَدِّيَانِ بِهِ إِلَى الْفَسَادِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ وَعَقْلِيَّةٌ تَدْعُوْهُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَالطَّاعَاتِ وَنَظَرُوْا إِلَيْهَا مُفْرَدَةً وَقَالُوْا: مَا الْحِكْمَةُ فِيْ إِسْتِخْلَافِهِ؟ وَهُوَ بِاعْتِبَارِ تَيْنِكَ الْقُوَّتَيْنِ لَايَقْتَضِي الْحِكْمَةُ إِيْجَادَهُ فَضْلًا عَنْ إِسْتِخْلَافِهِ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَةِ فَنَحْنُ نُقِيْمُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْهَا سَلِيْمًا عَنْ مُعَارَضَةِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ وَغَفَلُوْا عَنْ فَضِيْلَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقُوَّتَيْنِ إِذَا صَارَتْ مُهَذَّبَةً مُطْوَاعًا لِلْعَقْلِ مُتَمَرِّنَةً عَلَى الْخَيْرِ كَالْعِفَّةِ وَالشُّجَاعَةِ وَمُجَاهَدَةِ الْهَوٰى وَالْإِنْصَافِ وَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ التَّرْكِيْبَ يُفِيْدُ مَا يَقْصُرُ عَنْهُ الْاٰحَادُ كَالْإِحَاطَةِ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَاِسْتِنْبَاطِ الصِّنَاعَاتِ وَاِسْتِخْرَاجِ مَنَافِعِ الْكَائِنَاتِ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ الَّذِيْ هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْإِسْتِخْلَافِ إِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ

অনুবাদ:

এ বাক্যটি حال موكده যা প্রশ্নের দিককে শক্তিশালী করে। (কেননা, اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, খলীফা হওয়ার যোগ্য তো কেবল আমরাই। কিন্তু যারা খলীফা হওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে আমাদের পরিবর্তে কেন খলীফা বানানো হচ্ছে? এই প্রশ্নকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك এ অংশটিকে حال হিসেবে আনা হয়েছে)। তার দৃষ্টান্ত তোমার উক্তি أتحسن الى اعدائك وانا الصديق المحتاج (তুমি কি তোমার শত্রুদের উপর করুনা করছো? অথচ আমি তোমার দরিদ্র বন্ধু। অর্থাৎ যাদেরকে তুমি দয়া করছো তারা তোমার শত্রু। কাজেই তারা দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং আমিই এর যোগ্য। কেননা, আমি হলাম তোমার অভাবী বন্ধু। তাই আমাকে দয়া করা উচিত। কিন্তু আমার পরিবর্তে কোন যুক্তিতে তোমার শত্রুদের প্রতি দয়া করছো?)। এ মিছালের মধ্যে وانا الصديق المحتاج অংশটি حال হয়েছে। যা শত্রুদেরকে দয়া করার উপর আরোপিত প্রশ্নের দিককে আরো শক্তিশালী করেছে। তদ্রূপ ফেরেশতাদের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল যে, খলীফা হওয়ার যোগ্য তো একমাত্র

আমরা। কেননা, আমরা নিষ্পাপ জাতি আর খলীফা হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। কিন্তু আমাদের পরিবর্তে আদমকে কেন খলীফা বানানো হলো? কেননা, সে তো এর যোগ্য নয়। কারণ, সে তো নিষ্পাপ নয়? অতএব ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك এটা এমন حال হয়েছে যা পূর্বের প্রশ্নকে শক্তিশালী করেছে)। আয়াতের অর্থ: আপনি কি পাপাচারীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করছেন? অথচ আমরা নিষ্পাপ। তাই আমরা খলীফা হওয়ার যোগ্য। (বিধায় আমাদেরকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত ছিল)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বনী আদম থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বে কেন নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরকে খলীফা নিযুক্ত না করে আদমকে খলীফা নিযুক্ত করা হচ্ছে– এর রহস্য উদঘাটন করা; আত্মপ্রশংসা ও অহংকার উদ্দেশ্য নয়। (ফেরেশতাদের অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টির করাণ হয়তো এটা হতে পারে যে,) ১. তারা জ্ঞান করেছিল যে, যাকে খলীফা নিযুক্ত করা হবে তার মধ্যে তিনটি শক্তি বিদ্যমান থাকবে যেগুলোর উপর খেলাফতের বিষয়টি নির্ভরশীল। (ক) قوت شهويه "জৈবিক শক্তি"। (খ) قوت غضبيه "ক্রোধশক্তি"। এ উভয় শক্তি তাকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং রক্তাপাতের দিকে ধাবিত করবে। (গ) قوت عقليه "বোধশক্তি"। এটা আল্লাহর পরিচয় এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে। ফেরেশতারা এই তিন শক্তির দিকে এককভাবে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তাকে খলীফা নিযুক্ত করার রহস্য কি? প্রথম দুই শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে তাকে খলীফা বানানো তো দূরে থাক; সৃষ্টি করাও বাঞ্ছনীয় নয়। قوت عقليه -এর কারণে তার থেকে যে কল্যাণের আশা করা যায় (অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় ও ইবাদত) তা তো আমরা বিশৃংখলামুক্ত সার্বক্ষণিকভাবে আদায় করছি। (পক্ষান্তরে বনী আদম থেকে কল্যাণের আশা করা গেলেও তাদের থেকে বিশৃংখলার আশাংকা রয়েছে)। এই দুই শক্তি তথা قوت شهويه ও قوت غضبيه উভয়টি যখন সংশোধন হয়ে যায় তাখন বিবেকের অনুগত হয়ে যায় এবং ভাল কাজের অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন পরহেযগারী, বাহাদূরী, আত্মার সাধনা এবং ন্যায়-ইনসাফ। ফেরেশতারা একথা জানে না যে, এ তিন শক্তির সমন্বয়ে যে উপকার অর্জিত হবে তা পৃথকভাবে অর্জিত হবে না। যেমন ছোট-খাট বিষয়ের জ্ঞান, বিভিন্ন রকমের কারুকার্য আবিষ্কার এবং সৃষ্টিকূলের উপকারকে বাস্তবে রুপ দেয়া; এগুলো হচ্ছে খলীফা বানানোর মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ তা'লা এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এই আয়াতে– انى اعلم ما لاتعلمون

☆☆☆

وَالتَّسْبِيْحُ تَبْعِيْدُ اللّٰهِ عَنِ السُّوْءِ وَكَذَالِكَ التَّقْدِيْسُ مِنْ سَبَّحَ فِي الْأَرْضِ وَالْمَاءِ وَقَدَّسَ فِي الْأَرْضِ إِذَا ذَهَبَ فِيْهَا وَأَبْعَدَ وَيُقَالُ قَدَّسَ إِذَا طَهَّرَ لِأَنَّ مُطَهِّرَ الشَّيْءِ مُبْعِدُهٗ عَنِ الْاَقْذَارِ وَ(بِحَمْدِكَ) فِيْ مَوْضِعِ الْحَالِ أَىْ مُلْتَبِسِيْنَ بِحَمْدِكَ عَلٰى مَا أَلْهَمْتَنَا مَعْرِفَتَكَ وَوَفَّقْتَنَا لِتَسْبِيْحِكَ تَدَارَكُوْا بِهٖ مَا أَوْهَمَ إِسْنَادُ التَّسْبِيْحِ إِلٰى أَنْفُسِهِمْ وَنُقَدِّسُ

لَكَ نُطَهِّرُ نُفُوْسَنَا عَنِ الذُّنُوْبِ لِأَجْلِكَ كَأَنَّهُمْ قَابَلُوْا الْفَسَادَ الْمُفَسَّرَ بِالشِّرْكِ عِنْدَ قَوْمٍ بِالتَّسْبِيْحِ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ الَّذِىْ هُوَ أَعْظَمُ الْأَفْعَالِ الذَّمِيْمَةِ بِتَطْهِيْرِ النَّفْسِ عَنِ الْأَثَامِ قِيْلَ: نُقَدِّسُكَ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ

অনুবাদ:

تسبيح অর্থ আল্লাহ তা'লাকে ত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করা। আর এ অর্থে تقديس শব্দও ব্যবহৃত হয়। এটা سَبَحَ فِى الْمَاءِ وَالْاَرْضِ وَقَدَسَ فِى الْاَرْضِ থেকে নির্গত। অর্থ– জমিনে বিচরণ করে, পানিতে সাতার কেটে দূর চলে যাওয়া। (باب تفعيل থেকে) قدس বলা হয় যার অর্থ পবিত্র করা। (مشتق ও مشتق منه -এর মধ্যে) সম্পর্ক হলো, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে পবিত্র করলো সেটা থেকে নাপাকী ও ময়লা-আবর্জনা দূর করে দিলো।

بحمدك : এটা حال -এর স্থানে পতিত। মূল ইবারত এভাবে ملتبسين بحمدك على ما ألهمتنا الخ অর্থাৎ আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সাথে সাথে আপনি যে আমাদের অন্তরে আপনার পরিচয় ঢেলে দিয়েছেন এবং তাহসবীহ পাঠ করার তাওফীক দান করেছেন তার উপর আমরা আপনার প্রশংসা করছি। ফেরেশতাগণ এর দ্বারা (অর্থাৎ بحمدك দ্বারা) সেই ভুলকে সংশোধন করেছেন যে ভুলটি সৃষ্টি হয়েছিল তাসবীহকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার কারণে। (অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন তাসবীহকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে نسبح বলেছিলেন তখন নিজের আমল দ্বারা গর্ব বোধ করছিল। তাই بحمدك উল্লেখ করে সেই ভুলকে বিদূরীত করা হয়েছে। কেননা, بحمدك -এর অর্থ হলো, আপনি যে আমাদের অন্তরে আপনার পরিচয় ঢেলে দিয়েছেন এবং আপনার প্রবিত্রতা বর্ণনা করার তাওফীক দান করেছেন তার উপর প্রশংসা করে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, ফেরেশতারা নিজেকে কোন গণ্য করে নি। তাদের বিশ্বাস হলো, পবিত্রতা বর্ণনা করার তাওফীক যদি আল্লাহ না দিতেন তাহলে আমরা তাসবীহ পাঠ করতে পারতাম না)।

نقدس لك : এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের অন্তরকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে নেই। কেউ কেউ বলেন, نقدسك অর্থাৎ আমরা আপনাকে পবিত্র মনে করি। এমতাবস্থায় لك -এর لام টি زائده (অতিরিক্ত) হবে।

☆☆☆

﴿وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾

السوال: (الف) ما معنى التعليم ههنا ؟ اكتب كما فى كتابك

(ب) لفظ ادم عربى أم عجمى ايهما أرجح ؟ بين مع ذكر المشتق منه

(ج) ما معنى الاسم اشتقاقا وعرفا واصطلاحا ؟ واى معنى اريد فى الاية ؟

উত্তর: الف : معنى التعليم (تعليم শব্দের অর্থ) ঃ অত্র আয়াতে علم শব্দটি تعليم মাসদার থেকে নির্গত। تعليم অর্থ শিক্ষা দেয়া। تعليم সেই কাজকে বলে, যার সাথে সাধারণভাবে ইলম সম্পৃক্ত হয়। এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সেই সকল লোকের বক্তব্যকে খন্ডন করার উদ্দেশ্য করেছেন, যারা বলে যে, তা'লীমের সাথে ইলম ও ইলহামের সম্পর্ক নেই। অত্র আয়াতের মধ্যে ইলম দ্বারা হয়ত আল্লাহ্ প্রদত্ব যোগ্যতা অথবা ইলমে ওহ্বী অর্থাৎ ইলহাম উদ্দেশ্য।

ب : ادم শব্দ আরবী , না অনারবী ঃ ادم শব্দ আরবী , না অনারবী এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, আরবী। আর কেউ বলেন, অনারবী। যারা বলেন, আরবী তাদের মতে, ادم শব্দটি মূলতঃ أادم ছিল। امــن -এর কায়দা অনুসারে দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়া হয়েছে। ফলে ادم হয়ে গেল। আর যারা বলেন, ادم শব্দটি অনারবী তাদের মতে, ادم শব্দটি فاعل -এর ওযনে। কেননা, অধিকাংশ অনারবী শব্দ فاعل -এর ওযনেই আসে। যেমন شالح .اذر

ادم শব্দের مشتق منه (উৎসমূল) ঃ ادم শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে চারটি অভিমত রয়েছে।

১. তার উৎসমূল হল اُدْمَةٌ যার অর্থ বাদামী রঙ। যেহেতু আদম (আ.) -এর শরীরের রঙ ছিল বাদামী রঙ কাজেই তাঁকে আদম বলা হয়।

২. ادم শব্দটি اَدِيْــمُ الْاَرْضِ থেকে নির্গত। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর এক মুষ্টি মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. اَدَمَةٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ পথপ্রদর্শক। যেহেতু আদম (আ.) পৃথিবীর সকলের জন্য পথপ্রদর্শক কাজেই তাঁকে আদম বলা হয়।

৪. ادم শব্দটি اُدْمَةٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ প্রেম প্রীতি, ভালবাসা।

ج : معنى الاسم اشتقاقا و عرفا واصطلاحا ঃ اسم শব্দের مشتق منه কি এ সম্পর্কে বিসরিয়্যীন ও কূফিয়্যীনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কূফিয়্যীনের মতে, اســم শব্দটি وســم থেকে নির্গত যার অর্থ নিদর্শন। পক্ষান্তরে বিসরিয়্যীনের মতে, اسم শব্দটি سمو থেকে নির্গত যার অর্থ উচ্চতা, বুলন্দী। اسم -এর عـرفى (প্রসিদ্ধি) অর্থ– اسم এমন শব্দকে বলে, যাকে অর্থ প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছে। চাই এ অর্থটি مفرد বা مـركب হোক। আর পারিভাষিক অর্থ হল اسم সেই একক শব্দকে বলে, যা নিজ অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন একটি কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। আয়াতের মধ্যে اســــــم শব্দের উল্লেখিত তিনটি অর্থের অর্থাৎ اشتقاقى ـ عرفى ـ اصطلاحى -এর মধ্য থেকে প্রথম দুই অর্থ তথা اشتقاقى ـ عرفى অর্থ উদ্দেশ্য। তবে তৃতীয় অর্থটি কখনও উদ্দেশ্য হবে না। কেননা, যখন আদম (আ.) -কে বস্তুনিচয়ের নামসমূহ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তখন কোন পরিভাষা ধার্য্য করা হয়নি।

☆☆☆

﴿فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾

تَبْكِيْتٌ لَهُمْ وَتَنْبِيْهٌ عَلٰى عِجْزِهِمْ عَنْ أُمْرِ الْخِلَافَةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ وَالتَّدْبِيْرَ وَإِقَامَةَ الْمَعْدَلَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْمَعْرِفَةِ وَالْوُقُوْفُ عَلٰى مَرَاتِبِ الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَقَدْرُ الْحُقُوْقِ مَحَالٌ وَلَيْسَ بِتَكْلِيْفٍ لِيَكُوْنَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيْفِ بِالْمُحَالِ وَالْإِنْبَاءُ إِخْبَارٌ فِيْهِ إِعْلَامٌ وَلِذَالِكَ يَجْرِيْ مَجْرٰى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

অনুবাদ:

"আল্লাহ তা'লা বললেন, তোমরা আমাকে এসকল বস্তুর নাম বলে দাও।" এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদেরকে নিশ্চুপ করা এবং তারা যে খেলাফতের বিষয়াদি জানতে অক্ষম সেই সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। কেননা, বস্তুরাজি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত সমাজে শান্তি-শৃংখলা এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। (আর এ কথা পরিস্কার যে, ফেরেশতারা বস্তুরাজি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। পক্ষান্তরে বনী আদম এগুলোর জ্ঞান রাখে তাই বনী আদমই খলীফা হওয়ার যোগ্য)।

এ আয়াতটি مكلف বনানোর অন্তর্ভুক্ত নয়; যার ফলে تكليف بالمحال -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। انباء অর্থ: সংবাদ দেয়া, অবহিত করা। এ কারণেই انباء ও اعلام একটি আরেকটির স্থানে ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وليس بتكليف الخ : فقال انبئونى باسماء هؤلاء এই আয়াত দ্বারা কেউ কেউ تكليف ما لا يطاق (অসম্ভব জিনিসের নির্দেশ প্রদান) জায়েয হওয়ার উপর দলীল পেশ করে থাকেন। তারা বলেন, অসম্ভব জিনিসের নির্দেশ করা জায়েয। এর দৃষ্টান্ত হলো উপরিউক্ত আয়াতটি। কেননা, আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলে দেয়ার নির্দেশ করেছেন। অথচ এটা তাদের জন্য ছিল অসম্ভব। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, تكليف ما لا يطاق জায়েয।

উত্তর: মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত ইবারতের মধ্যে এই দলীলের জবাব দিয়েছেন। জবাবটির সারাংশ হলো এই, فقال انبئونى باسماء هؤلاء দ্বারা ফেরেশতাদেরকে মুকাল্লাফ বানানো উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদেরকে নিরুত্তর করা এবং এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা খেলাফতের যোগ্যতা রাখো না। অতএব এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

☆☆☆

﴿قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

এই বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: বাক্যের উদ্দেশ্য। ২য় আলোচনা: سبحان শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: বাক্যের শুরুতে سبحانك উল্লেখের রহস্য।

১ম আলোচনা: বাক্যের উদ্দেশ্য

اِعْتِرَافٌ بِالْعِجْزِ وَالْقُصُوْرِ وَاِشْعَارٌ بِاَنَّ سُؤَالَهُمْ كَانَ اِسْفَارًا وَلَمْ يَكُنْ اِعْتِرَاضًا وَاَنَّهُ بِمَا عَرَّفَهُمْ وَكَشَفَ لَهُمْ مَا قَدْبَانَ لَهُمْ مَاخَفِىَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِ الْاِنْسَانِ وَالْحِكْمَةِ فِىْ خَلْقِهِ وَاِظْهَارٌ لِشُكْرِ نِعْمَتِهِ عَقَلَ عَلَيْهِمْ وَمُرَاعَاةً لِلْاَدَبِ بِتَفْوِيْضِ الْعِلْمِ كُلِّهِ اِلَيْهِ

অনুবাদ:

(ফেরেশতাদের উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য চারটি ঃ) ১. নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি প্রদান। ২. এবিষয়ের অবহিতকরণ যে, তাদের প্রশ্নটি ছিল জানার উদ্দেশ্যে; অভিযোগ করা নয় এবং এবিষয়ের ঘোষণা প্রদান যে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদেরকে সৃষ্টি করার যে রহস্যাবলী ফেরেশতাদের নিকট গোপন ছিল তা এখন তাদের সামনে উন্মুচিত হয়ে গেছে। ৩. তাদের কাছে যে জ্ঞান গোপন ছিল আল্লাহ তা'লা সেই জ্ঞানকে তাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন তাই তারা এই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় হিসেবে উপরিউক্ত বাক্যটি বলেছে। ৪. সমস্ত জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে অর্পণ করে আদবের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে।

২য় আলোচনা: سبحان শব্দের বিশ্লেষণ

وَسُبْحَانَ مَصْدَرٌ كَغُفْرَانَ وَلَايَكَادُ يُسْتَعْمَلُ اِلَّا مُضَافًا مَنْصُوْبًا بِاِضْمَارِ فِعْلِهِ كَمَعَاذَ اللّٰهِ وَقَدْ اُجْرِىَ عَلَمًا لِلتَّسْبِيْحِ بِمَعْنٰى: اَلتَّنْزِيْهِ عَلَى الشُّذُوْذِ فِىْ قَوْلِهِ: سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ

অনুবাদ:

سبحان শব্দটি غفران -এর ওযনে মাসদার। (এর অর্থ হলো, দূর হওয়া। তা থেকে باب تفعيل আসে سبحته من كذا আমি ওটাকে তার থেকে দূরে এবং পবিত্র রেখেছি)। سبحان শব্দটি সর্বদা মুযাফ এবং فعل محذوف -এর (مفعول مطلق হয়ে) منصوب হয়। (যেমন سبحانك মূল ইবারত হল سبحتك تسبيحا অর্থ: আমি তোমাকে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করি)। যেভাবে معاذالله শব্দটি مضاف ও فعل محذوف -এর (مفعول مطلق হয়ে) منصوب হয়। (معاذالله -এর মূলরূপ ছিল اعوذ بالله معاذا)। আর سبحان শব্দটি বিরল হিসেবে تسبيح بمعنى تنزيه -এর علم হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন উক্তি سبحان من علمقمة الفاخر

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

قوله قد اجرى علما للتسبيح الخ : জেনে রাখা আবশ্যক যে, যেভাবে বস্তুসমূহের নাম থাকে তদ্রূপ ভাবার্থ -এরও নাম থাকে। তাই তাসবীহ যা ভাবার্থের অন্তর্ভুক্ত তার নাম হিসেবে سبحان শব্দকে গণ্য করা হয়। তবে এ নাম রাখা বিরল।

قوله سبحان من علقمة الفاخر : এটা কবি আ'শ্শী এর কবিতার একটি অংশ। পূর্ণ কবিতাটি হল قد قلت لما جاء نى فخره ☆ سبحان من علقمة الفاخر কবি এ কবিতাটি রচনা করেছিল আলকামা'র দুর্ণাম রটানোর জন্য।

কবিতার অর্থ: যখন আমার নিকট আলকামা'র আত্মগৌরবের সংবাদ পৌঁছল তখন আমি বললাম আত্মগৌরবী আলকামা'র জন্য আশ্চর্য লাগে। (সে কিভাবে আত্মগৌরব করে। অথচ সে যে নেয়ামতসমূহের উপর গৌরব করছে তা তো আল্লাহরই দান)।

محل استشهاد : এখানে سبحان শব্দটি محل استشهاد যা তাসবীহের علم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

☆☆☆

৩য় আলোচনা: বাক্যের শুরুতে سبحانك উল্লেখের রহস্য

وَتَصْدِيْرُ الْكَلَامِ بِه اِعْتِذَارٌ عَنِ الْاِسْتِفْسَارِ وَالْجَهْلِ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَلِذَالِكَ جُعِلَ مِفْتَاحُ التَّوْبَةِ فَقَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ﴾ وَقَالَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

অনুবাদ:

আর سبحان শব্দ দ্বারা বাক্যকে শুরু করা হয়েছে প্রশ্নের এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। এ জন্যই এটাকে তাওবার চাবি-কাটি গণ্য করা হয়। (অর্থাৎ তাওবার শুরুতে ব্যবহার করা যায়)। যেমন হযরত মূসা (আ.) তাওবা করার সময় سبحان শব্দ দ্বারা কথাকে আরম্ভ করে) বলেছেন سبحانك تبت اليك এবং ইউনুস (আ.)-ও (তাওবার সময়) বলেছেন سبحانك انى كنت من الظالمين

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

ফেরেশতাগণ তাদের উক্তি سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا -এর শুরুতে سبحان শব্দ উল্লেখ করে আল্লাহর দরবারে ওযর পেশ করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ سبحان শব্দ এনে একথা বলেছেন যে, হে আল্লাহ! আমরা আপনার গোপন রহস্য সম্পর্কে না বুঝে প্রশ্ন করেছিলাম। এখন আমরা আপনার দরবারে ওযর পেশ করছি আমাদের এই ওযরকে গ্রহণ করুন। আমরা মা'জুর কারণ, অজ্ঞতা থেকে পবিত্র সত্তা একমাত্র আপনি। আমরা মুর্খতায় শিকার।

قوله ولذالك جعل الخ : অর্থাৎ سبحان শব্দটি ওযর পেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিধায় এটাকে

তাওবার শুরুতে আনা হয়। যেমন হযরত মুসা (আ.) তাওবা করার সময় سبحان শব্দকে উল্লেখ করেছেন। যেমন سبحانك تبت اليك । অনুরূপ ইউনুস (আ.) তাওবার সময় এটাকে প্রথমে এনেছেন। যেমন سبحانك انى كنت من الظالمين

☆☆☆

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾

اَلَّذِىْ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ اَلْحَكِيْمُ اَلْمُحْكِمُ لِمُبْدَعَاتِهِ الَّذِىْ لَايَفْعَلُ اِلَّا مَا فِيْهِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَ(اَنْتَ) فَصْلٌ وَقِيْلَ تَاكِيْدٌ لِلْكَافِ فِىْ قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَاِنْ لَمْ يَجُزْ مَرَرْتُ بِأَنْتَ اِذِ التَّابِعُ يَسُوْغُ فِى الْمَتْبُوْعِ وَلِذَالِكَ جَازَ يَاهٰذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَجُزْ يَا الرَّجُلُ وَقِيْلَ: مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ

অনুবাদ:

"নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী" যার কাছে কোন কিছু গোপন নয়। "প্রজ্ঞাময়" অর্থাৎ সৃষ্টিকুলকে মজবুত করে সৃষ্টি করেন। তিনি তা-ই করেন যাতে রহস্য বিদ্যমান থাকে। انت টি ضمير فصل । আর কেউ কেউ বলেন, انك -এর كاف -এর মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করার জন্য এসেছে। যেমন তোমার উক্তি مررت بك انت যদিও مررت بانت অবৈধ। কেননা, متبوع -এর মধ্যে যা নাজায়েয তা تابع -এর মধ্যে জায়েয। আর এ কারণেই ياهذا الرجل বলা জায়েয এবং يا الرجل নাজায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

انك انت العليم الحكيم -এর মধ্যকার انت -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) انت টি ضمير فصل এটা ان -এর ইসম ও খবরের মধ্যখানে এসেছে। ان -এর ইসম হল كاف ضمير এবং العليم الحكيم টি খবরে আওয়াল ও ছানি। جمله اسميه -এর বেলায় خبر টি معرفه হলে خبر -কে صفت -এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত করার জন্যে مبتدا ও خبر -এর মাঝে একটি ضمير مرفوع منفصل ব্যবহার করতে হয়। এ ধরনের ضمير -কে ضمير الفصل বলা হয়। কেননা, বাস্তবে এটা خبر ও صفت -এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে خبر টি صفت -এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও ضمير فصل -কে ব্যবহার করা জায়েয আছে। ضمير فصل নেওয়ার এক ফায়দা হলো تاكيد حكم তথা مبتدا ও خبر -এর মধ্যখানে তাকীদ সৃষ্টি করা। এ ফায়দাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। انك انت العليم الحكيم -এর মধ্যে যদিও خبر টি صفت -এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। তথাপি এখানে انت ব্যবহার করা হয়েছে উল্লেখিত উপকারার্থে। (২) انت টি انك -এর كاف -এর তাকীদের জন্য। অর্থ: আপনিই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। এই উক্তি মতে, انت টি ضمير منصوب -এর তাকীদ হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। অথচ স্বয়ং انت টি ضمير منصوب হওয়া বৈধ নয়। এর কারণ হল এই যে, تابع -এর মধ্যে এমন জিনিস জায়েয যা متبوع -এর মধ্যে নাজায়েয। যেমন مررت بك انت -এর মধ্যে انت

ضمير مجرور টি كاف-এর তাকীদের জন্য এসছে। কিন্তু مررت بانت বলা যাবে না। কারণ এখানে انت টি متبوع-এর স্থানে এসেছে। তদ্রূপ يا هذا الرجل বলা জায়েয। কিন্তু يا الرجل বলা জায়েয নয়।
(৩) انت টি হলো مبتدا এবং العليم হলো خبر اول এবং الحكيم হলো خبر ثانى

☆☆☆

﴿قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ﴾

اَىْ أَعْلِمْهُمْ وَقُرِئَ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً وَحَذْفِهَا بِكَسْرِ الْهَاءِ فِيْهِمَا

অনুবাদ:

انبئهم অর্থ اعلمهم তাদেরকে জানিয়ে দাও। তার মধ্যে প্রচলিত কেরাত ব্যতীত আরো দু'টি কেরাত রয়েছে। (১) হামযাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ انبيهم (২) দ্বিতীয় হামযাকে হযফ করে। অর্থাৎ انبهم । এই দুই কেরাতের সময় هم যমীরটি যের বিশিষ্ট হবে।

☆☆☆

﴿فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾

اِسْتِحْضَارٌ لِقَوْلِه ﴿اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ﴾ لٰكِنَّهٗ جَاءَ بِه عَلٰى وَجْهِ الْبَسْطِ لِيَكُوْنَ كَالْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى لَمَّا عَلِمَ مَا خَفِىَ عَلَيْهِمْ مِنْ اُمُوْرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ اَحْوَالِهِمَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ عَلِمَ مَا لَايَعْلَمُوْنَ وَفِيْهِ تَعْرِيْضٌ بِمُعَاتَبَتِهِمْ عَلٰى تَرْكِ الْاَوْلٰى وَهُوَ أَنْ يَتَوَقَّفُوْا مُتَرَصِّدِيْنَ لِاَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ وَقِيْلَ مَا تُبْدُوْنَ قَوْلَهُمْ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَمَا يَكْتُمُوْنَ اِسْتِبْطَانُهُمْ اَحِقَّاءُ بِالْخِلَافَةِ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى لَايَخْلُقُ خَلْقًا اَفْضَلَ مِنْهُمْ وَقِيْلَ مَا اَظْهَرُوْا مِنَ الطَّاعَةِ وَاَسْتَرَ مِنْهُمْ اِبْلِيْسُ مِنَ الْمَعْصِيَّةِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ دَخَلَتْ حَرْفُ الْجَحْدِ فَأَفَادَتِ الْاِثْبَاتَ وَالتَّقْرِيْرَ

انی اعلم ما لاتعلمون এটা فلما انبأهم الخ -এর পুনরোল্লেখ। (অর্থাৎ এ বাক্য দ্বারা যেন انی اعلم এবং انی اعلم ما لاتعلمون -কে দ্বিতীয়বার পেশ করা হচ্ছে। কেননা, اعلم ما لاتعلمون انی اعلم ما غیب السموت والأرض উভয়টির ভাবার্থ এক ও অভিন্ন)। অবশ্য (প্রথম বাক্য তথা لاتعلمون -এর মধ্যে সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং انی اعلم غیب السموت الخ -কে স্ববিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে) এটাকে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এটা انی اعلم ما لاتعلمون -এর উপর দলীল স্বরূপ হয়। কেননা, (দ্বিতীয় বাক্যের ভাবার্থ হলো, আসমান ও জমিনে যেসকল বস্তু তোমাদের নিকট গোপন তা আমি ভালোভাবে জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন রাখো সেগুলোও আমি জানি) যখন আল্লাহ তা'লা আসমান ও জমিনের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান রাখেন যেগুলো ফেরেশতাদের নিকট গোপন এবং স্বয়ং তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন অবস্থার জ্ঞান রাখেন। তখন নিশ্চয় প্রমাণিত হলো যে, ফেরেশতারা যা জানে না তিনি তা জানেন। এর দ্বারা ফেরেশতাদের উত্তম বিষয়কে বর্জন করার কারণে তাদেরকে ভর্ৎসনা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উত্তম বিষয়টি ছিল এই যে, তারা প্রশ্ন করতে বিলম্ব করবে এবং তাদেরকে আদম সৃষ্টির রহস্য বলে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কেউ কেউ বলেন, ما تبدون দ্বারা তাদের উক্তি اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء উদ্দেশ্য এবং ما تكتمون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতারা তাদের অন্তরে একথা গোপন রেখেছিল যে, আমরাই খেলাফতের যোগ্য এবং আল্লাহ তা'লা আমাদের চেয়ে আর কোন উত্তম জাতিকে সৃষ্টি করবেন না। কেউ কেউ বলেন, ما تبدون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতারা তাদের ইবাদত-বন্দেগীর কথা প্রকাশ করেছিল এবং ما تكتمون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবলিস তার অন্তরে যে অবাধ্যতা গোপন রেখেছিল। الم اقل -এর মধ্যে همزه টি হলো انكاری যা হরফে নফীর উপর প্রবেশ করেছে। তাই এটা اثبات وتقرير -এর ফায়দা দিবে।

☆☆☆

وَاعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ تَدُلُّ عَلٰى شَرْفِ الْاِنْسَانِ وَمَزِيَّةِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهٖ عَلَى الْعِبَادَةِ وَاَنَّهٗ شَرْطٌ فِي الْخِلَافَةِ بَلِ الْعَمْدَةُ فِيْهَا وَاَنَّ التَّعْلِيْمَ يَصِحُّ اِسْنَادُهٗ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ لَمْ يَصِحَّ اِطْلَاقُ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهٖ بِمَنْ يَحْتَرِفُ بِهٖ وَاَنَّ اللُّغَاتِ تَوْقِيْفِيَّةٌ فَاِنَّ الْاَسْمَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْاَلْفَاظِ بِخُصُوْصٍ اَوْ عُمُوْمٍ وَتَعْلِيْمُهَا ظَاهِرٌ فِيْ اِلْقَائِهَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مُبَيِّنًا لَهٗ مَعَانِيْهَا وَذَالِكَ لَيَسْتَدْعِيْ سَابِقَةَ وَضْعٍ وَالْاَصْلُ يَنْفِيْ اَنْ يَكُوْنَ ذَالِكَ الْوَضْعَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَ اٰدَمَ فَيَكُوْنُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنَّ مَفْهُوْمَ الْحِكْمَةِ زَائِدَةٌ عَلٰى مَفْهُوْمِ الْعِلْمِ وَاِلَّا لَتَكَرَّرَ قَوْلُهٗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. وَاَنَّ عُلُوْمَ الْمَلَائِكَةِ

وَكَمَالَاتِهِمْ تَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالْحُكَمَاءُ مَنَعُوْا ذَالِكَ فِي الطَّبْقَةِ الْأَعْلٰى مِنْهُمْ وَحَمَلُوْا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ وَأَنَّ اٰدَمَ أَفْضَلُ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَالْأَعْلَمُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ. وَأَنَّهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ حُدُوْثِهَا

অনুবাদ:

তুমি জেনে রাখো যে, এই আয়াতগুলো (অর্থাৎ اذ قال ربك انى جاعل فى الأرض خليفة থেকে وما كنتم تكتمون পর্যন্ত আয়াতসমূহ নয়টি বিষয়ের) উপকারিতা দান করে। (১) মানুষ শ্রেষ্ঠ জাতি। (২) ইবাদত থেকে ইলম উত্তম। (৩) খেলাফতের জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত বরং খেলাফতের স্তম্ভ। (৪) আল্লাহ তা'লার দিকে শিক্ষাদানের সম্বন্ধকরণ বৈধ। যদিও তাঁকে শিক্ষক বলা অবৈধ। কেননা, শিক্ষক কেবল তাকেই বলে যে জ্ঞানকে তার পেশা বানিয়ে নেয়। (৫) ভাষা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। (৭) ফেরেশতাদের ইলম ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। (৮) আদম এই সকল ফেরেশতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা, তিনি ফেরেশতাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। আর যিনি অধিক জ্ঞানী হন তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। দলীল: আল্লাহ তা'লা বাণী هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون "যারা জানে ও যারা জানে না তারা উভয়ে কি সমান?" (৯) আল্লাহ তা'লা প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তার সৃষ্টির পূর্বে।

☆☆☆

﴿وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾

السوال: (الف) ما معنى السجدة لغة وشرعا وما المراد بها ههنا ؟

(ب) اللام فى قوله تعالى لادم لاى معنى وما معنى الاباء وما الفرق بين الاستكبار والتكبر

(ج) ابليس اللعين من الملائكة أم من الجن ؟ على الاول يخالف قوله تعالى وكان من الجن وعلى الثانى لايكون مخاطبا للسجدة فكيف اللعنة الى يوم الدين ؟

(د) هل يجوز سجدة التحية للمشائخ تمسكا بهذه القصة وبقصة اخوة يوسف ؟ رجح مختارك

(ه) كيف جاز السجود لادم مع انه لايجوز لغيره تعالى ؟

উত্তর: الف : معنى السجدة لغة (সিজদার আভিধানিক অর্থ) ঃ সিজদার আভিধানিক অর্থ হল নতশীরে বিনয়ী হওয়া। যেমন দু'জন কবির নিম্নোক্ত পংক্তি দু'টির মধ্যে সিজদা শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পংক্তি ترى الاكم فيه سجدا للحوافر "তুমি টিলাকে দেখবে, সে ঘোড়ার সামনে অবনত মস্তকে বিনয়াবনত রয়েছে।" এতে سجدا শব্দটি ساجد -এর বহুবচন। যা নতশীরে বিনীয় হওয়ার অর্থ প্রদান করেছে। দ্বিতীয় পংক্তি– وقلن له اسجد لليلى فاسجدا "সে সকল নারীগণ (উষ্ট্রি) -কে বল, তুমি লায়লার সামনে নিজের মস্তক অবনত কর। তখন উষ্ট্রি তার মস্তক অবনত করল।"

وضع الجبهة على قصد العبادة مطلقا معنى السجدة اصطلاحا (সিজদার পারিভাষিক অর্থ) : অর্থাৎ বন্দেগীর অভিপ্রায়ে আপন মস্তক ভূমিতে লুটিয়ে দেয়াকে সিজদা বলে।

معنى اللام في قوله تعالى: لادم : ب (আল্লাহর বাণী لادم -এর মধ্যে لام -এর অর্থ) : অত্র আয়াতে لادم -এর لام হরফটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. الى -এর অর্থে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা আদমের দিকে মুখ করে (আমাকে) সিজদা কর।"

২. سبب বা কারণ বর্ণনার্থে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, "তোমরা আদমের কারণে আমাকে সিজদা কর।" অর্থাৎ ফিরিশতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল হযরত আদম (আ.)।

معنى الاباء (اباء -এর অর্থ) : আল্লামা বায়যাবী (র.) اباء -এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– الاباء امتناع باختيار অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা।

الفرق بين التكبر والاستكبار (تكبر ও استكبار -এর মধ্যে পার্থক্য) : تكبر অর্থ নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা। আর استكبار অর্থ অহংকারকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, تكبر অর্থ অন্যকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা। আর استكبار অর্থ অহংকারকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করা। অর্থাৎ استكبار -এর জন্য নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করার প্রয়োজন নেই।

ابليس اللعين من الملائكة أم من الجن : ج (ইবলিস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল , না জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল?) : এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ মুফস্সিরীনের মতে, ইবলিস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল। দলীল আল্লাহ তা'লার বাণী فسجدوا الا ابليس কেননা, ইবলিস যদি ফিরিশতাদের অন্তর্গত না থাকত, তাহলে সে সিজদার আদিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হত না এবং তাকে ملائكة থেকে استثناء করা বিশুদ্ধ হত না। এ দাবীর উপর আল্লাহর বাণী وكان من الجن -এর সাথে সংঘর্ষ হয়। কেননা, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবলীস জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর জবাব হল, ইবলীস সত্তাগতভাবে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আকৃতিগত অর্থাৎ আমলের দিক থেকে জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল। ইলীস যে ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল তার দ্বিতীয় দলীল হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফিরিশতা দুই প্রকার। এক প্রকারের ফিরিশতা এমন রয়েছে, যারা বংশ বিস্তার করে। এদেরকে জ্বিন বলা হয়। ইবলীস এধরনের ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় প্রকারের ফিরিশতা হল, যারা বংশ বিস্তার করে না। সুতরাং এই আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, জমহুর মুফাস্সিরীনের মতে, ইবলীস জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল।

২. হযরত হাসান বসরী, ক্বাতাদা এবং কিছুসংখ্যক মুফাস্সিরীনের মতে, ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল না বরং জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল। তবে সে ফিরিশতাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়। যেহেতু হাজার হাজার ফিরিশতাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সে অস্তিত্বহীনের পর্যায়ে ছিল। তাই প্রাধান্যতার ভিত্তিতে তাকে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত করে তাকেও সিজদার আদেশ করা হয়েছে।

এখন জমহুরের উপর প্রশ্ন হল, আপনারা তো ইবলীসকে ফিরিশতাদের অন্তর্গত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের সম্পর্কে বলেন, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون এ আয়াতের দাবী হল ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ। তাই জমহুরের মাযহাব এবং আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত

হয়।

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ একথা সংখ্যাধিক্য হিসেবে। কেননা, ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন রয়েছে যারা সত্তগতভাবে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমলের দিক থেকে জ্বিন জাতির অন্তর্গত নয়। কাজেই তারা নিষ্পাপ একথাটি সংখ্যাধিক্যতা হিসেবে বলা হয়ে থাকে। যেভাবে মানুষের মাঝে যারা নবী তারা নিষ্পাপ। কিন্তু এতে সকল মানুষ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হয়না। এরকম ফিরিশতাদের বিষয়টিও বুঝে নাও।

২ : حكم سجدة التحية (সম্মানসূচক সিজদার বিধান) ঃ

সিজদা দুই প্রকার। (ক) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা এবং (খ) সম্মানসূচক সিজদা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা কোন কালে কোন উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। কেননা, এটা কুফুর ও শিরক। আর সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। অতএব ফিরিশতাদের কর্তৃক আদমকে সিজদা করা এবং ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইদের কর্তৃক ইয়সুফকে সিজদা করা সম্মানসূচক সিজদা ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। উভয় প্রকার সিজদার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, ইবাদতের সিজাদ কুফুর আর সম্মানসূচক সিজদা হারাম। সুতরাং আদম (আ.) -কে ফিরিশতাদের সিজদা করা এবং ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা ইয়সুফকে সিজদা করার ঘটনাকে দলীল বানিয়ে পীর-বুযুর্গকে সম্মানসূচক সিজদা বৈধ হবে না। আর এটাই পছন্দনীয় অভিমত।

৩ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা অবৈধ হওয়া সত্ত্বে আদমকে সিজদা করার কারণ ঃ প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নেই। তাহলে আদমকে সিজদা করা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার নামান্তর। অথচ এটা অবৈধ ?

এর উত্তর হল, আয়াতের মধ্যে সিজদা দ্বারা আভিধানিক সিজদাও উদ্দেশ্য হতে পারে আবার শরয়ী সিজদাও হতে পারে। যদি সিজদা দ্বারা শরয়ী সিজদা উদ্দেশ্য হয় তাহলে مسجود (সিজদাকৃত) হবেন আল্লাহ তা'লা। অর্থাৎ ফিলিশতারা আল্লাহকেই সিজদা করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে তোমরা আদমের দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা কর। অতএব আদম (আ.) ফিরিশতাদের সিজদার কিবলা বটে। যেভাবে আমরা কা'বার দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা করে থাকি। অথবা সিজদার নির্দেশ যেহেতু আল্লাহ তা'লা স্বয়ং দিয়েছেন; অতএব এটা سجده لغير الله ছিল না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সিজদা করা হয়েছিল। আর যদি সিজদা দ্বারা سجده لغوى উদ্দেশ্য হয় তাহলে আদমকে সিজদা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (ক) আদমের সম্মানার্থে তার সামনে নতশীকার কর। যেভাবে ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা তাঁর সামনে নতশীকার করে ছিল। কেননা, সিজাদর আভিধানিক অর্থ নতশীকার করা। (খ) আদমের জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিতে তার অনুগত হয়ে যাও এবং সর্বদা এগুলোর চেষ্টার জন্য প্রস্তুত থাক।

☆☆☆

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

اَلسُّكْنٰى مِنَ السُّكُوْنِ لِاَنَّهَا اِسْتِقْرَارٌ وَلُبْثٌ وَ(اَنْتَ) تَاكِيْدٌ اُكِّدَ بِهِ الْمُسْتَكِنُّ لِيَصِحَّ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَاطِبْهُمَا اَوَّلًا تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ بِالْحُكْمِ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ تَبْعٌ لَهُ وَالْجَنَّةُ دَارُ الثَّوَابِ لِاَنَّ اللَّامَ لِلْعَهْدِ وَلَا مَعْهُوْدَ غَيْرُهَا وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ قَالَ: اِنَّهَا بُسْتَانٌ كَانَ بِاَرْضِ فِلِسْطِيْنَ اَوْ بَيْنَ فَارِسَ وَكِرْمَانَ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِمْتِحَانًا لِاٰدَمَ وَحَمَلَ الْاِحْبَاطَ عَلَى الْاِنْتِقَالِ مِنْهُ اِلٰى اَرْضِ الْهِنْدِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى: اِهْبِطُوْا مِصْرًا

অনুবাদ:

(اسكن ফে'লটি سكنى থেকে নির্গত। سكنى অর্থ বাসস্থান বানানো। আর) سكنى শব্দটি سكون থেকে নির্গত। (مشتق منه ও مشتق -এর মধ্যে) সামঞ্জস্য বিধান হলো, سكون -এর অর্থ হলো স্থির থাকা। انت হলো এমন তাকীদ যা اسكن -এর মধ্যকার ضمير مستتر -এর দৃঢ়তা বুঝাচ্ছে যাতে তার উপর (زوجك) -এর عطف বিশুদ্ধ হয়। (কেননা, ضمير مرفوع متصل -এর উপর عطف করার জন্য শর্ত হলো ضمير مرفوع منفصل -এর মাধ্যমে তার তাকীদ নেওয়া। অন্যথায় عطف বিশুদ্ধ হবে না)। (প্রশ্ন: আল্লাহ তা'লা আদম ও হাওয়া উভয়কে একত্রে সম্বোধন করেননি কেন? অর্থাৎ يا ادم وحواء اسكنا الجنة এভাবে বলেননি কেন? যেমন পরবর্তী আয়াতে উভয়কে একত্রে সম্বোধন করে وكلا منها رغدا الخ বলেছেন। উত্তর:) উভয়কে একত্রে সম্বোধন না করে এ দিকে সতর্ক করেছেন যে, এখানে আদেশ দ্বারা আদমই উদ্দেশ্য আর তার معطوف তথা زوجك হলো তার تابع (অনুবর্তী)।

جنة দ্বারা دار الثواب উদ্দেশ্য। কেননা, (الجنة -এর আলিফ-লামটি استغراق -এর জন্য হতে পারে না। কেননা, সমস্ত জান্নাতে বসবাস করা আদমের জন্য সম্ভব নয়। কাজেই) তার আলিফ-লামটি عهدى -এর জন্য। আর دار الثواب ব্যতীত কোন معهود নেই। (তাই জান্নাত দ্বারা دار الثواب উদ্দেশ্য হবে)।

যাদের মতে, জান্নাত এখনো সৃষ্টি করা হয়নি তারা বলেন যে, এখানে জান্নাত দ্বারা دار الثواب উদ্দেশ্য নয়; বরং ফিলিস্তিন কিংবা কিরমানের মধ্যস্থ এক বাগান উদ্দেশ্য, যে বাগানটিকে আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছিলেন আদমকে পরীক্ষা করার জন্য। আর اهباط (অবতরণ করার) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই বাগান থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। যেমন অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা বলেন اهبطوا مصرا (এখানে اهباط যার অর্থ হলো উপর থেকে নিচে নামা। এর দ্বারা স্থানান্তরিত হওয়া উদ্দেশ্য)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, পূর্ব থেকেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলার মতে, এখনো সৃষ্টি হয় নাই। বরং কিয়ামতের দিন সৃষ্টি হবে। তাই তাদের মতে, এখানে জান্নাত দ্বারা دار الثـــواب উদ্দেশ্য নয়; বরং আদমকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে এক বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল এই বাগানটিই এখানে উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾

وَاسِعًا رَافِهًا صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوْفٍ

অনুবাদ:

"তোমরা উভয়ে এই জান্নাত থেকে নিষেধাজ্ঞা ব্যতীরেকে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করো"। رغـد : এটা উহ্য মাসদারের সিফাত হয়েছে। (মূল ইবারতঃ اكــلا رغـدا ছিল। رغـد : এর অর্থ- পরিতৃপ্ত হওয়া)।

☆☆☆

﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾

أَىْ مَكَانٌ مِنَ الْجَنَّةِ شِئْتُمَا وَسَّعَ الْأَمْرَ عَلَيْهِمَا اِزَاحَةً لِلْعِلَّةِ وَالْعُذْرِ فِى التَّنَاوِلِ مِنَ الشَّجَرِ الْمَنْهِى عَنْهَا مِنْ بَيْنِ أَشْجَارِهَا الْفَائِتَةِ لِلْحَصْرِ

অনুবাদ:

"জান্নাতের যে কোন স্থান থেকে চাও"। আদম ও হাওয়া উভয়ের জন্য আহারের বিষয়কে সহজ করে দেয়া হয়েছে যাতে তারা এ বিষয়ে ওযর পেশ করতে না পারে যে, আমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলাম খাবারের কোন কিছু না পাওয়ার কারণে।

☆☆☆

﴿وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

السوال: (الف) فسر الاية الكريمة

(ب) بين مسئلة عصمة الانبياء عليهم السلام مدللا

الف : **উত্তর: আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর ঃ**

উল্লেখিত আয়াতে নিষিদ্ধ গাছের নিকটে যেতে বারণ করা হয়েছে। অথচ নিকটে যাওয়া তো নিষেধ

নয়; বরং গাছের ফল খাওয়া নিষেধ। অতএব আয়াতের মর্ম হল, তুমি গাছের ফল খাওয়া তো দূরে থাক; গাছের ধারে-কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নিষিদ্ধ গাছটি কি ? আয়াতে যে গাছের নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই গাছ দ্বারা কোন্ গাছ উদ্দেশ্য এসম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

১. গম গাছ।

২. আঙ্গুর গাছ।

৩. তীন গাছ।

ب : عصمة الانبياء (নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া) ঃ আদম (আ.) -কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.) -এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, নবীগণ (আ.) -কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দ্বীন ও শরীয়তের স্থান কোথায় ? অবশ্য কুরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.) -এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মতি অভিমত হল, কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবী জেনে-শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটিকে শরীয়তের পরিভাষায় পাপ বলা চলে না। এ ধরনের ভুল ত্রুটি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দরবারে নবীগণের স্থান ও মর্যাদা যেহেতু অত্যন্ত উচ্চে এবং মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়। সেহেতু কুরআনে ও হাদীসে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

☆☆☆

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾

أَصْدَرَ زِلَّتَهُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ وَحَمَلَهُمَا عَلَى الزَّلَّةِ بِسَبَبِهَا وَنَظِيْرُهُ عَنْ هٰذِه فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِىْ. أَوْ أَزَلَّهُمَا عَنِ الْجَنَّةِ بِمَعْنٰى أَذْهَبَهُمَا وَيَعْضُدُهُ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ فَأَزَالَهُمَا وَهُمْ يَتَقَارَبَان فِي الْمَعْنٰى غَيْرَ أَنَّ اَزَلَّ يَقْتَضِىْ عُثْرَةً مَعَ الزَّوَالِ وَاِزْلَالُهُ قَوْلُهُ: هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَايَبْلٰى. وَقَوْلُهُ: مَانَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِه الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ. وَمُقَاسَمَتُهُ اِيَّاهُمَا بِقَوْلِه: اِنِّى لَكُمَا مِنَ النَّصِحِيْنَ. وَاخْتُلِفَ فِيْ أَنَّهُ تَمَثَّلَ لَهُمَا فَقَاوَلَهُمَا بِذَالِكَ أَوْ أَلْقَاهُ اِلَيْهَا عَلٰى طَرِيْقِ الْوَسْوَسَةِ وَأَنَّهُ كَيْفَ تَوَصَّلَ اِلٰى اِزْلَالِهِمَا بَعْدَ مَا قِيْلَ لَهُ: أُخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ. فَقِيْلَ اِنَّهُ مُنِعَ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلٰى جِهَةِ التَّكْرِمَةِ كَمَا كَانَ يَدْخُلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يُمْنَعْ أَنْ يَدْخُلَ لِلْوَسْوَسَةِ اِبْتِلَاءً لِاٰدَمَ وَحَوَاءَ وَقِيْلَ قَامَ عِنْدَ الْبَابِ فَنَادَاهُمَا وَقِيْلَ تَمَثَّلَ بِصُوْرَةِ دَابَّةٍ فَدَخَلَتْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْخَزَنَةُ وَقِيْلَ دَخَلَ فِيْ فَمِ الْحَيَّةِ حَتّٰى دَخَلَتْ بِهِ وَقِيْلَ أَرْسَلَ بَعْضَ اَتْبَاعِهِ فَأَزَلَّهُمَا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

অনুবাদ:

(এখানে عن টি سببيه বা কারণ বর্ণনার্থে। আর ها ضمير টি বৃক্ষের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে) শয়তান বৃক্ষের কারণে আদম ও হাওয়া উভয়ের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হলো, وما فعلته عن امرى (এর মধ্যেও عن টি سببيه) অথবা (ها ضمير -এর مرجع হলো জান্নাত। আর عن টি بعد ومجاوزة তথা দূরবর্তী ও অতিক্রম অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ হলো) তারা উভয়কে জান্নাত থেকে দূর করে দিল। কারী হামযা'র কেরাত ازالهما এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। (যার অর্থ হলো দূরীভূত করা)। ازل এবং ازال উভয়টি অর্থের দিক দিয়ে কাছাকাছি। তবে ازل টি زوال -এর সাথে পদস্খলন হওয়া বুঝায়।

শয়তান কিভাবে আদম ও হাওয়া এর বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল? শয়তান তারা উভয়ের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে তার বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে। যেমন: (১) هل ادلك على شجرة الخلد وملك لايبلى -এর মাধ্যমে। (যার অর্থ হলো, শয়তান বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?) (২) مانهكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা একারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী)। শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে কসম খেয়েও বললোঃ انى لكما من

النصحين "আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।"

এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, শয়তান কি আদম ও হাওয়া উভয়ের সামনা-সামনি হয়ে কথোপকথন করেছিল না তাদের অন্তরে কুমন্ত্রনা ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে। আর এ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে যে, শয়তানকে اخرج منها فانك رجيم বলে জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর সে কি করে তাদেরকে পদস্খলিত করার জন্য তাদের কাছে পৌঁছেছিল? সুতরাং কেউ কেউ বলেন, সে ফেরেশতাদের সাথে যেভাবে সম্মানের সহিত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারতো সেভাবে প্রবেশ করা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। আদম ও হাওয়াকে পরীক্ষা করার জন্য কুমন্ত্রনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বেহেশতে প্রবেশ করা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়নি। (কেননা, এ প্রবেশ লাঞ্চনাকর প্রবেশ। চুর যেমন ঘরে প্রবেশ করে)। কেউ কেউ বলেন, শয়তান জান্নাতের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আহবান করেছিল। (অতঃপর কুমন্ত্রনা দিয়ে পদস্খলিত করেছে)। কেউ কেউ বলেন, সে কোন এক প্রাণীর আকৃতি ধারন করে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। যার ফলে জান্নাতের পাহারাদার তাকে পরিচয় করতে পারেননি। কেউ বলেন, একটি সাঁপের মুখে প্রবেশ করে ঐ সাঁপটি তাকে জান্নাতে নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আবার অন্যান্যরা বলেন, শয়তান তার কতেক অনুসারীদেরকে প্রেরণ করে তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহরই নিকট।

☆☆☆

﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ﴾

مِنَ الْكَرَامَةِ وَالنَّعِيْمِ (وَقُلْنَا اهْبِطُوْا) خِطَابٌ لِأَدَمَ وَحَوَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى: قَالَ اهْبِطَا جَمِيْعًا. وَجُمِعَ الضَّمِيْرُ لِأَنَّهُمَا أَصْلًا لِإِنْسٍ فَكَأَنَّهُمَا الْجِنْسُ كُلُّهُمْ أَوْ هُمَا وَإِبْلِيْسُ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَانِيًا بَعْدَ مَا كَانَ يَدْخُلُهَا لِلْوَسْوَسَةِ أَوْ دَخَلَهَا مُسَارَقَةً أَوْ مِنَ السَّمَاءِ (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ) حَالٌ اِسْتَغْنٰى فِيْهَا عَنِ الْوَاوِ بِالضَّمِيْرِ وَالْمَعْنٰى مُتَعَادِّيْنَ يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ بِتَضْلِيْلِهِ (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ) مَوْضِعُ اِسْتِقْرَارٍ (وَمَتَاعٌ) تَمَتُّعٌ (اِلٰى حِيْنٍ) يُرِيْدُ بِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوِ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ:

অতঃপর শয়তান তাদেরকে যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে বের করে দিল। অর্থাৎ তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। وقلنا اهبطوا "আর আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও"। এর দ্বারা আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। যার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'লার বাণী قال اهبطا جميعا (এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আদম ও হাওয়া তো দু'জনই ছিলেন। তাহলে اهبطوا বহুবচনের সীগাহ্ ব্যবহার করা

হলো কিভাবে? উত্তর:) বহুবচনের যমীর ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হলো, তারা উভয়ে ছিলেন মানব জাতির মূল। কাজেই তারা দু'জনই যেন সমগ্র মানব জাতি। অথবা اهبطوا দ্বারা আদম, হাওয়া ও ইবলিসকে সম্বোধন করা হয়েছে। সে কুমন্ত্রনা দেয়ার জন্য অথবা চুরি করে প্রবেশ করার পরে (আদম ও হাওয়া'র সাথে) তাকে দ্বিতীয়বার জান্নাত থেকে বের করা হয়।

بعضكم لبعض عدو "তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে"। এ বাক্যটি (اهبطوا -এর যমীর থেকে) حال হয়েছে। তাতে ذوالحال -এর যমীর (كم) বিদ্যমান থাকায় واو আনার প্রয়োজন পড়েনি।

ولكم فى الأرض مستقر "আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানস্থল হবে"। ومتاع الى حين "এবং কিছুকাল উপভোগ করতে হবে"। এর দ্বারা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের সময়কাল উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

السوال: (الف) ترجم الاية الكريمة

(ب) اذكر الكلمات التى تلقاها ادم عليه السلام من ربه

(ج) معنى التوبة الاعتراف بالذنب والندم عليه فكيف وصف الله نفسه بالتواب وما فائدة الجمع بين الوصفين التواب والرحيم ؟

(د) ان الظاهر من الاية ان الله تعالى تاب على ادم عليه السلام فما بال حواء ؟

উত্তর: الف : ترجمة الاية الكريمة (আয়াতের অনুবাদ) ঃ

অতঃপর হযরত আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমতাশীল ও অসীম দয়ালু।

ب : الكلمات التى تلقاها ادم عليه السلام (আদম আ. -এর শেখা বচনাবলী) ঃ

হযরত আদম (আ.) শয়তানের প্রবঞ্চনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতারিত করা হয়। এতে হযরত আদম (আ.) চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু নবী সুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চালিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। বরং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এ করুন অবস্থা দেখে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা প্রার্থনা নীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন শিখিয়ে দিলেন। সে বচনগুলো কি ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তা পেশ করা হল—

১. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, এসম্পর্কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল সেই বচনগুলো ছিল এই— ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين আল্লামা ইবনে জারীর বলেন, এ অভিমতটি اوفق بالقران

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত যে, সেই বচনগুলো ছিল এই—
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت ظلمت نفسى فاغفرلى انه لايغفر الذنوب الا انت

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত আছে, কথাগুলো ছিল–

يا رب الم تخلقني بيدك ؟ قال بلى قال يا رب الم تنفخ فيَّ الروح من روحك ؟ قال بلى قال الم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال بلى قال الم تسكني جنتك ؟ قال بلى قال يا رب ان تبت واصلحت اراجعي انت الى الجنة ؟ قال نعم

অর্থ : হে প্রভূ ! তুমি কি আমাকে তোমার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করনি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রভূ ! তুমি কি আমার মাঝে তোমার রূহ ফুঁকে দেও নি? আল্লাহ বললেন হ্যাঁ। আদম বললেন, তোমার দয়া কি তোমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়নি? আল্লাহ বললে হ্যাঁ। আদম বললেন, তুমি কি আমাকে জান্নাতে বসবাস করাও নি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আদম বললেন, যদি আমি তাওবা করি এবং পরিশুদ্ধি লাভ করি, তবে কি পুনরায় আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে দিবে? আল্লাহ বললেন হ্যাঁ।

نسبة التوبة الى الله تعالى : ج (আল্লাহ তা'লার সাথে তাওবার সম্বন্ধ) :

এ আয়াতে আল্লাহর সাথে তাওবার সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে فتاب عليه । অথচ তাওবা বলা হয় নিজের অপরাধ স্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে এধরনের অপরাধ না করার দৃঢ় প্রত্যয় করা। তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তাওবার সম্বন্ধ কিভাবে করা হল ?

উত্তর: এপ্রসঙ্গে একটি নীতিমালা হল, বান্দার সঙ্গে যখন তাওবার সম্বন্ধ হবে, তখন তাওবার অর্থ হবে অপরাধ থেকে ফিরে আসা। আর যখন আল্লাহর সঙ্গে তাওবার সম্বন্ধ হবে, তখন তার অর্থ হবে তাওবা গ্রহণ করা। সুতরাং আর কোন প্রশ্ন থাকল না।

تواب ও رحيم এ দু'টি গুণ সমন্বয় করার উপকারিতা :

আয়াতের মধ্যে تواب (তাওবা গ্রহণকারী) ও رحيم (অতিশয় দয়ালু) এ দু'টি গুণ সমন্বয় করার রহস্য হল, যাতে পাপী বান্দা আল্লাহর করুনা থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ে। কারণ, تواب অর্থে ক্ষমা করার ও رحيم অর্থে করুনা করার অঙ্গীকার রয়েছে।

১ :তাওবার মধ্যে হযরত হাওয়া (আ.) -এর অন্তর্ভুক্তি :

নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) উভয়ই আল্লাহর কাছে অপরাধী বলে সাব্যস্ত ছিলেন। ফলে তারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং উভয়ের তাওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছিল। তা সত্ত্বে অত্র আয়াতে শুধুমাত্র আদম (আ.) -এর তাওবার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হাওয়া (আ.) -এর প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন–

১. হযরত হাওয়া (আ.) বিধানের ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.) -এর অনুগামী ছিলেন। নারী জাতি বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ জাতির অনুগামী বিধায় কুরআন ও হাদীসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের আলোচনা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এমনিতেই তারা হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২. এ সূরায় হযরত হাওয়া (আ.) -এর প্রসঙ্গ না আসলেও সূরা আ'রাফের এক আয়াতে হযরত হাওয়া (আ.) -এর আলোচনা এসেছে। আয়াতটি হল– قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين কাজেই অত্র সূরায় হাওয়ার প্রসঙ্গ না আসলেও তিনি বিধানের ক্ষেত্রে আদম (আ.) -এর অনুগামী হবেন। فلا اعتراض ولا اشكال

﴿قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا﴾

كَرَّرَ لِلتَّاكِيْدِ أَوْ لِإِخْتِلَافِ الْمَقْصُوْدِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ دَلَّ عَلٰى أَنَّ هُبُوْطَهُمْ اِلٰى دَارِ بَلِيَّةٍ يَتَعَادَوْنَ فِيْهَا وَلَا يَخْلُدُوْنَ وَالثَّانِيْ أَشْعَرَ بِأَنَّهُمْ اَهْبَطُوْا لِلتَّكْلِيْفِ فَمَنِ اهْتَدٰى الْهُدٰى نَجٰى وَمَنْ ضَلَّهُ هَلَكَ وَالتَّنْبِيْهُ عَلٰى أَنَّ مُخَافَةَ الْإِهْبَاطِ الْمُقْتَرِنِ بِأَحَدِ هٰذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ لِلْحَازِمِ أَنْ تَعُوْقَهُ عَنْ مُخَافَةِ حُكْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَيْفَ بِالْمُقْتَرِنِ بِهِمَا وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَفٰى بِهِ نَكَالًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ وَقِيْلَ الْأَوَّلُ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالثَّانِيْ مِنْهَا اِلَى الْأَرْضِ وَهُوَ كَمَا تَرٰى وَ''جَمِيْعًا'' حَالٌ فِي اللَّفْظِ تَاكِيْدٌ فِي الْمَعْنٰى كَأَنَّهُ قِيْلَ اِهْبِطُوْا أَنْتُمْ أَجْمَعُوْنَ وَلِذَالِكَ لَا يَسْتَدْعِيْ اِجْتِمَاعُهُمْ اِلَى الْهُبُوْطِ فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِكَ: جَاؤُوْا جَمِيْعًا

অনুবাদ:

(জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ) পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে তাকীদের উদ্দেশ্যে অথবা উভয় নির্দেশের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে। কেননা, প্রথম নির্দেশটি একথা বুঝাচ্ছে যে, তারা এমন পরীক্ষা ঘরে অবতরণ করবে যেখানে তারা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে না। আর দ্বিতীয় নির্দেশটি একথা বুঝাচ্ছে যে, তাদেরকে অবতরণ করানো হয়েছে মুকাল্লাফ বানানোর জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না সে পথভ্রষ্ট হবে। আর একথার উপরও সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যে, পরস্পর শত্রুতামী এবং মুকাল্লাফ বানানো যে কোন একটির সাথে অবতরণ করানোর একমাত্র ভয়-ভীতি সচেতন মানুষকে আল্লাহ তা'লার হুকুমের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উভয়টির সাথে ভয়-ভীতি আরো উত্তমরূপে যথেষ্ট হবে। তথাপি আদম ভুলে গেলেন এবং আমি তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পায়নি। তাছাড়া (অবতরণের নির্দেশ দু'বার এসেছে) এ কথার প্রতি সতর্ক করে দেয়ার জন্য যে, এই দুই নির্দেশের প্রত্যেকটি যে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম নির্দেশটি হলো জান্নাত থেকে পৃথিবীর আকাশের দিকে অবতরণের জন্য। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করার জন্য। তবে এ অভিমতটি যে দুর্বল তা তুমি দেখতে পাচ্ছো। (কেননা, هبوط শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীতে অবতরণ করা। কিন্তু প্রথম অবতরণ দ্বারা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা উদ্দেশ্য নিলে هبوط শব্দের অর্থের সাথে মিল থাকে না। আর দ্বিতীয় অবতরণ দ্বারা পৃথিবীতে অবতরণ করা উদ্দেশ্য নিলে منها -এর যমীরের সাথে মিল থাকে না। কেননা, منها -এর যমীরের مرجع আকাশ নয়; বরং জান্নাত)। جميعا : এটা لفظا হাল আর معنى তাকীদ। যেমন এভাবে বলা হয়েছে। اهبطوا انتم اجمعون "তোমরা সবাই অবতরণ করো"। এটা معنى তাকীদ হওয়ার কারণে একই সময়ে অবতরণকে চায় না। যেমন তোমার উক্তি جاؤوا جميعا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قلنا اهبطوا جميعا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)- এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে এ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শাস্তিমূলক। সেই জন্যই তার সাথে সাথে মানবের শত্রুতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক-খলীফা হিসেবে।

☆☆☆

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

وَالشَّرْطُ الثَّانِىْ مَعَ جُوَابِه جُوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَ(مَا) مَزِيْدِيَّةٌ أُكِّدَتْ بِه وَلِذَالِكَ حَسُنَ تَاكِيْدُ الْفِعْلِ بِالنُّوْنِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَعْنَى الطَّلَبِ وَالْمَعْنٰى اَنْ يَّأْتِيَكُمْ مِنِّىْ هُدًى بِاِنْزَالٍ أَوْ اِرْسَالٍ فَمَنْ تَبِعَهُ مِنْكُمْ نَجَا وَ فَازَ وَاِنَّمَا جِئَ بِحَرْفِ الشَّكِّ وَاِتْيَانُ الْهُدٰى وَلَمْ يُضْمِرْ لِاَنَّهُ اَرَادَ بِالثَّانِىْ اَعَمَّ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا اَتٰى بِهِ الرُّسُلُ وَاقْتَضَاهُ الْعَقْلُ أَىْ فَمَنْ تَبِعَ مَا أَتَاهُ مُرَاعِيًا فِيْهِ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَضْلًا مِنْ أَنْ يَحِلَّ لَهُمْ مَكْرُوْهٌ وَلَا هُمْ يَفُوْتُ عَنْهُمْ مَحْبُوْبٌ فَيَحْزَنُوْا عَلَيْهِ وَالْخَوْفُ عَلَى الْمُتَوَقَّعِ وَالْحُزْنُ عَلَى الْوَاقِعِ نَفٰى عَنْهُمُ الْعِقَابَ وَأَثْبَتَ لَهُمُ الثَّوَابَ عَلٰى أَكَدِّ وَجْهٍ وَاَبْلَغِهِ وَقُرِئَ هَدٰى عَلٰى لُغَةِ هُذَيْلٍ وَلَاخَوْفَ بِالْفَتْحِ

অনুবাদ:

(شرطيه টি من এর- فمن ।অনুবাদ

(شرطيه টি من -এর মধ্যে فمن । দ্বারা গঠিত ما زائده এবং ان شرطيه টি اما) দ্বিতীয় শর্ত ما এর- اما । جزاء (এর- فاما يأتينكم الخ তথা) সহ প্রথম শর্তের جزاء তার (فمن تبع الخ তথা) হলো زائده এর দ্বারা ان شرطيه -এর তাকীদ নেওয়া হয়েছে। ما তাকীদ হওয়ার কারণে يأتينكم ফে'লকে নূন দ্বারা তাকীদ নেওয়া উত্তম হয়েছে। যদিও তার মধ্যে طلب -এর অর্থ নেই। (অর্থাৎ অধিকাংশ সময় সেই ফে'লের সাথে নূন তাকীদ আসে যে ফে'লের মধ্যে طلب -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। যেমন قسم. استفهام. نهى. امر ইত্যাদি। এখানে يأتين ফে'লকে নূন তাকীদের সাথে

নেওয়া হয়েছে ما تاكيده আসার কারণে)। আয়াতের অর্থ: যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কিতাব অবতীর্ণের মাধ্যমে অথবা রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েত অনুসারে চলবে, সে মুক্তি পাবে এবং সফল হবে।

(**প্রশ্ন:** এখানে ان -এর স্থলে اذا আসাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা, اذا সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে আসে যার প্রকাশ পাওয়াটা নিশ্চিত। আর ان আসে যার প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকে। এখানে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত আসা সুনিশ্চত। বিধায় এখানে اذا আসাটা অধিক উপযুগী ছিল। তথাপি ان আসল কেন?)

(**উত্তর:**) আর حـــــرف شك (ان) ব্যবহার করা হয়েছে অথচ হেদায়েত আসাটা সুনিশ্চিত। তার কারণ হলো, প্রকৃত পক্ষে হেদায়েত আসাটা সম্ভাব্য বিষয়। তার আগমনটা যুক্তির নিরিখে আবশ্যক নয়।

(**প্রশ্ন:** আয়াতের মধ্যে هـــــدى শব্দকে দু'বার উল্লেখ করা হল কেন? দ্বিতীয়বার হেদায়েতের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ضمير এনে فمن تبعه বলা হল না কেন?)

(**উত্তর:**) هـــــدى শব্দকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে; তার যমীর নেওয়া হয়নি। কারণ, প্রথম হেদায়েতের তুলনায় দ্বিতীয় হেদায়েত দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। (প্রথম হেদায়েত দ্বারা هـــدايـــت بـــانـــزال الـكـتـب وارسـال الـرسل উদ্দেশ্য। এবং দ্বিতীয় হেদায়েত দ্বারা সেই সকল এ'তেকাদী ও আমলী বিষয় উদ্দেশ্য যেগুলো নিয়ে এসেছেন রাসূলগণ এবং সেগুলোকে বিবেকও মান্য করে। এর মর্ম হলো: যে ব্যক্তি সেই বিষয়াবলীকে অনুসরণ করবে যা তার নিকট এসেছে সাথে সাথে এগুলোকে এমনভাবে সংরক্ষণ করে, বিবেক যার সাক্ষী বহন করে। তবে তাদের না কোন ভয় থাকবে, না (কোন পছন্দনীয় বস্তু নিঃশেষ হওয়ার কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।

(الفرق بين الخوف والحزن) ঃ خوف আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حزن বলা হয় কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। এখানে তাদের থেকে সুদৃঢ়ভাবে خـــوف ও حـــزن -এর নফী করার দ্বারা আযাবের নফী করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে সওয়াবকে। হুযাইল গোত্রের নিয়মানুসারে هُـدَىٌّ পড়া হয়। এক কেরাতের মধ্যে لاخـوف (فاء যবরসহ) এসেছে।

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾

عَـطْفٌ عَـلٰى (فَمَنْ تَبِعَ) اِلٰى اٰخِرِهٖ قَسِيْمٌ لَهٗ كَاَنَّهٗ قَالَ وَمَنْ لَايَتَّبِعُ بَلْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَكَـذَّبُوْا بِاٰيَاتِهٖ اَوْ كَفَرُوْا بِالْاٰيَاتِ جِنَانًا وَكَذَّبُوْا بِهَا لِسَانًا فَيَكُوْنُ الْفِعْلَانِ مُتَوَجِّهَيْنِ اِلَـى الْـجَـارِ وَالْـمَـجْرُوْرِ وَالْاٰيَةُ فِى الْاَصْلِ اَلْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ وَيُقَالُ لِلْمَوْضُوْعَاتِ مِنْ حَيْـثُ اَنَّهَا تَدُلُّ عَلٰى وُجُوْدِ الصَّانِعِ وَعِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْاٰنِ الْـمُـتَـمَـيِّـزَةِ عَنْ غَيْرِهَا بِفَصْلٍ وَاِشْتِقَاقُهَا مِنْ اَىٍّ لِاَنَّهَا تُبَيِّنُ اَيًّا مِنْ اَىٍّ اَوْ مِنْ اَوٰى اِلَيْهِ

وَأَصْلُهَا أَيَّةٌ أَوْ أَوِيَةٌ كَثَمَرَةٍ فَأُبْدِلَتْ عَيْنُهَا أَلِفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ أَوْ أَيِيَةٍ أَوْ أَوِيَةٍ كَرَمَكَةٍ فَأُعِلَّتْ أَوْ آئِيَةٌ كَقَائِلَةٍ فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا وَالْمُرَادُ بِأَيَاتِنَا اَلْاٰيَاتُ الْمُنَزَّلَةُ أَوْ مَا يَعُمُّهَا وَالْمَعْقُوْلَةُ

অনুবাদ:

والذين كفروا الخ এ অংশটি فمن تبع هداى الخ -এর উপর معطوف হয়েছে। আল্লাহ তা'লা যেন এরকম বলেছেন, যে অনুসরণ করবে না; বরং আল্লাহর অবাধ্য হবে এবং তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করবে। অথবা আয়াতের অর্থ হলো, যারা অন্তর দ্বারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করবে এবং মুখের দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী উভয় فعل তথা كفروا ও كذبوا জার ও মাজরুরের (অর্থাৎ باياتنا) দিকে সম্বন্ধিত হবে। (আর كفروا بالايات দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অন্তরে অস্বীকার করা। আর كذبوا بالايات দ্বারা মুখ দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত করা)।

ايت শব্দের বিশ্লেষণ: ايت শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন, উজ্জ্বল প্রমাণ। এর ব্যবহার কখনো মাখলুকাতের বেলায়ও হয়ে থাকে। কেননা, মাখলুকাত আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের এবং তাঁর ইলম ও কুদরতের উপর প্রমাণ বহন করে। অনুরূপ কুরআনের সেই শব্দাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেগুলো তার ভিন্ন শব্দাবলী থেকে فاصله -এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র হয়। اية শব্দটি اى থেকে নির্গত। (যা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়)। (مشتق منه ও مشتق -এর মধ্যে) সামঞ্জস্য হলো, এক আয়াত অপর আয়াত থেকে পৃথক হয়ে থাকে। অথবা اوى اليه থেকে উৎকলিত (যার অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা)। (যদি اية শব্দটি اى থেকে নির্গত হয়, তবে তার মূল হবে اية অথবা اوية – ثمرة -এর মত। নিয়মের বিপরীত عين كلمه -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। অথবা ايية -এর কিংবা اوية ছিল– رمكة -এর ওযনে। তাতে তা'লীল করা হয়েছে (باع ও قال -এর নিয়মানুসারে)। অথবা قائلة -এর ওযনে ائية ছিল। হামযাকে تخفيفا হযফ করে দেয়া হয়েছে।

اياتنا দ্বারা উদ্দেশ্য: (আলোচ্য আয়াতে اياتنا দ্বারা) নাযিলকৃত আয়াতসমূহ উদ্দেশ্য। অথবা তার দ্বারা ব্যাপক বিষয় উদ্দেশ্য। তাতে নাযিলকৃত আয়াত এবং যৌক্তিক প্রমাণাদিও শামিল।

﴿يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ﴾

يَا أَوْلَادَ يَعْقُوْبَ وَالْاِبْنُ: مِنَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ مَبْنَى اَبِيْهِ وَلِذَالِكَ يُنْسَبُ الْمَصْنُوْعُ إِلَى صَانِعِه فَيُقَالُ: اَبُوالْحَرْثِ وَبِنْتُ فِكْرٍ. وَإِسْرَائِيْلُ لَقَبُ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَقِيْلَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقُرِئَ إِسْرَائِلُ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَإِسْرَالُ بِحَذْفِهِمَا وَإِسْرَايِيْلُ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً

অনুবাদ:

يا بنى اسرائيل অর্থাৎ হে ইয়াকুব সন্তান! ابن : এটা بناء থেকে নির্গত। (بناء অর্থ: নির্মাণ করা)। কেননা, পুত্র তো পিতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নির্মিত বস্তুকে নির্মাণকারীর দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়: ابو الحرث (কৃষকের পিতা অর্থাৎ কৃষক) এবং بنت فكر (চিন্তার মেয়ে। অর্থাৎ চিন্তার ফলাফল)। اسرائيل : এটা হযরত ইয়াকুব (আ.) -এর উপাধি। এটা ইবরানি ভাষার শব্দ। অর্থ: আল্লাহর মনোনিত। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ: আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)।

اسرائيل শব্দের কেরাত: (প্রসিদ্ধ কেরাত হলো اسرائيل আর অন্য কেরাত হলো এই) اسرائل (ইয়াকে হযফ করে)। اسرال (ইয়া ও হামযা উভয়টিকে হযফ করে)। اسراييل (হামযাকে ইয়া দ্বারা রূপান্তরিত করে)।

☆☆☆

﴿اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾

أَىْ بِالتَّفَكُّرِ فِيْهَا لِشُكْرِهَا وَتَقْيِيْدُ النِّعْمَةِ بِهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ غَيُوْرٌ وَحَسُوْدُ الطَّبْعِ فَإِذَا نَظَرَ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى غَيْرِه حَمَلَهُ الْغَيْرَةُ وَالْحَسَدُ عَلَى الْكُفْرَانِ وَالسَّخْطِ وَاِنْ نَظَرَ اِلٰى مَا اَنْعَمَ بِه عَلَيْهِ حَمَلَهُ حُبُّ النِّعْمَةِ عَلَى الرِّضَاءِ وَالشُّكْرِ وَقِيْلَ: اَرَادَ بِهَا مَا اَنْعَمَ عَلٰى اٰبَائِهِمْ مِنَ الْإِنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَالْغَرْقِ وَمِنْ عَفْوِ اِتِّخَاذِ الْعِجْلِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ اِدْرَاكِ زَمَنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقُرِئَ اِذَّكَّرُوْا وَالْاَصْلُ اِذْتَكِرُوْا وَنِعْمَتِيْ بِاِسْكَانِ الْيَاءِ وَاِسْقَاطِهَا دَرَجًا وَهُوَ مَذْهَبُ مَنْ لَايُحَرِّكُ الْيَاءَ الْمَكْسُوْرَةَ مَاقَبْلَهَا ـ

অনুবাদ:

(নেয়ামত স্মরণ করার অর্থ:) নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে শোকরিয়া আদায় করা। (নেয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য: এখানে নেয়মাত দ্বারা হয়তো অতীতে মানব জাতিকে যে সকল নেয়ামত দান করা হয়েছে, সেগুলো উদ্দেশ্য। যেমন:- তাকে জীবন দান করা, পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করা, আদমকে খলীফা নিযুক্ত করা এবং তাকে ফেরেশতা দ্বারা সেজদা করানো। এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে যখন নেয়ামত দ্বারা মানব জাতির উপর উল্লেখিত দানকৃত নেয়ামত উদ্দেশ্য। তাহলে التى انعمت على الانسان এরকম না বলে নেয়ামতকে বনী ইসরাইলের সাথে বিশেষিত করে التى انعمت عليكم বলা হলো কেন? কেননা, عليكم দ্বারা বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর উত্তর হলো এই-) আয়াতের মধ্যে নেয়ামতকে বনী ইসরাইলের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে তার কারণ হলো, মানুষ স্বভাবতঃ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং হিংসুক। তাই সে যখন দেখবে যে, তার বিপরীত অন্যকে আল্লাহ তা'লা নেয়ামত দান করেছেন, তখন আত্মমর্যাদা এবং হিংসা তাকে অকৃতজ্ঞতা ও অসন্তুষ্টির উপর উদ্বুদ্ধ করবে। পক্ষান্তরে যখন সে তার উপর আল্লাহর

নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, তখন নেয়ামতের ভালোবাসা তাকে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির প্রতি উৎসাহিত করবে। (বিধায় এখানে নেয়ামতকে তাদের সাথে বিশেষিত করে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা অন্যের নেয়ামত না বুঝে অসন্তুষ্ট ও অকৃতজ্ঞ না হয়। বরং এগুলোকে নিজের নেয়ামত মনে করে কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়)।

কেউ কেউ বলেন, (আয়াতের মধ্যে) নেয়ামত দ্বারা সেই সকল নেয়ামত উদ্দেশ্য যা বনী ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদেরকে দেয়া হয়েছিল। আর সেই নেয়ামতগুলো হলো, ফেরআউনের কবল ও পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি দান, তাদের বাছুরকে মা'বূদ বানানোর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং সেই নেয়ামত যা আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাদেরকে দান করেছিলেন। আর সেটা হলো রাসূলের যুগ পাওয়া।

এক কেরাতের মধ্যে اِذَّكَّرُوْا এসেছে। মূলতঃ اِذْتَكِرُوْا (বাবে افتعال থেকে) ছিল। تاء -কে ذال -এর দ্বারা পরিবর্তন করে ذال -কে ذال -এর মধ্যে ইদগাম করে দেয়া হয়েছে।

نعمتى : ياء -এর সুকূনের সাথে পঠিত। তবে وصل অবস্থায় اجتماع ساكنين -এর কারণে ياء -কে হযফ করা হয়। এটা তাদের মাযহাব অনুসারে যারা ياء ماقبل مكسور -কে হরকত দেননি। (তবে সাত কেরাতের মধ্যে نعمتى -এর ইয়াটি যবরের সাথে পঠিত)।

☆☆☆

﴿وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ﴾

بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ ﴿اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ بِحُسْنِ الْاِثَابَةِ وَالْعَهْدُ يُضَافُ اِلٰى الْمُعَاهِدِ وَالْمُعَاهَدِ وَلَعَلَّ الْاَوَّلَ مُضَافٌ اِلَى الْفَاعِلِ وَالثَّانِىَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى عَهِدَ اِلَيْهِمْ بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ بِنُصُبِ الدَّلَائِلِ وَاِنْزَالِ الْكُتُبِ وَوَعَدَ لَهُمْ بِالثَّوَابِ عَلٰى حَسَنَاتِهِمْ وَلِلْوَفَاءِ بِهَا عَرَضٌ عَرِيْضٌ فَاَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوَفَاءِ مِنَّا هُوَ الْاِتْيَانُ بِكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ وَمِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى حِقْنُ الدَّمِ وَالْمَالِ وَاٰخِرُهَا مِنَّا الْاِسْتِغْرَاقُ فِىْ بَحْرِ التَّوْحِيْدِ بِحَيْثُ يَغْفِلُ عَنْ نَفْسِه فَضْلًا عَنْ غَيْرِه وَمِنَ اللّٰهِ الْفَوْزُ بِاللِّقَاءِ الدَّائِمِ وَمَا رُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ : اَوْفُوْا بِعَهْدِىْ بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ بِرَفْعِ الْاِصَارِ وَالْاِغْلَالِ وَعَنْ غَيْرِه اَوْفُوْا بِاَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ الْكَبَائِرِ اُوْفِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالثَّوَابِ وَاَوْفُوْا بِالْاِسْتِقَامَةِ عَلَى الطَّرِيْقِ اُوْفِ بِالْكَرَامَةِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَبِالنَّظَرِ اِلَى الْوَسَائِطِ وَقِيْلَ كِلَاهُمَا مُضَافٌ اِلَى الْمَفْعُوْلِ وَالْمَعْنٰى: اَوْفُوْا بِمَا عَاهَدْتُّمُوْنِىْ مِنَ

الْإِيْمَانِ وَالْتِزَامِ الطَّاعَةِ أُوْفِ بِمَا عَاهَدْتُكُمْ مِنْ حُسْنِ الْإِثَابَةِ وَتَفْصِيْلُ الْعَهْدَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى قَوْلِهِ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ. وَقُرِئَ أُوَفِّ بِالتَّشْدِيْدِ لِلْمُبَالَغَةِ۔

অনুবাদ:

"তোমরা পূরণ করো আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা (ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে)। তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো (উত্তম প্রতিদানের মাধ্যমে)।" عهـــــد শব্দের সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞাকারী ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দিকে হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ প্রথম বাক্যে (তথা اوفوا بعهدى -এর মধ্যে عهـــــد -এর) সম্বন্ধ করা হয়েছে কর্তা (প্রতিজ্ঞাকারী) -এর দিকে এবং দ্বিতীয় বাক্যে (তথা اوف بعهدكم -এর মধ্যে عهد -এর সম্বন্ধ) কৃত ব্যক্তি (প্রতিশ্রুত) -এর দিকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদের কাছ থেকে প্রমাণাদি পেশ করার এবং কিতাবাদি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে ঈমান ও নেক আমলের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন (অর্থাৎ তাদেরকে আদেশ করেছেন)। এবং তাদেরকে তাদের নেক আমলের বিনময়ে সওয়াব দান করার ওয়াদা করেছেন।

এ উভয় প্রতিজ্ঞা পূরণের এক বিস্তৃত ময়দান রয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বপ্রথম স্তর হলো, শাহাদাতাইনের উপর ঈমান আনয়ন করা। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণ করার প্রথম স্তর হলো, জান ও মালের হেফাজত করা। আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বশেষ স্তর হলো, একত্বের সাগরে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া যে, অন্যান্য থেকে তো কি স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। আর অল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বশেষ স্তর হলো, স্থায়ী সাক্ষাতের মাধ্যমে সফলতা দান করা। (অর্থাৎ জান্নাতে নিজের স্থায়ী সাক্ষাৎ নসিব করে ধন্য করা)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) -এর আনুগত্য সম্পর্কীয় যে প্রতিশ্রুতি ছিল তোমরা তা পূরণ করো। তাহলে আমি তোমাদের থেকে কঠিন আযাব বিদূরীত করে আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো। আর ইবনে আব্বাস (রা.) ছাড়া অন্যান্যদের থেকে যে বর্ণিত আছে যে, তোমরা ফরযসমূহ আদায় করে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থেকে আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। তাহলে আমি ক্ষমা ও সওয়াব দানের মাধ্যমে তোমাদেরক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো। অথবা তোমরা সরল পথে অবিচল থেকে আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। আমি সম্মান ও চির শান্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ করবো। এই ব্যাখ্যাগুলো মধ্যম স্তরসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কেউ কেউ বলেন, عهدى ও عهدكم উভয়টি মাফউলের দিকে সম্বন্ধকৃত। অর্থ: তোমরা ঈমান ও আনুগত্যকে আবশ্যক করার মাধ্যমে আমার সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা পূরণ করো। আমি উত্তম প্রতিদান দান করার যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা পূরণ করবো। আর উভয় প্রতিজ্ঞা (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক বনী ইসরাইলকে ঈমান ও আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান এবং তাদেরকে প্রতিদান দানের প্রতিশ্রুতির) বিশদ বিরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার এই বাণীতে–

﴿ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيا. وقال الله انى معكم لئن اقمتم

الصلوة واتيتم الزكوة وامنتم برسلى وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنت تجرى من تحتها الأنهار﴾

(দেখুন! উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান, বিভিন্ন আনুগত্যের হুকুম প্রদান, তার বিনিময়ে গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন)। অন্য এক কেরাতে আছে أُوَفِّ (বাবে تفعيل থেকে فاء তাশদীদসহ) مبالغه -এর উদ্দেশ্যে।

☆☆☆

﴿وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ﴾

فِيْمَا تَأْتُوْنَ وَتَذَرُوْنَ وَخُصُوْصًا فِيْ نَقْضِ الْعَهْدِ وَهُوَ اٰكَدُ فِيْ اِفَادَةِ التَّخْصِيْصِ مِنْ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ) لِمَا فِيْهِ مَعَ التَّقْدِيْمِ مِنْ تَكْرِيْرِ الْمَفْعُوْلِ وَالْفَاءُ الْجَزَائِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلٰى تَضَمُّنِ الْكَلَامِ مَعْنَى الشَّرْطِ كَاَنَّهٗ قِيْلَ: اِنْ كُنْتُمْ رَاهِبِيْنَ شَيْئًا فَارْهَبُوْنِىْ وَالرَّهْبَةُ: خَوْفٌ مَعَهٗ تَحَرُّزٌ وَالْاٰيَةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ دَالَّةٌ عَلٰى وُجُوْبِ الشُّكْرِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَنْبَغِىْ اَنْ لَّايَخَافَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ۔

অনুবাদ:

اياى فارهبون -এর অর্থ হলো, তোমরা যেসব পাপাচার করো এবং ওয়াজিব পরিহার করো সেগুলোর ব্যাপারে আমাকেই ভয় করো। বিশেষ করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে। اياى فارهبون এটা اياك نعبد -এর তুলনায় অধিক تخصيص -এর ফায়দা দানকারী। কেননা, (اياك نعبد -এর মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র مفعول -কে مقدم করার কারণে। আর) اياى فارهبون -এর মধ্যে تقديم مفعول -এর সাথে সাথে تكرار مفعول ও হয়েছে। (একবার মাফউল উল্লেখ হয়েছে اياى এবং দ্বিতীয়বার 'ن' এটা نى ছিল। ইয়াকে হযফ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর نون وقايه -কে তার উপর قرينه স্বরূপ রাখা হয়েছে)। فاء টি হলো এমন جزائيه যা বাক্যের মধ্যে শর্তের অর্থ শামিল থাকার প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'লা যেন এরকম বলেছেন, ان كنتم راهبين شيئا فارهبونى অর্থাৎ তোমরা যদি কোন কিছুকে ভয় করে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো। (মোদ্দাকথা, اياك نعبد -এর মধ্যে শুধুমাত্র تقديم مفعول পাওয়া যাচ্ছে যা تخصيص -এর ফায়দা দেয়। পক্ষান্তরে اياى فارهبون -এর মধ্যে تقديم مفعول বিদ্যমান যা تخصيص -এর ফায়দা দেয়। এর সাথে সাথে تكرار مفعول ও পাওয়া যাচ্ছে যা পূর্বের تخصيص -কে আরো তাকীদ করে। কেননা, تكرار টি مفيد تاكيد হয়। তাছাড়া فاء টি جزائيه যা বাক্যের متضمن معنى شرط হওয়াকে বুঝায়। আর শর্তটি تخصيص -কে আরো দৃঢ় করে। কেননা, বাক্যের অর্থ হলো, তোমরা যদি কোন বস্তুকে ভয় করে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো। আর এ কথা পরিস্কার যে, "তোমরা আমাকেই ভয়

করো"– এর তুলনায় "তোমরা যদি কোন কিছুকে ভয় করে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো" অধিক তাকীদ বুঝায়। বিধায় اياى فارهبون বাক্যটি اياك نعبد-এর তুলনায় অধিক تخصيص বুঝায়)। رهبة বলা হয়, যে ভয়ের সাথে সাথে বিরোধিতা থেকেও পরহেয করা হয়।

(অত্র আয়াতের উপকারিতা:) আয়াতটি অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন, কৃতজ্ঞতা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ করছে। এবং একথারও প্রমাণ করছে যে, মুমিনের জন্য উচিত যে, সে যেন আল্লাহ্ ব্যতীত আরো কাউকে ভয় না করে। (অঙ্গীকারের কথা اوف بعهدكم, ভীতি প্রদর্শনের কথা واياى فارهبون এবং কৃতজ্ঞতা আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং اياى টি একথা বুঝাচ্ছে যে, মুমিনের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করা উচিত)।

﴿وَآمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾

اِفْرَادٌ لِلْاِيْمَانِ بِالْاَمْرِ بِهٖ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ وَالْعَمَدَةُ لِلْوَفَاءِ بِالْعُهُوْدِ وَتَقْيِيْدُ الْمُنَزَّلِ بِاَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الْكُتُبِ الْاِلٰهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ نَازِلٌ حَسْبَ مَا نَعَتَ فِيْهَا اَوْ مُطَابِقٌ لَهَا فِيْ الْقَصَصِ وَالْمَوَاعِيْدِ وَالدُّعَاءِ اِلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاَمْرِ بِالْعِبَادَةِ وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَالْفَوَاحِشِ وَفِيْمَا يُخَالِفُهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْاَحْكَامِ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ الْاَعْصَارِ فِي الْمَصَالِحِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حَقٌّ بِالْاِضَافَةِ اِلٰى زَمَانِهَا مُرَاعِيًا فِيْهَا صَلَاحُ مَنْ خُوْطِبَ بِهَا حَتّٰى لَوْ نَزَلَ الْمُتَقَدِّمُ فِيْ اَيَّامِ الْمُتَاَخِّرِ لَنَزَلَ عَلٰى وَفْقِهٖ وَلِذٰلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِيْ. تَنْبِيْهٌ اَنَّ اِتِّبَاعَهَا لَايُنَافِي الْاِيْمَانَ بِهٖ بَلْ يُوْجِبُهُ۔

অনুবাদ:

امنوا بما آنزلت-এর মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো, ঈমানই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য এবং অঙ্গীকার পূরণ করার ভিত্তি। নাযিলকৃত কিতাব (কুরআন) কে এ বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে যে, এটা আসমানী কিতাবাদির সত্যায়ন করে। এর দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবাদির অনুসরণ নাযিলকৃত কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের পরিপন্থী নয়; বরং এর উপর ঈমান আনয়নকে আরো সাব্যস্ত করে। এই কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এ হিসেবে যে, আসমানী কিতাবসমূহে এই কুরআনের যে বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেই অনুপাতেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা কুরআন ঘটনাবলী, প্রতিশ্রুতি, তাওহীদের দাওয়াত, ইবাদতের নির্দেশ, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকরণ, পাপাচার ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ প্রদান এবং আনুসাঙ্গিক বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও আসমানী কিতাবসমূহের অনুরূপ। তবে কিছু

আনুসাঙ্গিক বিধানসমূহে যে বৈপরীত্ব পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন ভেদে যুগের পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। যেমন: এগুলোর প্রত্যেকটি তার যুগ অনুপাতে সত্য, তাতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেই যুগের মানুষের প্রয়োজনের কথা। এমনকি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যদি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগেও অবতীর্ণ হতো, তবে হুবহু কুরআনের অনুরূপই অবতীর্ণ হতো। তাই তো রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ ফরমান, যদি মূসা জীবিত থাকতেন, তবে তাকে আমারই অনুসরণ করতে হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

قوله افراد للامر بالايمان به الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: اوفوا بعهدى -এর মধ্যে তো কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশটি অন্তর্ভুক্ত। তথাপি وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم এর মধ্যে পুনরায় কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশ দেয়া হলো কেন? এটা তো একই জিনিসের পুনর্বার নির্দেশ দেয়ার নামান্তর।

উত্তর: এ নির্দেশটি تخصيص بعد التعميم -এর মধ্য থেকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা যেসব বিষয় পালন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন তন্মধ্যে ঈমান হলো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অবশিষ্টগুলোর ভিত্তি। কেননা, ঈমান না থাকলে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই আয়াতের মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের নির্দেশ করেছেন।

☆☆☆

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه﴾

وَلِذَالِكَ عَرَّضَ بِقَوْلِه (وَلَاتَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه) بِاَنَّ الْوَاجِبَ اَنْ تَكُوْنُوْا اَوَّلَ مَنْ اٰمَنَ بِه وَلِاَنَّهُمْ كَانُوْا اَهْلَ النَّظْرِ فِىْ مُعْجِزَاتِه وَالْعِلْمِ بِشَانِه وَالْمُسْتَفْتِحِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ بِزَمَانِه

অনুবাদ:

আর এ কারণেই (অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুকরণ কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের পরিপন্থী না হওয়ার কারণে) আল্লাহ্ তা'লার বানী ولاتكونوا اول كافر به "তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না" -এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের প্রতি প্রাথমিক বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আর এ কারণেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল রাসূলের মু'জিযা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্য ছিল এবং তাঁর অবস্থার জ্ঞানও তাদের ছিল। তাঁর সাহায্যে বিজয় লাভের আবেদনকারী এবং তাঁর যুগের সু-সংবাদ প্রদানকারী ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

تعريض বলা হয় ইঙ্গিতসূচক কথা বলা অর্থাৎ এক বস্তু উল্লেখ করে তার দ্বারা অন্যটি উদ্দেশ্য নেওয়া। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের ব্যাপারে প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না। কিন্তু তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের উপর আবশ্যক যে, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হয়ে যাও। এভাবে

ইঙ্গিতসূচক কথা বলার কারণ হলো এই যে, এখানে বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা আহলে কিতাবের লোক। আর তারা রাসূলের মু'জিযার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করার যোগ্যতা রাখে এবং তাদের কিতাবাদির মধ্যে রাসূলের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই তারা সেগুলো দেখে রাসূলের গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সামর্থ্য রাখে। তাছাড়া তারা শেষ যামানার নবীর সাহায্যে মুশরিকদের উপর জয়লাভ করার কামনা করতো। তারা মুশরিকদের বলতো, শেষ যুগের নবীর আবির্ভাবের সময় একেবারে সন্নিকটে। আমরা তাঁর অনুসরণ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

মোদ্দাকথা, বনী ইসরাইলের লোকেরা আখেরী যামানার নবী সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত, তাঁর মু'জিযার মধ্যে গবেষণা করে তার নবুওয়ত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে ছিল এবং তারা সেই নবীর সাহায্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার কামনা করতো। বিধায় তাদের জন্য উচিত হলো যে, তারাই সর্বপ্রথম সেই নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে। তাই বনী ইসরাইলদেরকে ইঙ্গিতার্থে বলা হয়েছে যে, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হয়ে যাও।

☆☆☆

وَ (اَوَّلُ كَافِرٍ) وَقَعَ خَبَرًا عَنْ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ بِتَقْدِيْرِ اَوَّلُ فَرِيْقٍ اَوْ فَوْجٍ اَوْ بِتَاوِيْلِ لَايَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ اَوَّلَ كَافِرٍ كَقَوْلِكَ: كَسَانَا حِلَّةً ـ

অনুবাদ:

اول كافر : এটা ضمير جمع থেকে خبر হয়েছে। মূল ইবারত ছিল এভাবে اول فريق অথবা اول فوج কিংবা لايكن كل واحد منكم اول كافر به । যেমন তোমার উক্তি كسانا حلة

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

واول كافر وقع خبرا الخ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: অত্র আয়াতে لاتكونوا -এর মধ্যে ضمير جمع টি اسم হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে তার خبر টিও جمع হবে। কিন্তু এখানে তার خبر হলো اول যা একবচন। সুতরাং এখানে اسم বহুবচন হওয়া সত্ত্বে خبر -কে একবচন নেওয়া হলো কিভাবে?

উত্তর: এখানে হয়তো خبر -এর মধ্যে তাবীল করা হবে কিংবা اسم -এর মধ্যে। خبر -এর মধ্যে তাবীল হলো এই যে, এখানে كافر শব্দটি নির্দিষ্ট কাফির বুঝায়নি; বরং তার দ্বারা فريق كافر অথবা فوج كافر তথা কাফিরদের দল উদ্দেশ্য। সুতরাং তখন كافر শব্দটি معنى جمع হয়ে اسم -এর অনুকূল হয়ে যাবে।

اسم -এর মধ্যে তাবীল হলো এই যে, لاتكونوا -এর অর্থ হবে لايكن كل واحد منكم আর তখন اسم টি একবচন হয়ে যাবে। কেননা, এখানে كل واحد টি হলো اسم যা একবচনের অর্থ দেয়। অতএব اسم ও خبر উভয়টি একবচন হয়ে গেল।

☆☆☆

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نُهُوْا عَنِ التَّقَدُّمِ فِي الْكُفْرِ وَقَدْ سَبَقَهُمْ مُشْرِكُوْا الْعَرَبِ قُلْتُ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلتَّعْرِيْضُ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الظَّاهِرُ كَقَوْلِكَ أَمَا أَنَا فَلَسْتُ بِجَاهِلٍ أَوْ لَاتَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ كَفَرَ بِمَا مَعَكُمْ فَإِنَّ مَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا يُصَدِّقُهُ أَوْ مِثْلَ مَنْ كَفَرَ مِنْ مُشْرِكِيْ مَكَّةَ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

প্রশ্ন: বনা ইসরাইলদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। অথচ এর পূর্বে মক্কার মুশরিকরা কাফির ছিল। মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় তো কাফির হয়েছিল রাসূলের মদীনায় হিজরত করার পর। সুতরাং বনী ইসরাইল সর্বপ্রথম কাফির হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। অতএব তাদেরকে কিভাবে বলা হলো যে, তোমরা সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না?

উত্তর: আপনার প্রশ্নটির ভিত্তি হলো আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর। অথচ এখানে বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। বরং ইঙ্গিতার্থ এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ لاتكونوا اول كافر দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তোমাদের উপর অপরিহার্য হলো, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হবে। যেমন: কোন মুর্খ ব্যক্তিকে তুমি বলে থাকো যে, আমি মুর্খ নয়। এর দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি মুর্খ আমি নয়। অর্থাৎ এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে মুর্খ বলা উদ্দেশ্য। তাই বাহ্যিক অর্থের দ্বারা উপরিউক্ত প্রশ্ন করা যাবে না।

অথবা আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। কেননা, এর দ্বারা তাদের আলেম-ওলামাকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা স্বীয় ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। আর এ কথা পরিস্কার যে, তারা আপন ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম কাফির। তাদের পূর্বে আর কেউ কাফির হয়নি।

অথবা বলা যাবে যে, এখানে به -এর মধ্যকার ضمير -এর مرجع কুরআন নয়; বরং এর مرجع হলো ما معكم অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, তোমাদের সঙ্গে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে সে ব্যাপারে তোমরা সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। কেননা, কুরআনের অস্বীকার করা কুরআন যে বিষয়কে সত্যায়ন করে সেটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং কুরআনকে যখন অস্বীকার করবে, তখন তাওরাত ও ইঞ্জিলেরও অস্বীকার করা হবে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হবে। কেননা, তাদের পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অস্বীকারকারী কেউ থাকবে না।

অথবা اول শব্দের পূর্বে كاف تشبيه উহ্য রয়েছে। অর্থ হলো, মক্কার মুশরিকরা যেভাবে সর্বপ্রথম কুরআনকে অস্বীকার করেছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না।

☆☆☆

وَأَوَّلٌ: أَفْعَلُ لَا فِعْلَ لَهُ وَقِيْلَ أَصْلُهُ أَوْأَلٌ مِنْ "وَأْلٍ" فَأُبْدِلَتْ هَمْزَتُهُ وَاوًا تَخْفِيْفًا غَيْرَ قِيَاسِيٍّ أَوْ "أَءْوَلٌ" مِنْ "آلٍ" فَقُلِّبَتْ هَمْزَتُهُ وَأُدْغِمَتْ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

اول শব্দের বিশ্লেষণ:

اول এটা افعل -এর ওযনে। তার থেকে কোন فعل আসে না। কেউ কেউ বলেন, اول এটা মূলতঃ أَوْأَلٌ ছিল। তার দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করণার্থে خلاف قياس (নিয়মের বিপরীত) واو দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। (অতঃপর প্রথম واو -কে দ্বিতীয় واو -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে)। অথবা এটা أَءْوَلٌ ছিল। آل থেকে নির্গত (অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা)। দ্বিতীয় হামযাকে واو দ্বারা পরিবর্তন করে واو -কে واو -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾

وَلَاتَسْتَبْدِلُوْا بِالْإِيْمَانِ بِهَا وَالْإِتِّبَاعِ لَهَا حُظُوْظَ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا وَإِنْ جَلَّتْ قَلِيْلَةٌ مُسْتَرْذَلَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلٰى مَا يَفُوْتُ عِنْدَكُمْ مِنْ حُظُوْظِ الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِ الْإِيْمَانِ قِيْلَ: كَانَ لَهُمْ رِيَاسَةٌ فِيْ قَوْمِهِمْ وَرُسُوْمٌ وَهَدَايَا مِنْهُمْ فَخَافُوْا عَلَيْهَا لَوْ اِتَّبَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارُوْهَا عَلَيْهِ وَقِيْلَ كَانُوْا يَأْخُذُوْنَ الرِّشٰى فَيُحَرِّفُوْنَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُوْنَهُ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

(এখানে اشتراء দ্বারা استبدال বিনিময়ে নেওয়া, পরিবর্তে নেওয়া। আর ثمن قليل দ্বারা দুনিয়ার স্বাদ উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ:) তোমরা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনার এবং সেগুলোর অনুকরণ করার পরিবর্তে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করো না। কেননা, দুনিয়ার স্বাদ যতই বেশি হোক না কেন তা ঈমান না আনার কারণে তোমরা আখেরাতের যেসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে সেগুলোর তুলনায় অতি তুচ্ছ। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে তাদের আলেমগণের মাতব্বরী চলতো এবং তাদের মধ্যে অনেক প্রথা-প্রচলন ছিল। তাদের পক্ষ থেকে অনেক হাদিয়া-তুহফা আসতো। ফলে তারা ভয় করলো যে, যদি বনী ইসরাইলরা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে নেয়, তবে হাদিয়া আসা বন্ধ হয়ে যাবে। বিধায় তারা এগুলোর পরিবর্তে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে নিল। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাইলের আলেমরা ঘুষের বিনিময়ে সত্যকে বিকৃত করতো এবং তা গোপন রাখতো।

☆☆☆

بِـالْاِيْمَانِ وَاِتِّبَاعِ الْحَقِّ وَالْاِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا وَلَمَّا كَانَتِ الْاٰيَةُ السَّابِقَةُ مُشْتَمِلَةً عَـلٰى مَا هُوَ كَالْمَبَادِىْ لِمَا فِى الْاٰيَةِ الثَّانِيَةِ فُصِّلَتْ بِالرُّهْبَةِ الَّتِىْ هِىَ مُقَدَّمَةُ التَّقْوٰى وَلِـاَنَّ الْـخِـطَـابَ بِهَـا لِـمَـا عَمَّ الْعَالِمَ وَالْمُقَلِّدَ اَمَرَهُمْ بِالرُّهْبَةِ الَّتِىْ هِىَ مَبْدَأُ السُّلُوْكِ الْخِطَابُ بِالثَّانِيَةِ لِمَا خُصَّ اَهْلُ الْعِلْمِ اَمَرَهُمْ بِالتَّقْوٰى الَّذِىْ هُمْ مُنْتَهَاهُ

অনুবাদ:

"তোমরা ঈমান গ্রহণ করে, সত্যের অনুসরণ করে এবং দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আমাকেই ভয় করো।"

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে فارهبون এবং অত্র আয়াতের শেষে فاتقون আনার কারণ

আর যেহেতু প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থকে শামিল করে। এই ভাবার্থগুলো বুনিয়াদের সমতুল্য। তাই প্রথম আয়াতের শেষে رهبة আনা হয়েছে যা তাকওয়ার প্রথম ধাপ। আর যেহেতু প্রথম আয়াত দ্বারা আলেম ও অনুসারী উভয় দলকে ব্যাপক আকারে সম্বোধন করা হয়েছে, তাই তাদেরকে رهبة (ভয় করা) -এর নির্দেশ দিয়েছেন যা সুলূকের প্রাথমিক স্তর। এবং দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা যেহেতু সম্বোধন করা হয়েছে বিশেষ করে আহলে ইলমকে কাজেই তাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ করেছেন যা সুলূকের চূড়ান্ত বিষয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী আয়াত তথা يـابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم واوفوا بعهدى اوف بعهدكم واياى فارهبون -এর শেষে فارهبون ব্যবহার করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াত তথা وامنوا بما انـزلـت الـيـكـم مصدقا لما معكم ولاتكونوا اول كافر به ولاتشتروا بايتى ثمنا قليلا واياى فاتقون -এর শেষে ব্যবহার করা হয়েছে فاتقون । এরকম ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের রহস্য কি?

উত্তর: এরকম ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার রহস্য হলো এই যে, (১) প্রথম আয়াতের বিষয় বস্তু হলো, নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করা। আর দ্বিতীয় আয়াতের বিষয় বস্তু হলো, ঈমান, সত্যের অনুসরণ এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সংরক্ষণ। আর এ কথা পরিস্কার যে, নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা ঈমান ও হকের অনুসরণ করার প্রাথমিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃত নেয়ামত দাতার নেয়ামতসমূহকে যখন স্মরণ করবে, তখন তার উপর ঈমান আনয়ন করার এবং সত্যের অনুসরণ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করবে। অনুরূপ رهبة (ভয় করা) তাকওয়ার প্রাথমিক অবস্থা। কেননা, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে সে তাকওয়া অবলম্বন করে। তাই যে আয়াতটি প্রাথমিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত তার শেষে সেই শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রাথমিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর যে আয়াতটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত তার শেষে এমন শব্দকে আনা হয়েছে যা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝায়।

(২) প্রথম আয়াতের মধ্যে সমস্ত বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। চাই আলেম কিংবা আলেমের অনুসারী সাধারণ লোক হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে সম্বোধন করা হয়েছে বনী

ইসরাইলদের মধ্য থেকে শুধু আলেমদেরকে। আর رهبة তথা আল্লাহ্‌ভীতি সুলূকের প্রাথমিক অবস্থা এবং তাকওয়া হলো তার চূড়ান্ত অবস্থা। আর যেহেতু সুলূকের প্রাথমিক অবস্থাটি আলেম ও জাহিলের মধ্যে কম-বেশি হওয়া সম্ভব আছে। বিধায় প্রথম আয়াতের শেষে رهبة শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আলেম ও জাহিল উভয় অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সুলূকের চূড়ান্ত অবস্থা তথা তাকওয়া সাধারণতঃ আলেমদের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় আয়াতের শেষে তাকওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। যা শুধু আলেমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে।

☆☆☆

﴿وَلَاتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾

عَطْفٌ عَلٰى مَاقَبْلَهٗ وَاللُّبْسُ: اَلْخَلَطُ وَقَدْ يَلْزَمُهٗ جَعْلُ الشَّيْءِ مَشْتَبِهًا بِغَيْرِهٖ وَالْمَعْنٰى: لَاتَخْلِطُوْا الْحَقَّ الْمُنَزَّلَ بِالْبَاطِلِ الَّذِىْ تَخْتَرِعُوْنَهٗ وَتَكْتُبُوْنَهٗ حَتّٰى لَايُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا أَوْ لَاتَجْعَلُوْا الْحَقَّ مُلْتَبِسًا بِسَبَبِ خَلَطِ الْبَاطِلِ الَّذِىْ تَكْتُبُوْنَهٗ فِىْ خِلَالِهٖ أَوْ تَذْكُرُوْنَهٗ فِىْ تَاوِيْلِهٖ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

ولاتلبسوا الحق بالباطل বাক্যটি معطوف হয়েছে তার পূর্ববর্তী বাক্য (তথা وامنوا بما انزلت اليكم مصدقا لما معكم) এই বাক্যের উপর। لبس : অর্থ:- মিশ্রণ করা। কখনো এর দ্বারা এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সন্দেহপূর্ণ করে দেয়া লাযেম আসে। আয়াতের অর্থ:- তোমরা নাযিলকৃত সত্যকে সেই অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে গড়ে থাকো কিংবা লিখে থাকো। যার ফলে সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথবা তোমরা সত্যকে সেই অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দ্ব্যর্থবোধক করে নিও না, যা সত্যের ফাঁকে ফাঁকে লিখে থাকো অথবা সত্যের ব্যাখ্যা প্রদানের সময় উল্লেখ করে থাকো।

﴿وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ﴾

جَزْمٌ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكْمِ النَّهْيِ كَأَنَّهُمْ أُمِرُوْا بِالْإِيْمَانِ وَتَرْكِ الضَّلَالِ وَنُهُوْا عَنِ الْإِضْلَالِ بِالتَّلْبِيْسِ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْحَقَّ وَالْإِخْفَاءِ عَلَى مَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ نَصْبٌ بِإِضْمَارِ (أَنْ) عَلَى اَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ أَىْ لَاتَجْعَلُوْا لُبْسَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَكِتْمَانَهُ وَيُعْضِدُهُ أَنَّهُ فِيْ مَصْحَفِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ: تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ أَىْ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ بِمَعْنَى كَاتِمِيْنَ وَفِيْهِ اِشْعَارٌ بِأَنَّ اِسْتِقْبَاحَ اللُّبْسِ لِمَا يَصْحَبُهُ مِنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ عَالِمِيْنَ بِأَنَّكُمْ لَابِسُوْنَ كَاتِمُوْنَ فَإِنَّهُ أَقْبَحُ اِذِ الْجَاهِلُ قَدْ يُعْذَرُ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

تكتموا : (تلبسوا-এর উপর মা'তুফ হয়ে) حالت جزمى-তে পতিত হয়েছে এবং تحت النهى-এর অন্তর্ভুক্ত। (সুতরাং ইবারত এভাবে হবে لاتلبسوا الحق ولاتكتموا الحق)। যেন তাদেরকে (امنوا-এর মাধ্যমে) ঈমান আনয়নের আদেশ করা হয়েছে। (لاتشتروا-এর দ্বারা) আদেশ করা হয়েছে গোমরাহী পরিহার করার। যে সত্য কথা শ্রবণ করেছে তার সামনে সত্যকে দ্ব্যর্থবোধক বানিয়ে তাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (لاتلبسوا الحق بالباطل এই আয়াতের মাধ্যমে)। এবং যে সত্য কথা শ্রবণ করেনি তার থেকে সত্য গোপন রেখে তাকে গোমরাহ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (وتكتموا الحق بالباطل-এর মধ্যে)।

অথবা تكتموا টি উহ্য أن ناصبه-এর কারণে منصوب হয়েছে। তখন তার পূর্বের যে واو টি সেটা হবে واو جمع (অর্থাৎ واو بمعنى مع যাকে واو جمع এবং واو صرف ও বলা হয়। এই واو-এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع টি منصوب হয়)। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করণ এবং সত্যকে গোপনীয়করণ উভয় কাজ থেকে বিরত থাকো। (وتكتموا-এর প্রথম واو টি যে واو جمع হওয়ার এবং تكتموا এটা ان উহ্য থেকে منصوب হয়েছে) তার সমর্থন হয় এ কথার দ্বারা যে, ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মাসহাফের মধ্যে (لاتلبسوا-এর যমীর থেকে হাল হয়ে) و تكتمون الحق এসেছে। তখন ইবারতের মূল হবে এভাবে وانتم تكتمون। এটা جمله حاليه হয়েছে যা كاتمين-এর অর্থে। তাতে এ কথার উপর অবগত করা হয়েছে যে, সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ এ জন্য ঘৃণিত যে, এর ফলে সত্য গোপন রাখা লাযেম আসে। وانتم تعلمون অর্থাৎ তোমরা একথা জানো যে, তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিতকারী এবং সত্যকে গোপনকারী। জেনে-বুঝে এ ধরনের কাজ সর্বনিকৃষ্টতম কাজ। কেননা, অজ্ঞকে কখনো অপারগ গণ্য করা হয়।

☆☆☆

﴿وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ﴾

يَعْنِيْ صَلٰوةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَزَكٰوتَهُمْ فَاِنَّ غَيْرَهُمَا كَلَا صَلٰوةٍ وَزَكٰوةٍ اَمَرَهُمْ بِفُرُوْعِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ مَا اَمَرَهُمْ بِاُصُوْلِهٖ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِهَا. وَالزَّكٰوةُ: مِنْ " زَكَا الزَّرْعُ " اِذَا نَمَا، فَاِنَّ اِخْرَاجَهَا يَسْتَجْلِبُ بَرَكَةً فِي الْمَالِ وَيُثْمِرُ لِلنَّفْسِ فَضِيْلَةَ الْكَرَمِ اَوْ مِنَ الزَّكَاءِ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ فَاِنَّهَا تُطَهِّرُ الْمَالَ مِنَ الْخُبْثِ وَالنَّفْسَ مِنَ الْبُخْلِ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো। অর্থাৎ (এখানে নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,) মুসলমানের নামাযের ন্যায় (নামায কায়েম করা) ও তাদের যাকাতের ন্যায় (যাকাত আদায় করা)। কেননা, মুসলমানের নামায ও যাকাত ব্যতীত অন্য কারো নামায ও যাকাত যেন নামায এবং যাকাতই নয়। আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয় (তথা কুরআন, আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনার) নির্দেশ প্রদান করার পর তাদেরকে ইসলামের আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কাফির ইসলামের আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির মুকাল্লাফ।

زكوة : এটা زكا الزرع থেকে উৎকলিত। যার অর্থ হলো বর্ধিত হওয়া। কেননা, যাকাত দান করলে সম্পদ বাড়ে এবং আন্তরের মধ্যে দান করার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। অথবা زكوة শব্দটি زكاء (পবিত্রতা) থেকে নির্গত। কেননা, যাকাত সম্পদের অপবিত্রতা দূরীভূত করে এবং অন্তরকে কৃপণতা থেকে মুক্তি দান করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة : এখানে الصلوة এবং الزكوة এ দুই শব্দের মধ্যে الف لام টি হলো الف لام عهد خارجى । এর দ্বারা নির্দিষ্ট নামায ও যাকাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুসলমানের নামায ও যাকাত। আয়াতের মর্মার্থ হলো, তোমরা মুসলমানের নামাযের ন্যায় নামায কায়েম করো ও তাদের যাকাতের ন্যায় যাকাত আদায় করো। কেননা, মুসলমানের নামায ও যাকাত ব্যতীত অন্য কোন জাতির নামায ও যাকাতকে নামায এবং যাকাতই বলা যায় না।

কাফিররা কি (احكام فروعيه) আনুসাঙ্গিক বিধানাবলীর আদিষ্ট?

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব মতে, কাফিররা যেভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা ঈমানের মুকাল্লাফ, সেভাবে তারা ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়েরও মুকাল্লাফ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মাযহাব মতে, কাফিররা শুধু মৌলিক বিষয়াদির মুকাল্লাফ। তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির তারা মুকাল্লাফ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদেরকে প্রথমে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আনুসাঙ্গিক বিষয় তথা নামায,

যাকাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলীরও মুকাল্লাফ। তার উত্তর হলো, এই আয়াতের মধ্যে সেইসকল বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মুসলমান হয়ে গেছে।

☆☆☆

﴿واركعوا مع الراكعين﴾

اَىْ فِىْ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ صَلٰوةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. لِمَا فِيْهَا مِنْ تَظَاهُرِ النُّفُوْسِ وَعُبِّرَ عَنِ الصَّلٰوةِ بِالرُّكُوْعِ اِحْتِرَازًا عَنْ صَلٰوةِ الْيَهُوْدِ وَقِيْلَ اَلرُّكُوْعُ اَلْخُضُوْعُ وَالْاِنْقِيَادُ لِمَا يُلْزِمُهُمُ الشَّارِعُ قَالَ اَضْبَطُ السَّعْدِىُّ:ـ

لَاتُذِلَّ الضَّعِيْفَ عَلَّكَ ☆ اَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهٗ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

"তোমরা নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।" অর্থাৎ জামাতে নামায পড়ো। কেননা, জামাতে নামায পড়া একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি সওয়াব। কারণ, এর মাধ্যমে পরস্পর সহযোগিতা হয়। রুকু দ্বারা নামাযকে ব্যক্ত করা হয়েছে ইহুদিদের নামায থেকে নিবৃত্তির জন্য। (কেননা, ইহুদিদের নামাযে রুকু নেই)। কেউ কেউ বলেন, (এখানে রুকু দ্বারা নামায উদ্দেশ্য নয়; বরং) রুকু দ্বারা (তার আভিধানিক অর্থ তথা) শরীয়ত তাদের উপর যে বিষয়কে অপরিহার্য করেছে সেগুলোর সামনে অবনত হওয়া এবং সেগুলোকে অনুসরণ করে চলা। (অতএব আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা অনুসরণ করো তাদের সাথে, যারা অনুসরণ করে)। আযবত সা'দী বলেন– তুমি দুর্বলকে হীন মনে করো না। হতে পারে তুমি একদিন নীচু হয়ে যাবে, আর যুগ তাকে সম্মানের পাত্র বানাবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين

السوال: فسر الاية المذكورة كما فسر المفسر العلام

ঃ উত্তর ঃ

واركعوا مع الراكعين: রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকার সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকুকারীগণের সাথে রুকু করো।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকুকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদের এক জায়গায় وقرأن الفجر (ফজর নামাযের কুরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ

ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সেজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা'ত বা গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযিগণের সাথে নামায পড়ো। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য راكعين শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযীগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকুও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযীগণের সাথে নামায আদায় করো। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ করো, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় করো।

নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ঃ নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো واقيموا الصلوة শব্দের দ্বারাই বুঝা গেলো। এখানে مع الراكعين (রুকুকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হুকুমটি কোন্ ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবা তো শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলীল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মতে, জামাত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

☆☆☆

﴿اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على الخاشعين﴾

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السوال: (الف) اكتب ربط الأية بما بما قبلها

(ب) الاستفهام هنا لأى معنى وما معنى البر وكم قسما له وما هى؟

(ج) ما معنى نسيان النفس وفيمن نزلت هذه الاية وما المراد بقوله تعالى وانتم تتلون الكتاب؟

(د) من خوطب بقوله واستعينوا وما سبب الخطاب؟

(ه) ما معنى الصبر لغة وماذا يراد به في الشرع؟ كيف تحصل الاستعانة بالصبر والصلوة؟

(و) عين مرجع الضمير فى "انها" على نهج المفسر العلامّ

(ز) ما معنى الخشوع وما الفرق بينه وبين الخضوع؟

(ح) كيف تكون الصلوة كبيرة وهى ليست الا سهلا فى بادى الأمر؟

ঃ উত্তর ঃ

الف : ارتباط الأية بما قبلها (পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) ঃ

ইহুদী ধর্মযাজকগণ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতো। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ নিন্দনীয় আচরণের জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। আর এ আয়াতেও তাদেরকে সম্বোধন করে তাদের সংশোধনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। তাদেরকে গোমরাহী পরিহার করে মুহাম্মাদ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করে তা মানতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা তাদের জন্য বাহ্যতঃ অতি দুঃসহ কষ্টকর ব্যাপার। এছাড়া এর দ্বারা তাদের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করতে হতো এবং সর্বসাধারণ থেকে উপঢৌকন ও বখশীশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কুরআনের নির্দেশ সহজে মান্য করার উপায় বাতলে দিয়েছেন। কোন কোন তাফসীরকারদের মতে, এ আয়াতটি মুমিনদের সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

ب : معنى الاستفهام فى هذه الأية (অত্র আয়াতে استفهام -এর অর্থ) ঃ

اتأمرون الناس الخ আয়াতের মধ্যে استفهام কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, ইস্তেফহামটি تقرير مع توبيخ وتعجيب অর্থাৎ ধমক ও বিস্ময়জ্ঞাপনের সাথে সাথে মূল বক্তব্যকে সুদৃঢ় করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, تقرير -এর দুই অর্থ: ১. স্বীকারোক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করা। ২. কোন বক্তব্যকে প্রমাণ করা। আল্লাহর বাণী– انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين -এর মধ্যে همزه استفهام টি تقرير -এর প্রথম অর্থ প্রদান করেছে। আর هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون -এর মধ্যে هل استفهام টি تقرير -এর দ্বিতীয় অর্থ প্রদান করেছে। গ্রন্থকারের বক্তব্যে تقرير শব্দটি উভয় অর্থের জন্য হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী استفهام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তু স্বীকার করার জন্য ইহুদীদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী استفهام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করা।

معنى البر وأقسامه (بر শব্দের অর্থ ও তার প্রকারভেদ) ঃ بِرٌّ শব্দটি بَرٌّ শব্দ থেকে নির্গত। بَرٌّ অর্থ সু-প্রশস্ত খোলা প্রান্তর। بِرٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো, সৎকাজ, আনুগত্য, পূণ্য, সত্যবাদিতা, দান ও সদাচার ইত্যাদি। আল্লামা বায়যাবী (র.) بر শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, التوسع فى الخير অর্থাৎ পূণ্যের কাজে অনাবিল অবিমুক্ত মনে অগ্রসর হওয়া। যাবতীয় পূণ্যের কাজকেই بر বলা হয়।

اقسام البر (بر -এর প্রকারভেদ) ঃ

কারো কারো মতে, بر (পূণ্য) তিন প্রকার–

১. আল্লাহর বন্দেগী সংক্রান্ত পূণ্য।

২. আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা সংক্রান্ত পূণ্য।

৩. অনাত্মীয়দের সাথে আচার-আচরণের পূণ্য।

ج : معنى نسيان النفس (ব্যক্তি সত্তা ভুলে যাওয়ার অর্থ) ঃ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন ব্যক্তি কখনই নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলতে পারে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ইহুদি ধর্মযাজকদের সম্বোধন করে تنسون انفسكم (তোমরা নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছো) কিভাবে বললেন?

আল্লামা বায়যাবী (র.) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, تنسون انفسكم অর্থ تتركون من البر

كـالـمـنـسـيـات অর্থাৎ তোমরা মনকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করতে ভুলে গেছো, যেমনিভাবে বিস্মৃত বিষয় মানুষ পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ নিজেদের মনকে সৎকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত না করাকে نسيــــان (ভুলে যাওয়া) মাসদারের সাথে উপমা দিয়ে استعـارہ مصـرحـه تبعيـه -এর ভিত্তিতে মনকে সৎকাজের প্রতি অনুৎসাহিত করার জন্যে نسيان শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে গিয়েছিল। বরং অর্থ হলো, তারা নিজেদের মাঝে সৎকাজ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

فيمن نزلت الأية (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদীনার কোন কোন ইহুদি ধর্মযাজক তাদের প্রীতিভাজন ব্যক্তিদেরকে গোপনে ইসলাম কবূল করতে উৎসাহিত করতো, ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে মানুষদের অনুপ্রাণিত করতো, তবে নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করতো না। এ আয়াত তাদেরকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ইহুদি আলেমগণ আপন অনুসারীদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিতো, কিন্তু নিজেরা কখনো দান-খায়রাত করতো না। আলোচ্য আয়াতটি তাদেরকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

المراد بقوله تعالى وانتم تتلون الكتاب (وانتم تتلون الكتاب -এর মর্মার্থ) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (র.) وانتم تتلون الكتاب -এর মর্ম বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, تبكيت كقوله وانتم تعلمون অর্থাৎ এর পূর্বের আয়াতে وانتم تعلمون বলে যেভাবে ইহুদি ধর্মযাজকদের নির্বাক করে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে অত্র আয়াতে وانتم تتلون الكتاب বলেও তাদেরকে নির্বাক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হে ইহুদি ধর্মযাজকগণ! নিশ্চয় তোমরা তাওরাত কিতাব অধ্যয়ন করেছো। সেখানে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম বর্ণনা করা হয়নি? কথা ও কাজের মাঝে গরমিল থাকার পরিণতি বর্ণনা করা হয়নি?

د: من خوطب بقوله واستعينوا (استعينوا আয়াতের দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে) ঃ

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণের মতে, استـعـيـنـوا আয়াত দ্বারা বনী ইসরাইল তথা ইহুদি আলেমদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেকে সম্বোধন করার কারণ হলো, অর্থলোভ ও পদ মর্যাদার লিপ্সা দূরীভূত করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর আনীত শরীয়ত মানা তাদের জন্য বড় দুঃসহ মনে হয়েছিল। তাদের এ মনকষ্ট দূর করার প্রতিষেধক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ه: معنى الصبر لغة والمراد به وكيفية الاستعانة بالصبر والصلوة (সবরের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার পদ্ধতি) ঃ

صبر -এর আভিধানিক অর্থ হলো, বিরত রাখা, বাধা দেয়া। পরিভাষায় সবর বলা হয়, ইচ্ছার দৃঢ়তা, সংকল্পের পরিপক্কতা এবং লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়ানা ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিজের অন্তর ও বিবেকের মনোনীত পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হতে পারে।

صبر -এর দু'টি তাফসীর করা হয়– ১. তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে সফলতা ও চিন্তামুক্ততার জন্য অপেক্ষমান থেকে সাহায্য কামনা করো। ২. صبر দ্বারা উদ্দেশ্য الصوم (রোযা)। আয়াতের অর্থ, রোযা অর্থাৎ তিনটি কামনীয় বস্তু খাদ্য, পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে প্রবৃত্তির তাড়না দমিত করে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো।

صلوة -এরও দুটি তাফসীর করা হয়–

১. সালাত দ্বারা পারিভাষিক সালাতই উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম, সালাতের উসিলায় ও তার আশ্রয়ে থেকে সাহায্য কামনা করো। কেননা, সালাত হলো বিভিন্ন প্রকার আত্মিক ও দৈহিক ইবাদতের সমষ্টি। যার সাহায্যে আত্মা বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করে এবং এর দ্বারা সকল সমস্যা সংকট বিদূরীত হয়। সালাত যে সকল ইবাদতের সমষ্টি তা হলো, পবিত্রতা, সতর আবৃতকরণ, কিবলামুখী হওয়া, নিরিবিলি শান্তভাবে দাঁড়ায়মান হওয়া (যা ই'তিকাফ সদৃশ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নিজের হীনতা প্রকাশ করা এবং অন্তরে বিশুদ্ধ নিয়্যত করা। সালাতরত অবস্থায় শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা, আল্লাহর সাথে একান্তে কথোপকথন করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তাশাহুদের মধ্যে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা, পানাহার ও সহবাস থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা যা রোযা সদৃশ্য। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং দুঃখ-মুসিবত থেকে নিষ্কৃতির জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।

২. সালাত দ্বারা অত্র আয়াতে দু'আও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, দু'আ ও কায়মনবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমিত হয়। অন্তরে নম্রতা পয়দা হয় এবং আত্মা দুরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্ত হয়ে মা'রেফাতের নূরে আলোকিত হয়। যার ফলে আত্মা অতিশয় শক্তি লাভ করে। অতএব তোমরা সবর ও দু'আর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।

و : مرجع الضمير فى انها (انها -এর যমীরের مرجع) ঃ

انهـا -এর যমীরের مـرجـع কি হবে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন–

১. انها -এর যমীরের مرجع হলো استعينوا ফে'লের মধ্যে লুকায়িত মাসদার তথা استعانة ।

২. انها -এর যমীরের مـرجع হলো الـصـلـوة । সবর ও সালাতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সালাতের দিকে যমীর ফিরানোর কারণ দু'টি– (ক) সালাত মহান তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে।

(খ) সালাত বহুসংখ্যক ইবাদতের সমষ্টি হওয়ার কারণে।

৩. انهـا -এর যমীরের مـرجـع হলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলদের যে সকল বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বারণ করা হয়েছে তার সমষ্টি।

ز : معنى الخشوع (খুশূ -এর অর্থ) ঃ

خشوع শব্দটি বাবে فتـح يفتح -এর মাসদার। এর অর্থ হলো, الاخبات অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করা। বিনয়ের দ্বারা যেহেতু দেহ ঝুঁকে পড়ে সেহেতু ঝুঁকে পড়া বালুকাময় টিলাকে خشعة বলা হয়।

معنى الخضوع (خضوع -এর অর্থ) ঃ

خضوع বাবে فتـح يفتح -এর মাসদার। এর অর্থ হলো, الـلين والانقياد অর্থাৎ অবনত হওয়া এবং অনুগত হওয়া।

الفرق بين الخشوع والخضوع (خضوع ও خشوع -এর মধ্যকার পার্থক্য) ঃ

আল্লামা বায়যাবী (র.) خضوع ও خشوع -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

الـخشـوع بالجوارح والخضوع بالقلب অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয়ের নাম خشوع আর অন্তরের হীনতা ও বশ্যতার নাম হলো خضوع ।

ج : **নামায কঠিনবোধ হওয়ার কারণ ঃ** নামায নিছক একটি সহজ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা কঠিনবোধ হওয়ার কারণ হলো, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, পানাহার না করা, চলাফেরা না করা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এর দ্বারা কষ্টবোধ করতে থাকে। ফলে তাদের জন্যে নামায কঠিন ও কষ্টকর কাজ।

☆☆☆

﴿الذين يظنون انهم ملقو ربهم وانهم اليه راجعون﴾

السوال: (الف) فسر الاية المذكورة كما فسر المفسر العلام

فأرسلته مستيقن الظن أنه ☆ مخالط ما بين الشراسيف جائف

(ب) ترجم الشعر ثم بين محل الاستشهاد

ঃ উত্তর ঃ

الف : تفسير الاية المذكورة **(উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর)** ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা خاشعين তথা বিনয়ীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য যে, ظن বলা হয় এমন বিশ্বাসকে যা বিপরীতের সম্ভাবনা রাখে। আল্লামা বায়যাবী (র.) ظن -এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন–

১. ظـــــــن অর্থ আশা করা। অতএব বিনয়ী হলো সেই সকল লোক যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাক্ষাতের এবং তাঁর নিকট যে সম্মান ও সওয়াব রয়েছে সেগুলো পাওয়ার আশা রাখে।

২. ظن অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তারা এ কথার বিশ্বাস রাখে যে, তারা আল্লাহর কাছে সমবেত হবে। অতঃপর তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

فأرسلته مستيقن الظن أنه ☆ مخالط ما بين الشراسيف جائف

ب : ترجمة الشعر **(কবিতার অর্থ)** ঃ আমি এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তীরটি নিক্ষেপ করেছি যে, এটি পাঁজরের পার্শ্ব অতিক্রম করে পেটে বিদ্ধ হবে।

محل استشهاد ঃ এখানে ظن শব্দটি হলো محل استشهاد যা এখানে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

☆☆☆

﴿واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون﴾

السوال:(الف) فسر الاية

(ب) ما معنى الشفاعة والعدل والنصر؟ اكتب مع بيان الفرق بينهما

(ج) ما النسبة بين النصرة و المعونة؟
(د) الأية تدل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر كما هو رأى المعتزلة۔ ما الجواب عنه؟ بين مدللا۔

ঃ উত্তর ঃ

الف : تفسير الأية الكريمة (আয়াতের তাফসীর) ঃ

প্রারম্ভকথা ঃ বনী ইসরাইল জাতির একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল এই যে, তারা মহিমান্বিত নবীগণের বংশধর এবং মহৎ প্রাণ পীর-দরবেশ, পরহেযগার ও সাধক পুরুষদের সাথে তাদের গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক থাকার কারণে পরকালে তারা মুক্তি লাভ করবে। উক্ত আয়াতে তাদের এ বদ্ধমূল ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য ঃ দুনিয়াতে সাধারণতঃ নিয়ম হলো, কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্থ হলে তার আপন জনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়, তখন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে করে বিনিময় মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে স্বচেষ্ট হয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিপদমুক্ত হওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাইলের পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক বিশ্বাসের বাতুলতা ও অসারতা ঘোষণা করেছেন– সেদিনকে ভয় করো অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যে দিন কেউ কারো কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

ب : معنى الشفاعة (شفاعة -এর অর্থ) ঃ شفاعة শব্দটি বাবে فتح يفتح -এর মাসদার। অর্থ সুপারিশ করা।

معنى العدل (عدل -এর অর্থ) ঃ عدل শব্দটি বাবে ضرب يضرب -এর মাসদার। عدل অর্থ ন্যায় পরায়ণতা, পরিণাম, পরিণতি, মধ্যপন্থা, সমতা, সোজা হওয়া ইত্যাদি। আয়াতে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

معنى النصر (نصر অর্থ) ঃ نصر শব্দটি মাসদার। অর্থ সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, মুক্তি দেয়া ইত্যাদি।

الفرق بينهن (পারস্পরিক পার্থক্য) ঃ

النسبة بين النصرة والمعونة (নুছরত ও মাউনতের মধ্যকার সম্পর্ক) ঃ المعونة এবং النصرة শব্দদ্বয়ের মধ্যে عموم خصوص مطلق -এর সম্পর্ক রয়েছে। نصرة হল خاص । কেননা, বিপদ-মুসিবত কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য সাহায্য করাকে النصرة বলে। পক্ষান্তরে المعونة হল عام । দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ দূর করার এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র উপকৃত করা উভয়ের জন্য সাহায্য করাকে المعونة বলে।

১ : মু'তাযিলাদের যুক্তিখণ্ডন ঃ উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, কবীরা গোনাহ্কারী ব্যক্তির জন্য আখেরাতে সুপারিশ চলবে না। তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে শুধুমাত্র কাফির মুশরিকদের সুপারিশ গ্রহণ না করার কথা

বলা হয়েছে। কেননা, অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে আহলে কাবায়েরের পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এ কথা বলা হয়েছে। অত্র আয়াতে সুপারিশ গ্রহণ না করার বিষয় যে শুধুমাত্র কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে এর স্বপক্ষে দু'টি যুক্তি রয়েছে–

১. আয়াতে কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

২. আয়াতটি বনী ইসরাইলের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক বিশ্বাস অপনোদনের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হলো তাদের ধারণা মতে, তাদের পূর্বপুরুষ মহামনীষীরা তাদের জন্য পরকালে সুপারিশ করবে। এ উভয় বিষয় এ কথাই বুঝায় যে, এখানে সুপারিশ গ্রহণ না করার সম্পর্ক কাফিরদের সাথে।

☆☆☆

﴿وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ﴾

تَفْصِيْلٌ لِمَا أَجْمَلَهُ فِيْ قَوْلِهِ: اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. وَعُطِفَ عَلٰى نِعْمَتِيْ عَطْفَ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ وَقُرِئَ اَنْجَيْتُكُمْ وَاَصْلُ اٰلِ: أَهْلٌ لِأَنَّ تَصْغِيْرَهُ أُهَيْلٌ وَخُصَّ بِالْإِضَافَةِ اِلٰى اُوْلِي الْخَطْرِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُلُوْكِ. وَفِرْعَوْنُ: لَقَبٌ لِمَنْ مَلَكَ الْعَمَالِقَةَ كَكِسْرٰى وَقَيْصَرَ لِمُلْكَيِ الرُّوْمِ وَالْفَارِسِ. وَلِعُتُوِّهِمْ اُشْتُقَّ مِنْهُ تَفَرْعَنَ الرَّجُلُ اِذَا عَتَا. وَكَانَ فِرْعَوْنُ مُوْسٰى مَصْعَبُ بْنُ رَيَّانَ وَقِيْلَ: اِبْنُهُ وَلِيْدٌ مِنْ بَقَايَا عَادٍ. وَفِرْعَوْنُ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَيَّانٌ وَكَانَ بَيْنَهُمَا اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

অত্র আয়াতটি আল্লাহ তা'লার বাণী اذكرو نعمتي التي انعمت عليكم -এর মধ্যকার সংক্ষিপ্তভাবে যে নেয়ামতসমূহের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ। نعمتي -এর উপর তার عطف টি عطف الخاص على العام -এর পর্যায়ভুক্ত। যেভাবে جبرئيل ও ميكائيل -এর عطف টি ملائكة -এর উপর عطف الخاص على العام -এর অন্তর্ভুক্ত। এক কেরাতের মধ্যে انجيتكم এসেছে। ال এটা মূলতঃ أهل ছিল। কেননা, تصغير আসে أهيل। (আর تصغير ইসমকে তার মূলের দিকে নিয়ে যায়)। সম্ভ্রান্ত লোকদের দিকে ال -এর সম্পর্ক করা হয়। (চাই আখেরাতের বিবেচনায় সম্ভ্রান্ত হোক যেমন:) নবীগণ। (অথবা দুনিয়ার বিচারে যেমন:) রাজা-বাদশা। (পক্ষান্তরে اهل -এর সম্পর্ক করা হয় সম্ভ্রান্ত ও নিকৃষ্টদের দিকে)।

فرعون : আমালাকা গোত্রের রাজা-বাদশাদের উপাধী। যেমন পারস্য সম্রাটকে কিসরা এবং রুম সম্রাটকে কয়সর উপাধীতে ভূষিত করা হয়। যেহেতু ফেরআউন নামে যারাই ছিল তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল, সেহেতু فرعون শব্দ থেকে تفرعن الرجل নির্গত, যার অর্থ: লোকটি দুষ্ট হয়ে গেছে। মুসা (আ.) -এর যুগের ফেরআউনের নাম ছিল মাসআব ইবনে রাইয়ান। কেউ কেউ বলেন,

তার পুত্র ওলীদ ছিল, যে আদ গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিল। আর ইউসুফ (আ.) -এর যামানার ফেরআউনের নাম ছিল রাইয়ান। মুসা (আ.) -এর যামানার ফেরআউন এবং ইউসুফ (আ.) -এর যামানার ফেরআউনের মধ্যখানে সময়ের ব্যবধান ছিল চারশ' বছরেরও অধিক।

☆☆☆

﴿يَسُوْمُوْنَكُمْ﴾

يَبْغُوْنَكُمْ. مِنْ سَامَهٗ خَسْفًا اِذَا اَوْلَاهُ ظُلْمًا وَأَصْلُ السُّوْمِ اَلذَّهَابُ فِيْ طَلَبِ الشَّيْءِ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

"তারা তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তি অন্বেষণ করত"। يسومون এটা سامه خسفا থেকে নির্গত। যার অর্থ কারো জন্য অসম্মানী চাওয়া, অত্যাচার করা। سوم শব্দের মূল অর্থ: কোন বস্তুর অন্বেষণে যাওয়া।

☆☆☆

﴿سُوْءَ الْعَذَابِ﴾

اَفْظَعَهٗ فَاِنَّهٗ قَبِيْحٌ بِالْإِضَافَةِ اِلٰى سَائِرِهٖ وَالسُّوْءُ مَصْدَرُ سَاءَ يَسُوْءُ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لِيَسُوْمُوْنَكُمْ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْ نَجَّيْنَاكُمْ أَوْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ اَوْ مِنْهُمَا جَمِيْعًا لِأَنَّ فِيْهَا ضَمِيْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

سوء العذاب অর্থাৎ নিকৃষ্টতম শাস্তি। কেননা, এটা অন্যান্য সকল শাস্তির চেয়ে নিকৃষ্টতম। سوء এটা ساء يسوء -এর মাসদার। سوء العذاب টি يسومونكم -এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। আর يسومونكم سوء العذاب বাক্যটি نجيناكم -এর মধ্যকার যমীর থেকে حال হয়েছে। অথবা ال فرعون কিংবা উভয়টি থেকে। কেননা, এ বাক্যের মধ্যে উভয়ের যমীর বিদ্যমান রয়েছে।

☆☆☆

﴿يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَائَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَائَكُمْ﴾

بَيَانُ يَسُوْمُوْنَكُمْ وَلِذَالِكَ لَمْ يُعْطَفْ وَقُرِئَ يَذْبَحُوْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَاِنَّمَا فَعَلُوْا بِهِمْ ذَالِكَ لِاَنَّ فِرْعَوْنَ رَأَى فِي الْمَنَامِ قَالَ لَهُ الْكَهَنَةُ سَيُوْلَدُ مِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ بِمُلْكِه فَلَمْ يَرُدَّ اِجْتِهَادُهُمْ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

"তারা তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত।" এটা يسومونكم سوء العذاب -এর বিবরণী। এ জন্য عطف করা হয়নি। (কেননা, উভয় বাক্যের মধ্যে كمال اتصال বিদ্যমান)। এক কেরাতের মধ্যে يَذْبَحُوْنَ যাল সাকিনসহ এসেছে।

কেন এই শাস্তি ঃ ফেরআউনের লোকেরা বনী ইসরাইলদেরকে এই শাস্তি এ কারণে দিত যে, ফেরআউন স্বপ্ন দেখল যে, তাকে গণকরা বলছে, ইসরাইল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যার হাতে তোমার রাজত্বের পতন ঘটবে। (এ জন্য ফেরআউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইল)। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা আল্লাহ্ তা'লার কুদরতকে কিঞ্চিত পরিমাণই হঠাতে পারল না।

☆☆☆

﴿وَفِيْ ذَالِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ﴾

مِحْنَةٌ اِنْ اُشِيْرَ بِذَالِكُمْ اِلٰى صَنِيْعِهِمْ وَنِعْمَةٌ اِنْ اُشِيْرَ بِه اِلَى الْاِنْجَاءِ وَاَصْلُهُ اَلْاِخْتِبَارُ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ اِخْتِبَارُ اللّٰهِ عِبَادَهُ تَارَةً بِالْمِحْنَةِ وَتَارَةً بِالْمِنْحَةِ اُطْلِقَ عَلَيْهِمَا وَيَجُوْزُ اَنْ يُشَارَ بِذَالِكُمْ اِلَى الْجُمْلَةِ وَيُرَادَ بِه الْاِمْتِحَانُ الشَّائِعُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيْطِهِمْ عَلَيْكُمْ اَوْ بَعْثِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَوْفِيْقُهُ لِتَخْلِيْصِكُمْ اَوْ بِهِمَا. (عَظِيْمٌ) صِفَةُ بَلَاءٍ وَفِى الْاٰيَةِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ مَا يُصِيْبُ الْعَبْدَ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ اِخْتِبَارٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَعَلَيْهِ اَنْ يَشْكُرَ عَلٰى مَسَارِّه وَيَصْبِرَ عَلٰى مَضَارِّه لِيَكُوْنَ مِنْ خَيْرِ الْمُخْتَبِرِيْنَ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

যদি ذالكم -এর মুশাঁরুন ইলাইহি হয় ফেরআউনের হত্যাকাণ্ড, তবে بلاء দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বিপদ, দুঃখ-কষ্ট। আর যদি ذالكم দ্বারা انجاء তথা অব্যাহতি দানের দিকে ইশারা হয়, তবে بلاء দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নেয়ামত, অনুগ্রহ। بلاء শব্দের মূল অর্থ হলো, পরীক্ষা। আর আল্লাহ কখনো

বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন বিপদাপদ দিয়ে আবার কখনো পরীক্ষা করেন নেয়ামত দানের মাধ্যমে। কাজেই بـلاء শব্দটি বিপদাপদ এবং নেয়ামতের উপর ব্যবহৃত হয়। অথবা ذالـكـم দ্বারা ফেরআউনের হত্যাকাণ্ড এবং তা থেকে অব্যাহতি দানের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এবং بلاء দ্বারা পরীক্ষা উদ্দেশ্য যা বিপদাপদ এবং নেয়ামতকে শামিল রাখে। مـن ربـكـم অর্থাৎ এ পরীক্ষা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তথা তিনি ফেরআউন ও তার দলকে তোমাদের উপর বিজয়ী বানিয়েছেন। অথবা এ অব্যাহতি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসা (আ.) কে প্রেরণ করে তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। عـظـيـم এটা بـلاء -এর সিফাত। অত্র আয়াতে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, বান্দা ভালো-মন্দ যা কিছুর সম্মুখীন হোক না কেন সবই হলো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষস্বরূপ। তাই নিজের স্বচ্ছলতার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা বান্দার উপর আবশ্যক। তাহলে সে উত্তম পরীক্ষাকৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

☆☆☆

﴿وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾

فَـلَـقْـنَـاهُ وَفَـصَّـلْـنَـا بَيْنَ بَعْضِهِ وَبَعْضٍ حَتّٰى حَصَلَتْ فِيْهِ مَسَالِكُ بِسُلُوْكِكُمْ أَوْ بِسَبَبِ اِنْجَاءِكُمْ أَوْ مُتَـلَبِّسًا بِـكُمْ. كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ تَدُوْسُ بِنَا الْجَمَاجِمُ وَالتَّرِيْبَا. وَقُرِئَ فَرَّقْنَا عَلٰى بِنَاءِ التَّكْثِيْرِ لِأَنَّ الْمَسَالِكَ كَانَتْ اِثْنَا عَشَرَ بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

আয়াতের মর্ম– আমি সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি এবং তার এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করে নিয়েছি যার ফলে সাগরে বিভিন্ন রাস্তার সৃষ্টি হয়েছে। بكم -এর মধ্যকার باء -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১.البـــاء لـلاسـتـعـانـة তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমি তোমাদের চলার মাধ্যমে সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি। ২. الباء للسببية এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, আমি সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি তোমাদের চলার জন্য। ৩. البـاء لـلـمـصـاحـبة আর তখন بـاء টি مـلـتبسـا (শিবহে ফে'ল মাহযুফের) সাথে মুতাআল্লিক হয়ে فـرقـنـا -এর যমীর থেকে হাল হবে। আয়াতের মর্ম হবে, আমি তোমাদের সাথে পাহাড়কে দ্বিখণ্ডিত করেছি। যেমন কবির কবিতা: تـدوس بـنـا الـجـمـاجـم والـتـريـبا এ কবিতায় بـنا -এর باء টি مـصـاحـبة -এর জন্য। এক কেরাতের মধ্যে فـرّقـنا তাকছীরের ওযনে এসেছে। (অর্থাৎ باب تفعيل কখনো تكثير বা আধিক্যতা বুঝায়। এখানেও فرّقنا বাবে تفعيل থেকে এসে تـــكـثـيـــر বুঝাবে)। আয়াতের মর্ম: আমি সাগরকে অনেক দ্বিখণ্ডিত করেছি। কেননা, সাগরে বনী ইসরাইল গোত্রের সংখ্যা অনুপাতে বারোটি রাস্তা ছিল। (এ হিসেবে যেন সাগরকে অনেক দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে)।

﴿فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ﴾

اَرَادَ بِهٖ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ وَاقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِهِمْ لِلْعِلْمِ بِاَنَّهٗ كَانَ اَوْلٰى بِهٖ وَقِيْلَ: شَخْصُهٗ كَمَا رُوِىَ اَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَىْ شَخْصِهٖ وَاسْتُغْنِىَ بِذِكْرِهٖ عَنْ ذِكْرِ اَتْبَاعِهٖ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

(ال فرعون) -এর মূল অর্থ তো হলো ফেরআউনের গোত্র। কিন্তু) অত্র আয়াতে তার দ্বারা (শুধু ফেরআউন গোত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরআউন ও তার গোত্র। শুধু গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন (ফেরআউনের কথা উল্লেখ করেননি) কারণ, একথা জানা আছে যে, ফেরআউনকে ডুবিয়ে দেয়ার বেশি উপযুক্ত। (কাজেই ফেরআউনের গোত্রকে ডুবিয়ে দেয়ার সংবাদ দ্বারা একথা এমনিতেই বুঝে আসবে যে, ফেরআউনকেও ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে)। কেউ কেউ বলেন, ال فرعون (ফেরআউনের গোত্র) দ্বারা ফেরআউন সত্তা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত হাসান (রা.) বলতেন- اللهم صل على ال محمد -এর দ্বারা তিনি হুযুর (সা.) -এর সত্তাকে উদ্দেশ্য করতেন। (এই সূরতে তো শুধু ফেরআউনের কথার উল্লেখ হয়। কিন্তু তার গোত্রের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব) শুধু ফেরআউনের কথা উল্লেখ করে তার অনুসারীদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ফেরআউনের ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনা দ্বারা তার অনুসারীদের ডুবার কথা এমনিতেই বুঝে আসে।

☆☆☆

﴿وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ﴾

ذَالِكَ اَوْ غَرْقَهُمْ وَاِطْبَاقَ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ اَوْ اِنْفِلَاقَ الْبَحْرِ عَنْ طُرُقٍ يَابِسَةٍ مـ ـٍ اَوْ جُثَثَهُمُ الَّتِىْ قَذَفَهَا الْبَحْرُ اِلَى السَّاحِلِ اَوْ يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا رُوِىَ اَنَّهٗ تَعَالٰى اَمَرَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَسْرِىَ بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَخَرَجَ بِهِمْ فَصَبَّحَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ فَصَادَفُوْهُمْ عَلٰى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَهٗ فَظَهَرَتْ فِيْهِ اِثْنَا عَشَرَ طَرِيْقًا يَابِسًا فَسَلَكُوْهَا فَقَالُوْا يَامُوْسٰى! نَخَافُ اَنْ يَغْرِقَ بَعْضُنَا وَلَا نَعْلَمُ فَفَتَحَ اللّٰهُ فِيْهَا كُوًى فَتَرَائَوْا وَتَسَامَعُوْا حَتّٰى عَبَرُوا الْبَحْرَ ثُمَّ لَمَّا وَصَلَ اِلَيْهِ فِرْعَوْنُ رَاٰهُ مُنْفَلِقًا اِقْتَحَمَ فِيْهِ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فَالْتَطَمَ عَلَيْهِمْ وَاَغْرَقَهُمْ اَجْمَعِيْنَ. وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذِهِ الْوَاقِعَةَ مِنْ اَعْظَمِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهٖ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمِنْ

الْآيَاتِ الْمُلْجِئَةِ إِلَى الْعِلْمِ بِوُجُوْدِ الصَّانِعِ الْحَكِيْمِ وَتَصْدِيْقِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ وَقَالُوْا ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾ وَنَحْوُ ذَالِكَ فَهُمْ بِمَعْزِلٍ فِي الْفِطْنَةِ وَالزَّكَاءِ وَسَلَامَةِ النَّفْسِ وَحُسْنِ الْإِتِّبَاعِ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَإِنَّهُمْ اِتَّبَعُوْا مَعَ أَنَّ مَا تَوَاتَرَ مِنْ مُعْجِزَاتِهٖ أُمُوْرٌ نَظَرِيَّةٌ دَقِيْقَةٌ يُدْرِكُهَا الْأَذْكِيَاءُ وَأَخْبَارُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا مِنْ جُمْلَةِ مُعْجِزَاتِهٖ عَلٰى مَا مَرَّ تَقْرِيْرُهٗ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

(এখানে تنظرون -এর مفعول কি তা সম্পর্কে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে–) ১. তোমরা দেখছিলে এ সবগুলোকে। (অর্থাৎ অব্যাহতি দেয়া, সাগর দ্বিখণ্ডিত করা, নিমজ্জিত করা এই সবগুলোকে তোমরা দেখছিলে)। ২. তোমরা দেখছিলে তাদের নিমজ্জিত হওয়া এবং সাগর তাদের ঢেকে নেওয়াকে। ৩. তোমরা দেখছিলে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে তা থেকে আরামদায়ক এবং শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি হওয়াকে। ৪. তোমরা দেখছিলে তাদের মৃতদেহগুলোকে যেগুলোকে সাগর নিক্ষেপ করেছিল উপকূলে। ৫. তোমরা একে অপরকে দেখছিলে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.) -কে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাইলকে রাত্রি বেলায় নিয়ে বের হবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হলেন। ফেরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তরা তাদেরকে প্রভাতে সমূদ্র উপকূলে পেয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'লা মূসা (আ.) -এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করো। তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করলেন। ফলে সাগরে বারোটি রাস্তার সৃষ্টি হল এবং এগুলোর উপর দিয়ে বনী ইসরাইল পার হয়ে গেল। অতঃপর তারা বললো হে মুসা! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের অজান্তে আমাদের মধ্যে যারা অন্য রাস্তায় রয়ে গেছে তারা ডুবে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই রাস্তাগুলোর মধ্যে (অর্থাৎ এই বারোটি রাস্তার মধ্যখানে পর্বতের ন্যায় পানির যে পাটিশন ছিল সেই পাটিশনের মধ্যে) বাতির ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে তারা একে অপরকে দেখতে পেল এবং একে অপরের কথাও শুনতে পেল। এভাবে তারা সাগর পারি দিল। অতঃপর যখন ফেরআউন সাগরে পৌঁছল, তখন সে সাগরের মধ্যখানে রাস্তা দেখতে পেল এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিল। সাগর তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং ডুবিয়ে দিল।

তুমি জেনে রাখো যে, এই ঘটনাটি বনী ইসরাইলের উপর আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহের একটি অন্যতম নেয়ামত। এটা প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের উপর প্রমাণাদির একটি প্রমাণ যা তাঁর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করতে বাধ্য করে এবং মূসা (আ.) -এর সত্যায়ন করতে বাধ্য করে। এতদসত্ত্বেও তারা বাছুর পুঁজা করেছে এবং বলতে লাগলো যে, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। যাবৎ না আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাই। অনুরূপ আরো অনেক উক্তি ছিল। সুতরাং তারা বোধশক্তি, সুস্থ বিবেক এবং উত্তম অনুসরণের ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে অনেক দূরে। কেননা, উম্মতে মুহাম্মদী মুহাম্মাদ (সা.) -এর অনুসরণ করেছে। অথচ তাঁর যেসকল মু'জিযা তাওয়াতুরের

মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলো এমন সূক্ষ্ম বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত যা কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারে। (এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়)। আর উপরিউক্ত ঘটনার সংবাদ প্রদান রাসূলের মু'জিযার অন্যতম একটি মু'জিযা যার বিবরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

☆☆☆

﴿و اذ وٰعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده.......لعلكم تشكرون﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: (الف) ترجم الأية المذكورة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها

(ب) ما المراد بقوله تعالى "واعدنا" ؟ وما المراد بأربعين ليلة؟

(ج) الام اشار سبحانه وتعالى بقوله "ثم اتخذتم العجل" ؟

(د) ما المراد بالظلم فى هذه الأية؟

উত্তর :

الف : আয়াতের অনুবাদ ঃ আর (স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন আমি মূসার সাথে ওয়া'দা করেছি চল্লিশ রাত্রের, অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসা'র অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে জালেম। তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ হযরত মূসা (আ.) মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে খোদাদ্রোহী ফেরআউন ও কিবতীদের অত্যাচার থেকে বনী ইসরাইলকে মুক্তি দেয়ার পর তারা মুসা (আ.) -এর নিকট আসমানী কিতাবের জন্য আবেদন করে। তিনি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী তাওরাত কিতাব অর্জনের জন্য ৩০ দিনের ওয়া'দা করে তুর পর্বতে গমন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার জন্য আপন ভাই হারুন (আ.) -কে রেখে যান। হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে ৩০ দিনের স্থলে ৪০ দিন সিনাই পর্বতে অবস্থান করেন। মুসা (আ.) -এর অনুপস্থিতিতে সামেরী নামক এক ইহুদী স্বর্ণকার বনী ইসরাইলের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে সোনার গহনা সংগ্রহ করে একটি সুন্দর আকৃতির গোবৎস নির্মাণ করে। সে নিজে তার পূজা শুরু করে এবং অন্যদেরও তা করতে প্ররোচিত করে। প্রায় অধিকাংশ বনী ইসরাইল হযরত হারুন (আ.) -এর নিষেধ অমান্য করে গোবৎসের পূজা শুরু করে দেয়। হযরত মুসা (আ.) ৪০ রাত পর মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওরাত কিতাব নিয়ে পর্বতের নীচে অবস্থানরত বনী ইসরাইলের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের অধিকাংশকে গোবৎস পূজা করতে দেখে তিনি খুব রাগান্বিত হোন। অতঃপর তাদের সহ তুর পর্বতে গিয়ে মুসা (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করেন, হে আল্লাহ্ ! বনী ইসরাইল গোবৎস পূজার শিরক থেকে তাওবা করেছে। আপনি তাদের পাপের শাস্তি নির্ধারণ করে দেন। মহান আল্লাহর আদেশ হলো, গোবৎস পূজারী এবং যারা দেখে নীরব ছিল তাদের আপনজন আপনজনকে হত্যা করবে। এ আদেশ মতে তারা খোলা মাঠে এসে সকলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর জন্য ঘাড় পেতে দিল; কিন্তু আপন রক্তের সম্পর্কের কারণে মায়া মমতায় তারা হত্যা করতে পারছিল না। আল্লাহ্ তা'লা এ সময়

পৃথিবীকে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যাতে তারা আপনজনের চেহারা দেখতে না পায়। সে অন্ধকারে প্রায় ৭০ হাজার বনী ইসরাইল তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়।

واعدنا দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত واعدنا দ্বারা ঐ প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ্ তা'লা মুসা (আ.) -কে আসমানী কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে নিয়ে নীল নদ পার হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট কিতাব প্রার্থনা করে দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি তা অবতীর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে واعدنا দ্বারা তাওরাত কিতাব প্রদানের জন্য ৪০ দিনের যে সময় আল্লাহ্ তা'লা বেঁধে দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতিই উদ্দেশ্য।

اربعين ليلة দ্বারা কি উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী – اربعين ليلة তথা চল্লিশ রাত' দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে চল্লিশ রাত দ্বারা চল্লিশ রাত ও চল্লিশ দিন উদ্দেশ্য। কেননা, আরবী মাস রাত থেকে গণনা শুরু হয়। মূলতঃ এ কারণে اربعين يوما বলা হয়নি।

মাসটি যে মাস ছিল ঃ সকল তাফসীরকারের ঐক্যমতে, ঐ মাসটি ছিল পূর্ণ যিলকদ মাস ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

ثم اتخذتم العجل আয়াত দ্বারা কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী– ثم اتخذتم العجل দ্বারা বনী ইসরাইল কর্তৃক গোবৎস পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘটনাটি হলো, ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর আদেশে ৩০ দিনের জন্য তুর পর্বতে গমন করলেন। এ সময় তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.) -কে স্থলাভিষিক্ত করে যান। মহান আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী মুসা (আ.) আরও ১০ দিন বেশি সময় তুর পর্বতে কাটান। এ দিকে সামেরী নামক এক মুশরিক হারূন (আ.) -এর নির্দেশ উপেক্ষা করে একটি গোবৎসের মূর্তি তৈরী করলো। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) -এর ঘোড়ার পদদলিত সামান্য মাটি মূর্তিটির মুখে ঢুকিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ মূর্তিটি হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে শুরু করলো। এটা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাইলরা গোবৎসটির পূজা করতে শুরু করে। এমনকি তারা বলাবলি করতে লাগলো, গোবৎসটির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা আবির্ভূত হয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে ثم اتخذتم العجل দ্বারা এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وانتم ظالمون -এর মধ্যকার ظلم দ্বারা কি উদ্দেশ্য ঃ وانتم ظالمون বাক্যে ظلم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা, বনী ইসরাইল গোবৎস পূজার মাধ্যমে ইবাদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর ظلم বলা হয় وضع الشئ في غير محله তথা কোন বস্তুকে অপাত্রে রাখা।

☆☆☆

﴿واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: ما معنى الفرقان لغة واصطلاحا؟ وما المراد به ههنا؟

উত্তর :

الـفرقان -এর আভিধানিক অর্থ : الـفرقان শব্দটি فعلان ওযনে বাবে نـصـر ينصر -এর মাসদার, এটা الـفـرق মূলধাতু থেকে উদগত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. পৃথককারী, ২. পার্থক্য বিধানকারী, ৩. বিভেদ সৃষ্টিকারী, ৪. মীমাংসাকারী, ৫. ফয়সালাকারী ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায়– الـفـارق بين الـحق والباطل তথা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।

الـفرقان দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে الـفرقان দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) চারটি উক্তি বর্ণনা করেছেন–

১. الفرقان দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য।

২. الفرقان দ্বারা মূসা (আ.) -এর মু'জিযা উদ্দেশ্য, যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা যায়।

৩. الـفـرقـان শব্দ দ্বারা এমন বিধান উদ্দেশ্য, যার দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

৪. الفرقان দ্বারা ঐ সাহায্য বুঝানো হয়েছে, যা মুসা ও তার শত্রুর মাঝে পার্থক্য সূচিত করেছে।

☆☆☆

﴿واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: فسر الأية المذكورة

উত্তর :

تـفـسيـر الأية الـمـذكورة (অত্র আয়াতের তাফসীর) : আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে তাওবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তাওবা করো। তাওবা বলা হয়, অতীতের অপরাধের উপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে এরকম অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা এবং আল্লাহর আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

فتوبوا الى بارئكم "তোমরা তাওবা করো স্বীয় স্রষ্টার প্রতি" -এর অর্থ :

অত্র আয়াতের মধ্যে তাওবা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করা। অতএব আয়াতের মর্ম হবে, তোমরা স্বীয় স্রষ্টার প্রতি প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করো। ২. কৃত অপরাধের

উপর অনুতপ্ত হওয়া।

البارئ অর্থ : بارئ শব্দটি اسم فاعل , অর্থ– সৃষ্টিকারী। বলা হয় برأ الله الخلق اى خلقهم । المقدر الناقل অর্থ خالق আর المبدع المحدث অর্থ بارئ –এর মাঝে পার্থক্য হলো– خالق এবং بارئ শব্দমূলে একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তু পৃথক হওয়ার অর্থ রয়েছে। من حال برئ الى حال । যখন রোগী সুস্থ হয়, তখন বলা হয়– برئ المريض من مرضه আবার ঋণগ্রস্ত যখন ঋণ থেকে মুক্ত হয়, তখন বলা হয়– برئ المديون من الدين এথেকেই আল্লাহ্ তা'লার সিফাতী নাম البارئ নির্গত। কেননা, তিনি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং عدم থেকে পৃথক করে وجود -এ এনেছেন। আবার এ থেকেই (المخلوق) البرية بمعنى الخليقة -এর ব্যবহার রয়েছে। কেননা, মাখলূক عدم থেকে পৃথক হয়ে وجود -এ এসেছে।

فاقتلوا انفسكم-এর তাফসীর : এটা বনী ইসরাইলের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা। এখানে قتل نفس -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন–

১. তোমরা বাছুর পূজার কারণে আত্মহত্যা করো, যাতে তোমাদের তওবা পরিপূর্ণ তওবা হয়।

২. নিজের কামভাব ও জৈবিক চাহিদা বর্জন করো।

৩. তোমরা যারা বাছুর পূজা করেছিলে, একে অপরকে হত্যা করো।

৪. যারা বাছুর পূজা করেনি, তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। বর্ণিত আছে যে, তারা এ আদেশ মতে খোলা মাঠে এসে সকলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর জন্য ঘাড় পেতে দিল; কিন্তু আপন রক্তের সম্পর্কের কারণে মায়া মমতায় তারা হত্যা করতে পারছিল না। আল্লাহ্ তা'লা এ সময় পৃথিবীকে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যাতে তারা আপনজনের চেহারা দেখতে না পায়। সে অন্ধকারে প্রায় ৭০ হাজার বনী ইসরাইল তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়।

☆☆☆

﴿واذ قلتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصٰعقة وانتم تنظرون. ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: (الف) ترجم الأية الكريمة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها

(ب) "لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة" من القائلون لهذا ولمن قالوا ومتى قالوا؟ 'جهرة' فى أى محل من الاعراب؟

(ج) ما معنى الصاعقة وما المراد بها؟ وما ذا سببها؟

উত্তর :

الف : আয়াতের অনুবাদ : আর তোমরা (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা ! কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে

দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলের অবাস্তব আবেদন, বজ্রপাত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্তি এবং সেখানে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘটনাটি হলো, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাওরাতপ্রাপ্তির পর হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলের নিকট তা পেশ করেন। তারা আল্লাহ্কে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওরাত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে এবং হযরত মুসা (আ.) -কে নবীরূপে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ৭০ জন লোক নিয়ে সিনাই পর্বতে গমন করেন। সেখানে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত তাওরাত আসমানী গ্রন্থ এবং মুসা (আ.) -কে তাঁর সত্য নবী বলে ঘোষণা দিয়ে তাওরাত ও হযরত মুসা (আ.) -এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেন। তা সত্ত্বেও তারা যখন মহান আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার জন্য বায়না ধরলো, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর বজ্রপাত করায় তাদের সকলেই মারা যায়। এমতাবস্থায় হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর নিকট তাদের জীবিত করে দেয়ার আবেদন জানালে আল্লাহ্ তা'লা দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

ب : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة **কারা কাকে কখন বলেছিল ঃ** আল্লাহ্ তা'লার বাণী – لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة এ উক্তিটি কারা কাকে কখন বলেছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. لن نؤمن لك বাক্যটি ঐ ৭০ জন বনী ইসরাইল হযরত মুসা (আ.) -কে লক্ষ্য করে বলেছিল, যারা তাওরাতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মুসা (আ.) -এর সাথে তুর পর্বতে গিয়েছিল।

২. কারো কারো মতে, মুসা (আ.) যখন তুর পর্বত থেকে স্বগোত্রে ফিরে এসে বাছুর পূজারীদের হত্যা করে ও বাছুরকে জ্বালিয়ে দেয়, তখন গোত্রের কিছু লোক মুসা (আ.) -কে সম্বোধন করে এ উক্তি করেছিলো।

৩. কারো কারো মতে, لن نؤمن لك উক্তিকারীদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

৪. আবার কারো কারো মতে, বনী ইসরাইলের সকল লোক মুসা (আ.) -কে এরূপ বলেছিল।

جهرة -এর তারকীব ঃ جهرة শব্দটি তারকীবে কি হয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. جهرة এটা نرى ফে'লের مفعول مطلق من غير لفظه ,

২. جهرة এটা نرى ফে'লের ফায়িল থেকে حال হয়েছে।

৩. অথবা মাফউল তথা الله থেকে حال হয়েছে।

ج : **صاعقة -এর অর্থ ঃ** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الصاعقة শব্দটি اسم جامد একবচন। বহুবচনে الصواعق অর্থ–আর্তচিৎকার, বজ্রধ্বনি, বজ্রপাত ইত্যাদি।

الصاعقة দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ الصاعقة দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) ওলামায়ে কেরামের নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন–

১. বজ্রপাত।

২. আকাশ হতে অবতীর্ণ অগ্নি।

৩. আকাশ হতে আগত বিকট শব্দ।

৪. ফেরেশতা আগমনের ভয়ঙ্কর শব্দ।

الصاعقة তথা বজ্রপাতের কারণ ঃ মুসা (আ.) -এর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোকগণ হযরত মুসা (আ.) -কে বলেছিল, আমরা আল্লাহর বাণী সরাসরি শ্রবণ করা ব্যতীত আপনার আনীত এ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পরি না। অতএব যখন তারা সরাসরি গায়েবী আওয়াজে তাওরাতের সত্যতা শুনতে পায়, তখন তারা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, অথচ মু'জিযা প্রদর্শনের পর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আকাশ হতে অবতারিত অগ্নি অথবা জিবরাইলের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

☆☆☆

﴿وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبٰت ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: (الف) ترجم الأية الكريمة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها

(ب) ما معنى الغمام؟

(ج) المن والسلوى ما هما؟

উত্তর :

الف : আয়াতের অনুবাদ ঃ আর আমি মেঘমালা দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের প্রতি প্রেরণ করলাম মান্না ও সালওয়া (আসমানী খাবার)। তার মধ্য হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খাও, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছিলাম, কিন্তু (তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) আমার প্রতি জুলুম করেনি; বরং নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

وظللنا عليكم الغمام সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা তীহ্ প্রান্তরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, বনী ইসরাইলের আদি বাসস্থান ছিল সিরিয়া। এ সময় আমালেকা নামক এক শক্তিশালী জাতি সিরিয়া অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি দানের পর আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাইলকে তাদের আদি আবাসভূমি সিরিয়া আমালেকাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা যখন সিরিয়া উপকণ্ঠে পৌছে, তখন ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের কথা জানতে পেরে হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং জেহাদে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এমনকি তারা মুসা (আ.) -কে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা এখানে অবস্থান করছি।" আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে তীহ্ প্রান্তরে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত করার শাস্তি প্রদান করেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায়

ছয় লক্ষ। এ তীহ্ প্রান্তরে তাদের বিশোর্ধ্ব বয়সের নব লোক মৃত্যুবরণ করে। সেখানে কোন ছায়া ছিল না। ফলে মেঘমালা দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ছায়া দান করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমা وظللنا عليكم الغمام দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ج : غمام **শব্দের অর্থ ঃ** الغمام শব্দটি غمامة শব্দের বহুবচন; غم থেকে নিষ্পন্ন। আর غم শব্দের অর্থ– ঢেকে রাখা, আবৃত করা। মেঘমালাকে আলোচ্য আয়াতে غمام বলা হয়েছে। কেননা, তা আকাশকে ঢেকে রাখে। বনী ইসরাইল তীহ্ প্রান্তরে অবস্থান করার সময় প্রখর রৌদ্র তাপে কষ্ট পাওয়ার অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তা'লা এক খণ্ড সাদা মেঘমালার সাহায্যে তাদেরকে ছায়া দানের ব্যবস্থা করে দেন।

মান্না ও সালওয়া -এর পরিচয়

মান্না -এর পরিচয় ঃ المن শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. المن এক প্রকার খাদ্যবস্তু, যা বনী ইসরাইলের জন্য রাতে শিশির বিন্দুর মতো যমীনে জমে থাকতো এবং সকালে তারা তা সংগ্রহ করে আহার করতো।

২. এটা গাছ থেকে নির্গত এক প্রকার মিষ্টি আঠা বিশেষ।

৩. কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি এক প্রকার খাবার। যা উলুর মতো তাদের ঘরে সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে পড়তো।

সালওয়া -এর পরিচয় ঃ سلوى শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাসিসরগণের কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. কেউ কেউ বলেন, এটা হলো মধু।

২. লাল রংবিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখি।

৩. কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল এক প্রকার পাখি, যার নাম ছিল ভরত পাখি।

৪. অধিকাংশ আলেমের মতে, এটা ছিল ক্ষুদ্র পাখি, যা আসমান থেকে ভুনা হয়ে আসতো।

☆☆☆

﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيكم وسنزيد المحسنين﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: (الف) ما المراد بـ 'هذه القرية' و بـ 'ادخلوا الباب سجدا' ؟

(ب) ما معنى ' حطة '

(ج) فسر قوله تعالى ﴿وسنزيد المحسنين﴾

উত্তর :

الف : القرية **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** আল্লাহ্ তা'লার বাণী هذه القرية দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. القرية দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য।

২. বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার 'আরীহা' নামক একটি গ্রাম উদ্দেশ্য।

ادخلوا الباب -এর মর্মার্থ ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত দু'টি প্রণিধানযোগ্য। যথা–

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মহান আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাইলকে যে নগরদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের সেই দ্বারদেশ যা বর্তমানে 'বাবে হিত্তা' নামে পরিচিত।

২. কেউ কেউ বলেন, ঐ কুব্বা -এর দরজা উদ্দেশ্য, যে দিকে তাকিয়ে বনী ইসরাইল নামায আদায় করতো।

سجدا দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এখানে سجدا তথা সেজদা দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ তথা রুকুর মতো মাথা ঝুঁকানো উদ্দেশ্য। অথবা পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

ب : حطة শব্দের অর্থ ঃ حطة শব্দটি فِعْلَةٌ ওযনে حَطٌّ মাদ্দাহ্ থেকে গৃহীত। যার অর্থ হচ্ছে– طلب المغفرة তথা গোনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর حطة শব্দের অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. কেউ কেউ বলেন, বাক্যটি মূলে ছিল– أَحِطَّ عَنَّا خَطَايَانَا অর্থাৎ আমাদের গোনাহ্ মিটিয়ে দিন।

২. অথবা মূলে ছিল– قُوْلُوْا شَيْئًا يُحِطُّ ذُنُوْبَكُمْ অর্থাৎ তোমরা এমন কিছু বলো, যা তোমাদের গোনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেবে।

৩. কারো কারো মতে, মাগফিরাত কামনা করাকে حطة বলা হয়।

ج : سنزيد المحسنين -এর মর্মার্থ ঃ মহান আল্লাহর অমিয় বাণী سنزيد المحسنين -এর অর্থ হচ্ছে– আমি সৎকর্মশীলদেরকে আরো অধিক দান করবো। অর্থাৎ বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়নি তাদের উপর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেব। এখানে محسنين হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি, যারা ঈমানকে খাঁটি করতঃ নফসকে সুন্দর ও মার্জিত করার পাশপাশি ফরয কাজসমূহ সম্পন্ন করে এবং তাদের অনিষ্ট হতে অন্য মুমিনগণ নিরাপদ থাকে।

﴿واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قدعلم كل اناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا في الأرض مفسدين﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال:(الف) ما المراد بالعصا والحجر؟

(ب) فسر قوله تعالى: اثنتا عشرة عينا۔ كلوا واشربوا من رزق الله ۔

উত্তর :

الف : عصا দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মহান আল্লাহর বাণী اضرب بعصاك الحجر আয়াতে عصا দ্বারা মুসা (আ.) -এর সেই অলৌকিক লাঠি উদ্দেশ্য, যা হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন। কালক্রমে এ লাঠি হযরত শুয়াইব (আ.) -এর হস্তগত হয়। তিনি তা মুসা (আ.) -কে দান করেন। এ লাঠিটি সর্বদা হযরত মুসা (আ.) -এর সাথে থাকতো। তিনি এর দ্বারা বিভিন্ন মু'জিযা প্রদর্শন করতেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল হযরত মুসা (আ.) -এর শরীরের দৈর্ঘ্যের সমান; অর্থাৎ দশ হাত। এ লাঠির বিশেষত্ব ছিল এই যে, অন্ধকারে এর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো।

حجر দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ الحجر -এর الف ও لام টি عهد خارجى -এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ এর দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পাথর উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

১. এটা তুর পর্বতের চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি পাথর ছিল। মুসা (আ.) তুর পর্বত থেকে এই পাথরটি নিয়ে এসেছিলেন। এর চারদিক হতে তিনটি করে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্রের নিকট পৌঁছতো।

২. এটা ছিল একটি বেহেশতী পাথর। আদম (আ.) এটাকে বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন। কালক্রমে এ লাঠি হযরত শুয়াইব (আ.) -এর হস্তগত হয়। তিনি তা মুসা (আ.) -কে দান করেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, মুসা (আ.) গোসল করার জন্য যে পাথরের উপর দিগম্বর হয়ে কাপড় রাখতেন এবং মুসার প্রতি ইহুদীদের আরোপিত অণ্ডকোষ স্ফীতির অপবাদ দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে পাথরটি তার কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল, এটা সেই পাথর।

৪. কেউ কেউ বলেন, الحجر -এর الف ও لام টি جنس -এর জন্য। এমতাবস্থায় পাথর দ্বারা যে কোন পাথর উদ্দেশ্য।

ب : اثنتا عشرة عينا -এর মর্মার্থ ঃ আলোচ্য আয়াতাংশে اثنتا عشرة عينا -এর অর্থ হলো, বারোটি ঝরণাধারা। আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইয়া'কুব (আ.) -এর বারোজন পুত্রের প্রত্যেক বংশধরদের জন্য এক একটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। এর মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য নিহিত। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো।

১. বারোটি সম্প্রদায় একই নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি, হিংসা, বিদ্বেষ ছিল। অথচ স্বগোত্রীয়দের মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাই পারস্পরিক কলহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করা

হয়েছিল।

২. বনী ইসরাইলের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্রে পানাহারে অভ্যস্ত ছিল না বিধায় বারোটি গোত্রের জন্য বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করা হয়েছিল।

৩. পানির অভাব মোচনের জন্য প্রত্যেক গোত্রের জন্য এক একটি করে ঝরনাধারা দেয়া হয়েছিল।

كلوا واشربوا من رزق الله **-এর মর্মার্থ ঃ** আল্লাহ্ তা'লার বাণী كلوا واشربوا من رزق الله -এর অর্থ হলো, 'তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে খাও এবং পন করো।' আলোচ্য বাক্যের মধ্যে رزق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– মান্না ও সালওয়া এবং ঝরনাধারা হতে প্রবাহিত পানি। কেউ কেউ বলেন, রিযিক দ্বারা শুধু পানি উদ্দেশ্য। কেননা, পানি তো পান করার বস্তু এবং পানির সাহায্যে যা উৎপাদিত হয় তা খাবারের বস্তু।

☆☆☆

﴿واذ قلتم يموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال:(الف) ما المراد بـ 'طعام واحد' وكيف قالوا طعام واحد ؟ مع ان الطعام اثنان۔

(ب) قوله "من بقلها وقثائها" فى اى محل من الاعراب؟

(ج) اكتب معانى الألفاظ الأتية: بقل, قثاء, فوم, عدس, بصل۔

উত্তর :

الف: طعام واحد **দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ** তীহ্ প্রান্তরে বসবাসকারী বনী ইসরাইলদের কাছে মহান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মান্না ও সালওয়া নামক সুস্বাদু খাবার নাযিল হতো। অনায়াসলব্ধ এ খাদ্য খেয়েই তারা জীবন ধারণ করতো। হতভাগার দল দৈনিক একই খাবারের পরিবর্তে ভূমি হতে উৎপন্ন কৃষিজাত খাদ্য চেয়েছিল। طعام واحد দ্বারা মূলতঃ সে মান্না ও সালওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রতিদিনই তাদের জন্য এ জাতীয় খাবার-ই নাযিল হতো যদিও খাদ্য সংখ্যা দু'টি, কিন্তু তারা একটিকে অপরটির সাথে মিশিয়ে খেত; তাই উভয়টিকে একই প্রকার ধরা হয়েছে। কারো কারো মতে, প্রত্যেক দিন একই ধরনের খাদ্য আসতো বিধায় طعام واحد বলা হয়েছে। সুতরাং طعام واحد বলতে مَنّ ও سَلْوٰى উদ্দেশ্য।

ب- من بقلها **-এর তারকীব ঃ** এখানে من টি হলো بيانيه এবং من بقلها الخ এটা تنبت -এর উহ্য মাফউল বিহি থেকে حال হয়েছে। মূল ইবারত এভবে– مما تنبته الأرض كائنا من بقلها وقثائها । কেউ কেউ বলেন, من بقلها الخ এটা ما থেকে بدل হয়েছে।

শব্দার্থ

○ بقل : অর্থ ভূমি হতে উৎপন্ন কৃষিজাত খাদ্য। এর দ্বারা সুস্বাদু শাকসবজি উদ্দেশ্য।

০ قثاء : অর্থ ক্ষিরা, শশা।
০ فوم : অর্থ গম। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো রুটি। আবার কেউ কেউ বলেন রসুন।
০ عدس : অর্থ ডাল।
০ بصل : অর্থ পেঁয়াজ।

☆☆☆

﴿ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الأخر وعمل صالحا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال: فسر الأية كما فسر المفسر العلام

উত্তর :

ان الذين امنوا **"নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে" -এর মর্মার্থ ঃ**

আলোচ্য আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে। এখানে ঈমান আনয়নের অর্থ হলো, যারা মুখে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর দ্বারা সেই সকল লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন। চাই এরা মুমিন হোক কিংবা মুনাফিক। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা শুধুমাত্র মুনাফিকরা উদ্দেশ্য।

والذين هادوا والنصارى **ইহুদী, নাসারা ও সাবিয়ীনদের পরিচয় ঃ**

ইহুদী ঃ ইহুদীরা হযরত মুসা (আ.) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। ইয়াহুদ শব্দটি যদি আরবী হয়, তবে এটা تهــــود থেকে উৎকলিত। যার অর্থ– তাওবা করা। ইহুদীরা যেহেতু বাছুর পূজা থেকে তাওবা করেছিল, তাই তাদের ইহুদী নাম দেয়া হয়েছে। আর যদি অনারবী হয়, তবে এটা يهـــــــوذا থেকে উৎকলিত। অরবী ভাষায় রূপান্তরিত করে ইহুদী বানিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত ইয়া'কুব (আ.) -এর বড় পুত্রের নাম ছিল ইয়াহুযা। এ জন্য তাঁর অনুসারীদের ইহুদী বলা হয়।

নাসার ঃ نصارى শব্দটি نصران শব্দের বহুবচন, যেমন ندامى শব্দ ندمان শব্দের বহুবচন। নাসারা শব্দের অর্থ– সাহায্যকারী। তারা হযরত ঈসা (আ.) -এর সাহায্য করেছিল বিধায় তাদের নাসারা নাম দেয়া হয়েছে। অথবা তারা ঈসা (আ.) -এর সাথে নাসরান অথবা নাসিরা নামক গ্রামে বসবাস করতো বিধায় তাদেরকে সেই গ্রামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে নাসারা বলা হয়।

সাবিয়ীগণ ঃ সাবী -এর শাব্দিক অর্থ হলো– যে কেউ নিজের দ্বীন ত্যাগ করে অপরের দ্বীন গ্রহণ করে, বা অপরের দ্বীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় সাবিয়ীন নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রেসালাতের বিশ্বাসী। কারণ, তারা মূলতঃ আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহ্ইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল

ইয়াহ্ইয়া (আ.) -এর উম্মত। হযরত উমর (রা.) -এর মতো বিজ্ঞ খলীফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবিয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত উমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

من امن بالله واليوم الأخر وعمل صالحا : "যে কেউ আল্লাহ্ তা'লা, পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক আমল করেছে।" অর্থাৎ নিজের ধর্ম রহিত হওয়ার পূর্বে নিজের ধর্মের উপর অটল থেকেছে এবং মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'লা ও পরকালকে বিশ্বাস করেছে এবং নিজের শরীয়ত মোতাবেক আমল করেছে। কেউ কেউ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, উপরিউক্ত কাফির সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা একনিষ্ঠভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে।

فلهم اجرهم عند ربهم : "তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে।" এ আয়াতাংশে اجر দ্বারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সেই সওয়াব উদ্দেশ্য, যা ঈমান ও আমলের বিনিময় হিসেবে দেয়া হবে।

ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون : "তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।" অর্থাৎ যে সময় কাফিররা আযাবের আশঙ্কা করবে এবং আমলে ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী মুমিনরা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপর চিন্তান্বিত হবে, সে সময় তাদের কোন ভয়-ভীতি এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবে না।

☆☆☆

واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.

ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخسرين.

الأسئلة المتعلقة

السوال:(الف) اكتب الواقعة المتعلقة بهذه الأية

(ب) فسر قوله تعالى: واذكروا ما فيه لعلكم تتفكرون- و "فلولا فضل الله عليكم"

উত্তর :

الف : **আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ** মহান আল্লাহর বাণী واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور -এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি হলো, বনী ইসরাইল হযরত মুসা (আ.) -এর কাছে নতুন শরীয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার পর মুসা (আ.) আল্লাহর নিকট কিতাব প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'লা তুর পর্বতে মুসা (আ.) -কে তাওরাত দান করলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলরা সে কিতাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে গড়িমসি শুরু করল। তারা ক্রমশ অবাধ্য হতে থাকে এবং গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ অবাধ্য জাতিকে সু-পথে আনার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তুর পর্বতকে তাদের মাথার উপর উত্তোলন করে রাখেন। তাদের সামনে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল এবং পিছনে ছিল গভীর নদী। পলায়নের কোন পথ

না থাকায় তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার বিধান মেনে চলো, অন্যথায় তোমাদের পর্বত চাপা দিয়ে নিঃশেষ করে দেব। চারদিকে মহাবিপদ দেখে তারা অনন্যোপায় হয়ে মহান আল্লাহর বিধান মেনে নিলো।

واذكروا ما فيه لعلكم تتفكرون **আয়াতাংশের তাফসীর ঃ** আল্লামা বায়যাবী (র.) واذكروا ما فيه আয়াতাংশের তিনটি তাফসীর করেছেন। যথা--

১. মানুষকে আমার এই বিধানসমূহের শিক্ষা দেবে; এগুলোকে ভুলবে না।

২. এই বিধানসমূহের মধ্যে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করবে।

৩. তোমরা এগুলোর উপর আমল করবে।

فلولا فضل الله -এর মর্মার্থ ঃ মহান আল্লাহর বাণী فلولا فضل الله -এর অর্থ হলো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইলের উপর মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ছিল। এখানে فضل বা অনুগ্রহ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১. فضل দ্বারা তাওবা করার শক্তিদান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলকে তাওবা করার তাওফীক দান করেছেন। এটা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

২. মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সত্য পথে আহ্বান করেছেন। এটা ছিল আল্লাহর বড় অনুগ্রহ।

☆☆☆

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

الأسئلة المتعلقة

السوال: فسر الاية حق التفسير ثم بين القصة المتعلقة موضحة

উত্তর :

আয়াতের তাফসীর ঃ প্রথম আয়াতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতের মর্ম হল, হযরত মুসা (আ.) ইহুদীদের জন্য এমন একটি দিন নির্ধারিত করতে চাইলেন, যে দিনে তারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল থাকবে। তাই তিনি জুমআর দিনটিকে নির্ধারিত করলেন। কিন্তু ইহুদীরা তার বিরোধিতা করল। তারা বলল যে, আল্লাহ্ তা'লা শনিবার দিন কোন কিছু সৃষ্টি করেননি বরং অবসর ছিলেন। কাজেই আমরাও শনিবার দিনে সকল কাজ-কাম ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকব। এজন্য তারা শনিবার দিনকে সম্মান করল এবং ইবাদতের জন্য এই দিনকে নির্ধারিত করলো।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঃ হযরত দাউদ (আ.) -এর আমলে বনী ইসরাঈলের জন্যে শনিবার দিনটি ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য ছিল নির্ধারিত। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মস্‌খ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে

আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نـكـال 'শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত' বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্যে একে مـوعـظـة 'উপদেশপ্রদ' ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হল না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুইভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে জিজ্ঞেস করলেন : হুযুর ! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন সম্পর্ক নেই।

☆☆☆

﴿واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين﴾

الأسئلة المتعلقة

السوال:(الف) اكتب الواقعة المشار اليها وقوله تعالى: هزوا ما هو محل الاعراب؟

(ب) ما ذا سبب قولهم اتتخذنا هزوا؟

উত্তর :

الف : আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : বনী ইসরাইলের আমিল নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তার ভাতিজা সম্পত্তি কুক্ষিগত করা এবং একমাত্র সুন্দরী চাচাত বোনকে বিয়ে করার জন্য হত্যা করেছিল। রাতের অন্ধকারে চাচাকে হত্যা করার পর সে চাচার লাশ অন্য একটি গোত্রের ফটকের সামনে ফেলে আসে।

প্রত্যুষে চাচার লাশ নিয়ে হত্যার বিচার দাবি করে। ফলে দু'গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। তখন জনৈক ব্যক্তির পরামর্শে হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য তারা হযরত মুসা (আ.) -এর শরণাপন্ন হয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে হযরত মুসা (আ.) তাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ লাভের পর তারা গরু জবাই করতে টালবাহানা শুরু করে। গরুর আকৃতি, ধরন, রং ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তারা মুসা (আ.) -কে বিরক্ত করেছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা একটি মোটাতাজা, মধ্যম বয়সী দামি গরু জবাই করার নির্দেশ দিলেন। তারা একটি এতিম ছেলের সমওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে একটি গাভী ক্রয় করে তা জবাই করতঃ এক টুকরা গোশ্ত দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কে আপন ভাতিজার কথা বলেই আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এভাবে রহস্য উদঘাটিত হয়েছিল।

هزوا শব্দের محل اعراب ঃ هزوا শব্দটি تتخذ ফে'লের مفعول ثانى হয়েছে।

ب : اتتخذنا هزوا বলার কারণ ঃ বনী ইসরাইলদের মধ্যকার আমিল নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় নির্ণয় করতে তারা যখন হযরত মুসা (আ.) -এর শরণাপন্ন হয়, তখন মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা একটি গাভী জবাই করো। একথা শুনে সবাই বললো, اتتخذنا هزوا অর্থাৎ আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? বনী ইসরাইল কর্তৃক মুসা (আ.) কে এ কথা বলার কারণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. ব্যাপারটি তাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল বিধায় তারা এ কথা বলেছিল।

২. বনী ইসরাইল বাচাল প্রকৃতির লোক ছিল। মুসা (আ.) গাভী জবাই করতে নির্দেশ দেয়ায় তারা তাদের স্বভাবসুলভ বাচালতার দরুন এ কথা বলেছিল।

☆☆☆

﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك﴾

السوال: فسر الاية كما فسر المفسر العلام

উত্তর :

قوله يبين لنا ما هى : মহান আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা একটি গাভী জবাই করে এর কিছু অংশ দ্বারা মৃত্য ব্যক্তিকে আঘাত করবে। তাহলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার ঘাতকের নাম বলে দিবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গাভী দ্বারা অঃসাধারণ এক গাভী উদ্দেশ্য। কেননা, যে গাভীর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যায়, সেটা কোন সাধারণ গাভী হতে পারে না। আর এই অঃসাধারণ গাভীর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য কি হবে তা বনী ইসরাইলের জানা নেই। ফলে তারা ما শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিল। ما দ্বারা কোন বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

قوله لا فارض ولا بكر : فارض শব্দের অর্থ– বৃদ্ধ। فرض শব্দের মূল অর্থ হলো, কেটে ফেলা,

নিঃশেষ করা। যেমন বলা হয় فرضت البقرة فرضا "গাভীটি স্বীয় যৌবনের দিনগুলোকে অতিবাহিত করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে।" بكر অর্থ — কুমারী। এই শব্দের মূলবর্ণে 'প্রথম' অর্থ রয়েছে। তা থেকেই بكرة শব্দটি নির্গত, যার অর্থ– দিনের প্রথমাংশ, প্রথম ফল।

عوان بين ذالك : عوان শব্দের অর্থ– মধ্যবয়সী। অর্থাৎ এ গাভীটি এমন হবে, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়; বরং বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের।

গাভী দ্বারা কি নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য না অনির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য ঃ

আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাইলকে গাভী জবাইয়ের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কি কোন নির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য ছিল না অনির্দিষ্ট গাভী, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১. কোন কোন তাফসীকারকের মতে, এখানে গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট একটি গাভী উদ্দেশ্য। তবে আদেশের ক্ষেত্রে بقرة শব্দকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

২. কেউ কেউ বলেন, গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বনী ইসরাইলরা যখন এ নির্দেশ পালনে টালবাহানা শুরু করে দিল এবং নানা প্রকার প্রশ্ন করা আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের হুকুমকে পরিবর্তন করে নতুন হুকুম জারি করে দিলেন যে, এখন নির্দিষ্ট একটি গাভী জবাই করতে হবে।

প্রথম পক্ষের দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী انها بقرة لا فارض ولا بكر - انها بقرة صفراء এবং انها بقرة لا ذلول تثير الأرض এ আয়াতসমূহরে মধ্যে সর্বনামগুলো পূর্বের অনির্দিষ্ট গাভী তথা ان تذبحوا بقرة -এর মধ্যকার بقرة -এর দিকে ফিরছে। এর অর্থ হলো, এই সর্বনামগুলোর পরে যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হবে, তা ঐ গাভীরই বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত। এবং সে গাভীটির মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

দ্বিতীয় প্রক্ষের দলীল ঃ প্রথম দলীলটি হলো, কুরআনের বাহ্যিক শব্দ তথা بقرة এটা হলো নাকেরা। আর নাকেরা বলা হয়, যা অনির্দিষ্ট কোন কিছু বুঝায়। দ্বিতীয় দলীল হলো, রাসূল (সা.) -এর হাদীস– لو ذبحوا اى بقرة ارادوا لأجازتهم ولكن شددوا على انفسهم فشد الله عليهم অর্থাৎ তারা (বনী ইসরাইলরা) যদি যে কোন একটি গাভী জবাই করতো, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা নিজে নিজের উপর কঠোরতা অবলম্বন করলো। বিধায় আল্লাহ্ তা'লাও তাদের উপর কঠিন বিধান আরোপ করে দিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এখানে গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অনির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাদের টালবাহানার কারণে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রথম পক্ষের অভিমতটি দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়।

☆☆☆

﴿قالوا ادع لنا ربک يبين لنا ما لونها ط قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظرين﴾

السوال: اكتب ما قال المصنف العلام فى هذه الأية

উত্তর :

قوله فَاقِع : শব্দটি فاقع **শব্দটি** اسم فاعل -এর সীগাহ, فقوع থেকে নির্গত। যার অর্থ– গাঢ় হলুদ। যেমন বলা হয় اصفر فاقع গাঢ় হলুদ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, فاقع **শব্দটি** صفراء শব্দের সিফাত হয়েছে কাজেই এটাকে صفراء শব্দের দিকে নিসবত করে صفراء فاقعة এরকম বলা উচিত ছিল। কিন্তু তাকে নিসবত করা হয়েছে لون শব্দের দিকে। এর কারণ কি?

উত্তর: এর উত্তর হলো, এখানে فاقع শব্দকে لون শব্দের দিকে নিসবত করা হয়েছে صفراء -এর অর্থের মধ্যে مبالغه সৃষ্টির জন্য। কেননা, لون দ্বারা صفرة উদ্দেশ্য। অতএব আয়াতের অর্থ হবে صفراء شديدة الصفرة صفر । হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, صفراء শব্দের অর্থ سوداء شديدة السواد গাঢ় কালো।

☆☆☆

﴿قالوا ادع لنا ربک يبين لنا ما هى ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون﴾

السوال:(الف) لم كرروا السوال؟ (ب) كم قراءة فى تشابه وما هى؟

উত্তর (الف)

বনী ইসরাইলরা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল কেন ঃ পূর্বের আয়াতে গাভীর যে রঙ এবং গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা অনেক গাভীর মাঝেই পাওয়া যায়। তাই তারা নির্দিষ্টকরণার্থে এবং অধিক সুস্পষ্টতার জন্য আবার প্রশ্ন করলো।

ب:القراءة فى تشابه (তশাবহ-এর কেরাত)ঃ تشابه -এর মধ্যে আরো তেরটি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. يَتَشَابَهُ (ياء সহ)।
২. تَتَشَابَهُ (تاء সহ)।
৩. تَشَابَهُ (এক تاء -কে হযফ করে। صيغه مضارع)।
৪. يَشَّابَهُ (تاء -কে شين বানিয়ে شين -কে شين -এর মধ্যে ইদগাম করে)।
৫. تَشَّابَهُ (মূলতঃ تَتَشَابَهُ ছিল)।
৬. تَشَابَهَتْ
৭. تَشَّابَهَتْ
৮. تَشَبَّهُ
৯. يَشَبَّهُ
১০. مُتَشَابِهٌ

ফর্মা ৰ-৩৪/ক

১১. مُتَشَابِهَةٌ
১২. مُشْتَبِهَةٌ
১৩. مُتَشَبِّهَةٌ

﴿وإذ قتلتم نفسا فادّرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾

السوال: (الف) كيف خوطب بالجمع مع أن القاتل كان واحدا؟
(ب) بين معنى قوله تعالى: فادّرأتم

উত্তর ঃ

وإذ قتلتم نفسا: এখানে প্রশ্ন হয় যে, قاتل বা হত্যাকারী তো একজনই ছিল। তারপরও এখানে বহুবচনের সীগাহ্ ব্যবহার করা হলো কেন? তার উত্তর হলো, যেহেতু নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী জানা যায়নি, সেহেতু পূর্ণজাতির প্রতিই তার নিসবত করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হত্যাকারী দু'জন ছিল। সে হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে। এখানে جمع فوق الواحد হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, হত্যাকারী অনেক লোকই ছিল। কেননা, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ সকলে একমত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তাই বহুবচনের দ্বারা সকলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

فادّرأتم -এর মর্মার্থ ঃ ادّرأتم এটা تدارأ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো, পরস্পর ঝগড়া করা, প্রতিহত করা ও প্রতিরোধ করা। এখানে ادّرأتم -এর দু'টি মর্ম হতে পারে।

১. তোমরা নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে পরস্পর ঝগড়া করেছিলে। অর্থাৎ একজন অপরজনকে দোষারূপ করেছ।

২. তোমরা হত্যার দোষকে নিজের থেকে প্রতিহত করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।

ادّرأتم -এর তা'লীল ঃ ادّرأتم মূলতঃ تدارأتم ছিল। تاء -কে دال বানিয়ে دال -কে دال -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অতঃপর ابتداء بالسكون কঠিন হওয়ায় শুরুতে একটি همزة الوصل নেওয়া হয়েছে।

والله مخرج ما كنتم تكتمون : "যা তোমরা গোপন করেছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।" এখানে ما كنتم হলো مخرج -এর مفعول به । এখানে প্রশ্ন হয় যে, اسم فاعل আমল করার জন্য اسم فاعل টি حال অথবা استقبال -এর অর্থে হওয়া শর্ত। এখানে এ শর্তটি পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, مخرج ইসমে ফাইলটি কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালীন ماضى -এর অর্থ প্রদান করছে। সুতরাং এখানে শর্ত না পাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আমল করলো?

উত্তর: এখানে مخرج ইসমে ফাইলটি استقبال -এর অর্থ প্রদান করছে। কেননা, এর দ্বারা যে সময়ের ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, তা তো প্রকাশ পায়নি; বরং ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে।

☆☆☆

﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيى الله الموتى ويريكم ايته لعلكم تعقلون﴾

السوال:(الف) بأى جزء من البقرة ضرب المقتول؟

(ب) ما الحكمة فى امر ذبح البقرة؟

উত্তর ঃ

الف: الجزء الذى ضرب به المقتول **(নিহত ব্যক্তিকে যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয় ঃ)** নিহত ব্যক্তি আমিলকে গাভীর কোন্ অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. কতিপয় আলেমের মতে, নিহত ব্যক্তিকে গাভীর জিহবা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

২. কেউ কেউ বলেন, গাভীর ডান রান দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

৩. কোন কোন আলেম বলেন, লেজের মূল অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

৪. একদল আলেমের মতে, গাভীর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী একটি গোশতের টুকরা দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল।

ب : الحكمة فى امر ذبح البقرة **(গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের গূঢ় রহস্য ঃ)** এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে প্রথম পর্যায়েই নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন। এতে গাভী জবাই করার নির্দেশ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তথাপি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিলেন কেন?

এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'লা গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, এর বিভিন্ন রহস্য রয়েছে। যথা–

১. গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করা।

২. আল্লাহর একটি ওয়াজিব বিধান পালন করা। কেননা, গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দ্বারা গাভী জবাই করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

৩. এর দ্বারা এতিম ছেলেটির উপকার হওয়া। কেননা, বনী ইসরাইল উক্ত গাভীটি ক্রয় করেছিল একটি এতিম ছেলের নিকট থেকে। এর দ্বারা সে উপকৃত হয়েছে।

৪. এ শিক্ষা দেয়া যে, আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করার পূর্বে তাঁর দরবারে কোরবানী পেশ করা। এ ছাড়া আরো অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে।

☆☆☆

﴿ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة﴾

السوال: فسر الأية كما فسرها المفسر العلام

উত্তর ঃ

যোগসূত্র ঃ পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাবের বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর বিধি-বিধানে হীলা-বাহানা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করতো। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। তা হলো, তাদের قساوت قلب বা অন্তরের রূঢ়তা। সেই সাথে এখানে তাদের উক্ত قساوت قلب সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা দিন-রাত্র আল্লাহ্ তা'লার কুদরত ও নবীর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করছো; কিন্তু তারপরও তোমাদের অন্তর নরম হয় না। এটা কেমন কথা !

قست قلوبكم **:** قست ফে'লটি قسوة থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো– শক্ত হওয়া, রূঢ় হওয়া।

প্রশ্ন: ثم অব্যয়টি تراخى زمان বা কালের দূরত্ব বুঝায়। যার দ্বারা বুঝা যায়, তাদের قساوت قلب একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছে। অথচ বনী ইসরাইলের قساوت قلب সে সময়ই বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং মনে হচ্ছে, ثم -এর ব্যবহার তার محل বা উপযুক্ত স্থানে হয়নি।

উত্তর: এখানে ثم -এর ব্যবহার مجاز হিসেবে استبعاد -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এতসব দলীল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন আকেল-বালেগের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা, তার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র ছিল। বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া ও ঘাতকের নাম বলা এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

من بعد ذلك **:** আয়াতের এ অংশে ذلك -এর مشار اليه কি সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. আলোচ্য আয়াতে ذلك দ্বারা নিহতকে জীবিত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ذلك দ্বারা মুসা (আ.) -এর যাবতীয় মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فهى كالحجارة او اشد قسوة -এর মর্মার্থ ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী فهى كالحجارة او اشد قسوة -এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেলো। অথবা পাথরের চেয়েও আরো বেশি শক্ত।

২. তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেলো অথবা যে বস্তু পাথরের চেয়ে আরো বেশি শক্ত যেমন লোহা তার চেয়েও আরো অধিক শক্ত হয়ে গেলো। এই অর্থানুযায়ী اشد শব্দের পূর্বে مضاف উহ্য থাকবে। মূল ইবারত এভাবে او مثل ما هو اشد قسوة মুযাফকে হযফ করে মুযাফ ইলাইহিকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

او اشد قسوة **:** এখানে او অব্যয়টি تخيير বৈধতাবোধক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তাদেরকে পাথর মনে করা কিংবা তার চেয়েও কঠিন মনে করা উভয়টি বৈধ ও সঠিক।

☆☆☆

﴿وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله﴾

السوال: اكتب ما ذا قال المفسر العلام فى هذه الأية

উত্তর ঃ

যোগসূত্র : পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাবের বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। আয়াতের মর্ম হলো– কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সৃষ্টিজীবের উপকার সাধিত হয়। আরো কতক পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। কিন্তু এই জালেমদের অন্তর মোটেও প্রভাবান্বিত হয় না এবং আল্লাহর আদেশে হৃদয় গলে না।

পাথরের শ্রেনীবিন্যাস ও ক্রিয়া ঃ আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। ১. পাথর থেকে বেশি পানি প্রসরণ ২. কম পানি নিঃসরণ। এ দু'টি প্রভাব সবারই জানা। ৩. আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ, "চেতনা" প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে, যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণতঃ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তা'লা কতক পাথর বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্ তা'লার ভয়।

☆☆☆

﴿افتطمعون ان يؤمنوا لكم فقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون﴾

السوال: فسر الأية المذكورة كما فسرها المفسر العلام

উত্তর ঃ

افتطمعون দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ আয়াতের এ অংশ দ্বারা রাসূল (সা.) ও মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ সর্বদা আশা পোষণ করতেন, আহলে কিতাব তথা ইহুদিগণ যেন মুসলমান হয়ে যায় এবং রাসূলের বিরোধিতা না করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের

নিরাশ করে ইরশাদ করেছেন, যখন তারা (ইহুদীরা) আল্লাহ্ তা'লার বড় বড় নিদর্শন দেখে নিজেদের অন্তঃকরণ কঠিন পাথরের মতো করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কালাম শুনে তা বুঝার পরও তারা পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে, তাদের কাছে তোমরা কি আশা করতে পারো?

ان يؤمنوا لكم -এর **মর্মার্থ** ঃ এখানে ঈমান দ্বারা হয়তো ঈমানের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ সত্যায়ন করা। এমতাবস্থায় لكم -এর لام টি হবে তার صله । আয়াতের অর্থ: তারা তোমাদের সত্যায়ন করবে। অথবা ঈমান দ্বারা পারিভাষিক ঈমান তথা ঈমান আনয়ন করা। এমতাবস্থায় لكم -এর لام টি হবে تعليلية আয়াতের অর্থ হলো, তারা তোমাদের দাওয়াতের কারণে ঈমান আনয়ন করবে।

وقد كان فريقا منهم ও ان يؤمنوا لكم **দ্বারা উদ্দেশ্য কারা** ঃ ان يؤمنوا দ্বারা ইহুদী এবং فريقا منهم দ্বারা তাদের পূর্বসূরীরা উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর বাণী শুনার জন্য হযরত মুসা (আ.) -এর সাথে তূপ পর্বতে গিয়েছিল।

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه : এখানে কালামুল্লাহ্ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তারা তাওরাতের বিকৃতি সাধন করতো। এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যেসকল গুণ ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে পরিবর্তন করতো। যেমন তাওরাতে রাসূল (সা.) -এর গঠন প্রকৃতির বিবরণ এসেছে– كحل العين ربعة جعل الشعر তদস্থলে তারা حسن الوجه طويل ازرق العين سبط الشعر লিখতো।

২. তূর পর্বতে ইহুদীরা মহান আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার পর স্বজাতির নিকট এসে বলেছিল, আমরা আল্লাহর কালাম শুনেছি। আল্লাহ্ পরিশেষে বলেছেন, এ কাজগুলো করা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। এটাই ছিল তাদের বিকৃতির নমুনা।

☆☆☆

﴿واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحذثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لايعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون﴾

السوال: فسر الاية

উত্তর ঃ

تفسير الاية المذكورة **উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর** ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী واذا لقوا الذين امنوا এখানে لقوا (তারা মিলিত হতো) দ্বারা ইহুদীদের মধ্যে মুনাফিকরা উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম হলো, মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করতো, তখন বলতো– আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। অর্থাৎ আমরা এ কথার বিশ্বাস রাখি যে, তোমরা সত্য এবং তোমাদের রাসূল তিনিই যাঁর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাওরাতে।

واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا الخ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য ঃ মহান আল্লাহর বাণী واذا خلا بعضهم الى بعض যখন তারা পরস্পরে নিভৃতে মিলিত হয়। আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত بعضهم শব্দ দ্বারা যারা মুমিনদের কাছে তাওরাতে উল্লেখিত সত্য কথা প্রকাশ করতো সেসব ইহুদী মুনাফিক উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় بعض শব্দ এবং قالوا দ্বারা সেসব কপট ইহুদী মুনাফিক উদ্দেশ্য, যারা সমাজে নেতৃস্থানীয় ছিল। এই নেতৃস্থানীয় ইহুদীরা অন্যান্য ইহুদীদেরকে দোষারূপ করতঃ বলতো, তোমরা মুসলমানদের নিকট সেই সত্য কথা কেন বলো, যা আল্লাহ্ তা'লা তাওরাতে বলেছেন? তোমরা কি এ খবর রাখো যে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই দলীল উপস্থাপন করবে যে, স্বয়ং তোমাদের কিতাব তাওরাত আমাদের পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সত্যায়ন করছে। সুতরাং তোমরা কেন ঈমান আনয়ন করো না?

ليحاجوكم -এর অর্থ : আল্লাহর বাণী ليحاجوكم -এর মর্মার্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের কথা মোতাবেক তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ ইহুদী নেতারা মুনাফিক ইহুদীদেরকে বলেছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.) ও আল-কুরআন সম্পর্কে তাওরাতে উল্লেখিত যে সুসংবাদ মুসলামানদেরকে বলে দিয়েছ, এটাকে তো তারা কিয়াত দিবসে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করবে এবং বলবে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আনীত দ্বীনকে সত্য জেনেও কুফরি করেছ।

عند ربكم -এর ব্যাখ্যা ঃ عند ربكم -এর মর্মার্থ হলো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট। এ বাক্যটির তিনটি ভাবার্থ হতে পারে। যথা–

১. عند ذكر ربكم অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

২. عند ربكم فى يوم القيامة অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে সরাসরি তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে।

৩. بين يدى رسول ربكم অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলের সম্মুখে তোমাদের কথিত উক্তি উপস্থাপন করবে।

افلا تعقلون দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য আয়াতে কারীমার শেষাংশে افلا تعقلون বাক্যটি হয়তো তিরস্কারকারী ইহুদী নেতাদের উক্তি, যা তারা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাতকারী কপট বিশ্বাসী ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল। অথবা আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

او لا يعلمون ان الله يعلم الخ : ইহুদী মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে জবাবদিহিতার আশংকায় মুমিনদের সম্মুখে ঈমানের কথা স্বীকারোক্তির ব্যাপারে একে অপরকে ভর্ৎসনা করেছে। যার মর্ম হলো, তাদের ধারণা এভাবে গোপন করার দ্বারা আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না। এ আয়াতে তাদের সে ধারণা সম্পর্কে ধমক দেয়া হচ্ছে। আয়াতের ভাবার্থ হলো– তাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তো মহান আল্লাহ্ তা'লার জানা, তাদের কিতাবের যাবতীয় প্রমাণ তিনি মুসলমানদিগকে অবহিত করতে পারেন এবং কার্যত কিছু কিছু জানিয়েও দিয়েছেন। রজমের আয়াত তারা গোপন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো প্রকাশ করে দিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। এ ছিল তাদের পণ্ডিতদের অবস্থা, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও আসমানী বিদ্যার দাবিদার ছিল। আর او لا يعلمون -এর যমীরের মেসদাক মুনাফিক বা অমুনাফিক ইহুদী নেতৃবর্গ কিংবা উভয় গ্রুপ হতে পারে।

﴿ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا يظنون﴾

السوال: فسر الأية

উত্তর ঃ

আয়াতের তাফসীর ঃ

ومنهم اميون لايعلمون الخ : এ অংশটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী وقد كان فريق منهم বাক্যের উপর মা'তুফ হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, হে মুসলমানগণ ! তোমরা ইহুদীদের থেকে ঈমানের আশা করছো, অথচ তাদের মধ্যে এমন মূর্খ লোকও রয়েছে যাদের কোন খবরই ছিল না তাওরাতে কি লেখা আছে না আছে? তাদের ছিল কেবল কিছু মিথ্য আশা, যা তাদের পন্ডিতদের কাছ থেকে তারা শুনে রেখেছিল। যেমন, জান্নাতে ইহুদী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বস্তুতঃ এসব তাদের অমূলক কল্পনা। এর কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

০ اميون: এটি امی -এর বহুবচন। উম্মি বলা হয় هو الذى لايقرأ ولايكتب যে লেখা-পড়া জানে না।

০ الا امانى: এটা مستثنى منقطع। কারণ, এখানে মুসতাছনা তথা امانى মুসতাছনা মিনহু তথা কিতাবের جنس নয়। امانى এটা امنية শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো, অন্তরে কোন কিছুর কল্পনা করা। এটা তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. امنية অর্থ- মিথ্যা কথা। কেননা, মিথ্যা কথা তো অন্তরেরই ফসল।

২. امنية অর্থ- আশা-আকাঙ্খা। কেননা, আশা-আকাঙ্খা সর্বপ্রথম অন্তরেই উদিত হয়।

৩. امنية অর্থ- পাঠ করা।

এখানে الا مانى -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. এরা শুধু মিথ্যাবাসনাগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে। বাস্তবতা ও তথ্যনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যেগুলোর কোন সংযোগ নেই।

২. মিথ্যা বিবরণ, অপ্রামাণ্য ও অবাস্তব কল্প-কাহিনীতে নিমগ্ন থাকে। বিভিন্ন মিথ্যা (অবাস্তব) উক্তি, যা তারা তাদের বিদ্বানদের নিকট হতে শুনে অন্ধ অনুকরণ করে তা উদ্ধৃত করছে।

﴿فويل للذين يكتبون الكتب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون﴾

السوال: فسر الأية

উত্তর ঃ

ويل শব্দের ব্যাখ্যা ঃ ويل শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত আছে যে, ويـــــل হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এই উপত্যকায় কাফেরকে নিক্ষেপ করা হবে, সে চল্লিশ বৎসর পর্যন্তও তাতে পৌঁছতে পারবে না।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, ويــل হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, সেখানে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তার উষ্ণতায় পাহাড় বিগলিত হয়ে যায়।

২. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, ويــل অর্থ– আক্ষেপ, ধ্বংস। আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহর বিধান বিকৃতকারীদের জন্য কেয়ামত দিবসে আফসোসের শেষ থাকবে না। তারা সর্বদা يـا ويلتى يا حسرتا বলে চিৎকার করতে থাকবে।

للـذيـن يكتبون الكتب بايديهم : আলোচ্য আয়াতের এ অংশে الكتاب দ্বারা ইহুদী কর্তৃক বিকৃত কিতাব উদ্দেশ্য, যা ইহুদী আলেমরা নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন– তাওরাতে লেখা ছিল, শেষ নবী সুদর্শন, কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখ, মাঝারি গড়ন ও গৌরবর্ণের অধিকারী হবেন। তারা তদস্থলে লিখলো, তিনি দীর্ঘ দেহী এবং নীল চোখ ও খাড়া চুলবিশিষ্ট হবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণ তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

প্রশ্ন: লেখা তো হাত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তারপরও يكتبون -এর পরে بـايديهم উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর: আল্লামা বায়যাবী (র.) এর জবাবে বলেন, এখানে ايـديهم উল্লেখ করে তাকীদ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়াভাবে রচনা করে।

وويـل لهم مما يكسبون -এর ব্যাখ্যা ঃ এখানে مـما يكسبون দ্বারা তাদের অপকর্ম দ্বারা উপার্জিত সম্পদ তথা ঘুষ উদ্দেশ্য।

﴿وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا﴾

السوال: ما المراد بـ اياما معدودة؟

উত্তর ঃ

ايـامـا معدودة দ্বারা দিন সংখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী ايـامـا معدودة দ্বারা কতদিন বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. সাত দিন ঃ মুজাহিদ (র.) বলেন, ইহুদীদের ধারণা ছিল পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। প্রতি এক হাজার বছরের জন্য তাদেরকে একদিন করে মোট সাত দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের এ ধরনের মনগড়া কথার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'লা আলোচ্য আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন। সুতরাং اياما معدودة বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে।

২. চল্লিশ দিন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, আলোচ্য আয়াতে اياما معدودة তথা নির্দিষ্ট দিন বলতে চল্লিশ দিনের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, ইহুদীরা বলে বেড়াতো, তাদের পূর্ব পুরুষরা চল্লিশ দিন গোবৎসের পূজা করেছিল বিধায় কেবল চল্লিশ দিন তারা জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৩. তিন দিন থেকে দশের যে কোন সংখ্যা ঃ কেউ কেউ বলেন, ايـامـا مـعدودة বলতে তিন দিন থেকে দশ দিনের সংখ্যা উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আরবীতে ايـــام শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়।

☆☆☆

﴿واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتمٰى والمسٰكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلوة واتوا الزكوة ثم توليتم وانتم معرضون﴾

السوال: فسر الأية على نهج المفسر العلام

উত্তর ঃ

لاتعبدون الا الله -এর ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী لاتعبدون الا الله বাক্যটি শব্দগতভাবে جـمـلـه خبريه তবে অর্থগতভাবে جـمـلـه انشائيه তথা نهى -এর জন্য ব্যবহৃত। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে لايضار كاتب ولاشهيد -এর মধ্যে لايضار জুমলায়ে খবরিয়া দ্বারা ইনশাইয়া তথা نهى উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অন্য কেরাতে لاتـعـبـدوا এসেছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে لاتـعـبـدون খবর বমা'না নহী। এছাড়া পরবর্তী অংশ তথা وقـولـوا لـلـنـاس জুমলায়ে ইনশাইয়াকে তার উপর আতফ করা হয়েছে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, لاتـعـبـدون বমা'না নহী। কেননা, عـطف الانشـاء عـلـى الـخـبـر

নাজায়েয। এ ব্যাখ্যানুসারে لاتعبدون অংশটি قول مقدر (উহ্য কওল) -এর মাকুলা হবে। ইবারতের মূল রূপ এভাবে واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل قائلين لاتعبدون الا الله কেউ কেউ বলেন, মূল ইবারত ছিল এভাবে ان لاتعبدوا (ان উহ্য থেকে)। অতঃপর ان ناصبه -কে হযফ করে لاتعبدوا -কে رفع দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তার শেষে نون اعرابي যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন এখানে لاتعبدون টি خبر بمعنى النهي হয়েছে, তখন সরাসরি نهي -এর সীগাহ্ আনা হলো না কেন?

উত্তর: جمله انشائيه -কে جمله خبريه -এর মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, তাদের দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকাশিত হওয়া খুবই দুষ্কর।

لاتعبدون বাক্যের তারকীব ঃ لاتعبدون বাক্যটি الميثاق শব্দ থেকে بدل অথবা الميثاق শব্দের معمول হয়েছে حرف جر উহ্য থেকে। মূল ইবারত এভাবে بان لاتعبدوا । কেউ কেউ বলেন, لاتعبدون বাক্যটি جواب قسم হয়েছে। কেননা, তার পূর্বে اخذ ميثاق (প্রতিশ্রুতি নেওয়ার) কথা বর্ণিত হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি নেওয়া এক প্রকারের কসম।

وبالوالدين احسانا الخ : মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী بالوالدين জার ও মাজরুরসহ تحسنون অথবা احسنوا উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে। وذى القربى শব্দটি الوالدين শব্দের উপর মা'তুফ হয়েছে। يتامى শব্দ يتيم শব্দের বহুবচন। যেমন ندامى শব্দ نديم শব্দের বহুবচন। مسكين এটা مبالغه -এর সীগাহ্। سكون ধাতু মূল থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো, স্থির থাকা, নড়াচড়া না করা। দরিদ্র ব্যক্তিকে মসিকীন বলা হয়। কেননা, তাকে তার দারিদ্র যেন স্থির করে দিয়েছে। حسنا এটা بضم الحاء (হা বর্ণ পেশসহ) মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত। শব্দটি قول محذوف -এর সিফাত হয়েছে।

প্রশ্ন: حسنا শব্দ যখন মাসদার হয়েছে, তখন তার দ্বারা قول -এর সিফাত আনা হলো কিভাবে? কেননা, মাসদার দ্বারা সিফাত আনা শুদ্ধ নয়।

উত্তর: এখানে مبالغه স্বরূপ মাসদারের মাধ্যমে সিফাত আনা হয়েছে। যেমন زيد عدل

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এখানে সালাত এবং যাকাত দ্বারা বনি ইসরাইলের প্রতি ফরযকৃত সালাত ও যাকাত উদ্দেশ্য।

ثم توليتم وانتم معرضون : পূর্বে بنى اسرائيل غائب ছিল সুতরাং تولوا বলা উচিত ছিল। কিন্তু যখন توليتم বলা হয়েছে, তাই বুঝা গেল, এখানে غَيْبَةٌ থেকে خطاب -এর দিকে التفات হয়েছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যুগের ইহুদীরা ও তাদের পূর্বসূরীরা উদ্দেশ্য।

﴿واذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماء كم ولاتخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون﴾

السوال: (الف) اكتب سبب نزول الاية

(ب) ما المراد بقوله تعالى: ولاتخرجون انفسكم من دياركم؟

উত্তর ঃ

আয়াতের শানে নুযূল ঃ মদীনা শরীফে দু'টি ইহুদী গোত্র বাস করতো। একটি বনু কুরাইজা অপরটি বনু নাজীর। এ উভয় গোত্র পরস্পরে হানাহানি করতো। মদীনা শরীফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত। আওস ও খাযরাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনু কুরাইজা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করলো এবং বনু নাজীর মৈত্রী স্থাপন করলো খাযরাজ গোত্রের সাথে। যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রত্যেকেই সমমনা ও মিত্রের সাহায্য করতো। একে অপরের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিতো। আবার কেউ বন্দী হলে সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করতো এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতো। এ আয়াতে তাদের সে মন্দ কর্মের উল্লেখ করে তা থেকে বারণ করা হয়েছে।

لاتسفكون دماء كم ولاتخرجون انفسكم من دياركم-এর ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী لاتسفكون دماء كم ولاتخرجون انفسكم من دياركم "তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং নিজেদেরকে স্বীয় বাড়ি হতে বহিস্কার করবে না" -এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

১. তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে না এবং দেশান্তর করবে না। এখানে অন্যকে হত্যা করাকে নিজেকে হত্যা করা বলা হয়েছে। তার কারণ হলো, অন্যকে হত্যা করার দ্বারা কেসাসের মাধ্যমে নিজের হত্যাকে অপরিহার্য করে নেয়া হয়।

২. তোমরা এমন কাজ করো না (অর্থাৎ কুফরি করো না), যা তোমাদেরকে হত্যা কিংবা দেশান্তরিত করাকে হালাল করে দেয়।

৩. তোমরা এমন কাজে লিপ্ত হয়ো না, যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয় অর্থাৎ তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন ও তার উপভোগ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে তোমাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

☆☆☆

﴿ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان﴾

السوال:(الف) بين وجوه الاعراب لهذه الأية
(ب) كم قراءة فی "تظاهرون" وما هی؟

উত্তর ঃ

ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم -এর তারকীব ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের তিনটি তারকীব বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. انتم মুবতাদা, هؤلاء খবর।تقتلون انفسكم الخ হয়তো هؤلاء থেকে হাল কিংবা পূর্ববর্তী বাক্যের بيان । দ্বিতীয় সূরতে তার কোন মহল্লে ই'রাব নেই।

২. انتم মুবতাদা, هؤلاء তার তাকীদ এবং تقتلون انفسكم الخ খবর।

৩.انتم মুবতাদা, هؤلاء -এর মধ্যকার اولاء টি الذين -এর অর্থে ইসমে মাওসূল আর تقتلون انفسكم الخ সিলা। অতঃপর সিলা ও মাওসূল মিলে খবর।

تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان আয়াতাংশের তারকীব ঃ تظاهرون الخ বাক্যটি تخرجون -এর ফায়েল কিংবা তার মাফউল (فريقا) অথবা উভয়টি থেকে হাল হয়েছে।

تظاهرون -এর মোট চারটি কেরাত ঃ

১. تَظَاهَرُوْنَ
২. تَتَظَاهَرُوْنَ
৩. تَظَّاهَرُوْنَ
৪. تَظَّهَّرُوْنَ

☆☆☆

﴿ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينٰت وايدناه بروح القدس﴾

السوال: فسر الأية على نهج القاضي

উত্তর ঃ

ولقد اتينا موسى الكتاب : আলোচ্য আয়াতাংশে الكتاب বলতে তাওরাত উদ্দেশ্য।

وقفينا من بعده بالرسل : "তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি"। قفينا মাযী'র جمع متكلم -এর সীগাহ্। যার অর্থ হলো, পিছনে চলা। এটা قفاء থেকে নির্গত। قفاء অর্থ গদী। গদী যেহেতু পিছনে থাকে, সেহেতু তার অর্থ হলো, পিছনে চলা।

البينٰت দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী واتينا عيسى بن مريم البينٰت -এর মধ্যকার البينٰت দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. البينٰت দ্বারা মু'জিযা উদ্দেশ্য। আর তা হলো মৃতকে জীবিত করা, শ্বেত (ধবল) রোগ মুক্ত করা, অদৃশ্যের সংবাদ দান, হযরত জিবরাইলকে দিয়ে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

২. البينٰت দ্বারা ইঞ্জীল কিতাব উদ্দেশ্য।

عيسى শব্দের বিশ্লেষণ ঃ عيسى এটা হিব্রু ভাষার শব্দ। মূলতঃ এটা يشوع (যীশু) ছিল। যার অর্থ হলো, নেতা।

مريم শব্দের বিশ্লেষণ ঃ مريم শব্দের অর্থ– সেবক। হযরত ঈসা (আ.) -এর জননীকে মরিয়ম এজন্য বলা হয় যে, তাকে মসজিদের সেবার জন্য অন্যান্য কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত-স্বাধীন রাখা হয়েছিল।

روح القدس দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য আয়াতে কারীমায় روح القدس -এর অর্থ হলো, পবিত্র আত্মা। তবে পবিত্র আত্মা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) নিম্নোক্ত অভিমতগুলো ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. روح القدس দ্বারা হযরত জিবরাইল (আ.) উদ্দেশ্য।

হযরত জিবরাইল (আ.) -এর মাধ্যমে ঈসা (আ.) -কে কয়েক প্রকার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। যেমন– জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। আসমানে উত্তোলনের সময় জিবরাইলের মাধ্যমে তাঁকে তুলে নেয়া হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর আত্মা উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে ছিলেন মুক্ত। অথবা তিনি আল্লাহর নিকট ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

৩. কেউ কেউ বলেন, روح القدس দ্বারা ইঞ্জীল কিতাবকে বুঝানো হয়েছে।

৪. আবার কারো কারো মতে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার ইসমে আ'যম বুঝানো হয়েছে।

﴿افكلما جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون﴾

السوال: فسر الأية كما فسر المفسر العلام

উত্তর ঃ

افكلما جاء كم رسول بما لاتهوى الخ **ঃ** মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী افكلما جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم الخ -এর অর্থ হলো, "তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট সত্য ও ন্যায়ের এমন কিছু এনেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ। তাদের কতেককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ আর কতেককে হত্যা করেছ।" আলোচ্য আয়াতে بما لاتهوى انفسكم -এর মর্ম হলো, "যা তোমাদের পছন্দ নয়।"

لاتهوى : واحد مونث غائب -এর সীগাহ্। এটা هَوِيٌّ (بكسر الواو) থেকে নির্গত। অর্থ: পছন্দ করা, ভালোবাসা। আর هَوًى (بفتح الواو) ও هُوِيٌّ (بضم الهاء و كسر الواو و تشديد الياء) অর্থ: পতিত হওয়া।

افكلما : এখানে হামযা হলো استفهاميه আর فاء হলো عاطفه। তার معطوف عليه হলো পূর্ববর্তী আয়াতের সমষ্টি তথা ولقد اتينا موسى الكتٰب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس এই চার বাক্যের সমষ্টি হলো معطوف عليه। معطوف عليه ও معطوف -এর মধ্যখানে همزه استفهاميه আনা হয়েছে দুই কারণে। (ক) توبيخ -এর জন্য। অর্থাৎ ধমক ও ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, এতসব নেয়ামতের পরেও তোমরা কেন অহংকার করলে? (খ) اظهار تعجب বা আশ্চর্য প্রকাশার্থে।

অথবা افكلما এটা পূর্ববর্তী আয়াতের উপর معطوف না হয়ে جمله مستانفه হবে। আর তখন তার معطوف عليه টি উহ্য হবে। ইবারতের মূলরূপ এভাবে افعلتم ما فعلتم بعد ما انعمت عليكم بهذه النعمة الجليلة فكلما الخ

استكبرتم -এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী استكبرتم অর্থ হলো, তোমরা অহংকার প্রদর্শন করেছ। এর দ্বারা ঈমান আনয়ন ও রাসূলের অনুসরণ করা থেকে অহংকার করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন করোনি এবং রাসূলের অনুগত হওনি।

ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون -এর মর্মার্থ ঃ সুতরাং কতেক রাসূলকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো যেমন মুসা ও ঈসা (আ.) -কে আর কতেককে হত্যা করেছো যেমন যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ.) -কে।

প্রশ্ন: تقتلون মুযারে'র শব্দ দ্বারা বুঝা যায় ইহুদীরা এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ও নবীদেরকে হত্যা করছিল। অথচ এটা বাস্তবের পরিপন্থী। উচিত ছিল قتلتم ব্যবহার করা।

উত্তর: এখানে জঘন্যতা বুঝানোর জন্য অতীতকে مضارع -এর স্থানে রাখা হয়েছে। যেন নবী হত্যার ঘটনা বর্তমানেও দৃষ্টির সামনে রয়েছে। এটাকেই حكايت حال ماضيه বলা হয়।

﴿وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون﴾

السوال: (الف) فسر قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف

(ب) الام اشار سبحانه وتعالى بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم؟

(ج) اكتب محل الاعراب لقوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون

উত্তর ঃ

وقالوا قلوبنا غلف -এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী وقالوا قلوبنا غلف -এর তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. غلف শব্দ اغلف শব্দের বহুবচন। اغلف সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার খৎনা করা হয়নি। এখানে غلف শব্দ দ্বারা استعاره مصرحه স্বরূপ জন্মগত পর্দাবৃত হওয়া বুঝানো হয়েছে। অন্তরকে জন্মগত পর্দাবৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যার খৎনা করা হয়নি তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর مشبه به দ্বারা مشبه উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব قلوبنا غلف -এর মর্ম হলো, আমাদের অন্তর জন্মগত পর্দায় আবৃত। কাজেই তুমি যা বলবে তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

২. غلف এটা غلاف (আচ্ছাদন) -এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে, আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা শুনে তা স্মরণ করে নেয়। তবে তুমি যা বলো তা স্মরণ রাখতে পারে না। কাজেই আমাদের অন্তর তোমার কথাকে স্মরণ রাখতে না পারা এবং গ্রহণ না করা এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তোমার কথাগুলো وحی من الله (আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী) নয়।

৩. আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা হযরত মুসা (আ.) তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কাজেই নতুন কোন তা'লীম গ্রহণে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাছে শেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের যা আছে, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

بل لعنهم الله بكفرهم : এটি ইহুদীদের গর্বোদ্ধত উক্তির স্পষ্ট জবাব। এই অংশের তিনটি অর্থ হতে পারে।

১. ইহুদীদের অন্তরে জন্মগত কোন পর্দা (আচ্ছাদন) নেই। বরং তাদেরকে ফিতরতের উপর এবং সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুফরির কারণে তাদেরকে সত্য গ্রহণের তাওফীক দান করেননি, তাদের সত্য গ্রহণের সেই যোগ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছেন।

২. অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকার কারণে তারা কুরআনী হেদায়েতকে অস্বীকার করেছে। বিষয়টি এমন নয়; বরং এর মূল কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে কুরআনী হেদায়েত গ্রহণ করার তাওফীক দান করেননি।

৩. ইহুদীরা তো অভিশপ্ত। তথাপি তাদের জ্ঞান থাকার এবং তোমার থেকে অমুখাপেক্ষীতার দাবি কী করে সঠিক হয়? অর্থাৎ অভিশপ্ত কাফেরদের এমন জ্ঞান কী করে হতে পারে, যার দরুন তোমার থেকে তারা অমুখাপেক্ষী হবে?

فقليلا ما يؤمنون -এর তাকীব ঃ قليلا এটি يؤمنون ফে'লের مفعول مطلق مقدم আর ما টি অতিরিক্ত (زائده) অর্থে তা ঈমানের স্বল্পতাকে জোরদার করছে। অর্থাৎ খুবই অল্প ঈমান।

﴿ولما جاء هم كتب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا.................فلعنة الله على الكفرين﴾

السوال: فسر الآية الكريمة على نهج المفسر العلام

উত্তর ঃ

ولما جاء هم كتب من عند الله : এখানে কিতাব বলতে মানব জাতির মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। من عند الله এটি كتاب -এর প্রথম সিফাত।

مصدق لما معهم : এটি দ্বিতীয় সিফত। অর্থাৎ এই কুরআন ইহুদীদের তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করে। কোন কোন কেরাতে مصدقا নসবের সাথে এসেছে। তখন এটি كتاب থেকে حال হবে।

প্রশ্ন: এখানে ইশকাল হয় যে, নিয়ম আছে, ذوالحال টি نكره হলে حال -কে ذوالحال -এর পূর্বে আনা ওয়াজিব। এখানে তো مصدقا (حال)টি كتاب (ذوالحال نكره) -এর পরে এসেছে। সুতরাং حال -কে পরে আনা কিভাবে সঠিক হলো?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং সেই نكره -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে কোন প্রকার تخصيص -এর সম্ভাবনা নেই। এখানে তো من عند الله দ্বারা كتاب শব্দের সিফত আনা হয়েছে, যার দরুন তার মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এখানে حال -কে পরে নেওয়া জায়েয হয়েছে।

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا -এর মর্মার্থ ঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের দু'টি অর্থ করেছেন। যথা–

১. يستفتحون এটি استفتاح থেকে নির্গত। যার অর্থ: সাহায্য চাওয়া, বিজয় কামনা করা। আয়াতের মর্ম হলো– ইহুদীরা তাদের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে শেষ যুগের নবীর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতো। তারা বলতো, হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদেরকে শেষ যুগের নবীর খাতিরে সাহায্য করুন, যার গুণাগুন তাওরাতে বর্ণিত আছে।

২. استفتاح অর্থ– অবগত করা। আয়াতের মর্ম হলো– ইহুদীরা মুশরিকদেরকে অবগত করতো যে, তাদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যার আগমনের সময় একেবারে সন্নিকটে। এ মর্মানুযায়ী استفتاح -এর استفعال সীন টি طلب -এর জন্য; বরং مبالغه -এর জন্য।

☆☆☆

﴿بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا .... وللكافرين عذاب مهين﴾

السوال: اوضح ما قال المفسر العلام فى هذه الأية

উত্তর ঃ

بئس ما اشتروا به انفسهم **-এর তারকীব:** এখানে بئسما -এর মাঝে ما হলো نكره এবং شيئا -এর অর্থে। এটি بئس -এর ضمير فاعل -এর তমীয। اشتروا به انفسهم হলো ما بمعنى شيئا -এর সিফত। ان يكفروا হলো مخصوص بالذم

اشتراء **শব্দের অর্থ:** বিক্রয় করা ও ক্রয় করা। এখানে এই দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম অর্থ হিসেবে আয়াতের মর্ম হবে, তারা কত নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা বিক্রয় করেছে। অর্থাৎ ইহুদীরা কুফুরি গ্রহণ করে আখেরাতের পূণ্যফলের স্বীয় হিস্যা বিনষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আয়াতের মর্ম হবে, তা কত নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে ক্রয় করেছে। এটি তাদের ধারণা মতে। কেননা, আত্মাকে ক্রয় করার অর্থ হলো তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করা। ইহুদীদের ধারণা ছিল, তারা তাদের কর্ম তথা কুফরি দ্বারা নিজেকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

بغيا ان ينزل الله : بغيا শব্দের মূল অর্থ– অন্বেষণ করা, কামনা করা। আর কামনার বিভিন্ন ধরন আছে। তন্মধ্যে কারো নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনাকে حسد বলে। এখানে بغيا দ্বারা হিংসা উদ্দেশ্য। এটি ان يكفروا -এর مفعول له ।

فباءوا بغضب على غضب : (গজবের উপর গজব ক্রোধের উপর ক্রোধ) -এর বিভিন্ন তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে। যথা–

১. হযরত ঈসা (আ.) -এর রিসালত প্রত্যাখ্যান করে এ ইহুদীরা প্রথমবার 'মাগযূব' (গজবের ক্ষেত্র) হয়েছিল। আর দ্বিতীয় মাগযূব হওয়ার মূলে রয়েছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রিসালতের অস্বীকৃতি।

২. প্রথম গযবের কারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রিসালতের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান এবং দ্বিতীয়বার গযবের কারণ তাদের হঠকারিতা বিদ্বেষ ও মনোবৃত্তি তাড়িত হওয়া। কেননা, তারা সত্য নবীকে অস্বীকার করলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো।

৩. কেউ কেউ বলেন, উদ্দেশ্য গযবের দ্বিরুক্তি দ্বারা পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তাকিদ ও জোরদার করা ও প্রচণ্ডতা বুঝানো।

☆☆☆

﴿قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك﴾

السوال: (الف) بين لغات المختلفة فى جبريل (ب) هاتوا سبب نزول الاية (ج) عين مرجع الضمير فى قوله فانه نزله . لم قبل على قلبك فى موضع على قلبى ولم خص القلب فى هذه الاية ؟ بين وجوه الاعراب لقوله "باذن الله" (د) كم لغة فى ميكال ؟ هاتوا بالتمثيل (ه) لم افرد الملكان بالذكر مع انهما من جنس الملائكة ؟

উত্তর ঃ

الف : اللغات المختلفة فى جبريل (جبريل শব্দের পঠন পদ্ধতিসমূহ) ঃ جبريل শব্দে আটটি পঠনরীতি রয়েছে। যার মধ্যে চারটি কিরাত সুপ্রসিদ্ধ। সেগুলো হল–

১. جَبْرَئِيْلُ (سَلْسَبِيْلٌ -এর ওযনে)।
২. جَبْرِيْلُ
৩. جَبْرَئِلُ (جَحْمَرِشٌ -এর ওযনে)।
৪. جِبْرِيْلُ (قِنْدِيْلُ -এর ওযনে)।
৫. جَبْرَائِلُ
৬. جَبْرَائِيْلُ
৭. جَبْرَائِلُّ (লাম বর্ণে তাশদীদসহ)।
৮. جِبْرَئِنُ

ب : سبب نزول الاية (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. আয়াতটি ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া প্রিয় নবী (সা.) -এর দরবারে সদল বলে হাজির হয়ে প্রশ্ন করে, আপনার কাছে কোন্ ফিরিশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসে? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, হযরত জিব্রীলে আমীন (আ.)। একথা শুনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া বলল, জিব্রাঈল আমাদের চিরশত্রু। বহুবার সে আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। তার সর্বাধিক বড় শত্রুতা হল, সে একদা আমাদের নবীকে অবহিত করল যে, পারস্য সম্রাট বুখতে নাছার বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করবে। তখন আমাদের তৎকালীন পূর্ব পুরুষগণ তাকে হত্যা করার জন্য একদল গুপ্তঘাতক পাঠায়। তারা তাকে নিঃস্ব অপ্রাপ্তবয়স্ক রূপে হত্যা করার জন্য আটক করে। কিন্তু জিব্রাঈল তাকে এ কথা বলে বাঁচিয়ে দেয় যে, তোমাদের প্রতিপালক যদি তার হাতে তোমাদের ধ্বংসের ফয়সালা করে থাকেন, তবে তাকে তোমরা রোধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে এরূপ সিদ্ধান্ত যদি না করে থাকেন, তবে কোন্ অপরাধে তোমরা তাকে হত্যা করবে? পরিণামে তার হাতে ৭০ হাজার নাসারা নিহত হয় এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাদের ঐ কথার প্রত্যুত্তরে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.) একদা ইহুদীদের পাঠশালায় গমন করেন। সেখানে তাদেরকে তিনি জিব্রাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তারা বলল সে আমাদের শত্রু। সে আমাদের জন্য ধ্বংস ও আযাব নিয়ে আসত। সে আমাদের গোপন তথ্য মুহাম্মদকে জানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মিকাঈল আমাদের বন্ধু। কেননা, তিনি বৃষ্টি ও রহমত বহন করে আনেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা কি? তারা বলল, জিব্রাঈল আল্লাহর ডান পার্শ্বে এবং মিকাঈল আল্লাহর বাম পার্শ্বে থাকেন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, তাদের মর্যাদা যদি তোমাদের বর্ণনানুযায়ী এরূপই হয়, তাহলে তাদের কারো সাথে শত্রুতা রাখা আদৌ বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে সে আল্লাহর দুশমন। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.) ফিরে আসার পূর্বেই অত্র আয়াত নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করেন।

فانه ও نزله -এর মধ্যকার যমীর দু'টির مرجع (مرجع الضمير فى قوله تعالى فانه نزله) : فانه نزله মধ্যকার যমীরের مرجع সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. فانه যমীরের مرجع হল জিব্রীল আর نزله -এর যমীরের مرجع হল কুরআন। ২. فانه -এর যমীরের مرجع হল لفظ الله আর نزله -এর যমীরের مرجع হল جبريل মূল ইবারত হল, فان الله نزل جبريل بالقران على قلبك

على قلبك বলার কারণ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা নবী করীম (সা.) -কে সম্বোধন করে বলে দিয়েছিলেন, قل অর্থাৎ তুমি বলে দাও। অতএব পরবর্তী কথাগুলো রাসূলের ভাষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে এখানে নিয়মানুযায়ী على قلبك না হয়ে على قلبى বলাই উচিত ছিল।

এর উত্তর হল, রাসূল (সা.) হুবহু আল্লাহর বাণী নকল করেছেন। যেন তার প্রতি নির্দেশনা হয়েছে قل ما تكلمت به অর্থাৎ আমি যা বলেছি হুবহু তাই মানুষকে বলে দাও।

وجه تخصيص القلب (কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ) : এ খানে দু'টি কারণে কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কলবই মূলতঃ ওহীর ধারক-বাহক।

২. স্মরণ রাখার ও উপলব্ধি করার একমাত্র অঙ্গই হল কলব।

১ : **উত্তর: اللغات المختلفة فى ميكال (ميكال শব্দের পঠন পদ্ধতিসমূহ)** : ميكال শব্দে দশটি পঠনরীতি রয়েছে। যথা–

১. مِيْكَالٌ
২. مِيْكَائِل
৩. مِيْكَئِل
৪. مِيْكَئِيْل
৫. مِيْكَائِل
৬. مِيْكَائِيْل
৭. مِيْكَايِيْل
৮. مِكْئِيْل
৯. مِكْئِل
১০. مِيْكَئِل

০ : **জিবাঈল ও মিকাঈল উভয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ** : হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল উভয়জন ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ملائكة উল্লেখের পর এ দুই ফিরিশতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তারা তো ملائكة -এর আওতাভুক্ত। তথাপি তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার তিনটি কারণ রয়েছে।

১. জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আ.) অন্যান্য ফিরিশতাদের তুলনায় বেশী সম্মানী।

২. তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের সাথে শত্রুতা রাখা গোটা ফিরিশতা জাতির সাথে শত্রুতা রাখার নামান্তর।

৩. ইহুদী ও রাসূলের মাঝে এ দুই ফিরিশতা সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে।

قوله تعالى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

السوال: (الف) ما معنى السحر وما ذا حكمه في تعليمه وتعلمه ؟
(ب) ما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة ؟
(ج) فسر الاية حق التفسير

الف : **উত্তর: معنى السحر لغة (سحر -এর আভিধানিক অর্থ)** ঃ

سحر -এর আভিধানিক অর্থ كل ما لطف ودق অর্থাৎ সূক্ষ্ম কথা বা কাজকে আভিধানিক অর্থে سحر বলা হয়। سحر -এর প্রচলিত অর্থ জাদু।

معنى السحر اصطلاحا (سحر -এর পাভিাষিক অর্থ) ঃ

সেহের বা জাদু বলা হয় সংগুপ্ত উপায় উপরকনণ অবলম্বন করে এমন বিষয়কে আয়ত্বে আনা, যা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না।

জাদুর বিধান ঃ হানাফী আলেমগণের মতে, জাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া হারাম, কিন্তু কুফুর নয়। তবে যদি তাতে কোন মাখলূকের ইবাদত করা হয় কিংবা তাকে এমন সম্মান দেয়া হয়, যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন রুকু, সিজদা ইত্যাদি, তবে তা কুফুর হবে।

ب : **জাদু, মু'জিযা এবং কারামতের মাঝে পার্থক্য** ঃ কয়েকভাবে এ তিনটি বস্তুর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়। যথা–

১. জাদুর জন্য গুপ্ত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু মু'জিযা ও কারামতের ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন নেই। বরং হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়।

২. জাদু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়াত্বে আনা যায়। তবে মু'জিযা ও কারামত এর বিপরীত।

৩. জাদুর জন্য বিশেষ কোন স্থান বা সময়ের প্রয়োজন হয়। মু'জিযা ও কারামত কিন্তু এরকম নয়।

৪. জাদুকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু মু'জিযা ও কারামত এর বিপরীত।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

১. মু'জিযার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, যা কারামতের ক্ষেত্রে নেই।

২. নবুওয়তের দাবীদার এবং শরীয়তের পাবন্দী এমন ব্যক্তি থেকে যে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, তাকে মু'জিযা বলে। পক্ষান্তরে কারামত হল নবুওয়তের দাবীদার নন, তবে শরীয়তের পাবন্দী এমন ব্যক্তি থেকে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়কে কারামত বলে। (বাংলা তানযীমুল আশ্‌তাত শরহে মিশকাত)

ج : **আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর** ঃ

অত্র আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত– نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب الخ -এর উপর معطوف হয়েছে। আয়াতের মধ্যে ما تتلوا দ্বারা জাদুর কিতাবাদি উদ্দেশ্য। تتلوا শব্দটি تلاوة থেকে নির্গত যার অর্থ পাঠ করা, তেলাওয়াত করা। অথবা تلو থেকে নির্গত যার অর্থ অনুসরণ করা। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, তারা আল্লাহর কিতাব বর্জন করে জাদুর কিতাবাদীর অনুসরণ করে চলেছে, যে কিতাবগুলো শয়তানরা পাঠ করে অথবা শয়তানরা যে কিতাবগুলোর অনুসরণ করে চলে।

على ملك سليمان ঃ ملك অর্থ রাজত্ব। ملك -এর শুরুতে عهد মুযাফ উহ্য রয়েছে। ইবারতের মূল হবে على عهد ملك سليمان হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, শয়তানরা গোপনে ফিরশতাদের নিকট থেকে কিছু সংবাদ শুনে নিত এবং যা শুনত তার সাথে আরো কিছু মিথ্যা বানোয়াট কথাগুলো সংযোজন করে যাদুকরদের নিকট পৌঁছে দিত। যাদুকররা এ সকল কথা গ্রন্থাকারে সংকলন করে লোকদের নিকট প্রচার করত। এ অপকর্মমূলক কাজ হযরত সুলায়মান (আ.) -এর আমলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনকি মানুষের কাছে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, জ্বিন জাতি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এবং সুলায়মান (আ.) -এর রাজত্ব এই জ্ঞান দ্বারাই পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং এই জ্ঞান দ্বারা তিনি মানুষ, জ্বিন এবং বাতাসকে তার অনুগত করে নিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহ তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার খন্ডন করে ইরশাদ করেন وما كفر سليمان "সুলায়মান কুফরী অর্থাৎ জাদু করেনি।" এখানে كفر শব্দটি জাদু অর্থে ব্যবহৃত। জাদুকে কুফরী বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জাদু বিষয়টি কুফরী। আর যিনি নবী হন তিনি তো নিষ্পাপ থাকেন। সুতরাং তিনি যাদু থেকেও নিষ্পপাপ। তাই সুলায়মান থেকে যাদু প্রকাশ পায়নি বরং এ যাদু প্রকাশ পেয়েছে শয়তানদের নিকট থেকে।

☆☆☆

يا ايها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم

السوال: (الف) اكتب سبب نزول الاية

(ب) كم قرأة فى قوله تعالى راعنا وانظرنا ؟ فصل

(ج) فسر كما فسر البيضاوى

উত্তর: (الف) سبب نزول الاية (আয়াতের শানে নুযুল) ঃ মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে راعنا বলে সম্বোধন করত। যার অর্থ আপনি আমাদেরকে আপনাদের কথামালা বুঝার অবকাশ দেন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানগণ যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) -কে راعنا বলে আহবান করত। তখন ইয়াহুদীরাও রাসূল (সা.) -কে راعنا বলে সম্বোধন করতে লাগল। তবে তারা রাসূলকে অন্য অর্থে راعنا বলত। অর্থাৎ তারা راعنا -কে رعن অথবা رعونة থেকে مشتق মেনে রাসূলকে راعنا বলে সম্বোধন করত। যার অর্থ অজ্ঞ, মূর্খ। সুতরাং راعنا অর্থ হে মূর্খ ব্যক্তি ! তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, রাসূলকে এমন শব্দ দ্বারা আহবান করবে যা অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। আর এ শব্দটি হল انظرنا। যার অর্থ আপনি আমাদের অপেক্ষা করুন।

ب : راعنا ও انظرنا -এর কেরাতসমূহ ঃ راعنا -এর মধ্যে তিন কেরাত:

১. رَعِنَا

২. رَاعُوْنَا (বহুবচনের সীগার সাথে। এখানে বহুবচন আনা হয়েছে কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন দ্বারা সম্মান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও বহুবচন দ্বারা রাসূলের সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য)। ৩. رَعِنًا (নূনের তানভীনসহ। তখন অর্থ হবে তোমরা বোকামী কথা বল না।

انظرنا -এর মধ্যে দুই কেরাত :

১. أَنْظُرْنَا (ثلاثی مجرد থেকে। باب نصر অর্থ আপনি আমাদের অপেক্ষা করুন)।

২. أَنْظِرْنَا (ثلاثی مزید فیه থেকে باب افعال অর্থ আপনি আমাদেরকে অবকাশ দিন)।

ج: تفسير الاية (আয়াতের তাফসীর) ঃ রাসূলের সাথে যখন ইয়াহূদীদের কথোপকথন হত তখন তারা রাসূলকে راعـــنــا দ্বারা সম্বোধন করত। যার বাহ্যিক অর্থ অতি সুন্দর অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। কিন্তু ইয়াহুদীরা রাসূলকে এ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে অন্তরে এমন অর্থ গোপন রাখত যা অত্যন্ত ঘৃণিত। তারা এই শব্দ দ্বারা বোকা অথবা রাখাল উদ্দেশ্য নিত। অনেক মুসলামানের এই নিকৃষ্ট অর্থ জানা ছিল না। তাই তারা মনে করত যে, এই শব্দটি সম্মানসূচক শব্দ বিধায় মুসলমানগণও রাসূলকে এই শব্দ দ্বারা আহবান করত। তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানগণকে নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা রাসূলকে راعـنـا বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এই শব্দের মধ্যে নিকৃষ্ট অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। বরং তাকে انظرنا বলে ডাকবে। وللكافرين عذاب اليم অর্থাৎ ইয়াহুদীরা রাসূল ও মুসলমানগণকে যে কষ্ট দেয়, তার পরিণামে রয়েছে তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

☆☆☆

قوله تعالى: ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها

السوال: (الف) اكتب سبب نزول الاية

(ب)بين معنى النسخ مع اقسامه

(ج) هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة والقياس؟

(د) ما الحكمة فى نسخ احكام الشرع؟ حرر موضحا

(ه) اوضح القرأت فى ننسخ وننسها مع بيان المعانى

উত্তর ঃ الف سبب نزول الاية (আয়াতের শানে নুযুল) ঃ কাযী বায়যাবী (র.) এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বলেন, যখন পৌত্তলিক ও ইয়াহুদীগণ কটাক্ষ করে বলতে লাগল যে, দেখ! মুহাম্মদ তা র অনুসারীদের আজ এক কথা বলে, আর কাল এক কথা বলে। কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহ্র কালাম হত, তাহলে তাতে এত পরিবর্তন হয় কেন? আর কুরআনের আদেশ রহিত হয় কেন? এর জবাবে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন। এর সারকথা হল, মানুষের অবস্থা, পরিবেশ, উন্নতি-অবনতি প্রয়োগ ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ্র নখদর্পনে। তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে নিছক তাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ্ তা'লা কোন আদেশকে রহিত করেন।

ب : معنى النسخ لغة (নসখরে আভিধানিক অর্থ) ঃ

نسـخ শব্দটি بـــاب فتـح -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ রহিত করা, দূর করা, বিকৃত করা, অনুলিপি প্রস্তুত করা।

معـنـى النسـخ اصـطـلاحـا (নসখের পারিভাষিক অর্থ) ঃ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে নসখ বলা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নসখের সংজ্ঞায় বলেন–

النسخ هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر

অর্থাৎ শরয়ী বিধানকে পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা রহিত করা।

اقسام النسخ **(নসখের প্রকারভেদ) :** কুরআনী নসখ মোট তিন প্রকার–
১. نسخ التلاوة والحكم معا (তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত করা)
২. نسخ التلاوة دون الحكم (কেবল তিলাওয়াত রহিতকরণ, হুকুম নয়)
৩ نسخ الحكم دون التلاوة (শুধু হুকুম রহিতকরণ, তিলাওয়াত নয়)

ج **: হাদীস এবং কিয়াস দ্বারা কুরআনী বিধান কি রহিত করা জায়েয?**

হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে–

مذهب الشافعي وادلته **(ইমাম শাফেয়ী র. -এর অভিমত ও দলীলসমূহ) :** তাঁর মতে, হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ নয়। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল পেশ করেন।

১. হাদীস كلامي لاينسخ كلام الله "আমার বাণী (অর্থাৎ হাদীস) আল্লাহর বাণীকে রহিত করতে পারে না।"

২. হাদীসের তুলনায় কুরআনের মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব নিম্ন মর্যাদাবান বিষয় দ্বারা উচ্চ মর্যাদাবান বিষয়কে রহিত করা বৈধ হবে না।

৩. হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা হলে ইসলাম বিদ্বেষীরা বলবে, রাসূল (সা.) স্বয়ং আল্লাহর বিরোধিতা করেন।

مذهب ابي احنيفة وادلته **(ইমাম আবু হানীফা ও তার দলীলসমূহ) :** ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে, হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ। তাঁর দলীল হল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বাণী–

ان احاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن "আমার হাদীসগুলোর কিছু অংশ অপর অংশকে রহিত করে যেরমক রহিত করে কুরআনী বিধানকে।"

الجواب عن ادلة الشافعي **(ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক পেশকৃত দলীলসমূহের উত্তর) :**

১. হাদীসের শব্দ كلامي (আমার বাণী) দ্বারা নবী করীম (সা.) -এর সেসব বাণী বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত মতামত যা ওহীলব্ধ নয়।

২. كلامي (আমার বাণী) দ্বারা কুরআনের তেলাওয়াত রহিত হয়না; কিন্তু বিধান রহিত হয়।

৩. كلامي لاينسخ الخ হাদীসটি ইবনে উমরের বর্ণিত ان احاديثنا الخ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ। পক্ষান্তরে خبر واحد দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ নয়। তদ্রূপ কিয়াস দ্বারাও কুরআনের আয়াত ও বিধান রহিত করা বৈধ নয়।

د : الحكمة في نسخ احكام الشرع **(শরীয়তের বিধান রহিতকরণের গুঢ় রহস্য) :** চিকিৎসক রুগীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ পরিবর্তন করে থাকে। এটা চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা নয়; বরং অভিজ্ঞতার প্রমাণ। তদ্রূপ মহান আল্লাহ্ কর্তৃক শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন ঘটানোর পিছনে কোন না কোন গুঢ় রহস্য নিহিত থাকে। আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান ভুলের উর্ধ্বে। এর বিপরীতে আমাদের জ্ঞান ত্রুটিমুক্ত নয়। কাজেই আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সেই বিধানের সময়সীমা জানা থাকে না এবং সেই বিধানকে চিরস্থায়ী ও সার্বজনীন মনে করে বসি। মহান আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিধায় তাঁর শান মুতাবিক এ রহিতকরণ হিকমত বা গুঢ় রহস্য থেকে খালি নয়। অতএব আল্লাহর নিকট কোন বিধান রহিত নেই। বরং এ

রহিতকরণ আমাদের জ্ঞান অনুপাতে এবং আমাদেরই কল্যাণের স্বার্থে শরীয়তের বিধান রহিত করে থাকেন।

৬ : نَنْسَخْ -এর কিরাতসমূহ ও তার অর্থ ঃ

ننسخ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. نَنْسَخْ (باب فتح থেকে। অর্থ আমি কোন আয়াত রহিত করলে)।

২. نُنْسِخْ (باب افعال থেকে। অর্থ আমি আপনাকে জিবরাঈলকে আয়াত রহিত করার নির্দেশ দেই। কিংবা অর্থ হল, আমি যে আয়াত রহিত পাই)।

نُنْسِهَا -এর কেরাতসমূহ ও তার অর্থ ঃ

ننسها শব্দে ছয়টি কেরাত রয়েছে–

১. نُنْسِهَا (باب افعال থেকে। অর্থ আমি কোন আয়াত বিস্মৃত করে দিলে)।

২. نَنْسَاهَا (باب فتح থেকে। অর্থ আমি রহিতকারী আয়াত অবতীর্ণ করতে বিলম্ব করি)।

৩. نُنَسِّهَا (باب تفعيل থেকে। অর্থ আমি কাউকে যে আয়াত ভুলিয়ে দেই)।

৪. تَنْسَاهَا (باب فتح থেকে واحد مذكر حاضر -এর সীগাহ্। অর্থ যে আয়াত তুমি বিস্মৃত হয়ে যাও)।

৫. تُنْسَاهَا (باب افعال থেকে مضارع مجهول -এর واحد مذكر حاضر -এর সীগাহ্। অর্থ যে আয়াত তোমার থেকে বিস্মৃত করা হয়)।

৬. نُنْسِكَهَا (باب افعال থেকে مضارع معروف -এর جمع متكلم -এর সীগাহ্ এবং كاف ضمير সহ। অর্থ আমি তোমাকে যে আয়াত বিস্মৃত করে দেই)।

☆☆☆

ومن اظلم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين

السوال: (الف) بين سبب نزول الاية (ب) اوضح معنى قوله تعالى ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين

(ج) هل يجوز للكافر ان يدخل فى سائر المساجد وفى المسجد الحرام؟ هات اقوال الائمة بالادلة (د) بين حكم مذاكرة الامور السياسية فى المساجد والمنع عنها بالادلة وما حكم مانع التبليغ الجماعة عن المساجد؟

উত্তর: الف: سبب نزول الاية **(আয়াতের শানে নুযূল) ঃ**

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ইবনে আব্দুর রহমান (র.) ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন প্রিয় নবী (সা.) চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর এ

সফরের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ, জিয়ারত এবং তথায় নামায আদায় করা। কোন প্রকারের যুদ্ধের চিন্তা তাঁর ছিল না। তাই মুসলমানরা নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কা অভিমুখে গমন করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ মক্কার অদূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে প্রিয় নবী (সা.) -কে বাধা দেয়। এ সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়।

২. আল্লামা বগভী (র.) লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) আতা (রা.) প্রমুখ বলেন, খ্রীস্টান রাজা তাইসুস আছিয়ানুস রূমী ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তখন সে বায়তুল মুকাদ্দাস বিধ্বস্ত করে তথায় আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে এবং তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে দেয়। সমগ্র শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং শহরটিকে জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত করে। এ ঘটনা স্মরণ করিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ب : اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين **আয়াতের মর্মার্থ ঃ**

বক্ষমান আয়াতের বাহ্যর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার ইরশাদ অনুযায়ী বুঝা যায়, মসজিদে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা অর্থাৎ খ্রীস্টানেরা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দসে প্রবেশ করেছিল। অথচ বস্তুতঃ তারা অহমিকার সাথে নিশ্চিন্তে তথায় প্রবেশ করেছিল। তাই আল্লামা বায়যাবী (র.) এ বিভ্রান্তির নিরসন কল্পে আয়াতের চারটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. বিনয় ও ভীতি-সন্ত্রস্থ না হয়ে তথায় প্রবেশ করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়। অতএব বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস বা বিরান করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা তাদের জন্য মোটেও ঠিক হয়নি।

২. আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত হল, তারা মুমনিগণকে ভয় পেয়ে তথায় প্রবেশ করবে। অতএব যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনগণকে অঙ্গীকার দেয়া হচ্ছে যে, আমার তরফ থেকে তোমাদের নিকট সাহায্য পৌছবে এবং তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাদের থেকে ছিনিয়ে আনবে।

৩. আল্লাহ্ তা'লা মুমিনগণকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, যাতে তারা মসজিদে প্রবেশ করার সুযোগ না পায়। অতএব এখানে خبر (সংবাদ) দ্বারা نهى (নিষেধ) উদ্দেশ্য।

ج **কাফিরদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করার বিধান ঃ** কাফিররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কি না এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

مذهب الامام مالكؒ (ইমাম মালিক র. -এর অভিমত) ঃ তার মতে, পৃথিবীর সমস্ত মসজিদে কাফিরদের জন্য প্রবেশ করা নিষেধ।

مذهب الامام الاعظم ابى حنيفةؒ (ইমাম আ'যম আবু হানীফা র. -এর অভিমত) ঃ তার মতে, পৃথিবীর সকল মসজিদে কাফিরদের প্রবেশ করার অনুমতি আছে এমনকি মসজিদে হারামেও তারা প্রবেশ করতে পারবে।

مذهب الامام شافعیؒ (ইমাম শাফেয়ী র. -এর অভিমত) ঃ তিনি বলেন, মসজিদে হারাম ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

دليل الامام مالكؒ (ইমাম মালিকের দলীল) ঃ তিনি জুনুবী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে জুনুবীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। আর কাফির তো সবচেয়ে বড় জুনুবী। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান– انما المشركون نجس নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। কাজেই কাফিরদের

জন্যও মসজিদে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

دليل الامام شافعيؒ (ইমাম শাফেয়ী র. -এর দলীল) ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام

এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে মসজিদ হারামের কথা বলা হয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র মসজিদে হারামে প্রবেশ করা তাদের জন্য অবৈধ। অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ।

دليل الامام ابى حنيفةؒ (ইমাম আবু হানীফা র. -এর দলীল) ঃ প্রথম দলীল হল আল্লাহ্ তা'লার বাণী اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিররা মসজিদে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে প্রবেশ করবে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, তাদের জন্য মসজিদে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে প্রবেশ করা বৈধ। দ্বিতীয় দলীল হল একবার প্রিয় নবীর নিকট ছকীফের এক প্রতিনিধি দল এসেছিল। তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে বসালেন। সুতরাং যদি কাফিরদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা অবৈধ হ্তো, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে মসজিদে বসতে দিতেন না। তৃতীয় দলীল হলো– মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে পাক (সা.) ঘোষণা দিলেন, যে মুশরিকই আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ। সুতরাং মসজিদে কাফিরদের জন্য প্রবেশাধিকার না থাকলে রাসূল (সা.) প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। অতএব এ সকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের মাযহাবটি রাজেহ।

د : مذاكرة الامور السياسية فى المساجد (মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনা) ঃ

মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনার বিভিন্ন সূরত থাকতে পারে।

১. যদি মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনার কারণে মানুষের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় তাহলে এই সূরতে রাজনৈতিক আলোচনা করা নিষিদ্ধ। কেননা, অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মসজিদে যিকির, নামায ইত্যাদি কাজে যে সকল বিষয় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রাজনৈতিক আলোচনা যাকে ইসলাম সমর্থন করেনি তাও মসজিদে অবৈধ। তাই এ জাতীয় আলোচনাকারী ব্যক্তি কে বারণ উচিত।

২. এমন রাজনৈতিক আলোচনা যা ইসলাম সমর্থন করে এবং জনসাধারণের উপকারিতাও এতে

নিহিত এবং তাতে ইবাদত ও যিকিরে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় না এ জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনা করা মসজিদে জায়েয আছে। কেননা, রাসূল (সা.) অনেক সময় রাজনৈতক ব্যাপারে মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন।

যারা প্রচলিত তাবলীগ জামাতের লোকদেরকে মসজিদে প্রবেশ হতে নিষেধ করে তারাও উল্লেখিত আয়াতের মেসদাক। কেননা, আমাদের আকাবির এ জাতীয় জামাতকে পছন্দ করতেন। তাবলীগী জামাত মসজিদে ইসলামী তা'লীম দেন এবং শরীয়ত বিরোধী কোন কাজও তারা করেননি। উপরন্তু প্রিয় নবী (সা.) অধিকাংশ সময় মসজিদেই তা'লীম দিতেন এবং কিছুসংখ্যক সাহাবী মসজিদে নববীতে রাত্রিযাপন করতেন।

☆☆☆

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ

السوال: (الف) ما معنى الابتلاء؟ والابتلاء والاختبار مرادفان ام بينهما فرق؟

(ب) ما المراد بالكلمات؟

(ج) عين مرجع الضمير المرفوع فى قوله فأتمهن

উত্তর: الف (معنى الابتلاء والفرق بين الابتلاء والاختبار ابتلاء -এর অর্থ এবং ابتلاء ও اختبار -এর মধ্যকার পার্থক্য) ঃ

ابتلاء শব্দটি بلاء (বিপদ অর্থ) থেকে গঠিত। তার আভিধানিক অর্থ التكليف بالامر الشاق অর্থাৎ কাউকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া। আর এটাই তার প্রকৃত অর্থ। আর اختبار অর্থ পরীক্ষা করা। অতএব বুঝা গেল, প্রকৃত অর্থ হিসেবে ابتلاء ও اختبار -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে রূপক অর্থ হিসেবে উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ রূপক অর্থে ابتلاء শব্দটি اختبار -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ب : كلمات দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তা'লা ইবরাহীম (আ.) কে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। এখন আলোচনা হল এ বিষয়গুলো কি ছিল? এপ্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যথা–

১. ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনায় আছে, এখানে كلمات দ্বারা সেই ত্রিশটি প্রশংসনীয় গুণাবলী উদ্দেশ্য যেগুলো শরীয়তে ইসলামীর অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে দশটির আলোচনা রয়েছে সূরা বরাতের একটি আয়াতে। আয়াতটি হল–

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

অপর দশটির কথা আছে সূরা মুমিনের একটি আয়াতে। আয়াতটি হল এই–

قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلوتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذالك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم و وعدهم راعون والذين هم على صلوتهم يحافظون اولئك هم الوارثون.

আর বাকি দশটির উল্লেখ আছে সূরা আহযাবের এই আয়াতে–

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

অতএব আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ালো যে, মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.) -কে উল্লেখিত ত্রিশটি প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা পরিক্ষা করেছেন। ইবরাহীম (আ.)ও সেগুলোকে পূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অপর বর্ণনা মতে, এখানে كلمات দ্বারা ইব্রাহীম (আ.) -এর দশটি

সুন্নাত উদ্দেশ্য। এই সুন্নাতগুলি হল এই– (১) মাথা মুণ্ডানো (২) কুলি করা (৩) নাকে পানি দেওয়া।

(৪) মুঁচ ছোট করা (৫) মিসওয়াক করা (৬) নখ কাটা (৭) বগলের চুল উপড়ানো (৮) খৎনা করা (৯) নাভীর নীচ মুণ্ডানো এবং (১০) ইস্তেঞ্জা করা।

৩. কেউ কেউ বলেন, كلمات দ্বারা হজ্জের আরকান সমূহ উদ্দেশ্য। যেমন তওয়াফ, সাঈ', রমিয়ে জিমার বা পাথর নিক্ষেপন, ইহরাম, উকুফে আরাফা ও মুযদালিফা ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, كلمات দ্বারা ছয়টি নিদর্শনাবলী উদ্দেশ্য। যেমন নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, হিজরত, পুত্র জাবাই।

৫. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, كلمات দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

ج : فاتمهن-এর মধ্যে ضمير مرفوع-এর مرجع ঃ

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, فاتمهن-এর মধ্যে ضمير مرفوع-এর مرجع আল্লাহ্ তা'লা। তখন তার মর্ম হবে, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ের দাবি করেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যমীরের مرجع ইবরাহীম (আ.)। তখন অর্থ হবে, ইবরাহীম (আ.) -কে যেসকল বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তিনি সবগুলো পুংখানুপুংখভাবে আদায় করেছেন।

☆☆☆

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَايُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ

السوال: (الف) فسر الاية الكريمة

(ب) ما معنى الشفاعة والعدل والنصر؟

(ج) الاية تدل على نفى الشفاعة لاهل الكبائر كما هو رأى المعتزلة ـ ما الجواب عنه؟ بين مدللا

উত্তর: الف : تفسير الاية الكريمة (আয়াতের তাফসীর) ঃ

প্রারম্ভকথা ঃ বনী ইসরাঈল জাতির একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তারা মহামান্বিত নবীগণের বংশধর এবং মহৎ প্রাণ পীর দরবেশ, পরহেযগার ও সাধক পুরুষদের সাথে তাদের গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক থাকার কারণে পরকালে তারা মুক্তি লাভ করবে। উক্ত আয়াতে তাদের এ বদ্ধমূল ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

মূলকথা ঃ দুনিয়াতে সাধারণতঃ নিয়ম হলো কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্থ হলে তার আপন জনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়, তখন অর্থ সম্পদ ব্যয় করে বিনিময় মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ

করে যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিপদমুক্ত পাওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাঈলের পূর্বোক্ত ধারণা এবং অমূলক বিশ্বাসের অসারতা ঘোষণা করেছেন, সেদিনকে ভয় কর অর্থাৎ কিয়ামদের দিন যেদিন কেউ কারো কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় ও মূল্যও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

সুতরাং কিয়ামত দিবসের জন্য সকলের যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

ب : معنى الشفاعة (شفاعة অর্থ) ঃ شفاعة শব্দটি باب فتح -এর মাসদার। অর্থ সুপারিশ করা।

معنى العدل (عدل অর্থ) ঃ عدل শব্দটি باب ضرب -এর মাসদার। অর্থ ন্যায় পরায়ণতা, সমতা, সোজা হওয়া ইত্যাদি।

معنى النصر (نصر অর্থ) ঃ نصر শব্দটি মাসদার। অর্থ সাহায্য করা।

ج : **মু'তাযিলাদের যুক্তিখন্ডন** ঃ উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, কবীরা গুনাহ্কারী ব্যক্তির জন্য পরকালে সুপারিশ চলবে না। তাদের এ যুক্তি খন্ডন করে আল্লামা বায়াবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে শুধুমাত্র কাফির-মুশরিকদের সুপারিশ গ্রহণ না করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে কবীরা গুনাহ্কারী ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এ কথা বলা হয়েছে।

☆☆☆

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

السوال: (الف) بين سبب نزول الاية

(ب) ما المراد بمقام ابراهيم وما حكم الصلوة فيه؟

উত্তর: الف سبب نزول الاية (আয়াতের শানে নুযূল) ঃ বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) হযরত উমর (রা.) -এর হাতে ধরে মুকামে ইবরাহীমের দিকে ইঙ্গিত করলেন। উমর বললেন, আমরা কি এ জায়গাটিকে নামাযের স্থান বানাতে পারি না? তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বললেন, এ বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশ আসে নি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ب : المراد بمقام ابراهيم وحكم الصلوة فيه **(মকামে ইবরাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য ও তথায় নামায পড়ার বিধান)** ঃ মুকামে ইবরাহীম দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ প্রসঙ্গে চারটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. মকামে ইবরাহীম দ্বারা সেই পাথর উদ্দেশ্য যা মু'জিযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

২. মকামে ইবরাহীম দ্বারা সেই পাথর উদ্দেশ্য যে পাথরের উপর ইবরাহীম (আ.) দাঁড়িয়ে মানুষকে হজ্জের ঘোষণা দিয়েছিলেন অথবা কা'বা নির্মাণ করেছিলেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, মকামে ইব্‌রাহীম দ্বারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

৪. কেউ কেউ বলেন, হজ্জের স্থানসমূহ উদ্দেশ্য।

শেষের দুই উক্তি অনুযায়ী মকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থান বানানোর অর্থ হবে, সেই স্থানসমূহে দুআ করা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে মকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মকামে ইব্‌রাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى অতঃপর মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে ইব্‌রাহীম।– (সহীহ্ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ যদি কেউ মকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে ইব্‌রাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায ওয়াজিব।– (জাস্‌সাস, মোল্লা আলী ক্বারী) তবে উক্ত দু'রাকাত নামায বিশেষভাবে মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দু'রাকাত নামায কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকাত মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

☆☆☆

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

السوال: اذكر ما قال البيضاوىّ فى تفسير الاية ولاتنس ما ذكره فى اعرابها

উত্তর: আয়াতের তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে صبغة বলা হয়েছে। যার অর্থ আল্লাহর রঙ। صبغة الله এ অংশটি فعل محذوف -এর مفعول مطلق হয়েছে। ইবারতের মূল রূপ ছিল– صبغنا الله صبغته তার শাব্দিক অর্থ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর রঙে রঙ্গীন করেছেন। আল্লামা বায়যাবী (র.) এর তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১. এখানে صبغة الله (আল্লাহর রঙ) দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সেই স্বভাব অর্থাৎ দীনে ইসলাম উদ্দেশ্য, যার উপর তিনি বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং صبغنا الله صبغته -এর অর্থ হবে, فطرنا الله فطرته অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে স্বীয় ধর্মের উপর অবিচল রেখেছেন। এখানে ইসলাম ধর্মকে صبغة (রঙ) -এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, রঙ্গের মাধ্যমে যেরকম বস্তুর সৌন্দর্যতা প্রকাশ

পায়, সেরকম ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র ফুটে উঠে।

২. صبغة الله দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে, মহান আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে স্বীয় হেদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং তাঁর প্রমাণের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। হেদায়েতকে রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রঙ যেমন কাপড়ের প্রত্যেক সুতায় সুতায় প্রবেশ করে, তেমনি হেদায়েত মুমিনরে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে।

৩. صبغة الله -এর অর্থ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অন্তরকে ঈমানের দ্বারা পবিত্র করেছেন।

صبغة الله -এর তারকীব ঃ তারকীবের দিক দিয়ে তার মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. مفعول مطلق হিসেবে منصوب । ইবারতের মূল রূপ হল, صبغنا الله صبغته

২. صبغة الله এটা منصوب على الاغراء হয়েছে। অর্থাৎ صبغة -এর পূর্বে উৎসাহব্যঞ্জক একটি ফে'ল উহ্য রয়েছে। যেমন الزم

৩. অথবা صبغة الله টি بل ملة ابراهيم -এর ملة থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে منصوب ।

تَمَّتْ وَبِالْفَضْلِ عَمَّتْ